শিবানন্দ স্মৃতিসংগ্রহ

অখণ্ড

উদ্বোধন কার্যালয়

শিবানন্দ-স্মৃতিসংগ্রহ

অখণ্ড

সংকলক

স্বামী অপূর্বানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়

কলকাতা

প্রকাশকের নিবেদন

পরম পূজ্যপাদ স্বামী অপূর্বানন্দজী মহারাজ কর্তৃক সঙ্কলিত 'শিবানন্দ স্মৃতিসংগ্রহ' নামক বিপুলায়তন এই অপূর্ব গ্রন্থটি তিনটি খণ্ডে প্রথম প্রকাশিত হয় বারাসাত রামকৃষ্ণ মঠ (তদানীন্তন রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রম)-এর তত্ত্বাবধানে। এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশ ঘটে স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের পুণ্য-জন্মতিথিতে ১১ পৌষ, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দে (১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে) এবং তৃতীয় খণ্ডটি ১৩৭৭ বঙ্গাব্দে বা ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে। পরে, গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় দুই খণ্ডে— প্রথম খণ্ডটির আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৩৮৬ বঙ্গাব্দে বা ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে এবং দ্বিতীয় খণ্ডটি ১৩৮৯ বঙ্গাব্দে বা ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে। এরপর প্রায় বাইশ বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, গ্রন্থটির কোন সংস্করণ বা খণ্ডই আজ আর আগ্রহী পাঠকদের কাছে প্রাপ্তিসাধ্য নয়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলে এই অমূল্য গ্রন্থটির এক অপরিসীম গুরুত্ব ও একটি বিশেষ চাহিদা আছে। তাই, আমরা এই মহান সঙ্কলন গ্রন্থটির একটি অখণ্ড সংস্করণ নবকলেবরে পরিমার্জিত ও সংশোধিত আকারে প্রকাশ করতে অগ্রসর হই। প্রথম সংস্করণের তিনটি খণ্ডে কিছু কিছু রচনা একটি খণ্ডে স্থানলাভ করেও অনবধানতাবশত খণ্ডান্তরে প্রকাশিত হয়েছিল। তাছাড়া দুটি সংস্করণেই গ্রন্থটিতে কিছু কিছু ভ্রমপ্রমাদও সকলের অলক্ষিত থেকে গেছিল। ঐ ভ্রমসমূহের সংশোধন এবং আধুনিক বানান পদ্ধতি অনুসারে কিছু সংশোধন করা হয়েছে। আমেরিকার সেন্টলুইস বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ ও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বিদগ্ধ সন্ন্যাসী স্বামী চেতনানন্দজী মহারাজ তাঁর অত্যধিক কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও, এই গ্রন্থটির পুনর্বিন্যাস কার্যের দায়িত্বভার নিজে গ্রহণ করে, স্মৃতিকথাগুলির মধ্যে যেগুলি মঠ ও মিশনের সাধুসন্ন্যাসীদের রচনা, সেগুলি প্রথম পর্বে এবং অন্যান্য স্মৃতিকথাগুলি, যা গৃহিভক্তবৃন্দের লেখনী প্রসূত, সেগুলি গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বে ভাগ করে সাজিয়ে দিয়েছেন। বলাবাহুল্য, একই রচনা একাধিক খণ্ডে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অন্তর্ভুক্তিটি বাদ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া ভাষাগত ও অন্যবিধ ত্রুটিগুলির যথাযথ সংশোধন করা হয়েছে। গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তদানীন্তন সঙ্ঘাধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ যে প্রাক্-কথনটি অবদান করেন, সেটি আমরা এই সংস্করণেও অন্তর্ভুক্ত করেছি। এছাড়া, আমাদের বর্তমান

সঙ্ঘাধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ এই অখণ্ড সংস্করণের একখানি অনবদ্য ভূমিকা রচনা করে আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের মধ্যে স্বামী শিবানন্দ তথা মহাপুরুষ মহারাজজীর অবস্থান তাঁর প্রধান পরিকর স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দের ঠিক পরেই। মঠ ও মিশনের ইতিহাসে এক অতি ঘটনাবহুল ও গুরুত্বপূর্ণ কালপর্বে তিনি এর দ্বিতীয় সঙ্ঘনায়ক হিসেবে পরবর্তী প্রজন্মের সাধু সন্ন্যাসী ও ভক্তমণ্ডলীর সাধনজীবনে যে আধ্যাত্মিক প্রেরণা ও আদর্শ সঞ্চার করেছেন, তা সঙ্ঘজীবনকে শুধু যে কেবল এক সুদৃঢ় ভিত্তির ওপরই স্থাপিত করেছে তাই নয় তা সঙ্ঘবহির্ভূত রামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলকে প্রেমভক্তি রসাশ্রিত ও অশেষ মধুময় করে তুলেছে। তাই মহাপুরুষ মহারাজের সান্নিধ্যে আসা ও তার অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠা সাধুভক্তজনের লেখনী উদ্ভাসিত স্মৃতিচিত্রগুলি আধ্যাত্মিক সম্পদে যেমন সমৃদ্ধ তেমনই সেই জ্যোতিষ্কসম মহাপুরুষের দিব্য আলোকচ্ছটায় দেদীপ্যমান। সেদিক থেকে এই নবকলেবরে প্রকাশিত অখণ্ড স্মৃতিসঞ্চয়নটি আধ্যাত্মিক ভাবোজ্জীবিত মনের কাছে তথা শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর কাছে এক বহু আকাঙ্ক্ষিত সম্পদের সন্ধান দেবে। এ কারণেই, আমরা অনেক দেরিতে হলেও এই মহামূল্য সঙ্কলন গ্রন্থটির এই অখণ্ড সংস্করণটি আসন্ন কল্পতরু উৎসব উপলক্ষ্যে প্রকাশ করতে পেরে নিজেদের কৃতকৃতার্থ বোধ করছি।

এই মহাগ্রন্থটির প্রকাশনার প্রস্তুতি পর্বে স্বামী চেতনানন্দজী যে বিপুল পরিশ্রম স্বীকার করে এর সৌকর্যবৃদ্ধি করেছেন তার জন্য আমরা তাঁর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এছাড়া সর্বশ্রী পলিন মুখোপাধ্যায়, তারকনাথ দে, উৎপল মুখোপাধ্যায়, সুহাস রায়, অজিতকুমার দাস, প্রমুখ আমাদের স্বেচ্ছাব্রতী কর্মিবৃন্দ এই প্রকাশনার সর্ববিধ কার্যে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই প্রকাশনা সম্ভব করেছেন, সেজন্য তাঁরাও আমাদের ধন্যবাদার্হ।

আমাদের স্থির বিশ্বাস, এই অনুপম সঙ্কলন গ্রন্থটি শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলী ও অন্যান্য আগ্রহী পাঠক সমাজের কাছে সবিশেষ সমাদর লাভ করবে।

কল্পতরু উৎসব, ২০০৫ — স্বামী সত্যব্রতানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা

প্রথম খণ্ডের নিবেদন

শ্রীভগবানের অপার করুণায় 'শিবানন্দ-স্মৃতিসংগ্রহ' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলো। শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের প্রায় শতাধিক প্রবীণ সন্ন্যাসী ও ভক্তের অপ্রকাশিত স্মৃতিকথাই এ গ্রন্থের মূল উপাদান। তা থেকে ২৮ জন সাধু-ভক্তের স্মৃতিকথা নিয়ে প্রথম খণ্ডটি রচিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের যে সকল প্রবীণ সন্ন্যাসী তাঁদের স্মৃতিকথা এ গ্রন্থের জন্য লিপিবদ্ধ করেছেন, তাঁরা বর্তমান ও ভবিষ্যতের শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলী ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন, সন্দেহ নেই। যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ সন্ন্যাসি-পার্ষদ 'মহাপুরুষ মহারাজ'কে তাঁরা বিচিত্র পরিবেশে দিনের পর দিন নিজের চোখে যেভাবে দেখেছেন, তা তাঁদের অন্তরলোকের অনির্বচনীয় অনুভূতি; সে অনুভূতিকে ভাষায় সুবিন্যস্ত করা সত্যই কঠিন কাজ। তবুও তাঁরা উত্তরকালীন অধ্যাত্মপিপাসুদের জন্য প্রভূত শ্রম স্বীকার করে তাঁদের ব্যক্তিগত উপলব্ধিকে স্মৃতিমঞ্জুষা হতে তুলে নিয়ে বাক্যে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। রচনাশৈলী, অলঙ্কার, আবেগ বা অন্যপ্রকার সাহিত্য-মাধুর্য এ চেষ্টায় অপ্রাসঙ্গিক। ঈশ্বরদ্রষ্টা মহাপুরুষজীর যে অনন্যসাধারণ ভাবমূর্তি তাঁদের কাছেও একদিন সজীব ও প্রত্যক্ষগোচর ছিল, তারই কথঞ্চিৎ প্রতিচ্ছায়া যদি পাঠকপাঠিকাগণ স্মৃতিকথার মধ্যে দেখতে পান, তা হলেই তাঁদের লেখা সার্থক।

স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ দীর্ঘ আশি বৎসর এ পৃথিবীতে ছিলেন। প্রথম বয়সে তাঁর ধর্মজীবনের যে সূত্রপাত, তা কত বিচিত্র ধারায় বৎসরের পর বৎসর নানা ধ্যান-ধারণা, সেবা-বন্দনা, আত্মনিবেদন, পরিব্রজ্যা, জ্ঞান-বৈরাগ্য-যোগ-ভক্তি-প্রেম দ্বারা প্রবুদ্ধ ও পরিপুষ্ট হয়ে তাঁকে একদিন শতশত সাধু-ভক্তের আরাধ্য 'মহাপুরুষ মহারাজে' পরিণত করেছিল, তার কোন ধারাবাহিক কাহিনী আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। নিজের কথা তিনি সামান্যই বলতেন। যেটুকু কখনো বলতেন তা শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমার প্রসঙ্গেই উক্ত হতো। অতএব যাঁরা মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গলাভ করেছেন, তাঁরা তাঁর দীর্ঘজীবনের বহুতর লৌকিক বা অলৌকিক ঘটনা উপস্থাপিত করতে পারবেন, এমন আশা করা চলে না। কিন্তু তাঁরা এই মহৎ আধ্যাত্মিক জীবনে যে শ্রীরামকৃষ্ণময়তা, ভাবতন্ময়তা, ত্যাগ-বৈরাগ্য-জ্ঞাননিষ্ঠা ও মানবপ্রেম লক্ষ্য

করেছেন, তার অসন্দিগ্ধ পরিচয় এ স্মৃতিকথামালায় পাওয়া যাবে। আমাদের কাছে এ পরিচয়টিই সমধিক মূল্যবান ও প্রেরণাদায়ক।

মহাপুরুষ মহারাজ একখানা চিঠিতে একবার লিখেছিলেন যে, তাঁর জীবনে অন্য কোনও বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা নেই; একটিমাত্র ঘটনাই শুধু স্মরণীয়—তা হলো শ্রীরামকৃষ্ণের চরণাশ্রয় ও তাঁর কৃপা লাভ। শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমা ও কৃপার কথা বলতে তাঁর কোন ক্লান্তি ছিল না। এই স্মৃতিকথাগুলির মধ্যে মহাপুরুষজীকে অবলম্বন করে শ্রীরামকৃষ্ণের মহতী অভিব্যক্তিকে নানা রূপে-রসে ও অপূর্ব সুষমায় হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করব।

শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন যুগদেবতা, জননী শ্রীসারদাদেবী তাঁর মহাশক্তি আর স্বামী বিবেকানন্দ এঁদের বার্তাবহ সেবক। আমরা যাতে এ 'ত্রয়ী'কে ধরে ভারতের সনাতন অধ্যাত্মবাণী যথার্থ বুঝতে পারি এবং বুঝে তা নিজেদের জীবনে ফুটিয়ে তুলতে পারি, সেজন্য শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সন্ন্যাসী শিষ্যগণ বারবার আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। এই 'ত্রয়ী' যেন মহাপুরুষজীর মধ্যে সঙ্গত হয়েছেন জ্ঞান-ভক্তি-কর্মরূপে। মহাপুরুষ মহারাজের 'স্মৃতিসংগ্রহের' মুখ্য আবেদনও তাই।

কাশীপুর উদ্যানবাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণের পীড়া, চিকিৎসা ও সেবাকে হেতু করে শ্রীঠাকুরের পদাশ্রয়েই শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সূচনা হয়। 'সূত্রে মণিগণা ইব' কয়েকটি জীবন এক আদর্শে এক ব্রতে এক অভীপ্সায় সম্মিলিত হলো; বড় আশ্চর্য ও মধুর সে সম্মেলন! আজ আশি বৎসর পরে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদগণের পারস্পরিক প্রীতি, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও সমাদরের কোনও কথা যদি শুনতে পাই, তা আমাদের হৃদয়ে এক অপার্থিব আনন্দরস অভিসিঞ্চিত করে। ঠাকুর-মা-স্বামীজী যেমন মহাপুরুষ মহারাজের কথোপকথনের প্রধান উপজীব্য দেখতে পাই, তেমনি তাঁর গুরুভ্রাতাদের প্রসঙ্গও তিনি অপার উৎসাহের সঙ্গে করতে ভালবাসতেন। বস্তুত তাঁর স্মৃতিপ্রসঙ্গে তিনি নিজে যেন অনেক পিছনে পড়ে আছেন, সামনে জেগে উঠেন ঠাকুর-মা-স্বামীজী এবং ঠাকুরের অন্যান্য সন্তানগণ। বর্তমান গ্রন্থে সংগ্রথিত রচনাগুলি তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

স্বামী শিবানন্দকে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছিলেন, তাঁদের অনেকেই আজ লোকান্তরিত। এখনো যাঁরা বেঁচে আছেন, তাঁদের অনেকের কাছ থেকে মহাপুরুষজীর ব্যক্তিগত স্মৃতিসংগ্রহের প্রচেষ্টার প্রথম ধাপ এ পুস্তকে রূপান্তরিত হলো। ভগবৎকৃপায় এ স্মৃতিসংকলনের আরো দু-খণ্ড অদূর ভবিষ্যতে পর পর প্রকাশ করার আশা আমরা পোষণ করি।

*　　　*　　　*

জীবন সায়াহ্নে মহাপুরুষজীকে 'বারাসত' সম্বন্ধে কখনো কখনো বলতে শোনা যেত "...ও-স্থান কি কম গা? (নিজের বুকে হাত দিয়ে) এ শরীরের জন্ম হয়েছে। ...বাবা ডাকসাইটে তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। ...কালে ও-স্থান খুব জেগে উঠবে" ইত্যাদি। তাঁর কথা সত্য হতে চলেছে। আজ ওখানে গড়ে উঠেছে একটি সুন্দর আশ্রম। শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের সেবাপূজাদি নিত্য হচ্ছে, বহু ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিও ওখানে এসে প্রাণ জুড়ায়। তাই শ্রীরামকৃষ্ণে অর্পিতজীবন বিদেহ মহাপুরুষজীর 'স্মৃতিসংগ্রহ' গ্রন্থটি তাঁরই প্রীতির অর্ঘ্যস্বরূপ বারাসত রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরণে অর্পিত হলো।

মহাপুরুষ মহারাজ আজ চিন্ময়সত্তায় বিরাজমান। প্রায় তেত্রিশ বৎসর পূর্বে তিনি মর্তলীলা সমাপ্ত করেছেন, কিন্তু তিনি এখনো শত শত প্রাণে বেঁচে আছেন স্মৃতিতে—স্নেহমমতারূপে, ত্যাগ-বৈরাগ্য-পবিত্রতারূপে, উদ্বেল ঈশ্বরপরায়ণতা-রূপে, সর্বগ্রাহী ক্ষমা-করুণা-মানবতারূপে এবং সর্বোপরি "স ঈশঃ অনির্বচনীয়ঃ প্রেমস্বরূপঃ"—এ মহাবাক্যের জীবিত ভাষ্যরূপে। অতীত জেগে উঠেছে বর্তমানের শুভ অরুণ-প্রভাতে ভবিষ্যতের ভূয়িষ্ঠ সম্ভাবনা নিয়ে এই স্মৃতিকথায়।

এ স্মৃতিসংকলনে অনেকেরই উদার সাহায্য ও অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছি। সকলকেই, বিশেষ করে যাঁরা 'স্মৃতিকথা' দিয়েছেন তাঁদের, আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এ গ্রন্থ-পাঠে একজনও যদি উপকৃত হন তো আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক মনে করব।

ইতি
বিনীত
সংকলক

শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রম
বারাণসী
৩০।১২।৬৭

প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

প্রারম্ভেই সংকলক স্বামী অপূর্বানন্দ মাহারাজকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। দ্বিতীয় সংস্করণের বিষয়বস্তু তিনি অনেক পরিশ্রম সহকারে কাট-ছাঁট করিয়া সার সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। তিন খণ্ড স্থলে বর্তমান এই দ্বিতীয় সংস্করণ দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ করার প্রস্তাব হইয়াছে। এই সম্পর্কে বেলুড় মঠের প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী শ্রদ্ধানন্দ মহারাজ বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া edit করিয়া দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের উপযোগী করিয়া দিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রথম সংস্করণের প্রথম খণ্ড অনেক পূর্বেই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু নানা অনিবার্য কারণে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে অনেক বিলম্ব হইয়া গেল। সেইজন্য আমরা ভক্ত পাঠকবৃন্দের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। অতঃপর দ্বিতীয় খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

বর্তমানে কাগজ, ছাপাই ও বাঁধাই খরচ প্রভৃতি যাবতীয় ব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় আমরা এই পুস্তকের মূল্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইলাম। আশা করি সহৃদয় পাঠকবর্গ বর্তমান অবস্থা উপলব্ধি করিবেন।

কিমধিকমিতি।

পৌষ, ১৩৮৬ সাল — প্রকাশক

দ্বিতীয় খণ্ডের নিবেদন

শ্রীভগবানের অপার করুণায় বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে শিবানন্দ-স্মৃতিসংগ্রহের—নব পরিকল্পিত দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলো।

এই মূল্যবান সংকলন-গ্রন্থখানি ১৩৭৪ সালে প্রথম প্রকাশ লগ্নে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল এবং পাঠকদের চাহিদায় অচিরেই তা নিঃশেষিত হয়ে যায়। অতঃপর ক্রমবর্ধমান মুদ্রণ ব্যয় ও সর্বসাধারণের ক্রয়-সামর্থ্যের কথা বিবেচনা করে তিন খণ্ড স্মৃতি-সংগ্রহকে দু-খণ্ডে প্রকাশের পরিকল্পনা হয়। তদনুসারে পৌষ, ১৩৮৬ 'স্মৃতি-সংগ্রহের' সংক্ষিপ্ত প্রথম খণ্ড ৩৩১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু বিদ্যুৎ-বিভ্রাট ও প্রেসের নানা গোলমালে প্রস্তাবিত দ্বিতীয় খণ্ড ইতঃপূর্বে প্রকাশ সম্ভব হয়নি। এই দীর্ঘ বিলম্বের জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। এইভাবে তিন খণ্ডে প্রকাশিত তেরোশত পৃষ্ঠায় একশত চৌদ্দটি স্মৃতিকথা বর্তমানে দুখণ্ডে সাতশত ঊনত্রিশ পৃষ্ঠায় সাতান্নটি স্মৃতিকথায় পরিণত হয়েছে।

এই দ্বিতীয় খণ্ডের বর্তমান সংস্করণে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের তিনজন প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজ, স্বামী ভূতেশানন্দ মহারাজ ও স্বামী শিবস্বরূপানন্দ মহারাজের প্রদত্ত তিনটি স্মৃতিকথা প্রকাশ করতে পেরে বিশেষ আনন্দিত ও তৃপ্ত।

বর্তমানে প্রকাশন ও মুদ্রণ ব্যয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমরা নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে গ্রন্থটির সামান্য মূল্যবৃদ্ধির জন্য আন্তরিক দুঃখিত।

"শিবানন্দ-স্মৃতিসংগ্রহ" প্রথম সংস্করণ যেভাবে পাঠকমণ্ডলী দ্বারা সমাদৃত হয়েছিল, আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণের গ্রন্থটিও ভক্তমণ্ডলী কর্তৃক অনুরূপভাবে সাদরে গৃহীত হবে।

পরিশেষে আমাদের বিশ্বাস এ গ্রন্থে বর্ণিত সংলাপগুলি পাঠ ও দিব্য জীবনের রসাস্বাদে সমর্থ হয়ে শ্রদ্ধালু পাঠক-পাঠিকা শ্রীরামকৃষ্ণভক্তিলাভে কৃতার্থ হবেন।

শ্রাবণ, ১৩৮৯ প্রকাশক

তৃতীয় খণ্ডের নিবেদন

অনেক বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপার করুণায় 'শিবানন্দ-স্মৃতিসংগ্রহ' গ্রন্থের তৃতীয় ও শেষ খণ্ড প্রকাশিত হলো। এ গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড মহাপুরুষজীর জন্মতিথির দিনই প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু বহুতর অলঙ্ঘনীয় কারণে এ খণ্ড মহাপুরুষজীর জন্মতিথি-পূজার দিন প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। প্রকাশে বিলম্ব হলেও স্মৃতিসংগ্রহ-সংকলনের কাজটি যে সমাপ্ত হলো তার মধ্যে যেন শ্রীভগবানের মঙ্গল ইচ্ছাই পূর্ণ হয়েছে, মনে হয়।

৫৩ জন প্রবীণ সন্ন্যাসী ও ভক্তের অমূল্য স্মৃতিচারণ এ খণ্ডকে অভাবনীয়রূপে সমৃদ্ধ করেছে। ছয় বৎসর পূর্বে যখন পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতিকথা-সংকলন-কার্যের সূচনা হয়, তখন গ্রন্থটি যে তিন খণ্ডে প্রায় ১৩০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হবে তা আমাদের প্রত্যাশার অতীত ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের ৭২ জন প্রবীণ সন্ন্যাসী এবং ৪২ জন ভক্তের স্মৃতি-অর্ঘ্য যেভাবে এ গ্রন্থরচনায় অর্পিত হয়েছে, তার মধ্যে আমরা অনেক ক্ষেত্রে দৈব ইচ্ছাকেই প্রত্যক্ষ অনুভব করেছি। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ ইচ্ছা সংকলনের প্রত্যেক স্তরে যেন আমাদের সমগ্র কাজটিকে সম্পূর্ণ করবার প্রেরণা জুগিয়েছে—সমস্ত বাধাবিপত্তি অতিক্রম করার সাহস দিয়েছে। যখন এ গ্রন্থপ্রকাশের উদ্যোগ আরম্ভ হয় তখন আমাদের মনে কত সংশয়, ভয় ও অনিশ্চয়তা ছিল তা সহজেই অনুমেয়। আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বর্তমান (১৩৭৪) অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজের আশীর্বাদ নিয়েই এ শুভকার্যে ব্রতী হয়েছিলাম।

গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড যেভাবে পাঠকমণ্ডলীর সমাদরলাভ করেছে তাতে পরম পূজ্যপাদ শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের সমুন্নত আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণানুরাগী মাত্রেরই গভীর আকর্ষণের পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের আশা তৃতীয় খণ্ডও ভক্তমণ্ডলী কর্তৃক অনুরূপভাবে সমাদৃত হবে। এ গ্রন্থের জন্য যাঁরা স্মৃতিকথা পাঠিয়েছেন, মহাপুরুষ মহারাজের পুণ্য জীবন অনুধ্যান করার সুযোগ দিয়ে তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর বহুল কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন, সন্দেহ নেই।

'স্মৃতিসংগ্রহের' ১১৪ জন লেখক-লেখিকার মধ্যে সকলেই মহাপুরুষ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য নন। তাঁদের মধ্যে ৩৭ জন শ্রীশ্রীমা এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ

প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ পার্ষদদের সন্তান এবং মূল গ্রন্থের প্রায় ১৩০০ পৃষ্ঠার মধ্যে ৫৪৯ পৃষ্ঠা তাঁদেরই অবদান। তবে স্মৃতিচারণ যাঁরা করেছেন তাঁরা সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের বিশিষ্ট প্রবীণ সন্ন্যাসী ও ভক্ত এবং সকলেই উচ্চাঙ্গের সাধক, শ্রীভগবানলাভই তাঁদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। এঁরা প্রত্যেকেই প্রাণের গভীর ভক্তি ও আন্তরিকতার দিব্যসৌরভে পরিপূর্ণ করে স্মৃতি-অর্ঘ্যটি দেবতার চরণে অর্পণের জন্য রচনা করেছেন, যার ফলে এ স্মৃতিগ্রন্থটি শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের অমূল্য আধ্যাত্মিক ইতিহাসের স্থান গ্রহণ করেছে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্যে গ্রন্থটির যে একটি বিশিষ্ট আবেদন এবং স্বতন্ত্র মর্যাদা থাকবে, তা আমরা আশা করতে পারি।

শাস্ত্রে সাধুসঙ্গের মহিমা সকল দেশে সর্ব কালে সুকীর্তিত। শ্রীমদ্ভাগবত বলেছেন, "ধৈর্যশীল, দয়ালু, সর্বজীবের সুহৃদ, শত্রুরহিত, শান্ত ও সর্বদাই সদাচার-ভূষণে ভূষিত—'সাধবো দীনবৎসলাঃ'।...'দেবা স্বার্থা ন সাধবঃ'—এমন কি স্বয়ং শ্রীভগবানের কৃপাও 'সাধুবাহনা' এবং 'সঙ্গদোষহরা হি তে।'..." সর্বতোভাবে সাধুসঙ্গের মহিমোজ্জ্বল এ স্মৃতিসংগ্রহ-গ্রন্থটি সাধনপথের সকল পথিকের পরম আদরের বস্তু হবে—এ আশা ও বিশ্বাস আমাদের আছে, কারণ মহাপুরুষের ক্ষণিক সঙ্গলাভও সাধকের জীবনে কতটা পরিবর্তন এনে দেয় এবং সাধককে কত বড় আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারী করে জীবনপাথেয় সঞ্চয়ের সহায়ক হয়—তা-ই বিন্যস্ত রয়েছে প্রত্যেকটি স্মৃতিকথায়। মহাজীবনের সাধনদীপ্ত অথচ স্নিগ্ধমধুর মুহূর্তগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়ে এ যুগের অধ্যাত্মরসপিপাসুরা পরিতৃপ্ত হবেন; মহাপুরুষজী যাঁদের কাছে অতীত দিনের বিরাট একটি নামমাত্র, তাঁরাও সে যুগের ভক্তগণের স্মৃতিচারণের মধ্যে তাঁর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়ে ধন্য হবেন। স্মৃতিসংগ্রহের একটি তাৎপর্য এই নবীন সাধকদের মহাপুরুষজীর উজ্জ্বল জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত করে তোলার মধ্যে নিহিত এবং পরবর্তীরা যাঁরা মহাপুরুষজীকে দেখেননি তাঁরাও এই স্মৃতিকথার মাধ্যমে তাঁকে জীবন্তরূপে পেয়ে ধন্য হবেন।

স্মৃতিকথা একজাতীয় জীবনচরিতও বটে। বিচিত্রঘটনা-সংবলিত, বহুজনের গ্রথিত এ সুদীর্ঘ স্মৃতিমাল্যটি দেবতার কণ্ঠে ভূষিত হবার জন্যই যে রচিত হয়েছে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। 'সূত্রে মণিগণা ইব' এ স্মৃতিমাল্যে শ্রীঠাকুর, শ্রীমা, স্বামীজী ও ঠাকুরের অন্যান্য সন্ন্যাসী পার্ষদ এবং বিভিন্ন দেবদেবীর সঙ্গে মহাপুরুষজীর জীবনকুসুমটিও যথাস্থানে গ্রথিত আছে। এ স্মৃতিকথার মাধ্যমে আমরা মহাপুরুষজীর যতটা পরিচয় পাই তার চাইতে আরো বেশি নিবিড়ভাবে পাই

মহাপুরুষজীর অন্তরদেবতার সৌরভময় পরিচয়। যদিও ৩৬ বৎসর অতীত হয়েছে, কিন্তু মহাপুরুষজী পুণ্যস্মৃতিরূপে তাঁর সান্নিধ্য-ধন্য প্রত্যেকের হৃদয়েই চিরজাগ্রত ও জীবন্তরূপে রয়েছেন।

১৯২২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এ বারো বৎসর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ইতিহাসে একটি স্বর্ণযুগ—মহাপুরুষ মহারাজ সঙ্ঘের নায়ক, তাঁর ভিতর দিয়ে ঠাকুরের যোগমায়ার আকর্ষণ দিকে দিকে নানাভাবে প্রসারিত হয়েছে। অথচ তিনি নিজেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের হাতের নেহাত অযোগ্য যন্ত্র বলে জানতেন। এ আত্ম-বিলুপ্তি তাঁর মহৎ আধ্যাত্মিক চরিত্রের অন্যতম দীপ্তি আর শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘে তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান। শ্রীরামকৃষ্ণতন্ময়তা মহাপুরুষজীর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি।

শিবানন্দ-স্মৃতিসংগ্রহের বর্ণনা ও সংলাপগুলির মধ্য দিয়ে পাঠক-পাঠিকাদের মানসদৃষ্টিতে সহজেই পূর্বোক্ত স্বর্ণযুগের একটা ভাবালেখ্য রূপায়িত হবে। বেলুড় মঠে স্বামীজী ঠাকুরকে বসিয়ে দিয়ে গেছেন এবং ঠাকুরও স্বামীজীকে দেওয়া তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সকলের জন্য সেখানে বসে রয়েছেন সানন্দে; তাঁর জীবন্ত বিগ্রহ হতে বিচ্ছুরিত হচ্ছে দৈবীকরুণা এবং বিবেক-বৈরাগ্য-জ্ঞান-ভক্তির ঘনীভূত প্রেরণা। ...মহাপুরুষজী আছেন ঐ নবযুগের পুণ্যপীঠে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবক ও ভৃত্যরূপে। তাঁর চোখে-মুখে সর্বসংশয়াতীত জ্ঞান, প্রেম ও আনন্দের দীপ্তি, কথায় সর্বদুর্বলতা-বিদারী অভয় ও উৎসাহ, স্পর্শে মোহদুঃখ-সন্তাপহর অপার্থিব শান্তি। তিনি সকলকে বলছেন—"যা, যা, ঠাকুরের কাছে যা—নিজেকে তাঁর পায়ে সঁপে দে।"...

আমাদের একান্ত আশা ও বিশ্বাস যে, 'শিবানন্দ-স্মৃতিসংগ্রহ' গ্রন্থ পাঠ করে শ্রীরামকৃষ্ণে ভক্তি বর্ধিত হবে।

এ গ্রন্থ-সংকলনে আমরা বহু ব্যক্তির কাছ থেকে নানাভাবে সাহায্য পেয়েছি। সকলকে হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি এবং শ্রীভগবানের চরণে প্রার্থনা—তিনি যেন তাঁদের এ সুমহৎ কাজের সুফল প্রদান করেন।

আমাদের হাতে এখনো কিছু অপ্রকাশিত উপাদান রয়েছে। সম্ভব হলে ভবিষ্যতে তা পরিশিষ্টরূপে প্রকাশিত হবে। ইতি

শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম
বারাণসী-১
১৯ এপ্রিল, ১৯৭০

বিনীত
স্বামী অপূর্বানন্দ
সংকলক

সূচীপত্র

দ্বিতীয় পর্ব

প্রাক্-কথন

তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষগণের বাণী ও স্মৃতি ত্রিতাপক্লিষ্ট মানবের জীবন-পথের অমূল্য সম্পদ। দিগ্‌ভ্রান্ত পথিক সেই সকল মহাত্মাগণের জীবন-দীপালোকে এই সংসারারণ্যে প্রকৃত পথের সন্ধান পাইয়া ধন্য হয়। কিন্তু এরূপ আত্মদর্শী পুরুষের পদতলে বসিবার সৌভাগ্য সচরাচর কয়জনেরই বা হয়? অশেষ পুণ্যবলে যাঁহারা সেই সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহারা যদি নিজ নিজ স্মৃতির ভাণ্ডার হইতে কিছু কিছু অংশ বিতরণ করেন, তবে বহুজনের কল্যাণ সাধিত হয়। বর্তমান "শিবানন্দ-স্মৃতিসংগ্রহ" গ্রন্থ এই রকম একটি কল্যাণকর প্রয়াস।

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের বিশিষ্ট পার্ষদ শ্রীমহাপুরুষ শিবানন্দজী মহারাজ ভারতের অধ্যাত্মগগনে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কগণের অন্যতম। অবতার-সহচরদের জীবনের আলোচনায় বা স্মৃতির অনুধ্যানে শ্রীভগবানেরই লীলা আস্বাদন হয়। কারণ তাঁহাদের জীবনারাধ্য শ্রীভগবান ব্যতীত অন্য কোন পৃথক সত্তা তাঁহাদের জীবনে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজেরও জীবনসর্বস্ব ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁহার প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবেরই দিব্যমহিমা প্রকাশ পাইয়াছে। এই গ্রন্থে সংকলিত স্মৃতি-প্রবন্ধগুলি তাই প্রকারান্তরে পাঠক-পাঠিকাকে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবেই আপ্লুত করিবে, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

মহাপুরুষ-সান্নিধ্যের পবিত্র সঞ্চয় হইতে যাঁহারা এই পুস্তকের জন্য স্মৃতিপ্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা ভক্ত-সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এই সংকলনগ্রন্থখানি প্রকাশ করিতে বারাণসী অদ্বৈতাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী অপূর্বানন্দ সানন্দে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়াছে। তাহার এই শ্রম-স্বীকার সার্থক হইয়াছে। কারণ আমাদের বিশ্বাস এই গ্রন্থখানি সংসারতাপক্লিষ্ট মনুষ্যমাত্রেরই হৃদয়ে অসীম শান্তি, আশা ও উদ্দীপনা জাগাইয়া তুলিবে।

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ
রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ

বেলুড় মঠ
মহাপুরুষ মহারাজের আবির্ভাব-তিথি
একাদশী, ১১ পৌষ, ১৩৭৪

ভূমিকা

আচার্য শঙ্কর বলেছেন, এ জগতে তিনটি বস্তু সুদুর্লভ। এক—মনুষ্য জীবন। দুই—মুক্তির ইচ্ছা বা মুমুক্ষুত্ব। তিন—মহাপুরুষের সান্নিধ্য। ভক্তিশাস্ত্রেও বলা হয়েছে মহাপুরুষ-সান্নিধ্যের ফল 'অমোঘ'। আবার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—কেউ দুধের কথা শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ বা দুধ খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে। ভগবান যেন দুধ। সেই দুধ খেয়ে যিনি পুষ্ট হয়েছেন, তিনিই সত্যিকারের মহাপুরুষ। শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন ও বাণীর শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার স্বামী বিবেকানন্দের মতে, যাঁর হৃদয় পরের দুঃখে কাঁদে তিনিই যথার্থ মহাত্মা, প্রকৃত মহাপুরুষ। এই সব অর্থেই অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম অন্তরঙ্গ পার্ষদ এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দ্বিতীয় সঙ্ঘাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ শিবকল্প 'মহাপুরুষই' ছিলেন। সাধু ও ভক্ত মহলে 'মহাপুরুষ মহারাজ' নামেই তিনি যেন সমধিক প্রসিদ্ধ। স্বামীজী স্বয়ং তাঁকে এই নামে ভূষিত করেন কিনা! তাছাড়া, অধ্যাত্মজীবনের চরম সিদ্ধি যে সমাধি, সেই সমাধিলাভের দুর্বার ইচ্ছা ও প্রেরণা থেকেই তাঁর ধর্মজীবনের শুরু ও শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যলাভ ঘটেছিল। সেই দিক থেকে বিচার করলেও তিনি অসাধারণ মহাপুরুষ।

১৯২২-এর ১০ এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র ও সঙ্ঘের প্রথম অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মানবলীলা সংবরণ করার পর সঙ্ঘ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হয় স্বামী শিবানন্দের উপর। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি, তাঁর মহাপ্রয়াণের দিন পর্যন্ত, তিনি ঐ পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। কত অগণিত সাধু ও ভক্ত এই সময়ে যে তাঁর অপার কৃপা ও করুণা লাভ করে তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের আপন আপন ধর্মজীবন গড়ে তুলে কৃতার্থ হয়েছে, তা বলে শেষ করা যায় না। আমার একান্ত সৌভাগ্য যে তিনি উটাকামণ্ডে আমাকে মন্ত্রদীক্ষা দেন ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে। পরে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে আমার ব্রহ্মচর্য এবং তার চার বৎসর পর ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে সন্ন্যাস লাভ, সবই তাঁর অপার কৃপায় বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত হয়। তাই আমার অধ্যাত্ম জীবনে যা কিছু প্রাপ্তি সবই মহাপুরুষ মহারাজের স্নেহচ্ছায়ায়।

বেলুড় মঠ-জীবনের প্রথম পর্বে তিনি ছিলেন অতিশয় গম্ভীর প্রকৃতির ধ্যানপরায়ণ সন্ন্যাসী। যেমন বৈরাগ্যবান, তেমনি সংযতবাক; আবার রসনা-সংযমও ছিল তেমনি। দিনরাত সাধনভজনে বুঁদ হয়ে থাকতেই ভালবাসতেন। কিন্তু স্বামী ব্রহ্মানন্দের শরীর যাওয়ার পর থেকেই তাঁর মধ্যে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি 'মা' বলতেন। তিনি নিজেও যেন পুরুষ শরীরে

সকলের মা হয়ে উঠলেন। শেষের দিকে নিজেই নিজের উদ্দেশ্যে বলতেন—'আমি যেন মা গঙ্গা হয়ে গেছি!' সাধু-ভক্তরা তো বটেই, গরিব-দুঃখী, আর্ত, পীড়িত, অধঃপতিত ও সমাজের সম্ভ্রান্ত মানুষ সকলের জন্যই তিনি তাঁর কৃপার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। দেশের যে-প্রান্তে যখনই গিয়েছেন তখনই ধর্ম সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলেই প্রেরণালাভের আশায় তাঁর কাছে ছুটে এসেছেন; তিনি কাউকেই বিমুখ করতেন না। এই সময় তাঁর সরল, ক্ষমাশীল, অদোষদর্শী, সদাশিব মূর্তিখানি যে একবার দেখেছে, সেই তাঁর অপার্থিব প্রেমের বন্ধনে বাঁধা পড়েছে।

এই প্রেমের উৎস ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি অপরিসীম ভালবাসা, স্বামীজীর প্রতি অবিচল আনুগত্য ও শ্রীশ্রীমার প্রতি অচলা ভক্তি। এই তিনজনই ছিলেন তাঁর দৃষ্টিতে এক। সঙ্গে সঙ্গে গুরুভাইদের প্রতি ছিল তাঁর প্রাণের টান ও গভীর শ্রদ্ধা। তিনি ছিলেন রামকৃষ্ণময়, তাই সম্পূর্ণ অভিমানশূন্য। সকলের প্রতিই ছিল তাঁর সেবার মনোভাব ও সমদৃষ্টি। এমনকি মঠের গরু-বাছুরগুলির প্রতিও। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ, সবই ঠাকুরের কাজ—এই ছিল তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি। সঙ্ঘাধ্যক্ষ হিসাবে শ্রীঠাকুরের সেবা-পূজার দিকে ছিল তাঁর সতর্ক দৃষ্টি। অথচ তাঁর মধ্যে এতটুকু গুরুভাব ছিল না। তিনি বলতেন—'আমি তো গুরু নই, গুরু ঠাকুর। তিনিই জগদ্‌গুরু। যে আমার কাছে আসে, আমি ঠাকুরের পায়ের তলায় তাকে ফেলে দিই। তাছাড়া আর কিছু জানিনে বাবা।' বলতেন—'রামকৃষ্ণ' এ যুগের ডঙ্কামারা নাম। যে-কেউ এই নাম নেবে, সে উদ্ধার হয়ে যাবে। যারাই তাঁর পূত সান্নিধ্যে এসেছে, তাদেরই ভিতর তিনি এই জ্বলন্ত ভক্তি-বিশ্বাস জাগিয়ে ঠাকুরকে তাদের প্রাণের বস্তু করে দিয়েছেন।

স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষজী সম্পর্কে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের শতাধিক প্রবীণ সাধু ও ভক্তের স্মৃতিমূলক রচনার স্বর্ণপেটিকা এই 'শিবানন্দ স্মৃতিসংগ্রহ'। স্বামী অপূর্বানন্দজী সংকলিত এই অমূল্য গ্রন্থখানি রামকৃষ্ণ শিবানন্দ আশ্রম, বারাসাত থেকে তিনখণ্ডে প্রথম প্রকাশিত হয়। বর্তমানে এই গ্রন্থের অখণ্ড 'উদ্বোধন' সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে। এই গ্রন্থপাঠে একদিকে যেমন এই প্রজন্মের পাঠক জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম-যোগ সমন্বিত স্বামী শিবানন্দজীর অলোকসামান্য পূর্ণাঙ্গ দিব্য চরিত্র তথা ধর্মের ব্যবহারিক রূপ সম্পর্কে কিছুটা পরিচিত হতে পারবেন, তেমনি অন্যদিকে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, জগজ্জননী মা সারদা ও যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিও তাঁদের অনুরাগ শতগুণে বর্ধিত হবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বেলুড় মঠ
১৭ পৌষ, ১৪১১
1 January, 2005

রঙ্গনাথানন্দ
স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

প্রথম পর্ব
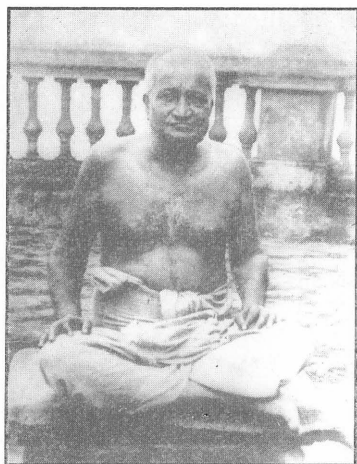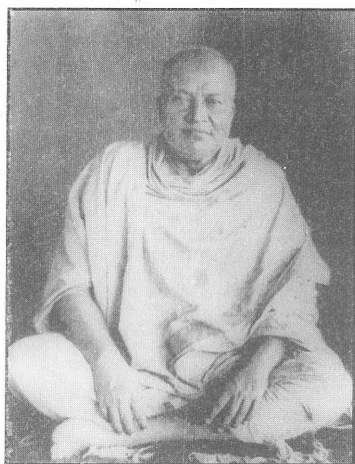
স্বামী শিবানন্দ

বেলুড় মঠ

বেলুড় মঠ, ১৯২১-২২
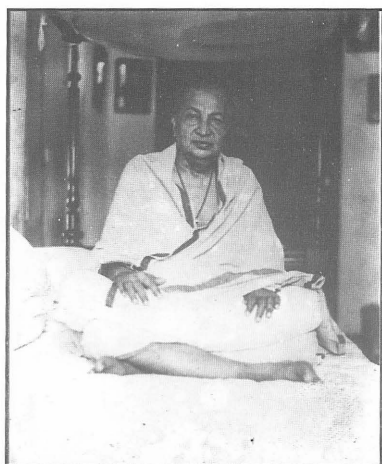
উতকামণ্ড, ১৯২৬ ইং

মাদ্রাজ, ১৯২৬
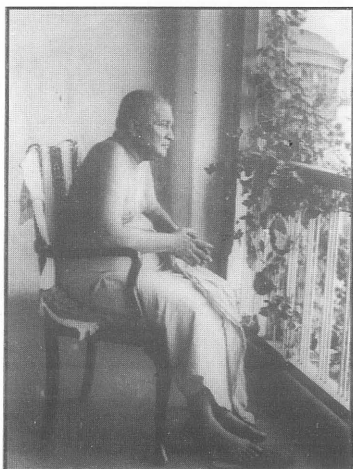
বেলুড় মঠ, ১৯২৬-২৭ ইং
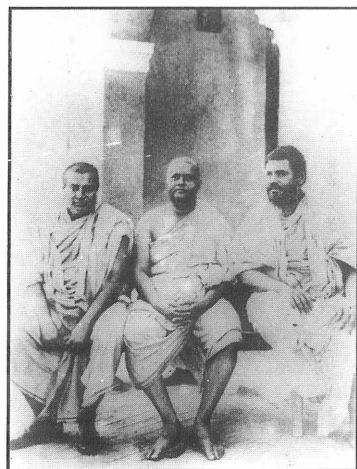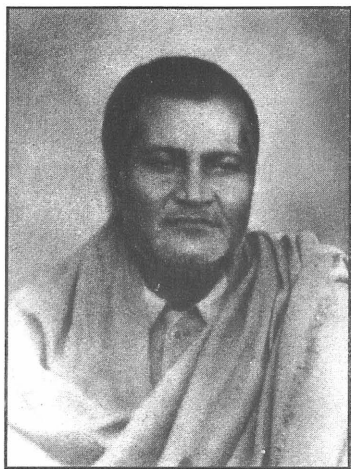
বাঁদিক থেকে ঃ স্বামী শিবানন্দ,
স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ
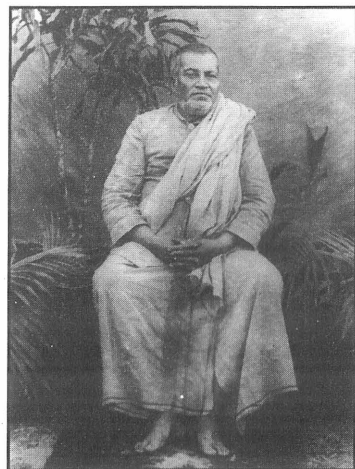
বেলুড় মঠ, ১৯২৫-২৬ ইং
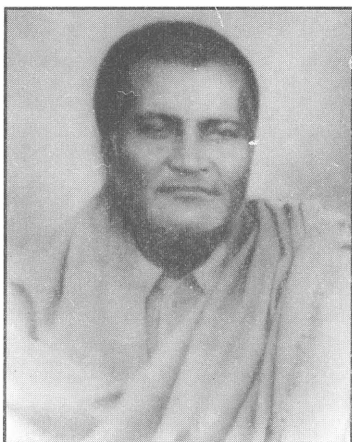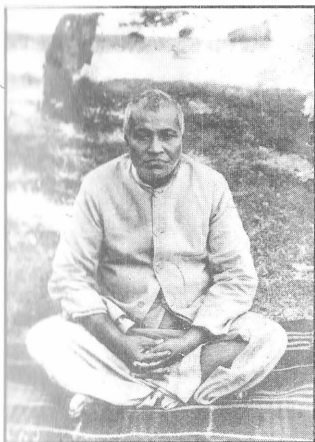
বেলুড় মঠ ইং ১৯১১-১২

বেলুড় মঠ

ভবানীপুর (কলকাতা)
ইং ১৯২৫
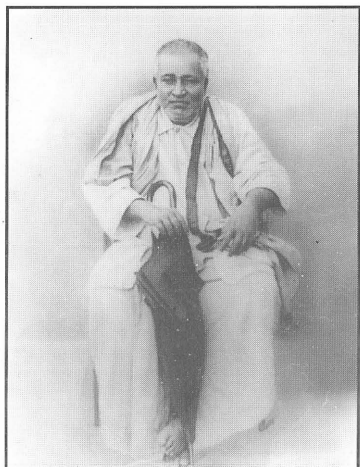
ভবানীপুর (কলকাতা)
ইং ১৯২৩-২৪

বেলুড় মঠ, (জন্মতিথি)
১৯২৫-২৬ ইং

বেলুড় মঠ, ইং ১৯২৮

আলমোড়া ইং ১৯১৩
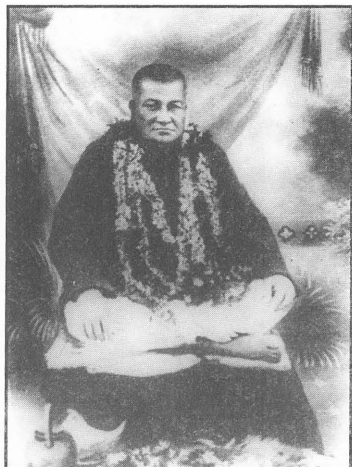
বোম্বাই ইং ১৯২৭

বেলুড় মঠ ইং ১৯২৪-২৫
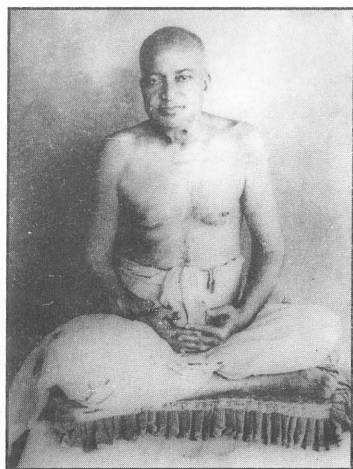
বেলুড় মঠ ইং ১৯২৮-২৯
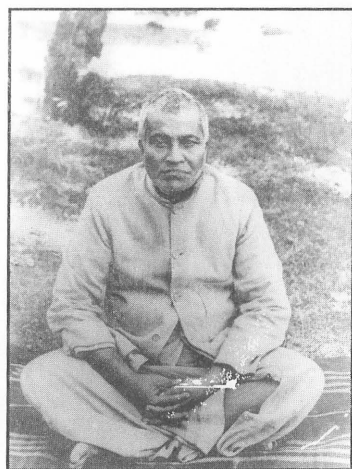
বেলুড় মঠ ইং ১৯২৫-২৬
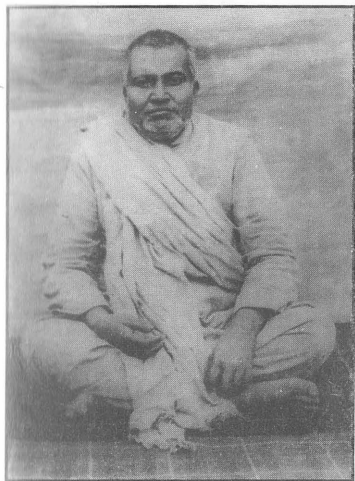
অজ্ঞাত

বেলুড় মঠ ইং ১৯০৯-১০
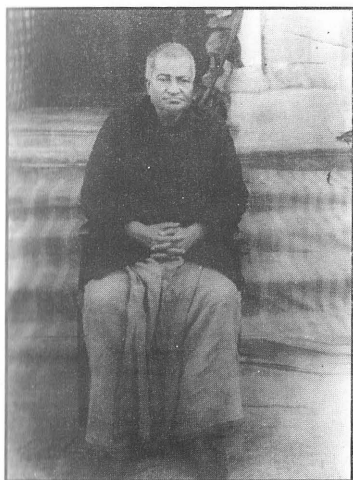
পাটনা ইং ১৯২৮

অজ্ঞাত
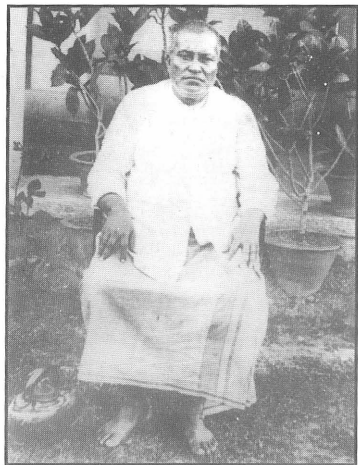
বেলুড় মঠ ইং ১৯২৫-২৬
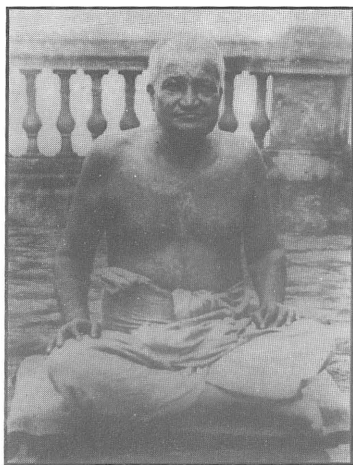
বেলুড় মঠ
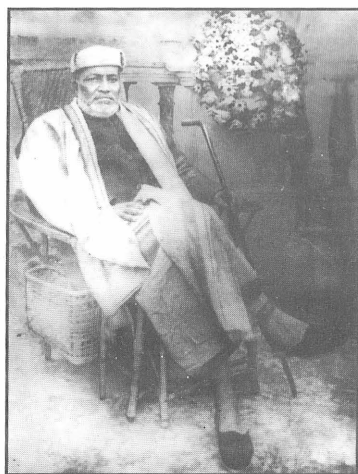
বেলুড় মঠ (জন্মতিথি)
ইং ১৯২৪-২৫

কলকাতা ইং ১৯২৭
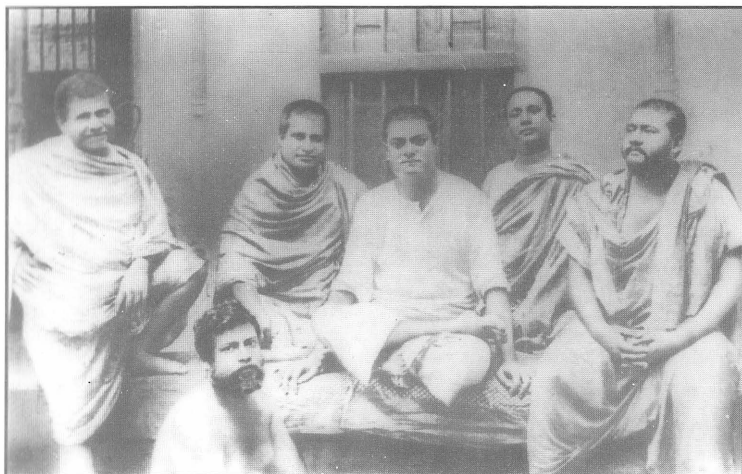
১৮৯৭ সালে বোসপাড়া লেনের বাড়িতে
বাঁ দিক থেকে ঃ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, শিবানন্দ, বিবেকানন্দ,
তুরীয়ানন্দ, ব্রহ্মানন্দ মেঝেতে বসে ঃ স্বামী সদানন্দ
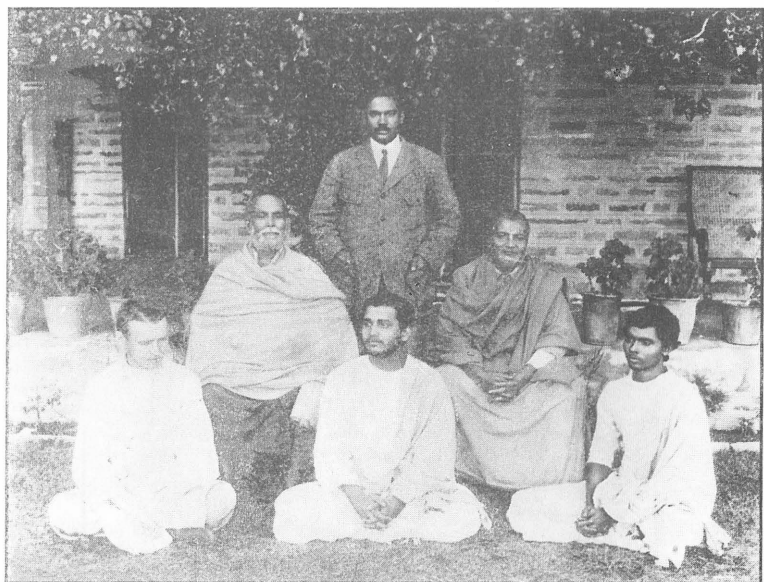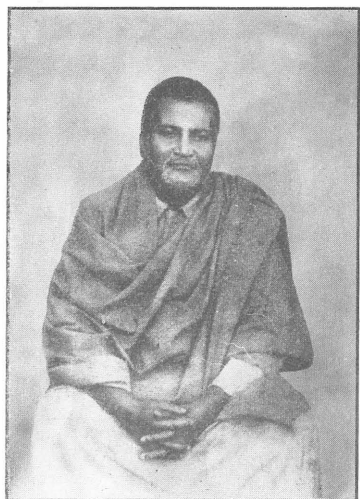
দাঁড়িয়ে বাঁদিক থেকে ঃ স্বামী শিবানন্দ, রামকৃষ(ানন্দ, বিবেকানন্দ, পাচক, দেবেন মজুমদার, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম), ত্রিগুণাতীতানন্দ, মুস্তাফি (দেবেন মজুমদারের মামা) বসে বাঁদিক থেকে ঃ স্বামী নিরঞ্জনানন্দ, সারদানন্দ, হুটকো গোপাল, অভেদানন্দ
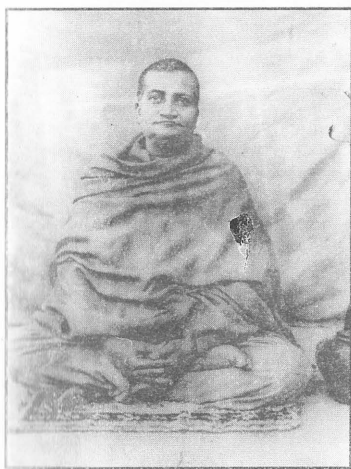
৺কাশীধাম ইং ১৯১০
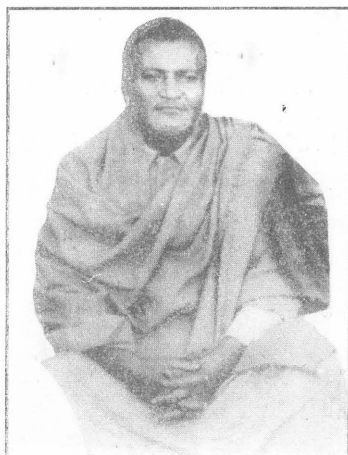
বেলুড় মঠ ইং ১৯১১-১২

জীবন সায়াহ্নে
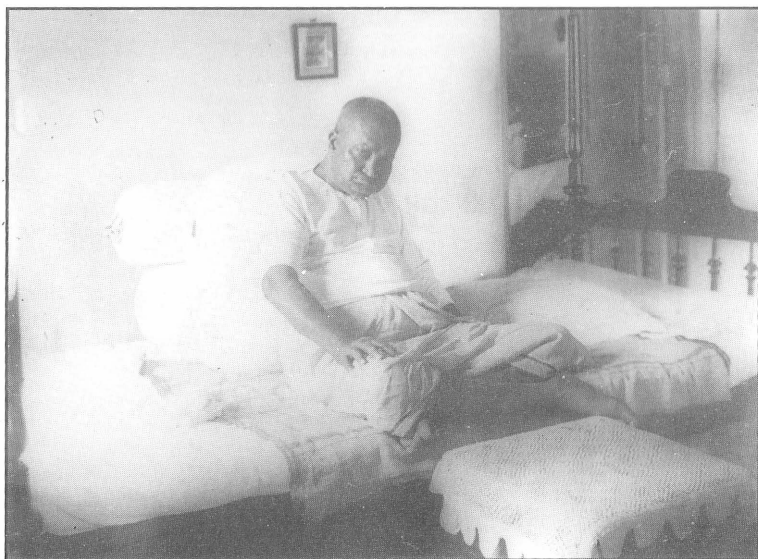
মহাপুরুষজীর স্মৃতি*

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

১৯০৭ সালে জুলাই মাসে আমি, খগেন মহারাজ ও গিরিজা যখন জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমার নিকট গেরুয়া নিয়ে হেঁটে কাশীতে এলাম তখন কাশী অদ্বৈত আশ্রমে পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ, চন্দ্র মহারাজ, পর্বত এবং আর একজন ব্রহ্মচারী ছিলেন। চন্দ্র মহারাজের বর্তমান ঘরটি তখন রান্নাঘর ছিল। এখন যেটি দুর্গাভাণ্ডার, সেই পিছনের হলঘরে তখন মহাপুরুষ মহারাজ থাকতেন। আর আমরা তারই পাশের ঘরে যেখানে পরে লাইব্রেরি হয়েছিল সেখানে ছিলাম। বর্তমান ঠাকুর-ভাঁড়ার ঘরে তখন ঠাকুরের পূজা হতো। মহাপুরুষ মহারাজ তখন শ্রীশ্রীঠাকুর-পূজা করতেন। চন্দ্র মহারাজ হাটবাজার সব করতেন। তিনিই আশ্রমের ম্যানেজার। মহাপুরুষ মহারাজের পূজার বিধি-টিধি তেমন কিছুই ছিল না। কেবল ধ্যান, প্রার্থনা ও অর্চনাদি। পূজার সময় দেখলে তাঁকে রামকৃষ্ণময় মনে হতো। কিন্তু শশী মহারাজের মতো পূজার খুঁটিনাটির দিকে তাঁর অত নজর ছিল না। তাই তো আশ্রমের নাম দিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম। তাঁর ঠাকুরই দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত সব। ওখানে প্রায় ছ-সাত বৎসর একনাগাড়ে ছিলেন। আশ্রমের বাইরে বড় একটা বেরুতেন না—বেড়ানোও আশ্রমের ভিতরেই। এত রাশভারী পুরুষ ছিলেন যে, দূর থেকে সম্ভ্রম হতো। কাছে যেতে সাহস হতো না। গৌরবর্ণ টকটকে রং, সুন্দর দোহারা চেহারা। আবার তেমনি দীর্ঘবপু।

দশ টাকা ভাড়ায় অত বড় খাজাঞ্চীর বাড়ি বাগিচাসহ নিয়েছিলেন—খুব বড় গেট। গেট কিন্তু সব সময় চোরের ভয়ে বন্ধ থাকত। তখন উঠান ছিল এক গলা নিচুতে। দু-তিনটি ঘর খোলা ছিল। বাকি সব ঘর রামলীলার জিনিসে ভরতি ও বন্ধ। একটা ভাব নিয়ে তিনি ওখানে পড়েছিলেন। সাধন-ভজনে ডুবে থাকতেন। আশ্রমে আমরা একমাস প্রসাদ পেয়েছিলাম। আহার খুব সাধারণ। এক মাসের পরে ছত্রে মাধুকরী করতাম। তিনিই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তখন থেকেই দেখেছি গরিব-দুঃখীর উপর তাঁর খুব টান ছিল, পাড়ার ছোট ছোট ছেলেদের জন্য তিনি একটি অবৈতনিক পাঠশালা খুলেছিলেন। তা অবশ্য টাকাকড়ির অভাবে বেশিদিন

---

* স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ বিভিন্ন সময়ে মহাপুরুষজীর স্মৃতি-প্রসঙ্গ করতেন; তা-ই সংগ্রহ করে এ প্রবন্ধে দেওয়া হলো।—সংকলক

চলেনি। ঠাকুর-স্বামীজীর ভাবপ্রচারের দিকেও তাঁর খুব উৎসাহ ছিল; স্বামীজীর শিকাগো বক্তৃতা হিন্দিতে অনুবাদ করিয়ে ছাপিয়েছিলেন, পরে স্বামি-শিষ্য-সংবাদও।

১৯০৮ সালে রাজা মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দজী) সেবাশ্রমের ভিত্তিস্থাপন করতে কাশীতে এলেন। তার পূর্বে সেবাশ্রম রামাপুরায় ভাড়াবাড়িতে দোতলায় ছিল। এখানেই ওঁকে প্রথম দেখলাম। রাজা মহারাজ অদ্বৈতাশ্রমেই মণ্ডপের পাশের ঘরে থাকতেন। অধিকাংশ সময়ই ধ্যানমগ্ন। মহাপুরুষজী আমায় গোড়া থেকেই খুব স্নেহ করতেন। অদ্বৈতাশ্রমে তখন তো খুব অভাব-অনটন—স্থায়ী আয় কিছুই ছিল না, তবু আমায় মাঝে মাঝে বলতেন—"জিতেন, ভিক্ষা করে খেয়ে তোমার শরীরটা খুব খারাপ হয়েছে দেখছি। তুমি কদিন বরং আশ্রমেই খেয়ো।" বিশেষ ভোগরাগ হলেও প্রসাদ রেখে দিতেন, এভাবে আমায় খুব যত্ন করতেন। সকলে ধ্যানজপ করছে কিনা সেদিকেও তাঁর খুব নজর ছিল। তখন আমাদের মনেও তীব্র বৈরাগ্য। তিনিও খুব ভজন-সাধন করতেন। রাত তিনটায় উঠে ধ্যানে বসতেন। আমরাও তাঁর দেখাদেখি তাই করতুম। মহাপুরুষজীর সময়ে অদ্বৈত আশ্রমে খুব একটা শান্ত পরিবেশ ছিল। কেউ চেঁচিয়ে কথা বলতে পারত না। তিনি নিজেও জোরে কথা বলতেন না। আর সব সময়েই যেন ধ্যানে ডুবে থাকতেন। কথাবার্তা খুবই কম বলতেন, তখন অবশ্য লোকজনও খুব কমই আসত।...

রাজা মহারাজ ঐবার আমায় মাদ্রাজে শশী মহারাজের কাছে পাঠালেন। তারপরে মাদ্রাজ, ব্যাঙ্গালোর ও মায়াবতীতে অনেক বৎসর কাটাতে হয়, তাই মহাপুরুষজীর সঙ্গে ঘন ঘন দেখা হতো না। একবার মায়াবতী থেকে বেলুড় মঠে এসেছি, তখন রাজা মহারাজজীও মঠে। আমি মহারাজের কাছেই বেশির ভাগ থাকতাম। তিনি বেড়াতে বেরুলে সঙ্গে সঙ্গে যেতাম, ছোটখাট সেবাও করতাম—এভাবে যতটা পারতাম মহারাজের কাছে কাছেই থাকতাম। মহাপুরুষ মহারাজের কাছে বড় একটা যেতাম না। কিন্তু আমি তাঁর কাছে যাই না বলে তাঁর মনে দুঃখ হয়েছিল। তাই একদিন প্রণাম করে দাঁড়াতেই তিনি একটু অভিমানের সুরে বললেন—"জিতেনকে তো আজকাল দেখতেই পাইনে!" আমি তখন বললুম—"মহারাজের একটু আধটু সেবা করার সুযোগ হয়েছে। এ সুযোগটি ছাড়তে ইচ্ছা হয় না। আমরা তো বেশির ভাগ বাইরের কেন্দ্রেই থাকি, মহারাজের সঙ্গ করার সুযোগ তো হয় না!" তখন তিনি খুব খুশি হয়ে বললেন, "বেশ, বেশ! মহারাজের সেবা করছ, খুব ভাল। মহারাজের সেবা করা তো মহাভাগ্যের কথা। মহারাজ আর ঠাকুর কি আলাদা? খুব তাঁর সেবা করে নাও।" এই বলতে বলতে উঠে

নিজেই বাইরে এসে 'মিটসেফ' খুলে আমার হাতে অনেক সন্দেশ দিয়ে সস্নেহে বললেন, "খাও, খাও। তোমরা তো মায়াবতীতে সন্দেশ খেতে পাও না!" তারপরে নিজেই জল গড়িয়ে খেতে দিলেন। তাঁর এত স্নেহ দেখে সন্দেশ খেতে খেতে আমার চোখে জল এল।...

* * *

মহারাজের দেহত্যাগের পর মহাপুরুষজী যখন প্রেসিডেন্ট হলেন তখন দিনে দিনে তিনি যেন ঠাকুরময় হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর কত দয়া, কত কৃপা, কত স্নেহ-ভালবাসা! তিনি বলতেন—"ঠাকুরই তাঁর ভিতর বসে সকলকে কৃপা করছেন।" ঐ সময় তাঁর মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ শক্তির বিকাশও হয়েছিল। ১৯২৪ সালে যখন তিনি মাদ্রাজ যান তখন নীলগিরি পাহাড়ে ও ব্যাঙ্গালোরে তাঁর সঙ্গে কয়েক মাস ছিলাম এবং তাঁর Private Secretary (একান্ত সচিব) ছিলাম বলে দিনে রাত্রে সব সময়ই তাঁর কাছে থাকতে হতো। তখন তাঁর ভালবাসা যে কত গভীর তা অনুভব করেছি! লোকজনের সামনে এত প্রশংসা করতেন যে, আমার তাতে লজ্জা হতো। রোজ শরীর কেমন আছে খোঁজ নিতেন। আমার যাতে কোন কষ্ট না হয় সেবকদের বলে তার ব্যবস্থা করতেন।

তখন দেখেছি তাঁর কি আকর্ষণ! তিনি তো কুনুরে পাহাড়ের একটি নির্জন বাংলোতে আমাদের নিয়ে ছিলেন স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য, কিন্তু তাঁকে কেন্দ্র করে সারা দক্ষিণ ভারতের কত রাজা, রানী, পদস্থ লোক, রাজকর্মচারী ওখানে আসতে লাগলেন! সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! কত লোক দীক্ষাপ্রার্থী হয়ে আসতো! তিনি কাউকেও ফিরাতেন না। তখন তাঁর ভিতর এমন এক শক্তির বিকাশ হয়েছিল, যে একবার তাঁকে দেখত বা তাঁর সঙ্গে দুটো কথা বলত সে-ই মুগ্ধ হয়ে যেত। আর দেখেছি তাঁর অন্তর্দৃষ্টি কত গভীর! তিনি সকলের মন দেখতে পেতেন।

মহাপুরুষজীর নাম শুনে কুনুরে একজন মুসলমান ডাক্তার সস্ত্রীক এসেছিলেন ছেলেমেয়েদের নিয়ে। ডাক্তারের স্ত্রী শ্রীকৃষ্ণরূপী ঠাকুরের ভক্ত। ঠাকুরকে গোপালভাবে দেখতেন। মহাপুরুষ মহারাজ সব শুনে ঐ মহিলার মাথায় হাত দিয়ে এমন আশীর্বাদ করলেন যে, তাঁর ভাব হয়ে গিয়েছিল, কান্না আর থামে না। অনেকক্ষণ পরে শান্ত হলেন। মহাপুরুষ মহারাজ তাঁদের মিষ্টান্নাদি খেতে দিলেন।

কুনুরে থাকতেও তিনি অনেক লোককে দীক্ষা দিয়েছিলেন। উটীতে গিয়েও ভক্তদের ঠাকুরের ভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলেন—দীক্ষাও দিয়েছিলেন।...

ব্যাঙ্গালোরে দেখেছি গরিব-দুঃখীদের জন্য তাঁর কত দরদ! আশ্রমের নিচেই

একটু দূরে 'হরিজন'দের গ্রাম ছিল। ঐ অচ্ছুতদের ছোট ছোট ন্যাংটো ছেলেপিলেরা রোজ মহাপুরুষজীর কাছে ভিড় করত। তিনি তাদের পয়সা দিতেন, বিস্কুট-লজেন্স দিতেন, তাতে তাদের কি আনন্দ! অথচ ওদের ভাষা বোঝেন না—ওরা কানাড়ী ভাষায় কথা বলে, তিনি আকারে ইঙ্গিতে তাদের সুখ-দুঃখের খবর নিতেন এবং তার প্রতিকার করতেন। যদিও ব্যাঙ্গালোর পাহাড়ি জায়গা, শীতপ্রধান স্থান—অথচ ঐ অচ্ছুতরা এত গরিব যে, ছেলেপিলেরা সব ন্যাংটোই থাকে। তিনি তাদের দুর্দশা দেখে কিছু নূতন কাপড় কিনে দিলেন। কুনুরেও দেখেছি তিনি বাগানের মালির ছেলেমেয়েদের পয়সাকড়ি দিতেন, খোঁজখবর নিতেন।

ঐ সময়ে ব্যাঙ্গালোরে একজন দক্ষিণদেশীয় ভক্তের দীক্ষা হলো। ভক্তটি গুরুদক্ষিণা হিসাবে হাজার একটাকা প্রণামী দিয়েছিলেন। তখনকার দিনে এত টাকা প্রণামী দিয়ে দীক্ষা নেওয়া বড় একটা দেখা যেত না। আর দামি দামি মাদ্রাজী কাপড়ও দিয়েছিলেন প্রচুর। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজাদি হলো, ভাণ্ডারা হলো; মহাপুরুষজী ঐ ভক্তটিকে দীক্ষা দিলেন, কিন্তু গুরুদক্ষিণা এক পয়সাও নিলেন না। বললেন—"আমি তো গুরু নই! গুরু হলেন ঠাকুর। তিনিই জগদ্‌গুরু। গুরুদক্ষিণাও তাঁরই প্রাপ্য।" যা বলা, কাজেও করলেন তাই। তিনি ঐ টাকা বিভিন্ন আশ্রমে দিয়ে দিলেন আর ঐসব ভাল ভাল কাপড়ও সাধুদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন। টাকাকড়ির উপর তাঁর আদৌ আকর্ষণ ছিল না। অদ্ভুত জীবন! কত বড় ত্যাগী ও তপস্বী ছিলেন তিনি! তবেই তো স্বামীজী তাঁকে মহাপুরুষ বলে ডাকতেন!

ব্যাঙ্গালোরে ঐ অস্পৃশ্যদের গ্রামে একটি ছোট্ট মন্দির ছিল—তাদের দেবমন্দির। মহাপুরুষজী ঐ খবর শুনে একদিন সকালে আমাদের কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে ঐ অচ্ছুতদের গ্রামে গেলেন। বড্ড নোংরা গ্রাম—নাকে কাপড় দিয়ে যেতে হয়। আর কি কালো চেহারা ওদের! আমরা যেতেই গ্রামে সাড়া পড়ে গেল—সাধুবাবারা এসেছেন। সকলে মহাপুরুষজীকে ঘিরে দাঁড়াল। তিনি সব ঘুরে ঘুরে দেখলেন এবং তাদের বাড়ি-ঘর-দোর পরিষ্কার রাখতে বললেন। পরে গেলেন তাদের দেবালয়ে। ছোট্ট মন্দির—মাথা নিচু করে ঢুকতে হয়। মন্দিরে সিঁদূর-মাখানো ছোট ছোট কয়েকটি মূর্তি। তিনি জুতা মোজা ছেড়ে মন্দিরে গেলেন এবং খানিকক্ষণ চোখ বুজে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে রইলেন। পরে দশটাকা প্রণামী দিয়ে প্রণাম করলেন। বাইরে এসে ঐ অচ্ছুতদের বললেন যে, ঐ টাকার ক্ষীরভোগ দিয়ে তারা সকলে যেন প্রসাদ পায়। ঐ অস্পৃশ্যদের গ্রামে উচ্চবর্ণের কেউ যায় না। মহাপুরুষ মহারাজ তাদের গ্রামে গেলেন, তাদের দেবতাকে প্রণাম করলেন—এতে তারা খুবই আনন্দিত

হয়েছিল। সকলে বার বার তাঁকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করতে লাগল। তিনিও তাদের খুব আশীর্বাদ করলেন। মহাপুরুষজী যেন ঐ গ্রামের কল্যাণের জন্যই সেদিন ওখানে গিয়েছিলেন। ঐ মন্দিরে গিয়ে মহাপুরুষজী বেশ ভাবস্থ হয়েছিলেন। পরে আশ্রমে ফিরে বলেছিলেন—"এক ভগবানকেই তো সকলে পূজা করে! অস্পৃশ্যদের দেবতা তো আলাদা নয়! ...আহা! ওদের কি ভক্তি!"

এর কয়েকদিন পরে ঐ গ্রামের ধার দিয়ে বেড়াতে গিয়ে দেখি যে, গ্রামের চেহারা একেবারে বদলে গিয়েছে। মহাপুরুষজীর কথা শুনে তারা সারা গ্রামটাকে পরিষ্কার করেছে—মন্দিরের চারদিকেও পরিষ্কার করে তাতে চুনকাম করেছে। আমি তো তা দেখে অবাক। মহাপুরুষজীর উপদেশে তাদের মনের ঐ পরিবর্তন সম্ভব হয়েছিল।

* * *

আমি রাঁচীতে থাকতে মাঝে মাঝে মঠে যেতাম। মঠে গেলে তিনি কত আদর-যত্ন করতেন—খাওয়া-দাওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা করে দিতেন। রাঁচী আশ্রমের উপরও তাঁর বিশেষ টান ছিল। অনেক জিনিসপত্র দিতেন। আমাকেও ভাল ভাল কাপড়-চোপড় দিতেন। শরৎ মহারাজের শরীরত্যাগের পর তিনি যেন একাধারে ঠাকুর ও মা হয়ে গিয়েছিলেন। সাধু ভক্ত সকলেরই উপর কত কৃপা, কী ভালবাসা! শেষেরদিকে তিনি কাউকেই ফেরাতেন না। যে এসেছে তাকেই দীক্ষা দিয়েছেন—আর সর্বদাই শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবে মাতোয়ারা হয়ে থাকতেন। তাঁর মুখ দিয়ে তখন যেন দৈববাণী বের হতো। যা বলতেন তাই ফলে যেত। আমাদের মহাভাগ্য যে, এমন সব মহাপুরুষের সঙ্গলাভ করেছি, আশীর্বাদ স্নেহ-ভালবাসা পেয়েছি! শ্রীশ্রীঠাকুর ও মা-ই ছিলেন তাঁর জীবনের সার ধন।...

মা-ঠাকুরানী আমায় কাশীতে মহাপুরুষ মহারাজের কাছে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর কাছ থেকেই আমরা তিনজনে সন্ন্যাসের নাম গ্রহণ করি। শ্রীশ্রীমায়ের আদেশে তিনি এক শুভদিনে আমাদের আগে নাম দেন ও পরে বিরজাহোম হয়। আমার মনে হয়, তাই তিনি আমায় এত স্নেহ করতেন! আমার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না।

মহাপুরুষজীর পুণ্যস্মৃতি

স্বামী শান্তানন্দ

ইংরেজি ১৯০৭ সালে কাশী অদ্বৈত আশ্রমেই মহাপুরুষ মহারাজকে প্রথম দর্শন করি। তিনি দেখতে খুব সুপুরুষ ছিলেন—কঠোর তপস্বী, দেখলেই ভক্তি হতো। তখন অদ্বৈত আশ্রমে মহাপুরুষজীই শ্রীশ্রীঠাকুর-পূজা করতেন। পরে মহাপুরুষজীর সময় আমিও ঠাকুর-পূজা করেছিলাম। তখনকার দিনে ছিল খুব সাদাসিধা সাত্ত্বিক পূজা। শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর পূজা হতো। শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবির পাশে স্বামীজীর ছবিও ছিল—তাতেও রোজ অর্ঘ্য এবং ফুল-চন্দন দিয়ে ভক্তি করে অঞ্জলি দিতাম। তখন পয়সায় দুটো করে পেড়া পাওয়া যেত। দুটো পেড়া ও দুটো বাতাসা দেওয়া হতো পূজার সময়। অন্নভোগও বরাবর হতো। যা রান্না হতো তাই খুব শুদ্ধাচারে ঠাকুরকে ভোগ দেওয়া হতো।

ভোরবেলা ঠাকুর তোলা, ৮-৩০টা ন-টায় ঠাকুর-পূজা, পরে ভোগ ও শয়ন; ৪টায় বৈকালীতে একটি ছোট্ট পেড়া ও দুটি বাতাসা। সন্ধ্যায় আরতিতে সকলে উপস্থিত থাকতেন। তখন 'খণ্ডন' ও 'ওঁ হ্রীং ঋতং' গাওয়া হতো। আরতির পর সকলেই খানিকক্ষণ ধ্যান করতেন। পরে চন্দ্র মহারাজ (স্বামী নির্ভরানন্দ) ভজন গাইতেন। মহাপুরুষজীর আদেশ ছিল—"চন্দ্র, আরতির পর রাত্রে ঠাকুরকে অন্তত একখানা গান শোনাবে।" তাই চন্দ্র মহারাজ রোজ ভজন গাইতেন—খালি গলায়। বেশ মিষ্টি গলা ছিল তাঁর।

রাত্রে ভোগ হতো—রুটি, তরকারি, ডাল, সামান্য ভাজা, এক পো দুধ ও বাতাসা। সন্ধ্যার পর কেউ আশ্রমের বাইরে যেত না—সকলকেই আশ্রমে থাকতে হতো। আমাদের যাবার পূর্বে, অদ্বৈত আশ্রমে তখন খুব কম লোক—মহাপুরুষজী, চন্দ্র মহারাজ, একটি ব্রহ্মচারী আর পর্বতবাবু। পর্বতবাবু কাশীবাস করতে এসেছিলেন—ব্রহ্মচারীর মতো থাকতেন। মহাপুরুষজী তাঁকে অদ্বৈত আশ্রমে থাকতে বলেন। জিতেন মহারাজ (স্বামী বিশুদ্ধানন্দ) আমার চাইতে ১½/২ বৎসরের বড় ছিলেন। গিরিজা বয়সে আমার ছোট ছিল। আমরা তিনজনে একসঙ্গে জয়রামবাটী গিয়েছিলাম। জিতেন মহারাজ আমাদের দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যেতেন—ওখানে ঠাকুরের ঘরে, পঞ্চবটীতে, কালীমন্দিরে আমরা খুব ধ্যান-জপ করতাম, 'কথামৃত' পাঠ করতাম। তখনো তো দীক্ষা হয়নি—ঠাকুরের নামই জপ করতাম।

জিতেন মহারাজের সঙ্গেই হেঁটে কাঁকুড়গাছি যাই—সেখানে গিরিজার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়। প্রায়ই যেতাম দক্ষিণেশ্বরে ও কাঁকুড়গাছিতে। বেশ ভাল লাগত। একদিন আমরা তিনজন গুরুভাই দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণির কালীবাড়িতে পঞ্চবটীমূলে অনেক রাত পর্যন্ত সাধন-ভজন করি এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কঠোর তপস্যা ও সাধনার বিষয় আলোচনা করি। সে সময় আমাদের মনে তীর্থভ্রমণের ইচ্ছাও প্রবল হয়ে ওঠে। পরদিন সকালে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করে জগন্মাতা ভবতারিণীদেবীর মন্দিরে বসে অনেকক্ষণ ধ্যান-জপ করি। দুপুরে সেখানেই প্রসাদ পেয়ে আমরা স্থির করলাম যে, দু-একদিনের মধ্যেই পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর দেশ জয়রামবাটীতে গিয়ে তাঁর দর্শন ও কৃপালাভ এবং তাঁর অনুমতি নিয়ে পায়ে হেঁটে পুরী যাত্রা করব।

এ রকম সংকল্প করে ৩ শ্রাবণ, ১৩১৪ সন, শুক্রবার রাত্রে আমরা তিনজন কলকাতা থেকে গাড়িতে খড়গপুর হয়ে শেষরাত্রে বিষ্ণুপুর পৌঁছই এবং পরদিন সকালে একটি গরুর গাড়ি করে সন্ধ্যায় কোতুলপুর পৌঁছে রাত্রিটা এক ময়রার দোকানে কাটিয়ে ভোর হতেই হেঁটে জয়রামবাটী যাই। ধুলোপায়ে শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরানীর শ্রীচরণদর্শন করে কৃতকৃতার্থ হলাম। মা আমাদের খুব আদরযত্ন করলেন এবং কাছে বসিয়ে অনেক কথা বললেন। আমাদের মনের ইচ্ছা তাঁকে জানাতে তিনি খুব খুশি হন। আমাদের পুরী যাত্রার সংকল্প শুনে মা বারণ করে বললেন, "পুরীতে নাকি এখন অসুখ-বিসুখ হচ্ছে—পুরী যেও না, তোমরা কাশীধামে যাও। আমি ওখানকার অদ্বৈত আশ্রমে তারককে লিখে দেব।"

আমরা নিঃসম্বল অবস্থায় একাকী যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করতে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী বললেন, "তোমাদের অত কষ্ট করবার দরকার নেই। তিনজনে একত্র যাবে। কেউ বা রান্না করবে, কেউ ভিক্ষা করবে। একা একা গিয়ে অত কষ্ট কেন করবে?" শ্রীশ্রীমা কৃপা করে আমাদের দীক্ষা দিলেন। পরে মার কাছে জয়রামবাটীতে কয়েক দিন খুব আনন্দে কাটালাম। ক্রমে মার কাছ থেকে বিদায় নেবার দিন ঘনিয়ে এল। ১২ শ্রাবণ, ১৩১৪ (ইং ২৮ জুলাই, ১৯০৭) শ্রীশ্রীমায়ের আদেশমত আমরা মস্তকমুণ্ডন করলাম এবং নিজ নিজ কাপড় গেরুয়া রং করলাম। পরদিন সোমবার আমাদের জীবনে মহাস্মরণীয় দিন। ঐদিন শ্রীশ্রীমা সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত করে আমাদের কৃতকৃতার্থ করলেন এবং গেরুয়াধারণের অনুমতি দিলেন। পরে তিনি বললেন, "সন্ন্যাসীর নামকরণ কি রকম করে হয়, আমার তো তা ঠিক জানা নেই। কাশী অদ্বৈত আশ্রমে তারকের কাছে চিঠি লিখে দিচ্ছি। তোমরা তার কাছ থেকে 'নাম' নিও।"

শ্রীশ্রীমা মহাপুরুষ মহারাজকে লিখেছিলেন—"তিনটি ছেলে যাচ্ছে, এদের

খাওয়া-দাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করে দিও। আর এদের সন্ন্যাসীর নামও দিও।” ইত্যাদি।

ঐ দিন আমরা মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে তীর্থযাত্রায় রওনা হই এবং প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পবিত্র জন্মস্থান কামারপুকুর-দর্শনে যাই। বিদায় দেবার সময় শ্রীশ্রীমা আমাদের সঙ্গে নিয়ে তাঁর ঠাকুরঘরে গেলেন এবং ৺দুর্গানাম জপ করে বিল্বপত্র নিয়ে মাথায় স্পর্শ করিয়ে আমাদের খুব আশীর্বাদ করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবির সামনে আমাদের প্রণাম করিয়ে নিজে করজোড়ে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করলেন—“ঠাকুর, এরা জলে জঙ্গলে পাহাড়ে যেখানে যে অবস্থায় পড়ুক না কেন, এদের দুটি দুটি খেতে দিও।”

২২ শ্রাবণ, বুধবার আমরা কামারপুকুরে রঘুবীরের প্রসাদ গ্রহণ করে ৺বিশ্বনাথের নাম নিয়ে কাশীধামোদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম। বৈদ্যনাথ, গয়া প্রভৃতি স্থান দর্শনান্তে কাশীধামে পৌঁছই। কাশী অদ্বৈত আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরপ্রণাম করে মহাপুরুষ মহারাজকে দর্শন ও প্রণাম করলাম। পরিচয় দিয়ে মায়ের চিঠিখানি দিতেই মহাপুরুষজী খুব খুশি হয়ে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। পরে তাঁর কাছ থেকেই আমরা তিনজন সন্ন্যাস-নাম গ্রহণ করি। এক শুভদিনে আগে নাম দেন, পরে বিরজা হোম হয়।

কাশীতে আমরা আশ্রমে বসেই ধ্যান-জপ করতাম। গঙ্গাস্নান এবং ৺বিশ্বনাথ-দর্শনেও যেতাম। ভোর রাত্রে ৩টার সময় সকলকে উঠতে হতো। মহাপুরুষজীও উঠতেন। তারপর শৌচাদি সেরে সকলে ধ্যানে বসতাম। শীতের দিনে অদ্বৈত আশ্রমের হলঘরে ধুনি জ্বালানো হতো—সকলেই ধুনির পাশে বসতাম। মহাপুরুষজীও বসতেন। সকাল পর্যন্ত একটানা ধ্যান চলত। মহাপুরুষজীও আমাদের সঙ্গে বসে ধ্যান করতেন। খুব শান্ত পরিবেশ, পাশেই ছোট্ট ঠাকুরঘরটি। চুপচাপ সকলে ধ্যান করতাম। আশ্রমের সর্বত্র শান্তি বিরাজ করত। 'টুঁ' শব্দটিও নেই—কেউ কথা বলত না। অন্য সময়েও পরস্পর কথাবার্তা খুব নিম্নস্বরে বলতে হতো, চেঁচামেচি মহাপুরুষজী পছন্দ করতেন না। তিনিও জোরে কথা বলতেন না, কাউকে কিছু বলতে হলে তার কাছে এসে আস্তে আস্তে বলতেন। বিকালেও অনেকক্ষণ ধ্যান করতাম সকলে।

মহাপুরুষজীকে তখন দেখে মনে হতো—সব সময়ই তিনি যেন ধ্যানে ডুবে আছেন। সন্ধ্যাবেলায় আরতির পর কোন কোন দিন মহাপুরুষজী ভজন গাইতেন। তাঁর গলা খুব মিষ্টি ছিল। 'দয়াঘন তোমা সম কে হিতকারী'—এই গানটি তাঁর খুব প্রিয় ছিল। কখনো কখনো তিনি ঠাকুরের কথাও বলতেন।

কিছুদিন পর মহাপুরুষজীর আদেশে কেদারবাবা (স্বামী অচলানন্দ) ছত্র ঠিক করে দিলেন। কোথাও দুদিন, কোথাও চারদিন—এভাবে মাধুকরী ভিক্ষা করতাম। ধ্রুবেশ্বরের ছত্র থেকে সকালে টিকিট এনে সে টিকিট নিয়ে ছত্র থেকে মাধুকরী করে নিয়ে এসে আশ্রমে বসে সকলের সঙ্গে খেতাম। মাধুকরীর অন্ন খুব পবিত্র। মহাপুরুষজীও দুটি দুটি খেতেন।

* * *

শ্রীশ্রীমা যেবার কাশীতে এলেন (১৯১২ সন) তখন রাজা মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দজী), মহাপুরুষ মহারাজ, হরি মহারাজ প্রভৃতি কাশীতে। বিজ্ঞান মহারাজও (স্বামী বিজ্ঞানানন্দ) এসেছিলেন। মাস্টার মশাই (শ্রীম) মা-র সঙ্গে কলকাতা থেকে গিয়েছিলেন। তখন মহাপুরুষজী অদ্বৈত আশ্রমেই থাকতেন। রাজা মহারাজ ছিলেন সেবাশ্রমে। মহাপুরুষ মহারাজ সেবাশ্রমে বড় একটা থাকতেন না। কষ্ট হলেও তিনি অদ্বৈত আশ্রমেই থাকতেন, অদ্বৈত আশ্রমকে খুব ভালবাসতেন—ওখানে যারা থাকত তাদেরও। বেশি সাধু হলে কেদারবাবাকে দিয়ে ছত্রে ব্যবস্থা করে দিতেন। মহাপুরুষজী শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিয়েই থাকতেন—ঠাকুরই তাঁর সব। ৺বিশ্বনাথ-দর্শনেও কদাচিৎ যেতেন। আশ্রমের মধ্যেই একটু বেড়াতেন—বাইরে বড় একটা যেতেন না।

১৯১২ সালে ৺কালীপূজার সময় শ্রীশ্রীমা কাশীতে ছিলেন। কালীপূজার পরদিন সকালে শ্রীশ্রীমা দত্তদের বাড়ি থেকে মেয়ে-ভক্তদের নিয়ে অদ্বৈত আশ্রমে আসেন। খানিকক্ষণ বসেছিলেন হলের পাশের ছোট ঘরটিতে। মা এলে রাজা মহারাজ প্রভৃতি সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতেন। মা থাকতেন অদ্বৈত আশ্রমের কাছেই কিরণ দত্তদের নূতন বাড়িতে। ঐ বৎসর অদ্বৈত আশ্রমে স্থানীয় লোকেরা রামলীলা করেছিল। মা সেই রামলীলা দেখে খুব খুশি হয়েছিলেন। বলেছিলেন—"আসল নকল সব এক দেখলুম।"

কাশীতে শ্রীশ্রীমা যতদিন ছিলেন রোজ তাঁকে দর্শন করতে যেতাম। মায়ের জন্য পূজার ফুল নিয়ে যেতাম অদ্বৈত আশ্রম থেকে। হাটবাজার করে দেওয়া ও মাকে দেখা-শোনার ভার ছিল আমার উপর। মা একদিন অন্তর গাড়ি করে গঙ্গাস্নানে যেতেন এবং গঙ্গার ধারে ৺থুলটংকেশ্বরের মন্দিরে যেতেন ও পূজা করতেন এবং বলতেন, "এই আমার ৺বিশ্বনাথ।" ৺বিশ্বানাথের মন্দিরে ভিড় হতো বলে রোজ যেতেন না, মাঝে মাঝে বিশেষ দিনে যেতেন। মেয়ে-ভক্তরা মা-র সঙ্গে থাকত।

রাজা মহারাজ সেবাশ্রমের অফিসের কোণের ঘরে থাকতেন। মহাপুরুষজী অদ্বৈত আশ্রমে থাকতেন—খুব ধ্যান করতেন, গভীরধ্যানস্থ হয়ে থাকতেন। হরি মহারাজ সেবাশ্রমে অফিসের পাশের ছোট ঘরটিতে থাকতেন। ঐ সময় কাশী অদ্বৈত

আশ্রমে জমজমাট আধ্যাত্মিক পরিবেশ ছিল, ভজন-কীর্তনও হতো। মহাপুরুষ মহারাজ, রাজা মহারাজ তাতে যোগ দিতেন; খুব আনন্দ হতো।

শ্রীশ্রীমা যেদিন পালকি করে সেবাশ্রম দেখতে গিয়েছিলেন, সেদিন আমি ও কেদারবাবা মায়ের পালকির সঙ্গে ছিলাম। মা সব দেখে খুব আনন্দিত হন। বলেছিলেন—"সর্বত্র ঠাকুর বিরাজ করছেন।" তখন তো সেবাশ্রম খুব ছোটই ছিল। মা তা দেখেই খুব খুশি হয়েছিলেন। একজন ভক্ত মায়ের হাত দিয়ে সেবাশ্রমের জন্য দশটাকা দিয়েছিলেন—মা হাতে করে যে দশটাকার নোটটি দিয়েছিলেন—সে নোটখানি এখনো সেবাশ্রমের অফিসে রাখা আছে।

মা একদিন রাজা মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, হরি মহারাজ প্রভৃতি ঠাকুরের সন্তানদের খাওয়ালেন। 'লক্ষ্মী নিবাস' নামক কিরণ দত্তের নবনির্মিত যে বাড়িতে মা ছিলেন তার নিচের তলার বারান্দায় সকলে খেতে বসেছিলেন। মা সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে সকলকে খাইয়েছিলেন এবং পরে সকলকে একখানি করে কাপড় দিলেন। হাতমুখ ধুয়ে তাঁরা ঐ কাপড় মাথায় বেঁধে নাচতে লাগলেন আনন্দে। মা-কে আগে খাবার কথা বলা হয়েছিল কিন্তু শ্রীশ্রীমা কিছুতেই আগে খেলেন না—বললেন, "আগে ছেলেদের খাওয়া হোক, তারপর আমি খাব।" যতক্ষণ ছেলেরা খাচ্ছিল, ততক্ষণ মা দাঁড়িয়ে থেকে সকলকে পরিতোষ করে খাইয়েছিলেন।

মা অদ্বৈত আশ্রমে কোনদিন বসে খাননি। অমনি ফল মিষ্টি ২।১ বার খেয়েছেন।

* * *

পরেও মহাপুরুষজী আলমোড়া বা অন্যত্র যাতায়াতের পথে কাশী অদ্বৈত আশ্রমে অনেকবার এসেছিলেন। তাঁর ঐ আশ্রমটির উপর খুব টান ছিল। তখনও সেবাশ্রম ভাড়াটে বাড়িতে। অদ্বৈত আশ্রমের পশ্চিম পাশে একটা প্রকাণ্ড বাগান ছিল—নেবু পেয়ারা ইত্যাদির বাগান। ঐ বাগানে কয়েকটা বেলগাছ ছিল—খুব বড় বড় বেল হতো। অত বড় বেল কাশীতে সাধারণত দেখা যেত না। মহাপুরুষ মহারাজ চার-পাঁচ পয়সা করে এক-একটা বেল কিনতেন। আর ঐ বেল শ্রীশ্রীঠাকুরকে ভোগ দিয়ে বলতেন—"ঠাকুর, এই বাগানটি করে দাও।" পরে ঐ বাগান সেবাশ্রমের হলো। তাঁরই প্রার্থনায় সব হলো। সেই বেলের চারা এলাহাবাদে বিজ্ঞান মহারাজ নিয়ে গিয়েছিলেন। কনখলে কল্যাণ স্বামীও (স্বামী কল্যাণানন্দ) নিয়ে গিয়েছিলেন।

আমরা কাশী আসবার আগে এক সময়ে অদ্বৈত আশ্রমের ঠাকুর-ঘরে চুরি

হয়। রাত্রে চোর ঢুকে ঠাকুরঘর থেকে একটি ছোট্ট তোরঙ্গ—যাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের রুমাল ও কাপড়-চোপড় ইত্যাদি ছিল—নিয়ে যায় এবং সেই সঙ্গে বেদির উপর যে ছোট্ট জার্মান-সিলভারের কৌটাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের অস্থি ছিল এবং যা নিত্য পূজা হতো সে কৌটাটিও রূপার মনে করে নিয়ে যায়। পরদিন পুলিশে খবর দেওয়া হয় এবং খোঁজ করতে করতে দেখা গেল পাশের ঐ নেবুবাগানে ঐ ছোট্ট তোরঙ্গটি ভাঙ্গা অবস্থায় পড়ে আছে আর সেই জার্মান-সিলভারের কৌটাটিও পড়ে রয়েছে খোলা অবস্থায়। কৌটার ভিতরে শ্রীশ্রীঠাকুরের যে অস্থিটুকু ছিল তা পাওয়া গেল না। তাতে মহাপুরুষ মহারাজ বলেছিলেন, "শ্রীশ্রীঠাকুরের অস্থি যখন এখানে পড়েছে তখন এ জায়গা ঠাকুরের হবেই।" তখনও সেবাশ্রম ভাড়াবাড়িতে রামাপুরায়। তারপর সেবাশ্রম ঐ জমি কিনল। মহাপুরুষ মহারাজের কথা কি মিথ্যা হয়? ঐ জায়গা ঠাকুরের হলো। ওখানে সেবাশ্রম হলো।...

তখন মহাপুরুষ মহারাজ ঠাকুর-পূজা করেন। এদিকে চন্দ্র মহারাজেরও মনে মনে ঠাকুর-পূজা করার খুব ইচ্ছা হয়েছে, অথচ তিনি মুখ ফুটে কাউকে কিছু বলেননি। হঠাৎ মহাপুরুষজীর শরীর খারাপ হলো। তিনি বুঝলেন, কেন তাঁর শরীর খারাপ হয়েছে—ঐ শরীর খারাপ হবার মধ্যেই তিনি পেলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের ইঙ্গিত। তাই তিনি চন্দ্র মহারাজকে জিজ্ঞেস করলেন—"চন্দ্র! তোমার কি ঠাকুর-পূজা করার ইচ্ছে হয়েছে?" চন্দ্র মহারাজ মাথা নিচু করে বললেন, "হাঁ"। তখন মহাপুরুষজী হাসতে হাসতে বললেন, "তা আমাকে বললেই পারতে? আমার অসুখ করালে কেন?" এবং চন্দ্র মহারাজকে পূজা করতে বললেন। ভক্তের ইচ্ছা ভগবান কত অচিন্তনীয় উপায়ে পূর্ণ করেন!

মহাপুরুষজীর-স্মৃতিকথা

স্বামী প্রভবানন্দ

মহাপুরুষ মহারাজকে যা দেখেছি বা তাঁর যা সঙ্গ করেছি তা অধিকাংশ সময়েই রাজা মহারাজের সঙ্গে। আর আমি থাকতুম মহারাজের কাছেই—মহাপুরুষ মহারাজকেও যখন দেখেছি তা রাজা মহারাজের কাছেই। তাঁর পৃথক সঙ্গলাভের সৌভাগ্য খুব অল্পই হয়েছে।

মহাপুরুষজীকে প্রথম দর্শন করি সম্ভবত ১৯১১ সনে বেলুড় মঠে। সেদিন

আমি মঠে যাই শরৎ সেন মাস্টারের সঙ্গে (শরৎ সেন পরে হৃষীকেশে পূর্ণানন্দ নামে পরিচিত হয়েছিলেন)। চায়ের টেবিলের বেঞ্চে বসে মহাপুরুষ মহারাজ—মাথায় পাগড়ি বাঁধা ছিল। মনে হলো মুখখানি থেকে এক অপূর্ব জ্যোতি বেরুচ্ছে! শরৎবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "ভগবানলাভ কি করে হবে?"

মহাপুরুষ মহারাজ—"তোমার পড়াশুনা কতদূর? কি কর?"

শরৎ—"বি. এ. পাশ। মাস্টারি করতুম।"

মহাপুরুষ মহারাজ—"ঐ বি. এ. পাশ করতে যতটা পরিশ্রম করেছ ও মনঃসংযম করবার চেষ্টা করেছ, ঐ অতটা চেষ্টা করলেই ভগবানলাভ হয়।"

* * *

এর পরে দেখা কনখলে, যেবার মহারাজ প্রতিমায় দুর্গাপূজা করেন—সম্ভবত ১৯১২ সালে। শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানদের মধ্যে মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ ও হরি মহারাজকে সেখানে একত্র পাবার সুযোগ হয়। মহারাজ ও মহাপুরুষ মহারাজ বড় হলঘরে শয়নাদি করতেন—দুজনে একই ঘরে।

মহারাজের কাছে একদিন সমাধির কথা জিজ্ঞাসা করার সুযোগ হয়। মহাপুরুষ মহারাজও কাছে বসে। মহারাজ বললেন—"যদি অটুট ব্রহ্মচর্য থাকে, সমাধি অল্প আয়াসে হয়।" তারপর বললেন, "সমাধি কি সহজ ব্যাপার?"

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥*

এই উপনিষদের শ্লোকটি বললেন। আর বললেন—"এক দেখেছি স্বামীজীর তিনবার সমাধি হয়েছিল আর ঠাকুরের সমাধি দেখেছি প্রতিদিন কতবার! আর তো বাবা কারুর দেখলাম না। কি বলেন, তারকদা?" মহাপুরুষ মহারাজ চুপ করে রইলেন। আমার ধারণা হলো, ঐ চুপ করে থেকে তাঁর নিজেরও যে সমাধি হয়েছে তিনি সেটাই জানালেন।

কনখলে থাকবার সময় একদিনের জন্য আমি হৃষীকেশে যাই দর্শনাদি করতে। সন্ধ্যার সময় ফিরেছি। মহারাজ বললেন—"ওরে, তোর মুখটা শুকিয়ে গেছে যে।"

মহাপুরুষ মহারাজ—"ও ওখানে তপস্যা করেছে।"

মহারাজ—"তপস্যা না ছাই! ওর খুব কষ্ট হয়েছে সেখানে।"

বাস্তবিকই তাই। আমার কাছে যে সামান্য পয়সাকড়ি ছিল তা সবই

---

* সেই পরাবর আত্মস্বরূপ পরব্রহ্মদর্শন হলেই দ্রষ্টার অবিদ্যাদি সংস্কাররূপ হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়ে যায়, সকল সন্দেহ হয় দূরীভূত, প্রারব্ধ ভিন্ন অন্য কর্মরাশি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। (মুণ্ডকোপনিষদ্, ২/৯)

লছমনঝোলার এক অসুস্থ সাধুকে দিয়ে দিই, মনে করেছিলাম আমার সঙ্গীর (একটি স্কুলের ছেলে, মহারাজের এক শিষ্যের পুত্র) কাছে পয়সাকড়ি কিছু থাকবে। তারপর হৃষীকেশে যখন হেঁটে এলুম খিদে পেয়েছে দুজনেরই। খাবার কিনবার পয়সা নেই। দুজনেই বসে আছি চুপ করে, এমন সময় কনখল থেকে পরিচিত কয়েকটি বাঙালি ভক্ত এলেন। তাঁরাই খাবার নিমন্ত্রণ করলেন এবং তাদের ঝটকা গাড়িতে জায়গা ছিল—তাতেই ফিরি।

১৯১৪ সনে কাশীধামে রাজা মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ, হরি মহারাজ, বিজ্ঞান মহারাজ উপস্থিত। মহাপুরুষ মহারাজ আসবেন আলমোড়া থেকে। এক গাড়িতে সকালে তাঁর কাশীধাম পৌঁছবার কথা। মহারাজ মহাপুরুষ মহারাজকে স্বাগত করবার জন্য নানাভাবে আয়োজন করেছেন। কাঁসর, ঘণ্টা, শাঁক বাজিয়ে আরও নানাপ্রকারে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করার ইচ্ছা—কারণ মহারাজ বললেন, "হিমালয়ে তপস্যা করে মহাপুরুষ মহারাজ ফিরছেন।"

এদিকে সংবাদ এল মহাপুরুষ মহারাজ ঐ গাড়ি ধরতে পারেননি। তিনি পরের ট্রেনে এলেন—কাকেও না জানিয়ে। মহাপুরুষ মহারাজ যখন আশ্রমে এলেন, মহারাজ তখন ঘরে বিশ্রাম করছেন। মহাপুরুষ মহারাজকে যখন বলা হলো যে, মহারাজ তাঁকে সংবর্ধনা করার জন্য কতভাবে ব্যবস্থা করেছিলেন—সেসব শুনে তিনি বলেছিলেন, "দেখলে, ঠাকুর আমাকে কেমন বাঁচিয়ে দিলেন! আমি কি মহারাজের কাছ থেকে এভাবে অভ্যর্থনা নিতে পারি?"

১৯২১ সন মাদ্রাজে। আমি একবার স্থির করেছিলাম। নর্মদায় গিয়ে তপস্যা করব। মহারাজ স্থান ঠিক করে দিয়েছিলেন। যখন যাবার জন্য প্রস্তুত, মহারাজের শ্রীচরণে বিদায় নিতে গেছি তখন মহারাজ বললেন—"কি রে, কোথায় যাবি?" আমি তপস্যা করতে যাব শুনে তিনি খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, বললেন—"যা, তারকদাকে ডেকে নিয়ে আয়।" আমি মহাপুরুষ মহারাজকে ডেকে নিয়ে এলুম। তখন মহারাজ বলতে আরম্ভ করলেন— "তারকদা, দেখুন তো ছেলেটা কত বোকা! বলে কিনা তপস্যা করতে যাব। তপস্যার কি জানিস? আর আমরা না তোদের জন্য তপস্যা করেছি! তোদের তপস্যা করতে হবে কেন?" ইত্যাদি প্রায় তিন ঘণ্টা মহারাজ নিজের সাধন-ভজনাদি সম্বন্ধে কত কথা বললেন ও কতভাবে উপদেশ দিলেন।

পরে মহাপুরুষ মহারাজ বাইরে এলেন, আমিও সঙ্গে বেরিয়ে এলুম। মহাপুরুষ মহারাজ বললেন—"অবনী, তুমি poked the honeycomb (অর্থাৎ তুমি মৌচাকে খোঁচা দিয়েছিলে)। আজ অনেক নূতন কথা শুনলুম, যা আমিও জানতুম না।"

* * *

আর একদিন মাদ্রাজে আমি মহাপুরুষ মহারাজকে বলেছিলুম—"আপনি তো মহারাজের 'yes man', তাঁর সব কথায় হাঁ বলেন।" মহাপুরুষ মহারাজ হেসে উত্তর দিলেন—"অবনী, তোমরা দেখ মহারাজকে মহারাজ। আমরা কি দেখি জান? বাহিরে মহারাজের খোলটা আর অন্তরে ঠাকুর ছাড়া আর কিছু নেই।"

মাদ্রাজে থাকার সময় একদিন মহাপুরুষ মহারাজকে 'বেদান্ত-কেশরী'র জন্য একটা প্রবন্ধ লিখতে অনুরোধ করলুম। তিনি রাজি হলেন এবং কাগজ-কলম দেবার কথা বললেন। আমি ভাল খাতা ও নূতন ফাউন্টেন পেন একটি দিলুম। প্রায় এক সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহ পরে জিজ্ঞাসা করলুম—"মহারাজ, প্রবন্ধ কিছু লিখেছেন?"

তিনি উত্তর দিলেন—"দেখ অবনী, আমি তো প্রবন্ধের বিষয় ঠিক করলুম আর ঐ বিষয়ে চিন্তা করতেই তৎক্ষণাৎ conclusion-এ (সিদ্ধান্তে) এসে পড়লুম! তাই আর কি লিখব?"

* * *

রাজা মহারাজের শরীর যাবার পর ১৯২২ সনে বেলুড় মঠে মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে বললেন, "অবনী, বিদেহানন্দ সিঙ্গাপুরের জন্য একজন সহকারী চাচ্ছে। আমি নূতন প্রেসিডেন্ট। কেউ বিদেহানন্দের সহকারী হয়ে যেতে চায় না। তুমি যাবে?" আমি উত্তর দিলাম—"হাঁ মহারাজ, আপনি যেমন আদেশ করবেন তেমনি করব। বিদেহানন্দ আমার বন্ধু, তার সহকারী হতে আমার কোন আপত্তি নেই।"

আমি একমাস সময় নিলুম, কারণ যাবার পূর্বে হরি মহারাজকে দেখে যাবার ইচ্ছা। যা হোক, আমি যখন সিঙ্গাপুর যাবার জন্য প্রস্তুত তখন আদেশ এল যে, সিঙ্গাপুর যেতে হবে না। তাঁরা (মহাপুরুষ মহারাজ ও শরৎ মহারাজ) আমাকে আমেরিকায় পাঠানো স্থির করেছেন। আমেরিকায় আসবার পূর্বে মহাপুরুষ মহারাজকে বলি—"মহারাজ, আমাকে তো পাঠাচ্ছেন। আমি কি করতে পারি সেখানে? আমার তো ভগবদ্দর্শন হয়নি।" তার উত্তরে মহাপুরুষ মহারাজ ইংরেজিতে বললেন—"You have seen the Son of God, you have seen God", (অর্থাৎ তুমি ভগবানের মানসপুত্রকে দেখেছ, তুমি ভগবানকেই দেখেছ)।

* * *

১৯২২ সন—বেলুড় মঠের ঘটনা। মহাপুরুষ মহারাজ চায়ের টেবিলের কাছে বেঞ্চে বসে আছেন। আমি কাছে দাঁড়িয়ে। একটি যুবক ভক্ত এসে মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করল। প্রণাম করে সে দাঁড়িয়ে রইল। মহাপুরুষ মহারাজ কোন কথা বলেন না। যুবকটি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অতি করুণস্বরে বলল—

"মহারাজ, আপনি আমাকে চিনতে পারলেন না? আপনি যে আমাকে কৃপা করে দীক্ষা দিয়েছেন।" মহাপুরুষ মহারাজ—"আমি, বাবা, কারও গুরু নই। যে আমার কাছে আসে, আমি ঠাকুরের পায়ের তলায় তাকে ফেলে দিই; তাছাড়া আমি কিছু জানিনে, বাবা।" আমি তখন মনে মনে ভাবলুম—এটি আমাকে শিক্ষা দেবার জন্য। কারণ তখন আমার আমেরিকা যাওয়া স্থির হয়েছে। মহাপুরুষ মহারাজ সম্পূর্ণ নিরভিমান ছিলেন এবং গুরুবুদ্ধি তাঁতে আদৌ ছিল না।

মহাজনের স্মৃতিকথা

স্বামী স্বপ্রকাশানন্দ

পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের পবিত্র সঙ্গলাভ করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে। নির্ধূম-বহ্নির ন্যায় তেজস্বী, অহেতুক-কৃপাসিন্ধু মহাপুরুষ মহারাজ তখন মঠে অবস্থান করছিলেন। পরমপূজ্য শ্রীবাবুরাম মহারাজ অসুস্থতা নিবন্ধন তখন বলরাম মন্দিরে চিকিৎসার্থ ছিলেন। মহাপুরুষ মহারাজ তখন মঠের সমস্ত কাজকর্ম দেখাশোনা করতেন, সকলের খোঁজখবর নিতেন এবং বিশেষ বিশেষ কাজ কিভাবে করতে হবে তাও বলে দিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা-সেবা যাতে ভালভাবে হয় সেদিকে খুব নজরে রাখতেন। আমি তখন পূজার ভাঁড়ারে কাজ করতাম। কনখল সেবাশ্রমে পাঁচ বৎসর সেবা-কাজ করে এসে সবে ঠাকুর-ভাঁড়ারের কাজে নিযুক্ত হয়েছি। লক্ষ্মণ মহারাজ পূজা করতেন, আমি ও সাদা জ্যোতীশ (স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দ) ঠাকুর-ভাঁড়ারে কাজ করি। আমি মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করতে গেলেই তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা ও জোগাড়ের কাজ সম্বন্ধে এবং কতটা ফল-মিষ্টি আছে ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞাসা করতেন। আমিও যথামত উত্তর দিতাম।

দেখতে পেতাম মঠের বিশেষ বিশেষ কাজ তিনি রাজা মহারাজের সঙ্গে পরামর্শ করে তবে তা করার আদেশ দিতেন। আবার রাজা মহারাজকে কেউ কোন কাজের কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন, "মহাপুরুষকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি যেমন বলবেন তেমনিই কর।" উভয়ের মধ্যে এমন একটা মধুর সম্বন্ধ ছিল যা জাগতিক সম্বন্ধের বহু ঊর্ধ্বে অপার্থিব ভালবাসা!...

যখনকার কথা বলছি তখন মহাপুরুষ মহারাজের কোন নির্দিষ্ট সেবক ছিল না।

তিনি নিজেই তাঁর অধিকাংশ কাজ করে নিতেন। কোন কোন সাধু-ব্রহ্মচারী কিছু কিছু করে দিত। আমরা কিছু সেবা করতে গেলে তিনি বলতেন—"আমি এখনও অসমর্থ হইনি। তোমাদের সেবা কেন নেব? তোমরা ঠাকুরের কাজকর্ম কর।" আমরা বলতাম, "আপনার একটু সেবা করতে পারলে আমাদের কত আনন্দ হয়, তাতে আমাদের মনও শুদ্ধ হবে।" তাতে তিনি বলতেন—"ঠাকুরের কাজকর্ম ভাল করে কর, তাতেই তোমাদের মন শুদ্ধ হয়ে যাবে। তোমরা আনন্দ পাবে।"

আমাদের মধ্যে অনেকে তখন মহাপুরুষ মহারাজকে খুব ভয় করত। তিনি খুব গম্ভীর প্রকৃতির ও রাশভারী লোক ছিলেন। কেউ কেউ ভয়ে তাঁকে দুবেলা প্রণাম করতে যেতেও সাহস করত না। কোনমতে একবেলা প্রণাম করে আসত। আমারও ভয় হতো, কিন্তু অপরের মতো অতটা নয়। আমি ঠাকুর-ভাঁড়ারে কাজ করতুম বলে মহাপুরুষ মহারাজের কাছে যাওয়া, কথা বলা ও কোন কিছু জিজ্ঞাসা করার সুযোগ ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ফল-প্রসাদ নামলে আমি প্রসাদী ফল মিষ্টি মহাপুরুষ মহারাজ এবং রাজা মহারাজের ঘরে রেখে আসতাম, কখনো কখনো সেবকরাও নিয়ে যেত। আমি সকাল-সন্ধ্যা দুবেলাই রাজা মহারাজ ও মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করতে যেতাম। মহাপুরুষজী আমায় জিজ্ঞাসা করতেন, "ঠাকুরের সেবার কাজ ভাল করে করছ তো? সাবধান, বাবা! যেন কোনরূপ ত্রুটি না হয়, প্রাণ দিয়ে ঠাকুরের সেবা করবে।"

একদিন আরতির পর মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করতে গিয়েছি, তখন তিনি নিজের ভাবে বসে আছেন। আমি অতি সন্তর্পণে পায়ে হাত না দিয়ে প্রণাম করে ঘর থেকে বাইরে আসছি, এমন সময় তিনি আমাকে ডাকলেন। আমি ফিরে দাঁড়াতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "ওখানে প্রণাম করেছ?"—অর্থাৎ পূজ্যপাদ স্বামীজী মহারাজের ঘরে। আমি উত্তর দিলাম, "না, ওখানে করিনি, এখন গিয়ে করব।" তিনি বিরক্ত হয়ে ধমক দিয়ে বললেন—"আগে ওখানে প্রণাম করবে, পরে এখানে। জান না সাক্ষাৎ শিব স্বামীজী ওখানে রয়েছেন। ওখানে প্রণাম করলেই হলো। এখানে আর কি?" আমি বললাম—"আজ্ঞে রোজ ওখানে প্রথম প্রণাম করে পরে আপনাকে প্রণাম করব।" সদাশিব মহাপুরুষ মহারাজ সন্তুষ্ট হয়ে বললেন—"তাই করবে।"

একদিন বৈকালে কয়েকজন সাধু-ব্রহ্মচারী মিলে নিচের বারান্দায় কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে নানা কথাবার্তা বলছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে আমিষ নিরামিষ খাবার কথা উঠল। কেউ বললেন, "আমি আমিষাশী, আমিষ খাই।" কেউ বললেন—"আমি

নিরামিষাশী, আমিষ পছন্দ করি না, নিরামিষ খাই।" একজন বললেন—"আমার এত বাছবিচার নেই; আমিষ হলে তো আমিষই খেলাম, নিরামিষ হলে তো তাই খেলাম।" ঠিক এমন সময় মহাপুরুষ মহারাজ উপর থেকে নিচে নামছিলেন। তিনি শেষোক্ত সাধুর ঐ কথা শুনতে পেয়ে তাকে লক্ষ্য করে বললেন—"একি কথা? একি ভাব? যা পেলুম তাই খেয়ে নিলুম!—যেন কোন আঁট নেই, কোন একটা দৃঢ়তা নেই। গ্রহণ করার অযোগ্য বস্তু হলেও অমনি তাই খেলুম, পেলুম না তো খেলুম না—এ রকম ভাব সাধুর পক্ষে ভাল নয়। এতে মনে দুর্বলতা আসে। সাধুর একটা আঁট থাকবে, দৃঢ়তা থাকবে। বিচার করে সব করতে হবে।"

* * *

মহাপুরুষ মহারাজ অতি প্রত্যুষে উঠে শৌচাদি সম্পন্ন করতেন। তিনি উপর থেকে নেমে এসে নিচের পায়খানায় যেতেন। উপরকার স্বামীজীর পায়খানা তিনি ব্যবহার করতেন না। স্বামীজীর প্রতি এতই গভীর ছিল তাঁর শ্রদ্ধা! তখন প্যান-বসানো পাকা পায়খানা নিচে ছিল না, খাটা পায়খানা ছিল। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষায় তিনি নিচে নেমে খাটা পায়খানায় যেতেন। চৌবাচ্চায় জল ভরে রাখা হতো। শীতকালে চৌবাচ্চার জল বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে যেত। তিনি ঐ ঠাণ্ডা জলেই শৌচ করতেন এবং শৌচান্তে পুরাতন ঠাকুর-ভাঁড়ারের সামনে এসে দাঁড়াতেন। আমি আগে থেকে একটা পাত্রে করে গরম জল রেখে দিতাম। তিনি আসামাত্র তাঁর হাতে একটু একটু করে গরম জল ঢেলে দিতাম। তিনি হাত মুখ ধুয়ে উপরে চলে যেতেন। পরে তিনি ঠাকুরঘরে গিয়ে দীর্ঘ সময় ধ্যান করতেন। তিনি বৃদ্ধ বয়সেও নিত্য নিয়মিত ধ্যান-জপ করতেন, যদিও তাঁর নিজের জন্য তা করার একটুও প্রয়োজন ছিল না। তিনি অতি বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত নিজ জীবনে আচরণ করে আমাদের জন্য আদর্শ রেখে গিয়েছেন, যাতে আমরা ঐ আদর্শ গ্রহণ করতে পারি।

* * *

একদিন জনৈক ব্রহ্মচারী মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করতে উপরে গিয়েছে। তখন তিনি খাটের উপর বসে নিবিষ্টমনে চিঠি লিখছিলেন। তাঁর মুখ বিপরীত দিকে ছিল। ব্রহ্মচারী এতটুকুও বিবেচনা না করে ঘরে ঢুকেই মহাপুরুষ মহারাজকে পেছন থেকে প্রণাম করলেন। ব্রহ্মচারীকে ঐভাবে প্রণাম করতে দেখে তিনি খুব বিরক্ত হয়ে বললেন—"বোকা কোথাকার! প্রণাম করতে এসেছ অথচ কোন্ অবস্থায়, কিভাবে প্রণাম করতে হয় তা জান না। এত বয়স হলো এখনও প্রণাম করতে শিখলে না? যারা বাহ্যিক আচরণ জানে না, শেখে না, তাদের কি করে ধর্মলাভ হবে? কি করে জ্ঞান ভক্তি লাভ হবে? সাধু হতে এসেছ, দেখেশুনে সব

শিখতে হয়।" ঠিক সে সময় আর একজন ব্রহ্মচারী এসে প্রণাম করল। তখন পূর্বোক্ত ব্রহ্মচারীকে মহাপুরুষ মহারাজ বললেন—"এই দেখ, শেখ, কিভাবে কোন্ অবস্থায় প্রণাম করতে হয়।" ঐ ব্রহ্মচারী নিজের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত হয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল।* ভোলানাথ মহাপুরুষ মহারাজ একটু পরেই সব ভুলে গিয়ে ব্রহ্মচারীকে আশীর্বাদ করে বিদায় দিলেন। তিনি মায়ের মতো সকলের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী ছিলেন।

* * *

আমাদের একজন সাধু হৃষীকেশে কিছুদিন তপস্যা করে মঠে ফিরে এসেছেন। তিনি কখনো কখনো হৃষীকেশের সাধুদের ত্যাগ-তপস্যা ও তিতিক্ষার কথা মঠের সাধুব্রহ্মচারীদের কাছে বলতেন। একদিন তিনি সকালের দিকে বারান্দায় বসে কয়েকজন সাধুর কাছে হৃষীকেশের সাধুদের তিতিক্ষার কথা বলছিলেন—"হৃষীকেশের কোন কোন সাধু শীত-গ্রীষ্মে মাত্র কৌপীন পরে থাকেন, কোন কোন সাধু গ্রীষ্মকালে সূর্যের দিকে চেয়ে থাকেন, আবার কোন সাধু শীতকালে গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে থাকেন। এভাবে ওখানকার সাধুরা তিতিক্ষা সাধনা করেন।" মহাপুরুষ মহারাজ উঠানে আমগাছের তলায় একখানা টুলের উপর বসে একজন ভক্তের সঙ্গে কথা বলছিলেন। ভক্তটি চলে যাওয়ার পরও তিনি কিছুক্ষণ ওখানে বসেছিলেন। তখন ঐ সাধুটির মুখে তিতিক্ষার কথা শুনতে পেয়ে তিনি উপরে উঠে যাবার সময় সাধুটিকে বললেন—"কি সব তিতিক্ষার কথা বলছ? তিতিক্ষা কাকে বলে জান?" সাধুটি উঠে দাঁড়ালেন, কোন উত্তর দিতে পারলেন না। তখন মহাপুরুষ মহারাজ বললেন—"জলে ডুবে থাকলে বা সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকলে বা খালি কৌপীন পরে থাকলেই তিতিক্ষা হয় না, তাকে তিতিক্ষা বলে না। স্তুতি-নিন্দা, মান-অপমান বা সুখ-দুঃখে উদাসীন হয়ে একমাত্র ভগবানে মন নিবিষ্ট করে সাধন-ভজনে ডুবে থাকাকেই তিতিক্ষা বলে। আসল কথা হলো শ্রীভগবানে মন রাখা; শুধু দৈহিক কৃচ্ছ্রসাধন তিতিক্ষা নয়।" পূজনীয় মহাপুরুষজী এ শিক্ষাপ্রদ উপদেশটি দিয়েই ধীরে ধীরে উপরে চলে গেলেন।

* * *

কখনো কখনো দেখা যেত রাজা মহারাজ ও মহাপুরুষ মহারাজ একসঙ্গে বসে কথা বলছেন। এভাবে কথা বলতে দেখলে ভয়ে আমরা তাঁদের কাছে যেতাম না। মনে করতাম মঠ-সংক্রান্ত কাজকর্মের কোন গোপনীয় কথাবার্তা হচ্ছে। একদিন

---

* পিছন থেকে বা একপাশ থেকে প্রণাম করতে নেই। যাঁকে প্রণাম করা হচ্ছে, তাঁর দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করতে হয়—এই শাস্ত্রের বিধান।

আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদী ফল মিষ্টি নিয়ে মহাপুরুষজীর ঘরে ঢুকেছি, তখন শুনতে পেলাম মহাপুরুষ মহারাজ বলছেন—"রাজা, ঠাকুরকে আমি এখনো দেখতে পাই, তাঁকে যদি দেখতে না পেতাম তাহলে আমার পক্ষে জীবন-ধারণ কষ্টকর হতো।" আমি তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে প্রসাদ যথাস্থানে রেখে চলে এলুম। আমি ও-কথার মর্ম ভাল করে বুঝতে না পারলেও আমার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠেছিল। সে কাঁপুনি অনেকক্ষণ ছিল।

আর একদিন আমি স্বামীজী মহারাজের ঘরে প্রণাম করতে গিয়ে শুনতে পেলাম রাজা মহারাজের ঘরে বসে দুজনে খুব জোরে হাসছেন। এমন উচ্চ হাসি আমি জীবনে কখনো শুনিনি। পরে জানতে পারলুম শ্রীশ্রীঠাকুর যেসব কথা বলে হাসিঠাট্টা করতেন, সেসব কথা বলে দুজনে খুব হাসছিলেন।

* * *

রাজা মহারাজ ও মহাপুরুষ মহারাজ দুজনেই পরস্পরকে খুব সমীহ করে চলতেন। বেলুড় গ্রামে একটি বাগানে নানাজাতীয় ফলফুলের গাছ ছিল। রাজা মহারাজ গাছপালা, বাগান ও বাগিচা খুব ভালবাসতেন। প্রশংসা শুনে আমাদের সঙ্গে নিয়ে তিনি ঐ বাগান দেখতে যাবেন স্থির করলেন। আমাদের বলে রাখলেন—"কাল বিকালে বাগান দেখতে যাব, তারকদা যেন জানতে না পারেন। তাঁকে এ বিষয় কিছু বলো না।" পরের দিন আমাদের দুজনকে সঙ্গে নিয়ে মহারাজ বাগান দেখে এলেন, কিন্তু বাগান দেখে তিনি ততটা খুশি হতে পারেননি। যেমনটি শুনেছিলেন তেমন কিছুই নয়। তিনি ফিরে এসে মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে দেখা হতেই বললেন—"আপনাকে না বলে, না জানিয়েই বেলুড় গ্রামে একটা বাগান দেখতে গিছলাম।" মহাপুরুষ মহারাজ বললেন—"তাতে আর কি হয়েছে, ভালই করেছ।" এভাবে দুজনেই হাসতে লাগলেন ও বাগান সম্বন্ধে নানা কথাবার্তা হলো।...

বেলুড় মঠে বাবুরাম মহারাজের আমল হতেই বহু ভক্ত অ-ভক্ত এসে প্রসাদ পেত। ক্রমশ তা এত বেড়ে গিয়েছিল যে, দুবার তিনবার রান্না করতে হতো। তাতেও কুলাত না। ভক্ত অপেক্ষা অ-ভক্তের সংখ্যাই বেশি। তারা সময়-অসময় বিবেচনা করত না। তাতে সকলেই বিশেষ অসুবিধা ভোগ করছিল এবং মঠের অন্যান্য কাজকর্মেরও বিশেষ অসুবিধা হতো। অবেলা পর্যন্ত লোকজন খাওয়াতে ব্যস্ত থাকতে হতো অনেককে। ব্রহ্মচারী জ্ঞান মহারাজ তখন লোকজন-খাওয়ানোর দেখাশুনা করতেন। স্বামী গোপালানন্দ ভাঁড়ারে কাজ করতেন। তাঁরাও নিজেদের অসুবিধা মহাপুরুষজীকে জানান। দুজনকেই তিনি ডেকে বলে দিলেন, "এখন থেকে যারা আগে খবর না দিয়ে প্রসাদ পেতে আসবে তাদের প্রসাদ দিও না। আর দেখ,

রাজাকে তোমরা এসব বলো না, রাজা যেন জানতে না পারেন।" রাজা মহারাজ তখন মঠে ছিলেন না। তিনি রামকৃষ্ণপুরে গিয়েছিলেন। কয়েকদিন পরে তিনি মঠে ফিরে এলেন। সরলতার প্রতিমূর্তি সদাশিব মহাপুরুষ মহারাজ নিজেই রাজা মহারাজের কাছে গিয়ে বললেন, "দেখ রাজা, তোমাকে না জানিয়েই, তোমার অনুমতি না নিয়েই এ রকম ব্যবস্থা করেছি।" রাজা মহারাজ বললেন—"আপনি তো ভালই করেছেন; আমিও ভাবছিলাম যে, এর কি ব্যবস্থা করা যায়। ছেলেদেরও কষ্ট হচ্ছিল আর বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে পড়েছিল।" এমনই ছিল উভয়ের মধ্যে অকৃত্রিম প্রেম ভালবাসা—যার তুলনা মিলে না!

* * *

ছয় বৎসর হলো আমি সঙ্ঘে যোগদান করেছি। কিন্তু তখন পর্যন্ত দীক্ষাগ্রহণ করার তেমন ইচ্ছা আমার মনে জাগেনি। সেবা-কাজেই আনন্দে দিন কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু ঠিক ঐ সময় আমার অন্তরে দীক্ষা নেওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগল। একদিন সময়মত রাজা মহারাজের পাদপদ্মে উপস্থিত হয়ে প্রণাম করে দীক্ষার প্রার্থনা জানালুম। তিনি কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, "দেখি, তোমার হাত। আমি হাত বের করে তাঁকে দেখাতেই তিনি আমার হাত ধরে দেখলেন, ওজন করে দেখলেন। একটু পরে বললেন—"যাও, হয়ে যাবে।" এ কৃপাবাণী শুনে আমি আনন্দে কেঁদে ফেললুম।

আমার দীক্ষা নেবার কথা শুনে মঠের কয়েকজন সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী আমাকে বললেন—"রাজা মহারাজের কাছে দীক্ষা পাওয়া খুব সৌভাগ্যের কথা। তিনি কিন্তু সহজে কাকেও দীক্ষা দেন না। জনকতক ব্রহ্মচারী বেশ কয়েক বৎসর ধরে অপেক্ষা করছে, এখনও পর্যন্ত তাদের দীক্ষা হয়নি। আর তোমার দীক্ষা এত সহজে হয়ে যাবে?" আমি মনে মনে ভাবলুম শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায়ই সব হয়।

আমি মহাপুরুষ মহারাজের কাছে গিয়ে আমার দীক্ষার কথা সব খুলে বললাম, সাধুদের কথাও বললাম। তিনি শুনে বললেন—"ওদের কথা তুমি শুনো না। রাজা মহারাজ যখন বলেছেন তখন তোমার হয়ে যাবে। আর কি! ভেবো না, তোমার দীক্ষা হয়ে যাবে।"

মহাপুরুষ মহারাজের এ আশীর্বাদ-বাণী পেয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলুম। কয়েকদিন পরে জানতে পারলুম যে, দীক্ষার দিন ধার্য হয়েছে। শুভ দিনে শুভ মুহূর্তে ধ্যান-ঘরে বসে রাজা মহারাজ পূজান্তে আমাকে যথাবিধি দীক্ষা দিলেন। জপ, ধ্যান, পূজা কিভাবে করতে হবে তাও সমস্তই বলে দিলেন। ঐদিন একজন সন্ন্যাসীরও দীক্ষা হলো। তিনি পূর্বে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন, পরে দীক্ষা নিলেন। তখনকার দিনে আগে থেকেই সকলের দীক্ষা হতো না।

দীক্ষান্তে আমি মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করতে গেলুম। তিনি সহাস্যবদনে বসে ছিলেন। আমি প্রণাম করতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন—"এখন ধীরে ধীরে জপ ধ্যান করতে আরম্ভ কর। রোজ করবে। নিত্য করবে—গুরুবাক্য যেন লঙ্ঘন না হয়। তবেই তো দীক্ষা নেওয়া সার্থক হবে, আনন্দ পাবে।" মহাপুরুষ মহারাজের এই হৃদয়স্পর্শী বাণী আমার হৃদয়ে গ্রথিত হয়ে গেল। দৃঢ় প্রত্যয় হলো যে, রাজা মহারাজ ও মহাপুরুষ মহারাজ দুজনেই যেন একতারে একসুরে বাঁধা। উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নেই, কোন পার্থক্য নেই।

আজ স্থূল শরীরে তাঁরা কেউ বিদ্যমান নেই। তাঁদের স্মৃতি ও তাঁদের বাণী আমার অন্তরের সম্পদ হয়ে রয়েছে। মহাপুরুষ মহারাজ বলতেন—"গুরুর শরীর চলে গেলেই গুরু চলে যান না। তিনি শিষ্যহৃদয়ে থাকেন, শিষ্য তা বুঝতে পারে। তিনি যাবেন কোথায়? শিষ্যহৃদয়ে থাকেন।" মহাপুরুষ মহারাজের এই মহতী বাণী যতই দিন যাচ্ছে ততই হৃদয়ঙ্গম করছি।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

মহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতিকথা*

স্বামী নিখিলানন্দ

১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মের ছুটিতে আমি জীবনে প্রথম বেলুড় মঠ দর্শন করি। তখন আমি ঢাকা কলেজের ছাত্র। তার কিছুদিন পূর্বে শীতকালে শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও প্রেমানন্দ মহারাজ ঢাকায় এসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে স্বামী শঙ্করানন্দ, অম্বিকানন্দ, মাধবানন্দ প্রমুখ মঠের অনেক প্রবীণ সাধুও ঢাকা গিয়েছিলেন। 'আগ্নেশ ভিলা' নামক একটি বাটিতে তাঁদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কোন সাক্ষাৎ সন্তানের দর্শন-লাভের সুযোগ সেই আমার জীবনে প্রথম ঘটে। আমার জীবনে সে একটি সন্ধিক্ষণ। আমি তখন বাংলার বিপ্লবী-দলের একজন সদস্য। পূজনীয় রাজা মহারাজ এবং বাবুরাম মহারাজ উভয়েই আমাকে বৈপ্লবিক কার্যাদি ছেড়ে স্বামীজীর নির্দিষ্ট ভাবে জীবন গঠন করতে উপদেশ দিয়েছিলেন।

আমার পিতা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম গৃহি-ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের শিষ্য

১ মূল ইংরেজি হতে অনূদিত।

ছিলেন। সুতরাং সাধারণভাবে ছেলেবেলা থেকেই আমি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন সম্বন্ধে কিছু কিছু চিন্তা করতুম। আজও মনে পড়ে—সে বারই বাবুরাম মহারাজকে আমি বলেছিলুম যে, আমি সংসারত্যাগ করে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগ দিতে চাই। আর তিনি বলেছিলেন—"আগে বি. এ. পাশ কর, তারপর সে-কথা ভাবা যাবে।" তিনি আরও বলেছিলেন, "সামনের গ্রীষ্মের ছুটিতে বেলুড় মঠে যেও।" তাঁর কথা আমি রক্ষা করেছিলুম এবং কয়েকটি দিন মঠে বাসও করেছিলুম। মঠে থাকাকালে তিনি আমাকে জয়রামবাটী যেতে আদেশ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, "যাও, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে এস গিয়ে।"

যতদূর মনে পড়ে পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ তখন মঠেই ছিলেন এবং তাঁর পুণ্য-দর্শনও সে বারই আমি লাভ করেছিলুম। তবে তাঁর সঙ্গে কোন কথা হয়েছিল কি না—তা আজ আর মনে নেই।...

ছুটির পরে ঢাকা ফিরে এলাম এবং ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে বিপ্লবী-দলের সঙ্গে যোগাযোগ-রক্ষার অপরাধে আমাকে গ্রেপ্তার করা হলো। তারপর প্রায় দু-বৎসর সুন্দরবন অঞ্চলের কাকদ্বীপে আমি অন্তরীণ ছিলুম এবং ১৯১৮ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের পর মুক্তিলাভ করি।

মুক্তিলাভের পর আমি কলকাতায় আসি এবং 'অমৃতবাজার পত্রিকা' অফিসে একটি চাকরি গ্রহণ করি। সে সময়ে প্রায়ই বেলুড় মঠে যেতুম। 'উদ্বোধনে' মায়ের বাড়িতে এবং 'বলরাম মন্দিরে'ও গিয়েছি এবং তখন মহাপুরুষ মহারাজকেও নিশ্চয়ই দর্শন করেছি। কিন্তু তাঁর সঙ্গে কোন বিশেষ কথাবার্তা হয়েছিল কিনা তা এখন আর মনে পড়ে না।

অন্তরীণ অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার পর আমি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির একজন সক্রিয় সদস্য হই এবং ১৯২০ সালের ডিসেম্বরে নাগপুর কংগ্রেসে যোগদান করি। মনে আছে, নাগপুর থেকে ফিরবার পথে কাশীধামে নেমেছিলুম স্বামী তুরীয়ানন্দজীকে প্রণাম করার জন্য। পরিচয়ের পর স্বামী তুরীয়ানন্দ আমাকে কংগ্রেস সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন এবং কংগ্রেসের যে মূল উদ্দেশ্য, সে উদ্দেশ্যটির সাধনকল্পে আমাকে কাজ করে যেতে বলেছিলেন। সে সময় মহাত্মা গান্ধী এবং তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের দিকে তুরীয়ানন্দ স্বামীর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। কথাপ্রসঙ্গে তিনি আমায় বলেছিলেন, আমি যেন ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনে পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করি। আর কতকটা অকস্মাৎ এবং অপ্রত্যাশিতভাবে একথাও বলেছিলেন যে, যদি তিনি তপস্যা দ্বারা কোন আত্মিক শক্তি অর্জন করে থাকেন, তবে সে শক্তি তিনি আমাকে ঐ কাজের জন্য দান করলেন।

তাঁর প্রধান সেবক ঐকথা শুনেছিলেন এবং পরে আমাকে বলেছিলেন, "ঐ ধরনের আশীর্বাদ স্বামী তুরীয়ানন্দের মতো সিদ্ধ মহাপুরুষের কাছ থেকে আর কেউ কখনো লাভ করেছে বলে আমি শুনিনি।"

কিন্তু দু-বৎসরকাল রাজনীতিক নেতৃবর্গের সংস্পর্শে থেকে ধীরে ধীরে আমার মোন মোহভঙ্গ হয়েছিল। আমি তাঁদের আন্তরিকতা সম্পর্কে ক্রমশ সন্দিহান হয়ে উঠেছিলুম। আমি দেখছিলুম যে, তাঁদের অধিকাংশই নাম ও প্রতিপত্তির আশায় ঘুরছেন, দেশের জন্য কোন ত্যাগ-স্বীকার করতে তাঁরা বাস্তবিক রাজি নন। ফলে, আমি মনে মনে এই সঙ্কল্প করেছিলুম যে, কিছুদিনের জন্য রাজনীতি থেকে অবসর নিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নূতন করে চিন্তা করব এবং সেজন্য মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের নির্জন পরিবেশে কিছুদিন বাস করে আসব। স্বামী মাধবানন্দ তখন মায়াবতী আশ্রমের প্রেসিডেন্ট ছিলেন; সুতরাং তাঁর অনুমতি চাইলুম। তিনিও অনুগ্রহ করে অনুমতি দিলেন। আর সে সঙ্গে কাশী থেকে রওনা হবার একটা তারিখও ঠিক করে দিলেন। সে তারিখের প্রায় একমাস পূর্বেই অবশ্য আমি কাশী পৌঁছলাম। কাশীতে সে বার যদিও আমি আমার মায়ের সঙ্গে একটি ভিন্ন বাড়িতে ছিলুম, তবু প্রত্যহই অদ্বৈত আশ্রমে ও সেবাশ্রমে যেতুম। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী তখন অদ্বৈত আশ্রমে ছিলেন। প্রতিদিন শেষরাত্রে আশ্রমের সাধুদের নিয়ে তিনি ধ্যানে বসতেন। আমার অশেষ সৌভাগ্যবশে সে ধ্যানচক্রে আমিও যোগ দিতুম। কখনো কখনো তিনি নানা ধর্মপ্রসঙ্গও করতেন। একদিন বলেছিলেন—মন্ত্রের অলৌকিক শক্তির কথা। বলেছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব সশরীরে থাকতে তাঁকে একটি মন্ত্র শিখিয়েছিলেন। মন্ত্রটি জপ করলে, যে-কোন ব্যক্তিকে অপ্রত্যাশিতভাবে নিজের সান্নিধ্যে আকর্ষণ করে নিয়ে আসা যায়। তারপর বহু বৎসর গিয়েছে, মহারাজ তখন বেলুড় মঠে। হঠাৎ একদিন তিনি শুনতে পেলেন যে, একজন বিশিষ্ট রাজন্য কলকাতায় এসেছেন। তিনি কোন কারণেই বেলুড় মঠে আসবেন এমন সম্ভাবনা ছিল না। সেজন্য হঠাৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর মনে হয়েছিল যে, ঐ রাজন্যপুরুষের উপর মন্ত্রটি প্রয়োগ করে তার ফল দেখতে হবে। ফলে দেখা গেল যে, মন্ত্রপ্রয়োগের অল্প কয়েক দিন পরেই ঐ মহারাজা তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারিকে মঠে পাঠিয়েছেন এ সংবাদটি জানাবার জন্য যে, মহারাজা নিজে একবার মঠে আসতে চান, এবং কখন এলে সুবিধা হবে—সেটি যেন তাঁকে জানানো হয়। পূজনীয় স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মন্ত্রটির শক্তি-পরীক্ষায় প্রসন্ন হয়েছিলেন, কিন্তু পরমুহূর্তেই তাঁর মনে হয়েছিল যে, ঠাকুর তাঁকে ঐ মন্ত্র অযথা প্রয়োগ করতে নিষেধ করে গেছেন; সুতরাং মন্ত্রটি প্রয়োগ করা বোধ হয় ঠিক হলো না।...

১৯২১ সালে আমি মায়াবতী যাই। এ সময়েই স্বামী মাধবানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি ইংরেজি জীবনচরিত রচনা করতে আমাকে আদেশ করেছিলেন। ঐ গ্রন্থ-রচনা করতে করতেই আমি রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। পুস্তকখানির পাণ্ডুলিপি ১৯২৩ সালের শরৎকালেই শেষ হয়েছিল। এরপর স্বামী মাধবানন্দের অনুরোধে আমি মঠে আসি স্বামী সারদানন্দ এবং মহাপুরুষ মহারাজের নিকট থেকে গ্রন্থখানির জন্য কিছু অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে।...

তারপর স্বামীজীর জন্মতিথির পুণ্যদিনে পূজ্যপাদ মহাপুরুষজী আমাকে ব্রহ্মচর্য দীক্ষাদানে ধন্য করেছিলেন। মঠের সঙ্গে আমার সংযোগ দীর্ঘদিনের ছিল না, সেজন্য স্বামী শুদ্ধানন্দ আমার ব্রহ্মচর্য-দীক্ষা সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে ব্রহ্মচর্য-দীক্ষাদান করেন। এর কিছুদিন পর আবার আমি কাশী চলে যাই। মহাপুরুষ মহারাজ তখন কাশী 'অদ্বৈত আশ্রমে' ছিলেন। সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ সময়েই তাঁর পূত সঙ্গলাভ করবার সুযোগ আমার জীবনে প্রথম এসেছিল। একদিন তাঁকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম—শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁকে কিভাবে দীক্ষাদান করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "ঠাকুর আমার জিহ্বায় কিছু লিখে দিয়েছিলেন।" আরও জিজ্ঞেস করেছিলুম ঠাকুরের দেহত্যাগের পূর্বেকার ঘটনা সম্পর্কে—কেন স্বামীজী বুদ্ধগয়ায় বোধিবৃক্ষের নিচে ধ্যান করবার সময় সহসা তাঁকে আলিঙ্গন করেছিলেন। মহাপুরুষ মহারাজ বলেছিলেন, "দেখ, স্বামীজী সেদিন গভীর ধ্যানে ডুবে গিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের অতীত গৌরব তাঁকে যেন প্রচণ্ডভাবে সেদিন আলোড়িত করেছিল। ভাবাবেগ রোধ করতে না পেরেই বোধ হয় তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন।" "কিন্তু আমরা শুনেছি আপনার মধ্যে বুদ্ধদেবের বিশেষ প্রকাশ প্রত্যক্ষ করেই তিনি আপনাকে আলিঙ্গন করেছিলেন।" যতদূর মনে পড়ে আমার একথায় তিনি কোন উত্তর দেননি এবং এমনভাবে নীরব হয়ে গেলেন যেন ঐ বিষয়ে কোন প্রসঙ্গ করতে চান না।

এইকালে সন্ন্যাস-দীক্ষাগ্রহণের জন্যও আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলুম। স্বামী শুদ্ধানন্দ মঠের নিয়মাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করতে চাইতেন, সুতরাং তিনি মহাপুরুষ মহারাজের কাছে আমার সন্ন্যাস-গ্রহণ সম্পর্কে প্রথম আপত্তি উত্থাপন করলেন। মহাপুরুষজী কিন্তু এই বলে সে আপত্তি এককালে বাতিল করে দিলেন যে, আমি মায়াবতীতে থাকি, অতএব আমার ব্যাপারটি স্বতন্ত্র। তাঁর অপার করুণায় সেদিন আমি যেন অভিভূত হয়ে গিয়েছিলুম। বস্তুত তিনি এক স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বিচার করেছিলেন। যুক্তির চাইতে ভাবের মূল্যই তাঁর কাছে বেশি

ছিল। এ প্রসঙ্গে অনেক পরের একটি ঘটনাও বিবৃত করছি। ঘটনাটি বেলুড় মঠে সংঘটিত হয়েছিল।

একদিন মঠের একজন বিশিষ্ট সাধু মিশনের ছোট একটি কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত জনৈক সন্ন্যাসীর তীব্র সমালোচনা করেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহাপুরুষজীকে অনুরোধ জানান। বেশ কিছুক্ষণ ধরে তিনি তাঁর বক্তব্য নিবেদন করলেন। মহাপুরুষ মহারাজ স্থিরভাবে সব কথা শুনলেন। তারপর ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলেন—ঐ সন্ন্যাসীটির কি কোন গুণ নেই? সে সম্বন্ধে তার পক্ষে অবশ্য দুটি-একটি কথা উল্লিখিত হলো। তাতেই মহাপুরুষ মহারাজের মুখখানা প্রসন্ন হয়ে উঠল। তিনি বললেন—"তা হলেই যথেষ্ট। সে ক্ষমালাভের যোগ্য অধিকারী।"

পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ, শরৎ মহারাজ প্রভৃতিকে দেখে কত সময়ই না আমার একথা মনে হয়েছে যে, এঁরা অসংখ্য দোষত্রুটি সত্ত্বেও সঙ্ঘের সবাইকে, সকল সন্ন্যাসীকেই সঙ্ঘের মধ্যে ধরে রাখবার জন্য কত আগ্রহান্বিত!

সে যাই হোক, আমি মহাপুরুষ মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাস-গ্রহণের অনুমতি পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলুম। কিন্তু এরই মধ্যে আর একটি কথা আমার মাথায় এল। আমার ইচ্ছা হলো শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথিতে পূজনীয় শরৎ মহারাজের কাছে সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করব। তিনিও তখন কাশীতে ছিলেন। কিন্তু তিনি বহু বৎসর পূর্বে দু-এক জনকে সন্ন্যাস-দীক্ষা দিয়ে দীর্ঘকাল আর কাউকে সন্ন্যাস দেননি। শুধু মঠ-মিশনের অধ্যক্ষই তখন সন্ন্যাস-দীক্ষা দিতেন। তথাপি আমার প্রার্থনা শুনে স্বামী সারদানন্দ আমাকে বলেছিলেন যে, মহাপুরুষ মহারাজ যখন আমায় ব্রহ্মচর্য-দীক্ষা দিয়েছেন, তখন তাঁর কাছ থেকেই আমার সন্ন্যাসও নেওয়া উচিত—তবে মহাপুরুষ মহারাজের অনুমোদন থাকলে তিনি আমাকে সন্ন্যাস দেবেন।

স্বভাবতই কতকটা সঙ্কোচের সঙ্গেই আমাকে মহাপুরুষ মহারাজের অনুমোদন প্রার্থনা করতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি কিছুমাত্র দ্বিধা না করে সঙ্গে সঙ্গেই অনুমতি দিয়েছিলেন। তিনি সত্যই মহাপ্রাণ ছিলেন, সত্যই মহাপুরুষ ছিলেন।...

১৯২৬ সালে মঠের প্রথম সন্ন্যাসি-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের সভাপতির ভাষণ ইংরেজি ভাষায় লিখবার জন্য আমাকে মঠে আহ্বান করা হয়। আমি তাঁর উপদেশ নির্দেশ ও আশীর্বাদ নিয়ে ভাষণটি রচনা করে প্রথমে স্বামী সারদানন্দকে পাঠ করে শুনিয়েছিলুম। তিনি সামান্য দু-একটি পরিবর্তনের উল্লেখ করে বলেছিলেন, "ভাষণটি একটু দীর্ঘ হয়েছে। তবে এদেশের শ্রোতৃবর্গের কাছে অবশ্য চলবে। একবার মহাপুরুষ মহারাজকে শুনিয়ে

নিও।" মহাপুরুষ মহারাজ ভাষণটি শুনে খুশি হয়েছিলেন এবং তাঁর অনুমোদনও জানিয়েছিলেন। আমারও মনে হয়েছিল তাঁরই আশীর্বাদে আমি ঐ ভাষণে তাঁর ভাব প্রকাশ করতে পেরেছিলুম।

স্থির হয়েছিল যে, বোস্টন কেন্দ্রের স্বামী পরমানন্দ ভাষণটি সম্মেলনে পাঠ করবেন। সম্মেলনে মহাপুরুষ মহারাজ এবং স্বামী সারদানন্দ মঞ্চের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। অনেক সাধু এবং কলকাতার বহু বিশিষ্ট ভক্ত নাগরিক সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন।

স্বামী পরমানন্দ যখন ভাষণটি পাঠ করছিলেন তখন মহাপুরুষ মহারাজ মধ্যে মধ্যে বলছিলেন—"ছোকরা বেশ লিখেছে।" সম্মেলনের শেষে অনেকে মহাপুরুষ মহারাজকে ভাষণটির অনবদ্যতার জন্য অভিনন্দন জানিয়েছিল। তিনি সহাস্যে বলেছিলেন, "ভাষণ লিখেছে দীনেশ, পড়ল বসন্ত। এর মধ্যে আমি এলাম কোথা থেকে হে?" এমনি ছিল তাঁর সরলতা, তাঁর নিরভিমান ভাব!

সম্মেলনের পর আমি প্রায় দু-বৎসর মঠে বাস করি। মধ্যে আট-নয় মাস অবশ্য কুমিল্লায় ডাঃ অঘোরনাথ ঘোষের অতিথিরূপে তাঁর চিকিৎসাধীন ছিলুম। তখন আমার অন্ত্রে ক্ষত হয়েছে বলে সন্দেহ করা হয়েছিল। এর মধ্যে সহসা স্বামী সারদানন্দ সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হন, আর সে সংবাদে আমিও কলকাতায় ফিরে আসি। স্বামী সারদানন্দের মহাসমাধির পর তাঁর মরদেহ শেষকৃত্যাদির জন্য বেলুড় মঠে আনা হয়েছিল। মঠের মূল বাড়ির উঠানে আমগাছটির তলায় যখন তাঁর দেহ নামানো হলো—তখন মহাপুরুষ মহারাজ তাঁর ঘর থেকে নিচে নেমে এলেন। তারপর যে দৃশ্যটি আমি দেখেছিলুম, সেটি জীবনে ভুলতে পারব না। মহাপুরুষ মহারাজ শরৎ মহারাজের মৃতদেহটির পাশে দাঁড়িয়েছেন, দুচোখ দিয়ে অশ্রু পড়ছে আর বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে তিনি অভিযোগ জানাচ্ছেন—"শরৎ, আমি তোমার চাইতে বয়সে বড়। আমাকে তুমি 'দাদা' বলে ডাকতে। তবে আমাকে ফেলে রেখে তুমি কেন চলে গেলে?" সে কী করুণ বিলাপ! তিনি মুক্ত-পুরুষ, সন্ন্যাসী—তথাপি সেদিন অন্তরের মর্মান্তিক বেদনা গোপন করেননি। আত্মিক-ধর্ম ও জীবনধর্মের যথার্থ সমন্বয় এক বিচিত্র ব্যাপারই বটে! সে সমন্বয় আমি পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছি, স্বামী সারদানন্দের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছি। এর আবেদন অসামান্য।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ সন্তানগণের মধ্যে শ্রদ্ধা ও প্রীতির এক অপূর্ব বন্ধন ছিল। একদিন আমি স্বামী সারদানন্দকে প্রশ্ন করেছিলুম যে, তাঁদের মধ্যে কোন কলহ কিংবা মতবিরোধ ছিল কিনা! তিনি বলেছিলেন, "অবশ্য ছিল। কিন্তু সেসব

কখনো আমাদের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারত না, কারণ শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের সকলকে প্রেমের এক অচ্ছেদ্য সম্পর্কে বেঁধে গিয়েছিলেন।"

স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ও স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের ঢাকা পরিভ্রমণের কথা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি। সে সময় আমরা ঢাকা কলেজের ছাত্রাবাসে স্বামী মাধবানন্দের একটি বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছিলুম। স্বামী প্রেমানন্দজীও সে সভায় কিছু বলতে সম্মত হয়েছিলেন। আমিই তাঁকে সভায় নিয়ে যাবার জন্য 'আগ্নিস ভিলা'তে গিয়েছিলুম। স্বামী প্রেমানন্দ তখন পূজনীয় ব্রহ্মানন্দ মহারাজের অনুমতি নেবার জন্য তাঁর কাছে গেলেন। আমিও সঙ্গে গেলুম। মহারাজ বারান্দায় পায়চারি করছিলেন। মহারাজের পাদস্পর্শ করে স্বামী প্রেমানন্দ বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন। মহারাজ অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পিছিয়ে গেলেন। আর পুনঃপুনঃ বলতে লাগলেন, "বাবুরামদা, এ কি কচ্ছ? ঠাকুরের কৃপায় সব ঠিক হয়ে যাবে। কেন তুমি ভাবছ?" কিন্তু বাবুরাম মহারাজ কোন নিষেধে কর্ণপাত করলেন না। পুনঃপুনঃ মহারাজকে প্রণাম করে তাঁর আশীর্বাদ ভিক্ষা করলেন। আহা! ঠাকুরের সন্তানদের পরস্পরের মধ্যে কি শ্রদ্ধা ও প্রীতিই না ছিল!

আর একবার, তখন আমি উদ্বোধনে ছিলুম। সে সময় স্বামী অভেদানন্দের জন্মদিনে কিছু ফল, মিষ্টি এবং একখানা নূতন কাপড় নিয়ে স্বামী সারদানন্দ তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন। আমাকে তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন। স্বামী অভেদানন্দ সে সময় কলকাতায় একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। মঠের সাধুগণ ক্বচিৎ কখনো তাঁকে দর্শন করতে যেতেন। কিন্তু স্বামী সারদানন্দের মহাপ্রাণতা ছিল অসাধারণ। তিনি খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে স্বামী অভেদানন্দকে সাদর অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। পরস্পরের প্রতি তাঁদের স্নেহ ও প্রীতি আমাকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল।

স্বামী সারদানন্দের দেহত্যাগের পর থেকেই মহাপুরুষ মহারাজের মধ্যে একটি বিশেষ পরিবর্তন এসেছিল। আগে মহাপুরুষ মহারাজ একজন গম্ভীর প্রকৃতির সাধু বলে সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন। মঠের সাধুরা অনেকেও যথাসম্ভব তাঁকে এড়িয়ে চলত। কিন্তু তখন থেকে তিনি অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ হয়ে উঠলেন এবং সকলের সঙ্গেই তাঁর সম্বন্ধ অনেকটা জননীর মতো কিংবা পিতামহীর মতো হয়ে উঠল। তিনি তখন থেকে অত্যন্ত ধৈর্য ও সহানুভূতির সঙ্গে সকলের অসুবিধা এবং অভিযোগের কথা শুনতেন, শুনে সান্ত্বনা দিতেন, উৎসাহ দিতেন। তখন সবাই স্বচ্ছন্দে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারত, তাঁর সান্নিধ্যে যেতে পারত। আমার মনে হয়েছিল যে, স্বামী সারদানন্দের দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে মহাপুরুষ মহারাজ যেন মঠ-মিশনের প্রতি অধিকতর দায়িত্ব ও মমত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। আর

তখন থেকে প্রায় সর্বদাই তিনি যেন সকলের গুণটুকুই শুধু খুব বড় করে প্রকাশ করতে চাইতেন আর দোষক্রটি যা কিছু সব মুছে দিতে প্রয়াসী হতেন।

বেলুড় মঠের তখনকার দিনে—এটা অনেকেই লক্ষ্য করেছেন কিভাবে মহাপুরুষ মহারাজ মঠস্থ প্রত্যেকের আনন্দ এবং সুখ-সুবিধার জন্য ব্যস্ত হতেন, যত্ন নিতেন। তিনি কারও অসুখ-বিসুখ হলে তার ঔষধ ও পথ্যের পয়সা জোগাতেন, এমন কি ফুটবল ম্যাচ দেখবার জন্যও কাউকে কাউকে টাকা দিয়েছেন, এমন দৃষ্টান্ত আছে। ঐ সময় আমি একবার পেটের গোলমালে খুব কষ্ট পাচ্ছিলুম। সেজন্য ডিম ও দুধ খাওয়ার ব্যবস্থা দিয়েছিলেন ডাক্তার। কিন্তু আমার কাছে নিজস্ব কোন টাকাকড়ি ছিল না। মঠের পক্ষেও এসবের জন্য টাকা দেয়া সম্ভব ছিল না। কাজেই আমি আর ডিম অথবা দুধ খেতে পারিনি। একদিন মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—আমি ডাক্তারের ব্যবস্থামত ঔষধ-পথ্য নিচ্ছি কিনা। আমি খানিকটা ইতস্তত করে বলেছিলুম যে, আমার হাতে কোন টাকাকড়ি নাই, কাজেই ডাক্তারের ব্যবস্থামত খাদ্য-সংগ্রহ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন—"আমি টাকা দেব।" কিন্তু আমি বলেছিলুম, "তা যেন দিলেন, কিন্তু পরে আপনি যখন থাকবেন না, কিংবা আমি যখন অন্য কোন কেন্দ্রে চলে যাব, তখন টাকা পাব কোথায়? কাজেই ডিম অথবা দুধের অভ্যাস না করাই ভাল।" তখন তিনি অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলেছিলেন—"যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিনই এসব সংগ্রহের ক্ষমতা তোমার থাকবে। কোন চিন্তা নেই।" তাঁর কথা আমার জীবনে আক্ষরিকভাবে সত্য হয়েছিল।

আর একদিনের কথা। আমি তখন মঠের দক্ষিণাংশে গেস্ট-হাউসে থাকি। বর্ষাকাল। রাত্রিতে খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা গেস্ট-হাউসে শুতে যেতুম। স্বভাবতই ওদিকটা তখন অন্ধকার থাকত। মহাপুরুষ মহারাজ সেটি লক্ষ্য করে আমাকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন—আমাদের কোন টর্চ আছে কিনা। টর্চ আমাদের ছিল না, অথচ অন্ধকারে সাপের ভয় ছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ একটি টর্চ কিনবার জন্য টাকা দিলেন—যাতে অন্ধকারে আমাদের অসুবিধা না হয়। এমনি আরও কত ঘটনাই না আছে।

মনে পড়ে, একদিন আমার একজন বন্ধুকে মহাপুরুষ মহারাজের কাছে নিয়ে গিয়েছিলুম তাঁকে প্রণাম করাবার উদ্দেশ্য নিয়ে। মহাপুরুষ মহারাজ পূর্বে কখনও তাকে দেখেননি। অথচ আমি তার পরিচয় দিতে শুরু করতেই তিনি তার গ্রাম, তার পরিবার সম্বন্ধে অনেক কিছু বললেন। এ বিষয়ে পূর্বে কিছু জানা তাঁর পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব ছিল। পরে আমি এ রহস্য সম্বন্ধে মহাপুরুষজীকে প্রশ্ন করেছিলুম।

তিনি বলেছিলেন, "এটা কোন কঠিন ব্যাপার নয়। সূক্ষ্ম মনই সকল চিন্তার আবাসভূমি। যদি মনের সে স্তরে তুমি প্রবেশ করতে পার, তবে যে কোন সংবাদ ইচ্ছামত জানতে পারবে।" "কিভাবে সে সূক্ষ্ম স্তরে প্রবেশ করা যায়?"—আমি প্রশ্ন করেছিলুম। "প্রথমে মনটিকে সম্পূর্ণ নির্বিষয় করে ফেলতে হয়, শূন্য করে নিতে হয়। তারপর বোঝা যায় সূক্ষ্ম মনে কি আছে।"—তিনি বললেন। আমি অবশ্য আপনমনে ভেবেছিলুম—ব্যাপারটি মহাপুরুষ মহারাজ কত সহজেই না বললেন, কিন্তু আমাদের পক্ষে সেটা কতই না কঠিন!

জীবনের শেষ বৎসরগুলিতেও মহাপুরুষ মহারাজ প্রতিদিনই শেষ রাত্রিতে সাড়ে তিনটায় শয্যাত্যাগ করতেন। একদিন তিনি আমাদের বলেছিলেন, "স্বামীজী যখন মঠ-প্রতিষ্ঠা করেন তখন তিনি এ নিয়ম করেছিলেন যে, মঠবাসী প্রত্যেককেই, তা তিনি বৃদ্ধই হোন আর যুবকই হোন, শেষরাত্রিতে ধ্যান করবার জন্য মন্দিরে যেতে হবে। কিন্তু এক সময় বেশ কিছুদিন আমি মন্দিরে যাইনি। স্বামীজী সেটা লক্ষ্য করে একদিন বলেছিলেন, 'তারকদা, আমি জানি তোমার নিজের জন্য ঐ শেষরাত্রে মন্দিরে গিয়ে ধ্যান করতে বসবার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু ছেলেদের সামনে উদাহরণ তো তোমাকে স্থাপন করতে হবে।'—সেই থেকে আমি ধ্যান করবার জন্য সকলের সঙ্গে ঠাকুরঘরে যেতুম। এখন অবশ্য বৃদ্ধ হয়েছি, শরীরও জীর্ণ হয়ে গেছে। ভাল করে হাঁটতে পারি না। তবু ঐ সময়ই ঘুম থেকে উঠি এবং ঠাকুরকে প্রণাম করে বিছানায় বসেই ধ্যান করি।"

সেকালে কোন কোন সময় আমার মনে হতো মহাপুরুষ মহারাজ যেন আমার কল্যাণের জন্য একটু বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত। একবার স্বামী শর্বানন্দ আমাকে দিল্লী কেন্দ্রের ভার দিয়ে সেখানে পাঠাতে চেয়েছিলেন। আর একবার স্বামী পরমানন্দ আমাকে তাঁর সঙ্গে বোস্টন নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দুবারই মহাপুরুষ মহারাজ আপত্তি করেছিলেন এবং আমাকে তাঁর কাছে মঠেই থাকতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

এবার মঠে থাকাকালে একটি ঘটনা ঘটে, সেটি আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। ডাঃ সুকুমার নাগ নামে এক ভদ্রলোক সৈন্য-বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ ডাক্তার ছিলেন। পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশের) এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে তাঁর জন্ম। তিনি এবং তাঁর তরুণী-পত্নী পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত প্রীতিপূর্ণ ছিলেন। একদিন স্টোভে রান্না করবার সময় অতর্কিতে পত্নীর শাড়িতে আগুন লাগে এবং সেই আগুনে দগ্ধ হয়েই তিনি মারা যান। যদিও ডাঃ নাগ তখন বাড়িতেই ছিলেন, কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা করেও তিনি স্ত্রীকে রক্ষা করতে পারেননি। স্ত্রী সন্তান-সম্ভবা ছিলেন।

সে নিদারুণ দুর্ঘটনা ডাঃ নাগকে একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত করে দিয়েছিল। তিনি প্রায় উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। এমন কি, শেষ পর্যন্ত তাঁকে তাঁর কলকাতার বাড়িতে একটি ঘরে তালা দিয়ে রাখতে হয়েছিল। তারপর একটু প্রকৃতিস্থ হলে তাঁর কয়েকজন আত্মীয় তাঁকে বেলুড় মঠে নিয়ে আসেন। আমিই তাঁকে ঠাকুরঘরে নিয়ে যাই। সেখানে তিনি শিশুর মতো কাঁদতে লাগলেন। তখন তাঁকে মহাপুরুষ মহারাজের কাছে নিয়ে গেলুম। সেখানেও তাঁর সে কি কান্না! মহাপুরুষ মহারাজ তাঁর বেদনার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। ডাঃ নাগ বললেন—"মহারাজ, আমরা পরস্পরকে বড় ভালবাসতুম। কখনো পরস্পরকে ছেড়ে দূরে থাকিনি। স্ত্রীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আহার-বিহারের জন্য অর্থব্যয়ে আমার কোন কার্পণ্য ছিল না। আজ আর সে বেঁচে নেই। কোথায় গেছে, কে তার দেখাশুনা করছে কে জানে? কেবলই মনে হয় তাকে দেখবার কেউ নেই। সে অত্যন্ত দুঃখে আছে। তাই আমার মনেও বেদনার শেষ নেই।" মহাপুরুষ মহারাজ সব শুনে কিছুক্ষণ পরে শান্তকণ্ঠে বললেন—"দেখ, যখনই তোমার স্ত্রীর কথা মনে হবে, তখনই ভাববে সে ভগবানের কোলটিতে শুয়ে আছে। ভগবানের চেয়ে অধিক যত্ন কি আর কেউ করতে পারে? না, তা পারে না।" কত সহজ সাধারণ উক্তি! আমরা তো কত সময়ই অন্যকে সান্ত্বনা দিতে এ জাতীয় কথা বলে থাকি। কিন্তু তাতে কোন স্থায়ী ফল দেখতে পাই না। কিন্তু এক্ষেত্রে এক বিচিত্র ফল দেখা গেল। ডাঃ নাগ সহসা শান্ত হয়ে গেলেন।

এ ঘটনার কিছুদিন পরেই আমি মায়াবতী চলে যাই এবং ডাঃ নাগও তারপরই মায়াবতী যান। তখন তিনি স্বাভাবিক মানুষ। তাঁর উন্মাদ অস্বাভাবিক অবস্থা সম্পূর্ণ কেটে গেছে। একদিন কথাপ্রসঙ্গে তিনি আমাকে বলেছিলেন—"মহাপুরুষ মহারাজের সেদিনের কথাগুলি আমার মধ্যে এক অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করেছিল। একথা অনস্বীকার্য যে, আমি আমার স্ত্রীর মৃত্যুতে একটা বিরাট শূন্যতা বোধ করেছিলুম এবং তার নানা দৈহিক প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে আমার দুঃখের অবধি ছিল না। কিন্তু এছাড়াও আমার দুঃখের মধ্যে আরও একটি বস্তু নিহিত ছিল। আমাদের বিবাহ খুব বেশি দিন হয়নি এবং স্বতই আমার স্ত্রীর সাহচর্য আমার কাছে একটি বিশেষ কামনার বিষয় ছিল। সুতরাং তার মৃত্যুতে সেদিক দিয়েও আমি বিশেষ শোকার্ত হয়েছিলুম। এখন মহাপুরুষ মহারাজের উপদেশে পরলোকগত পত্নীকে ভগবানের সঙ্গে সংযুক্ত করে তার সঙ্গে আমার দৈহিক সম্পর্কের যেসব স্মৃতি ছিল, সেসব আমি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছি। আজকাল যখনই তার কথা মনে হয়, তখনই ভাবি সে ভগবানের কোলে শুয়ে আছে। আর আমার সমস্ত মন সমুদয় জাগতিকতার ঊর্ধ্বে উঠে প্রশান্তিতে ভরে যায়।"...

১৯২৯ সনে আমি মহীশূরে যাই এবং ভি. সুব্রহ্মণিয়ম আইয়ারের শিক্ষকতায় মাণ্ডূক্য উপনিষদ্ পাঠ করতে শুরু করি। সে সময় একজন আমেরিকান মিশনারি ডাক্তার আমার আন্ত্রিক ক্ষতের জন্য অস্ত্রোপচার করতে চান। আমাকে হাসপাতালে ভরতি করা হয় এবং অস্ত্রোপচারের দিনও ঠিক হয়ে যায়! অস্ত্রোপচারের পূর্ব রাত্রে নার্স যাবতীয় জিনিসপত্র ঠিক করে রাখেন। পরদিন অতি প্রত্যুষে আমাকে অস্ত্রোপচারের কক্ষে নিয়ে যাবার মুহূর্তটিতে স্বামী অমৃতেশ্বরানন্দ সরাসরি মাদ্রাজ থেকে হাসপাতালে এসে উপস্থিত। তাঁর হাতে মহাপুরুষ মহারাজের একখানা টেলিগ্রাম। টেলিগ্রামে নির্দেশ ছিল—অমৃতেশ্বরানন্দ যেন মুহূর্ত বিলম্ব না করে মহীশূর যায় এবং আমার অস্ত্রোপচার বন্ধ করে। আরও ছিল, যদি অস্ত্রোপচার একান্তই করতে হয় তবে আমেরিকায় করা হবে। ফলে, অস্ত্রোপচার বন্ধ হলো। আমেরিকান চিকিৎসকটি অবশ্য নিরাশ হয়েছিলেন, কিন্তু তখন আর কিছুই করণীয় ছিল না। আমরা অনেক ঘটনায় দেখেছি—মহাপুরুষজী বাক্‌সিদ্ধ ছিলেন, আমার অপারেশনও অনেক পরে আমেরিকায় হয়েছিল।

তারপর কয়েক বৎসর অতীত হলো, আমেরিকা যাত্রার পূর্বে ১৯৩১ সনে আমি বেলুড় মঠে এলাম। যাত্রার দিন অপরাহ্ণে মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করবার জন্য এবং নূতন কর্মভার গ্রহণ করবার মুখে তাঁর আশীর্বাদলাভের জন্য তাঁর ঘরে গিয়েছিলুম। মহাপুরুষজী তখন আংশিক পক্ষাঘাতে অশক্ত। অপরের সাহায্য ছাড়া বিছানা থেকে চেয়ারে বসতে পারতেন না। তাঁর কথাও অনেকটা অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তিনি একখানি চেয়ারে বসেছিলেন। আমি তাঁর পাদমূলে সাষ্টাঙ্গ প্রণতি জানালাম, তারপর যখন মাথা তুললুম তখন মনে হলো তিনি যেন চেয়ার থেকে উঠতে চাইছেন। আমি তাঁকে বসে থাকতে প্রার্থনা জানালুম। কিন্তু তিনি কোন প্রকারে উঠে দাঁড়ালেন এবং আমার পিঠে চাপড় দিয়ে বললেন—"যা ব্যাটা, তুই দিগ্বিজয়ী হবি। যেখানে যাবি সেখানেই তোর জয় হবে। আমি সর্বদা তোর সঙ্গে সঙ্গে থাকব। এমন কি তুই নরকে গেলেও দেখতে পাবি আমি তোর পাশে রয়েছি।" আমার দুচোখ জলে ভরে গেল। স্থূল শরীরে সেই তাঁকে আমার শেষ দর্শন। এ জীবনে আর দেখা হয়নি।

আজ কতকাল পরে যখনই শুভানুধ্যায়ী বন্ধুজনের মুখে কোন প্রশংসা বা অভিনন্দন লাভ করি তখনই আমি মনে মনে ভাবি—"এরা জানে না আমার কর্মের যে সাফল্য তার শক্তি-উৎস কোথায়।" বস্তুত তাঁর জীবিতকালে তিনি আমাকে যে আশীর্বাদ করেছিলেন—আমার সাফল্যের দিনগুলিতে সেই আশীর্বাদই আমাকে সংযত থাকতে সাহায্য করেছে। আবার দুঃখ নিরাশার দিনেও সেই আশীর্বাদই

আমার মধ্যে শক্তি জুগিয়েছে, অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। আজও প্রায় সর্বক্ষণই আমার মনে হয় তিনি যেন আমার পার্শ্বেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

তাঁর গভীর আধ্যাত্মিকতার পরিমাপ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আধ্যাত্মিক অনুভূতি থেকে যখন তিনি কোন কথা বলতেন তখন সেসব কথার অর্থও আমি যথাযথ ধরতে পারতুম না। সিংহের ভাষা সিংহের পক্ষেই বোঝা সম্ভব, মোরগের পক্ষে নয়।

তাঁকে কখনো কোন আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছি বলেও মনে পড়ে না। তিনি নিজে পণ্ডিত বা দার্শনিক বলে কখনো দাবি করতেন না। ভক্তদের তিনি যা বলতেন বা যেসব নির্দেশ ও উপদেশ দিতেন সবই স্বকীয় উপলব্ধি-প্রসূত। তাঁর ভাষা ছিল সরল ও সহজ। আর তাঁর অখণ্ড বিশ্বাস এই ছিল যে, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের হাতের যন্ত্রমাত্র, তাঁরই ইচ্ছায় জীবনের সব কাজ, সব চিন্তা ও বাক্য নিয়ন্ত্রিত। অহং-বুদ্ধির লেশও তাঁর মধ্যে ছিল না। একদিন এই বহু বিতর্কিত প্রশ্নটি তাঁকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম—"শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আশ্রয়ে যারা এসেছে, এ জন্মই তাদের শেষ জন্ম—কথাটি কি সত্য?" উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে, সত্য বলেই তাঁরও বিশ্বাস। আমি তর্ক উত্থাপন করে বলেছিলাম যে, শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে নির্বাসনা না হলে পুনর্জন্ম এড়ানো যায় না। আর নির্বিকল্প সমাধি-যোগে প্রত্যক্ষ ব্রহ্মদর্শন না হলে নির্বাসনাও হওয়া সম্ভব নয়। তবে এটি সত্য হবে কিভাবে? মহাপুরুষ মহারাজ তখন বলেছিলেন, "দেখ, আমি পণ্ডিত নই, শাস্ত্রও আমি জানি না। কিন্তু পুনর্জন্মের হেতু কি বল দেখি? অপূর্ণ বাসনাই কি তার হেতু নয়?" আমি বলেছিলুম, "আজ্ঞে—হ্যাঁ, তা তো বটেই।" "তবে কল্পনা কর, তোমার মৃত্যুক্ষণটিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তোমার সামনে উপস্থিত হয়েছেন এবং প্রশ্ন করেছেন—তোমার এমন কোন অপূর্ণ কামনা রয়েছে কিনা যার জন্য আবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতে চাও। তখন তুমি তাঁকে কি বলবে?" আমি বলেছিলুম—"বলব, আমার এমন অপূর্ণ বাসনা আছে বলে মনে হয় না, যার জন্য আবার পৃথিবীতে আসতে হবে।" "তবে? তাহলে এই তো তোমার শেষ জন্ম। মৃত্যু সময়ে তাঁর দর্শন হলে এ নির্বাসনার ভাবটি প্রভুর কৃপায়ই লাভ হয়ে থাকে।"—এ উত্তর দিয়েছিলেন মহাপুরুষজী।...

আর একবার দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর কুমিল্লা থেকে ফিরে এসে মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করে কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলুম যে, আধ্যাত্মিক জীবনে আমার কোন উন্নতিই হচ্ছে না। "একবারেই কিছু হচ্ছে না?"—জিজ্ঞেস করেছিলেন মহাপুরুষ মহারাজ। "অন্তত আমি তো বুঝতে পারছি না।"..."দেখ, বাবা, তুমি হয়তো নিজের

আশানুরূপ উন্নতি অনুভব করতে পারছ না এবং সেজন্যই আমাকে কথাটি বলছ। কিন্তু আমি একটা কথা তোমাকে বলছি, অনেক দিন পর আমাকে দেখে তোমার আনন্দ হচ্ছে নিশ্চয়। কি বল?" "তা তো বটেই, মহারাজ!"—আমি উত্তর দিয়েছিলুম। তিনি বলেছিলেন, "আমিও তোমাকে দেখে খুব খুশি হয়েছি। এ পারস্পরিক আকর্ষণের হেতু কি? তোমার আমার মধ্যে তো কোন জাগতিক সম্বন্ধ নেই। তুমি আমাকে দেখে আনন্দিত হয়েছ, কারণ তুমি ভগবানকে ভালবাস। আমিও খুশি হয়েছি, কারণ আমিও ভগবানকে ভালবাসি। এ ভগবৎ-প্রেম আমাদের উভয়কে এক অপার্থিব বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। এরই জন্য আমরা পরস্পরকে দেখে খুশি হই, আনন্দলাভ করি। তুমি যখন এখানে ছিলে না, তখন তোমার অভাব আমি বোধ করতাম, তুমিও নিশ্চয় আমার অভাব বোধ করতে। এ অপার্থিব ভগবৎ-প্রেমই আধ্যাত্মিক উন্নতির অব্যর্থ প্রমাণ। আর প্রমাণের প্রয়োজন কি?"

মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ-স্মৃতিকথা

স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পার্ষদ ও লীলাসহচর মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের স্মৃতিকথা লেখার সুযোগে আমার সন্ন্যাস-গুরু এবং জীবনপথের আলোকস্তম্ভ-স্বরূপ প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষজীর অনুধ্যান করতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।

খুব সম্ভব ১৯১১ সনের ডিসেম্বর মাসে আমি যখন দ্বিতীয়বার বেলুড় মঠে যাই তখন পূজ্যপাদ মহাপুরুষজীর প্রথম দর্শনলাভ করি। শেষ দর্শনলাভ হয় ১৯৩৩ সনের আগস্ট মাসে বেলুড় মঠেই, তখন তিনি পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী, বাক্শক্তিরহিত এবং তাঁর দক্ষিণাঙ্গ অবশ। সেবার গ্রীষ্মকালে আমি আমাদের সংঘের তিনজন সন্ন্যাসিভ্রাতার সঙ্গে পুণ্যতীর্থ গঙ্গোত্রী, গোমুখী ও যমুনোত্রী দর্শনে গিয়েছিলাম। উত্তরাখণ্ডে অবস্থানকালে মহাপুরুষজীর নিদারুণ ব্যাধির সংবাদ পাই। তার পূর্বেই আমাদের উত্তরকাশী হয়ে গঙ্গোত্রী যাত্রার সংকল্প স্থির হয়ে গিয়েছিল। কাজেই যাত্রাশেষে যতশীঘ্র সম্ভব আমি ৺কাশীধাম হয়ে বেলুড় মঠে মহাপুরুষজীর শ্রীচরণ-সকাশে উপস্থিত হই। প্রণিপাতান্তে গোমুখীর পুণ্যোদক ও তৎপ্রদেশের ভূর্জপত্রবৃক্ষের বৃহৎ বল্কল (যাহা পূর্বে ভূর্জপত্ররূপে পাণ্ডুলিপির জন্য ব্যবহৃত হতো) তাঁকে দেখাতেই

তিনি মৌন-প্রসন্নবদনে সকরুণ দৃষ্টিতে আমাকে দেখতে লাগলেন এবং বাম হাতটি সঞ্চালন করে আশীর্বাদ জানালেন। তারপর সেবকের সাহায্যে গোমুখীর জলের শিশি মস্তকে ধারণ করে কিঞ্চিৎ জল গ্রহণ করলেন। গঙ্গাজল এবং দেবদেবীর নির্মাল্য ও প্রসাদের প্রতি মহাপুরুষজীর কি ভক্তি-বিশ্বাসই ছিল! সে সময় পূজ্যপাদ স্বামী অখণ্ডানন্দজী (গঙ্গাধর মহারাজ) বেলুড় মঠে ছিলেন। তিনিও একশিশি গোমুখীর জল এবং একখণ্ড ভূর্জপত্র পেয়ে আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন।

* * *

১৯১১ সনের ডিসেম্বর হতে ১৯৩৩ সনের আগস্ট পর্যন্ত বাইশ বৎসরের অধিককাল বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন স্থানে—যথা বেলুড় মঠ, ৺দক্ষিণেশ্বর, বলরাম মন্দির, ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও তৎসংশ্লিষ্ট গৌরাবাস এবং কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমে—মহাপুরুষজীর শ্রীচরণদর্শনের সৌভাগ্য আমার হয়। আমি নিজে যা দেখেছি এবং তাঁর শ্রীমুখ হতে যা শুনেছি তাই যথাসম্ভব বিবৃত করা এই নিবন্ধের লক্ষ্য।

১৯১১ সনের ডিসেম্বর মাসে আমি যেদিন দ্বিতীয়বার বেলুড় মঠে যাই, সেদিন রাজা মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দজী) সেখানে ছিলেন। স্বামী প্রেমানন্দজী (বাবুরাম মহারাজ) তো ছিলেনই। এর প্রায় দু-বৎসর পূর্বে আমি তাঁদের দুজনের প্রথম দর্শনলাভে কৃতার্থ হই। প্রথমাবধি রাজা মহারাজের সকরুণ দৃষ্টি, সস্নেহ ব্যবহার এবং সুমিষ্ট বাক্যে তাঁর প্রতি আমি অন্তরে গভীর আকর্ষণ অনুভব করতাম। বলতে কি, প্রথম দিন—১৯১০ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে সরস্বতীপূজার দিন বেলুড় মঠে ঢুকেই প্রথম পূজ্যপাদ রাজা মহারাজের দর্শন পেয়েছিলাম। কাজেই প্রায় দু-বৎসর পর তাঁর পুনর্দর্শনান্তে যথাসম্ভব তাঁর কাছে কাছেই থাকতে চেষ্টা করতাম। মহাপুরুষজীর দর্শনলাভ করেও তাঁর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিইনি।

মহাপুরুষজীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার সুযোগ উপস্থিত হয়—বেলুড় মঠে ১৯১৬ সনের গ্রীষ্মকালে। এর কয়েকমাস মাত্র পূর্বে তিনি বেলুড় মঠে এসেছেন, অনেককাল আলমোড়া, ৺কাশী ও অন্যান্য স্থানে অবস্থানের পর। কাজেই কয়েক বৎসর বেলুড় মঠে তাঁর দর্শনলাভ সম্ভবপর হয়নি। মঠে ফিরবার কিছুদিন পর হতে তিনি পূজনীয় বাবুরাম মহারাজের পীড়িতাবস্থায় মঠের তত্ত্বাবধান করতে থাকেন। তখন মঠের পুস্তকাগার (Library) আদি বাড়ির দ্বিতলে স্বামীজীর ঘরের পশ্চিমদিকের বড় ঘরে ছিল। ব্রহ্মচারী নগেন তখন পুস্তকাগারের গ্রন্থাগারিক ছিলেন। স্বামী বাসুদেবানন্দ অনেক সময় লাইব্রেরি ঘরে বসে তাঁর সঙ্গে কাজ করতেন। ঘরে চুনকামের সময় বা অন্য কোন কারণে বইগুলি বড় বিশৃঙ্খল হয়ে

গিয়েছিল। ব্রহ্মচারী নগেন আমাকে সমস্ত বই Catalogue-এর সঙ্গে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখতে বলেন। আমি বেশ যত্নের সঙ্গে দু-তিন দিনের মধ্যে কাজটি সম্পন্ন করে বই-এর অবস্থা সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিই। এই সামান্য কাজে মহাপুরুষজী খুশি হয়ে আমাকে বলেন—"আহা, তোমার দ্বারা মঠের একটি বড় কাজ হয়ে গেল।" তাঁর প্রসন্নতার কথা স্মরণ হলে তাঁকে 'আশুতোষ' বলেই মনে হয়।

সে সময় রোজ বিকেলে মহাপুরুষজী গঙ্গার ধারে জমিতে পাদচারণ করতেন। বেড়াবার সময় তাঁর পদক্ষেপ ও চলনভঙ্গি আমার কাছে রাজন্যোচিত বলে মনে হতো। প্রতিবার ফিরবার সময় তিনি স্কন্ধদেশ যেভাবে আবর্তিত করতেন তাতে বীরত্বের ভাব ফুটে উঠত। কোন কোন দিন আমি যথোচিত ব্যবধানে মহাপুরুষজীর অনুগমন করতাম। একদিন একটি নবাগত যুবককে দেখে বজ্রগম্ভীরস্বরে তিনি বললেন, "Remember, you are still under trial.—মনে রেখো এখনও তোমার পরীক্ষা চলছে।" ছেলেটি ফরিদপুর হতে সাধু হবার সঙ্কল্প নিয়ে মঠে এসেছিল, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই কর্তৃপক্ষের আদেশে তাকে মঠত্যাগ করে গৃহে ফিরে যেতে হয়।

* * *

একদিন বেড়াবার সময় আমি মহাপুরুষজীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—"আচ্ছা মহারাজ! কেউ কেউ শ্রীশ্রীমায়ের কাছ থেকে দীক্ষা নেয়, কেউ কেউ মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) কাছে থেকে দীক্ষা নেয়। এতে কোন প্রভেদ আছে কি?" তদুত্তরে তিনি বলেন, "না, আমি তো কোন প্রভেদ দেখি না—একই গঙ্গার জল যেন দুটি নলের ভিতর দিয়ে আসছে। একই ঠাকুরের শক্তি, ঠাকুরের কৃপা মা ও মহারাজের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। একই বস্তু দুই আধারে। আর দেখ, 'দীক্ষা নেয়'—এ তুমি কি বলছ? দীক্ষা পায়, দীক্ষা পায়, দীক্ষা পায়।" শোনামাত্র আমার যেন দীক্ষা সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি খুলে গেল। একটি মহাসমস্যার সমাধান হলো।

মঠের পুরানো রান্নাঘরের পাশের ভোজনাগারে একদিন মধ্যাহ্নে পঙক্তি ভোজনের সময় স্বামী বাসুদেবানন্দ মহাপুরুষজীকে জিজ্ঞেস করেন—"শুনেছি স্বামীজী আপনাকে 'মহাপুরুষ' আখ্যা দেন। তা কখন এবং কি সূত্রে?" মহাপুরুষজী কোন উত্তর না দিয়ে গম্ভীরভাবে অবস্থান করেন। তখন অন্য একটি সাধু বলেন—"আমরা শুনেছি যে ঠাকুরের শরীর যাবার কয়েকমাস পূর্বে স্বামীজী, আপনি ও কালী মহারাজ (স্বামী অভেদানন্দ) ৺বোধগয়ায় যান। সেখানে বোধিবৃক্ষের নিচে যখন রাত্রিতে আপনারা ধ্যানে নিবিষ্ট ছিলেন, তখন স্বামীজী বুদ্ধদেবের ভাবে আবিষ্ট হয়ে তাঁর আবির্ভাব অনুভব করেন এবং বুদ্ধদেবকে আপনার মধ্যে অন্তর্হিত

হতে দেখেন। সে অবধি তিনি আপনাকে 'মহাপুরুষ' নামে অভিহিত করেন।" তখন মহাপুরুষজী চুপ করে ছিলেন। পরে গম্ভীরভাবে বলেন, "তা হতে পারে অথবা অন্য কারণেও হবে।" এই ঘটনায় আমার ধারণা হয় যে, 'মহাপুরুষ' আখ্যা তাঁর নিকট অতি অকিঞ্চিৎকর। এর কারণ-গবেষণার কোন মূল্য আছে বলে তিনি মনে করেন না অথবা এমনও হতে পারে—যে কারণে স্বামীজী তাঁকে 'মহাপুরুষ' নামে অভিহিত করেন, তা তিনি নিজে প্রকাশ করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। আমরা যতদূর জানি—মহাপুরুষজী যৌবনে অবস্থা-বিপাকে সস্ত্রীক বাস করেও শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ আশীর্বাদে অখণ্ড-ব্রহ্মচর্যপালনে সমর্থ হয়েছিলেন—একথা শোনামাত্র স্বামীজী তাঁকে উক্ত নামে অভিহিত করেন।...

একদিন একটি তুচ্ছ ঘটনায় তাঁর মহত্ত্ব ও নির্বিকারত্বের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। রাত্রে আহারাদির পর তিনি মঠের আদি-বাড়ির নিচের তলায় পুবদিকের বারান্দায় বড় বেঞ্চের উপর গঙ্গার দিকে মুখ করে বসে কথাবার্তা ও তামাক-সেবনের পর শোবার পূর্বে উঠানের উত্তর-পশ্চিমকোণে নির্দিষ্ট স্থানে শৌচে যান। সেখান হতে ভিজিটার্স-রুমের পাশ দিয়ে মন্দান্ধকারে যখন তিনি ফিরছিলেন, তখন একটি নবাগত যুবক ঘরের ভিতর থেকে হঠাৎ অতর্কিতে জানালা খুলে বাইরে থুথু ফেলে। সে তৎক্ষণাৎ অস্পষ্ট দেখতে পায় যে, সমস্ত নিষ্ঠীবন মহাপুরুষজীর শ্রীঅঙ্গে পড়েছে! মুহূর্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সে মহাপুরুষজীর শ্রীচরণে পতিত হয় এবং ক্ষমা ভিক্ষা করে। মহাপুরুষজী নির্বিকারচিত্তে হাতের কমণ্ডলু থেকে একটু জল নিয়ে অন্য হাত দিয়ে গায়ের কাপড় পরিষ্কার করতে করতে তাকে অভয় দিয়ে বলেন—"ও কিছুই নয়, ও কিছুই নয়। তুমি তো জানতে না! এতে কি হয়েছে! যাও, যাও।" তিনি এমন ভাব দেখালেন যে, ছেলেটির তেমন বড় কোন অপরাধ হয়নি যাতে ক্ষমা-প্রার্থনা আবশ্যক। ছেলেটি কিন্তু নিজের অপরাধ সহজে ভুলতে পারেনি। একমাত্র মহাপুরুষজীর অহেতুক কৃপার উপর নির্ভর করেই সে সান্ত্বনা লাভ করে।

মহাপুরুষজীর একটি স্বভাবসিদ্ধ গুণ ছিল—তিনি সকলকে বড় করে দেখতেন। তাঁর সংস্পর্শে এসে আমার এ ধারণা জন্মে যে, দোষের দিক দেখে লোক বিচার করা ক্ষুদ্র-পুরুষের স্বভাব আর গুণের দিক দেখে লোককে বিচার করা মহাপুরুষের স্বভাব। কারও সম্বন্ধে কোনরূপ অভিযোগে তিনি সহজে কর্ণপাত করতেন না। শুনলেও তাঁর মনে তা স্থান পেত না; এমন কি তার রেখাও পড়ত না। কখনো কখনো বলতেন—"না না, আমি জানি সে ভাল ছেলে।"...

রাজা মহারাজের আদেশে আমি আমার গর্ভধারিণী জননী যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন তাঁর সেবা বিশেষভাবে করেছি। ১৯২৪ সনে তাঁর দেহান্তে আমি সন্ন্যাস-

দীক্ষা প্রার্থনা করে মহাপুরুষজীকে পত্র লিখি। তিনি অবিলম্বে স্বহস্তলিখিত পত্রে আমাকে সন্ন্যাস দেবার ইচ্ছা জানান। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশত ১৯২৫ সনে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি-দিবসে আমার সন্ন্যাস-দীক্ষা না হওয়ায় তিনি আমাকে গোপবীত সগৈরিক ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করেন এবং পরে ১৯২৭ সনে পুণ্যক্ষেত্র কাশীধামে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি দিবসে সন্ন্যাসদীক্ষা দেন। মহাপুরুষজীর স্নেহশীলতার একটি দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করছি। একবার কয়েক বৎসর পরে আমি বেলুড় মঠে ফিরে সকালবেলা তাঁর শ্রীচরণদর্শনার্থ তাঁর ঘরে যাই। প্রণিপাতান্তে কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর আমার সামনেই তিনি মঠের ভাণ্ডারিকে ডেকে আমার জন্য নিয়মিত স্বাস্থ্যানুকূল আহার্যের ব্যবস্থা করেন।...

রাজা মহারাজ একবার কৌতুকচ্ছলে মহাপুরুষজীকে একখানি চিঠি লেখেন। ঘটনাটি সামান্য হলেও এতে তাঁদের উভয়ের মধ্যে যে কি মধুর ও নিবিড় প্রীতিপূর্ণ সম্বন্ধ ও সখ্যভাব ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়! ১৯১৭ সনে শীতের প্রারম্ভে বলরাম মন্দিরের বৈঠকখানা ঘরে রাজা মহারাজ আমাকে একদিন চিঠির কাগজ এবং কালি-কলম আনতে বলেন। তিনি ইংরেজিতে বলতে আরম্ভ করলে আমি লিখতে লাগলাম এবং মহারাজ মাঝে মাঝে আমাকে ইংরেজি সংশোধন করে নিতে বললেন। এক জায়গায় তিনি বলেছিলেন—"will be successful (সফল হবে)"। আমি তাঁর অনুমতি নিয়ে লিখলাম—"will be crowned with success (সাফল্যমণ্ডিত হবে)"। চিঠির শিরোনামা—To the Abbot, Belur Monastery (বেলুড় মঠের মোহন্ত মহারাজ সমীপেষু)। সে সময় মহাপুরুষজী বেলুড় মঠের অধ্যক্ষরূপে সেখানে ছিলেন। পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ বলরাম মন্দিরের পাশের ছোট ঘরে রোগশয্যায় শায়িত। চিঠির মর্ম এরূপ ছিল—আপনাদের মঠে নিশ্চয়ই খ্রিস্ট-উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। আমরা একদল সন্ন্যাসী (monks) ঐ উপলক্ষে মঠে আসছি। আপনাদের আতিথেয়তা সুপরিজ্ঞাত। উপাসনান্তে নিশ্চয়ই Christmas (খ্রিস্টমাস) পর্বের প্রথানুসারে পানভোজনের ব্যবস্থা থাকবে। সোপকরণ বিবিধ আমিষ আহার্যই আমাদের প্রিয়। ভূরিভোজনের আশায় আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনাদের উৎসব সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হোক—এই আমাদের অন্তরের ইচ্ছা।

চিঠি লেখা শেষ হলে স্বাক্ষরের জন্য মহারাজের হাতে দিলাম, কিন্তু তিনি নিজের নাম না লিখে 'Premananda' (প্রেমানন্দ) নামে সই করলেন এবং আমাকে বললেন, "বাবুরাম মহারাজকে চিঠি পড়ে শোনাও গিয়ে।" বাবুরাম মহারাজ চিঠি শুনে এবং তাঁর নাম জাল করা হয়েছে দেখে মুচকি হাসলেন। কিন্তু আর কিছু

বললেন না। এখানে এটা বিশেষ করে দেখার যে, বাবুরাম মহারাজ ও মহাপুরুষজী উভয়ে নিরামিষাশী ছিলেন।

পরে মহারাজ আমাকে বেলুড় মঠে গিয়ে চিঠিখানা মহাপুরুষজীর হাতে দিতে বললেন এবং তিনি যে পাঠিয়েছেন সেকথা জানাতে বারণ করলেন। মহাপুরুষজী চিঠিখানা পড়েই আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন—"মহারাজ পাঠিয়েছে, না?" আমি কিছু না বলে একটু মাথা নাড়লাম। মহাপুরুষজী বুঝলেন "মৌনং সম্মতিলক্ষণম্"।

* * *

মহাপুরুষজী সংঘের সাধুদের কি দৃষ্টিতে দেখতেন তার একটি দৃষ্টান্ত মনে পড়ছে। ১৯২৬ সনে বেলুড় মঠে সমগ্র রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মহাসম্মেলন (Convention) হয়। সভায় মহাপুরুষজী সভাপতিরূপে এবং স্বামী সারদানন্দ সম্পাদকরূপে অভিভাষণ দেন। আমেরিকা হতে স্বামী পরমানন্দ এসে মহাসম্মেলনে যোগ দেন। আমার যতটা মনে আছে, মহাসম্মেলনের পরে মে মাসে গভীর অমাবস্যা রাত্রিতে বেলুড় মঠে ৺কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম প্রহরে স্বামী ওঁকারানন্দ (অনঙ্গ মহারাজ) মহাপুরুষজীর অনুমতি নিয়ে পূজা আরম্ভ করেন। তন্ত্রধারকের বিশেষ সাহায্য না নিয়েই সমস্ত রাত একে একে তিনি সব পূজাই নিরবচ্ছিন্নভাবে সম্পন্ন করেন। সকালে মহাপুরুষজীকে দর্শন ও প্রণামান্তে আমি বলি, "অনঙ্গ মহারাজ পূজায় সিদ্ধহস্ত। সমস্ত রাত্রি একাসনে তন্ত্রধারকের সাহায্য না নিয়ে সকল পূজাই একাদিক্রমে অনুষ্ঠান করলেন। Very well-trained!" মহাপুরুষজী তখন হেসে বললেন, "শুধু এই জন্মে নয়, জন্ম-জন্মান্তরের সাধনার ফল। পূর্ব পূর্ব জন্মের সুকৃতি না থাকলে কেউ ঠাকুরের ঘরে আসতে পারে না। যারা ঠাকুরের দরজায় এসে জুটেছে, তাদের বিশেষ সুকৃতিমান বলে জানবে।"...

মহাপুরুষজী অত্যন্ত সারগ্রাহী ছিলেন। ১৯২৩ সনের প্রথমদিকে ঢাকার শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে অবস্থানকালে তিনি একদিন ফরাসগঞ্জ গৌরাবাসে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাপ্তাহিক অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। সেদিন সভায় আমার উপর কঠোপনিষদ্-পাঠের ভার ছিল। আমি বঙ্গানুবাদসহ নিম্নলিখিত শ্লোক দুটি পাঠ করি ঃ

আত্মানাং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিস্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ ॥ —(১/৩/৩-৪)

—আত্মাকে রথী এবং শরীরকে রথ বলে জানবে। বুদ্ধিকে সারথি এবং মনকে

লাগাম বলে জানবে। জ্ঞানিগণ ইন্দ্রিয়সমূহকে অশ্ব, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহকে অশ্বের বিচরণপথ বলে থাকেন এবং তাঁরা শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনসংযুক্ত আত্মাকে ভোক্তা বলে জানেন।

পাঠের পরে সামান্য ব্যাখ্যা ও আলোচনা হয়। মহাপুরুষজী চুপ করে শোনেন এবং পরে বলেন, "দেখ, আত্মা দেহাতীত, অজর, অমর, শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব—এটি ধারণা হলেই তো উপনিষদ্-পাঠের কাজ হয়ে গেল। তারপর সাধনভজন দ্বারা আত্মজ্ঞানলাভ—এই তো কথা!"...

মহাপুরুষজীর আহার-সংযম সেদিনই আমি লক্ষ্য করেছিলাম। গৌরাবাসে অধিবেশনের পর তাঁর নৈশভোজনের ব্যবস্থা ছিল। ভিতর বাড়িতে দোতলার বৈঠকখানা ঘরে শ্বেতপাথরে একটি বড় গোলাকার টেবিলের উপর বহুপ্রকার খাদ্য ছোট ছোট পাত্রে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। ওদিককার মেয়ে-ভক্তরা নানাবিধ অন্নব্যঞ্জন ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি নিজেরা তৈরি করে এনেছিলেন। মহাপুরুষজী একটি টেবিলে আহার করতে বসেন। একে একে সব রকম খাবার আঙ্গুল দিয়ে মাত্র স্পর্শ করে জিহ্বায় ছোঁয়ালেন এবং বার বার বললেন, "বেশ, বেশ, খুব সুস্বাদু! অতি উপাদেয়!" কিন্তু কোন খাবারই আর দ্বিতীয়বার আস্বাদন করলেন না। আমি যতটা জানি, তাঁর প্রতিদিনকার আহার্য ছিল প্রধানত পাঁচনের মতো নিরামিষ ঝোল ও সামান্য অন্ন এবং মিষ্টির মধ্যে একটু সন্দেশ।...

ঢাকা মঠে একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন, "সমাধিকালে ঠাকুরের মুখমণ্ডল আত্মজ্যোতি ও আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে যেত। নিত্যগোপালেরও ভাবসমাধি হতো, কিন্তু তাঁকে দেখে মনে হতো ভিতরে নিরানন্দ, যেন কত যন্ত্রণা!"...

ঢাকাতে অনেক দীক্ষাপ্রার্থীর আকুল আগ্রহে এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের অনুমতিক্রমে ও ঢাকা মঠাধ্যক্ষের বিশেষ অনুরোধে মহাপুরুষজী দীক্ষা দিতে সম্মত হন। কিন্তু দীক্ষা দেবার পূর্বে সংঘাধ্যক্ষ শ্রীমহারাজকে অনুমতির জন্য তিনি পত্র লেখেন। পত্রোত্তরে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ 'তার' করে সাগ্রহে মহাপুরুষজীকে দীক্ষা দেবার জন্য উৎসাহিত করেন। এর আগে মহাপুরুষজী কাকেও মন্ত্র-দীক্ষা দিতেন না। কদাচিৎ দু চার জনকে সাধন-ভজন সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছেন, আমি যতদূর জানি।

কিন্তু এর অল্প কিছুদিন পরেই মহাপুরুষজী তারযোগে শ্রীমহারাজের কঠিন পীড়ার সংবাদ পান। মহারাজের জন্য বিশেষ চিন্তিত হয়ে তিনি আর কালবিলম্ব না করে কলকাতা চলে আসেন এবং বলরাম মন্দিরে তাঁর রোগশয্যা-পার্শ্বে উপস্থিত হন। রাজা মহারাজের অন্তিমকাল পর্যন্ত তিনি সেখানে ছিলেন।...

১৯২৭ সনে ৺কাশী অদ্বৈতাশ্রমে শ্রীমহাপুরুষজীর জন্মতিথির দিন তাঁর বিধবা বোন (তিনি তখন ৺কাশীবাস করছিলেন) সেখানে এসে প্রায় সমস্ত দিন ছিলেন। খুব সম্ভব অদ্বৈতাশ্রমের তখনকার অধ্যক্ষ স্বামী নির্ভরানন্দ (চন্দ্রবাবা) তাঁকে আসতে বলেছিলেন। বোনের সঙ্গে কথাবার্তায় ও ব্যবহারে মহাপুরুষজীর কোন রকম বিশেষ প্রীতি, অভিনিবেশ, উপেক্ষা বা অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ পায়নি। মহাপুরুষজীর এই চিত্তসাম্য আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছিলাম। একথা যখন ভাবি তখন গীতার এই শ্লোকটি মনে পড়ে ঃ

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥ —(৫/১৯)

—অর্থাৎ, যাঁদের মন সাম্যে অবস্থিত, তাঁরা জীবিত অবস্থাতেই সংসার (জন্ম-মৃত্যুপ্রবাহ) জয় করেছেন। যেহেতু ব্রহ্ম সম ও নির্দোষ, সুতরাং তাঁরা ব্রহ্মে অবস্থিত।...মহাপুরুষজীর আদেশেই আমি দিল্লী আশ্রমের ভার নিয়ে পাঁচ বৎসর (১৯৩১-১৯৩৬) দিল্লীতে কাজ করেছিলাম। সেখানকার কাজে যা কিছু সাফল্য হয়েছিল তাও মহাপুরুষজীর আশীর্বাদের ফল বলেই আমার ধারণা।

মহাপুরুষজী ভগবানে আত্মসমর্পণের যেন প্রতিমূর্তি ছিলেন এবং তিনি ঠাকুরগতপ্রাণ ছিলেন। এটি তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে মনে হয়। একবার আমি গ্রীষ্মের সময় দিল্লী হতে মঠে এসেছি। সে সময় একজন প্রবীণ সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হওয়ায় তিনি আমাকে বলেন, "মহাপুরুষজীর ভিতর বর্তমানে অদ্ভুত শক্তির বিকাশ দেখা যাচ্ছে। তাঁর প্রবল আকর্ষণে দূর দূরান্তর হতে অনেক উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলা, এমন কি রাজা-রানী পর্যন্ত মঠে আসছে।" আমি অবাক হয়ে সব শুনলাম। এর পরেই আমি মহাপুরুষজীকে দর্শন করতে যাই। তখন তিনি মধ্যাহ্নভোজনের পর বিশ্রামান্তে আদি মঠ-বাড়ির উপরতলায় পূর্বদিকের বারান্দায় গঙ্গার দিকে মুখ করে একটি চেয়ারে বসেছিলেন। তাঁর পা দুখানি মেজেতে চটিজুতার উপরে ছিল। প্রণাম করার পর আমি মেজেতেই বসে তাঁকে দর্শন করতে লাগলাম। সেখানে তখন আর কেউ ছিলেন না। আমি কিছু না বলতেই মহাপুরুষজী আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—"দেখ, এই তো শরীরের অবস্থা! ভগ্নদেহ! একদিন ভাল তো দুদিন মন্দ। দেখ, এ নিয়েই ঠাকুর খেলছেন। আমাদের ঠাকুর পাকা খেলোয়াড়। কানাকড়ি দিয়ে (নিজের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে) বাজি মাত করেন।" আমি ভাবতে লাগলাম কানাকড়িই বটে! মহাপুরুষজী দেহমনপ্রাণ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে অর্পণ করে ঠাকুরময় হয়ে গিয়েছিলেন।

মহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতিকথা

স্বামী পবিত্রানন্দ

পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের প্রথম দর্শন কোথায় এবং কখন হয়েছিল, আমার তা ঠিক স্মরণ নেই। বোধ হয় ১৯১৯ সালে বেলুড় মঠে তাঁকে প্রথম দর্শন করি। ১৯১৯ সালের ২৫ অক্টোবর বিকালবেলা আমার বন্ধুদের তিন-চার জনের সঙ্গে আমি বেলুড় মঠে যাই, পরদিন শ্রীমহারাজের কাছে দীক্ষা নেবার আশায়।

সন্ধ্যারতির পর বাইরের লোকজন সকলেই চলে গিয়েছে। কিছু রাত্রি হয়েছে। পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ মঠের পূর্বদিকের বারান্দায় একটি বেঞ্চে বসেছিলেন। আমি ঐদিক দিয়ে যাচ্ছি। তিনি আমাকে দেখে বললেন, "এখন রাত্রি হয়েছে, এখনও যে তুমি মঠে আছ?" আমি উত্তর দিলাম, "আজ রাত্রিতে আমি মঠেই থাকব।" মঠে স্থানাভাবের জন্য তিনি প্রথমটায় একটু আপত্তি প্রকাশ করেছিলেন। পরে আমার বন্ধু এসে আমার পরিচয় দিয়ে রাজা মহারাজের কৃপাপ্রার্থী বলাতে মহাপুরুষ মহারাজ অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ করুণস্বরে আমাকে বলেন, "তোমরা কলেজে পড়, হোস্টেলে আরামে থাক। এখানে কিন্তু তোমার কষ্ট হবে।" আমি বললাম যে, আমার কোনই অসুবিধা হবে না। ঐ ঘটনাতে তাঁর স্নেহপ্রবণতা আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

পরদিন সকালবেলা রাজা মহারাজ আমাকে দীক্ষা দেন। দীক্ষালাভের পর আমি যখন মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করি তখন তিনি অত্যন্ত খুশি হন এবং আমাকে বিশেষভাবে আশীর্বাদ করেন। আমার দীক্ষার আগে বা পরেও একদিন সন্ধ্যার সময় 'উদ্বোধনে' শ্রীশ্রীমায়ের বাড়িতে মহাপুরুষ মহারাজকে দেখেছিলাম—সিঁড়ি দিয়ে তিনি উপরে উঠছেন শ্রীমাকে দর্শন করবার জন্য। তখন মায়ের শরীর খুব অসুস্থ, বাইরের কোন ভক্তকে মায়ের কাছে যেতে দেওয়া হয় না। মহাপুরুষ মহারাজ ধীরে ধীরে উপরে যাচ্ছিলেন, হাতে কি যেন রয়েছে—মনে হলো মাকে দেবার জন্য এনেছেন। তিনি কি অপরিসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধায় ভরপুর হয়ে উপরে উঠছিলেন। এখনও সে দৃশ্য মাঝে মাঝে আমার মনে লাগে।

* * *

১৯২১ সালের বড়দিনের সময় মঠে যোগদানের সংকল্প নিয়ে আমি ভুবনেশ্বরে শ্রীমহারাজের সঙ্গে দেখা করতে যাই। মহারাজ তখন দক্ষিণদেশ ভ্রমণের পর ভুবনেশ্বরে ছিলেন। ভুবনেশ্বর গিয়ে দেখি যে, মহাপুরুষ মহারাজও সেখানে রয়েছেন। তিনি আমাকে দেখে চিনতে পেরেছিলেন এবং আনন্দিত হয়েছিলেন।

ভুবনেশ্বরে পাঁচ-ছ দিন ছিলাম। যে কদিন ছিলাম, সুযোগ-সুবিধা পেলেই শ্রীমহারাজের সঙ্গে বেড়াতে যেতাম। তিনি সকাল বিকাল দুবেলাই বেড়াতেন। একদিন মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গেও বিকালে বেড়াতে গিয়েছিলাম। তিনি বোধ হয় শুধু বিকালেই বেড়াতে বেরুতেন। বেড়াবার সময় খুব নিঃসঙ্কোচে তাঁর সঙ্গে আলাপ করা যেত। তখন মহাত্মা গান্ধীর স্বাধীনতা-আন্দোলন খুব জোরে চলেছে। সমগ্র দেশব্যাপী উত্তেজনা। দলে দলে শত সহস্র লোক—ছেলে, যুবা, বৃদ্ধ সে আন্দোলনে যোগদান করছে। আমি মঠে যোগদান করতে ইচ্ছুক হলেও যারা স্বাধীনতা-আন্দোলনে যোগদান করছে তাদের প্রতি আমার খুব সহানুভূতি ছিল এবং স্বার্থত্যাগ, কষ্টস্বীকার এবং নির্ভরতার জন্য তাদের আমি মনে মনে খুব প্রশংসা করতাম। আমি যে পথে যেতে চাই তা কি সম্পূর্ণ ঠিক?—সে কথাও বোধ হয় মনের কোণে লুকিয়ে ছিল। তা পরিষ্কার করবার জন্য একদিন মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে আলাচনা করবার সুযোগ পেয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "সারাদেশ জুড়ে রাজনীতিক আন্দোলন চলছে, স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষকে এত ভালবাসতেন, কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন তাতে যোগদান করেন না বলে কেউ কেউ অভিযোগ করে।" একথা শুনে মহাপুরুষজী দাঁড়ালেন এবং আমার দিকে চেয়ে দৃঢ়স্বরে বললেন, "শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন—আমাদের অন্য পথ ধরে দেশের সেবা করতে হবে। রাজনীতিক আন্দোলনের পথের কথা তিনি আমাদের বলেননি। যদি তা বলতেন তবে আমরাও ঐ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তাম এবং তার জন্য Lloyd George, Winston Churchill কাকেও বিন্দুমাত্র ভয় করতাম না। কিন্তু তা তিনি আমাদের বলেননি।" কথাগুলি তিনি এত উদ্দীপনার সঙ্গে বললেন যে, তাঁর দেহও যেন স্ফীত হয়ে উঠেছিল বলে মনে হচ্ছিল। পরে অন্য কথাবার্তা হলো। আমার জন্য কোন্ পথ, সে প্রশ্নের আর বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা সন্দেহ রহিল না। ভুবনেশ্বর-বাসকালে একদিন সকালে আমি ছ-সাত মাইল দূরে—খণ্ডগিরি উদয়গিরি দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে খ্রিস্টীয় অষ্টম নবম শতকে বৌদ্ধ ও জৈন মঠ ছিল। অনেক সন্ন্যাসী সেখানে তপস্যা করেছেন। তাঁদের বাসস্থান—কতগুলি গুহা এখনও বিদ্যমান। ঐদিনই বিকালবেলা আমি মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে বেড়াতে যাই। তখন কথায় কথায় তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "খণ্ডগিরি উদয়গিরি তোমার

কেমন লাগল?” আমি উত্তরে বললাম, “সেখানে অনেক বৌদ্ধ ও জৈন সাধু ভগবানলাভের জন্য কত তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধন করেছেন, কত আশা-আকাঙ্ক্ষা তাঁদের মনকে আন্দোলিত করেছে! ঐসব আশা-আকাঙ্ক্ষা কি তাঁদের পূর্ণ হয়েছিল? যদি তা না হয়ে থাকে তবে তো কি দুঃখের বিষয়, কি শোচনীয় অবস্থা!” আমি যখন এসব কথা বলছিলাম মহাপুরুষ মহারাজ চুপ করে শুনছিলেন! একটু থেমে আমি বললাম, “পরে আমার এও মনে হয়েছে—এত লোক সেখানে তপস্যা করেছেন, তাঁদের মধ্যে নিশ্চয়ই কেউ কেউ বস্তুলাভ করেছেন।” আমার এ কথা শুনে মহাপুরুষ মহারাজ খুবই আনন্দিত হলেন। মুখে হাসির ছটা দেখা দিল, চক্ষু আনন্দ-বিস্ফারিত হলো, তিনি বললেন, “ঠিক, ঠিক বলেছ। নিশ্চয় কেউ কেউ সেখানে ভগবানকে লাভ করেছেন।”...

* * *

সুযোগ বুঝে একদিন শ্রীমহারাজকে আমার মঠে যোগদান করবার ইচ্ছা জানালাম। তিনি কোন আপত্তি করলেন না। একটু চুপ করে থেকে পরে খুব সহানুভূতির সঙ্গে আমায় বললেন, “দ্যাখ বাবা, তোর শরীর তত সবল নয়, সাধু-জীবনের কঠোরতা সহ্য করতে তোর বিশেষ কষ্ট হবে। তুই কিছু টাকা রোজগার করে তা সঙ্গে নিয়ে আয়, তাতে তোর সুবিধা হবে।” তা শুনে তৎক্ষণাৎ আমার মনে হলো—টাকা-পয়সা সঙ্গে নিয়ে এসে সাধু হওয়া আমার দ্বারা হবে না। কিন্তু রাজা মহারাজের কথার উপর আমি কিছু বলতে পারলাম না—বিশেষত এত স্নেহভরে তিনি ঐসব কথা বলেছিলেন বলে। পরে মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ হতে তাঁকে আমি সব খুলে বললাম। সব শুনে তিনি বললেন, “তুমি মহারাজকে ঐ কথা বল না কেন?” মহারাজকে ঐ সব কথা জানাতে তিনি বললেন, “আমি কলকাতা যাচ্ছি, আমি সেখানে গেলে আমার সঙ্গে দেখা করিস।”

কিন্তু রাজা মহারাজের নির্দেশমত আমি কলকাতা গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। এপ্রিল মাসে তাঁর শরীর যায়—তখন আমি অন্যত্র। যাই হোক কিছুদিন পরে আমি বেলুড় মঠে যাই এবং পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের অনুমতি নিয়ে ২৫ জুলাই ১৯২২ মঠে যোগদান করি।

মঠে যোগদান করে অনেকের মুখে অনেক সময় শুনেছি, পূর্বে নাকি মহাপুরুষ মহারাজ অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। কিন্তু তিনি যখন মঠ-মিশনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট হলেন তখন থেকে তাঁর মধ্যে মহা পরিবর্তন আসে। আমি যখন মঠে যোগদান করি তখন তিনি মঠের প্রেসিডেন্ট। আমরা তাঁকে খুবই স্নেহপরায়ণ দেখেছি। বালক, যুবক, বৃদ্ধ, ধনী, নির্ধন, ভক্ত, জনসাধারণ—সকলের প্রতি তাঁর

অসীম ভালবাসা দেখেছি। মহাপুরুষ মহারাজের একজন গৃহস্থ শিষ্য—পূর্বে তিনি সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন, পরে তাঁর অবস্থার বিপর্যয় হয়—আমাকে বলেছিলেন, "মহাপুরুষ মহারাজ আমার শুধু যে ধর্মজীবনের আশ্রয় ছিলেন তা নয়, আমার সাংসারিক জীবনেরও সহায় ছিলেন।" মহাপুরুষ মহারাজ তাঁকে আর্থিক সাহায্যও করেছিলেন। আমি মহাপুরুষ মহারাজের জীবনের শেষ অধ্যায়টিই দেখেছি—তিনি যখন সকলকে আশীর্বাদ ও ভালবাসা বিতরণ করেছিলেন এবং আমারও তার কিঞ্চিৎ লাভ করবার সৌভাগ্য হয়েছিল। অনেক ছোটখাট ব্যাপার ও সামান্য ঘটনা থেকেও তাঁর অসীম দয়া ও তীক্ষ্ণদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যেত। অনেক সময় স্থূলদৃষ্টিতে দেখলে ঐ সব ঘটনা অতি সামান্য বলে মনে হতে পারে, কিন্তু যে তা লাভ করত তার কাছে সে-সবের মূল্য অত্যন্ত বেশি। তাছাড়া আমি নিজের জীবনেও প্রত্যক্ষ করেছি যে, মহাপুরুষদের জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনাই বড় এবং মূল্যবান।

মঠে যোগদান করেই মহাপুরুষ মহারাজের একটি জিনিস আমার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল—ভোরের বেলা প্রত্যহ ঠাকুরঘরে গিয়ে তিনি ধ্যান করতেন। আমি সকাল সাড়ে পাঁচটার সময় ঠাকুরঘরে যেতে চেষ্টা করতাম, কিন্তু প্রতিদিনই গিয়ে দেখতাম, তিনি ঠাকুরঘরে বসে ধ্যান করছেন। তখন তাঁর বৃদ্ধ শরীর। একদিন সকালবেলা খুব ঝড়বৃষ্টি। মহাপুরুষ মহারাজকে তাঁর ঘর হতে ঠাকুরঘরে আসতে হলে একটি খোলা ছাদের উপর দিয়ে হেঁটে আসতে হতো। আমি মনে করেছিলাম নিশ্চয়ই তিনি আজ ঠাকুরঘরে আসতে পারবেন না। কিন্তু গিয়ে দেখি তিনি ঠিক এসেছেন। ঠাকুরঘরে তিনি ধ্যানমগ্ন, অনেক আগেই এসেছেন। আমরা শুনেছি—তিনি প্রতিদিনই ঠাকুরঘর খোলার সঙ্গে সঙ্গেই মন্দিরে যেতেন, কোনক্রমেই তাঁর ব্যতিক্রম হতো না এবং সকাল পর্যন্ত মন্দিরে বসে ধ্যান করতেন। এ সব ঘটনা আমাদের পক্ষে খুবই শিক্ষাপ্রদ হয়েছিল। এর দু-তিন বছর পরে তিনি মাদ্রাজ গিয়েছিলেন। মাদ্রাজ মঠে পৌঁছবার পরদিন সকালবেলা দেখি মৃগচর্মের আসনটি বগলে নিয়ে তিনি গুনগুন করে আপন মনে গান করতে করতে ঠাকুরঘরের দিকে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছেন। গানের প্রথম লাইনটি ছিল—"তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক হে করুণাময় স্বামী।" গলার সুর অতি মধুর, আর শব্দগুলি যেন তাঁর প্রাণের অন্তস্তল হতে আসছে। তিনি যখন ঠাকুরঘরের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন তখনও কিন্তু দরজা খোলা হয়নি। ঠাকুরঘর খুলতে সেদিন দেরি হয়ে গিয়েছিল। তারপর তিনি মাদ্রাজ মঠে যতদিন ছিলেন, সকালে ঠাকুরঘরে যেতে তাঁকে দেখিনি, নিজের ঘরে বসেই ধ্যান করতেন।...

মঠে যোগদান করার পর আমার প্রথম কাজ হয়েছিল উত্তরবঙ্গে বন্যাসেবাকার্যে যাওয়া। পশুপতি (স্বামী বিজয়ানন্দ) এবং আরও দু-এক জনের সঙ্গে যাই। ঐ কাজ থেকে আমি ফিরে এলাম। পশুপতিও পরে ফিরে এলে একদিন বিকালবেলা পশুপতি ও আমি মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে মঠের পূর্বদিকের 'লনে' পায়চারি করছি, পশুপতি সেবাকার্যের বিষয় বলছে। মহাপুরুষ মহারাজও আগ্রহসহকারে তা শুনছেন এবং আনন্দ প্রকাশ করছেন। কথায় কথায় পশুপতি বলেছিল, সে সেবাকার্যে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাবার সময় ট্রেনে উচ্চশ্রেণীর কামরায় ভ্রমণ করেছিল। মহাপুরুষ মহারাজ তৎক্ষণাৎ তাকে বললেন, "গরিবদের জন্য জনসাধারণ অর্থসাহায্য করছে আর তুমি কিনা তার অপব্যবহার করলে?" এই সামান্য ঘটনাটি আমার মনের কোণে বেশ দাগ রেখে গিয়েছে—এখনও তা মনে আছে।

মহাপুরুষ মহারাজ খুব রাশভারী লোক হলেও তাঁর মধ্যে কৌতুকপ্রিয়তা বেশ ছিল। আর একদিন বিকালে গঙ্গার ধারে পূর্বোক্ত 'লনে' মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে পশুপতি ও আমি বেড়াচ্ছি। তখন ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ হয়েছে, তাই আমরা তিনজনেই মঠবাড়ির পূর্ব-বারান্দায় এলাম। সে সময় ঐ বারান্দায় বেঞ্চের সংলগ্ন দেয়ালে উপরের দিকে ছবির মতো করে কাঁচ দিয়ে বাঁধানো একটি ছাপানো কাগজও ছিল—নাম দেওয়া 'অষ্টাদশ উপদেশ'। তাতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আঠারোটি উপদেশ অতি সুন্দরভাবে ছাপানো হয়েছিল। পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং একটু দেখলেন তাতে কি আছে। পশুপতি তাঁর কাছে, আমি পশুপতির পিছনে। মহাপুরুষ মহারাজ অঙ্গুলি নির্দেশ করে পশুপতিকে একটি উপদেশ দেখালেন। উপদেশটি এই ঃ "ভগবানলাভ করতে হলে সাধন-ভজন চাই।"—কিংবা এরূপ কিছু। ঠিক কথাগুলি আমার মনে হচ্ছে না। পশুপতি চট করে মহাপুরুষ মহারাজকে দেখাল অন্য একটি উপদেশ ঃ "গুরুর কৃপা হলে সবই হয়।" মহাপুরুষ মহারাজ পশুপতির জবাবটি খুব উপভোগ করলেন এবং হেসে উঠলেন।...

আমার ব্রহ্মচর্য-মন্ত্র গ্রহণ করার ছ-মাসের মধ্যে মাদ্রাজ মঠ হতে স্বামী অখিলানন্দ মহাপুরুষ মহারাজকে একখানি চিঠি লেখে। তাতে লেখা ছিল যে, তাকে চিদম্বরম নামক স্থানে পাঠানো হচ্ছে একটি কলেজে ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা এবং ভার নেবার জন্য। তার একজন সহকারীর প্রয়োজন। সে আমাকে সহকারিরূপে চায়। অখিলানন্দের সঙ্গে কলেজে পড়ার সময় হতে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। একদিন সকালবেলা মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে গিয়েছি। তিনি অখিলানন্দের চিঠিখানা হাতে

নিয়ে আমায় বললেন, "অখিলানন্দ এই চিঠি লিখেছে, তাকে কি জবাব দেব বলো?" তিনি কিন্তু খোলাখুলিভাবে আমায় যেতে আদেশ করলেন না, আমাকেই জিজ্ঞেস করলেন কি করা উচিত। আমার মনে তখন মঠ ছেড়ে অন্যত্র যাবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু মহাপুরুষ মহারাজ এভাবে প্রশ্নটি উত্থাপন করাতে আমি সেকথা বলতে পারলাম না। আমি বললাম, "আপনি যদি আমাকে যেতে বলেন তো আমি যাব।" তিনি বললেন, "হাঁ, যাও।" কিন্তু তাঁকে কথা দিয়ে আসার পর থেকে আমার মনের মধ্যে নানা তোলপাড় হতে আরম্ভ হলো। একদিন কর্মসচিব স্বামী শুদ্ধানন্দজীকে সব বিষয় বললাম। তিনি মহাপুরুষ মহারাজকেই সব জানাবার পরামর্শ দিলেন। আমার কিন্তু অতটা করতে প্রবৃত্তি বা সাহস হচ্ছিল না। অথচ মনের দ্বন্দ্ব চলছিল অবিরাম গতিতে। এর কিছুদিন পরে একদিন মধ্যাহ্নে আমি যখন মঠের অফিসে বসে কাজ করছিলাম—মহাপুরুষজী অকস্মাৎ আমার কাছে এসে, ডান হাতটি তুলে, তর্জনী একটু উঁচু করে খুব স্নেহের সঙ্গে বলতে লাগলেন, "ভূপেন, তুমি মাদ্রাজ যাও, আমি বলছি তোমার তাতে কোনরকম অসুবিধা বা কষ্ট হবে না।" তিনি আরও দু-একটি কথা বলে স্নান করতে চলে গেলেন।

মাদ্রাজ রওনা হবার কয়েকদিন পূর্বে মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে একদিন বললেন, "মাদ্রাজে অর্থাৎ চিদম্বরম কলেজে কাজ করতে হলে তোমার পক্ষে ব্রহ্মচারীর সাদা কাপড় পরা চলবে না। তোমাকে গেরুয়া কাপড় পরতে হবে—সন্ন্যাস নিতে হবে। সন্ন্যাস নিয়ে যাও।" আমি বললাম, "ভিতরটা আমার লাল হোক, মহারাজ।" তিনি বললেন, "তা তো করতেই হবে।" আমার সন্ন্যাস নেবার দিন ধার্য হলো। আমি হোম করে ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণ করেছি, সাধুজীবন আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করেছি এবং তাতেই আমি সন্তুষ্ট ছিলাম। সন্ন্যাসগ্রহণ করতে হবে বা সন্ন্যাসের বিশেষ কি প্রয়োজন, সেসব কথা তখন পর্যন্ত আমার মনেই ওঠেনি। সুতরাং আমার সন্ন্যাস নেওয়া ঠিক হবে কিনা এসব চিন্তা কিছু কিছু হয়েছিল। তাই মহাপুরুষ মহারাজকে আমি সব খুলে বললাম এবং এ-ও প্রকাশ করলাম যে, সন্ন্যাস নেবার আমার এমন সুযোগ তাঁর অনুগ্রহে এসেছে। তা কি আমি নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য হারাচ্ছি? স্থিরভাবে সব শুনে তিনি আমাকে বললেন, "হাঁ, তুমি সন্ন্যাস নাও। কে জানে আমি আর কতদিন বাঁচব!" একটু থেমেই আবার বললেন, "তবে এ-ও সত্য যে, (আমার) পরেও সন্ন্যাস দেয়া হবে, তারা সন্ন্যাস দেবে।" আমি মনের ভার মুক্ত করে নিশ্চিন্তমনে ফিরে এলাম।

একটু রাত্রিতে আমি মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে গিয়েছি। তিনি বিছানায় শুয়ে আছেন—বৃদ্ধ বয়স, বিশ্রাম করছেন। কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, "আজ তুমি

কি খেয়েছ?" আমি বললাম, "আমি আজ আবার কি খাব, মহারাজ? আজ সন্ন্যাস হবে, আমি উপোস করে আছি।" তিনি যেন খুব উৎকণ্ঠিত হয়ে বলে উঠলেন, "উপোস করেছ কেন? এখনি গিয়ে ঠাকুরের ফল-প্রসাদ কিছু খাও। আর রাত্রিবেলা সন্ন্যাসের জন্য স্নান করো না, গঙ্গাজল স্পর্শ করলেই হবে।" তখন আমার শরীর সুস্থ ছিল না। অনেকদিনের ম্যালেরিয়া জ্বর থেকে সবেমাত্র একটু আরোগ্যলাভ করেছি। তাই তিনি এই ব্যবস্থার আদেশ দিলেন। মহাপুরুষ মহারাজকে সমগ্র মঠ-মিশনের সাধু ব্রহ্মচারী ও ভক্তদের জন্য ভাবতে হতো, তার মধ্যেও আমার এত সামান্য খুঁটিনাটি প্রয়োজনের প্রতিও তাঁর দৃষ্টি দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

পরেও এরূপ ঘটনা হয়েছে। তিনি যখন দক্ষিণদেশে যান, তখন আমি মাদ্রাজ মঠে ছিলাম। তিনি উটি (Ooty)-তে আছেন। মাদ্রাজ মঠ হতে তাঁকে একখানি চিঠি লিখেছি। তখন তিন-চার দিন যাবৎ আমার শরীর সামান্য অসুস্থ ছিল। তাই চিঠিতে লিখতে পারিনি—আমি ভাল আছি। আমি লিখেছিলাম, "কয়েক দিন যাবৎ সামান্য অসুস্থ আছি।" এটা সংবাদের মধ্যেই গণ্য করা যায় না। কিন্তু তিন-চার দিন পরেই মাদ্রাজ মঠে স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ মহাপুরুষ মহারাজের কাছ থেকে এক চিঠি ও মনিঅর্ডারে কিছু টাকা পেলেন। চিঠিতে লেখা ছিল—ঐ টাকা আমার জন্য পাঠানো হয়েছে, আমার জন্য যেন দুধের ব্যবস্থা করা হয়। আমি সকলের সঙ্গে খেতে বসে আলাদা কোন জিনিস একলা খেতে রাজি হব না। সুতরাং আমি যাতে তা অন্য সময়ে খেতে পারি তেমন ব্যবস্থা করবার নির্দেশ ছিল। সংবাদ শুনে তো আমি আশ্চর্যান্বিত। শুধু যে টাকা পাঠিয়েছেন তা নয়, তিনি এও বিবেচনা করেছেন, আমি সকলের সঙ্গে খেতে বসে আলাদা কিছু খেতে সঙ্কোচ বোধ করব, সুতরাং তদনুযায়ী ব্যবস্থা করারও নির্দেশ দিয়েছেন।

যখন মহাপুরুষ মহারাজ মাদ্রাজ মঠে ছিলেন, তখন আমিও সেখানে ছিলাম। আমার সমসাময়িক একজন ব্রহ্মচারী উত্তরকাশীতে গিয়ে খুব তপস্যা করছিল সংবাদ পেয়েছিলাম। শারীরিক সামর্থ না থাকলেও প্রাচীনপন্থী সাধুদের মতো হৃষীকেশ বা ঐরকম কোনস্থানে গিয়ে তপস্যা করার আকাঙ্ক্ষা আমার মনে মাঝে মাঝে হতো। তাই আমি একদিন মহাপুরুষ মহারাজকে বললাম, "অমুক ব্রহ্মচারী উত্তরকাশী গিয়ে বেশ তপস্যা করছে।" আমি মনে করেছিলাম, একজন খুব তপস্যা করছে শুনে তিনি খুব আনন্দিত হবেন। তিনি কিন্তু বললেন, "তুমি কি মনে কর শুধু উত্তরকাশী গেলেই ভগবানলাভ হয়ে যাবে?" বাইরে গিয়ে তপস্যা করার লাভালাভ সম্বন্ধে তিনি আমাকে সচেতন করে দিলেন। যে ব্রহ্মচারীটি উত্তরকাশীতে তপস্যা করত, পরে তাঁর মাথা খারাপ হয়ে যায়।...

মাদ্রাজ মঠে যখন মহাপুরুষ মহারাজ ছিলেন, তখন আমরা সকলে ভোরবেলা ধ্যান-জপ করবার পর তাঁর ঘরে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করতাম, তখন কিছু কিছু ধর্মপ্রসঙ্গও হতো। তাঁর মুখে কিছু প্রসঙ্গ শোনার জন্য আমরা উদ্গ্রীব হয়ে থাকতাম। মাদ্রাজে একজন বৃদ্ধ ভক্ত তখন কর্ম থেকে অবসরগ্রহণ করে মঠে বাস করতেন, তাঁর নাম ছিল 'মুদলিয়ার'। তিনি অত্যন্ত সাধুপ্রকৃতির লোক ছিলেন। শ্রীশ্রীরাজা মহারাজ নাকি তাঁকে "ঋষি মুদলিয়ার' নাম দিয়েছিলেন। তিনি সকলেরই অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁকে আমরা 'তাতা' বলে ডাকতাম। তামিল শব্দ 'তাতা'র অর্থ ঠাকুরদাদা। একদিন সকালবেলা আমরা সকলে মহাপুরুষ মহারাজের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, তাতা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "How are you Maharaj?" মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, "I am all right. The Self is always all right. I am the Self."—(আমি ভালই আছি, আত্মা সবসময়েই ভাল থাকেন। আমি আত্মস্বরূপ)। তাঁর সঙ্গে মহাপুরুষ মহারাজ কখনো স্নেহ-কৌতুকভরে কথাবার্তা বলতেন। তাই আমি প্রথমে মনে করেছিলাম, তিনি বুঝি হাসি-তামাশার ভাবে কথাবার্তা বলছেন! তাঁর শরীর কেমন আছে বলতে চাইছেন না।—অন্যকথা বলছেন। কিন্তু দেখলাম ধীরে ধীরে তিনি গম্ভীর হয়ে দৃঢ়স্বরে ঐসব কথাই বলছেন—"আমি পূর্ণ (I am Purnam...) ইত্যাদি।" তখন মনে হলো, তিনি নিজের অনুভূতির কথাই বলছেন, কৌতুক নয়। ক্রমে তিনি চুপ হয়ে গেলেন। আমরা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কারো কোন কথা বলবার প্রবৃত্তি হচ্ছিল না।

দক্ষিণদেশে আমি আন্দাজ বছর দেড়েক ছিলাম, পরে বঙ্গদেশে আসি। সেখান হতে আমাকে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের কাজে পাঠানো হয়। মঠে আসার বছরখানেকের মধ্যেই আমার ম্যালেরিয়া হয় এবং বারংবার জ্বরে ভুগতে থাকি। মহাপুরুষ মহারাজকে তা জানাতেই তিনি বললেন, "ভাবনা কি? কোন একটি ভাল স্থানে তোমাকে পাঠিয়ে দেব।" আমাকে মায়াবতী পাঠানো হয়। সেখানকার কাজে আমি কুড়ি বছরের বেশি নিযুক্ত ছিলাম। মায়াবতীর কাজের জন্য আমাকে মাঝে মাঝে কলকাতায় গিয়েও থাকতে হতো। তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন, মঠে গিয়ে তাঁর সাক্ষাৎ পাবার সুবিধা ছিল। কলকাতায় বাস করার সময় প্রায় প্রতি রবিবারই মঠে গিয়ে তাঁকে দর্শন করতাম।

যখন আমি কলকাতায় মায়াবতীর শাখা, পুস্তক-প্রকাশন বিভাগে কাজ করতাম, তখন কাজের জন্য আমাকে ছুটতে হতো চীনাবাজারে কাগজের দোকানে, গোলদীঘির কাছে ছাপাখানায় আবার দপ্তরীপাড়ায়। তা ছাড়া আশ্রমের অফিসে বই-কেনাবেচা সম্পর্কেও অনেক লোক আসত। তাতে সেখানে আশ্রমের আবহাওয়া

গভায় রাখা শক্ত ছিল। আমি মহাপুরুষ মহারাজকে একদিন বলেছিলাম, "কলকাতায় পুস্তক-প্রকাশন বিভাগে কাজ করি, বড় distraction (মনের অস্থিরতা) হয়।" তিনি উত্তরে বললেন, "সকাল সকাল উঠে বেশ করে ধ্যান-জপ করে নিও, তাতে মন ভাল থাকবে। আমি তা-ই করি। ভোরবেলা ধ্যান করি, আর সারাদিন তার নেশায় কেটে যায়।" সাধারণত তিনি ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা বেশি কিছু বলতেন না। তিনি সকালবেলা ধ্যান করেন আর তার জের আপনা হতেই সমস্ত দিন চলে—একথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম, আর তিনি যে ব্যক্তিগত ব্যাপার আমাকে এরূপভাবে বললেন তাতেও বিশেষ আনন্দিত হলাম। তাঁর কথা শুনে আমি বললাম, "আপনি তো বললেন, মহারাজ, যে ভোরবেলা ধ্যান করেন আর তার ফলে সমস্ত দিন আনন্দে থাকেন। আমি যখন ধ্যান করতে চেষ্টা করি তখন তো ধ্যান হয় না। মন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত থাকে।" আমার কথা শুনে তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন। পরে যে কটি কথা বললেন, তা আমার পক্ষে অতি মূল্যবান।

আমি তাঁকে জানালাম যে, খুব সকালে উঠে ধ্যান-জপ করতে অনেকবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু তাতে আমার মাথাটা ঝিমঝিম করে, পরে কাজ-কর্ম করতে অসুবিধা হয়। তাতে তিনি যেন খুব উদ্বিগ্ন হয়ে তাড়াতাড়ি বললেন, "না না, তা কর না। বেশ করে ঘুমিয়ো এবং যতটা পার ধ্যান-জপ কর।" তিনি আমাকে বললেন না যে, জোর করে সকালে ঘুম থেকে উঠবে এবং ধ্যান-জপ করবে। তিনি এমনিভাবে ধর্মজীবন যাপন করা আমাদের পক্ষে সহজ করে দিতে চাইতেন।...

আর একদিন মহাপুরুষজী আমাকে বলেছিলেন—ঠিক কোন্ সময়ে আমার মনে নেই—"খুব জোর করে বেশি ধ্যান-জপ করতে যেও না। সহজভাবে অন্তরের সঙ্গে যতটুকু তাঁকে ডাকতে পার তাই কর। বাকি সবের জন্য তাঁর উপর নির্ভর করে থেকো। ভগবান লাভ তো জাগতিক বিদ্যার্জন করার মতো জিনিস নয়!"

বেলুড় মঠে থাকতে লক্ষ্য করেছিলাম—আমাদের কারও অসুখ-বিসুখ হলে মহাপুরুষ মহারাজ বেশ চিন্তিত হয়ে পড়তেন। একদিন বোধ হয় ধর্মজীবনে অনেক বাধাবিঘ্নের কথাপ্রসঙ্গে আমি তাঁকে বললাম, "আমাদের শারীরিক অসুখ হলে তো, মহারাজ, আপনারা এত চিন্তিত হন; কিন্তু মন যখন আমাদের পীড়া দেয়, আর আমরা কোন কূলকিনারা পাই না, তখনও কি আপনারা আমাদের জন্য উদ্বিগ্ন হন?" আমার এই অদ্ভুত প্রশ্ন শুনে তিনি মৃদু হাসলেন ও ধীরে ধীরে বললেন—"তা হই বইকি তোমাদের জন্য।...সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

একদিন গ্রীষ্মকালের বিকালে মঠে গিয়েছি। মহাপুরুষজী সবেমাত্র সামান্য বিশ্রামের পর জেগে তখনও বিছানাতেই শুয়ে আছেন। তাঁর ঘরের দরজা খোলা

হয়েছে দেখে আমি তাঁর ঘরে গেলাম ও তাঁকে হাতপাখা দিয়ে ধীরে ধীরে বাতাস করতে লাগলাম। এমন সময় একটি লোক—মাঝবয়সী হঠাৎ ঘরে ঢুকল। এ সময় বাইরের কাউকে আসতে দেওয়া হয় না। তাই আমি একটু আশ্চর্য ও বিরক্ত হলাম। লোকটির উসকো-খুসকো চুল, মুখ-চোখের ভঙ্গি দেখে মনে হলো যে কোন কারণে তার মন বিশেষভাবে বিক্ষুব্ধ আছে। সে এসেই মহাপুরুষ মহারাজকে জিজ্ঞেস করল—জগতে এত দুঃখকষ্ট কেন? তার কথার ভাবে মনে হলো সে সমস্ত জগতের উপর বিদ্বেষভাবাপন্ন। আমি এ সময় ঘরে থাকব কিনা বুঝতে পারছিলাম না। মহাপুরুষজী ধীরে ধীরে বিছানা থেকে উঠে তাঁর টেবিলের কাছে চেয়ারটিতে গিয়ে বসলেন। ঐ লোকটি ইতোমধ্যে তাঁর সামনে খালি মেজেতে বসল। মহাপুরুষ মহারাজ তার দিকে একটু ঝুঁকে অতি গভীর সহানুভূতির সঙ্গে অনুচ্চস্বরে বললেন—"জগতে দুঃখকষ্ট কেন তা আমি বলতে পারি না, তবে জগতের দুঃখকষ্টের বাইরে কিভাবে যেতে হয় তা আমি বলতে পারি।" কথাগুলির মধ্যে ছিল লোকটিকে সাহায্য করবার জন্য মহাপুরুষ মহারাজের অসীম আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা। মহাপুরুষজীর উপদেশ শুনে অল্পক্ষণের মধ্যেই লোকটি শান্ত হয়ে চলে গেল। সেদিন যা দেখেছিলাম ও শুনেছিলাম তা এখনও আমার কাজে লাগছে।...

অন্য একদিন দুপুরের একটু পূর্বে কি কারণে আমি মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে গিয়েছি। সকালবেলা যেসব ভক্ত তাঁকে দর্শন করতে এসেছিল, সকলেই চলে গিয়েছে। শুধু একজন মাত্র মেজেতে বসে আছে। তিনি খাটের উপর বসে ছিলেন। ভক্তটি মহাপুরুষ মহারাজের কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করল। তিনি তাকে আশীর্বাদ করলেন। কিন্তু ভক্তটি বারবার বলছে, "আমাকে আশীর্বাদ করুন, আমাকে আশীর্বাদ করুন।" তা দেখে আমিও মনে মনে একটু বিরক্তি বোধ করতে লাগলাম। তিনি আশীর্বাদ করছেন, তবু লোকটি সেই এক কথা বারবার বলছে। একবার আশীর্বাদ করায় যদি লোকটির বিশ্বাস না হয় তবে বারবার আশীর্বাদ করলেও তার মনে কোনপ্রকার বিশ্বাস হবে না। এমন সময় মহাপুরুষ মহারাজ ইংরেজিতে একটু দৃঢ় প্রশান্ত ভাবে বললেন, "We have only blessings and no curse. We have only blessings, no curse," (আমাদের কেবল আশীর্বাদই আছে, তা ছাড়া অন্য কিছু নেই)!...

লাহোরে প্লেগ আরম্ভ হয়েছে। আমাদের দু-তিনজন সাধু সেখানে সেবাকার্যে যাচ্ছেন। তাঁরা মহাপুরুষ মহারাজের কাছে বিদায় নিতে এসেছেন। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তিনি তাঁদের খুব আশীর্বাদ করলেন ও উৎসাহ দিলেন, "ঠাকুর-স্বামীজীর কাজ কর ও ধন্য হয়ে যাও।" যখন তাঁরা চলে গেলেন, তখন তিনি

অতি করুণভাবে অস্ফুটস্বরে জগজ্জননীর নিকট প্রার্থনা জানাতে লাগলেন—"মা, মা, এদের দেখো, এদের রক্ষা কর।" সে এক অতি করুণ দৃশ্য!...

সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব কি স্বামীজীর উৎসব ঠিক মনে নেই। মঠে খুব ভিড় হয়েছিল। পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের শরীর সুস্থ নয়, তবু বহু ভক্ত তাঁকে দর্শন ও প্রণাম করতে এসেছিল। সন্ধ্যার পর যখন সকলে চলে গিয়েছে, আমি তাঁর ঘরে গিয়েছিলাম। তিনি চেয়ারে বসে ছিলেন—ঘরে একা। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "আজ এত লোক আপনাকে প্রণাম করতে এসেছিল, আপনার নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হয়েছে।" তিনি বললেন, "কষ্ট হবে কেন? আমার বরং আনন্দ হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের এত ভক্ত এসেছিল, সে তো আনন্দের কথা।"...

কলকাতায় মায়াবতীর প্রকাশন-বিভাগে দু-বছর কি আড়াই বছর কাজ করবার পর ঠিক হয় আমাকে 'প্রবুদ্ধ ভারত' কাগজের সম্পাদক হবার জন্য মায়াবতী যেতে হবে। তখন একদিন মহাপুরুষ মহারাজকে বলেছিলাম, "আমাকে 'প্রবুদ্ধ ভারত' কাগজের সম্পাদনার ভার নিয়ে যেতে হবে ঠিক হয়েছে, কিন্তু সে কাজের যোগ্যতা সম্বন্ধে আমি সন্দিহান।" তার উত্তরে তিনি বললেন, "বেশ করে ধ্যান-জপ কর, তা হলেই কাজ ঠিক ঠিক ভাবে করতে পারবে।" 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র কাজ করতে হলে কি ধরনের বই পড়তে হবে এবং কিভাবে কাগজে লিখতে হবে সে সম্বন্ধে তিনি কিছু উল্লেখই করলেন না—শুধু বললেন, "ভাল করে ধ্যান-জপ করতে হবে।"

'প্রবুদ্ধ ভারতে' কাজ করতে করতে আমাকে কলকাতা আসতে হয়। সে সময় একদিন আমি মঠে গিয়েছি। ভোরবেলা ঠাকুরঘরে গিয়ে একটু ধ্যান-জপ করে মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করতে যাই। তিনি তাঁর চেয়ারে বসে ছিলেন। আমি নিচে মেজেতে বসেছিলাম। তাতে সহজেই তাঁর দৃষ্টি আমার চোখের দিকে পড়ল। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার চশমা কোথায়?" তখন আমার মনে হলো, ভুলে চশমা আমি ঠাকুরঘরে ফেলে এসেছি। আমি তাঁকে সেকথা বললাম। তিনি বললেন, "তুমি ঠাকুরঘরে যাও?" তিনি কেন একথা জিজ্ঞেস করলেন বুঝতে পারলাম না। আমি মায়াবতীতে থাকতাম, সেখানে ঠাকুরঘর নেই। সুতরাং আমি ঠাকুরঘরে যাবার অভ্যাস হয়তো ছেড়ে দিয়েছি, এই মনে করেই সম্ভবত তিনি এরূপ প্রশ্ন করেছিলেন। আমি কোন জবাব দিলাম না। তিনি তখন বললেন, "হাঁ, এটি রাখবে। তা না হলে শুধু 'প্রবুদ্ধ ভারত' কাগজের সম্পাদকতা করে কিছুই হবে না।" আমি চুপ করে রইলাম। আমার মনের কোণে দ্বন্দ্ব উঁকি-ঝুঁকি মারছিল যে, তাহলে আমি কি করছি! তিনি একটু থেমে বললেন, "তবে এও ঠাকুর-স্বামীজীর কাজ, এও ঠাকুর-স্বামীজীর কাজ।"

কোন্ সময়ে তা ঠিক মনে করতে পারছি না—একবার মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে বলেছিলেন, "যখন ধ্যান করতে বসবে তখন ভাববে আমি আছি আর ভগবান আছেন। তাছাড়া আর কেউ নেই, কিছুই নেই—জগৎ নেই, মঠ নেই, মিশন নেই। একমাত্র ভগবান আছেন।" আমার তখন মনে হয়েছিল—তিনি নিজে মঠ-মিশনের প্রেসিডেন্ট; তিনিও বলছেন, "যখন ধ্যান করতে বসবে তখন মনে করবে, সমস্ত জগৎ অবিদ্যমান, এমন কি মঠ-মিশনের অস্তিত্বও অবিদ্যমান!" কি আশ্চর্যের বিষয়!

মহাপুরুষ মহারাজের শরীর থাকতে তাঁর কাছে গিয়ে আমার কয়েকবারই মনে হয়েছে বাইবেলের বহু-উদ্ধৃত বাক্যটি ঃ He lives, moves and has his being in God.—তিনি ভগবৎ-রাজ্যে বাস করেন, ভগবচ্চিন্তার রাজ্যে বিচরণ করেন আর তাঁর অন্তরাত্মা ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছে। তিনি সর্বক্ষণই যেন ভগবদ্ভাবে বিভোর হয়ে থাকতেন। সাধারণ লোকের জীবনের বহু সমস্যার কথা বিশেষভাবেই তিনি অবগত ছিলেন। সামাজিক অবস্থার কথা—দেশের কত দুঃখ-কষ্ট তিনি খুবই জানতেন, সেজন্য তাঁর অশেষ সহানুভূতি ছিল। দৈনিক ইংরেজি সংবাদপত্র তিনি পাঠ করতেন—এ সবই তিনি করতেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে আলাপ করলেই বোঝা যেত যে, তাঁর আসল সত্তা ছিল গভীর-অনুভূতিসম্পন্ন আধ্যাত্মিক জীবন, আর সব কিছু বাইরের ক্ষীণ আবরণ। তাঁর মন সব সময় উচ্চভূমিতে থাকলেও তিনি জগৎ থেকে নিজেকে আলাদা করে রাখতেন না। জগতের দুঃখ-কষ্ট যাতে দূর হয় সেজন্য ছিল তাঁর তীব্র উৎকণ্ঠা ও আকাঙ্ক্ষা। অনেক সময় দেখেছি তিনি আপনমনে অতি করুণভাবে জগন্মাতার কাছে প্রার্থনা করছেন, যাতে সকলের, সমস্ত দেশের, সমস্ত জগতের কল্যাণ হয়। তাঁর স্বলিখিত এক চিঠিতে উল্লেখ আছে, "আমাদের এখানকার ধ্যান-ভজন প্রভুর কৃপায় কেবলমাত্র জগতের জীবের কল্যাণ-কামনা ছাড়া আর কিছুই নয় বা অন্য কোনরকম নেই। প্রভুর নাম বা ধ্যান করতে বসলেই 'প্রভু জগতের কল্যাণ করুন, আপনি শুদ্ধ করুণার অবতার'—কেবল এ ভাবনাই আসে।" (১০।১০।১৫)

ভগবান ছিলেন সব সময়েই যেন তাঁর প্রত্যক্ষ বস্তু। তাঁর কাছে উপস্থিত হলে ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান-মনেরও সকল সন্দেহ আপনা হতে দূর হয়ে যেত। শুধু তাই নয়, সাধারণ লোকেরও মনে হতো—ভগবানকে জীবনে, এ জীবনেই লাভ করা যেতে পারে। ভগবানকে লাভ করা কষ্টকর হলেও অসম্ভব নয়। সাধারণ লোকের পক্ষেও তা সম্ভবপর। তিনি এ বিশ্বাস-বুদ্ধি লোকের মনে জাগিয়ে দিতে পারতেন ও দিতেন। তিনি যখন ধর্মজীবনযাপন সম্বন্ধে লোককে উপদেশ দিতেন, তখন সাধারণ ধর্ম-উপদেষ্টার মতো অনিশ্চিত বিশ্বাসের উপর

দাঁড়িয়ে কথা বলতেন না। মনে হতো তিনি যেন প্রত্যক্ষ দর্শন করে ঐসব বলছেন—প্রত্যেকের অন্তরে সততজাগ্রত ভগবৎ-সত্তাকে নিজে উপলব্ধি করে, অন্যাকে উপদেশ ও সাহস দিতেন যাতে তারাও তাঁকে অনুভব করতে পারে। তাঁর কাছে গেলে কেন ভগবানলাভ তত কষ্টকর নয়—এত সহজ মনে হতো, পরে তার যথার্থ কারণ বুঝতে পেরেছি তাঁর স্বলিখিত চিঠির সঙ্কলিত ছাপানো বই পড়ে। তাতে আছে তিনি এক চিঠিতে একজন শিষ্য বা শিষ্যস্থানীয় সাধুকে লিখেছেন—"আন্তরিক প্রার্থনা করি তোমরা দিন দিন প্রভুর রাজ্যে অগ্রসর হও; বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি, জ্ঞান, বৈরাগ্য, দয়া প্রভৃতি ভগবৎ ঐশ্বর্যের অধিকারী হও। অধিকারী তো তোমরা আছই; নূতন আর কি হইবে? পিতামাতার ধনে পুত্রের পূর্ণ অধিকার সর্বদাই আছে, প্রয়োজন কেবল সেটা জানিতে পারা। তাই প্রার্থনা করি, তিনি তোমাদের তাহা জানাইয়া দিন।" (৪।১।১৯)

শিবানন্দ-পুণ্যস্মৃতি

স্বামী ভাস্বরানন্দ

পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। পূজ্যপাদ রাজা মহারাজ ১৯১৬ সালে যে সময়ে পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে গিয়ে কাশিমপুরের জমিদারের ঢাকা শহরের আরমানিটোলার বাড়িতে অবস্থান করছিলেন, সে সময় সৌভাগ্যক্রমে ও বহু জন্মের সুকৃতিফলে তাঁর প্রথম পুণ্যদর্শনলাভ ও চরণপ্রান্তে তিনদিন বাস করবার সুযোগ ঘটে। প্রথম পাদস্পর্শেই রাজা মহারাজ আমাকে বললেন, "লেখাপড়া যাই কর কিন্তু মনে রেখো ঈশ্বর-লাভই জীবনের উদ্দেশ্য।" জানি না একথা কটিতে কি শক্তি নিহিত ছিল! ঐ কটি কথাই যেন অন্তরে বৈরাগ্য-বহ্নি প্রজ্বলিত করে নানা পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে আমায় অমৃতের সন্ধান দেখিয়ে দেয়!...

১৯২০ সালের জানুয়ারির কোন এক দুপুরে বালি রেলওয়ে স্টেশনে নেমে হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করে বেলুড় মঠ-প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালাম। গঙ্গা-দর্শন করে প্রাণটা যেন জুড়িয়ে গেল। অনেকক্ষণ গঙ্গার ধারে বসে থেকে পরে মঠবাড়ির ভেতরে গিয়ে গঙ্গার ধারের বারান্দায় জনৈক সাধুকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "মঠাধ্যক্ষ মহারাজের সঙ্গে কি এখন দেখা করতে পারা যাবে?" উত্তরে তিনি বললেন, "মহারাজ এখন খাচ্ছেন। খাবার পরে পশ্চিম দিকের বারান্দায়

এসে বসবেন। সে সময় দেখা হতে পারে।” কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেই তিনি আহার শেষ করে বারান্দায় এসে বসলেন ও অন্যান্য সাধু-ব্রহ্মচারিগণের সঙ্গে কথাবার্তা কইতে লাগলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর মহাপুরুষ মহারাজ উপরে চলে গেলেন। আমি শুধু দাঁড়িয়ে তাঁর কথা শুনছিলাম, কিন্তু ঐ সময়ে কথা জিজ্ঞেস করার মতো সুযোগ হয়নি বলে পরে আবার কখন দেখা হবে তার প্রতীক্ষায় রইলাম। গঙ্গার ধারের বারান্দায় বসে বসে ভাবছিলাম কখন তাঁর সঙ্গে দেখা হবে ও আমার প্রাণের আর্তি তাঁর পাদপদ্মে নিবেদন করে নিশ্চিন্ত হব। ইতোমধ্যে ৪টা বেজে গেল। প্রথম যে সাধুটির সঙ্গে দেখা হয়েছিল তিনি আবার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি খেয়েছ?” আমি বললাম, “আমি মহারাজের সঙ্গে দেখা না করে খাব না। আমাকে তাঁর কাছে অনুগ্রহ করে নিয়ে যান।” আমার গায়ে একখানি কম্বল মাত্র ও সঙ্গে আর কিছুই নেই দেখে সে সাধুটি ধারণা করলেন—আমি সাধু হবার উদ্দেশে এসেছি। কয়েকটি কথার পরে তিনি আমাকে পাতায় করে কিছু প্রসাদ এনে দিলেন, আমি তা গ্রহণ করে দর্শন-মুহূর্তের প্রতীক্ষায় আছি—কখন আমি তাঁর পাদপদ্মে লুটিয়ে পড়বার সুযোগ পাব। যে আশা নিয়ে এসেছি সে আশা কি সফল হবে না? নানা সন্দেহ এসে মনকে বড়ই চঞ্চল করে তুলল। এমন সময় উপরে যাবার অনুমতি এল। আমিও মন স্থির করে ধীরে ধীরে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের পদপ্রান্তে উপনীত হয়ে প্রণাম করেই বসে পড়লাম। তাঁর পবিত্র দর্শনেই যেন আমার মন-প্রাণ শুদ্ধ হলো—এক অনাবিল আনন্দ-ধারায় হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। তিনি আস্তে আস্তে সুমধুর ভাষায় আমার পরিচয় ও ঘর ছেড়ে বেলুড় মঠে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তাঁর করুণামাখা কথাগুলি শুনে মন্ত্রমুগ্ধের মতো হয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ পরেই একজন ব্রহ্মচারীকে ডেকে আমাকে মঠে থাকবার অনুমতি দিলেন। তাঁর পদাশ্রয়ে স্থান পেয়ে যেন মুক্তির আস্বাদ প্রাণে প্রাণে অনুভব করেছিলাম। এই দিনটি আমার জীবনে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। এই মিলনক্ষণটির কথা স্মরণ হলে এখনও মহাপুরুষ মহারাজের করুণা-ধারা প্রাণে প্রবাহিত হয়ে এক নিত্য অখণ্ড আনন্দের সৃষ্টি করে থাকে।

পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের অহৈতুকী কৃপাদৃষ্টির ফলেই মঠে স্থান পেয়েছি। তাঁর সান্নিধ্যে বাস করবার অপূর্ব সুযোগও তিনিই করে দিয়েছিলেন। তিনি যে ঘরে থাকতেন তার পাশের ঘরেই লাইব্রেরি ও অফিস ঘর ছিল। সেখানেই কাজকর্ম করার আদেশ পেয়ে মহাপুরুষ মহারাজের পবিত্র দর্শনের সুযোগ দৈনিক একাধিকবারই হতো। মঠের নিয়মানুযায়ী সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর দর্শন তো সকলেরই মিলত, কিন্তু আমার সৌভাগ্য এই ছিল যে, কাজ করবার ফাঁকে-ফাঁকেই তাঁকে দর্শন করতে পারতাম। তিনিও কৃপা করে কোন কোন সময় তাঁর জন্য তামাক সেজে দিতে

বলতেন। এটুকু সেবা করবার সুযোগ পেয়েই নিজেকে ধন্য মনে করতাম। এ সময়ে মহাপুরুষ মহারাজের কোন নির্দিষ্ট সেবক ছিল না। তাঁর একটু-আধটু প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন কাজগুলি একজন সাধু করে দিতেন। তিনি নিচে খাবার ঘরে সকল সাধু ও ভক্তের সঙ্গে বসেই আহার করতেন। তাঁর আহারও ছিল অতি অল্প। শুধু একটু ঝোল-ভাতই প্রধান আহার্য ছিল। আহারের পর মঠ-বাড়ির পশ্চিম দিকের বারান্দায় কিছুক্ষণ বসে সাধু-ভক্তদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন এবং একটু হরিতকী খেয়ে মুখশুদ্ধি করে উপরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে যেতেন। বিকালবেলা ভক্তগণের সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাবার্তা বলে সকলকে আনন্দ দান করতেন। সন্ধ্যাবেলা আরাত্রিকের সময় তিনি আরতিতে যোগদান করতেন আবার কখনও কখনও মঠের উঠানের আমতলায় একটি বেঞ্চের উপরে বসে থাকতেন এবং লক্ষ্য করতেন সাধু-ব্রহ্মচারিগণ নিয়মিতভাবে আরাত্রিক যোগদানান্তে ধ্যান-জপ করে কিনা। প্রত্যহ ধ্যান-জপের পরে রাত্রে অভ্যাগত-কক্ষে ভজন হতো। তিনি সকলকে ভজনে যোগদান করতে বলতেন। তিনি নিজেও ভজন শুনে খুব আনন্দ পেতেন।

দেখতাম পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ অত বৃদ্ধ বয়সেও রাত্রি ৩টায় শয্যা ত্যাগ করতেন। নিয়মিতভাবে ঠাকুরঘরের এক কোণে হরিণের ছালখানির উপর বসে সকাল পর্যন্ত ধ্যান করতেন। ধ্যান শেষ হলে আসনখানি বগলে করে এসে নিজের ঘরে বসতেন। আমরা সকলে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করতাম। তিনি অতি স্নেহভরে সকলের খবর নিতেন কে কেমন আছে। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে ডাক্তারকে বলে দিতেন তার ঔষধ-পথ্যাদির ভালভাবে ব্যবস্থা করতে। যাঁরা দৈনিক শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবার কাজে নিযুক্ত থাকতেন তাঁদের বলে দিতেন ঠাকুর-সেবার যেন কোনরূপ ত্রুটি না হয়। মঠের প্রত্যেক কর্মীকে প্রত্যহ স্মরণ করিয়ে দিতেন যে, মঠের সব কাজই ঠাকুরের কাজ। পায়খানা পরিষ্কার করা থেকে চণ্ডীপাঠ অবধি সব কাজ তাঁরই সেবা। কোন কাজই হেয় নয়—এ সেবাবুদ্ধিতে কাজ করলে চিত্তশুদ্ধি হয়।

মহাপুরুষ মহারাজ প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা একবার সমস্ত মঠবাড়ি ঘুরে দেখতেন কোনও আগন্তুক আছে কিনা। যদি কাকেও অকেজো লোক কিংবা পাগল বলে মনে করতেন তবে তৎক্ষণাৎ তাকে মঠ থেকে বার করে দিতে বলতেন। একদিন সন্ধ্যায় পায়চারি করবার সময় মহাপুরুষ মহারাজ পাগলের মতো একটি ছেলেকে দেখতে পেয়ে একজন সাধুকে বললেন তাকে মঠের বাইরে বার করে দিতে। সাধুটি ছেলেটিকে বাইরে নেবার সময় তার ঘরবাড়ি কোথায় ও মঠে আসবার কারণ জিজ্ঞেস করাতে ছেলেটি উত্তরে জানায় যে, সে আমারই পূর্বাশ্রমের পরিচিত। এটা জেনে সাধুটি ঐ ছেলেটিকে বেলুড় গ্রামের রথ-তলার বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করতে

বলেন। সাধুটির কাছ থেকে এ সংবাদ পেয়ে আমি রাত্রিতে বেলুড় গ্রামে গিয়ে ছেলেটিকে মঠের ভিতরে নিয়ে আসি এবং কিছু খাবার খেতে দিয়ে একটা জায়গায় শোবার বন্দোবস্ত করে দিই। পরদিন সকালবেলা ভীত ও শঙ্কিত হয়ে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজকে ঘটনার আদ্যোপান্ত নিবেদন করি। আমার মনে হয়েছিল তিনি ছেলেটিকে তো মঠ থেকে সরিয়ে দিবেনই, সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও হয়তো মঠ থেকে সরে পড়তে হবে। কিন্তু যা দেখলাম ও শুনলাম তাতে আমার হৃদয় অপার আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠে মস্তক সহজেই তাঁর পদানত হলো। তিনি রুষ্ট হওয়া দূরে থাকুক আমাকে উৎসাহ-সূচক বাণীতে বললেন, "বেশ করেছিস, তাকে রাত্রিতে পেটভরে খেতে দিয়েছিলি তো? শোবার একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছিলি তো? যে কয়দিন থাকে তার একটু দেখাশুনা করিস।"

* * *

১৯২২ সাল, তখনও আমার সন্ন্যাস-দীক্ষা হয়নি। কোয়ালালামপুরে (F. M. S) কর্মী হয়ে যাবার সময় তিনি বললেন, "বিদেশে যাচ্ছ, সেখানে সন্ন্যাস-বস্ত্র ধারণ করে গেলেই ভাল হবে। কাজের পক্ষেও সুবিধা হবে।" তাই তিনি কৃপা করে আমায় গেরুয়াবস্ত্র দেন। আমি তা-ই শিরোধার্য করে কর্মক্ষেত্রে গিয়ে কাজ আরম্ভ করি। দূরে ও বিদেশে থাকাকালীন মহাপুরুষ মহারাজের স্নেহাশীর্বাদ, শুভেচ্ছা, উৎসাহ ও উদ্দীপনাপূর্ণ চিঠিগুলিই ছিল তখনকার জীবনের উপজীব্য। তাঁর চিঠি নিরাশ ও হতাশ প্রাণে শক্তি-সঞ্চার করে দিত, তাঁর আশীর্বাদপূর্ণ চিঠি পেলেই উৎসাহ ও আনন্দে প্রাণ ভরপুর হয়ে উঠত। ১৯২৪ সালে ব্যাঙ্গালোর থেকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, "ওখানকার আশ্রমের কাজকর্ম বেশ ভালরূপ চলিতেছে সংবাদে আনন্দিত হইলাম। তোমাদের ধ্যান, জপ, পূজা, পাঠ ইত্যাদিও উৎসাহের সহিত হইতেছে—পাঠে অধিকতর সুখী হইয়াছি। শ্রীশ্রীপ্রভুর কৃপায় তোমাদের শরীর বেশ ভাল থাকুক ও তোমরা তাঁর খুব কাজ কর ও তাঁর ধ্যান ও ভজনে উত্তরোত্তর আনন্দ ও শান্তি পাও ইহাই তাঁহার নিকট আমার আন্তরিক প্রার্থনা। আমি এখানে (ব্যাঙ্গালোরে) বিগত ২৮ জুলাই আসিয়াছি ও শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় আমার শরীর একরূপ ভালই আছে। বিদেহানন্দকে আমার স্নেহাশীর্বাদ দিবে ও তুমি জানিবে। নূতন তিনটি যুবককে আমার স্নেহাশীর্বাদ জানাইও।" পরে অপর একখানি চিঠিতে লিখেছিলেন, "তোমরা নূতন বাড়িতে গিয়েছ এবং শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর উৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে জানিয়া আনন্দিত হইলাম। ইতঃপূর্বে বিদেহানন্দের চিঠিতে ওখানকার উৎসবের detail খবর পাইয়া খুবই আনন্দিত হইয়াছি। তোমাদের প্রেরিত উৎসবের কাপড়ও পাইয়াছি। শ্রীমান বিদেহানন্দের

"The Voice of Truth' নাম দিয়া মাসিক পত্রিকা বাহির করিবার সংকল্প খুবই উত্তম। আমি আনন্দের সহিত অনুমতি দিতেছি। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় তোমাদের সদিচ্ছা পূর্ণ হউক। তোমরা সকলে আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিও। এখানে এখন convention চলিতেছে। আজ 4th day. তজ্জন্য সকলেই খুব ব্যস্ত। আমার শরীর মন্দ নয়। মঠের অন্যান্য সব কুশল। তোমাদের খুব ভক্তি-বিশ্বাস হউক।" আর একখানি চিঠিতে আছে, "তোমার ১৪।৮।১৯২৩ তারিখের পত্র যথাসময়ে পৌঁছিয়াছিল। বিদেহানন্দ August holidays-এ তো নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, সেইসব স্থানে class ও lecture-আদি হইয়াছিল এবং দরিদ্রনারায়ণদের ভোজন করান হইয়াছিল এবং lecture প্রভৃতি খুব উত্তমরূপে হইয়াছিল—সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছে—এ সকল শুনিয়া খুব আনন্দ হইল। আন্তরিক প্রার্থনা করি তোমরা সুস্থ শরীরে এবং আনন্দে তাঁর কার্যাদি করিতে থাক এবং সাধন-ভজনের দিকে অগ্রসর হও।

"স্কুলের মীমাংসা প্রভুর ইচ্ছায় যেরূপ হয় হইবে, তার জন্য চিন্তার কোন কারণ নাই। প্রভুর ইচ্ছায় যা হইবে, তা ভালই হইবে।

"ওখানকার অন্যান্য কাজকর্ম ঠাকুরের কৃপায় ভালই চলিতেছে শুনিয়া সুখী হইলাম। মঠে এখনও Malaria দেখা দেয় নাই, তবে ডেঙ্গুজ্বর অনেকেরই হইয়াছে ও হইতেছে। প্রভুর কৃপায় সকলেই আরোগ্য হইয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে। তোমরা সকলে ভাল আছ জানিয়া সুখী হইলাম। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ বিদেহানন্দ ও তুমি জানিবে। তোমাদের সর্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনা করি। স্থানীয় ভক্তদের আমার আন্তরিক আশীর্বাদ দিবে।"

১৯২৫ সালে একখানি চিঠিতে লিখেছিলেন—"তোমাদের সুদীর্ঘ পত্রে ওখানকার বিস্তারিত সংবাদ সমস্ত অবগত হইয়া মনে বড় কষ্ট হইল। কিন্তু প্রভুর ইচ্ছায় সমস্তই ঠিক হইয়া যাইবে। তোমরা একটু ধৈর্য ধরিয়া থাক। ঠাকুরের কাছে খুব প্রার্থনা কর। তিনি তাঁর কাজ সর্বত্রই দেখিতেছেন। অবশ্য একটা খারাপ সময় আসিয়াছে। ইহাও জানিবে ভবিষ্যতে একটা ভালর জন্যই হইতেছে। তোমরা বিচলিত হইও না। সব বিপদ কাটিয়া যাইবে। ওখানকার ৪টি নূতন ব্রহ্মচারী এখানে আসিয়াছে। তাহারা বিদেহানন্দকে পত্র লিখিয়াছে এবং উত্তর-প্রতীক্ষা করিতেছে। আমি হৃদয়ের সহিত ওখানকার আশ্রমের কুশলের জন্য প্রার্থনা করিতেছি। শীঘ্রই সব ঠিক হইয়া যাইবে। তোমরা প্রভুর চরণে বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া বসিয়া থাক। কোন ভয় নাই। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তোমরা সকলে জানিবে। এখানকার সব প্রভুর কৃপায় কুশল।"...

মহাপুরুষ মহারাজের অফুরন্ত কৃপা অবিরলধারে নির্বিচারে ছোট বড় সকলের উপর বর্ষিত হতো। যে যখন তাঁর কাছে সাহায্যপ্রার্থী হতো সকলেই সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরত। কাকেও প্রার্থিত টাকা, কাকেও বা কাপড় চাওয়ামাত্রই তিনি দিয়ে দিতেন। সাধুদের ভিতর কেউ যদি কখনও তীর্থযাত্রা-মানসে তাঁর কাছে সাহায্যপ্রার্থী হতেন, তিনি তখনই তাঁকে কিছু টাকা দিয়ে দিতেন। মহাপুরুষ মহারাজ ছিলেন যথার্থই গরিব-দুঃখীদের ত্রাণকর্তা।

গীতায় আছে, "যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥"* এই শ্লোকটির অর্থ আক্ষরিকভাবে মহাপুরুষ মহারাজের জীবনে রূপায়িত দেখেছি।

মঠে বাসকালীন এক সময়ে আমি কঠিন রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ায় পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ ডাক্তারের নির্দেশানুযায়ী আমার জন্য বহু ব্যয়সাধ্য ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। বস্তুত তাঁর অসীম ও অহেতুক কৃপাবলেই সেই দুরারোগ্য ব্যাধি হতে আমি মুক্তি পেয়েছিলাম। তাঁর স্নেহাশীর্বাদ ও করুণার কথা, তাঁর মহান, উদার ও আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবের কথা যতই ভাবি, ততই যেন মন-প্রাণ, ভক্তি-শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় অবনত হয়ে তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়ে।

সাধু-ভক্তগণের সকলের আধ্যাত্মিক উন্নতি হোক মহাপুরুষ মহারাজ এই চাইতেন। আমাদের সাধন-ভজনের চেষ্টা দেখলে তিনি কত যে আনন্দ পেতেন নিম্নলিখিত পত্রাংশগুলি তার পরিচায়ক। তাঁর করুণাময় চিত্ত নিশিদিন আমাদের জন্য বিগলিত হতো।

মহাপুরুষজীর স্বহস্তে লিখিত ২খানি চিঠি এখানে দেওয়া হলো ঃ

Sri Ramakrishna Math
Mylapore, Madras, 25.8.21

"...অনেক দিন হইল তোমার গর্ভধারিণী তোমাকে দেখেন নাই। এখন যখন অত ব্যস্ত হইয়াছেন, তখন তাঁকে একবার দেখিয়া আসিতে কোন ক্ষতি নাই, বরং উচিত। শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁর কাছে যে সকল ছেলেরা থাকিত সকলকেই পিতামাতাকে এক একবার কখনো কখনো দেখিতে যাইতে পাঠাইতেন। অবশ্য অধিকদিন সেখানে থাকিবার প্রয়োজন হইবে না। আমি যদিও বাহিরে আসিয়াছি, তথাপি মঠস্থ সকলের জন্যই সর্বদাই ভাবি এবং প্রভুর শ্রীচরণে প্রার্থনা করি যে তোমরা সকলে বিশ্বাস,

---

* যাঁকে লাভ করলে অপর কোনও লব্ধব্য বস্তুই আর কাম্য থাকে না, যে ভাবে অবস্থিত হলে মানুষ গুরুতর দুঃখেও অভিভূত হয় না। (৬।২২)

ভক্তি, প্রীতি, পবিত্রতা, কর্মক্ষমতাতে সর্বদা পূর্ণ হইয়া থাক। আমরা নিশ্চয় জানি যে, প্রভু তোমাদের দেখিতেছেন ও সর্বদা রক্ষা করিতেছেন। মঠে নিয়মিত class হইতেছে এবং মধ্যে মধ্যে পরীক্ষাও হয়, অনঙ্গ রাত্রিতে class করে এবং তোমরা সকলে বেশ প্রীতির সহিত আছ এবং যথাসাধ্য ধ্যান-জপ করিতেছ শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। এখানকার জলবায়ু তত ভাল নয় তবে খুব খারাপও নয়। গ্রীষ্ম অতিশয়। বেড়ান হয় তবে বিশেষ নয়। মহারাজ এক প্রকার আছেন। আমিও এক প্রকার আছি, বোধ হয় শীঘ্রই Bangalore যাওয়া হইতে পারে। তুমি ও তোমরা সকলে আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। প্রভু তোমাদের পরম কল্যাণ করুন।

তোমাদের—শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

পত্রাংশ— মঠ, ১৪।৭।২২

"...কয়েক দিন হইল কাহার মারফত মনে নাই তোমার একখানা পত্র পাইয়া সুখী হইয়াছি। তোমার ওস্থান খুব ভাল লাগিয়াছে শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। প্রভুর ইচ্ছায় যতদিন তিনি ওখানে রাখেন, থাকিয়া ভজন, সাধন ও আশ্রমের যথাসাধ্য কাজকর্ম কর। ভুবনেশ্বর স্থান বড়ই সাধনের অনুকূল, সেই জন্যই মহারাজ ওখানে ঠাকুরের স্থান করিয়া গিয়াছেন, বহু লোকের কল্যাণ ওখান হইতে হইবে তার আর সন্দেহ নাই।

"হরি মহারাজের শরীর ভয়ঙ্কর পীড়িত। তাঁর শরীর এবার বোধ হয় আর আরোগ্য হইবে না, শীঘ্রই বোধ হয় দেহত্যাগ হইবে, অবস্থা খুবই খারাপ। কি জানি প্রভুর কি ইচ্ছা। মহারাজ যখন আমাদের ছাড়িয়া গিয়াছেন (স্থূলত) তখন আমাদের কাহারও দেহের উপর বিশ্বাস নাই। কখন কাহাকে তিনি নিজের কাছে ডাকিয়া লইবেন কিছুই বলা যায় না। সব তাঁরই ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।"

মহাপুরুষজী আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন-পথের আলোকবর্তিকা। যতদিন যাচ্ছে প্রাণে প্রাণে তা খুবই অনুভব করি।

শুভম্

মহাপুরুষজীর অস্ফুট স্মৃতি

স্বামী ধর্মানন্দ

মনে হয় ১৯১০ খ্রিস্টাব্দ। লিলুয়া স্টেশন থেকে আমি ও আমার এক বন্ধু বেলুড় মঠে থাকবার জন্য বিকালে আসি এবং পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের দর্শন হয়। তিনি আমাদের নাম-ধাম জিজ্ঞেস করলেন। বন্ধুটির নাম শুনে বললেন, "বাবা, এই তোমাকে খুঁজতে পুলিশ এসেছিল। এখন তোমরা বাড়ি যাও। 'কথামৃত' ও স্বামীজীর বই পড়, আর ঠাকুরের শ্রীচরণে প্রার্থনা জানাও। তাঁর কৃপায় সময় হলে আবার আসবে।" আমাদের প্রসাদ নিয়ে যেতে বললেন।...

১৯১১ খ্রিস্টাব্দে শ্রীশ্রীমার আদেশে কোয়ালপাড়া আশ্রমে যোগ দিই। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে বেলুড় মঠে আসি। তখন পূজ্যপাদ প্রেমানন্দ মহারাজ মঠে আছেন। মধ্যে মধ্যে মহাপুরুষ মহারাজও এসে মঠে থাকেন। তাঁরা দুজন একঘরেই থাকতেন। আমি মঠের ডাক্তারখানায় ডাক্তারি করি।

যখন পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ, তখন ডাক্তারখানার সব কাজ—যেমন, জল আনা, ঝাড়ু দেওয়া, ঔষধ দেওয়া, খাতা লেখা—এসব আমাকেই করতে হতো শুনে একদিন মহাপুরুষজী বেড়াতে বেড়াতে মঠের ডিসপেনসারিতে গিয়ে আমায় বললেন, "দেখ, যতীন, তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে। আচ্ছা, আমি কিছু করতে পারি?" আমি আশ্চর্য হয়ে হাত জোড় করে বললাম,— "মহারাজ, আপনি আশীর্বাদ করুন যেন আমি এ সব করতে পারি।" দয়াময় মহাপুরুষ মহারাজ মঠের পাচক-বামুনদের ডেকে বলতেন, "দেখ, যতীন ডাক্তার প্রসাদ পেতে দেরিতে আসে। তার জন্য পায়েস-টায়েস যেন একটু থাকে।"

একদিন মহাপুরুষজীর সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে জিজ্ঞেস করলাম—"মহারাজ, মন বড়ই চঞ্চল; কি করে শ্রীশ্রীঠাকুরে মন স্থির হয়?" তিনি বললেন, "বাবা, তাঁকে ধরে পড়ে থাক আর আন্তরিক প্রার্থনা জানাও। যখন আমাদের কাছে এসেছ, প্রভুর কৃপায় সব হয়ে যাবে।"...

মহাপুরুষজী যখন বাক্‌শক্তিরহিত, অসুস্থ, তখন প্রণাম করতেই হাতটি তুলে ইশারায় জিজ্ঞেস করতেন, "কেমন আছ?" তাঁর সদুপদেশ, উৎসাহ, স্নেহ-ভালবাসার কথা আর কি বলব। 'বোঝে প্রাণ বোঝে যার।'

একদিন মহাপুরুষজীকে বললাম, "আপনি আছেন—কত লোক আসছে,

কৃপালাভ করছে! এরপর কি হবে?" তিনি তখনই বললেন, "তুমিও যেমন, প্রভুর কাজ কি বাকি থাকবে? তাঁর কাজ তিনি কারও দ্বারা চালাবেন। আমাদের মতো কানাকড়িকে দিয়ে যখন তিনি চালিয়ে নিচ্ছেন, তখন তিনি সবই পারেন।"

আমরা ঠাকুরঘরে যাই কিনা, সাধন-ভজন করি কিনা, ঠাকুরের ভোগের কি রান্না হচ্ছে—এসব খবর মহাপুরুষজী নিতেন। একদিন করুণাসিন্ধু মহাপুরুষ মহারাজ নিজের পায়ের একজোড়া জুতো আমায় দিয়ে বলছেন, "এইটি পায়ে দিও।" আমি বললাম, "সে কি মহারাজ! আপনার জুতো কি করে পরব?" তাতে তিনি বললেন, "না, নাও তুমি; আমি বলছি ব্যবহার করো।"

মহাপুরুষজীর জন্য তখন ঘুষুড়ি থেকে তামাক খাবার গাব-ফলের রস দেওয়া টিকে কিনে আনাতাম। ডাক্তারখানার অনেক রোগী ঘুষুড়ি থেকে আসতো, তাদের দিয়ে আনাতাম। তখন সকালে ডাক্তারি করি, বিকেলে মুসলমানপাড়ার ছোট ছোট দু-চারটি ছেলেমেয়েকে প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ পড়াই। মহাপুরুষজী একদিন শুনে খুব উৎসাহ দিয়ে বললেন, "যদি বই কেনার টাকার দরকার হয়, আমার কাছ থেকে নিও।" গরিবদের জন্যে তাঁর প্রাণ কাঁদত।

যখন মহাপুরুষজীর দিব্য সঙ্গে ছিলাম, মনের মধ্যে সাহস, ভরসা, বল সর্বদাই বিরাজ করত, মা-বাবার কাছে ছেলেরা থাকলে যেমন হয়ে থাকে। সেই ভালবাসার, কৃপার কথা মুখে বলা যায় না, অনুভবের বিষয়। তিনি বিন্দুতে সিন্ধু দেখতেন এবং সেইটুকু যাতে আরও বৃদ্ধি পায়, উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে তা বাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতেন। তামাক খেতে খেতে বেশি হলে সেবক দিয়ে আমাদের কাছে নিচে পাঠিয়ে দিতেন। তিনি আমাদের মা-বাবা, ভাই, বন্ধু, সখা—সব ছিলেন।

মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের অনুধ্যান

স্বামী সন্তোষানন্দ

ভগবানের অপার করুণায় আমার ভাগ্যে মহাপুরুষ মহারাজের প্রথম দর্শনলাভ হয় খুব সম্ভবত ইংরেজি ১৯১৬ সালে, আর তাঁর মহাপ্রস্থান হয় ইংরেজি ১৯৩৪ সালে। এই দীর্ঘকাল ধরে বহুভাবে বহুবার তাঁর দর্শনলাভ ঘটেছে। কিন্তু তখন কখনও ভাবিনি যে তাঁর স্মৃতি লিপিবদ্ধ করবার জন্য কোনকালে আমার কাছে অনুরোধ আসবে। তাই এ অনুরোধকে পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষজীর অলঙ্ঘনীয়

আদেশরূপে গ্রহণ করা ভিন্ন গত্যন্তর নেই! বহুদূরে ফেলে আসা কয়েকটি দিনের যে অস্পষ্ট ছবি স্মৃতির ক্ষীণ আলোকে তাঁরই কৃপায় ভেসে উঠবে তাই ভাষায় ব্যক্ত করার চেষ্টা করব। অনেক খুঁটিনাটি বাদ তো যাবেই, দিনতারিখও কিছু বলা যাবে না।

তখন তখন আমার মঠে যেতে প্রায় ১২টা সাড়ে ১২টা হতো, কারণ আমি যেখানে থাকতাম সেখান থেকে খাওয়া-দাওয়া সেরে যেতে হতো। খুব সম্ভবত ১৯১৬ সালের একদিন দুপুরে মঠে গেছি। দেখি মধ্যাহ্নের আহারান্তে তাঁদের নিত্য অভ্যাসমত পরমারাধ্য মহাপুরুষজী ও শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজ মঠবাটির পশ্চিমের বারান্দার বেঞ্চিতে এসে বসেছেন। আর একখানা বেঞ্চিতে বসে আছেন কয়েকটি ভক্ত। নানা কথার মধ্যে পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ বললেন, "এইখানে বসে স্বামীজী একদিন আমাকে বললেন, 'দেখ বাবুরাম, ভারতবর্ষের আগামী ৪। ৫শো বছরের ইতিহাসের পাতা উলটে গেল, সব দেখে ফেললাম।' আমি বললাম, 'বেড়ে বাবা, বেড়ে আছ, আমরা ৪।৫ দিন দেখতে পাই না, আর তুমি ৪। ৫শো বছর দেখে ফেললে'!"

শুনেই মহাপুরুষজী বলে উঠলেন, "চার-পাঁচ দিন? চার মুহূর্ত পরে কি হবে তাই জানি না! Next moment-এ কি হবে তাও জানি না, বলে কিনা ৪।৫ দিন!" মহাপুরুষজী উত্তর দিকের ঘরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, "এইখানে বসে একদিন স্বামীজী (নিজের উরুদেশ দেখিয়ে) এইখানে এক থাপ্পড় মেরে বললেন, 'দেখ, ঐ জাপানের ধার-করা সভ্যতা—ওটা টিকবে না। ঐ যে চীনে আফিম খেয়ে ঘুমুচ্ছে, ওটা উঠবে।' "

একথা ও-কথার পরে পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ বললেন, "ঠাকুরের ব্যাপার কিছুই বোঝা যায় না। তাঁর একটি ভক্তের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। বিয়ের কিছুদিন পরেই একদিন এসে ঠাকুরের পায়ে ধরে কান্না! বলছে—'বৌকে ভালবাসতে ইচ্ছা করছে। এই তো মায়া! আমি তো ডুবে যাব, আমাকে বাঁচান।' ঠাকুর বললেন, 'তুই একদিন কিছু খাবার নিয়ে আসিস, তোর মায়াটাকে খেয়ে দেব।' কয়েকদিন পরেই সে একদিন এক চাঙাড়ি জিলিপি নিয়ে এলো। ঠাকুর তাকে বললেন সেটা তাকের উপর রেখে দিতে। সে তাই করল আর খানিকবাদে প্রণাম করে চলে গেল। রাত্রে তিনি আহারে বসলেন, আমি কাছেই ছিলাম, খাওয়া শেষে জিজ্ঞেস করলেন, 'অমুক কি নিয়ে এসেছে না?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ, জিলিপি এনেছে।' বললেন, 'দে দুখানা।' তাঁর পাতে দুখানা জিলিপি দিলাম। ঠাকুরের কাণ্ড কি কিছু বোঝা যায়? কি করে ওর ভেতরে ওর মায়া ঢোকালেন, কে জানে! তারপরে যাই

না জিলিপিতে হাত ঠেকিয়েছেন আর যেন সিঙ্গি মাছের কাঁটা বেঁধার মতো যন্ত্রণায় হাত সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে নিলেন! তারপর হাত ধুলেন। হাত ধুয়ে আবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু জিলিপি ছুঁতে পারলেন না, উঠে বাইরে গেলেন, মুখ হাত ধুয়ে এলেন; এসে আবার বসলেন। কিন্তু থালা পর্যন্ত হাত পৌঁছাল না। তখন বাঁহাতে করে ডান হাতটা ধরে টানছেন আর বলছেন, 'ছাড়, মা, ছাড়। আমি কথা দিয়েছি। মা, ছাড়। ছাড়, মা, ছাড়।' কিন্তু কিছুই হলো না, খাবার থালা পর্যন্ত আর ছুঁতে পারলেন না। তখন উঠে গেলেন; আমাদের বললেন, এই জিলিপি যেন আমরা না খাই, যেন ফেলে দিই! পরে দেখা গেল, ওঃ, সেই বৌকে নিয়ে ভক্তটির কি নাজেহাল! কিছুতেই সেটাকে ছাড়তে পারল না। অতখানি আসক্তি ছিল বলেই ঠাকুর সেদিন খেতে পারলেন না।"

উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে একজন বললেন, "মহারাজ, সে তো ঠাকুরের কাছে মুক্তি চাইলেই পারত।" জবাবে প্রেমিক স্বামী প্রেমানন্দজী বললেন, "ঠাকুরকে দেখেছে; মুক্তির কি আর তার বাকি আছে? মুক্তি হয়েই গেছে।" এর পরে সভা ভঙ্গ হলো। পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ উঠে সিঁড়ির দিকে রওয়ানা হলেন, উপরে যাবেন বিশ্রামের জন্য। একজন ভক্ত বললেন, "মহারাজ, আমরা তো আর ঠাকুরকে দেখিনি; আমরা আপনাকে দেখছি।" সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এলো—"আমরা কে? ঠাকুরই সব।" বলেই দুহাত তুলে সুর করে বললেন, "তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।"

* * *

১৯১৭ সালের দুর্গাপূজা। মহানবমীর সন্ধ্যার পরে যখন মঠে গিয়ে পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যারতি শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু যা দেখলাম তা জীবনে ভোলবার নয়। আগে কখনও এ রকম দৃশ্য দেখিনি। তখন পূজা হতো পুরোনো ঠাকুরমন্দির আর মঠবাড়ির মাঝের জায়গাটিতে। দেখলাম মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীরা মহানন্দে নৃত্যগীতে মগ্ন। একদল গাইছেন, 'জয় শিব, জয় জগৎ-পিতা', অন্যদল গাইছেন, 'জয় দুর্গা, জয় জগৎ মাতা'। আরও দেখলাম যে, সাধু-ব্রহ্মচারীদের একপাশে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজও গান গাইছেন ও নৃত্য করছেন। তাঁর একটি হাত ঊর্ধ্বে উত্তোলিত আর তিনি সঙ্গীতের দুটি পদই সমানভাবে গাইছেন। একবার গান শেষ করেই সব সাধু-ব্রহ্মচারীরা দেবীর সামনে প্রণাম করে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজকেও প্রণাম করছেন। মহাভাবে মাতোয়ারা মহাপুরুষজী বলছেন, "আজ আমরা সব শিবের দানা। আবার এখানে প্রণাম কেন? মাকেই প্রণাম কর।" অবশ্য একথায় কেউই তাঁকে প্রণাম করা থেকে নিরস্ত হয়নি।

ভাব ক্রমশ ঘনীভূত হতে লাগল। মনে হলো যেন আনন্দের বন্যা উঠেছে। বোধ হলো যেন—এই সাক্ষাৎ কৈলাসধাম। জগদম্বা প্রেমে করুণায় দয়ায় যেন বিগলিত হয়ে আপন সন্তানদের অতৃপ্ত নয়নে দর্শন করছেন! আর যেন দেবশিশুগণ মহানন্দে বিভোর হয়ে মহামায়ার পদপ্রান্তে উন্মত্তপ্রায় হয়ে সঙ্গীত ও নৃত্য করছেন! আর মহাপুরুষ মহারাজ? মনে হলো যেন আমাদের পরিচিত স্থূল জগৎ তাঁর দৃষ্টি থেকে কোথায় লোপ পেয়ে গেছে! সঙ্গীতের মাঝে মাঝে যখন সকলে তাঁকে প্রণাম করছিল তারই মধ্যে একবার অন্য সকলের সঙ্গে শ্রীজিতেন্দ্রনাথ পালও তাঁকে প্রণাম করবার জন্য যখন নতজানু হয়ে মস্তক অবনত করার প্রয়াস করছে, সেই মুহূর্তে দেহবোধশূন্য শিবস্বরূপ শিবানন্দ মহারাজ, 'আমরা সব শিবের দানা; শিব শিব বলে এখনই ঘাড়ে লাফিয়ে উঠবো' বলেই জিতেনের কাঁধে পা দিয়ে সোজা লাফিয়ে উঠলেন। এদিকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের জ্ঞানরহিত মহাপুরুষজী পূর্বের ন্যায় নৃত্যগীতে মগ্ন রইলেন!...

১৯১৮ সালের গ্রীষ্মকাল। পূজনীয় স্বামী ধীরানন্দ (কৃষ্ণলাল মহারাজ) আমাকে একদিন বললেন পরমারাধ্য রাজা মহারাজের নিকট দীক্ষার প্রার্থনা জানাতে। আমি বললাম যে, শ্রীশ্রীমায়ের কাছ থেকে দীক্ষাগ্রহণই আমার অভিপ্রায়। তাতে তিনি আর কালবিলম্ব না করে শীঘ্র শীঘ্র দীক্ষা নেবার জন্য শ্রীশ্রীমায়ের দেশে যাবার উপদেশ দিলেন। বললেন—আমতা পর্যন্ত ট্রেনে গিয়ে সেখান থেকে হেঁটে যেন তাঁর দেশ জয়রামবাটীতে যাই। প্রস্তাবটি আমার খুবই ভাল লাগল। আমতা থেকে শ্রীশ্রীমায়ের দেশ ২৪।২৫ মাইল রাস্তা। এই দীর্ঘ ও অজানা পথ অপরিচিত লোকের মধ্যে দিয়ে চলে যাওয়ার অভিনবত্ব আমাকে খুবই উৎসাহিত করল। কবে যাব তার দিন তখনও স্থির হয়নি, এমন সময় একদিন মঠে গেছি। ইতোমধ্যে রায়পুর (তৎকালীন মধ্যপ্রদেশ) থেকে এসে এক ভদ্রলোক বোধ হয় মঠেই ছিলেন। তিনি সেখানে সরকারি চাকরি করতেন, জেলার (jailor) ছিলেন। ভদ্রলোকের বয়েস হয়েছিল ষাটের কাছাকাছি। তিনি সরকারি চাকরির নির্দিষ্ট সময় শেষ করে ১০০ টাকা মাসিক পেন্সনসহ কাজ থেকে অবসর নিয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী-পুত্র সবই ছিল। ছেলেরাও সব তখন নানা কাজে নিযুক্ত। ভদ্রলোকের সংকল্প—তিনি শেষজীবনে বেলুড় মঠের সন্ন্যাসিরূপে কাটাবেন। যা হোক, তিনি মঠে আসায় কর্তৃপক্ষ স্থির করলেন যে, তাঁকে দীক্ষার জন্য শ্রীশ্রীমায়ের কাছে পাঠাবেন। কিন্তু এক অসুবিধা হলো, ভদ্রলোক বাংলা জানেন না। এ রকম যখন অবস্থা তখন পূজনীয় কৃষ্ণলাল মহারাজ পরমারাধ্য মহাপুরুষজীকে আমার জয়রামবাটী যাবার অভিপ্রায় জানিয়ে দিলেন। পূর্বেই বলেছি, আমি সেদিন মঠে গিয়েছিলাম। তখন বিকেল হয়ে গেছে। সহসা একজন এসে আমাকে জানালেন যে, পূজ্যপাদ মহাপুরুষজী আমাকে ডেকে

পাঠিয়েছেন। শুনেই তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি তখন স্বামীজীর ঘরের ঠিক পশ্চিমের ঘরে একটি চেয়ারে উপবিষ্ট। আমাকে দেখেই জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি জয়রামবাটী যাবে?" আমি সম্মতি জানাতে বললেন, "বেশ হয়েছে। ঐ রায়পুরীও যাবে। ও তো বাংলা বোঝে না, তুমি সঙ্গে থাকলে কোন অসুবিধা হবে না। তুমি দোভাষীর কাজ করবে।" কথা শুনে জিজ্ঞেস করলাম, "মহারাজ, ভদ্রলোক কোন্ রাস্তায় যাবেন?" শুনেই মহাপুরুষজী হেসে বললেন, "ওকে বিষ্ণুপুর দিয়ে যেতে হবে।" আমি তো প্রমাদ গুণলাম, কারণ ও-রাস্তায় যেতে হলে যত খরচ লাগবে, তত টাকা আমার ছিল না। কিন্তু মহাপুরুষ মহারাজ নিজেই যেন আমার চিন্তাগুলি দেখতে পেলেন এবং বলে উঠলেন, "আরে, তা তো বটেই। তুমি স্টুডেন্ট। কোথায় পাবে টাকা? তোমার খরচ তাকে দিতে হবে। ও এমন সুবিধা কোথায় পাবে? তুমি তাকে বলগে যে, তোমার খরচা তাকেই দিতে হবে।" আমি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মহাপুরুষ মহারাজ সন্ন্যাসী; তিনি যে কথা নির্বিকারে বলতে পারেন, আমি তা কি করে বলি! আমি তখন যুবক, পড়ি। আমার আত্মসম্মান, চক্ষুলজ্জা সবই যে আছে। পুনরায় তিনি বলে উঠলেন, "তুমি যাও, তাকে গিয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।" তাই করা গেল। নিচে গিয়ে সে ভদ্রলোককে বলতেই তিনি মহাপুরুষ মহারাজের নিকট চলে গেলেন, এবং অল্প পরেই ফিরে এসে জানালেন যে, আমি তাঁর সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের দেশে গেলে তিনি আনন্দের সঙ্গে আমার খরচ দেবেন। যাবার দিন ঠিক হয়ে গেল, এবং গোমো প্যাসেঞ্জারে যথাসময়ে রওনা হলাম।

কোয়ালপাড়া পৌঁছে শুনলাম শ্রীশ্রীমা সেখানেই আছেন। শুনে খুবই আনন্দ হলো। কিন্তু পরেই শুনলাম, তাঁর জ্বর। একটু পরেই আমাদের ডাক পড়ল মাকে প্রণাম করবার জন্য। গিয়ে দেখলাম তিনি একটি তক্তপোশের উপরে শুয়ে আছেন। ঘরে ঢোকা নিষেধ, তাই বারান্দা থেকে চৌকাঠে মাথা রেখে প্রণাম করলাম। তারপর বরদা মহারাজের (স্বামী ঈশানানন্দের) সঙ্গে মায়ের বাড়ি জয়রামবাটী থেকে ঘুরে আসা গেল। এসেই কিন্তু শুনলাম, মা আদেশ করেছেন, 'কলকাতা থেকে যেসব ছেলেরা এসেছে, তারা যেন প্রসাদ পেয়ে সেই দিনই ফিরে যায়।' কাজেই ফিরে আসতে হলো, আমারও অবশ্য ফিরে আসাই ছিল অভিপ্রায়।

কলকাতায় ফিরে বোধ হয় সেদিনই মঠে গেলাম। মহাপুরুষ মহারাজ পূর্বেই আমাদের ব্যর্থকাম হয়ে ফিরে আসার সংবাদ শুনেছিলেন। এখন আমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শ্রীশ্রীমায়ের খবর সব জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। আমিও যতটা জানতাম সব তাঁকে নিবেদন করে সেদিনই যে ফিরে এসেছি তাও তাঁকে জানালাম।

সব শুনে তিনি বললেন, "আরে, বেশ করেছ, বেশ করেছ।" তাঁর ঐরূপ কথায় উৎসাহিত হয়ে বলতে আরম্ভ করলাম, "মহারাজ, দেখলাম সে দেশে পুকুরগুলি সব পানায় ভরতি, লোকগুলো ময়লা-রং, পেটফোলা, মাটি পর্যন্ত কালো ফাটল-ধরা।" আর যায় কোথা! মহাপুরুষজী সহসা ধমক দিয়ে উঠলেন, "তুমি কোন্ বিলেত থেকে এসেছ হে? আমাদের বঙ্গদেশে সবই এই রকম। লোকগুলো কালো, মাটি কালো! তোমার দেশ কোথায় হে? ছেলের রকম দেখ না, যেন বিলেত থেকে এলেন!" আমি তো ভয়ে জড়সড় হয়ে গেলাম। আর কিছু করারও উপায় নেই। লোকের বা স্থানের দোষ দেখা বা নিন্দা করা, এই তো লাগে ভাল। তা যে অদোষদর্শী মহর্ষিদের দৃষ্টিতে দোষাবহ, তা জানব কেমন করে? যা হোক, কিছু পরে তিনি থামলেন; আমি তাঁর কাছ থেকে সরে গিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। ভাবতে লাগলাম, এঁরা যে কি দেখেন, কি ভাবেন, তা আমাদের বুদ্ধির একেবারেই অগম্য! পরে শুনেছিলাম জয়রামবাটী অঞ্চলের কোন নিন্দা বা সমালোচনা তাঁরা সহ্য করতে পারতেন না—এত গভীর ছিল শ্রীশ্রীমায়ের উপর তাঁদের শ্রদ্ধা।

বোধ হয় এর একদিন কি দুদিন পরেই আবার মঠে গেছি। মহাপুরুষজীকে প্রণাম করতেই তিনি বললেন, "মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দজী) মায়ের খবর সব শুনতে চাচ্ছেন তাঁকে গিয়ে সব বল।" একথা হচ্ছিল দ্বিতলে তাঁর ঘরে বসে। পূর্বোক্ত কথা কটি বলেই তিনি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে চললেন যেখানে রাজা মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দজী) দ্বিতলের পূর্বদিকের বারান্দায় একটি আরাম কেদারায় বসেছিলেন, সেখানে। এর দু-এক দিন আগেই যে আমার কোয়ালপাড়া সম্বন্ধে নিন্দাবাদ শুনে আমাকে ভর্ৎসনা করেছিলেন, তা এঁর মন থেকে কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেছে, তার চিহ্নমাত্রও নেই! যা হোক, ঐ বারান্দায় উপস্থিত হয়েই বললেন, "রাজা, এই ছেলেটি গিয়েছিল মায়ের দেশে, এর কাছে সব শুনতে পার।" তিনি একবার আমার দিকে ফিরে চেয়ে বললেন, "আপনিই তো শুনেছেন, ওতেই হবে।" মহাপুরুষ মহারাজ নিজের ঘরে ফিরে গেলেন, আমি সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। একবার রাজা মহারাজ আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে প্রশ্ন করলেন "মায়ের ওখানে গিয়েছিলি?" আমি বললাম, "আজ্ঞে, হ্যাঁ।" "তবে চলে এলি কেন? সেখানে তাঁর সেবা করতে হয়। এমন opportunity কখনও ছাড়ে? দ্যাখ দেখি কি করলি? জয়রামবাটী গিয়েছিলি?" বললাম, "আজ্ঞে, হ্যাঁ।" "কামারপুকুর গিয়েছিলি?"—পুনরায় প্রশ্ন করলেন শ্রীশ্রীপ্রভুর মানসপুত্র। উপায় নেই, বলতে হলো "আজ্ঞে, না।" আক্ষেপের সুরে বলে উঠলেন, "অত দূরে গিয়ে ঠাকুরের জন্মস্থান দর্শন না করে ফিরে এলি? এমনও কখনও করে?" মাথাটি হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করতে পারলাম না।...

আর একদিনের কথা। কোন্ সাল ঠিক মনে নেই। হয়তো ১৯১৮-১৯ হবে। শ্রীমহাপুরুষজীর পায়ের কাছে বসে আছি; এমন সময় আর একটি যুবক তাঁকে প্রণাম করে জিজ্ঞেস করল, 'মহারাজ, আমার রাগ হলে একেবারে জ্ঞানহারা হয়ে যাই। তখন আমার মাকে পর্যন্ত অতি কঠোর ভাষায় গালমন্দ করি। পরে আমার অনুতাপ হয়। কি করি, মহারাজ?' অতি সহানুভূতির সুরে মহাপুরুষজী বলছেন, "মাকে কটূক্তি করা তো ভাল নয়। তবে এটা যে দোষ, তা তুমি যখন বুঝতে পেরেছ, তখন ওটা কেটে যাবে। মনে মনে খুব দৃঢ় সঙ্কল্প করবে যে, আর কখনও অমন করবে না। আর যদি না সামলাতে পেরে ঐ রকম করেই ফেল, তবে রাগ থেমে যাবার পর মাকে প্রণাম করে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইবে। বলবে, 'মা, আমি রাগের মাথায় সামলাতে না পেরে তোমাকে কটুকথা বলেছি, আমায় ক্ষমা কর'।" ছেলেটি তারপর এক মজার প্রশ্ন করে বসল, "মহারাজ, শুনেছি স্বামীজী ঠাকুরকে দেখতে পেতেন, আপনারা কি দেখতে পান?" অহংবুদ্ধিশূন্য মহাপুরুষজী জবাব দিচ্ছেন, "হ্যাঁ, স্বামীজী দেখতে পেতেন। আমরা তা...অবশ্য আমরা সে...আমরা...দেখ এসব প্রশ্ন করতে নেই।" ছেলেটি আবার প্রশ্ন করল, "মহারাজ, গুরু তো একজনই থাকবেন, তাঁকে আর বদলাতে নেই?" "না, গুরু বদলাতে নেই"—বললেন মহাপুরুষজী। ছেলেটি তখন বলল, "মহারাজ, এ জন্মে যিনি আমার গুরু হবেন, জন্মান্তরে তাঁকে আবার চিনব কি করে?" প্রথম জবাব এলো, "সচ্চিদানন্দই একমাত্র গুরু; আবার কে গুরু?" এ কথা বলেই বললেন, "ঠিক গুরুবরণ হয়ে গেলে আবার জন্মাবে কেন?" সন্তুষ্টচিত্তে প্রণাম করে ছেলেটি বিদায় গ্রহণ করল।...

১৯১৮ সালের ঘটনা; শুনেছি পূজনীয় স্বামী নির্বেদানন্দজীর মুখে। তখন বর্তমান স্টুডেন্টস হোমের নাম ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম। এর আগে পূজ্যপাদ মহাপুরুষজী অনাদি মহারাজকে (স্বামী নির্বেদানন্দজীকে) বলেছিলেন, তিনি যে কাজটি আরম্ভ করেছেন অর্থাৎ ঐ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, তাতে লেগে থাকতে। কিন্তু অনাদি মহারাজের প্রায়ই মনে হতো ঐ আশ্রম ত্যাগ করে মঠে যোগ দেওয়াই শ্রেয়। আর ঐ আশ্রমে ফিরবেন না, এ রকম দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে একদিন সকালে তিনি মঠে গেলেন। সেখানে গিয়ে তাঁর প্রথমেই দেখা হলো রাজা মহারাজজীর সঙ্গে। তিনি বসেছিলেন মঠবাড়ির নিচের তলায়, খুব সম্ভবত উঠানে আমগাছতলায় একটি চেয়ারের ওপর। তাঁকে প্রণাম করেই অনাদি মহারাজ বললেন, "আমি মঠে থাকব।" নিতান্তই অসহায় বালকের মতো যুগাবতার ভগবান রামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র বললেন, "বাবা, আমি তো এখানকার কেউ নই।" হাতজোড় করে উপরের দিকে দেখিয়ে বললেন, "ঐ ওখানে মহাপুরুষ বসে আছেন, তাঁকে গিয়ে

বল।” রাজা মহারাজের অতি সরল অতুলনীয় বালকভাব ভাষায় বর্ণনা করা যায় না! তাঁকে স্থূল শরীরে দর্শন করার সৌভাগ্য যাঁদের ঘটেছে তাঁরাই এই ব্রজগোপালের বালমধুর ভাবের কিছু কিছু আস্বাদ লাভ করেছেন। যা হোক, অনাদি মহারাজ (তখন সুরেনবাবু) তাঁর ঐ উক্তিকে অলঙ্ঘনীয় আদেশরূপে গ্রহণ করে বিনা বাক্যব্যয়ে উপরে গেলেন মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে। সেখানে তাঁকে প্রণাম করেই নিবেদন করলেন নিজের অভিপ্রায়। শুনেই মহাপুরুষজী অতি স্নেহপূর্ণ বাক্যে বোঝাতে আরম্ভ করলেন অধুনা সুপরিচিত স্টুডেন্টস হোমের স্থাপয়িতা ও বাহককে। তিনি বললেন, “যে কাজ আরম্ভ করেছ, তাতেই লেগে থাক। এতে বহুর কল্যাণ হবে, তোমারও মঙ্গল। এটি স্বামীজীর খুবই অভিপ্রেত কাজ। এতদিন লোকাভাবে আরম্ভ করা যায়নি। এখন যখন ঠাকুরের ইচ্ছায় তুমি এ কাজটি আরম্ভ করেছ, তখন ওতেই লেগে থাক। আর ওটি তোমারও ধাতের উপযোগী কাজ; এতে তোমারও কল্যাণ হবে। তুমি তো আমাদেরই আছ! বেলুড় মঠ কি মঠবাড়ির চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ? তুমি এখানে এলে যে এখানেই থাকতে পারবে তার কি মানে আছে? তোমাকে মাদ্রাজ পাঠাতে পারি, আমেরিকায় পাঠাতে পারি, বা আর কোথায়ও পাঠাতে পারি। এ তো মঠের অতি কাছে কলকাতায় আছ; যখন খুশি আসতে পার। আর মঠে এলে তোমাকে যে কাজ দেয়া হবে সেটি তোমার উপযোগী নাও হতে পারে। তার চেয়ে নিজের ধাতমত একটি কাজ বেছে নিয়েছ, এতে তোমার কল্যাণই হবে। আর আমি বলছি, এ কাজে তোমার আধ্যাত্মিক কল্যাণের কখনও বাধা ঘটবে না। আর ধর, যদিই বা এতে তোমার spiritual progress (আধ্যাত্মিক উন্নতি) কিছুটা hamper করে (বাধাপ্রাপ্ত হয়),—আমি বলছি করবে না, তবুও স্বামীজীর জন্য কি একটা life sacrifice (জীবন উৎসর্গ) করতে পারবে না?” আবেগভরা কণ্ঠের এই উক্তিতে ভবিষ্যৎ স্বামী নির্বেদানন্দজীর সকল সঙ্কল্প ভেসে গেল; বিনয়নম্র কণ্ঠে তিনি বললেন, “পারব, মহারাজ।” ইতোমধ্যে পূজ্যপাদ রাজা মহারাজজী এসে মহাপুরুষজীর ঘরে ঢুকে বলতে আরম্ভ করলেন, “টেনে নিন না, মশায়; টেনে নিন না! ওর তো সময় হয়েছে।” মৃদুহাস্যে মহাপুরুষজী জবাব দিলেন, “ও একটা ভাল কাজ করছে; অনেক ছেলে মানুষ হবে।” “ও একা মানুষ হলে লাখ মানুষ হবে”—বললেন মঠ ও মিশনের প্রথম সর্বাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী। বলেই আবার বললেন, “ওর তো দেখছি দীক্ষা হয়নি; দীক্ষাটা দিয়ে দিন না!” পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, “আমি তো দেই না; তুমি দিয়ে থাক, তুমি দাও।” রাজা মহারাজ বললেন, “দেন না বলেই তো বলছি; অনেক জমিয়েছেন, কিছু খরচ করুন।” এবারও মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, “না, ও তুমিই দিয়ে থাক; তুমি দেবে।” “তা আপনার আদেশ হলেই আমি লেগে যেতে

পারি।”—করজোড়ে হাসতে হাসতে প্রার্থনার ভঙ্গিতে বললেন রাজা মহারাজ। তাঁর কাছ থেকে এর কয়েক দিন পরেই মন্ত্রদীক্ষা লাভ করলেন অনাদি মহারাজ।...

আর একটি ঘটনা; খুব সম্ভবত ১৯১৮ সাল। পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজের ভাণ্ডারার দিন বিকেল। গঙ্গার ধারে লন-এ একটি ছোট সভাও হয়ে গেছে। অন্যান্য বক্তার মধ্যে স্বামী কমলেশ্বরানন্দও কিছু বললেন। বলতে বলতে তিনি অশ্রু সংবরণ করতে পারেননি। পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, “ললিত বাবুরাম মহারাজের কথা বলতে আরম্ভ করলে আর নিজেকে সামলাতে পারে না।” তারপরেই বলতে আরম্ভ করলেন—বাম হাতটি মুষ্টিবদ্ধ, ভ্রূ সঙ্কুচিত; যেন প্রত্যেকটি কথার উপর জোর দিতে চাচ্ছেন—“গাজীপুরে স্বামীজীর ভেতর তখন দারুণ বিরহ চলছে। ঠাকুরের অদর্শনে বিরহের জ্বালায় তাঁর ভেতরটা যেন জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে! ঠাকুরের অদর্শন তিনি আর সহ্য করতে পারছিলেন না। বাবুরাম মহারাজ গিয়ে তাঁকে ওখান থেকে নিয়ে আসার চেষ্টা করছেন। স্বামীজীর ভেতরে সেই দারুণ বিরহ চলছে। তিনি বলছেন, ‘তুই যা এখান থেকে। তোর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। ঠাকুর নেই। তিনি নির্বাণ নিয়ে নিয়েছেন। তাঁকে নিয়ে তো তোদের সঙ্গে সম্পর্ক। তিনি তো আর নেই। তোদের সকলের সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক ঘুচে গেছে। তুই চলে যা।’ বাবুরাম মহারাজ ভাবছেন যে, পওহারী বাবার পাল্লায় পড়েই স্বামীজী ঐ রকম বলছেন। তাঁকে একবার কোন গতিকে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে আসতে পারলেই তাঁর এ ভাবটা কেটে যাবে। তাঁকে ওখান থেকে নিয়ে আসবার জন্য তিনি তাই প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। কিন্তু স্বামীজীর ভেতর তখন সেই বিরহ চলছে। তাই তিনি বলছেন, ‘ঠাকুর আর নেই; তিনি নির্বাণ নিয়ে নিয়েছেন। তাঁকে নিয়েই তোদের সঙ্গে সম্পর্ক। তিনি আর নেই। তোদের সঙ্গেও আমার সব সম্পর্ক ঘুচে গেছে! তুই চলে যা।’ কিছুতে তাঁকে টলাতে না পেরে বাবুরাম মহারাজ কাঁদতে কাঁদতে চলে এলেন। আর সেদিন রাত্রেই ঠাকুর স্বামীজীকে দর্শন দিলেন, আর তাঁর ভিতরটা শান্তিতে ভরপুর হয়ে গেল। তারপরেই তিনি গাজীপুর থেকে চলে এলেন।” সব শুনে ললিত মহারাজ, “তবে তো প্রেমেরই জয় হলো।” একটু হেসে মহাপুরুষজী বললেন, “তা তো বটেই।”

* * *

খুব সম্ভবত ১৯১৯-এর স্বামীজীর তিথিপূজা। সকালেই মঠে গেছি। সেদিন স্বামীজীর ঘরের সামনে একজনকে পাহারায় থাকতে হতো। ঐ কাজের ভার পড়ল আমার ওপরে। স্বামীজীর ঘরের কাছে দাঁড়িয়ে আছি; একটু পরে যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদ দয়াঘন-মূর্তি পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ তাঁর

ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। এসেই হাত নেড়ে নেড়ে হাসিমুখে বলতে আরম্ভ করলেন, "এ রামজীকা মন্দির হ্যাঁয়, আউর ভরত পহারা। রামজীকা মন্দির হ্যাঁয়, আউর ভরত পহারা হ্যাঁয়।" বারে বারেই কথাটি বলতে লাগলেন। কত কথাই বলতে ইচ্ছা হলো, কিন্তু মুখ ফুটে একটি কথাও বেরুল না। তাঁর প্রতিটি কথায় অহেতুক করুণা বর্ষার বারিধারার মতো ঝরে পড়ছিল নিতান্তই অযাচিতভাবে আমার শিরে। বাক্‌শূন্য হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। একটু পরে মহাপুরুষ মহারাজ ফিরে এলেন নিজের ঘরে।

খানিক পরে প্রসাদের ঘণ্টা পড়ল। তখন সকাল নটা—সাড়ে নটা হবে। এ প্রসাদের অর্থ সকালের জলখাবার। একটু পরেই পূজ্যপাদ মহাপুরুষজী তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, বললেন—"প্রসাদের ঘণ্টা পড়ল। তুমি গেলে না?" বললাম, "যাবখন।" মনে মনে জানি আমার একজন বদলি না এলে যাব না। যা হোক, একটু পরে তিনি আবার এসে হাজির—"কই, তুমি প্রসাদ পেতে গেলে না?" এবার উত্তর দিলাম, "মহারাজ, সে যাওয়া যাবে এখন।" তিনি চলে গেলেন। একটু পরেই বেরিয়ে এলেন, হাতে একটি বাটি; আমার হাতে দিয়ে বললেন, "এই নাও। স্বামীজীর প্রসাদ।" একটু সঙ্কোচমিশ্রিত হাসিমুখে বললেন, "আমি একটু খেয়েছি; তা স্বামীজীর প্রসাদ, ওতে দোষ হবে না।" দু হাত পেতে পাত্রটি নিলাম; মনে হলো—'স্বামীজী গ্রহণ করেছিলেন কিনা জানি না; তবে প্রত্যক্ষ পাচ্ছি আপনার প্রসাদ।' এরপর আরও একদিন প্রসাদ দিয়েছিলেন। কোন্ বছর মনে নেই। তিনি রাজা মহারাজের সঙ্গে দীর্ঘ দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ করে ফিরেছেন। একদিন সকালে মঠে গেছি। তাঁকে প্রণাম করতেই বললেন, "দেখ তো, ঐখানে একটা কাপের মধ্যে কি আছে? আমি খানিকটা খেয়েছি; বাকিটা খেয়ে ফেল।" দেখলাম এক বড় কাপের প্রায় তিনভাগ ভরতি দুধ আর ক্রিমক্র্যাকার বিস্কুট। বললেন, "এখানে দাঁড়িয়ে খাও।" আমি একটু ইতস্তত করছিলাম, তাঁর ব্যবহারের জিনিস! কিন্তু কিছুই উপায় রইল না; আবার বললেন, "খাও, খেয়ে কাপ ধুয়ে রেখে যাও।" তাই করলাম। কি যে সুস্বাদ লাগল, তা আর কি বলব!...

১৯২০ সাল; বি. এ. পরীক্ষা হয়ে গেল। পরীক্ষায় কিন্তু হলাম অকৃতকার্য। পাস ফেল যাই হোক, আর যে পড়ব না তা আগেই ঠিক করেছিলাম। মঠে তো গেছি। সেখানে গিয়ে মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করতেই জিজ্ঞেস করলেন, "পরীক্ষায় ফেল করেছ?" আমি বললাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ।" "কিসে ফেল করলে?"—তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন। বললাম, "আজ্ঞে, অঙ্কে।" "তা ওতে আর কি হয়েছে? ওর জন্য মন খারাপ কর না, আর একটা বছর তো! এক বছর পড়ে পরীক্ষাটা

দিয়ে দাও। ও পাশ করে যাবেখন। পরীক্ষায় পাশ ফেল, ও সামান্য একটুতেই হয়ে যায়। ওনিয়ে মন খারাপ কর না, আর একটা বছর পড়। ও সামান্য পরীক্ষা, পাস করে যাবেখন।" আমি তো পড়লাম মহামুশকিলে; মনে মনে ঠিক করেছি আর পড়ব না। এদিকে এঁর এই দ্বিধাহীন আদেশ। কি করা যায়? সহসা প্রশ্ন করলেন, "কি, পড়বে তো?" "আজ্ঞে, আমার আর পড়ার ইচ্ছা নেই"—জানালাম অবনত মস্তকে। "বেশ, সেই ভাল"—এলো সোৎসাহ উত্তর। "ও যারা চাকরি-বাকরি করবে তাদের জন্য একটা ডিগ্রীর প্রয়োজন। আমাদের একটু ইংরেজি আর একটু সংস্কৃত জানলেই হলো। তাতে তো তুমি পাস করেছ। অঙ্কে আমাদের কি প্রয়োজন? সেই ভাল।" হাঁপ ছেড়ে বাঁচা গেল।

এ বছরই একদিন পূজনীয় অনাদি মহারাজ এসে জানালেন যে, সেবার মঠের দুর্গাপূজায় আমি হয়েছি নির্বাচিত পূজক। প্রথমটা তো ভয়ই লাগল! যা হোক, আর যখন উপায় নেই তখন পুজোর কয়েকদিন আগেই মঠে চলে গেলাম, মঠে প্রচলিত পূজাপদ্ধতি যদ্দুর সম্ভব আয়ত্ত করবার জন্য। একদিন প্রায় সন্ধ্যেবেলা, স্বামীজীর একখানা চটি ইংরেজি বই, বোধ হয় চিকাগো বক্তৃতা, মঠের সামনের রোস্তার উপর পায়চারি করতে করতে পড়ছিলাম। গঙ্গার দিকের বেঞ্চিতেই বসেছিলেন মহাপুরুষ মহারাজ। তিনি একজনকে বললেন, "ও ছোকরাকে ডাকো তো।" কাছে আসতেই বললেন, "এবার কি দুর্গাপূজা হবে ইংরেজিতে?" লজ্জায় মরে গেলাম।...যা হোক পূজা আরম্ভ হচ্ছে। আমি বিলক্ষণ সন্ত্রস্ত হয়েছিলাম; একে মঠের দুর্গাপূজা, তায় সন্ধিপূজা ছিল প্রায় শেষ রাত্রে! শেষ পর্যন্ত পারব কি না কে জানে? বোধনের জন্য আগে থেকেই একটি বেলের ডাল এনে মঠের ঠাকুরঘরের সামনের বারান্দায় রাখা হয়েছিল। সান্ধ্যারতির পরে সেখানে যখন চলেছি অধিবাসের জন্য, ঠাকুরের ঘরের দরজায় সিঁড়ির মুখে দেখা হলো মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে। অপ্রত্যাশিতভাবে তিনি করলেন আশীর্বাদ। আমারও সকল সঙ্কোচ ঘুচে গেল। তাঁরই অমোঘ আশীর্বাদে পূজা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে গেল। দশমীর দিন সকালে দর্পণ-বিসর্জনের পরেই প্রণাম করলাম পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজকে। তিনি বসেছিলেন মঠের বারান্দায় পশ্চিম দিকের ছোট বেঞ্চিখানার উপর। তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ মণ্ডপস্থ দেবীর মুখের ওপরে। একটু হাসিভরা মুখে বললেন, "মন্তরটি পড়া হলো, আর দেবীর মুখের ভাবও বদলে গেল।" এই ঋষির দৃষ্টি আমরা কোথায় পাব? আমাদের দৃষ্টিতে ছিল প্রাণপ্রতিষ্ঠার পূর্বে, প্রাণপ্রতিষ্ঠার পরে এবং দর্পণ-বিসর্জনের অন্তে একই মূর্তি। পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজজীর বলার পরেও কোন তফাত দেখতে পাওয়া গেল না। যাই হোক, আশীর্বাদ করলেন খুবই।

ক্রমে লক্ষ্মীপূজা এলো। পূজক ভাব মহারাজ; আমি তন্ত্রধারক। আমিও অবশ্য উপবাসী ছিলাম। ঐদিন সন্ধ্যার পরেই ছিল চন্দ্রগ্রহণ। তাই পূজা খুব শীঘ্র শীঘ্র সেরে নিতে হলো। পূজা শেষ হতে হতেই গ্রহণ লেগে গেল। তাই তখন আর কিছু খাওয়া হলো না। ঐ সময় নিত্যই মহাপুরুষ মহারাজের পা একটু টিপে দিতাম সন্ধ্যার পর। সেদিনও তাই তাঁর কাছে যেতেই বললেন, "আজ পারবে?" আমি বললাম, "পারব।" তিনি হাসতে হাসতে বললেন, "আমি কিন্তু না খেয়ে থাকতে পারব না। আমার ক্ষিদে পেয়েছে।" বলেই একজনকে আদেশ করলেন তাঁকে কিছু খেতে দেবার জন্যে। সে দিল একটি রাজভোগ। সেটি খেয়েই বললেন, "Superstition! একটা গ্রহের ছায়া পড়েছে আর একটা গ্রহের উপরে। এই তো ব্যাপার। হ্যাঁ, তবে nature-এ এত বড় একটা পরিবর্তন! এতে সহজেই লোকের মন একাগ্র হয়। এ সময় যদি ধ্যান-জপ করে, সে খুব ভাল। যারা পুরশ্চরণ করবে তাদের আজ খুব জুত।" শেষের কথা-কটি বলার কারণ যে, সেদিন গ্রহণ একটু দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল।...

১৯২১ সালের প্রথমেই পূজনীয় অনাদি মহারাজ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুখ ক্রমশ খারাপের দিকে যেতে লাগল। এক সময় তিনি শরীরের বিভিন্ন অংশে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করতেন, "এটা কার?" এ রকম সময় একদিন পূজ্যপাদ মহাপুরুষজী এলেন তাঁকে দেখতে। এসেই গিয়ে বিছানার উপরে তাঁর মাথার কাছটিতে বসলেন। জিহ্বায় অত্যন্ত ঘা হওয়ায় অনাদি মহারাজের কথা তখন অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তিনি আস্তে আস্তে বললেন, "উঁচু চিন্তা মাথা থেকে সলাতে (সরাতে) পাচ্ছি না। বল (বড়) কষ্ট হচ্ছে।" মহাপুরুষজী তাঁর মাথায় হাত বুলুতে বুলুতে বললেন, উঁচু চিন্তা এখন থাক। ও পরে আবার হবে।" পরে এসে বারান্দায় উপবেশন করলে মহাপুরুষজীকে জিজ্ঞেস করা হলো একটু কিছু প্রসাদ দেব কিনা। বেশ জোর দিয়েই বললেন, "হ্যাঁ, দাও।" শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিবেদিত ফলমিষ্টি তাঁকে দেওয়া হলো। তিনি সামান্যই গ্রহণ করলেন এবং অল্প পরেই চলে গেলেন।

এর পর থেকেই পূজনীয় অনাদি মহারাজ আস্তে আস্তে সেরে উঠতে লাগলেন। তিনি পরে বলেওছিলেন যে, মহাপুরুষজীর পূর্বের কথার পর থেকেই অসুখের ভেতর 'উঁচু চিন্তা' চলে যায়। তারপর আর কখনও আগের মতো নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্পর্শ করে 'এটা কার?'—এরূপ প্রশ্ন করেননি।...

পরম পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের খাওয়ারও এক বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি দুপুরে সব সাধু-ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে একত্র পঙক্তিতে বসে খেতেন। ঠাকুরদের ভোগে যা কিছু উঠত, সবই তাঁকে সাজিয়ে দেওয়া হতো। পূজার সময় ঠাকুরদের যে ফলমিষ্টি

নিবেদন করা হতো, তারও কিছু কিছু একটি রেকাবিতে সাজিয়ে তাঁকে দেওয়া হতো। আর দেওয়া হতো একটা বাটিতে খানিকটা পলতা বা নালতে পাতার ঝোল। তিনি কিন্তু সবই একটু একটু চেখে দেখতেন। আলাদা একটা বাটিতে ঠাকুরদের প্রসাদী পায়েসও তাঁকে দেওয়া হতো। তিনি যে কটি ভাত খাবার তা ওই নালতে পাতার ঝোল দিয়েই খেতেন। আর সবই একটু একটু চেখে দেখতেন মাত্র। বলতেন, "বাঃ বেশ হয়েছে।" কিন্তু কোন ব্যঞ্জনে যদি তরকারির বিসদৃশ সংযোগ ঘটত, তা মোটেই তাঁর নজর এড়াত না। বলে উঠতেন, "এ কি combination হয়েছে? যা তা একটা মিলিয়ে দিলেই হলো?" পরে বাটি থেকে একটু পায়েস নিয়ে দুটি ভাতের সঙ্গে মেখে একটু খেতেন। তারপর সবটুকু পায়েস পাতে ঢেলে যে ভাত থাকত তার সঙ্গে মেখে ফেলতেন; প্রসাদী ফলমিষ্টির থালা থেকে সন্দেশটি তুলে তাও ঐ ভাতের সঙ্গে মেখে বেশ একটি বড় ডেলা প্রস্তুত করে বলতেন, "বড়দা, এই রইল।" তারপর যখন জয় দিয়ে সাধুব্রহ্মচারীরা উঠে পড়তেন তখন বড়দা ঐ ভাতের ডেলাটি নিয়ে দিতেন একটি কুকুরকে। আর কুকুরটা সারাক্ষণ উঠোনে একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকত, বোধ হয় মহাপুরুষ মহারাজের দিকে তাকিয়ে।...

গ্রীষ্মকাল। সেদিন বেশ গরম। সকলের সঙ্গে পূজ্যপাদ মহাপুরুষজীও এসে খেতে বসলেন। ভাব মহারাজ (স্বামী রামেশ্বরানন্দ) নিজে খেতে না বসে একটি হাত-পাখা নিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে পূজ্যপাদ মহাপুরুষজীকে হাওয়া করতে লাগলেন। ক্রমে খাওয়া শেষ হলো। মহাপুরুষ মহারাজ প্রসাদী ফলমিষ্টির রেকাবিতে কিছু ফলমিষ্টি সাজিয়ে রেখে হাসতে হাসতে বললেন, "ভাব, এই যে এতক্ষণ হাওয়া করলে, তার মজুরি।" হাসিমুখে ভাব মহারাজ জবাব দিলেন, "অন্য মজুরি চাই না, মহারাজ চাই একটু আশীর্বাদ।" "আরে আশীর্বাদ তো আছেই, এটা নগদ বিদায়।"—বললেন শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ।...

* * *

১৯২৩-এর ৺বাসন্তীপূজা। হবে ভুবনেশ্বর মঠে। ভবানী মহারাজ (স্বামী বরদানন্দ) একদিন এসে অনুরোধ জানালেন, ভুবনেশ্বর যেতে হবে ৺বাসন্তীপূজা করবার জন্যে। এ বছরই শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজার সময় সন্ন্যাস চেয়েছিলাম। কিন্তু কোন ফল হয়নি। পরমারাধ্য মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে বলেছিলেন, "এ ambition" কথা একেবারে ঠিক। কিন্তু তখন তা বোঝে কে? যা হোক, আমার অভিমানেও লেগেছিল দারুণ আঘাত। যদিও তিথিপূজার পর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে, তবুও আমার সেই ঘা তখনও শুকোয়নি। তাই ভবানী মহারাজ যখন এসে অনুরোধ জানালেন ৺বাসন্তীপূজা করতে ভুবনেশ্বর যাবার জন্যে, তখন সে অনুরোধ

উপেক্ষা করলাম। ভবানী মহারাজ অনেক বোঝালেন; কিছুই ফল হলো না, আমি তাঁর কোন কথাই শুনলাম না। তিনি ফিরে গেলেন। দু-এক দিনের মধ্যেই খবর এলো, পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন। মঠে গিয়ে মহাপুরুষজীকে প্রণাম করতেই হাসতে হাসতে তিনি বলে উঠলেন, "আরে, ভরত নাকি আমাদের উপর রাগ করেছ? আরে ভরত আমাদের ছেলে, আমাদের সন্তান, আমরাই তার আপনার জন; আমরা যা বলব তাই করবে। আমাদের কথা শুনবে না তো আর কার কথা শুনবে? আমরা যা বলবো তাই করবে।"—ইত্যাদি অনেক কথা বলতে লাগলেন। এত মিষ্টি কথা তো কখনো শুনিনি! যেন মধুবর্ষণ হলো! সব রাগ অভিমান কোথায় চলে গেল। কে জানে, তিনিই হয়তো আমার অন্তরের ময়লা-মাটি ধুয়ে পরিষ্কার করে দিলেন! কি বলব কিছুই ভেবে পাচ্ছিলাম না। আস্তে আস্তে বললাম, "মহারাজ, শুনেছি ঐ সময় জয়রামবাটীতে মায়ের মন্দির-প্রতিষ্ঠা হবে, সেখানে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে; আবার রাজা মহারাজের প্রতিষ্ঠিত ভুবনেশ্বর মঠে বাসন্তীপূজা, সেখানেও যেতে ইচ্ছা হচ্ছে। এ দোটানায় পড়ে গেছি। এখন কি করব, আপনি বলে দিন।" বেশ প্রসন্নচিত্তে মহাপুরুষজী বললেন, "শরৎ মহারাজ আমাকে বলেছেন মায়ের মন্দির-প্রতিষ্ঠা পেছিয়ে দেবেন। যদি তা না হয়, তবে তুমি জয়রামবাটী যাবে। তা না হলে তোমাকে ছাড়ব না, ভুবনেশ্বর যেতে হবে।" আমিও মহানন্দে তাঁর আদেশ শিরোধার্য করে ফিরে এলাম।

৺বাসন্তীপূজা উপলক্ষে মহাপুরুষজীর সঙ্গে একই ট্রেনে ভুবনেশ্বর যাওয়া গেল। ঐ ট্রেনে আরও অনেক সাধু-ব্রহ্মচারী গিয়েছিলেন; তাঁদের মধ্যে ছিলেন পূজনীয় স্বামী শঙ্করানন্দ ও অম্বিকানন্দজী। মঠে পৌঁছেই গেলাম মূর্তি দেখতে। স্থানীয় কারিগরের প্রস্তুত মূল মূর্তি আমার মোটেই ভাল লাগল না। স্বামী অম্বিকানন্দ প্রভৃতিও মূর্তি অপছন্দ করলেন। কিন্তু নানাকলাবিদ্যা বিশারদ স্বামী অম্বিকানন্দ লেগে গেলেন সেই মূর্তিটি শোধরাতে। আমি কিন্তু আর দ্বিতীয়বার মূর্তি দেখতে যাইনি। আমাদের যাবার আগে পূজার ব্যবস্থা হয়েছিল উঠোনে, এজন্যেই মূর্তিটি তোলা হয়েছিল একটি একচালার তলায়। আমাদের যাবার পরে সবাই পরামর্শ করে স্থির করলেন, মঠবাড়ির মধ্যেই প্রশস্ত হলঘরে পূজা হবে। যা হোক, প্রতিমা অতি সন্তর্পণে তুলে এনে স্থাপন করা হলো হলঘরে। তারপর ষষ্ঠীর দিন সকালে দ্বিতীয়বার সেই মূর্তি দেখে অবাক হয়ে গেলাম। স্বামী অম্বিকানন্দ মহারাজের সুদক্ষ হস্তের স্পর্শে এ কি অদ্ভুত পরিবর্তন! সত্যিই এখন মূর্তিটি হয়েছে অতি সুন্দর!

পূজা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে গেল। নানাবিধ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা হয়েছিল। পূজার মধ্যে একদিন স্থানীয় একজন পণ্ডিত তাঁর রচিত একটি সংস্কৃত-শ্লোক এনে

দিলেন মহাপুরুষ মহারাজের কাছে। স্বামী প্রশান্তানন্দ শ্লোকটি পড়ে বললেন যে, পণ্ডিতজীর প্রার্থনা হচ্ছে তাঁকে একখানা পট্টবস্ত্র প্রদান করা হোক। বলা বাহুল্য, পূজ্যপাদ মহাপুরুষজী পণ্ডিতজীর সেই প্রার্থনা তখনই পূর্ণ করে দিলেন। বোধ হয় একাদশীর দিন রাত্রে মহাপুরুষজীর কাছে কয়েকটি ভক্ত বসেছিলেন, আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তাঁদের মধ্যে একজন আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, "এ খুব কঠোর করতে পারে।" শুনেই মহাপুরুষজী বলে উঠলেন, "কি এমন কঠোর করেছে? আমরা এখনও যা করতে পারি, ও কি তা পারবে?"

ভুবনেশ্বর থেকে পুরী হয়ে ফিরে আসা গেল কলকাতায়। সেখান থেকে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির-প্রতিষ্ঠা দর্শন করতে গেলাম জয়রামবাটী। মন্দির-প্রতিষ্ঠা হয় অক্ষয় তৃতীয়ার দিন। মহামহোৎসব লেগে গিয়েছিল, যেন আনন্দের বান ডেকেছিল। এই উপলক্ষে পরমপূজনীয় স্বামী সারদানন্দজী কয়েকজনকে সন্ন্যাস দেন, আমিও তাদের মধ্যে একজন। সন্ন্যাসের পরে ফিরে এসেছি স্টুডেন্টস হোমে।

পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ আরও কিছুকাল পরে ফিরলেন মঠে। মঠে গেছি তাঁকে দর্শন করতে। তিনি বসেছিলেন দোতলায় গঙ্গার দিকের বারান্দায় একটি আরাম কেদারায়। আর তাঁর ডানদিকে আর একটি চেয়ারে বসেছিলেন পূজনীয় স্বামী অভেদানন্দজী। আমাকে দেখেই হাসতে হাসতে মহাপুরুষ মহারাজ আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, "এই দেখ, ভরত পূজার ভয়ে আমাদের ফাঁকি দিয়ে সন্ন্যাস নিয়ে নিল।" আমি ততক্ষণে তাঁকে প্রণাম করে পূজনীয় অভেদানন্দজীকে প্রণাম করলাম। তিনিও হাসতে হাসতে বললেন, "কি রে, পুজোর ভয়ে সন্ন্যাস নিলি?" আমি তখন মহাপুরুষ মহারাজকে বললাম, "না, মহারাজ, আপনি বললেই আমি পূজা করব।" শুনেই সোৎসাহে বলে উঠলেন, "এই তো চাই। মায়ের পূজা করবে না? ভারী তো সন্ন্যাস! এই তো চাই। যখন তাঁরা বলেছিলেন বিধান নেই, ছিল না বিধান"—একথা বলেই নিজের বুকে হাত দিয়ে বললেন, "এখন আমরা বলছি বিধান, হয়ে গেল বিধান।" এ পর্বের শেষ এখানেই হলো না।

সেবারে ৺দুর্গাপূজার সময় স্বামী ধীরানন্দ পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজকে জিজ্ঞেস করলেন, "এবার পুজো কে করবে?" "কেন, ভরত করবে!"—অকুণ্ঠস্বরে উত্তর দিলেন মাতৃগতপ্রাণ স্বামী শিবানন্দ মহারাজ। পূজনীয় ধীরানন্দজী পড়লেন মহামুশকিলে। সন্ন্যাসী ৺দুর্গাপূজা কি করে করবে? অথচ পূজ্যপাদ মহাপুরুষজীর এ রকম সুস্পষ্ট নির্দেশের বিরুদ্ধে কোন কথা বলাও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি উদ্বোধন-বাটিতে এসে সবই নিবেদন করলেন পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দজীর কাছে। তিনি একদিন মঠে এসে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজকে বললেন, "এ আশ্রমেই

আর একটি ছেলে আছে ক্ষুদিরাম বলে। সেটিও তো বামুনের ছেলে, তারও দীক্ষা হয়ে গেছে। সেও তো পূজা করতে পারে।" পূজ্যপাদ মহাপুরুষ বললেন, "হ্যাঁ, তা ক্ষুদিরামও পারে। তা তাই হবে।"

স্বামী অম্বিকানন্দজী ছিলেন সাধনভজনশীল কঠোরী সন্ন্যাসী। মনে হয়, সে সময় তাঁর একটা অবস্থা হয়েছিল, যেন মনটাকে একটু বহির্মুখ করতে পারলেই ভাল হয়। মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি এসব কথা বলছিলেন, এমন সময় আমিও সে ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। স্বামী অম্বিকানন্দজী বললেন, "একজন বলেছে একদিন গাড়ি করে আমাকে 'জু' গার্ডেনে নিয়ে যাবে। ভাবছি একদিন 'জু' দেখে আসব।" পূজ্যপাদ মহাপুরুষজী বললেন, "আমি কখনও 'জু' দেখিনি!" "যাবেন, মহারাজ?" সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন স্বামী অম্বিকানন্দ। পূজ্যপাদ মহাপুরুষজী বললেন, "না, কি হবে! তুমিও যেমন। আমি তো কলকাতায় থাকতাম, কোন দিন গড়ের মাঠ দেখিনি। সেদিন গদাধর আশ্রম থেকে গাড়ি করে ফিরছি, একজন বললে—এই গড়ের মাঠ। আমি চেয়ে দেখলাম। এই যে এতদিন গড়ের মাঠ দেখিনি, তাতেও কোন অভাববোধ ছিল না, আর এখন যে দেখলাম, তাতেও কিছু হলো না। এই তো চাই। 'যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ'।" ব্যস্, এই তো চাই। 'যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।' কয়েকবার কথাটি বলে নিজের ঘরের যে দরজাটি দিয়ে ছাদে যাওয়া যায়, সেই দরজাটি দেখিয়ে বলছেন, "ঐটি হলো বেশ জায়গা। ঐখানে দাঁড়িয়ে ঘরের ভেতরটাও দেখা যায়, আবার বাইরেটাও দেখা যায়।"...

একবার কথাপ্রসঙ্গে পূজ্যপাদ মহাপুরুষজী বললেন, "একদিন ঠাকুর বললেন, 'দেখ, তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছে। কারুর বেলা তো এ রকম হয় না; তোমার বেলাই এমনটা কেন হলো?' আমি বললাম, 'তা কি জিজ্ঞেস করবেন করুন না।' তিনি বললেন, 'তোমার বাবার নামটি কি?' নামটি বলতেই বলে উঠলেন, 'ও তাই! তুমি তাঁর ছেলে? তিনি এখানে আসতেন গো। আমাকে একটি কবচ দিয়েছিলেন। দেখ তো ঐ তাকের উপরে হাত দিয়ে।' তাকের উপরে হাত দিয়ে এটি এনে তাঁকে দেখালাম। বললেন, 'হ্যাঁ, ঐ কবচটি তিনি আমায় দিয়েছিলেন। তাই তো, তা হলে তুমি তো একরকম গুরুপুত্র হলে। তোমার সেবাটা নেয়া যাবে কি করে?' আমি বললাম, 'তা তিনি যাই হোন, আমার তো আপনিই সব।' তারপর থেকে তাঁর জন্য গাড়ু করে জল নিয়ে গেলে বলতেন, 'তাই তো, তুমি নিয়ে এলে? আচ্ছা, আগে একটু হাতে দাও।' তাঁর হাতে একটু জল দিলে সেটুকুও নিজের মাথায় দিয়ে তবে ঢেলে দিতে বলতেন।"

আর একদিন, স্বামীজীর সঙ্গে তিনি যে মায়াবতী গিয়েছিলেন, সেই ঘটনার বর্ণনা করেছিলেন—"সে শীতকাল। পাহাড়ের রাস্তা সব বরফে ঢাকা। আমার ঘোড়াটা গেল পালিয়ে। আমাকে সেই বরফের উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে যেতে হলো। অনেক জায়গায় এতখানি করে পা দেবে যাচ্ছিল। সকলেরই খুব কষ্ট হচ্ছিল। স্বামীজী বললেন, 'গুপ্ত আগে চলে যাক। ওখানে খবর দিক যে আমরা আসছি, যেন গরম জল-টল সব ready করে রাখে।' তাই হলো, গুপ্ত চলে গেল। স্বামীজী আবার ছিলেন nervous। গুপ্ত চলে যাবার পরই ভাবতে আরম্ভ করলেন, 'ওকে এই পাহাড়ের রাস্তায় একা একা পাঠালাম। ও যদি রাস্তা ভুল করে বা ওর যদি অন্য কোন বিপদ হয়, তাহলে কি হবে?' স্বামীজীর এই রকম ভাবনা দেখে ঠিক হলো একজন পাহাড়িকে পাঠানো হবে গুপ্তের খবর আনতে। একজন পাহাড়িকে পাওয়াও গেল। স্বামীজী তখন এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন যে, সে লোকটা যদি দশ টাকা চায়, তাই দিতেন। লোকটা বললে, 'হাম এক রুপেয়া লেগা।' আমি কথা শুনে বললাম, 'এক রুপেয়া? থোরা কমতি কর।' স্বামীজী বলে উঠলেন, 'ওদের সঙ্গে আবার দরাদরি কি? ও যা চেয়েছে, তাই দাও।' তাই ঠিক হলো, বললাম, 'আচ্ছা যাও, খবর নিয়ে এসো।' সে বলে, 'রুপেয়া দাও।' আমি বললাম, 'আগে খরব আন, তবে টাকা দেব।' সে বলে, 'এ্যায়সা জারা হ্যায়, জায়েগা কেইসে। ঐ রুপেয়াটো (ট্যাঁক দেখিয়ে) হিয়া রাখ লেগা। ওছিকা গরমছে চলা জায়েগা।' তাকে একটি টাকা দিলাম, সেও রওনা হয়ে গেল। পরদিন সকালে তার সঙ্গে রাস্তায় দেখা; হাসতে হাসতে বলল, 'ও স্বামীজী হুঁয়া পৌঁছ গিয়া। আউর সব আচ্ছা হ্যায়।' " তারপরে তিনি হাসতে হাসতে বললেন, "মায়াবতী পৌঁছে সেই বুড়িকে (অর্থাৎ মিসেস সেভিয়ারকে) বিধবা দেখে আমি ভ্যাক করে কেঁদে ফেলেছিলাম।" শ্রোতাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞেস করলেন, "আর স্বামীজী?" "তিনি গম্ভীর" — জবাব দিলেন মহাপুরুষজী।...

আর এক দিনের ঘটনা। রামকৃষ্ণপুরের ৺নবগোপাল ঘোষ মহাশয়ের ছেলে শ্যামবাবু ছিলেন পরমপূজ্যপাদ রাজা মহারাজজীর শিষ্য। তিনি কয়লার ব্যবসা করতেন। আর কোষ্ঠী দেখানো তাঁর একটা বাই ছিল। পুলিন মিত্র ছিলেন তাঁর খুব সুহৃদ। তিনি আবার কোষ্ঠীও দেখতেন। পুলিনবাবু বললেন যে কোষ্ঠীতে আছে, শ্যামবাবুর ঐ সময় কলেরা হবে, জীবনসংশয়। শ্যামবাবু খুবই ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। যা হোক, তাঁর কোন অসুখই হলো না; কিন্তু কথা চারদিকে খুব ছড়িয়ে গেল। তিনি একদিন মঠে এসেছেন সকালের দিকে। মহাপুরুষ মহারাজের কাছে আসতে দু-এক কথার পর মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, "আরে শ্যাম, তুমি মহারাজের সন্তান। তোমার ভয় কি? তুমি ঐ সব কোষ্ঠী-ফোষ্ঠী দেখে অত ভয়

কর কেন? তুমিও যেমন! তুমি মহারাজের শিষ্য। তোমার ওসবের দরকার কি? তুমি ও কোষ্ঠী ফেলে দাও গে যাও।" তারপর নিজের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলছেন, "এটা বাপের বড় ছেলে ছিল কিনা, তাই বাবা এক কোষ্ঠী করিয়েছিলেন। খুব বড় কোষ্ঠী! আমি ঠাকুরের সন্তান। আমার সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক? দিলাম একদিন গঙ্গায় ফেলে, গঙ্গার উপর দিয়ে পাক খুলতে খুলতে গেল, অনেক লম্বা! গিরিশবাবু এক সময় কোষ্ঠী নিয়ে খুব নাড়াচাড়া করতেন। তিনি শুনে বললেন, 'অমন কোষ্ঠীখানা ফেলে দিলেন?' তুমিও ও কোষ্ঠী ফেলে দাও। কি বল, ফেলে দেবে তো?" শ্যামবাবু আস্তে আস্তে জবাব দিলেন, "আমাদের insurance প্রভৃতি করতে হয়। তাই কোষ্ঠীর দরকার হয়।" মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, "তবে থাক।"

মন্মথনাথ দত্ত ছিলেন আলিপুরের Deputy Superintendent of Police. তিনি এবং তাঁর পত্নী ছিলেন পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের খুব ভক্ত। তিনিও তাঁদের স্নেহ করতেন খুবই। তাঁদের কোন সন্তান ছিল না। মঠের সব সাধুদেরই তাঁরা ছিলেন কাকাবাবু, কাকীমা। একদিন কাকীমা তাঁর এক বিধবা বান্ধবীকে নিয়ে গেছেন মঠে, সেখানে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করে নিজের বান্ধবীর পরিচয় দিয়ে বললেন, "ইনি বিধবা।" শুনেই মহাপুরুষ মহারাজ বলতে আরম্ভ করলেন, "বেশ বেশ, বিধবাই ভাল। বেশ, বেশ, বিধবাই ভাল।" তিনি যত এই কথা বলছেন, ততই কাকীমার মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে, কারণ তিনি ছিলেন সধবা। সহসা তাঁর উপর নজর পড়ায় বললেন, "সধবাও ভাল, বিধবাও ভাল।"

এর অল্প কয়েকদিন পরে পূজনীয় স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ মঠে এসে এই কথা শুনে একদিন দুপুরে শ্রীমহাপুরুষজীর ঘরে হাসতে হাসতে ঢুকে বললেন দাদা নাকি বলেছেন—সধবাও ভাল, বিধবাও ভাল। তিনি হাসিমুখে জবাব দিলেন, "হ্যাঁ, বিধবারা ভাল। তারাই তো ধর্মটা রেখেছে। পূজার্চনা, বার-ব্রত সব তো তারাই রেখেছে। আর সধবারাও ভাল। তারাই এই মহামায়ার সংসারে জীবদের আনে।" পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজ আবার বললেন, "আমি শুনে বললাম, 'তা দাদার মতোই কথা হয়েছে।' এই সেদিন যখন জিজ্ঞেস করলাম—শরীরটা কি রকম আছে, তা বললেন, 'এই এখানে বাত, এখানে সর্দি, এই তো। তবে আত্মা ভাল আছে।' শুনেই পরমানন্দময় পূজ্যপাদ মহাপুরুষজী বলতে আরম্ভ করলেন, "হ্যাঁ, তাই তো; এই দেখ না (হাঁটুতে হাত দিয়ে) এখানে ব্যথা, ও সর্দি, এই সব।" তারপর (যে রকম করে জন্তুজানোয়ারকে আদর করে, সেই রকম নিজের দক্ষিণ ঊরুদেশে চাপড় মারতে মারতে) বলতে লাগলেন, "তবে এই শরীরে ভগবানলাভ হয়। ধন্য মানব-

শরীর, এই শরীরে ঈশ্বরদর্শন হয়, ধন্য মানব-শরীর।" সমস্ত স্থানটি এক গম্ভীর আবেশে ভরপুর হয়ে গেল! কারুর মুখে কোন কথা নেই! নিজের আনন্দে নিজে বিভোর হয়ে মাহাপুরুষজী বলতে লাগলেন, "ধন্য মানব-শরীর, ধন্য মানব-শরীর, এই শরীরে ভগবানলাভ হয়।"

পরম পূজ্যপাদ শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতি-চয়ন

স্বামী সারদেশানন্দ

আমার ব্যক্তিগত জীবনে পরম পূজ্যপাদ শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের যে সকল বাণী ও ঘটনার বিশেষ প্রভাব পড়েছিল এবং যা প্রায় রোজ ভাবতাম তারই কিঞ্চিৎ পরিচয় দেবার চেষ্টা করছি। একদিন বেলুড় মঠে সকালবেলা শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে আমরা তিনজন—স্বামী সহজানন্দ, স্বামী সিদ্ধানন্দ ও আমি দক্ষিণেশ্বরে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করতে মহাপুরুষ মহারাজ অতি প্রসন্নচিত্তে আশীর্বাদ করে বললেন, "বেশ তো, আজ মঙ্গলবার, খুব ভাল দিন। মাকে দর্শন করে এস। ইলিশ মাছের সময়, মায়ের ভোগের জন্য ইলিশ মাছ নিয়ে যাও।" বর্ষাকাল, গঙ্গায় খুব ইলিশ মাছ ধরা পড়ছিল মঠের সামনেই। দুটি বড় বড় ইলিশ মাছ কিনে আমাদের হাতে সেবককে দিতে বললেন। মহাপুরুষজী খাজাঞ্চীর নাম করে তাঁর স্নেহাশীর্বাদ জানাতে বললেন আর তিনি যেন নিজেই তত্বাবধান করে ভালভাবে মাছ রান্না ও মায়ের ভোগের সুব্যবস্থা করেন এবং পূজনীয় রামলালদাদাকে তাঁর প্রণাম জানিয়ে বলতে বললেন, তিনি যেন স্বয়ং মায়ের পূজা, ভোগ দেন এবং মন্দিরে প্রসাদ পান। আমরা চলতি পানসি নৌকাতে আনন্দে দক্ষিণেশ্বরের দিকে রওনা হলাম।

দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছে মন্দিরাদিতে প্রণাম করে খাজাঞ্চীর সঙ্গে দেখা করলাম ও মহাপুরুষ মহারাজজীর অভিপ্রায় জানালাম। রামলালদাদা জগজ্জননী ৺ভবতারিণীর পূজা, ভোগ-রাগ নিবেদন করলেন। আমরাও দাদার কৃপায় মন্দিরের প্রায় ভিতরে গিয়ে মনের সাধে মার পূজা, আরতি দর্শন করে খুব আনন্দ পেলাম। ভোগারতির সময় প্রাণভরে মায়ের আরতি দর্শন এবং নিজহস্তে মাকে চামর ব্যজন করে জীবন সার্থক করলাম, যে চামর নিয়ে একদিন স্বয়ং নারায়ণ শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ মাকে জীবন্ত মূর্তিতে ব্যজন করেছিলেন। প্রসাদ পেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে আমরা বিশ্রাম

করলাম। আমি ও সিদ্ধানন্দ মহারাজ দক্ষিণেশ্বরে রাত্রিবাসের সঙ্কল্পে তথায় থেকে গেলাম এবং সন্ধ্যারতির পর নাটমন্দিরে বসে দাদা আমাদের ঠাকুরের গান সব শুনাতে লাগলেন। দাদা কখনও বা ভাবে বিভোর হয়ে দাঁড়িয়ে নৃত্য করতে লাগলেন। শেষ দিকে দাদা টলতে টলতে দু-হাত তুলে নাচতে লাগলেন এবং জড়িত স্বরে ঠাকুরের গাওয়া মাতালের গান গাইলেন। তার মধ্যে একটি কলি আমার এখনও মনে আছে— যথা, "হাড়িপাড়া যাব আমি ধুচুনি বুনতে বুনতে।" সে রাতে দাদার কৃপায় আমাদের ঠাকুরের ঘরেই রাত্রিযাপনের মহাসৌভাগ্য হয়েছিল। পরদিন প্রাতে বকুলতলায় শ্রীশ্রীমায়ের ঘাটে স্নান করলাম এবং মন্দিরাদিতে প্রণাম করে বেলুড় মঠে রওনা হলাম। দাদা বললেন, "মঠে গিয়ে শ্রীমহাপুরুষ মহারাজকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাতে ভুলো না" এবং দীন-হীনভাবে নিজের পরিধেয় বস্ত্রাদি গুটিয়ে পায়ের চটিজুতা খুলে মঠের অভিমুখে দাঁড়িয়ে করজোড়ে মস্তক অবনত করে প্রণাম নিবেদনও করলেন।

মঠে গিয়ে মহাপুরুষ মহারাজকে দক্ষিণেশ্বরের পূজাদির বিবরণ আদ্যোপান্ত বলতে, তিনি ভাবে বিভোর হলেন এবং ৺ভবতারিণীকে স্মরণ করতে করতে হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে বারংবার 'জয় মা, জয় মা' ধ্বনি ও জোড়হস্তে প্রণাম করতে লাগলেন। তাঁর ভাবোজ্জ্বল মুখশ্রী আরও উজ্জ্বল হলো।...

মঠে সরস্বতীপূজা প্রতিমাতে। শশধর মহারাজ তন্ত্রধারক, আমি পূজক। পুরানো ঠাকুরঘরের পেছনে ধ্যান ঘরে পূজার আয়োজন। শ্রীপঞ্চমীর দিন প্রাতে পূজায় যাবার পূর্বে পূজ্যপাদ মহাপুরুষজীর আশীর্বাদ ও অনুমতি লাভের জন্য তাঁর ঘরে গিয়ে জোড়হস্তে মনোভিলাষ নিবেদন করলাম। শুনেই তিনি গম্ভীর ও স্থির দৃষ্টিতে ক্ষণিক চেয়ে রইলেন। তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু উত্তেজিতভাবে বলতে লাগলেন, "মা-ই তো সরস্বতী, আমাদের মঠে তাঁরই তো নিত্যপূজা। আবার প্রতিমা-পূজা কেন?" আমি কিছুক্ষণ চুপ থেকে ধীরে ধীরে নিবেদন করলাম— "আজ শ্রীপঞ্চমী, বিশেষ পূজা।" আমার বাক্যে তিনি আরও উত্তেজিত স্বরে বললেন, "বিশেষ পূজা? বিশেষ পূজা আবার কি? নিত্যই তাঁর বিশেষ পূজা হচ্ছে।" মহাপুরুষজী বলতে বলতে একেবারে স্থির হয়ে গেলেন, হস্তদ্বয়ে প্রার্থনা-মুদ্রা। আমরাও পরস্পর মুখ দেখাদেখি করে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলাম। মুহূর্ত পরে তাঁর ভাব কথঞ্চিৎ প্রশমিত হলো। 'মা, মা' বলতে বলতে প্রসন্নবদনে পূজার অনুমতি দিলেন, বললেন, "যাও, খুব ভক্তিভাবে মায়ের পূজা করোগে।" হৃষ্টচিত্তে তাঁর পদধূলি শিরে ধারণ করে পূজার আসনে বসলাম। পূজা আরম্ভ হয়েছে; এবার প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হবে। ঠিক সে সময় মহাপুরুষজী পূজাগৃহে এসে উপস্থিত,

সেবকের হাত ধরে। তখন তাঁর শরীর অসুস্থ, চলচ্ছক্তি খুব কম। তিনি যখন 'মা, মা' বলতে বলতে পূজাগৃহে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর গলার গদগদ স্বর শুনে আমাদের মন প্রফুল্ল হলো। গৃহে প্রবিষ্ট হয়ে স্বহস্তে ফুল বিল্বপত্র চন্দন নিয়ে উল্লসিত মনে মন্ত্রপাঠ করতে করতে মায়ের শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি দিলেন এবং ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে সামনে দাঁড়িয়ে পূজা দেখতে লাগলেন। ততক্ষণে আমাদের দেবীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পূর্ণ হলে আবার ততোধিক উল্লাসে সরস্বতীকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে প্রণামান্তর উচ্চৈঃস্বরে ও সহর্ষে 'মা, মা' বলতে বলতে আবার সেবকের হাত ধরে ফিরে চললেন।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের আরতির পর মা-সরস্বতীর আরতি। মহাপুরুষজীর কৃপাপ্রাপ্ত ও বিশেষ স্নেহভাজন সুপ্রসিদ্ধ মৃদঙ্গাচার্য শ্রীভগবান সেন সেদিন পূর্ব হতে প্রস্তুত ছিলেন। মায়ের আরতির সময় ভগবানবাবু সোল্লাসে পাখোয়াজ বাজাতে আরম্ভ করলেন। বাজাতে বাজাতে তিনি যেন বাজনায় ডুবে গেলেন। তাঁর সেই অদ্ভুত বাজনায় আকৃষ্ট হয়ে মঠের বহু সাধু সমবেত হলেন। পূজ্যপাদ মহাপুরুষজীও সেবকের হাত ধরে পূজাগৃহে এসে উপস্থিত। তাঁর দর্শনে বাদকের উৎসাহ পূর্ণচন্দ্র-দর্শনে সমুদ্রের মতো উথলে উঠল। আত্মহারা বাদক অত্যদ্ভুত ধ্বনি তুলে দ্রুত ও বিলম্বিত নানা লয়ে অনেকক্ষণ ধরে মৃদঙ্গ বাজালেন। ভাববিহ্বল মহাপুরুষজী প্রসন্নবদনে প্রতিমার সামনে দাঁড়াতে উপস্থিত সকলের হৃদয়ে বিশেষ আনন্দোল্লাস-সঞ্চার হয়েছিল, যেন মায়ের সাক্ষাৎ আবির্ভাব সকলে অনুভব করলেন। অনেকক্ষণ পরে পাখোয়াজ বাজানো শেষ হলে সকলে উচ্চৈঃস্বরে মায়ের জয়ধ্বনি করে প্রণত হলেন। মহাপুরুষজীও হাতজোড় করে মাকে প্রণাম করে সহর্ষে 'মা-মা' বলতে বলতে সেবকের হাত ধরে ঘরে ফিরলেন।

* * *

তখন ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে আছি। ভীষণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলেছে। ঘটনাক্রমে ঠিক ঐ সময় আমার ৺কৈলাস-দর্শনের অযাচিত সুযোগ উপস্থিত হওয়ায় আমি ঢাকা আশ্রমের তদানীন্তন অধ্যক্ষের অনুমতি নিয়ে বেলুড় মঠে চলে এলাম। পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের অনুমতি ভিক্ষা করতে গিয়ে দেখি তিনি ঢাকার ভক্তদের পত্র হতে জেনেছেন যে, আবার ঢাকায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। তাই তিনি নানাভাবে যুক্তি দেখিয়ে আমায় ঢাকায় ফিরে সেখানে শান্তি-সেবার কাজে যোগ দিতে অনুরোধ জানালেন। বললেন, 'গোপেশ! জান, একঘড়া দুধে এককোঁটা চোনা দিলে সব দুধ নষ্ট হয়ে যায়। তেমনি তোমরা এতদিন সেখানে যেসব সেবার কাজকর্ম করেছ, এই একটি মাত্র ঘটনায় সব মাটি হয়ে যাবে। এখন

ঢাকায় ফিরে যাও এবং যাতে সকলের মনে আশা-ভারসা ও আনন্দের সঞ্চার হয়, যাতে সকলের মঙ্গল হয়, সকলে মিলে তারই চেষ্টা কর। কৈলাস-দর্শন পরে ঠাকুরের কৃপায় হয়ে যাবে আবার।" তাঁর বাক্যে যেন মমতা-স্নেহ ঝরছিল এবং দীনদুঃখীর দুঃখে তিনি কতদূর কাতর ও দয়াবিগলিত তাও অনুভব করলাম! মহাপুরুষজীর স্নেহাশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা পেয়ে, রিলিফের জন্য আর্থিক সহায়তা মঠ হতে ব্যবস্থা করে ঢাকায় ফিরে এলাম এবং অল্পকালের মধ্যে দাঙ্গাবিধ্বস্ত হিন্দুপ্রধান রোহিতপুরে সুষ্ঠুভাবে সেবাকার্য আরম্ভ হলো। মিশনের গৌরব ও সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। মহাপুরুষজীর অমোঘ ইচ্ছা ও আশীর্বাদে পরবর্তী কালে আমার কৈলাস-দর্শন ও পরিক্রমার সুযোগ ও সুবিধা অযাচিতভাবে হয়েছিল।

তীর্থাদি-দর্শনে মহাপুরুষজী আমায় খুব উৎসাহিত করতেন, স্বয়ং পাথেয়াদি প্রদান করেছেন, অপরকেও আমায় সাহায্য করতে বলেছেন। তাঁর দেহত্যাগের কিছুকাল পূর্বে মঠে গিয়েছিলাম, তখন তাঁর শরীর খুব অসুস্থ, চলা-বসার শক্তিও কমে গেছে। তথাপি একদিন নিকটে ডেকে সস্নেহে কুশল-সমাচার জিজ্ঞাসান্তে জানতে চাইলেন ৺অমরনাথ-দর্শন হয়েছে কিনা। বিনীতভাবে যখন বললাম—হয়নি, তখন তিনি একটু চিন্তিতভাবে বললেন, "আমিও ভাবছি, গোপেশের ৺অমরধাম-দর্শন হয়নি।" তাঁর দেহত্যাগের কিছুকাল পরেই শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় ও তাঁর স্নেহাশীর্বাদে ৺অমরনাথ-যাত্রা ও কাশ্মীর-জম্মু অঞ্চলের বহু তীর্থস্থানাদি দর্শনের সৌভাগ্য হয়েছিল।

দাক্ষিণাত্যের তীর্থ-ভ্রমণের পর মহাপুরুষজীর নিকট সে সকল কথা বলতে বলতে উল্লসিত হৃদয়ে যখন তদঞ্চলের অধিবাসীদের ভক্তিভাব, বিশেষত ব্রাহ্মণগণের সন্ধ্যাপূজায় নিষ্ঠা ও মন্দিরে পূজার্চনার আড়ম্বরের কথা বলছিলাম, তখন তিনি খুব হেসে বলে উঠলেন, "আরে, এসব বেশির ভাগই যে সকাম।" তৎক্ষণাৎ আমারও এক নূতন দৃষ্টি খুলে গেল।...

* * *

শিলচর অঞ্চলে প্রবল বন্যা হয়েছে। রিলিফে যাবার জন্য মহাপুরুষজীর অনুমতি-আশীর্বাদ নিতে তাঁর ঘরে উপস্থিত হলাম। অপরাহ্নকাল, তখনও বেশ গরম, বর্ষার প্রারম্ভ। মহাপুরুষজী খাটে বিশ্রাম করছিলেন। তাঁর গৃহদ্বারে দাঁড়িয়ে সেবককে মনোভিলাষ জানাতেই তিনি গিয়ে মহাপুরুষজীকে জানালেন। শোনামাত্রই মহাপুরুষজী তাড়াতাড়ি উঠে এসে সামনে দাঁড়ালেন এবং অতি করুণস্বরে বলতে লাগলেন, "বাবা! তোমরা সেখানে যাও শিগ্‌গির। লোকগুলো কি কষ্টেই না আছে! তাদের ঘর দরজা সব ভেসে গিয়েছে, মাথা গুঁজবার স্থান নেই, পেটে ভাত নেই,

পরনে কাপড় নেই, দুর্দশার সীমা নেই। কাগজে এসব কথা পড়ে অবধি আমার ভাবনার অন্ত নেই। ভেবে ভেবে রাতে ঘুম হয় না। তোমরা যাও শিগ্গির। গিয়ে যথাসাধ্য তাদের সেবা কর, নিজের জীবন সার্থক কর, তাদের বিপদ হতে রক্ষা কর।" বলতে বলতে স্তব্ধ হয়ে গেলেন, সামনের দিকে চেয়ে রইলেন স্থির-দৃষ্টিতে, নীরবে। সমস্ত ঘর নিস্তব্ধ, আমরা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি। মুহূর্তের মধ্যে তাঁর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল প্রসন্ন হয়ে উঠলো, আমাদের লক্ষ্য করে বললেন, "মা জগদম্বা একদিকে ভয়ঙ্করী, ভীষণা, খড়্গমুণ্ডধারিণী, অপরদিকে আবার স্নেহার্দ্রহৃদয়া, দয়াময়ী, বরাভয়করা। দেখো, একদিকে বন্যায় ভেসে গিয়ে লোকের দুর্দশার সীমা নেই, অপরদিকে কত লোক ছুটে আসছে টাকাকড়ি জিনিসপত্র নিয়ে তাদের সেবা সহায়তা করতে। তিনিই সত্য, জয় মা, জয় মা।" মহাপুরুষজী প্রাণভরে আমাদের আশীর্বাদ করলেন।...

পূজ্যপাদ মহাপুরুষজীর লিখিত পুরানো 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত 'একবারকার রোগী আর একবারের রোজা' নামক নিবন্ধে এই বিষয়েরই প্রমাণ একটি ঘটনা, যা কাশী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে ঘটেছিল, তা পাঠ করে আমরা মোহিত হই। অনেকের ধারণা কাশী অদ্বৈতাশ্রমের প্রথমাবস্থায় মহাপুরুষ মহারাজ কেবল ধ্যানধারণা, শাস্ত্রচর্চাদি ভিন্ন অপরাপর কাজে মনোযোগ দিতেন না। বাস্তবিক তা নয়। তিনি আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ধ্যান-ধারণাদির সঙ্গে সঙ্গে প্রচার, শিক্ষা, সেবা সকল প্রকার কার্যের সর্বদা সহায়তা করেছেন। কাশী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম তাঁরই উৎসাহ-যত্নে, লালন-পালনে প্রথমে পরিপুষ্ট হয়। তিনিই প্রথম হিন্দিতে প্রচারের জন্য 'চিকাগো বক্তৃতা' 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' প্রভৃতি পুস্তকের অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। সে সকল পুস্তকের সাহায্যেই স্থানীয় হিন্দিভাষী লোকের মধ্যে ঠাকুর-স্বামীজীর মহিমা-প্রচারের সূত্রপাত হয়েছিল। হিন্দুস্থানী কেউ কেউ তাঁর কৃপাপ্রাপ্ত হন, তন্মধ্যে দুজন সন্ন্যাসী ছিলেন। মহাপুরুষজী অদ্বৈতাশ্রমে স্থানীয় হিন্দুস্থানী গরিব ছেলেদের জন্য একটি অবৈতনিক পাঠশালাও পরিচালনা করতেন।...

কনখলে পূজনীয় কল্যাণানন্দজীর কাছে শুনেছি সেখানকার সেবাশ্রমের আর্থিক অভাব দেখে মহাপুরুষজী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দুবার অর্থসংগ্রহে বের হয়েছিলেন—একবার দেরাদুন অঞ্চলে, দ্বিতীয়বার মীরাটের দিকে।

কনখল সেবাশ্রমের ঠাকুরঘরে শ্রীশ্রীঠাকুর ও মার পট পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ বিষয় উল্লেখ করে কল্যাণ মহারাজ বলেছিলেন, "এখানে সন্ন্যাসীর আশ্রমে ঠাকুর ঘরে পূজার আসনে মেয়েমানুষের ছবি রাখতে আপত্তি তুলে তখনকার অনেক বহিরাগত সাধুকর্মীরা মায়ের পট আসন হতে উঠিয়ে

দেয়। পরে তা দেয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখা হয়। মহাপুরুষজী তখন কাশীতে ছিলেন। তিনি এই গণ্ডগোলের সংবাদ পেয়ে কনখলে চলে আসেন এবং ঠাকুরঘরে গিয়ে প্রণামান্তে দেয়াল হতে পট নামিয়ে আসনে যথাস্থানে পূর্ববৎ রাখেন। তারপর আর কেউ এ বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করতে সাহস করেনি।"...

উড়িষ্যাতে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ। রামকৃষ্ণ মিশনের রিলিফ-কার্য আরম্ভ হয়েছে। সেখানে কর্মী পাঠাতে তাগিদ এসেছে। কিন্তু মঠে লোকাভাব। সকলের নিত্য নিয়মিত কাজ আছে। পূজারি জ্যোতির্ময়ানন্দজী পূজার জন্য অপর লোক পাওয়া গেলে রিলিফে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, "বেশ তো, অন্য পূজারি পাওয়া না গেলে, আমিই ঠাকুরের পূজা করব। তাকে পাঠিয়ে দাও। পাঁচজন সাধুকর্মী মঠে থাকলেই আমি তাদের নিয়ে সব কাজ চালিয়ে নেব, বাকি রিলিফের কাজে চলে যাক, সেখানে কর্মীর বিশেষ প্রয়োজন।" পরে কাজের অদল বদল করে, মঠের নিত্য কর্মের অসুবিধা না করেই কর্মী প্রেরিত হতে মহাপুরুষজীকে পূজা করতে হয়নি। কিন্তু সে সময় তাঁর উৎসাহ-উদ্যম অপরকে খুব প্রেরণা দিয়েছিল। এই রিলিফে মিশনের পৃষ্ঠপোষক পরদুঃখে-সদা-সহায়ক মহাপ্রাণ মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় গোপনে সমস্ত ব্যয়ভার নির্বাহ করেছিলেন।...

* * *

উত্তরাখণ্ডে নির্জন বাস ও সাধন-ভজন করবার সময় মহাপুরুষ মহারাজের প্রচুর উৎসাহ ও প্রেরণা পাওয়া যেত; কিন্তু বেশিদিন আশ্রমের বাইরে স্বাধীনভাবে নিজের খুশিমত থাকাটা তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না, কারণ তাতে অনেক বিপদের সম্ভাবনা আছে। তা ছাড়া তখনকার দিনে ভেকধারী সাধুসমাজে যে প্রাচীন ধরনের চালচলন ও জীবনযাপন-প্রণালীর সমধিক আদর ও চল ছিল, সাধুরা সেদিকেই ঝুঁকে পড়ত বলে মহাপুরুষজী আমাদের মঠের সাধুদের পক্ষে আশ্রমের বাইরে দীর্ঘকাল থাকাটা পছন্দ করতেন না। যাদের তিনি বাইরে থাকার অনুমতি দিতেন, তাদেরও কিন্তু ঐ বিষয়ে বিশেষ সাবধান করে দিতেন। বলতেন, "ভগবৎপরায়ণতা ও পরার্থপরতা—এ দুটি মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। নিজের আরামে খাওয়া-থাকার চেষ্টা তো ইতরপ্রাণীও করে, মানুষ যদি ঐ সকল বিষয়ে লালায়িত হয়, তবে মানুষে আর পশুতে তফাত কি? বাবা, তোমাদের যেন এরূপ মতি না হয় ঠাকুরের কৃপায়।"

সাধন-ভজনের উন্নতি সম্বন্ধে মহাপুরুষ মহারাজের সূক্ষ্ম দৃষ্টির দুটি ঘটনা এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মঠের একজন সাধু খুব ধ্যান-ধারণা করতেন, অনেকক্ষণ একাসনে স্থির হয়ে বসে থাকতেন। সেজন্য মঠে সকলে তাঁকে খুব খাতির করত

এবং তাঁর দৈনিক কাজকর্মও কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল যাতে ঐ পথে তিনি দ্রুত অগ্রসর হতে পারেন। মহাপুরুষজী কিন্তু তাঁর চালচলন পছন্দ করতেন না। বলেছিলেন, "অনেকক্ষণ স্থিরভাবে বসে থাকে সত্য, কিন্তু তা আধ্যাত্মিক উন্নতির লক্ষণ নয়। যদি ধ্যান-ধারণা বলে কোন উচ্চভাবের উপলব্ধি না হয়, তাহলে কেবলমাত্র চিন্তাশূন্য ধ্যানের ফল বেশিদিন স্থায়ী হয় না।" পরে অবশ্য ঐ সাধুর চিত্তবিক্ষেপও দেখা গিয়েছিল। তাতে করে মহাপুরুষজীর কথার অর্থ আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়।

আর একজন সাধু উত্তরাখণ্ডে বেদান্তের অদ্বৈতবাদের গ্রন্থাদি পাঠ ও আলোচনায় ব্রহ্মজ্ঞানের সিদ্ধান্ত কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করে প্রকাশ্যে বলতে থাকেন যে, তাঁর ব্রহ্মাত্মৈক্য-বোধ হয়েছে এবং পত্র দ্বারা মহাপুরুষজীকেও জানান যে, তাঁর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়েছে। পরে সে সাধুটি মঠে আসতে মহাপুরুষজী তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, "তোমার মনে কি একেবারে কোন সন্দেহ নাই?" তাতে সে সাধুটি স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, অন্তরের অন্তস্তলে একটু একটু সন্দেহ আছে। তাতে মহাপুরুষজী বলেন, "তবে তোমার এখনো কিছুই হয়নি। দেহাত্মবুদ্ধি যতক্ষণ সুদৃঢ় থাকে তো যতই বিচার, আচার, যোগবাশিষ্ঠ মুখস্থ কর এবং বিচার দ্বারা 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' স্থির-নিশ্চয় কর, তাতে কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান কেবল কথার কথাই থেকে যায়।"...

পূজনীয় বাবুরাম মহারাজের মহাসমাধির পূর্ব হতেই মহাপুরুষজী মঠের কার্যভার গ্রহণ করেছিলেন। মঠের খরচপত্রের সম্বন্ধে তাঁর তখন কিরূপ তীক্ষ্ণদৃষ্টি থাকত, সে সম্বন্ধে একটি ঘটনা মনে পড়ে। রান্না শেষ হওয়া মাত্রই উনুনের কয়লা ঝেড়ে ফেলবার আদেশ ছিল পাচকের উপর। একদিন যখন শুনলেন সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয়েছে, তখন তিনি বিশেষ বিরক্ত হয়ে পাচককে তীব্র ভর্ৎসনা করেন। মঠের প্রত্যেক জিনিস এবং সাধু, ভৃত্য ও প্রত্যেকটি কাজকর্মের প্রতি তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখতেন এবং সকলের খোঁজখবর নিতেন যাতে কর্তব্য-কর্মের সঙ্গে সঙ্গে সকলে নিয়মিত জপ ধ্যানাদি করে আর নিজেদের মধ্যে আড্ডা না দিয়ে বা বাইরে ঘুরে কেউ সময়ের অপব্যয় না করে। মঠের বাগানের প্রত্যেকটি জিনিস প্রথমেই শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবায় যাতে লাগে সেজন্য তাঁর আগ্রহ-উৎকণ্ঠা দেখে বিস্মিত হতাম। তখন আমের সময়, ঠাকুরের জন্য কত চমৎকার আম সব আসছে। মহাপুরুষজী মঠের উঠানের কোণে যে পুরানো আমগাছটি ছিল, তার মাথায় একটি আম রং ধরছে দেখে কয়েকদিন যাবৎ নিত্য সেই আমটিকে ভালভাবে নিরীক্ষণ করছিলেন। পরে আমটি সম্পূর্ণ পেকে অতি সুন্দর সিন্দূরে রং ধরতে আমাকে আদেশ করলেন আমটি নিখুঁতভাবে পাড়বার জন্য। আম দেখে মহাপুরুষজী পরমানন্দিত হয়ে বললেন, "যাও, যাও, শিগ্‌গির ঠাকুরভাঁড়ারে দিয়ে এসো; ঠাকুরের নিজের গাছের

আম।” আর একদিন সকালবেলা পায়খানা থেকে ফিরে এসে ঠাকুর-ভাঁড়ারের সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকলেন এবং উঠানের উত্তর-পশ্চিম কোণে পায়খানার রাস্তার পাশে হলুদ গাছের মতো ছোট ঝোপ দেখিয়ে বললেন, “যাও, ওখানে একটি ফুল ফুটেছে, নিয়ে এসো। ঠাকুরকে দাও। বড় সুন্দর ফুল, নাম দোলন চাঁপা। মৃদু মধুর গন্ধ, তাই ঠাকুর খুব ভালবাসতেন।” মনে হয় সাদা গুলচী ফুলও কোন সময় তুলে এনে ঠাকুরকে দিতে বলেছিলেন। গুলচী ফুলও ঠাকুর ভালবাসতেন। ঠাকুরের প্রিয় পুন্নাগ ফুলের কুঁড়ি দেখেই প্রতীক্ষা করতেন কবে প্রস্ফুটিত ফুলের গন্ধে ঠাকুরঘর আমোদিত হবে।...

মহাপুরুষ মহারাজ উপযুক্ত পাত্র দেখলে নানাভাবে তাঁর মনে সংসারাসক্তিত্যাগের, বিবেক-বৈরাগ্যের ও ভগবদ্‌ভজন-মাহাত্ম্যের উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করতেন এবং সর্বস্ব ত্যাগ করে সাধনে উৎসাহিত করতেন। এ সম্বন্ধে একদিনের একটি বিশেষ ঘটনা মনে পড়ছে। বরাহনগরের ভক্ত নারায়ণবাবু, যিনি জার্মান যুদ্ধের সময় ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থোপার্জন করে ধনবান হয়েছিলেন, হঠাৎ একদিন মঠে এসে উপস্থিত। বর্ষাকাল, বাদলা থাকায় সেদিন মহাপুরুষ মহারাজ উপরে গঙ্গার দিকে বারান্দায় বসে ভগবৎপ্রসঙ্গ করছিলেন, আমরা দু-তিন জন তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলাম। কুশল-প্রশ্নাদির পর মহাপুরুষজী তাঁকে বললেন, “তুমি অনেক দিন আসনি, তোমায় ডেকে পাঠাব ভেবেছিলাম। ঠাকুরের ইচ্ছায় এসেছ, খুব ভাল হয়েছে। তুমি এখন সংসারের ঝঞ্ঝাট ছেড়ে দিয়ে ঈশ্বর-চিন্তায় মন দাও। বয়স হয়েছে। ষোল-আনা-মনপ্রাণ দিয়ে তাঁকে ডাক, তাঁতে ডুবে যাও।” বলতে বলতে তিনি ক্রমশ উচ্চ হতে উচ্চ স্তরের গম্ভীর বৈরাগ্যের ভাবপ্রবাহ সৃষ্টি করলেন। তাঁর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল শ্রী ধারণ করল। বক্তা, শ্রোতা, দর্শক সকলেই নিস্তব্ধ। ভদ্রলোক মৌনভাবে সব শুনে বলতে লাগলেন, “আমি সময় সময় ভাবি কার জন্য খেটে মরছি, টাকা হলে লোকের বাহবা পাওয়া যায়, কিন্তু পরকালের আমার কি হলো? যা হোক, কাকেও ব্যবসার ভার দিয়ে শীঘ্র ত্যাগের পথে অগ্রসর হব। সওদাগরী অফিসের মুৎসদ্দী সাহেব আমায় সহজে ছাড়তে চান না। আশীর্বাদ করুন যাতে ঐসব মানযশ থেকে মুক্ত হয়ে তাঁকে মন-প্রাণ সমর্পণ করে একান্তে ডাকতে পারি।” এই বলে তিনি মহাপুরুষজীর অনুমতি ও আশীর্বাদ নিয়ে সেদিন বিদায় নিলেন। নারায়ণবাবু অবশ্য বহুদিন পরে ব্যবসায়ে খুব লোকসান হতে থাকায় লোকসঙ্গ পরিত্যাগ করে ভগবদ্‌ভজনে শেষটা নিরিবিলিতে জীবনযাপন করেছিলেন।

* * *

১৯২০ সাল, তখন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর শরীরের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে

পড়াতে মঠে সকলে বিশেষ উদ্বিগ্ন। মহাপুরুষজীর কাছে সংবাদ আসছে সর্বক্ষণ, আর তিনিও ঐজন্য বিশেষ উৎকণ্ঠিত। বিকালে 'অবস্থা খুব খারাপ'—সংবাদ আসাতে মহাপুরুষজীর অনুমতিক্রমে মঠ থেকে অনেক সাধু-ব্রহ্মচারী উদ্বোধনে মাকে দেখতে গেলেন। মহাপুরুষজী দু-একদিন পূর্বেই শ্রীশ্রীমাকে শেষ দর্শন করে এসেছিলেন। শেষ রাত্রে খবর এল—অর্ধরাত্রে 'মা' মহাসমাধিস্থা হয়েছেন (২০ জুলাই)। মহাপুরুষজীর কাছে যে নৌকায় খবর এসেছিল, তিনি সে নৌকাতেই মঠের সাধুদের উদ্বোধনে পাঠিয়ে দিলেন। কেবল যাদের উপর বিশেষ কাজের ভার ও যারা অসুস্থ তারা যেতে পারেনি। মহাপুরুষজীও আর বিছানায় গেলেন না, অস্থিরভাবে ঘরে ও বারান্দায় পায়চারি করতে লাগলেন। কখনো বা সামনের গঙ্গার দিকে যাচ্ছেন, কখনো দক্ষিণেশ্বর, কাশীপুর শ্মশান বা উদ্বোধনের (শ্রীশ্রীমার বাড়ির) দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন। আবার কখনো বা উদাস দৃষ্টিতে নিশ্চলভাবে অবস্থান করছিলেন। মাঝে মাঝে নিকটস্থ সাধুদের সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলছিলেন। মঠের সর্বত্র নেমে এসেছিল গভীর শোকের ছায়া।

তখন আমি ঠাকুর-ভাঁড়ারের কাজ করবার অধিকার পেয়েছিলাম, লক্ষ্মণ মহারাজ ছিলেন পূজারি। ভোরবেলা ঠাকুর তোলার পরই তাড়াতাড়ি পূজার জোগাড় করবার আদেশ দিলেন মহাপুরুষজী। শ্রীশ্রীমার দেহযাত্রা মঠে পৌঁছবার পূর্বেই সকাল সকাল ঠাকুরপূজা শেষ করতে হবে। তাছাড়া মায়ের শ্রীপাদপদ্মে বিল্বপত্রপুষ্পাঞ্জলির ও আরাত্রিকাদির বিশেষ আয়োজন করতে বললেন। নিখুঁতভাবে বাছাই করে প্রচুর বিল্বপত্র সংগ্রহ করে বৃহৎ দীপাধারে দীপমালা ও সুন্দর পুষ্পমাল্য গেঁথে রাখা হলো।

ভোর হবার পূর্বেই বরাহনগরের ধনী লৌহব্যবসায়ী ভুবনবাবু মঠে এসে মহাপুরুষজীর ঘরের বাইরে থেকে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে কাঁদতে ভক্তিগদগদ-কণ্ঠে বলে উঠলেন, "মহাপুরুষ! মাকে দেখলে তাঁর অন্তর্ধানের দুঃখ আর থাকে না। উদ্বোধনের ঠাকুরঘর আলো করে রয়েছেন 'মা'। তাঁর দিব্য-জ্যোতিতে চারদিক যেন দীপ দীপ করছে। সেই মধুর হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে তাকালে আর চোখ ফেরাতে ইচ্ছা করে না।"—ইত্যাদি অনেক কথা তিনি উচ্ছ্বসিত-হৃদয়ে বলতে লাগলেন। আমরাও সেখানে উপস্থিত, মহাপুরুষজীও নির্বাক স্থির হয়ে সব শুনছিলেন। ভুবনবাবু শেষকৃত্য ও সৎকারাদি-বিষয়ে মহাপুরুষজীর সঙ্গে পরামর্শ করে চন্দনকাঠ, ঘৃত, ধূপ, গুগগুলাদি আবশ্যকীয় উপকরণ সংগ্রহের জন্য তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। আমরা সে সংবাদ পেয়ে মায়ের দর্শনের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে পথপানে চেয়ে রইলাম, কখন তাঁকে মঠে আনা হবে। মায়ের দিব্য এ-রূপের প্রকাশ সম্বন্ধে

পূজনীয় রাসবিহারী মহারাজ পরে আমাকে বলেছিলেন, "অনেক দিন কালাজ্বরে ভুগে মায়ের শরীর খুবই ক্ষীণ, গায়ের রং কালো, মুখমণ্ডল প্রভাহীন হয়ে পড়েছিল। প্রাণবায়ু বার হবার পর পূজনীয় শরৎ মহারাজের আদেশে নূতন বস্ত্রাদি পরিয়ে, সুন্দর নূতন বিছানায় রেখে ধূপ ধুনো জ্বালা হলো এবং চারদিকে সাধু-ভক্ত সন্তানগণ কালীকীর্তন আরম্ভ করলেন। মুহূর্ত পরে একজনের দৃষ্টি পড়ল—মায়ের মুখশ্রী হঠাৎ প্রভামণ্ডিত হয়ে উঠেছে। তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'দেখ, দেখ, মায়ের জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডল দেখ, কেমন উজ্জ্বল, কেমন সুন্দর!' সে অপরূপ রূপের প্রভা অনেকক্ষণ পরে হ্রাস হতে আরম্ভ করলেও শেষ মুহূর্তে অগ্নি-সংযোগ করা পর্যন্ত উজ্জ্বল ছিল। আশ্চর্যের বিষয়, দেহের প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লাবণ্যমণ্ডিত ও কোমল ছিল, শক্ত হয়নি শেষ পর্যন্ত।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজার সময় মহাপুরুষজীর নির্দেশে লক্ষ্মণ মহারাজ ঠাকুরের শয়নঘরে দেয়ালে যে মায়ের ছবি রাখা ছিল, তা ঠাকুরের সিংহাসনের বাঁ পাশে একখানি সুন্দর জলচৌকির উপর সুসজ্জিত করে বসালেন। মহাপুরুষজীর আদেশে বেদির উপরে আত্মারামের কৌটায় বিশেষভাবে পূজা ও পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে সেদিন থেকে মঠে প্রকাশ্যভাবে শ্রীশ্রীমায়ের পট-পূজা আরম্ভ হলো। স্বামীজী রক্ষিত মঠের সর্বস্বধন শ্রীশ্রীমায়ের 'শ্রীচরণ-রজ-কৌটা' মায়ের চিত্রের সামনে স্থাপিত হলো। মহাপুরুষজী শ্রীশ্রীমায়ের ভোগের চাল বাড়িয়ে দিলেন এবং পূজক লক্ষ্মণ মহারাজকে মন্ত্র বলে দিয়ে শক্তিবীজ সহ ঐ মন্ত্রে ঐ দিন থেকে শ্রীশ্রীমার পূজার্চনার আদেশ দিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিবেদন করে সে নৈবেদ্যভোগাদি পরে শ্রীশ্রীমাকে নিবেদন করার নির্দেশ দিলেন। পরে বললেন, "আমি সব সময়েই ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করবার সময় ভাবি, মা প্রথমে ঠাকুরকে খাওয়াচ্ছেন, পরে নিজে খাচ্ছেন ও সন্তানদের খেতে দিচ্ছেন।"

সকাল সকাল পূজা-ভোগ সেদিন সম্পন্ন হলো। পূজনীয় খোকা মহারাজ পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে সকল বিষয়ে তদ্বির করছিলেন। সেদিন খোকা মহারাজের কর্মতৎপরতা ও বিচক্ষণতা দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম, বিশেষভাবে শ্রীশ্রীমার প্রতি তাঁর ভক্তিভাব এবং সুন্দরভাবে তাঁর কাজ করবার আগ্রহ ও নিপুণতা দেখে।

উদ্বোধন হতে সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারী, ভক্তগণ স্ত্রী-পুরুষ সকলে শোভাযাত্রা করে পত্র-পুষ্পে সুসজ্জিত মাতৃদেহ খাটে করে বহন করে আনলেন মঠের সামনে গঙ্গার অপর তীরে কুটিঘাট পর্যন্ত। পূজনীয় শরৎ মহারাজ প্রমুখ সাধুবৃন্দ নগ্নপদে এসেছিলেন ঐ শোভাযাত্রায়। কুটিঘাট হতে মঠের নৌকাতে করে সাধুরাই দাঁড়

টেনে নিয়ে এলেন 'মা'-র শেষশয্যা। আমরা সব অপলকনেত্রে মা-র সেই অপরূপ জ্যোতির্ময় রূপ দর্শন করলাম। তারপর মঠের ভিতর খাটসহ বহন করে নিয়ে ঠাকুর-মন্দিরের সিঁড়ির সামনে রেখে পূজা আরাত্রিক করা হলো এবং মহাপুরুষজী, শরৎ মহারাজ প্রমুখ সন্ন্যাসিগণ শ্রীমার শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ ও প্রণাম করলেন। পরে যথাবিধি স্নানাদি করিয়ে যেখানে শ্রীশ্রীমার মন্দির হয়েছে, সেখানে চন্দনকাঠের চিতা সজ্জিত ছিল, সেখানে মাকে স্থাপন করে সকলে প্রদক্ষিণ করলেন। শরৎ মহারাজ প্রথমে অগ্নি দিলেন। ঠাকুরের সন্তানগণ-সহ সব সন্ন্যাসীরা চারদিকে দাঁড়িয়ে সেই মহাযজ্ঞে অগুরু, ধূপ ও ঘৃতাহুতি প্রদান করলেন। অনেকে প্রাণের আবেগে বৈদিক স্তোত্রাদি মন্ত্র পাঠ করছিলেন। চারদিকে চন্দন, অগুরুর সুবাস ছড়িয়ে ধু ধু করে অগ্নিশিখা উর্ধ্বে উঠছিল।...দু-ঘণ্টার মধ্যে সব শেষ। পরে চিতাবশেষ গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন করা হলো। প্রাচীন ও নবীন সাধুগণ কলসী করে চিতায় গঙ্গাজল দিলেন। এমন সময় ঝর ঝর করে পুষ্পবৃষ্টির মতো অল্প বৃষ্টি পড়তে লাগল, দেবগণ যেন দেবকার্য সমাপন করলেন। সন্তানদের সমস্ত দিনের ক্লান্ত কলেবর স্নিগ্ধ-শান্ত করবার জন্য যেন মহামায়া জগজ্জননী নিজেই এ ব্যবস্থা করেছিলেন। আমরা সকলে গঙ্গাস্নান করে এসে ঠাকুরঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের পাশে মাকে দর্শন করতে লাগলাম। সেদিন পূজনীয় মাস্টার মহাশয়ও সর্বক্ষণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ঠাকুরমন্দিরে উপস্থিত হয়ে একবার সামনের বারান্দায় আবার পাশের বারান্দা থেকে ব্যাকুলভাবে ছুটাছুটি করে নির্নিমেষ নয়নে ঠাকুর-মাকে দর্শন এবং যেন জোড়হাতে অস্পষ্টভাবে কিছু নিবেদন করছিলেন। সকলে উঠানে বসে প্রসাদ পেলেন। কিন্তু মাস্টার মহাশয় কিছুই গ্রহণ করলেন না। সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের আরতি হলো এবং মহাপুরুষজীর নির্দেশে 'সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে' ইত্যাদি দেবী অভ্যর্থনম্ আরতির পরে গাওয়া হলো। পরে একটু রাত্রি হলে ভক্তগণ স্ব-স্ব স্থানে চলে গেলে মঠবাড়ি যেন গভীর বিষাদ-আঁধারে আবৃত হয়ে নীরবে শোকাশ্রু বর্ষণ করছে মনে হলো।

সেদিন সব শেষ হবার পর শোকসন্তপ্ত সমবেত সাধুভক্ত-মণ্ডলীকে লক্ষ্য করে মহাপুরুষজী অতি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ শ্রীশ্রীমায়ের মাহাত্ম্য বলতে লাগলেন। সকলকে অভয় প্রদানপূর্বক তিনি আবেগভরা কণ্ঠে বললেন, "মা সন্তানদের ফেলে যাবেন কোথায়? তিনি কোথাও যাননি। তিনি এখন সর্বব্যাপিনী—সকলের হৃদয়ব্যাপিনী। পূর্বে তিনি একস্থানে থাকলে সেখানে গিয়ে কষ্ট করে তাঁকে দর্শন করতে হতো। এখন আর কোথাও যেতে হবে না। যে যেখানে আছে, সেখানেই তাঁর কৃপা উপলব্ধি করবে ব্যাকুল হয়ে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে তাঁকে ডাকলেই।" চিতা-নির্বাপণের পর মহাপুরুষ মহারাজের আদেশে ঠাকুর-ভাঁড়ার থেকে একটি তামার ঘটি আনা হলো। তাতে পূত-

অস্থি সংগ্রহ করা হয়। যে নূতন স্বর্ণ-বলয় (বলরামবাবুর কন্যার প্রদত্ত) মায়ের দেহের সঙ্গে অগ্নিসমর্পিত হয়েছিল, সেই নূতন বলয়ের একটি টুকরাও ভস্মের সঙ্গে পাওয়া যায়। তাও তাম্রঘটে রক্ষিত হয়। পরদিন হতে সেই মহাশ্মশানে সকালে বিল্বপত্রপুষ্পাঞ্জলি ও সন্ধ্যায় ধূপ-দীপ দেবার ব্যবস্থা করলেন মহাপুরুষ মহারাজ। ত্রয়োদশ দিনে বিরাট ভাণ্ডারা হবার সময়—তখন পূর্বদিকের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বৃষ্টি হয় হয় এমন সময়—মহাপুরুষজী সকলকে অভয় দিয়ে বললেন, "কোন ভয় নেই। জান না, কার কাজ—সাক্ষাৎ জগদম্বা, যাঁর ইঙ্গিতে সৃষ্টি স্থিতি চলছে? তাঁর ব্যবস্থা তিনিই করবেন। তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে সব জোগাড় ঠিক রাখ।" আকাশ দেখতে দেখতে পরিষ্কার হয়ে গেল। সেদিন সারাদিন মধ্যরাত্রি পর্যন্ত এক ফোঁটাও বৃষ্টি হয়নি। পরমানন্দে উৎসব সমাধা হয়ে গেল।...

মায়ের শ্রীচরণাশ্রিত ব্রহ্মচারী সুরেনকে মহাপুরুষজী ঐ পবিত্র স্থান রক্ষণাবেক্ষণ ও পুষ্প, ধূপ, দীপ দেবার আদেশ দিলেন। মহাপুরুষজী সুরেনের ঐকান্তিক সেবায় খুব খুশি হন। দু-বৎসরের মধ্যেই সেখানে মন্দির-নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হয়ে গেল। মহাপুরুষজীই ঐ মন্দির-নির্মাণের স্থান নির্বাচন করে দিয়েছিলেন। মা যেন গঙ্গাতীর আলো করে মন্দিরে বসে আছেন এবং সর্বদা তাঁর অতি প্রিয় পবিত্র গঙ্গা দর্শন করছেন। মাতাঠাকুরানীর ভস্মাস্থির কিঞ্চিৎ অংশ কোন কোন গৃহস্থ ভক্ত নিজেদের ঘরে রাখবার জন্য সংগ্রহ করেছিলেন। তা শুনে মহাপুরুষ মহারাজ সকলকে সাবধান করে দেন এবং বলেন, "এসব পবিত্র বস্তু রাখা অত্যন্ত কঠিন। এসব খুব পবিত্রভাবে সাবধানে নিত্য পূজা করা উচিত, নতুবা গৃহস্থের অমঙ্গল হবে। ঠাকুরের দেহাবশেষও ওভাবে কোন কোন ভক্ত রেখেছিলেন, কিন্তু তাঁর পূজাদি ঠিকমত না হওয়ায় তাঁদের নানারকম অমঙ্গল হয়েছিল। শেষে চুনীবাবু প্রভৃতি কোন কোন গৃহস্থ ভক্ত সেসব মঠে পাঠিয়ে দেন।"

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর দেহত্যাগের কিছু পূর্বে তাঁর শরীরের অবস্থা খারাপ শুনে মহাপুরুষ মহারাজ একদিন বিকেলে উদ্বোধনে গেলেন তাঁকে দর্শন করবার জন্য। সেদিন মায়ের খুব হিক্কা হচ্ছিল। ঔষধ-পত্রে কিছুই উপশম হচ্ছে না। অভিজ্ঞ কেহ কেহ বললেন, কচি-তালশাঁসের জল খাওয়ালে উপশম হতে পারে। কিন্তু কলকাতার বাজারে তা তখন পাওয়া গেল না; এমন সময় মহাপুরুষজীর কানে ঐ সংবাদ গেল। তখন তিনি পূজনীয় শরৎ মহারাজের পাশের নিচের প্রবেশ-পথের বাঁদিকের ছোটঘরে বসে আছেন। উভয়ে মায়ের সঙ্কটজনক অবস্থার জন্য স্থির ধীর বিমর্ষ হয়ে বসে আছেন। চারদিকে যেন একটা থমথমে ভাব, সব যেন নিঃসাড়, নিস্তব্ধ। সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে মহাপুরুষজী আমায় ডাকলেন। আমি তখন মঠে থাকলেও

প্রায় রোজই সকালবেলা মঠ থেকে মায়ের নব-গ্রহ-শান্তি-স্বস্ত্যয়নের পূজার ফুল, বেলপাতা প্রভৃতি নিয়ে উদ্বোধনে যেতাম। এই সঙ্গে মায়ের মুখের অরুচির জন্য মঠ থেকে আমরুল শাক, টাটকা পাতিলেবু প্রভৃতি যা প্রেরিত হতো তাও নিয়ে যেতাম। সন্ধ্যায় আমি মঠে ফিরলে মহাপুরুষজী আমার কাছে শ্রীশ্রীমায়ের শারীরিক অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞেস করতেন। ঐদিন উদ্বোধনের বৈঠকখানা হতে মহাপুরুষজীর ডাক শুনে অতিশয় সন্ত্রস্ত-চিত্তে সেই দুই বিরাট পুরুষের সামনে যেতেই মনে হলো যেন সে ক্ষুদ্র ঘরটি জুড়ে দু-জনে বসে আছেন। ভিতরে ঢুকতে সাহস হলো না। দরজার সামনে দাঁড়াবামাত্র মহাপুরুষজী বললেন, "শিগ্‌গির মঠে যাও, সন্ধ্যায় ৫টার পরে পালীরা আসে, তালগাছের মাথায় হাঁড়ি লাগায়। মায়ের জন্য তালশাঁস চাই এক্ষুনিই। তাদের বললেই কচি তাল কেটে দেবে। তুমি কয়েকটা নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে এসো।" আমি তখনই রওনা হলাম। মঠে পৌঁছেই দেখি পালীরা এসেছে তালগাছে হাঁড়ি বসাতে। তখনই কচিতাল কাটিয়ে নিয়ে উদ্বোধনে ফিরলাম। দুঃখের বিষয় খুব কচি ছিল বলে রস তেমন বেশি ছিল না। পরদিন সকালে কলকাতায় নূতন বাজার থেকে যে তালশাঁস কিনে আনা হয়েছিল, তাও খুব নীরস হলো। উপকার বিশেষ হলো না। নানা দৈব দুর্ঘটনাও দেখা গেল। দু-দুবার স্বস্ত্যয়নের ঘট ছেঁদা হয়ে গেল। সকলের মনে ঐ ঘটনায় ভাবী বিপদের আশঙ্কা জাগে। মহাপুরুষজী, শরৎ মহারাজজী সকলেই বিষাদগ্রস্ত হলেন।

সেদিন রাত্রিটা মহাপুরুষ মহারাজ ও আমরা যথাক্রমে বলরামমন্দিরে ও উদ্বোধনে কাটালাম।...

আর একবার মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে বলরামমন্দিরে রাত্রিবাস করেছিলাম। শ্রীশ্রীমায়ের শরীরত্যাগের মাস তিনেক পূর্বে ৺বলরামবাবুর পুত্র রামকৃষ্ণ বসু মহাশয় দেহত্যাগ করেন। তাঁর অন্তিম সময়ে মহাপুরুষজী সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং সময় নিকটবর্তী বুঝে তিনি উচ্চৈঃস্বরে ঠাকুরের (হরি ওঁ রামকৃষ্ণ) নাম শুনাতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে পূজনীয় শরৎ মহারাজ এবং প্রবীণ-নবীন সাধু ও ভক্তগণের ঠাকুরের ঐ নাম সমস্বরে উচ্চারণে তথায় এক দিব্যভাবের বিকাশ হলো। মহাপ্রয়াণে প্রস্তুত ভক্তপ্রবরও ক্ষীণস্বরে ঠাকুরের নাম নিচ্ছিলেন। যদিও নাড়ী ছেড়ে গেছে, তবু তাঁর জ্ঞান অক্ষুণ্ণ ছিল, ধীরে ধীরে স্বর বন্ধ হলো, তবু ঠোঁট নড়ছিল। শরীরত্যাগের পরও দেখা গেল তাঁর বিস্ফারিত অপলক দৃষ্টি তখনও বুকের-ওপর রাখা ঠাকুরের ছবির দিকে নিবদ্ধ—স্থির। সেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে আমাদের মনে হলো এ তো মরণ নয়, অমর-জীবন!...

*　　　*　　　*

মহাপুরুষজী জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকলের প্রতি সমদর্শী ও দয়ালু ছিলেন। মাদ্রাজ মঠে একজন ইতালীয় যুবক ছিলেন। তিনি প্রথম জার্মান-যুদ্ধের পরে ধর্মের সন্ধানে ভারতে এসে ক্রমে মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠে আসেন। মহাপুরুষজীও তখন সেখানে। তাঁর প্রতি মহাপুরুষজীর বিশেষ কৃপা হয়েছিল। এক ভক্তপ্রদত্ত মূল্যবান শাল তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন এবং তাঁকে মোক্ষ বলে ডাকতেন। তাঁর নাম ছিল Capt. Moska (কাপ্তেন মোসকা)। মহাপুরুষজীর সামনে তিনি ভক্তিভাবে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হয়ে শালখানি গায়ে জড়িয়ে চুপ করে বসে থাকতেন। হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, পারসীক, নিম্নবর্ণ, অস্পৃশ্য, আদিবাসী প্রভৃতি সকলেই সমভাবে মহাপুরুষজীর কৃপার অধিকারী হতো। শ্রীহট্ট, আসাম, খাসিয়া পাহাড়ের অনুন্নত-শ্রেণীর লোককে মহাপুরুষজী তখনকার দিনে যেভাবে কৃপা করেছিলেন, তা সে সময়ের পক্ষে দয়া ও উদারতার পরাকাষ্ঠা সন্দেহ নেই।

মহাপুরুষজী যখন বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ, তখনই মঠে দাতব্য ঔষধালয় স্থায়িভাবে স্থাপিত হয়, অসুস্থ সাধুদের সেবাযত্নের ব্যবস্থা হয়। মঠে তখন অসুস্থ সাধুদের জন্য সাগু বার্লি প্রভৃতি পথ্য তৈয়ারির পৃথক উনুন ছিল না। আমার একবার প্রবল জ্বর হয়, সেবক উনুনের অসুবিধার জন্য আহারের পর বিশ্রাম করতে গেল। পরে সারাদিন সাগু দিতে ভুল হলো। সেদিন ভাঁড়ারে প্রসাদি ফলটলও ছিল না। এসব দেখে মহাপুরুষজী পৃথক উনুনের ব্যবস্থা করলেন রোগীদের পথ্য প্রস্তুত করার জন্য। এবং কখনো নিজের হাতে সাগু বার্লি তৈয়ার করে রোগীদের খাওয়াতেন। তাঁর চেষ্টায় ধীরে ধীরে মঠে রোগীদের চিকিৎসা ও ঔষধ-পথ্যের সুব্যবস্থা হলো।

মহাপুরুষ মহারাজ মঠের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য উৎসাহ ও আগ্রহশীল ছিলেন। মঠে যখন শিল্প-বিদ্যালয় হয় তখন তিনি তার কর্মকর্তা শ্রীধর ও সুহৃদ মহারাজকে খুব উৎসাহিত ও সহায়তা করতেন। কোন কোন দরিদ্র যুবকও তাঁর উৎসাহ ও সহায়তায় উচ্চশিক্ষালাভে সমর্থ হয়েছিল। পূজ্যপাদ স্বামীজী-পরিকল্পিত বেলুড় মঠে ঠাকুরের মন্দির-নির্মাণেও তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। ঠাকুরের জন্মস্থান কামারপুকুরে মন্দির-নির্মাণে অগ্রসর হয়ে তিনি অর্থসংগ্রহও করেছিলেন। কিন্তু দৈব প্রতিবন্ধকে তখন তা সফল হয়নি। পূজনীয় রাজা মহারাজের জন্মস্থানে মন্দির করার ইচ্ছা মহাপুরুষজীর ছিল। আমরা যখন মহারাজের জন্মস্থান দর্শন করতে গিয়েছিলাম, তখন তাঁর বৃদ্ধ ভ্রাতুষ্পুত্র অতীব দুঃখিত চিত্তে আমাদের বলেছিলেন, "বেলুড় মঠের প্রেসিডেন্ট স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ এখানে এসে মহারাজের জন্মস্থানে মন্দির নির্মাণ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় আমরা সেই জমি লিখে দিয়েছিলাম। তারপর তিনি গত হলেন, আর কিছুই হলো না।"

একবার মহাপুরুষজীর মাদ্রাজ মঠে বাসকালীন তাঁর এক শিষ্য তাঁকে হাজার এক টাকা প্রণামী দিয়ে মন্ত্রদীক্ষা নেন। তখন মাদ্রাজ মঠের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না, তাই মহাপুরুষজী তার অধিকাংশই মাদ্রাজ মঠের কাজেই দিয়ে দিলেন। এভাবে সব সৎকার্যে তিনি সহায়শীল ছিলেন।

গুরুভ্রাতাদের প্রতিও তাঁর প্রেমপ্রীতির সঙ্গে সঙ্গে প্রবল শ্রদ্ধার ভাবও দেখা যেত। শশী মহারাজের স্মৃতিভরা মাদ্রাজ মঠ তাঁর কাছে পবিত্র তীর্থস্বরূপ ছিল এবং তার উন্নতির জন্য তিনি সব রকম সাহায্য করেছেন। নিত্যধামে অবস্থিত গুরুভ্রাতাগণের জন্মতিথি তিনি পর্বদিনরূপে গণ্য করতেন এবং তা পালনে তিনিই প্রথম অগ্রণী হয়ে বেলুড় মঠে তা প্রবর্তন করেন এবং সাধুভক্তদিগকে তাতে উৎসাহিত করতেন। একবার মঠে পূজনীয় হরি মহারাজজীর জন্মতিথিতে আমি উপস্থিত ছিলাম। সেদিন রাত্রে পূজনীয় মহাপুরুষজীকে হরি মহারাজ সম্বন্ধে কিছু বলতে বললে তিনি সানন্দে স্বীকৃত হন এবং সমবেত সাধুদের কাছে অনেক প্রাচীন কাহিনী বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, তাঁরা উভয়ে একবার কাশীতে এক বাগানে নির্জনে থেকে মাধুকরীতে জীবন-যাপন ও অহোরাত্র ধ্যান-ধারণায় কাটাতেন। হরি মহারাজ কখনো কখনো দু-তিন দিন আসনেই বসে থাকতেন, ভিক্ষায় যেতেন না। শুকনো বাসি রুটি জলে ভিজিয়ে কোন প্রকারে ক্ষুধা-নিবৃত্তি করতেন। কিন্তু নিয়মিত আহার ও বিশ্রামের অভাবে কারো মনে কোন কষ্ট হতো না, বরং সাধন-ভজনের সুবিধা হওয়ায় আনন্দই হতো। এরূপ কঠোরতার ফলে পরে হরি মহারাজের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে, রক্তামাশয় হয়।...

রাজা মহারাজজীর প্রতি মহাপুরুষজীর কিরূপ আন্তরিক টান ছিল তা মহারাজের দেহত্যাগের সময় খুব ভালভাবে বুঝতে পারা যায়। রাজা মহারাজজীর অনুমতিক্রমে ঢাকা গিয়ে মহাপুরুষজী বহু লোককে দীক্ষা দেন, তাতে ঠাকুরের নাম-মহিমার খুব প্রচার হয়। বহু লোক আকৃষ্ট হওয়াতে ঢাকাতে খুব জমজমাট ভাব ধারণ করে। এমন সময় কলকাতা হতে মহারাজের কঠিন অসুখের সংবাদ পৌঁছল। মহাপুরুষজী খবর পেয়েই সকলের অনুরোধ-উপরোধ উপেক্ষা করে অবিলম্বে কলকাতায় চলে এলেন ও মহারাজের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হলেন। তাঁর সঙ্কটজনক অবস্থা দেখে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং মঠে মহারাজের আরোগ্য-কামনায় বিশেষ পূজা-অর্চনার ব্যবস্থা করেন এবং সর্বক্ষণ মহারাজের স্বাস্থ্যের কল্যাণ-কামনায় ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা জানান।

মহারাজের দেহত্যাগে তিনি খুবই বিষণ্ণ ও ম্রিয়মান হয়েছিলেন। বলতেন, "মহারাজ চলে গেলেন, আমারও আর থাকবার ইচ্ছা হচ্ছে না। মহারাজেরই মঠ,

তিনিই ছিলেন মঠের কর্তা, শোভা, সম্পদ, যা কিছু সব। আমরা তো তাঁর চাকর, তাঁর আদেশমত সব করছি।"...

ভক্তদের আপদ-বিপদে তাঁর সহানুভূতির অন্ত ছিল না। বলরামবাবু ও তাঁর পুত্র রামকৃষ্ণ বসুর দেহত্যাগের সময় সকলকে নিয়ে তিনি উপস্থিত থেকে সব কাজ করেছিলেন। রামকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের শ্রাদ্ধে আমাকে দিয়ে মঠ হতে বাসনপত্র পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু তিনি বিনাকারণে সাধু-ব্রহ্মচারীদের ভক্তগৃহে গমনাগমন পছন্দ করতেন না। তখন বিশেষ কোন কাজে, এমন কি বেলুড় মঠের বাইরে যেতে হলেও তাঁর অনুমতি নিতে হতো এবং ঠিক সময়ে ফিরে এসে খবর দিতে হতো; অন্যথা তিরস্কার করতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা অথবা অন্য কোন পর্বোৎসবে ভক্ত-গৃহে নিমন্ত্রণ করলে তিনি তাতে যোগদান করতে পাঠাতেন এবং শ্রীঠাকুরের পূজা-অর্চনা ও কথামৃত পাঠ ইত্যাদি করার জন্য খুব উৎসাহ দিতেন। কোন কোন ভক্তবাড়িতে ৺অন্নপূর্ণা পূজায় তাঁকে স্বয়ং উপস্থিত হতে দেখেছি। গদাধর আশ্রমে বাসন্তী পূজার সময় গিয়ে কদিন ছিলেন। কিন্তু তিনি যখন তখন যার-তার বাড়িতে সাধুদের আহার করা মোটেই পছন্দ করতেন না। বলতেন—"খাওয়া-দাওয়া বিষয়ে সাবধান না হলে সাধুত্ব রক্ষা করা কঠিন।"...তিনি একদিন বলেছিলেন, "শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাবে জমি-জমার ফলন প্রভৃতিরও বিশেষ উন্নতি হবে। চিরদিন লোকে তাঁর মহিমা বুঝতে পারবে। তখন সকলেই তাঁকে ডাকবে। ঠাকুরের সঙ্ঘেও মহা অভ্যুদয় হবে।"

শুভম্

মহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতিকথা

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ

১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জুলাই (বিকাল ৪টা ১৫ মিঃ) ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্ষদ পূজ্যপাদ স্বামী প্রেমানন্দের (বাবুরাম মহারাজ) মহাপ্রয়াণে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলী বিশেষভাবে মর্মাহত হন। এই প্রেমিক শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানকে দর্শন করে আমি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হই। তাঁর অভাবে আমার মনের অবস্থা কিরূপ হয়েছিল তা বর্ণনাতীত।

ঐ কালের কোন সময়ে আমার অন্তরের বেদনা-ভার লঘু করার ও জুড়াবার

জন্য বাবুরাম মহারাজের স্মৃতিপূত বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম পার্ষদ ও তদানীন্তন মঠাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দের (মহাপুরুষ মহারাজ) পদপ্রান্তে উপনীত হই। তাঁর শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে দাঁড়াতেই তিনি পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। পরিচয় পেয়ে মহাপুরুষজী বলে উঠলেন, "তুমি কি ধীরেন? তোমার কথা বাবুরাম মহারাজ আমাকে কতবার বলেছেন—তোমার খোঁজখবর একটু নিতে। এতদিন আসনি কেন? মাঝে মাঝে আসতে যেতে হয়। আমরা সকলে বাবুরাম মহারাজের দেহাবসানে বেদনা-ভারাক্রান্ত। তবে কি জানো—দেহনাশে দেহীর নাশ কখনও হয় না।"...

পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ সন্ধ্যার পূর্বে গঙ্গার ধারে শ্রীশ্রীস্বামীজীর মন্দিরের দিকে বেড়াতে যেতেন। একদিন তাঁর পূতসঙ্গে যাবার সুযোগ গ্রহণ করলাম। সেদিন কিছু সময় শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীর পুণ্যসংশ্রয়লাভে এবং তাঁর শ্রীমুখের অমূল্য উপদেশশ্রবণে হৃদয়ের বেদনাভার কিছুটা যেন প্রশমিত হলো। 'ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।'—এ জগতে ক্ষণকালও মহাজনের সঙ্গলাভ সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হবার নৌকার মতো।

* * *

পূর্ববঙ্গের ভক্তগণের আগ্রহাতিশয্যে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ ও পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ ঢাকা শহরে শুভাগমন করেন। নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা প্রভৃতি শহরে তাঁদের বিপুল সংবর্ধনা হয়েছিল। তাঁরা ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে অবস্থান করেন।

মহাপুরুষজী ঢাকায় প্রায় দেড়মাস অবস্থান করেছিলেন এবং সেখানেই আনুষ্ঠানিকভাবে সর্বপ্রথম বহু ধর্মপিপাসু নরনারীকে মন্ত্রদীক্ষাদানে কৃতার্থ করেন। একদিন বিকালবেলা ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে 'কিরণ কটেজ'-এর (Kiran Cottage) বারান্দায় মহাপুরুষ মহারাজ পাদচারণ করছিলেন। সে সময় আমি তাঁর অনুগমন করেছিলাম। নানা ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ বলতে বলতে মহাপুরুষজী হঠাৎ আমার দিকে ফিরেই আমার বামহাতের কনুই ধরে বেশ একটি ঝাঁকুনি মারলেন এবং বললেন, "সিংহের বাচ্চা, সিংহের মতোই চলবে।" সেই ঝাঁকুনিটির স্মৃতি এখনও আমার মনে মুদ্রিত হয়ে রয়েছে—যেন মাত্র কাল সংঘটিত হয়েছে। মহাপুরুষজীর ঐ দিব্যবাণীটি আজও আমার কানে অনুরণিত হচ্ছে এবং তাঁর শক্তিসঞ্চারকারী অদ্ভুত স্পর্শানুভব আমাকে প্রতি কাজে সঞ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করছে। জীবন-সায়াহ্নেও তা ভুলতে পারব না।

* * *

একদিন পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে তাঁর ঘরে দাঁড়িয়ে আছি। তিনি আমাকে নানা কথা জিজ্ঞেস করছেন বোম্বে ও সেখানকার শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম সম্বন্ধে। বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষীয় একজন স্বামী সেখানে উপস্থিত হন। আমাদের কথাবার্তা তখনই বন্ধ হয়ে গেল। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কাজকর্ম সম্বন্ধে নানা কথাপ্রসঙ্গে মহাপুরুষ মহারাজকে একজন কর্মী সম্বন্ধেও বললেন। মহাপুরুষ মহারাজ সব কথা শুনে বললেন, "দেখো, অনেককে বলতে শুনেছি ছেলেটি ভালো। আমিও একে ক-বার দেখেছি—আমারও মনে হয় ছেলেটি ভালোই। সাধুজীবনের প্রধান পরিচয়—ত্যাগ, তিতিক্ষা ও ক্ষমা। এ গুণগুলির দ্বারা কোন ব্যক্তিকে বিচার করতে হয়। যে ছেলেটির সম্বন্ধে এতক্ষণ কথা হলো, সে ছেলেটি ভালো!" আবার অল্প কিছুক্ষণ পরে বলে উঠলেন, "ছেলেটি ভালোই হে, ছেলেটি ভালো।" উক্ত সাধুকর্মী সম্বন্ধে মহাপুরুষ মহারাজের মনোভাব জানতে পেরে কর্তৃপক্ষস্থানীয় স্বামী নীরবে চলে গেলেন।

* * *

শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে কিছুকাল বোম্বে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে অবস্থান করে নানাবিধ ধর্মপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসু সাধু-ভক্তগণকে পরিতৃপ্ত করেন এবং ফেব্রুয়ারি মাসে বেলুড় মঠ অভিমুখে যাত্রা করেন। আমি সে সময়ে বোম্বে-কল্যাণ স্টেশন পর্যন্ত একখানা প্রথম শ্রেণীর টিকিট করে পূজ্যপাদ মহাপুরুষজীর গাড়ির কামরায় উঠে তাঁর পদসেবা করবার একটু সুযোগ গ্রহণ করলাম। পদসেবা করতে করতে মহাপুরুষজীর কাছে প্রার্থনা জানালাম, "মহারাজ, আশীর্বাদ করুন যেন আপনাদের কখনও না ভুলি।" উত্তরে তিনি বললেন, "আমাদের ভুলবে কেন? তুমি তো ঠাকুর-স্বামীজীর ভাবেই ভাবিত ও অনুপ্রাণিত, আর আমরা যা ভালবাসি তা-ই মনে প্রাণে করছো, কাজেই ভুলবার তো কথা নেই।"

* * *

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ। বেলুড় মঠে একদিন মহাপুরুষ মহারাজ তাঁর ঘরে সেবকদের মধ্যে কাকেও নিকটে দেখতে না পেয়ে নিজ হাতেই তামাক সাজছিলেন। তা দেখে আমি তখনই তাঁর হাত থেকে কল্কেটি নেবার জন্য চেষ্টা করতেই তিনি বললেন, "তুমি পারবে না, বাবা। তুমি পারবে না। তুমি কি করে পারবে? তুমি তো তামাক খাও না। তামাক সাজতে জানা চাই।" আমি বললাম, "মহারাজ, আমার বাবা তামাক খেতেন। কখনো কখনো তাঁকে তামাক সেজে দিতাম। কৃপা করে আমাকে একবার তামাক সাজতে অনুমতি দিন। দেখুন আমি পারি কিনা।" মহাপুরুষজী তখনই কল্কেটি আমার হাতে দিলেন। তাঁকে তামাক সেজে দেবার সুযোগ পেয়ে

নিজেকে অত্যন্ত কৃতার্থ ও সুখী বোধ করলাম। মহারাজ কিছুক্ষণ তামাক সেবন করলেন। পরে জিজ্ঞেস করলাম, "মহারাজ, ঠিক হয়েছে তো?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, ঠিকই হয়েছে।"

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় নানা বিপদ-আপদ, বিপর্যয় ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও মহাপুরুষজীকে সব সময় দেখতাম পর্বতের মতো অচল-অটল, ধীর-স্থির, অবিচলিত। সুখ-দুঃখ, সম্পদ-বিপদ, শীত-উষ্ণ, মান-অপমান সকল অবস্থাতেই তিনি একভাবে অবস্থান করছেন—একেবারে দ্বন্দ্বাতীত। নানা কাজে ব্যস্ত থেকেও তিনি বোম্বে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের সকল খবর জানবার জন্য খুব উৎসুক হতেন। বোম্বের সাধু-ভক্ত-কর্মী সকলেরই খবর নিতে কখনও ভুলতেন না। প্রকৃতপক্ষে মহাপুরুষজীর মধ্যে আমরা গীতায় বর্ণিত 'স্থিতপ্রজ্ঞ স্থিতধী মুনি'কেই দেখতে পেতাম। আর শুধু মনে হতো—আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ কী গভীর অন্তর্দৃষ্টি-সহায়েই গুরুভ্রাতা স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের দিব্যগুণরাজি দেখে তাঁকে 'মহাপুরুষ' বলে ডাকতেন!

মহাপুরুষজী গম্ভীর ও প্রশান্ত প্রকৃতির ছিলেন। সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, গৃহী ভক্ত সকলেই তাঁর সান্নিধ্যে উপস্থিত হতে খুবই ইতস্তত করতেন। কিন্তু দর্শনার্থী সকলেই লক্ষ্য করেছেন যে, তিনি সকলের প্রতিই অশেষ-প্রীতিসম্পন্ন ও চিরশুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, সকলকেই সাদরে গ্রহণ করে যথোচিত উপদেশাদি প্রদান করে পরিতৃপ্ত করতেন।

মহাপুরুষ মহারাজের আর একটি প্রেমপূর্ণ ভাব ও আচরণ দেখে সকলেই সমধিক বিস্মিত হতেন—সেটা এই যে, তিনি দরিদ্র, মূর্খ, তথাকথিত নীচ ও অস্পৃশ্য জাতিদের প্রতি অপার করুণা, অকুণ্ঠ সহানুভূতি ও আন্তরিক শুভেচ্ছা প্রকাশ করতেন এবং যথাশক্তি তাদের অভাব-অভিযোগ দূর করতে সচেষ্ট ছিলেন।

* * *

বোম্বে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে অবস্থানকালে মহাপুরুষ মহারাজ কিঞ্চিৎ প্রাতরাশ গ্রহণ করে প্রত্যহই প্রাতঃভ্রমণে বের হতেন। কোন কোন দিন সমুদ্রের ধারে জেলেপাড়া, মুচিপাড়া প্রভৃতির দিকেই যেতেন। জেলেপাড়ায় গিয়ে তিনি জেলেদের প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরও দর্শন করতেন। জেলেপাড়ায় সকলেই মহাপুরুষজীকে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করত, সাধুবাবা তাদের শিবঠাকুরকে দর্শন করতে যেতেন বলে তাদের আনন্দের সীমা ছিল না। জেলেরা সাধুবাবার পিছনে পিছনে রামকৃষ্ণ আশ্রম পর্যন্ত আসত। সাধুবাবাও 'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম, পতিতপাবন

সীতারাম'—এ গানটি স্বয়ং গেয়ে তাদের দিয়ে গাওয়াতেন এবং কণ্ঠস্থ করাতেন। মহাপুরুষজী প্রায় রোজই তথাকথিত অস্পৃশ্য জেলে বালক-বালিকাদের পয়সাদি দিতেন। সমদর্শী জ্ঞানী মহাপুরুষের এরূপ প্রেমময় আচরণ দেখে সকলেই বিস্ময়বিমুগ্ধ চিত্তে তাঁর শ্রীচরণে প্রণত হতো।

পরমারাধ্য মহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতিকথা

স্বামী কৈলাসানন্দ

শিবে যস্য পরাভক্তি স্ত্যাগেঽপি রতিরুত্তমা।
অহেতুক-কৃপাসিন্ধুং শিবানন্দং নমাম্যহম্ ॥

যতদূর মনে হয় আজ থেকে প্রায় সাতচল্লিশ বৎসর পূর্বে আমার পরমারাধ্য মহাপুরুষ মহারাজের শ্রীচরণদর্শন লাভ হয়। ১৯১৯ সনের ৺পূজার ছুটিতে একদিন অপরাহ্নে প্রায় সাড়ে তিনটার সময় মঠের একজন প্রবীণ সন্ন্যাসীর আনুকূল্যে আমি মহাপুরুষ মহারাজের শ্রীচরণ-সমীপে উপস্থিত হই। প্রথম দর্শনেই প্রাণে খুব আনন্দ পেলাম। খুব ভাল লাগল, কথাবার্তা একটু-আধটু হলো, কিন্তু তাঁর শ্রীমূর্তি দর্শন, সরল অথচ করুণা ও গাম্ভীর্যপূর্ণ কথাবার্তা শ্রবণ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা নিরীক্ষণ করে মনে এত আনন্দ পেলাম যে, তা এখন জীবনে চিরসঞ্চিত—আনন্দের একটি উৎস হয়ে আছে। তিনি বসেছিলেন তাঁর ঘরের উত্তর-পূর্ব কোণে একখানা চেয়ারে; ডানদিকে ছাদ, বেশ রোদ সেখানে এবং ঘরটি দরজা-জানালা-বন্ধ থাকলেও সূর্যকিরণে কতকটা উদ্ভাসিত। কতক্ষণ কথাবার্তার পর আমি পূজ্যপাদ মহারাজকে বললাম, "আজ রাত্রে আমি এখানে থাকব।" তিনি বললেন, "পরিচয়পত্র কিছু আছে? এখানে কেমন করে থাকবে? আমি বললাম, "পরিচয়পত্র নেই, তবে তার প্রয়োজন আছে তাও জানতাম না।" তাতে তিনি বললেন, "কোন সাধু বা ভক্তের পরিচয়পত্র আনলে থাকতে পার, নতুবা আমাদের নিয়মানুসারে এখানে থাকতে দিতে পারি না।" আমি বললাম, "কাপড়-গামছা আমি নিয়ে এসেছি রাত্রে থাকব মনে করে।" তিনি উত্তরে বললেন, "কাপড়-গামছা আনলেই কি থাকা যায়? পরিচয়পত্র ছাড়া এখানে কাউকে থাকতে দেয়া হয় না।"

সন্ধ্যার সময় কেমন করে কলকাতা ফিরে যাই, এখানকার তো এই নিয়মকানুন!—এভাবে সামান্য জল্পনা-কল্পনা করতে করতে পূজ্যপাদ মহারাজকে

প্রণাম করে মঠ থেকে সেই সন্ধ্যার প্রাক্কালে বিদায় নিলাম। মনে কিন্তু একটি কথা ভেবে খুশি হলাম তা এই—যা হোক, আমাদের দেশে এমন একটি ভারতীয় সাধু-প্রতিষ্ঠান আছে যাঁদের নিয়ম-কানুন ভাল এবং ঐ নিয়মগুলি কার্যত অনুসরণ করা হয়। এ অভিজ্ঞতা এখানে আজ অসময়ে থাকতে না দিলেও ভুলব না, বরং শ্রদ্ধার সঙ্গে আমি সর্বদা মনে রাখব। এ কথা স্বীকার্য যে, এ অভিজ্ঞতা আমার ক্ষুদ্র জীবনে পরে বিশেষ কার্যকরী ও সহায়ক হয়েছে।

আবার প্রায় তিন বৎসর পরে যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, জগজ্জননী পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী, পূজ্যপাদ স্বামীজীর বিষয় জেনেছিলাম এবং পূজ্যপাদ রাজা মহারাজ ও শ্রীশ্রীঠাকুরের আর কয়েকজন সন্ন্যাসী শিষ্যের পদধূলি-গ্রহণ, দর্শন, একটু কথাবার্তা-শ্রবণ এবং তাঁদের পবিত্র সান্নিধ্যলাভ কতকটা করেছিলাম এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কয়েকটি কেন্দ্র এবং কয়েকজন শ্রদ্ধেয় সাধু-সন্ন্যাসী ও ভক্তদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁদের আদর-যত্ন, ভালবাসা ও সদয় ব্যবহার আমাকে বিশেষ আকৃষ্ট করেছিল। তখন ১৯২২ সনের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রারম্ভে ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ মহারাজের ইচ্ছানুযায়ী আর একজন বিশিষ্ট ভক্তসহ আমি বেলুড় মঠে পরমপূজনীয় রাজা মহারাজ, পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ এবং আমেরিকা হতে প্রত্যাগত পূজনীয় স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে ঢাকা আশ্রমে তথা পূর্ববঙ্গে আনার চেষ্টা করতে এলাম। রাজা মহারাজ আসতে রাজি হলেন না। মহাপুরুষ মহারাজ ও কালী মহারাজকে নিয়ে আমরা কয়েক দিন পরেই ঢাকা এলাম।

আসবার সময় একটি ক্ষুদ্র কিন্তু স্মরণীয় ঘটনা হয়। পূজনীয় মহারাজদের জন্য আমরা ট্রেনে দ্বিতীয় শ্রেণী ও স্টিমারে প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনেছিলাম। তখনকার দ্বিতীয় শ্রেণীতে বেশ ভাল বন্দোবস্ত ছিল। মহারাজদের যত্ন করে বসিয়ে আমরা নিজেদের জন্য তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে রাত্রি-যাপনের জন্য একটু বসবার স্থান করে সেখানে বসে আছি। মনে মনে ভাবছি যে, পূজনীয় মহারাজদের কোন প্রয়োজনাদি আছে কিনা তা একবার কি দেখে আসা উচিত নয়? আবার ভয় হলো একবার কামরা ছেড়ে গেলে আর কি এখানে বসবার জায়গা পাওয়া যাবে? তবু এত বড় বৃদ্ধ সাধু মহারাজদ্বয়ের গাড়ি ছাড়বার পূর্বে একবার একটু খোঁজ করে আসা উচিত। এরূপ ভাবছি, ঠিক তখন দেখি আমাদের তৃতীয় শ্রেণীর কামরার দরজায় পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ এসে হাজির। তিনি সহাস্য বদনে, স্নেহ-মধুর স্বরে জিজ্ঞেস করছেন, "কি হে, তোমরা বসবার জায়গা পেয়েছ তো?" আমি তাঁকে দেখে বিস্মিত, অনুতপ্ত ও দুঃখিত হয়ে তাড়াতাড়ি প্ল্যাটফর্মে নেমে বললাম,

"মহারাজ, আপনি কেন এলেন?" এবং মনে মনে বড়ই অপ্রস্তুত হলাম। কি আর করব? পূজনীয় মহারাজের সঙ্গে তাঁর কামরায় আবার গেলাম। সেখানে কিছুক্ষণ থেকে গাড়ি ছাড়বার কয়েক মিনিট পূর্বে নিজেদের কামরায় এলাম। ঘটনাটি বড় নয়, কিন্তু অবিস্মরণীয়। সেই থেকে যখনই কোন স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম দেখি, তখন তা মনে হয়ে নিজেকে অনুতপ্ত মনে করতাম।

পূজনীয় মহারাজদের সঙ্গে তাঁদের দুজন সন্ন্যাসি-সেবক এবং আমরা দুজন, মোট চারজন ছিলাম। রাত্রি দশটা-এগারটায় গাড়ি ছেড়ে ভোরে গোয়ালন্দে পৌঁছায়, রাত্রির কথা তেমন কিছু মনে নেই। সূর্যোদয় হচ্ছে, তখন বিশাল পদ্মানদীর উপর স্টিমারের দোতলায় পূজনীয় মহারাজদের নিয়ে আমরা উপরে উঠতেই কালী মহারাজ বললেন, "চা কোথায়?" তাড়াতাড়ি প্রথম শ্রেণীতে তাঁদের নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়ে চায়ের বন্দোবস্ত করা হলো। মহাপুরুষ মহারাজ আমাদের বললেন, "দেখ, আমার জন্য এত ভেব না। কালী মহারাজ এতকাল আমেরিকার জীবনে অভ্যস্ত। তাঁর কোন অসুবিধা যেন না হয়, তোমরা সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখবে। আমাকে একটু পরে সব দিলেও ক্ষতি নেই। কালী মহারাজের যেন কোন অসুবিধা না হয়।" আমরা যথাসম্ভব তাঁর আদেশ পালন করতে সচেষ্ট হলাম। তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট থাকলেও আমরা অনেকবার পূজনীয় মহারাজদের কাছে যাতায়াত ও কথাবার্তার সুযোগ খুঁজতাম। তাঁদের মধুর হাসিতে এবং সুন্দর কথাবার্তায় খুব আনন্দে স্টিমারে প্রায় পাঁচ-সাত ঘণ্টা কেটে গেল। এ তো যাত্রা নয়—যাত্রা উৎসবে পরিণত হয়েছে। স্টিমার লোহজঙ্গ স্টেশনে থামতে অনেক ভক্ত জয়ধ্বনিসহ মাল্য ইত্যাদি নিয়ে পূজনীয় মহারাজদের প্রণাম, দর্শন ও আশীর্বাদগ্রহণ করতে আসেন। বেশ আনন্দ। অন্তত আমার জীবনে শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় এরূপ অভিজ্ঞতা এই প্রথম।

দুপুরে নারায়ণগঞ্জ স্টেশনে স্টিমার পৌঁছতেই সেখানে পূজনীয় মহারাজদের সংবর্ধনা ও অভ্যর্থনা করতে ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ এবং নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্র হতে সাধু ও ভক্তগণ উপস্থিত হন। সকলেরই প্রাণে বিপুল আনন্দ। দর্শনাদির পর ঢাকা মঠের অধ্যক্ষ পূজনীয় মহারাজদের একখানি মোটর গাড়িতে নারায়ণগঞ্জ হতে ঢাকা আশ্রমে নিয়ে যান। আমরা কয়েকজন সব মালপত্র নিয়ে একটু পরে ট্রেনে ঢাকায় আসি। ঢাকা আশ্রমে প্রবেশ করে দেখি আশ্রমের চেহারা বদলে গিয়েছে। সাধু-ভক্ত, পরিচিত-অপরিচিত বহু নরনারীতে মঠ-প্রাঙ্গণ ভরতি। সকলেরই প্রাণে খুব আনন্দ ও উৎসাহ।...

তাঁদের উপস্থিতির সময় আশ্রমে প্রবেশ করলেই মনে হতো যেন আশ্রম সর্বদা উৎসব-মুখরিত। সবসুদ্ধ প্রায় পাঁচ-সাত সপ্তাহ ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ ও

বুড়ীগঙ্গার অপর পারে সামান্য কয়েক মাইল দূরে বেঙ্গারা গ্রামে—সকলেই খুব আনন্দে মহারাজদের পুণ্য সান্নিধ্যে পূজা, ভজন, ধর্মপ্রসঙ্গ-শ্রবণ, প্রসাদগ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে মহা-আনন্দ-উৎসবে কাল কাটিয়েছিলেন। পূর্ববঙ্গের নানাস্থান হতে বহু ধর্মপিপাসু আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ভক্তগণ আসতে লাগলেন। কত উপদেশ-শ্রবণ, শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসব, আশ্রমে ও বাইরে ধর্ম-প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বৃহৎ ও নাতিবৃহৎ সভানুষ্ঠান, ভজন-কীর্তন প্রভৃতি ব্যাপারে সকলে যোগদান করলেন।

পূজনীয় মহারাজদ্বয় ঢাকা আশ্রমে অনেক ভাগ্যবানকে মন্ত্রদীক্ষাও দিলেন। ঢাকা হতে শিবরাত্রির দিন পূজনীয় মহারাজদ্বয় ময়মনসিংহ যান। আমরা কয়েকজন গাড়িতে সঙ্গে ছিলাম। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা অন্যের কাছে ক্ষুদ্র হলেও আমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। দুপুরবেলা ময়মনসিংহের পথে গাড়িতে প্রবেশ করেই দেখি বেশ গরম। আমি পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের কামরায় ছিলাম। আমাকে ডেকে তিনি বললেন, "আমি তোমাকে ভাড়ার টাকা দেব; তুমি টিকিটখানি বদলে নাও। আমার কাছেই তুমি থাক।" আমি উত্তরে বললাম, "হাঁ মহারাজ, আমিও তা করব ভেবেছি। এ সুযোগ আমি ছাড়ব না। আমার কাছে টাকা আছে।" গাড়িতে তাঁর পদপ্রান্তে থাকার সৌভাগ্য এভাবে হলো। গাড়ি ছাড়ল, বেশ গরম। গরম হাওয়া ভেতরে আসছিল। আমি একটু হতবুদ্ধি হলাম। কেবলই ভাবছি—কি করব? মহারাজ একটু যদি ঘুমাতে পারেন, তবে বড় ভাল হয়। ইনি বৃদ্ধ—কি করলে একটু ঘুম হয়? এই ভেবে মহারাজের শায়িত অবস্থায় পায়ে একটু হাত বুলাতে লাগলাম। শ্রীভগবানের কৃপায় এতেই সুফল হলো। কয়েক মিনিট ঐরূপ করতেই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন এবং প্রায় সমস্ত পথই গাড়িতে ঘুমালেন। নিদ্রাভঙ্গে তিনি খুব প্রফুল্ল হন এবং খুব স্বস্তিবোধ করছেন এরূপ মনে হলো। বলা বাহুল্য এতে আমার প্রাণে অভূতপূর্ব তৃপ্তি হলো।

ময়মনসিংহ-এ এক জমিদারের প্রকাণ্ড বাড়িতে সকলের থাকবার স্থান হয়েছে, কিন্তু শিবরাত্রি বলে সে রাত্রিতে আর ঘুম তেমন হলো না। পূজনীয় মহারাজদ্বয় সকলের সঙ্গে শিবের গান একটু একটু করলেন আর শিবরাত্রির পূর্বস্মৃতি সম্বন্ধীয় ও অন্যান্য প্রসঙ্গে রাত্রি প্রভাত হলো। পরদিন ওখানকার আশ্রম মন্দিরের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা হলো। পূজনীয় স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ ময়মনসিংহ হতে কার্যগতিকে বেলুড় মঠে চলে গেলেন। তিনি যাবার সময় বেশ একটি কথা বলেছিলেন। আমি যখন তাঁকে বললাম, "মহারাজ, আমি আপনার সেবা তেমন করতে পারিনি।" আমার এই কথা শুনে তিনি বললেন, "তাতে কিছু আসে যায় না, খুব যত্ন করে ঠাকুরের সেবা-পূজা কর, তাহলে সেসব আমাদের কাছেই পৌঁছবে।" তাঁর ঐ কথায়

প্রায়ই মনে হয় ঠাকুরের সেবা করলেই তাঁদের সেবা করা হয়। যে কদিন তিনি ঢাকা ও ময়মনসিংহ-এ ছিলেন সকলেই তাঁর আশীর্বাদ ও স্নেহ-ভালবাসার অধিকারী হয়ে আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে দিন কাটাত।

আমরা পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজকে নিয়ে শীঘ্র ঢাকা আশ্রমে ফিরলাম। ঢাকাতে থাকার সময় আশ্রমটি সর্বদাই উৎসব-মুখর হয়ে থাকত। সকলেই কত গান, ভজন, সৎকথা, আশীর্বাদলাভ ও বহু সাধু-ভক্তের আগমনে দিনরাত আনন্দে কাটাত! আবার বহু দীক্ষাপ্রার্থীর আকাঙ্ক্ষাও তখন পূর্ণ হয়। কত নরনারীর জীবনের গতি চিরকালের জন্য পরিবর্তিত হয়! পরিচিত ও অপরিচিত বহু লোক সেখানে আসতেন। প্রায়ই শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রসঙ্গ চলত। আর প্রায় প্রতিদিন আশ্রমে ও বাইরে "দীয়তাং নীয়তাং ভুজ্যতাম্"—প্রসাদ-বিতরণের ঘটা বেশ ছিল। নানাপ্রকারের আহার্য পূজনীয় মহারাজদের জন্য নানাস্থান হতে ভক্তগণ নিয়ে আসতেন এবং মহারাজদের কত আশীর্বাদ ও ভালবাসা পেয়ে কৃতার্থ হতেন।...

* * *

ঢাকা মঠের পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠা কার্য মহাপুরুষ মহারাজ নিজে উপস্থিত থেকে সব করালেন। তিনি বলেছিলেন, "শ্রীশ্রীঠাকুর কিছু ভাঙতে আসেননি। শাস্ত্রে যেমন বিধি আছে তেমনি বাস্তু-পূজা প্রভৃতি ভাল পুরুত আনিয়ে সব করাও আর আমাদের ঠাকুরের পূজাও সেখানে হবে।" ওসব ব্যাপারে তাঁর এতটা আগ্রহ দেখে সকলে পরম তৃপ্তিলাভ করলেন। পুকুরের জল এনে দেয়া হলে তিনি তা অতি যত্নসহকারে নিয়ে বললেন, "দেখেছ, কেমন চমৎকার জল, যেন ডাবের জল!" ঐসকল উৎসাহ-বাণী শুনে মঠের সাধু ও ভক্তগণ—বিশেষত যাঁরা পুষ্করিণী-খনন ও প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ-সাহায্য ও কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন, তাঁদের প্রাণে বিপুল আনন্দ হলো। ছোট-বড় সব ব্যাপারে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের শুধু আশীর্বাদ নয়—তাঁর হৃদয়বত্তার স্পর্শ পেয়ে আমরা মনে মনে ভাবতাম যেন তাঁর অবস্থানকালে এক অপার্থিব অমর ধামে বাস করছি! জপ-ধ্যান, পূজা-পাঠ ভুলে সর্বদা সকলের ইচ্ছা হতো তাঁর শ্রীচরণপ্রান্তে বসে ঐ মধুর অপার্থিব হাসি আর তাঁর অমৃতময়ী কথা দিনরাত সম্ভোগ করি। তিনি তা বেশ বুঝতেন এবং আমাদের আনন্দ দিতে কৃপণতা করতেন না। ভাবুকতা বা 'ইমোসান' বলে সবই উড়িয়ে দেয়া যায় বটে, কিন্তু এসব ভাবুকতার অতীত অনেক ঊর্ধ্বে অবস্থিত এক অজ্ঞাত রাজ্যের জিনিস। তাই অনেকেই তা এখনও পরম আদরে হৃদয়ের মণিকোঠায় সংরক্ষণ করে ঐ অমৃত-আস্বাদনে সচেষ্ট আছেন। মাঝে মাঝে তিনি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কত হাসি-ঠাট্টা করতেন! এসব কথায় মনে পড়ে শ্রীশ্রীঠাকুরেরই কথা—"মা, আমি

শুটকো সাধু হব না।" প্রাকৃত জগতের সব কথা ভুলে গিয়ে মনে হতো যে, আমরা পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজকে নিয়ে যেন সশরীরে স্বর্গবাস করছি!

এ সময় আমরা কেউ কেউ মহাপুরুষজীর দিব্যসঙ্গলাভ করা শুধু নয়, তাঁর একটু-আধটু সেবা করবার সুযোগও পেয়েছি। সকলেই তাঁর "নির্মাণমোহ" শ্রীমূর্তির প্রতি কেমন একটা অনৈসর্গিক আকর্ষণ অনুভব করতাম, যার ফলে আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের আদর্শ ও কর্ম-পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়ে গেল! তিনি যখন ভগবৎ-কথা, সাধন-ভজন অথবা নিজ পূর্বজীবনের কথা বলতেন, তখন আমরা সকলেই মুগ্ধ হয়ে প্রত্যেকটি শব্দ আয়ত্ত করবার চেষ্টা করতাম। তাঁর গলার স্বর খুবই মিষ্টি ছিল। গানের সময় বাঁয়া তবলা প্রভৃতি বাজাতে তাঁর বেশ উৎসাহ দেখা যেত। তিনি যখন কথাবার্তা বলতেন বা অস্ফুটস্বরে কোন গান গাইতেন তা আমরা স্থির হয়ে শুনতাম। সাধু-ব্রহ্মচারী গৃহী সকলেই কিভাবে জীবন যাপন করবে সব কথা তিনি প্রাঞ্জলভাবে সকলকে বুঝিয়ে বলতেন। ভক্তদের আন্তরিকতায় তুষ্ট হয়ে শুধু তাদের মন্ত্রদীক্ষা দেয়া নয়, দৈনিক নিত্য-নৈমিত্তিক জীবন তারা কিভাবে যাপন করবে তাও অতি সুন্দরভাবে বলতেন। অবশ্য তাঁর ব্যবহারিক জীবনটিই ছিল সব উপদেশের জীবন্ত-ভাষ্যস্বরূপ। তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল ঢাকা আশ্রমটি খুবই জেঁকে ওঠে আর ভক্তগণ কৃতকৃতার্থ হয়ে যায়। মহাপুরুষজী ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের হাতের যন্ত্রস্বরূপ। তাই ঠাকুর ঐ যন্ত্রটি দ্বারা অনেকের প্রকৃত আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধন করলেন। জাগতিক ও আধ্যাত্মিক সব ব্যাপারে যাতে সকলে উন্নত হতে পারে তাতেই ছিল তাঁর বিশেষ আগ্রহ। 'কথামৃত' বা 'লীলাপ্রসঙ্গ'-পাঠে বা আশ্রম হতে কিছু দূরে বুড়ীগঙ্গা নদীর কাছে ফরাশগঞ্জ 'গৌরাবাসে' সাপ্তাহিক অধিবেশনে, ভক্তদের ক্ষুদ্র-বৃহৎ বাসগৃহে, সব স্থানে গিয়ে তাঁদের ধর্মজীবন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে কখনও তিনি কুণ্ঠাবোধ করতেন না। ভক্তগণ বরং তাঁকে নিজ বাসস্থানে নিয়ে যেতে ভয় পেতেন।...

বেশ আনন্দে দিনগুলি কাটছিল, হঠাৎ কলকাতা থেকে সংবাদ এল যে, পরমারাধ্য স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ বিশেষ অসুস্থ। নিত্য নিয়মিতভাবে রাজা মহারাজের সংবাদ আসত। মহাপুরুষ মহারাজ প্রথম দিকে বলতেন, "মহারাজ ভাল হয়ে যাবেন, অনেক কাজ বাকি আছে। মহারাজ এখন কোথায় যাবেন? মহারাজকে শ্রীশ্রীঠাকুর জগতের কল্যাণের জন্য আরও কিছুকাল সুস্থ শরীরে রাখবেন।" কিন্তু একদিন রাত্রে এক ভক্তের বাড়ি হতে ফিরবার সময় তিনি আমাদের বললেন, "দেখ, মহারাজের অসুখ আর আমি এখানে রয়েছি—সে কি? সব ব্যবস্থা কর। আমি কাল মঠে রওনা হব।" তাঁর আদেশ অনুসারে সব বন্দোবস্ত করা হলো। কলকাতা থেকেও তাঁর ফিরবার জন্য চিঠি আসছিল।

সুখস্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। পরদিন তিনি মঠে রওনা হলেন। সকলের প্রাণে বিষাদের ছায়া। "আপনি চলে যাচ্ছেন—আমরা কেমন করে থাকব"—এ প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, "কেন, এই যেভাবে আমার সঙ্গে কাটিয়েছ, সেভাবে থাকবে।" আমরা ভাবলাম—তা কি কখনও সম্ভব?

এখনও সেই বিদায়গ্রহণের ছবি মনে পড়ে। নারায়ণগঞ্জ শীতললক্ষা নদীর উপর মেল স্টিমার, আমরা সব জেটিতে দাঁড়িয়ে। পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের সৌম্যমূর্তি—দয়া, স্নেহ, প্রীতি, প্রেম ও ভালবাসায় পূর্ণ। স্টিমারে ডেকের উপর দাঁড়িয়ে তিনি আমাদের তথা সমগ্র পূর্ববঙ্গকে যেন দু-হাত তুলে আশীর্বাদ করছেন। তখন মধ্যাহ্ন, প্রখর সূর্যকিরণ। তাঁর সেই সুন্দর তপোজ্জ্বল মূর্তিটি স্মরণ করলে প্রাণ নিমেষে অন্য-রাজ্যে চলে যায়! চুয়াল্লিশ বৎসর পূর্বের ঘটনা। সেই বিদায়কালীন আশীর্বাদ-বর্ষণ করবার চিত্র অবিস্মরণীয়। কি আনন্দে সেই কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল—"মূকাস্বাদনবৎ" তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়! "বুঝে প্রাণ বুঝে যার।" ঢাকা মঠে নিত্যোৎসব বন্ধ হলো।...

তাঁর সেবার একটু-আধটু কাজ মহাপুরুষজী আমাদের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে করবার সুযোগ দিতেন। উল্লেখযোগ্য একটি কথা মনে পড়ে। একদিন একখানা পোস্টকার্ডে চিঠি লিখতে ডাকলেন, আনন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে লিখতে বসলাম। পত্রখানি পরমারাধ্য রাজা মহারাজের নিকট তাঁর অসুখ হওয়ার পূর্বে লেখা হয়েছিল। লিখতে আরম্ভ করেই আমি বললাম, "পূজনীয় মহারাজের কাছে পত্র দিবেন—তা কি আমি লিখতে পারি!" শুধু উত্তর দিলেন, "তুমি লিখে যাও, আমি বলে দিচ্ছি। তাতে কোন আপত্তি নেই।" তাঁর আদেশে এই আমার প্রথম পত্র লিখবার প্রয়াস—তা স্মরণ করে সর্বদা গৌরববোধ করি।

কতটা তন্ময় হয়ে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর কথা বলতেন তার একটি দৃষ্টান্ত মননযোগ্য। একদিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর কলম্বো তথা মাদ্রাজ হতে কলকাতায় পূজ্যপাদ স্বামীজীকে নিয়ে তিনি ও নিরঞ্জনানন্দ মহারাজ এসেছিলেন—তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আমাদের বললেন। বলতে বলতে অনেক রাত্রি হয়েছে, প্রায় সাড়ে বারোটা বাজবার উপক্রম। শ্রোতাদের সংখ্যাও কম। আমি ক্লান্ত অবস্থায় একটু নিদ্রালু হয়েছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কটা বেজেছে?" জবাব শুনে তিনি বললেন, "তোমারও ঘুম পেয়েছে—আচ্ছা যাও, ঘুমোও গে। আমি আর ঘুমাব না। ঘুম হয়ে গেছে। স্বামীজীর কথা—এর কি আর শেষ আছে? তাঁর কথা মনে হলে ঘুমটুম সব পালায়। আজ আর ঘুম হবে না। আজ শিবগুণগান করে আমি ধন্য হয়ে গেছি। আচ্ছা, তোমরা সব যাও, ঘুমোও গে।" কথা শুনে এবং তাঁর

ভাব-বিহ্বল অবস্থা দেখে আমাদের মন অন্তত কিছুক্ষণের জন্য অন্য রাজ্যে চলে গিয়েছিল, তা ভুলবার নয়। স্বামীজীকে তিনি কি চক্ষে দেখতেন তার একটু আভাস যেন তাঁর কৃপায় আমরা সেদিন হৃদয়ঙ্গম করলাম।

কত নরনারীর জীবনের ধারা যে মহাপুরুষজীর সংস্পর্শে এসে পরিবর্তিত হয়েছে তা বলা অসম্ভব! তাঁর কৃপায় বহু ভক্ত ত্যাগের জীবন বরণ করেছেন দেখেছি—কেহ গুপ্ত, কেহ ব্যক্ত। এসব আমাদের কাছে ইন্দ্রজালের মতো মনে হতো। সর্বদা একটি বিষয় লক্ষ্য করতাম যে, এত জীবনের পরিবর্তনসাধন তিনি করতেন, কিন্তু তা সব অনায়াসে করে যেতেন, এতটুকু ভ্রূক্ষেপ ছিল না। মনে হতো তিনি যেন শ্রীশ্রীঠাকুরের 'পাওয়ার হাউস' (শক্তিকেন্দ্র), তাঁর মধ্যে সর্বদা অফুরন্ত শক্তি রয়েছে! শুধু কয়েকজন ভাগ্যবান সে শক্তির দুই-এক কণা লাভ করে সহজে তাঁর কৃপায় জীবন-সমস্যার আত্যন্তিক সমাধান করতেন।...

এর কয়েক সপ্তাহ পরে রাজা মহারাজের মহাসমাধির পর ত্রয়োদশ দিনে আবার আমি বেলুড় মঠে মহাপুরুষজীর কাছে যাই। তখন গ্রীষ্মের ছুটি। মঠে ঐদিন বহু সাধু ও ভক্তের সমাগম হয়েছে, তবু আমার পক্ষে তাঁর শ্রীচরণছায়ায় প্রায় সব সময় থাকার কোন বাধা ছিল না। তাঁর কৃপায় সবই সহজ ও সুলভ হয়ে গেল। কত কথা তাঁর কাছে শুনতাম! দিনরাত তিনি রাজা মহারাজের কথা বলতে বলতে যেন তন্ময় হয়ে যেতেন। কি অপূর্ব ভাবগম্ভীর অবস্থা! অথচ নিষ্ঠার সঙ্গে মঠের দৈনন্দিন কাজকর্ম ঠিক চালিয়ে যাচ্ছেন এবং সকলেই তাঁর নির্দেশে সব করে যাচ্ছেন। মিশনের বাৎসরিক সভায় যেদিন অভ্যাগতদের কক্ষে অধ্যক্ষ-নির্বাচন হলো তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। পূজনীয় শরৎ মহারাজও এসেছেন। মহাপুরুষ মহারাজকে অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করার অনুরোধ জানাতে তিনি কতক্ষণ ইতস্তত করে "মহারাজই আমাদের প্রেসিডেন্ট"—এসব কথা বলে পরে ঐ পদ গ্রহণ করতে রাজি হলেন। আমাকে সে সভায় মহাপুরুষ মহারাজের অনুমোদনে মিশনের একজন গৃহী সদস্যরূপে গ্রহণ করা হলো। তাতে আমার খুবই আনন্দ হয়েছিল।...

ঐ সময় থেকে অবসর পেলেই বেলুড় মঠে গিয়ে পূজ্যপাদ মহাপুরুষজীর পদপ্রান্তে বাস করবার সুযোগ লাভ করতাম। তখন কত ভালবাসতেন—কত সদুপদেশ তিনি দিতেন! একটু একটু কাজও করতে বলতেন—যেমন মঠে কুটনো কোটা, বাগানে জল দেয়া, ঘর ঝাঁট দেয়া এবং মঠের দিনচর্যা পালন করা, সকাল হতে রাত্রিতে বিশ্রামকাল পর্যন্ত নিত্য-নৈমিত্তিক সকল কাজে যোগ দেয়া। কয়েকটি ক্লাশও তখন মঠে হতো নানা পর্যায়ের। উৎসবগুলিতে মঠে থাকলে পূর্ণোদ্যমে কাজকর্ম করা তিনি খুব পছন্দ করতেন। সাধারণত কোন শাস্ত্রপাঠ করে তাঁকে

শোনাতে তিনি বলতেন বা চিঠিপত্র লিখতে বলতেন। তাঁর কাছে অনেক চিঠি আসত। তার কিয়দংশ কিরূপে লিখতে হয় তা আমায় সংক্ষেপে শিখিয়ে দিয়ে লিখতে বলতেন। পরে আমার লেখা পত্রগুলি পড়ে প্রয়োজনমত সংশোধন করে স্বাক্ষর করতেন। বড়ই আনন্দে সে-দিনগুলি কাটত। কিছুতেই আমার আয়াস বোধ হতো না। অহেতুক কৃপা বা ভালবাসা অপার্থিব বস্তু। কখনও মনে অন্য কোন চিন্তা আসত না। কখনো কখনো তাঁর ব্যক্তিগত সেবা একটু-আধটু করার সুযোগও আমায় দিতেন। আচার্য শঙ্করের প্রসিদ্ধ কথা সার্থক মনে হতো ঃ

"ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা।
ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা ॥"

ঈশ্বরের কৃপায়ই এ জগতে সমস্ত ব্যাপার ঘটে তার কোন সন্দেহ নেই। তা হলেও সর্বদা লক্ষ্য করতাম মহাপুরুষ মহারাজ নীরবে বা অন্যের অজ্ঞাতসারে বহু লোকের জীবনধারা পরিবর্তিত করে তাদের অমরধামে উপনীত হবার সুযোগ-সুবিধা করে দিতেন। প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে তা ভাবলে হৃদয় বিস্ময়ে পূর্ণ হয়। স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা, আশীর্বাদ প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি সকলকে ধীরে ধীরে শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে সমর্পণ করতেন। তাতে তাঁর নিজের ও কৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তির মনেও স্বত আনন্দ লাভ হতো। কাউকে দেখেই তিনি বুঝতেন পরবর্তী কালে তাকে কিভাবে জীবনযাপন করতে হবে। তদনুসারে তাকে সদুপদেশ দিতেন।

এ সময়ের একটি ক্ষুদ্র ঘটনা মহাপুরুষজীর আদর-যত্ন ও ভালবাসার দৃষ্টান্তরূপে বিশেষ স্মরণীয় হয়ে আছে। একবার গ্রীষ্মের অবকাশে মঠে গিয়ে তাঁর কাছে বাস করছি। প্রায় দেড়-দুমাস বাসের পর কর্মস্থলে ফেরার কথা তাঁকে নিবেদন করাতে তিনি বললেন, " ওহে, এখনও তো ছুটি শেষ হয়নি—আরও কয়েক দিন থাক না কেন? চাকরির জন্য এত মায়া কেন? আরও কয়েকদিন থাক।" উত্তরে বললাম, "না মহারাজ, এখন চলে যাই। আর থাকতে পারব না। পড়াশুনাও তো কিছু করতে হবে।" তিনি থাকতে বললেন, আমি তাতে রাজি হলাম না। শেষে যেদিন রওনা হব সেদিন মঠে মুষলধারে বৃষ্টি। এক দালান থেকে অন্য দালানে যাওয়া যায় না এত বৃষ্টি। সে দিনও বললেন—"আরও কয়েকদিন থাক। কেন এখন যাবে? এত মায়া কেন?" আমি কিন্তু রাজি না হয়ে বললাম—"না মহারাজ, বৃষ্টি হয় হোক—আমি আজই চলে যাই।" তিনি খুশি হলেন না। শুধু বললেন, "তাহলে আজ যাওয়াই স্থির?" আমি বললাম—"আজ্ঞে হাঁ, মহারাজ আজই যাই।" সন্ধ্যা আগত। আমায় মঠ থেকে রওনা হতে হবে। তখন বিদায়-আশীর্বাদ-গ্রহণ করবার সময় আসন্ন। তিনি বললেন, "দেখ, আমি একটি ভক্তকে (অঙ্গুলি-নির্দেশে দেখিয়ে)

বলেছি—তার মোটর গাড়িতে তোমাকে রেল-স্টেশনে সে তুলে দিয়ে আসবে।" আমি তো অবাক! তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাচ্ছি, কিন্তু তিনি এতটুকু বিরক্ত না হয়ে আমার যাবার ভাল ব্যবস্থা করে দিলেন। আবার মঠ হতে পূজ্যপাদ মহারাজকে প্রণাম করে আসবার সময় অজস্র আশীর্বাণীর সঙ্গে শ্রীশ্রীমহামায়ার "দুর্গা দুর্গা দুর্গা দুর্গা" ইত্যাদি অমৃতবর্ষণকারী নাম এবং "সর্বদা মনে রাখবে যেখানেই যাওনা কেন শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী, মহারাজ ও আমরা সঙ্গে সঙ্গে আছি, কোন ভয় নেই।"—ইত্যাদি আশ্বাসবাণী এমন মধুরস্বরে বললেন যে, এতকাল পরে আজও যখন কোথাও যাই শুধু তখনই নয়, প্রায় সর্বদা সেই করুণাপূর্ণ ধ্বনি হৃদয়ে জাগরূক রয়েছে। সমস্ত রাত্রি ও গন্তব্যস্থানে পৌঁছানো পর্যন্ত, এমনকি তার পরেও সেই সুমধুর কণ্ঠস্বর ও মনপ্রাণঢালা আশীর্বাদ পুনঃপুনঃ মনে হতে লাগল। সামান্য ব্যক্তি আমি, আমাকে তিনি এত আদর করে অযাচিতভাবে আশীর্বাদ করলেন ও সাহস দিলেন! —এই ভাবতে লাগলাম এবং ভাবলাম এটাই বোধ হয় অহৈতুকী কৃপা। নতুবা এ তো আমার কল্পানাতীত বস্তু। এ সামান্য জীবনে তা এখন কেন, শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও অপার্থিব পুঁজি হয়ে রয়েছে। শুধু শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি—এ শুভ স্মৃতিটুকু শেষ পর্যন্ত যেন মনে জাগরূক থাকে।...

মহাপুরুষজীর কাছে কেউ অযোগ্য বা নগণ্য ছিল না। ঐ ক-বৎসরের আর একটি ঘটনাও মনে পড়ে। একবার বহুদূর থেকে কলকাতায় এসে সন্ধ্যার সময় মঠে মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম ও দর্শন করতে গিয়েছি। কথাবার্তার পর সন্ধ্যা হলো, শীতকাল। তখন মঠে বেশ স্থানাভাব। মঠে থাকা বিশেষত রাত্রিতে, সকলের পক্ষেই অসুবিধাজনক। তিনি সন্ধ্যার সময় জিজ্ঞেস করলেন, "এখন কি করবে? কোথায় থাকবে আজ রাত্তিরে?" আমি বললাম, "আজ ভেবেছি দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে রাত কাটাব।" তিনি বললেন, "দক্ষিণেশ্বরে কেন? এই শীতকাল, অন্ধকার রাত্রি। দক্ষিণেশ্বরে কেন যাবে?" আমি বললাম, "অনেক দিনের সাধ একটা রাত দক্ষিণেশ্বরে কাটাব। বহুকালের সাধ।" তিনি বললেন, "দেখ বাবা, দক্ষিণেশ্বরের তুলনা নেই—আমাদের ঐ সেরা জায়গা, কিন্তু খাওয়া-দাওয়া শোয়া, মশার কামড় ইত্যাদি তো আছে। কেমন করে সেখানে থাকবে? কষ্ট তো হবে।" আমি জবাব দিলাম, "কোনপ্রকারে একটা রাত কাটিয়ে দেব।" তখন আসল কথাটি উত্তরে বললেন, "দেখ, দক্ষিণেশ্বর আমাদের পীঠস্থান—অমন স্থান আর কি আছে? স্বয়ং শ্রীশ্রীঠাকুর ওখানে এতকাল ছিলেন, সাধন-ভজন, পূজা-পাঠ, তপস্যা, শিক্ষা-দীক্ষাদান, ধর্মপ্রচার ইত্যাদি কত অদ্ভুত কাজ সব স্বয়ং ভগবান করেছেন প্রায় ৩০ বৎসর কাল। তবু বলছি, আজ এখানেই থাক—Nothing like life (জীবন খুব মূল্যবান, জীবনের মতো আর কিছুই নেই)। এখানে এত সাধু-সন্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের

স্থানে বাস করছে। আমি বলছি আজ এখানেই থাক—এখানে আমার কাছে থাক। দক্ষিণেশ্বর মহাতীর্থ নিঃসন্দেহ, সেখানে পরে কখনো গিয়ে থাকবে। সৎসঙ্গ, ভগবৎকৃপা, ভগবদানন্দ জীবন্তভাবে এখানে বর্তমান! এই মঠ অতুলনীয় স্থান—আজ এখানে থাক—অন্যত্র যাবার দরকার নেই।" আমি যখন বললাম, "মঠে তো জায়গা নেই। কোথায় থাকব?" তিনি উত্তরে বললেন, "কেন? এই ঘরের মেজেতে শোবে। ঐ আলনায় কম্বল আছে, একখানি কম্বল দেব, তাতে কোন কষ্ট হবে না।" আমারও যেন ক্ষণকালের জন্য চোখ ফুটল। আর কোন বাক্‌স্ফূর্তি না করে সে ঘরে ঐ রাত্রে পূজ্যপাদ মহারাজের পদতলে কাটাতে আনন্দ ও বিস্ময়ে রাজি হলাম! এতটা তো কখনও আশা করিনি! ঐ রাত্রিটি আমার জীবনের একটি স্মরণীয় রাত্রি। সমস্ত জীবন তা ভেবে কত সৌভাগ্য ও মহাপুরুষজীর অপার করুণার কথা মনে পড়ে! শীত বেশ মন্দ নয়। শেষ রাত্রে তিনি উঠে একটি ছোট্ট মোমবাতি জ্বালিয়ে কুশল-প্রশ্নাদি করে হাত মুখ ধোবার পর "তুমি এখানেই থাক, একটু নাম কর, আমি এখন ঠাকুরঘরে যাচ্ছি।"—বলে শ্রীশ্রীঠাকুর-মন্দিরে চলে গেলেন। আমিও তাঁর আদেশমত ভগবানের নাম জপ করতে লাগলাম। সাধুসঙ্গ কি বস্তু তা তিনি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। ঐ পবিত্র বাসগৃহে বাস অথচ কয়েক বৎসর পূর্বে তিনিই আমাকে পরিচয়পত্র আনিনি বলে মঠে রাত্রিবাস করতে দেননি! আর আজ কত দয়া!...

পূজ্যপাদ মহাপুরুষজীর কৃপায় কয়েক বৎসর তাঁর শ্রীচরণপ্রান্তে থাকবার ও তাঁর সদুপদেশ পাবার সৌভাগ্য হয়েছিল। একবার কিছুকাল মঠে নানা কারণে যেতে পারিনি। তাতে তিনি লিখলেন—"কেন এতদিন এখানে আসনি? শীঘ্র একবার আসবে।" তখন আমিও সব দূরে ফেলে যেমন করেই হোক মঠে তাঁর শ্রীচরণপ্রান্তে উপস্থিত হতাম। একবার মঠে পৌঁছে নিচে উঠানে দাঁড়িয়েছি মাত্র। জানলার ফাঁক দিয়ে আমাকে দেখে বললেন, "সে কি? দেখেছ? বেচারার চেহারা কেমন হয়ে গেছে?" পরে দেখা হতে বললেন, "চলে এসো ওসব ছাইভস্ম ছেড়ে। তুমি কি মারা যাবে? এখানে এসো, শরীর মন সব ভাল হয়ে যাবে।" যখন দূরে থাকতাম তখন তিনি কৃপা করে পত্রে কত সুন্দর সুন্দর কথা লিখতেন। সর্বদাই পত্রযোগে তিনি আমার খবর নিতেন। ঐভাবে যাতে পথভ্রষ্ট না হই সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখতেন। পত্র লিখতে বিলম্ব হলে "আমার উপর অভিমান হয়েছে? আমি বৃদ্ধ, সব সময় পত্র লিখতে পারি না। কিন্তু সর্বদা তোমাদের কথা মনে করি। কেমন আছ—কুশল-সংবাদ দিয়ে সুখী করবে।" ইত্যাদি লিখতেন।

* * *

ধীরে ধীরে মহাপুরুষজী ১৯২৯-এর পূর্বেই আমাকে কৃপা করে পবিত্র শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদান করতে আদেশ দিলেন। আমার কাছে তা দুর্লভ বস্তু। শ্রীভগবানের ইচ্ছায় সবই সম্ভব। ১৯২৯-এ কল্পনা বাস্তবে পরিণত হলো। তাঁর পদপ্রান্তে এসে বেলুড় মঠে নূতন জীবন যাপন করবার সুযোগ তিনি আমাকে দিলেন। তাঁর কৃপা এক অপার্থিব বস্তু। আমার ক্ষুদ্র জীবনে সাধুদের যা কাম্য তার কিছুই ধীরে ধীরে তাঁর কৃপায় অপ্রাপ্য রইল না। সঙ্ঘভুক্ত হওয়া, সন্ন্যাস ও নাম-নির্বাচন পর্যন্ত নিজেই সব করলেন এবং মঠেই তাঁর কাছে থাকার সুযোগও তিনি কৃপাপূর্বক করে দিলেন। তাঁর শরীর তখন ভাল নয়, তবুও আমাকে তাঁর অপার দয়া ও স্নেহ-ভালবাসা থেকে কখনও বঞ্চিত করেননি। অসুস্থতার মধ্যেও কত আনন্দ ও রঙ্গরসের মাধ্যমে আমাদের মন সর্বদা এক উচ্চ স্তরে উন্নীত করে রাখতেন। সন্ন্যাস নেবার পরে কখনো সম্বোধন করতেন, "ওঁ নমো নারায়ণায়" বলে, কখনো গীতা, উপনিষদ্, ভাগবত, চণ্ডী প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ হতে উত্তম শ্লোক বা বাক্যসকল উদ্ধৃত করে আলোচনা করতেন। অন্যত্র যাওয়ার সময় বিদায় ও আশীর্বাদ গ্রহণ করতে এলে হেসে বলতেন কখনো—"When shall we meet again? In thunder, hailstorm or in rain?" প্রাতঃকালে প্রণাম করতে গেলে কখনো বলতেন—"Good morning. How are you?" অথবা বলতেন, "কুশলং তে?" ইত্যাদি প্রশ্ন করে দু-একটি কথা বলতেন অথবা স্নেহাশিসপূর্ণ দৃষ্টি দিতেন, তাতেই মনপ্রাণ অনেকক্ষণ উৎফুল্ল হয়ে থাকত। সাধন-ভজন সম্বন্ধে অনেক কথা বলতেন যাতে সকলেই অন্তরে অনুভব করত নূতন প্রেরণা। মঠের যাবতীয় কাজকর্ম ও ব্যক্তিগত কর্তব্যসম্পাদন সম্বন্ধে সকলকে সজাগ করে দিতেন। কখনো কাজগুলি যেভাবে সুসম্পন্ন হয় তেমনি দিক্‌দর্শন করিয়ে দিতেন। সমগ্র মঠে ও বাইরের কেন্দ্রগুলিতে মনে হতো যেন একটি অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

চিঠিপত্র দ্বারা তিনি সর্বদা দূরে-স্থিত সাধু, কর্মী ও ভক্তদিগকে ঠিক পথে চলবার এবং সর্বদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে জীবনের ধ্রুবতারা করে তাঁদের কাজকর্ম, সাধন-ভজন এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন যাতে সুনিয়ন্ত্রিত হয়ে গন্তব্যস্থলে নির্বিঘ্নে বিনাক্লেশে তাঁরা পৌঁছতে পারেন তেমন ব্যবস্থা করে দিতেন। সকলেই তাঁর পবিত্র ও করুণাপূর্ণ হৃদয়ের স্পর্শ পেয়ে যেন পুনরুজ্জীবিত হতেন। এভাবে মঠে ও বাইরে, দেশে ও সুদূর বিদেশে তাঁর প্রাণস্পর্শী স্নেহাশীর্বাদ বা চিঠিপত্রাদি পেয়ে সকলেই পরম তৃপ্তিলাভ করতেন। কখনো তাঁর লিখিত পত্রের একটি বাক্যে তাঁদের নিজ নিজ জীবনের সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, অসাধারণ মহাপুরুষদের বাক্যকে কর্ম অনুসরণ করে; ঠিক তার বিপরীত দেখা যায় সাধারণ লোকের জীবনে, অর্থাৎ কর্মকে বাক্য অনুসরণ করে। পূজ্যপাদ মহাপুরুষজীর

'সিদ্ধবাক্ অবস্থা' অনেকবার লক্ষ্য করেছি। যেমন করেই হোক, যা তিনি বলতেন তা কালে সংঘটিত হতো।

মহাপুরুষজীর স্মৃতিকথাই এখন আমাদের সম্বল। লিখতে গেলে অনেক কিছুই মনে পড়ে, তাতে ব্যক্তিগত ভাব স্বতই এসে যায়। সেসব কথা প্রকাশ করা ঠিক নয়। ওসব মহাশক্তির লীলা। পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের কথা ভাবলে শ্রীশ্রীচণ্ডীর শ্লোকটি মনে হয়—

যা দেবী সর্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥

তাই পূজ্যপাদ স্বামীজী মহারাজ যেমন বলতেন, "বোঝে প্রাণ, বোঝে যার।"—স্মৃতিকথা লিখতে বা অনুধ্যান করতে গেলে এ কথাটিই বারবার স্মরণ হয়। তা স্মরণ করে এবং দোষ-ত্রুটির জন্য মহাপুরুষ মহারাজের শ্রীপদে ক্ষমা প্রার্থনা করে এখানে ঐ কথার পরিসমাপ্তি করছি।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের পুণ্যস্মৃতি

স্বামী শিবস্বরূপানন্দ

ভগবান শঙ্করাচার্য বলেছেন জগতে তিনটি জিনিস দুর্লভ। মনুষ্য জন্ম, মুক্তির ইচ্ছা ও মহাপুরুষের সংশ্রয়। যে মহাপুরুষের স্মৃতিকথা লিখিতেছি তাঁহার সহিত কথাপ্রসঙ্গে একদিন স্বামীজী মহারাজ বলিয়াছিলেন যে বিবাহিত জীবনে অটুট ব্রহ্মচর্য রক্ষা করা যায় না। তাহাতে স্বামীজী মহারাজকে মহাপুরুষ মহারাজ বলেন, "শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় আমার জীবনে তাহা সম্ভব হয়েছে।" তখন স্বামীজী মহারাজ বলেন—"আপনি তো মহাপুরুষ।" এই কথা শুনিয়া বাবুরাম মহারাজের মাতাঠাকুরানী বলিয়াছিলেন—"মহাপুরুষ তো গাছে থাকে"; তখন স্বামীজী মহারাজ বলেন—"ইনি সে মহাপুরুষ নন, ইনি সত্যকার মহাপুরুষ।"

প্রথম কিভাবে শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের শ্রীচরণদর্শনের সৌভাগ্য আমার হয়

এবং তাঁর সেবক হিসাবে থাকার সৌভাগ্য লাভ করি তাহারই দু-চার কথা এখানে বলিবার চেষ্টা করিতেছি। ১৯২০ সালে প্রথম সাধু হইবার জন্য ৺কাশীধামে যাই, সেবারে সঙ্ঘে যোগদান করিবার সুযোগ না হইলেও ৺বিশ্বনাথ এবং ৺অন্নপূর্ণা দর্শনের এবং ঠাকুরের সন্তানদের অন্যতম পূজ্যপাদ হরি মহারাজের পদচ্ছায়ায় প্রায় মাস খানেক থাকিবার পর বাড়ি হইতে বাবা আসিয়া আমাকে ধরিয়া লইয়া যান। পুনরায় কয়েক মাস পরে বেলুড় মঠে পলাইয়া আসি। সে সময়ে পূজনীয় রাজা মহারাজ বা মহাপুরুষ মহারাজ কেহ মঠে না থাকায় দিন সাতেক মঠে থাকিয়া মায়ের বাড়ি উদ্বোধনে গিয়া পূজনীয় শরৎ মহারাজকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে সাধু হওয়ার কথা বলায় তিনি বলিলেন—"এখন মহারাজ নাই কাজেই আমি এ বিষয়ে কিছু বলিতে পারি না।" যাহা হউক খুবই ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সেবারও বাড়ি ফিরিয়া যাইতে হয়। পুনরায় কয়েক মাস অপেক্ষা করিয়া আবার দৃঢ় সংকল্প লইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্মরণ করিয়া সোজা বৃন্দাবনে যাই। সেখানে তখন যমুনার তীরে আশ্রম। আশ্রমিকদের মধ্যে আমরা চার-পাঁচ জন ব্রহ্মচারী এবং তখন সেখানকার অধ্যক্ষ স্বামী বেদানন্দ। সেখানে কিছুদিন থাকিবার পর ঝুলন পূর্ণিমা উপলক্ষে আগত সেবাশ্রমে বহুরোগীর দিন রাত্রি সেবা করিয়া আমার শরীর খুব অসুস্থ হইয়া পড়ায় মহারাজদের পরামর্শে সেখান হইতে জামতারা আশ্রমে আসিয়া উঠি এবং সেখানকার জলহাওয়ার গুণে শরীরও সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া যায়। তার কয়মাস পরে ১৯২৩ সালের ডিসেম্বরে শ্রীশ্রীমার শুভ জন্মতিথির দিন এক ঝুড়ি উত্তম গোলাপ ফুল সঙ্গে লইয়া বেলুড় স্টেশনে নামিয়া মঠে আসিয়া পৌঁছাই। তখন প্রায় বেলা সাড়ে সাতটা। ফুলের ঝুড়ি সমেত প্রথম পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের দর্শনে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই তিনি বলিলেন, "জামতাড়া থেকে এসেছ? বেশ হয়েছে, এই ফুল ঠাকুর ঘরে দিতে বল" এবং পরক্ষণেই আমায় বলিলেন, "ব্রহ্মচর্য নিবি?" আমি সে বিষয়ে তৈরি হইয়া আসি নাই, শুধু বলিলাম, "আমার এখনও দীক্ষা হয়নি।" তার উত্তরে তিনি বলিলেন, "সে পরে হবে, তুই আগে ব্রহ্মচর্য নিয়ে নে। দ্যাখ কোন সাধুকে দিয়ে মাথা কামিয়ে নে, আর অনঙ্গ-এর কাছ থেকে একখানা কাপড় নিয়ে গঙ্গাস্নান সেরে তৈরি হয়ে ঠাকুর ঘরে যা। সময়মত ব্রহ্মচর্য হবে।" আমরা প্রায় বারো জন সেবারে তাঁর নিকট হইতে ব্রহ্মচারী ব্রতে দীক্ষিত হই। পূজনীয় শুদ্ধানন্দ স্বামী আচার্য ছিলেন। পুরানো ঠাকুর ঘরের পশ্চিম দিকের ঘরখানিতে তাঁর উপস্থিতিতে হোমাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। এর মধ্যে আমরা স্বামী ভূতেশানন্দ ও স্বামী গম্ভীরানন্দ বর্তমান আছি। যথারীতি তিনদিন হবিষ্যান্ন করিবার মাত্র তিন-চার দিন পরেই তাঁর শুভ জন্মতিথি দিন প্রণাম করিতে গেলে তিনি বলিলেন, "আজ তোমার দীক্ষা হবে, গঙ্গাস্নান

করে ঠাকুর ঘরে গিয়ে বস।" পূজান্তে তিনি ঠাকুর ঘরে যাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে তিনবার অর্ঘ্য দেওয়াইলেন। পরে যথারীতি দীক্ষাদিও সম্পন্ন হইল। কিন্তু আমার এমনি অবস্থা যে দীক্ষান্তে গুরুদক্ষিণারূপে যে একটু ফল দিতে হয় সে সামর্থ্যও ছিল না। তখন আমার অবস্থা দেখিয়া তিনি বলিলেন, "গুরুদক্ষিণা কিছু দিতে হয়। যা ঠাকুরভাণ্ডার থেকে একটি হরীতকী চেয়ে নিয়ে আয়।" আমি তাহাই করিলাম এবং তিনিও শিষ্যের কল্যাণের জন্য তখনও আসনেই উপবিষ্ট ছিলেন। আমি ঐ হরীতকী দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি বলিলেন, "যাও একটু ভগবানের নাম কর।"

এই ভাবে আরও দুই-তিন বৎসর অতিবাহিত হইলে মঠে সেই সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা করিবার লোকের অভাব হওয়াতে পূজনীয় কৃষ্ণলাল মহারাজ পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজকে ঐ কথা জানান এবং আমার নামও সেই সঙ্গে উল্লেখ করিয়া বলেন এবং আমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার কাছে লইয়া যান এবং বলেন—"মহারাজ একে আমরা মঠের পুজোর জন্য ঠিক করেছি।" তাতে তিনি বলেন, "ও, হাঁ, আমি এই ছেলেটিকে জানি। ছেলেটিও বেশ ভক্তিমান" বলে আমাকেও খুব আশীর্বাদ জানাইলেন। পরে স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দের নিকট শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা বিস্তারিত শিখিয়া যথাসময়ে পূজাদি আরম্ভ করিলাম। এইভাবে কিছুদিন কাটাইবার পর তাঁর সেবকের প্রয়োজন হওয়ায় মঠ হইতে অপর একজন সাধুকে তাঁর সেবার জন্য ঠিক করা হয় এবং সে-ও তার কাজ আরম্ভ করে। ইতোমধ্যে একদিন আমি পূজাদি সারিয়া পঙ্গতে প্রসাদ পাইতে বসিয়াছি সেই সময় অন্য একজন সেবক আমাকে পঙ্গতে আসিয়া জানাইলেন যে মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে ডাকিতেছেন। আমি তখন খাইতে আরম্ভ করিয়াছি। বহু গুরুজনেরাও পঙ্গতে বসিয়াছেন সেই অবস্থায় তাঁহাদের অনুমতি লইয়া হাত মুখ ধুইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি শুধু বলিলেন, "বাবা, তুমি একটু আমায় দেখাশুনা কর।" এইরূপ অভাবনীয়রূপে তাঁহার সেবা করার সুযোগ পাইয়া নিজেকে ধন্য এবং কৃতার্থ মনে করিলাম। ঐ দিন সন্ধ্যার সময় তাঁহার কাছে দাঁড়াইয়া আছি হঠাৎ বলিলেন—"তুমি শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা করছিলে কিন্তু এ গুরুসেবা", বলিয়া বলিলেন, "এ জীবন্ত বিগ্রহের সেবা", কথাটি তিনবার উচ্চারণ করিলেন। যদিও সেই মুহূর্তে ইহার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারি নাই কিন্তু যে কয় বছর তাঁহার সেবায় নিযুক্ত ছিলাম প্রাণে প্রাণে ইহা অনুভব করিয়াছি যে তিনি সত্যই জীবন্ত বিগ্রহ। যদিও তখন আমার বয়স কম ছিল—সব জিনিস বুঝিতে না পারিলেও তাঁহাদের জীবন যে সততই ধ্যান ও ভগবানের চিন্তাতেই নিমগ্ন রহিয়াছে তাহা দেখিতাম। তাঁহার প্রথম জীবনের তপস্যার কথা আমাদের বিশেষ জানা না থাকিলেও

আলমোড়াতে যেস্থানে তিনি তপস্যা করিয়াছেন সেসব স্থান দর্শন করিবার সুযোগ পাইয়াছি। তিনি আলমোড়ায় পাতালদেবীর সংলগ্ন একটি ছোটঘরে কয়েক বছর কাটাইয়াছিলেন। দেবীর পূজারি সন্ধ্যার পূর্বেই পূজাদি সম্পন্ন করিয়া চলিয়া আসিতেন। আর কোন জন-মানব সেখানে থাকিত না। একদিন কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন—"যে ঘরটিতে আমি থাকতাম তাতে কোন দরজা না থাকায় দু-খানা কাঠ দরজার মুখে দিয়ে রাখতাম। বহুদিন লক্ষ্য করেছি—রাত্রে বাঘ এসে সামনে বসে আছে। তাতে কোনরূপ মনে ভয় বা উদ্বেগ হতো না।" ৺কাশীতেও তাঁর তপস্যার কথা বহুবার শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। তবে স্বচক্ষে বেলুড় মঠে দীর্ঘদিন ধরিয়া দেখিয়াছি প্রত্যহ শ্রীশ্রীঠাকুর ঘর খোলা হইলে তিনি হাত মুখ ধুইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর ঘরের ভিতরে বসিতেন এবং শীতের দিনেও প্রায় দুই ঘণ্টা একই ভাবে ধ্যানস্থ থাকিতেন। যতদিন শরীর ভাল ছিল প্রত্যহ ঐ ভাবে ঠাকুর ঘরে যাইয়া বসিতেন এবং যখন ঘরে ফিরিয়া আসিতেন যদিও তখন মঠে সাধু সংখ্যা কম তথাপি সকলেই তাঁহার আসার অপেক্ষায় তাঁহার ঘরে অপেক্ষা করিতেন এবং প্রণামান্তে কোন কোন দিন শাস্ত্রের কোন বিষয় আলোচনা হইত। সে দৃশ্য আমার পক্ষে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। পরে সাধুরা নামিয়া যাইলে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি প্রসাদী সন্দেশ ও একটু জল খাইতেন। কিছু পরে মঠের ভাণ্ডারি আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন—আজ শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগে কয় রকমের তরকারি এবং পায়েস হইবে এবং বলিতেন যে বেশ শুদ্ধাচারে এবং উত্তমভাবে যেন শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগ দেওয়া হয়। কারণ এখানে ঠাকুর প্রত্যক্ষ রহিয়াছেন। পরে তিনি কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম করিতেন সেই সময় শাখা কেন্দ্র থেকে সাধুরা আসিলে এবং তাহাদের সাধন-ভজন সম্বন্ধে কোন জিজ্ঞাসা থাকিলে তাহার জবাব দিতেন। আমিও ইতোমধ্যে তাঁহার ঘর পরিষ্কার করিয়া স্নান সারিয়া কিছু ফুল আনিয়া তাঁহার ঘরে যে শিব মূর্তিটি এখনও আছে সেটিতে এবং শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও হংসেশ্বরী দেবীকে এক একটি ফুল দিয়া কোন কোন দিন তাঁহার জন্য একটি ফুল আলাদা রাখিয়া তাঁহার পায়ে সেটি দিয়া প্রণাম করিতাম। যতদিন শরীর তাঁহার ভাল ছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজার পর ঠাকুর ঘরে যাইয়া সেখানে দীক্ষা দিতেন। শেষের দিকে যখন অত্যধিক blood pressure বাড়িয়া গেল তখন ডাক্তারদের নির্দেশ মতো ঠাকুর ঘরের পরিবর্তে নিজের ঘরেই, স্বামী-স্ত্রী হইলে একসঙ্গে নতুবা পৃথক পৃথক ভাবে দীক্ষা দিতেন। অবশ্য আমি তাহাদের ঠাকুরের পাদুকায় অর্ঘ্য দেওয়াইয়া তাঁহার ঘরে লইয়া আসিয়া কপাট বন্ধ করিয়া বাহিরে চলিয়া আসিতাম। এইভাবে দীর্ঘদিন চলিবার পর একদিনের ঘটনা মনে পড়িতেছে। হয়ত আমার মনে গুরুভাব জাগে সেজন্য যখন কপাট বন্ধ করিয়া চলিয়া আসিতেছি তখন হঠাৎ বলিলেন, "তুই চলে যাচ্ছিস

কেন? তুই কি মনে করিস মন্ত্র শুনলে গুরু হবি? মন্ত্র—কোন্ দেবতার কি বীজ তা কে না জানে? কিন্তু এই যে ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর মুখ থেকে শোনা—এই হলো মন্ত্রশক্তি।" তাহার পর থেকে আর কোনদিন বাইরে যাইবার চেষ্টা করি নাই। এর মধ্যে একদিনের ঘটনার কথা মনে হইলে আমি এখনও কষ্ট পাই। কারণ জনৈকা মহিলা দীক্ষাপ্রার্থিনী হইয়া মঠে আসিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মণের মেয়ে ও বিধবা এবং বয়সও কম এবং তাহার সহিত একটি ছোকরা সম্ভবত অন্য জাতের। কেন জানি না তাহাদের ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করিতে দেখিয়া আমার মনে সন্দেহ জাগিয়াছিল। এ অবস্থায় তাঁহার যা শরীর তাহাতে এদের দীক্ষাদি না হওয়াই ভাল এই ভাবিয়া আমি উপরে যাইতে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি, কেউ খদ্দের আছে?" তাহাতে আমি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছি। দেখিয়াই তিনি বলিলেন, "দেখ বাবা, ঠাকুর পতিত পাবন, তিনি পতিতদের তরাবার জন্যই এসেছেন, তুমি যাও তাকে গঙ্গাস্নান করতে বল এবং ঠাকুরের পাদুকায় অঞ্জলি দিয়ে নিয়ে এস।" যথারীতি তাহাকে তাঁহার ঘরে লইয়া আসার পর ভক্তটি সঙ্গে যে ফুল ও গঙ্গাজল আনিয়াছিলেন তাহা হাতে লইতে বলিয়া তিনি বলিলেন—বল, 'ইহকাল পরকালে যত পাপ করেছি সব এইখানে দিলাম, আর বল, আর করব না।" পরে তাকে দীক্ষা দিলেন। ইহার কিছুদিন পরে মধুপুরে কয়েকমাস থাকিয়া তিনি ৺কাশীতে যান, সেখানে সেই শিবক্ষেত্রে আসিয়া তিনি যেন স্বস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। নিত্য সকাল সন্ধ্যায় বেড়াইতে বাহির হইতেন। কেদার বাবা প্রভৃতি বহু পুরাতন সাধু সঙ্গে থাকিতেন। একদিন ৺বিশ্বনাথ দর্শনেও গিয়াছিলেন। আর একদিন অনেক সাধুর সহিত দুর্গাবাড়ি দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। সে যাত্রায় ৺কাশীতে কিছু দীক্ষাদিও হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন স্বামীজীর তিথিপূজাতে আমাদের প্রায় ৭।৮ জনের সন্ন্যাস দীক্ষা হয়। সে সময় গম্ভীর মহারাজও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। আমরা তিথিপূজার দিন যথারীতি মণিকর্ণিকার ঘাটে সন্ন্যাসের পূর্বে যাহা করণীয় উহা সম্পন্ন করিয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসি এবং ঐ রাতে চারিটার সময় অদ্বৈত আশ্রমের নিচের হলে বহু সাধু সমাবেশে স্বামী জগদানন্দজী আচার্যের আসন গ্রহণ করেন। যখন অগ্নি স্থাপন করা হইল তখন পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ ধীরে ধীরে 'হর হর মহাদেব শম্ভু' এই নাম উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আসনে বসার পর—সন্ন্যাসের মন্ত্রাদি পাঠ আরম্ভ হইল এবং সমস্ত কাজ শেষ হইতে প্রায় ভোর হইয়া গেল। তাহার পরে আমরা সকলে গঙ্গায় স্নান ও দণ্ড বিসর্জন দিয়া ৺বিশ্বনাথ ও ৺অন্নপূর্ণা দর্শন করিয়া অদ্বৈতাশ্রমে ফিরিয়া আসিবার পর যেটুকু ক্রিয়া বাকি ছিল তিনি তাঁহার ঘরে বসিয়া আমাদের তাহা জানাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, 'আগে গুরু দক্ষিণা দাও', পরে তিনিই আগে আমাদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ওঁ নমো

নারায়ণায়"। পরে চন্দ্র মহারাজকে বলিয়া পাঠাইলেন, "আজ শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাল করে ভোগ দাও। আমি আজ এদের প্রথম ভিক্ষা দিব।" তিনি নিজ হাতে পরে প্রসাদ দিলেন এবং পরের দিন অন্যান্য সাধুরা ভিক্ষায় গেলেও আমি পূর্ববৎ তাঁহার সেবা করিতে থাকিলাম। অন্যান্য ভাইয়েরা ভিক্ষায় গিয়া আমার জন্য যাহা লইয়া আসিতেন তাহা হইতে আমাকে যাহা দিতেন তাহা আমি গাছ তলায় বসিয়া খাইতাম।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট যাইবার পূর্বেই সমাধিতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার জানার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল এবং প্রথম যেদিন ঠাকুরের দর্শনলাভ করেন সেদিন তিনিও সমাধিতত্ত্ব বিষয়ক বহু ঘটনা বলিতেছিলেন তাহাতে মহাপুরুষ মহারাজ খুবই মুগ্ধ হন এবং নিজেও রোমাঁ রোলাঁকে নিজের ঘটনা সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, "আমাদের আধার অনুযায়ী তিনি সব শিষ্যদের কমবেশি সমাধিস্থ করে দিলেন। তাঁহারই জীবিতকালে, আমার তিনবার সমাধি লাভের সৌভাগ্য হয়েছিল।" এইরূপ মহাপুরুষ সম্বন্ধে আমার পক্ষে কিছু লিখিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তথাপি বিশেষ অনুরুদ্ধ হইয়া সামান্য কিছু লিখিতে হইল। ৺কাশীতে তাঁহারই ঘরে আমাকে রাত্রে শুইতে হইত। প্রথম প্রথম দু-একদিন খুবই সন্তর্পণে রাত্রি অতিবাহিত করিলাম। এক রাত্রে বাহিরে যাইবার প্রয়োজন হওয়ায় খুবই সন্তর্পণে কপাট খুলিলেও সামান্য একটু শব্দ হওয়ায় তিনি বলিয়া উঠিলেন 'কি সর্বনাশ', আমি খুবই ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া আলো জ্বালিয়া দেখি তিনি ধ্যানস্থ এবং আমি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা চাই। তাহাতে তিনি অভয় দিয়া বলিলেন, "খুবই সাবধানে কপাট খুলো।" সেই থেকে যতদিন ছিলাম রাত্রে না ঘুমাইয়া চুপচাপ পড়িয়া থাকিতাম এবং লক্ষ্য করিয়া দেখিতাম তিনি গভীর ধ্যানস্থ। এ ছাড়া দর্শনাদি তাঁহার যাহা হইয়াছিল তার অনেক কথাই স্মৃতিকথায় উল্লিখিত আছে। এইভাবে ৺কাশী বাসের পর পাটনায় দুই তিন দিন অতিবাহিত করিয়া শিবরাত্রির পূর্বে বেলুড় মঠে উপস্থিত হন। পরবর্তী অনেক ঘটনাই প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৩৩ সনে তাঁহার সংকল্প হয় মঠের সব স্থান ঘুরিয়া মন্দিরাদি দর্শন করেন। শরীরের সামর্থ্য না থাকায় তাঁহারই এক ভক্ত দার্জিলিং হইতে একখানা ডাণ্ডি পাঠান। ২৫ এপ্রিল, ১৯৩৩ সকাল ৯টার মধ্যে তাঁহাকে নিচে নিয়ে আসা হয় এবং ঐ ডাণ্ডিতে করিয়া কয়েকজন সাধুই তাঁহাকে বহন করেন। আমি সঙ্গে ছাতা লইয়া যাই। তিনি প্রথম শ্রীশ্রীমহারাজের মন্দিরে ডাণ্ডি হইতে প্রণাম জানাইয়া বিদায় লইলেন। পরে মা-র মন্দিরে প্রণাম করিয়া বিদায় লইয়া স্বামীজী মহারাজের ওখানেও সেইভাবে প্রণাম ও বিদায় লইয়া বাবুরাম মহারাজের সমাধিস্থান হইয়া ফটকের নিকটে আসিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাইরে যাবেন কি?" তাহার উত্তরে তিনি বলিলেন, "না বাবা, আর বাইরে নয়।"

এই যে তাঁর স্বামীজীর প্রতিষ্ঠিত মঠ ঘুরে দেখা শেষ তাহা তখন বুঝিতে পারি নাই, পরে আমতলার নিচে ফিরিয়া ডাণ্ডিতে বসিয়া সাধু, ভক্ত, পাচক, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলের সহিত কথাবার্তা বলিলেন এবং তাঁর প্রিয় 'কেলো' কুকুরটিকেও আদর করিয়া একটু সন্দেশ খাওয়াইলেন, পরে উপরে গিয়া সেদিন তিন চার জনকে ঘরে বসিয়া দীক্ষাও দিলেন। স্নান শেষ করিয়া খাটে বসিয়াই folding table-এ খাবার রাখিয়া তাঁহার নিত্য যাহা খাইবার নিজ হাতে খাইলেন পরে জিজ্ঞাসা করিলাম একটু ঘোল খাইবেন? সেই ইচ্ছা প্রকাশ করায় সামান্য দই ঘোল করিয়া সঙ্গে মিছরির গুঁড়া দিয়া খাইবার টেবিলে দেওয়া হইল এবং তিনি তাহা প্রথমটা cup যেভাবে আঙুল দিয়া ধরে সেইভাবে তুলিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহা না পারায় পুরো হাত দিয়া cupটি ধরিবার চেষ্টা করিলেন, তাহাও পারিলেন না, তখন শরীরের দক্ষিণ দিক ক্রমশ হেলিয়া পড়ায় শংকর মহারাজ তাঁহাকে ধরিয়া ফেলেন এবং আমি টেবিলটি সরাইয়া ফেলি। সেই সময় তিনি আমার দিকে তাকাইয়া যেন কিছু বলিবার চেষ্টা করিয়া কিছু বলিতে না পারিয়া শুধু একটু হাসিলেন। আমরা এ অবস্থার জন্য সতত সজাগ থাকিতাম। আমি তাড়াতাড়ি নিচে প্রথমে দ্বিজেন মহারাজ ও ডাক্তার মণীন্দ্রকে সংবাদ দিই এবং পূজনীয় ভরত মহারাজ প্রভৃতি সঙ্গে সঙ্গে উপরে যান। মণীন্দ্র ডাক্তার নাড়ী দেখিয়া অবস্থা বুঝিয়া দ্বিজেন মহারাজকে দিয়া তাড়াতাড়ি অজিত ডাক্তারকে ফোনে সমস্ত ঘটনা বলায় তিনি বলিলেন যে অবস্থায় আছেন কোনরূপ নাড়াচাড়া না করিয়া সেইরূপ রাখুন এবং বরফ আনাইয়া মাথায় দিতে বলিলেন এবং তিনি জ্যোতিষ ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া শীঘ্রই আসিতেছেন বলিলেন। পরে ডাঃ নীলরতন সরকারকে সংবাদ দিয়া মঠে আসিয়া পৌঁছাইলেন। ডাক্তারদের মতে তিনদিন না কাটিলে কোন চিকিৎসা করা সম্ভব নয়। ডাঃ নীলরতন সরকার আসিয়া সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিলেন। তিনদিন পরে সামান্য একটু জ্ঞান ফিরিয়া আসায় তাঁহারা চিকিৎসাদি শুরু করিলেন। অবস্থার কিছুটা উন্নতি দেখা গেল। প্রথমটা সম্পূর্ণ বাক্‌রুদ্ধ হইলেও শেষের দিকে 'বা' 'কি' ইত্যাদি বলিতে পারিতেন এবং বরাবরই সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল। এই অবস্থায় দশ মাস মঠ মিশনের সকল কাজকর্ম সম্বন্ধেও তাঁহাকে জানান হইত এবং কয়েকজনকে দীক্ষাদিও দিয়াছিলেন। কয়েকটি ভগবানের নাম (মন্ত্র) কাগজে লিখিয়া তাঁহাকে দিলে তিনি তাহা দেখিয়া যাহাকে যাহা দিবার তাহা নিজ হাতে করিয়া দিতেন। তাঁহার চিকিৎসার জন্য ডাঃ নীলরতন সরকার যেদিন প্রথম দেখিতে আসেন— তাঁহার ফি হিসাবে সেদিন একশ কুড়ি টাকা দিতে যাওয়ায় তিনি বলিয়াছিলেন, "যে মহাপুরুষের সেবা করে আপনারা নিজেকে ধন্য মনে করছেন আমি কি তাঁতে একটু অংশ গ্রহণ করতে পারি না? আপনারা যখন ইচ্ছা আমাকে ডাকবেন।"

তিনি নিজের কাজের ক্ষতি করিয়া উনিশ কুড়ি দিন সমানে আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া যাইতেন। ডাঃ অজিতবাবু বলিয়াছিলেন, "আমি চিকিৎসা করিতে আসিয়াছিলাম কিন্তু তাহা পারি নাই তিনিই আমার ভবরোগের চিকিৎসা করিয়াছেন।" ডাঃ জ্যোতিষবাবুকে তিনি একদিন প্রসাদ খাইতে দেন এবং বলেন, "জানিস আমি মাছ খেয়েছি", তার উত্তরে তিনি বলেন—"আমার গুরু রামানুজী সম্প্রদায়ভুক্ত এবং অযোধ্যায় থাকিলেও একদিন আপনার ঘরে আসিয়া যাহা দেখিয়াছি তাহা না বলিয়া পারিতেছি না—ঘরের দরজার পরদা সরাইয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে আমি স্তম্ভিত। খাটের উপর দেখি আপনার পরিবর্তে আমার গুরু স্বয়ং উপবিষ্ট। কাজেই আপনার যে প্রসাদ পাইব তাহাতে আমার কিছুমাত্র সংকোচ বা দ্বিধা নাই।"

একটা বিষয়ের জন্য মনে এখনও আক্ষেপ রহিয়াছে—আমি একদিন স্নান করিয়া বাটিতে মুড়ি ও কড়াইশুঁটি তেল দিয়া মাখিয়া পাশের ঘরে দাঁড়াইয়া খাইতেছিলাম, সেই সময় তিনি আমাকে ডাকিলেন। আমি সেই অবস্থায়ই তাঁহার নিকট উপস্থিত হই, তিনি জিজ্ঞেস করিলেন, "মতি, কি খাচ্ছিস?" আমি বলিলাম মুড়ি কড়াইশুঁটি। তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "দে আমাকে দুটি দে", কিন্তু তখনকার মনের অবস্থায় তাহা পারি নাই। আমি তাড়াতাড়ি নিচে গিয়া পুনরায় ঐভাবে মুড়ি কড়াই তেল মাখাইয়া তাঁহার সামনে আনিতে তিনি তাহা আর গ্রহণ করিলেন না। মঠে তাঁহার সেবাকালে প্রত্যহ বৈকাল তিনটে হইতে চারটে নিচে সব দেখাশুনা করিয়া যাইতাম। অধিকাংশ দিন মঠ সংক্রান্ত সব সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেন। এর মধ্যে একদিনের ঘটনা মনে পড়ে। প্রায় আধ ঘণ্টা খাট ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছি কিন্তু কোন বিষয় তিনি জিজ্ঞেস না করায় আমিও সেইভাবে অপেক্ষা করিতেছি, পরে তিনি যেন নিদ্রা হইতে উঠিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কখন এলি?" এই বলিয়া বলিতেছেন, "তুই জগতের পাঁচটা জিনিস দেখে এলি, আমার নিকট জগতের কোন অস্তিত্বই নেই, একমাত্র ব্রহ্মই প্রতিভাত রহিয়াছেন।" তিনি এক সময় বলিয়াছিলেন, "তোদের কোন দোষ দেখিলে আমার উপর দোষ পড়িবে এবং সঙ্ঘের উপর এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের উপর তাহা বর্তাইবে।" এই ভাব মনে যখনই উদয় হয় তখনই মনে হয় ঠাকুর আমাকে প্রকৃত সাধু কর যাহাতে তাঁর নামে কোনরূপ দোষ না পড়ে—এই একমাত্র প্রার্থনা। মঠে তাঁহারই জনৈকা শিষ্যা তাঁহার কিছু সেবা করিবার সুযোগ প্রার্থনা করায় তার উত্তরে তিনি বলিলেন, "আমার আর কি সেবা করবে? তুমি পরম কারুণিক শ্রীশ্রীভগবান রামকৃষ্ণের নাম কর তাতেই আমি বেশি সুখী হব।" শ্রীশ্রীঠাকুর সেবার ব্যাপারে তিনি কত সজাগ থাকিতেন সে সম্বন্ধে মনে পড়িতেছে। এক বড়দিন উপলক্ষে তাঁহার কাছে শ্রীশ্রীঠাকুরের ফল মিষ্টি প্রসাদ আনা হইলে তাহাতে কমলালেবু না থাকায় তিনি

জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ ঠাকুরকে কমলা দেওয়া হয়নি?" তখন আমি নিচে গিয়া ঠাকুর ভাণ্ডারে খবর নিয়া জানিলাম যে কমলা ঠাকুর ভোগে দেওয়া হয় নাই। তাহাতে তিনি খুবই দুঃখিত হইয়া যিনি পূজক ছিলেন তাহাকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং প্রথমে বলিলেন, "আজ বিশেষ দিন, সকলে কমলা খেয়েছে আর তুমি আজকের দিনে কমলা ছাড়াই ঠাকুরের ভোগ দিলে, তোমার দেখা উচিত ছিল।" পূজারি বলিলেন, ভাঁড়ারি ফল কেটে দিয়ে যায় আমার একটু ভুল হয়েছে আমি না দেখে ভোগ দিয়েছি। পরে যে ঠাকুর ভাঁড়ারি ছিল তাহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল যে ঠাকুর ভোগে সে কমলা দেয় নাই। তখন বিরক্তি সহকারে তাহাকে মহাপুরুষ মহারাজ বলিলেন, "তুমি ঠাকুর সেবায় অনুপযোগী, যাও তুমি গোশালায় গিয়ে গরুর জন্য খড় কাট।" ফলে সে তাঁর আদেশ মতো গরুর জন্য কিছুদিন খড় কাটিতে লাগিয়াছিল। যখন সে রোজ মহারাজকে প্রণাম করিতে আসিত তিনি হাসিতে হাসিতে ঘরে যাঁহারা উপস্থিত থাকিতেন সকলের সামনে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "কেমন খড় কাটছ?" এইরূপ তিনদিন চলিল। চারদিনের দিন হইতে তাহার খড় কাটা বন্ধ হইল। শ্রীশ্রীঠাকুর সেবা সম্বন্ধে তাঁহার এইরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল।

তাঁহার মহাসমাধির কয়েক ঘণ্টা পরে যখন তাঁহার দেহ গঙ্গায় স্নানাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া পুরানো ঠাকুর ঘরের নিচে খাটে শায়িত অবস্থায় রহিয়াছে এবং আরতি প্রভৃতিও শেষ হইয়াছে ইতোমধ্যে পূজ্যপাদ অভেদানন্দ মহারাজ কয়েকজন সাধু সমেত মঠে আসেন এবং ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়া সঙ্গে যাহা ফুলের তোড়া আনিয়াছিলেন তাহা হাতে করিয়া ভাগবতের শ্লোকের অংশ বিশেষ 'বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্' বলিয়া তিনবার অঞ্জলি দিয়া আর অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া যান।

এইভাবের বহু ঘটনা স্মরণে থাকিলেও সব জিনিস প্রকাশ করা যায় না। সে কারণে এইখানেই তাঁহার স্মৃতির বিষয় শেষ করিয়া পুনঃপুনঃ প্রণাম জানাই এবং আন্তরিক প্রার্থনা করি—'অব শিব পার কর মেরে নেইয়া।' হরি ওঁ।

শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতিকথা

স্বামী গম্ভীরানন্দ

মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দজীকে একবার অনুরোধ করা হয়েছিল, শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণের কথা বলতে; তাতে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, ''আমরা তাঁর ভালবাসাতেই মুগ্ধ হয়ে তাঁর কাছে থেকে গিয়েছিলাম, তাঁর উপদেশাবলী বা জীবনের ঘটনাবলী স্মরণ করে রাখার দিকে নজর ছিল না।'' মহাপুরুষজীর স্মৃতিকথা লিখতে গিয়ে আমাকেও তাই বলতে হয়। অধিকন্তু তিনি যতদিন নরদেহে অবস্থিত ছিলেন ততদিন আমাকে থাকতে হয়েছিল দূরে দেওঘরে বিদ্যাপীঠে, অথবা বছর দেড়েকের জন্য উদ্বোধন কার্যালয়ে বা শ্রীশ্রীমায়ের বাটিতে। তবু ছুটির দিনে বেলুড়ে থাকা সম্ভব হতো। তখন নিয়ম ছিল প্রতিদিন সকালে সাধু-ব্রহ্মচারীরা তাঁর ঘরে তাঁকে প্রণাম করতে যেতেন এবং খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে তাঁর কথামৃত পান করতেন। সে সময় তাঁর জীবনের ঘটনাবলী যা বলতেন বা উপদেশ দিতেন সেসব কথা বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন ব্যক্তি প্রকাশ করেছেন, সুতরাং আবার লিখতে গেলে 'পিষ্ট-পেষণ' মাত্র হবে। অথচ স্বামী অপূর্বানন্দজীর আদেশ এসেছে কিছু লিখতেই হবে, সুতরাং এই চেষ্টা।

প্রথম যখন বেলুড়ে আসি তখন মঠের কর্মপরিচালকদের কাছে শুনেছিলাম মহাপুরুষজী খুবই কড়া মেজাজের লোক আর খুব গম্ভীর, বেশি কথাবার্তা না বলে এক কথায় সব সেরে দেন। তাই তাঁদের কথা শুনে মহাপুরুষজীর সম্বন্ধে মনে বেশ একটা ভয় ছিল, কিন্তু প্রথম যেদিন দেখা হলো সেদিন আমি চুপ করেই বসেছিলাম, অপর দু-একজন যাতায়াত করছিলেন বা দু-একটি কথাও বলেছিলেন, আমি তাঁর দিকে সর্বদা তাকিয়ে বসে ছিলাম এবং তিনিও মাঝে মাঝে আমাকে দেখছিলেন। অতি সুন্দর ছিল তাঁর চেহারা এবং গায়ের রং ছিল খুব ফরসা, দৃষ্টিতেও ছিল একটা স্নেহের ভাব। সুতরাং ভয় সম্পূর্ণ না কাটলেও মনে মনে স্থির করেছিলাম এই সৌম্যশান্ত সাধু মহারাজই হবেন আমার জীবনের পথ-প্রদর্শক। এরপরে যখন দেওঘর বিদ্যাপীঠে যাই, তখন সেখানকার কর্তৃপক্ষ আমাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের অপর একজন সন্তানের নিকট দীক্ষা নেবার কথা বলেছিলেন কিন্তু আমি জানিয়ে ছিলাম 'আমি মনে মনে মহাপুরুষজীকেই গুরুপদে বরণ করেছি', শুনে তাঁরা আর কিছু বলেননি, এসব ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের কথা। তখন মাত্র সাত

আট মাস রামকৃষ্ণ মিশনে প্রবেশ লাভ করেছি। এরই মধ্যে আমার ইচ্ছা হলো আমি মহাপুরুষজীর কাছে মন্ত্রদীক্ষা নেব এবং ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণ করব। তাই একদিন মনের বাসনা জানিয়ে মহাপুরুষজীকে চিঠি লিখে ফেললাম। শীঘ্রই অনুকূল উত্তর এল, শ্রীশ্রীমায়ের তিথিপূজাতে ব্রহ্মচর্য হবে এবং এরই মধ্যে কোন এক সময়ে দীক্ষাও হবে। তখন নিয়ম-কানুনের তেমন কড়াকড়ি ছিল না। মঠের প্রেসিডেন্ট মহাপুরুষজী এবং সেক্রেটারি সারদানন্দজী যে কোন সময়ে ব্রহ্মচর্য বা সন্ন্যাস দিতেন। আমি চিঠিখানি দেওঘর বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষকে দেখাতে তিনি বেশ একটু বিরক্তি প্রকাশ করলেন। প্রথমত তাঁকে না জানিয়ে কেন চিঠি লিখেছিলাম, দ্বিতীয়ত এত তাড়াহুড়ার কি প্রয়োজন ছিল; কিন্তু মহাপুরুষজীর আদেশ এসেছে তাই না বলতে পারলেন না। যা হোক সদ্‌ভাবানন্দজীর অনুমতি নিয়ে আমি বেলুড়ে গেলাম এবং শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথিতে (১৯২৩) আমাদের ব্রহ্মচর্য দীক্ষা হয়ে গেল, সে দলের সকলের নাম মনে নেই, তবে স্বামী ভূতেশানন্দ এবং স্বামী অচিন্ত্যানন্দ এ দু-জন ছিলেন; এ ছাড়া আরো চার-পাঁচজন ছিলেন বলে মনে হয়। তার মধ্যে ভবানীচৈতন্য বলে একজন ব্রহ্মচারী যিনি হৃষীকেশে তপস্যা করতে গিয়ে গঙ্গার বানে ভেসে যান। গোবিন্দ নামের আর একজন, যিনি বাড়িতে ফিরে যান, কিন্তু চিরজীবন অবিবাহিত থাকেন; যাক সেসব কথা। এর কয়দিন পরেই মহাপুরুষজীর জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হলো এবং সেদিন আমার মন্ত্রদীক্ষাও হলো। দীক্ষা হয়েছিল পুরাতন ঠাকুর ঘরে; মহাপুরুষজী বসেছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে উত্তরমুখ হয়ে এবং আমি বসেছিলাম মহাপুরুষজীর সামনে দক্ষিণমুখ হয়ে। তিনি মন্ত্রদীক্ষা দিয়ে বীজমন্ত্রটি গঙ্গাজল দিয়ে মেজেতে লিখে বুঝিয়ে দিলেন, তারপর বললেন 'গুরুদক্ষিণা দাও' আমি এসব নিয়ম-বিধি কিছুই জানতাম না। সুতরাং কিছু নিয়েও যাইনি, তিনি অবস্থা বুঝে বললেন, নিচে ঠাকুরভাণ্ডার থেকে একটা হরীতকী বা অন্য কোন ফল নিয়ে এস। ঠিক কি ফল এনেছিলাম আমার মনে নেই; তবে সেটি গ্রহণ করে আমাকে নিচে যেতে বললেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করলেন—"ঠাকুর, এর কল্যাণ কর।"

আমার ব্রহ্মচর্যের নূতন নাম হয়েছিল সৌম্যচৈতন্য, তাই মহাপুরুষজী দেখা হলেই ছান্দোগ্য উপনিষদের কথা স্মরণ করে বলতেন ঃ 'সদেব সৌম্য।'

* * *

তারপর ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ২৮ জানুয়ারি শ্রীপঞ্চমী তিথিতে বিদ্যাপীঠের নবনির্মিত এবং নিজস্ব তিনটি বাড়ির দ্বারোদ্ঘাটনের জন্য মহাপুরুষজী দেওঘরে এসেছিলেন। একটি বিস্তীর্ণ খোলা মাঠের একপাশে তিনটি ছোট বাড়ি তৈরি

হয়েছিল। সামনে দুটি একতলা বাড়ি ছেলেদের থাকার জন্য। সে দুটির ভিতরের কাজ শেষ হয়ে গেলেও টাকার অভাবে বাইরের আস্তরের কাজ বাকি ছিল। তার পিছনে একটু দূরে তৈরি হয়েছিল রান্নাঘর এবং তার সামনে বসে খাবার জন্য চওড়া বারান্দা। মহাপুরুষজীকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল এই মাঠের সম্মুখস্থ রাস্তার অপর দিকে অন্য একটি রাস্তার মোড়ে 'বিপিন কুটির' নামক একটি বাড়িতে। সেখানে তাঁর সঙ্গে আগত অন্য সাধুরাও থাকতেন। বাড়ির মালিক বিনা ভাড়ায় বাড়িটি কিছুদিন ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। আমরা তখন থাকতাম দুটি ভাড়া বাড়িতে যাদের নাম ছিল 'ক্ষমা ভিলা' ও 'বামা ভিলা'। যথাসময়ে নূতন বাড়িগুলির দ্বারোদ্ঘাটন হয়ে গেল এবং আমরা ভাড়া বাড়ি ছেড়ে সেখানে চলে এলাম। এর পরেও মহাপুরুষজী দেওঘরে কিছুদিন ছিলেন, আমি তখন হেডমাস্টারের কাজে নিযুক্ত ছিলাম। মহাপুরুষজীর অবস্থান কালে আশ্রমের কর্তা সদ্‌ভাবানন্দজী আমাকে রান্নাঘরে কাজ করতে বলেছিলেন, সুতরাং মহাপুরুষজীর কাছে যাবার আমার তেমন ফুরসত ছিল না। বিদ্যাপীঠে মাঠের রাস্তার ধারে একটি কোণ বেশ উঁচু ছিল সেখান থেকে বৈদ্যনাথ ৺শিব মন্দিরের চূড়া দেখা যেত। তীর্থযাত্রীরা ওখানে এসে মন্দিরচূড়া দর্শন করত এবং সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করত। অনেক সময় সেখানে রাত্রিবাসও করত। যাত্রীরা এলে জনকয়েক ঢাকীও এসে জুটতো এবং তারা যাত্রীদের ঘিরে ঢাক বাজাত ও নাচত। যাত্রীরাও তাতে যোগ দিত এবং ঢাকীদের কিছু কিছু বকশিশ দিত। তখনও বিদ্যাপীঠের দোতলা বাড়িগুলি তৈরি হয়নি সুতরাং রান্নাঘরের বারান্দা থেকে ঐ দৃশ্য দেখা সম্ভব হতো। স্থানীয় ভাষায় ঐ মাঠটিকে বলত 'দর্শনীয়া টাট্', একদিন রান্নাঘরের বারান্দায় বসে তরকারি কুটছি এমন সময় দেখি মহাপুরুষজী ঐ কোণে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁকে দেখে ঢাকীরা আহ্লাদে ঢাক বাজিয়ে তাঁকে ঘিরে নৃত্য আরম্ভ করেছিল এবং মহাপুরুষজীও তাতে যোগ দিলেন; অতঃপর তাদের কিছু বকশিশ দিয়ে তিনি হেঁটে রান্নাঘরের দিকে এলেন এবং আমার কাছে এসে বললেন ঃ "এখানে দেখছি মহাশক্তির বিকাশ। কালে এখানে খুব বড় কাজ হবে।" এ কথার অর্থ কি তা তখনও বুঝিনি, এখনও বুঝি না। তবে তাঁর কৃপায় বিদ্যাপীঠ এখন একটি পূর্ণাঙ্গ আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে এবং দিল্লির শিক্ষাবিভাগের কাছে ঐরূপ স্বীকৃতি পেয়েছে। যার ফলে অনেক ভাল ভাল ছেলে সেখানে পড়তে আসে। শিক্ষার মানও খুব উঁচু হয়েছে এবং পরীক্ষায় ছাত্ররা বিশেষ কৃতিত্ব দেখাচ্ছে। শুনেছি মহাপুরুষজীকে লক্ষ্য করে ঠাকুর একবার বলেছিলেন, "এর খুব উঁচু শক্তির ঘর, যেখান থেকে সৃষ্টির আরম্ভ হয়।"। আর শুনেছি যে মঠের প্রাথমিক অবস্থায় তিনি ঐ শক্তি বিষয়ে মাঝে মাঝে আলোচনা করতেন।...

দেওঘরে থাকাকালীন একদিন সকালে কাজের অবসরে মহাপুরুষজীর কাছে

গিয়ে দেখি তিনি বিছানায় বসে হাঁপাচ্ছেন এবং জন কয়েক সাধু পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। মহাপুরুষজীর হাঁপানি রোগ ছিল, দেওঘরের ঠাণ্ডায় তা বেশ বেড়ে গিয়েছিল। তিনি বলছিলেন সারারাত বসেই কাটিয়েছি আর নিজের বুকে হাত দিয়ে বললেন, "ব্যথাটা যখন খুব বেড়েছিল তখন এটাতে মন একাগ্র করেছিলাম এবং কষ্টবোধ চলে গিয়েছিল", অমনি সেখানে উপস্থিত ওঙ্কারানন্দজী প্রশ্ন করলেন—ওটা কি মহারাজ? তিনি উত্তর দিলেন "ঐতো আত্মা।"...

তখন বিদ্যাপীঠের ছেলেরা একটা হস্তলিখিত পত্রিকা বের করত। আমি তাতে স্বামীজী সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। একদিন শুনলাম তিনি সে পত্রিকাটি নিয়ে গেছেন পড়বার জন্য। শুনে ভাবলাম এইবারেই বিপদ ঘটবে; কাঁচা হাতের লেখা কি না—কি লিখেছি তিনি পড়ে বিরক্ত হয়ে হয়ত মঠ থেকে তাড়িয়েই দেবেন। কিন্তু পরে শুনে আশ্বস্ত হলাম যে তিনি প্রবন্ধ পড়ে খুশিই হয়েছেন।...

ঐ সময়ে একদিন ব্রহ্মচারী বালানন্দজীর আশ্রমে দুপুরে ভিক্ষাগ্রহণের আমন্ত্রণ আসে। ওঁরা সর্বতোভাবে সন্ন্যাসীর মতো জীবন-যাপন করলেও কখনও সন্ন্যাস গ্রহণ করতেন না। জটাজুট-মণ্ডিত বৃদ্ধ এবং বহুজন সম্মানিত বালানন্দজীও নিজেকে ব্রহ্মচারী বলেই পরিচয় দিতেন। মহাপুরুষজীর সঙ্গে আমরা সকলে মন্দিরাদি দর্শন করলাম; সেখানে একটি নূতন পুষ্করিণী খোঁড়া হয়েছিল, বালানন্দজী অনুরোধ করলেন মহাপুরুষজী যেন এক গণ্ডূষ জল গ্রহণ করেন যাতে পুষ্করিণীটি পবিত্র হয়ে যায়। মহাপুরুষজী সে অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন। তারপর তিনি একটি বেলতলার চারপাশে বাঁধান পাকা বেদির ওপর বসে বালানন্দজীর সঙ্গে সদালাপ আরম্ভ করলেন; আমরাও যে যেখানে পারি আশে পাশে বসে পড়লাম। এই সময় মহাপুরুষজীর একটি কথার জের ধরে বালানন্দজীর প্রধান শিষ্য ব্রহ্মচারী পূর্ণানন্দ প্রশ্ন করলেন, শঙ্করাচার্য কি বিজ্ঞানী ছিলেন? কথা শুনে ওঙ্কারানন্দজী বেশ ক্ষুব্ধ হলেন এই ভেবে যে, দুই প্রধানের মধ্যে সদালাপ চলছে সেখানে কোন শিষ্যের পক্ষে তর্কের অবতারণা করা সাধু বিগর্হিত কাজ, তাই তিনি মহাপুরুষজীকে বললেন মহারাজ, আমি এঁর প্রশ্নের উত্তর দেব? মহাপুরুষজী সম্মতি দিলেন, তখন ওঙ্কারানন্দজী পূর্ণানন্দকে প্রশ্ন করলেন—আপনি বাদবিতণ্ডা বা তর্ক কি করতে চান? বালানন্দজী দেখলেন গতিক ভাল নয়, তাই তিনি পূর্ণানন্দকে থামিয়ে দিলেন।

ব্রহ্মচারী পূর্ণানন্দের মতিগতি কিন্তু তাতেও শুধরায় নি; কারণ আমরা যখন ভিক্ষাগ্রহণে বসেছিলাম, তখন সকলের নিকট কমণ্ডলু নেই দেখে তিনি বললেন আপনারা দেখছি পানপাত্র না নিয়েই ভিক্ষাগ্রহণে এসেছেন অর্থাৎ তার মতে আমরা সাধুদের আচরণ জানতাম না, আমরা কিন্তু কোন উত্তর দিই নি।

ব্রহ্মচারীজীর আশ্রমের উল্টাদিকে রাস্তার ওপারে এক মাড়োয়ারি ভদ্রলোকের বাড়ি ছিল; ওঁদের আশ্রমের সঙ্গে মনোমালিন্য থাকায় তিনি কখনও সেখানে পদার্পণ করতেন না। সে সময় আমাদের মঠের সাধু স্বামী গিরিজানন্দজীও সেই বাড়িতে ছিলেন। তিনিও এ আশ্রমে যেতেন না। সুতরাং আহারান্তে একটু বিশ্রামের পর উক্ত ভদ্রলোক ও গিরিজানন্দের অনুরোধক্রমে আমরা মহাপুরুষজীর সঙ্গে সেই বাড়িতে গেলাম। কিছুক্ষণ আলাপাদির পর মহাপুরুষজী তাদের দুজনকেই তাঁর সঙ্গে সেই আশ্রমে আসতে বললেন, তাঁরাও সে আদেশ পালন করে আশ্রমে এলেন এবং বালানন্দজী তাদের সাদরে গ্রহণ করলেন। এরপর আমরা বিদ্যাপীঠে ফিরে আসি কিন্তু গিরিজানন্দজীর প্রতি বালানন্দজীর বিরূপ ভাব দূর হয়নি, কারণ এর পরেও তিনি আমাদের বহুবার বলেছেন—"রামকৃষ্ণ মিশন তো আচ্ছাই হ্যায়, লেকিন কোই কোই খারাব আদমি উসকে অন্দর ঘুস যাতা হ্যায়।"...

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ১ এপ্রিল থেকে আট দিন বেলুড় মঠে একটি কনভেনশন বা সাধু ও ভক্তদের সম্মেলন হয়। সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন মহাপুরুষজী। কিন্তু তাঁর পক্ষে বৃদ্ধ বয়সে প্রকাশ্য সভায় ইংরাজিতে ভাষণ দেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই তাঁরই অনুমতিক্রমে স্বামী নিখিলানন্দ ইংরাজি ভাষায় একটি ভাষণ লিখেন এবং প্রকাশ্য সভায় মহাপুরুষজীর নির্দেশে আমেরিকা হতে আগত স্বামী পরমানন্দ উহা পাঠ করেন। পাঠ শেষ হলে মহাপুরুষজী মন্তব্য করলেন, বা! বেশ লিখেছে! এই কথা অনেকেই শুনলেন এবং ভাবলেন মহাপুরুষ কত সরল এবং প্রচলিত রীতি অনুসারে মিথ্যাকে অবলম্বন করে নিজের গৌরব বাড়ানোর প্রতি কত বিরূপ।

১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দজীর দেহত্যাগের পর মহাপুরুষজীর শরীরও অসুস্থ হয়, সুতরাং বায়ু পরিবর্তনের জন্য তিনি মধুপুর যান এবং শেঠ ভিলায় অবস্থান করেন। ইতোমধ্যে আমার জীবনে একটা বড় রকম পরিবর্তন ঘটে গেছে। কনভেনশনের কিছুকাল পরেই দেওঘর বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ স্বামী সদ্ভাবানন্দজী যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন এবং কর্তৃপক্ষ আমাকেই অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন, যদিও আমি তখনও ব্রহ্মচারী সৌম্যচৈতন্য এবং মাত্র কিঞ্চিৎ অধিক তিন বছর আগে সঙ্ঘে যোগ দিয়েছি। আমার টাকা সংগ্রহের ক্ষমতা মোটেই ছিল না, এখনও নাই। স্বতঃলব্ধ দানের টাকা দিয়েই আমাকে কাজ চালাতে হতো, অথচ বিদ্যাপীঠের সেই প্রারম্ভিক সময়ে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। স্বামী সদ্ভাবানন্দজীর থাকাকালে দু-জন কংগ্রেস কর্মী স্বামী সত্যানন্দ ও জ্ঞান বিদ্যাপীঠের কাজে যোগ দেন। সত্যানন্দ বেশি দিন থাকেননি, তিনি পরে নেতাজীর দলে যোগ দিয়েছিলেন এবং ব্যাঙ্ককে দেহত্যাগ করেন। জ্ঞানদা (আমরা তাঁকে এই নামেই ডাকতাম)

কিছুকাল বিদ্যাপীঠে থাকার পর স্বাত্মানন্দ নামে পরিচিত হন। বেলুড়ে থাকাকালে ইহা প্রকাশ পায় যে তিনি রাজদ্রোহের সহিত সক্রিয়ভাবে জড়িত এবং সেজন্য তাঁকে সঙ্ঘত্যাগ করতে হয়। যাক, সেসব পরের কথা। আলোচ্যকালে জ্ঞানদা ছিলেন টাকা সংগ্রহ বিষয়ে আমার পরামর্শদাতা। তাঁর সঙ্গে আমি মাঝে মাঝে দেওঘরে টাকার জন্য সাইকেলে ঘুরেছি কিন্তু ফল বিশেষ কিছুই হয়নি। এবারে মহাপুরুষজী মধুপুরে এসেছেন শুনে জ্ঞানদা বললেন—চল মধুপুরে, মহাপুরুষজী সেখানে আছেন সুতরাং টাকা সংগ্রহের সুবিধা হবে। তবে সাইকেলে যেতে হবে, তা না হলে শহরে ঘোরাঘুরি করব কি করে? জ্ঞানদার কথাটা লাগল ভাল; মহাপুরুষজীর দর্শন পাব আবার টাকা পাবারও সম্ভাবনা আছে। দেওঘর থেকে মধুপুরের দূরত্ব রেলপথে গেলে প্রায় বাইশ মাইল আর মেঠো রাস্তায় গেলে হয়ত উনিশ-কুড়ি মাইল। কোন সড়ক ছিল না। মাঝে আবার একটা চওড়া ক্ষীণস্রোতা নদী পেরোতে হতো। সুতরাং কখনও সাইকেলে চড়ে এবং কখনও সাইকেলকে ঘাড়ে করে আমরা দু-জনে দুপুরে খাবার অনেক আগেই শেঠ ভিলায় উপস্থিত হলাম। প্রথমেই দেখা মহাপুরুষজীর সেক্রেটারি স্বামী গঙ্গেশানন্দের সঙ্গে। তিনি আমাদের দেখেই বললেন—"মহাপুরুষজী আছেন অপরের বাড়িতে অতিথি হয়ে; তোমরা এই ভাবে ভিড় করলে তিনি এবং গৃহস্বামী দুজনেই বিব্রত হবেন আর টাকা সংগ্রহ করা চলবে না; কারণ তাতে মহাপুরুষজীর দুর্নাম হবে। সুতরাং আমরা ঠিক করলাম মহাপুরুষজীকে দর্শন ও প্রণাম করেই দেওঘরে ফিরে যাব, মধ্যাহ্ন আহারের জন্য বাজার থেকে কিছু কিনে খেলেই চলবে; কিন্তু আমরা যখন মহাপুরুষজীকে দর্শন করতে গেলাম তিনি আমাদের সাদরে গ্রহণ করলেন এবং না খেয়েই ফিরে যাব শুনে বললেন—"না, এখানেই দুপুরে খাবে।" গৃহস্বামীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন তিনিও ইহাতে সানন্দে সায় দিলেন।

ইতোমধ্যে দেওঘরের অপর সাধু-ব্রহ্মচারীরাও রেল যোগে শেঠ ভিলায় উপস্থিত হলেন কথায় কথায় টাকা সংগ্রহের প্রসঙ্গ উঠতে, মহাপুরুষজী বললেন—"যে যা চায় ঠাকুর কৃপা করে তাকে তাই দেন, তোমরা বিদ্যাপীঠের জন্য টাকা চাচ্ছ তাও হয়ে যাবে।" ঐ সময় বিদ্যাপীঠের সহকর্মী স্বামী ধর্মেশানন্দও উপস্থিত ছিলেন, তিনি তাঁর স্মৃতি কথায় লিখেছেন যে মহাপুরুষজী আমায় আশীর্বাদ করেছিলেন 'ঠাকুরের কৃপায় তোমার চতুর্বর্গ ফল—ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ লাভ হবে।' আমি তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম 'আপনি এ কথা কোথায় পেলেন?' তিনি বললেন 'আমি ডায়েরিতে লিখে রেখেছিলাম।' আমি উত্তর দিয়েছিলাম 'আপনি ডায়েরি বা যাতেই লিখে রাখুন আমি এ কথা শুনিনি এবং এটা অযৌক্তিক যে মহাপুরুষজী তাঁর সঙ্ঘের একজন মুক্তিকামী ব্রহ্মচারীকে এই বলে আশীর্বাদ করবেন যে তার অর্থ ও

কাম লাভ হবে?” আহার সেদিন বেশ ভালই হয়েছিল, আহারের পর আমি ও জ্ঞানদা মহাপুরুষজীকে প্রণাম করে সাইকেলে দেওঘরে ফিরে গেলাম, অপরেরা ফিরলেন ট্রেনে, টাকা সংগ্রহ কিছুই হলো না।...

মধুপুর থেকে মহাপুরুষজী ৺কাশী ধামে চলে যান এবং অদ্বৈতাশ্রমে বাস করতে থাকেন। তখন মঠে বেশ একটা আন্দোলন চলছে যে, ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস গ্রহণের সময় বেঁধে দিতে হবে। তাই পাছে আমার আবেদন না মঞ্জুর হয় এই ভয়ে এতদিন সন্ন্যাসের জন্য দরখাস্ত করিনি, এখন হঠাৎ কাশী থেকে তার-বার্তা এল ব্রহ্মচর্যের পর যাদের তিন বছর হয়ে গেছে তারা সকলে চলে এস, মহাপুরুষজী স্বামীজীর জন্মতিথি দিবসে সন্ন্যাস দিবেন। তেমন উপযুক্ত ছিলাম আমরা তিনজন, স্বামী সৎস্বরূপানন্দ, স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ এবং আমি। আমরা তিনজনেই তাড়াতাড়ি টিকিট কিনে দেওঘর থেকে কাশীধামে উপস্থিত হলাম। সেখানে ভাবী সন্ন্যাসের সাথী পেলাম স্বামী শিবস্বরূপানন্দ (মতি মহারাজকে) এবং আরও দু-তিন জনকে যাদের নাম এখন মনে নেই। সন্ন্যাসের পূর্বে আত্মশ্রাদ্ধ করতে হয়। এখন মুশকিল হলো এই যে পুরোহিত খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না; সব কথা শুনে মহাপুরুষজী বললেন—তোমরাও যেমন, পিণ্ড পাকিয়ে দশাশ্বমেধ ঘাটে নিয়ে গঙ্গায় বিসর্জন দিবে; এই কথা বলে, ঐ পিণ্ড দানের সময় যে মুদ্রা দেখাতে হয় তাও দেখিয়ে বললেন, এই দেখিয়ে দেবে। আমাদের অবশ্য তা করতে হয়নি, কারণ শেষ পর্যন্ত পুরোহিত পাওয়া গিয়েছিল, যথা সময়ে ভোর রাত্রে সন্ন্যাসও হয়ে গেল। বিরজা হোমে আচার্য ছিলেন স্বামী জগদানন্দজী এবং সন্ন্যাসের মন্ত্র শোনালেন মহাপুরুষজী স্বয়ং। সন্ন্যাসের পর গঙ্গাস্নান করে এবং ৺অন্নপূর্ণা ও ৺বিশ্বনাথ দর্শন করে আমরা মহাপুরুষজীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলাম। সন্ন্যাসের পরে ভিক্ষা করতে হয়। প্রথম ভিক্ষা দিলেন মহাপুরুষজী নিজেই একটি টাকা দিয়ে এবং বললেন—জিলিপি কিনে খেও। আমরা অদ্বৈতাশ্রমের খোলা মাঠে বসে তাই করেছিলাম। তখনও সেখানে মন্দির তৈরি হয়নি। দুপুরের ভিক্ষা মিলেছিল কাকিমার বাড়িতে। একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারী কাশীতে বাস করতেন; সে পরিবারের সকলেই ঠাকুরের ভক্ত এবং ঐ ভদ্রলোকের স্ত্রীকেই সকলে শ্রদ্ধা সহকারে কাকিমা বলে ডাকতেন। দেওঘরে আমাদের প্রচুর কাজ ছিল সুতরাং সন্ন্যাসের পর যত শীঘ্র সম্ভব দেওঘরে ফিরে গেলাম।...

আমি বলতে চাই না যে, আমি সব সময়েই তাঁর আদর পেয়েছি এবং কখনও বিরক্তিভাজন হইনি। একবার বেলুড়ে আছি, তখন দেওঘর বিদ্যাপীঠের সব রকমেরই অভাব—টাকা, ছাত্র, শিক্ষক ইত্যাদি। তখন একজন বয়স্ক সাধু, নাম

নলিনী মহারাজ, যাঁকে নলিন মাস্টার বলে সকলে ডাকতেন, তিনি বললেন অমুক থিয়েটারের কর্তা তাঁর বাড়ির একটি ছেলেকে দেওঘরে দেওয়ার কথা ভাবছেন, তুমি গিয়ে দেখা করলে ভাল হয়, আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবো; তাই একদিন তাঁর সঙ্গে থিয়েটারের কর্তার বাড়িতে গেলাম। বেঞ্চির অনেকগুলি লাইন পেরিয়ে অফিসে উপস্থিত হলাম। কর্তা সেখানে ছিলেন না এবং খবর পেলাম বাড়িতে গেলেও হয়ত দেখা হবে না, তাই মঠে ফিরে এলাম এবং মহাপুরুষ মহারাজের কাছে সব নিবেদন করলাম। তিনি শুনেই খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। হ্যাঁ, না— কিছুই বললেন না। আমি এতেই বুঝে নিলাম যে কাজটি ভাল হয়নি; সুতরাং ঐ সাধুর সঙ্গ পরিত্যাগ করলাম। পরে ইনি সঙ্ঘ ছেড়ে চলে যান।

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে বেলুড় মঠে থাকাকালে উদ্বোধন কার্যালয় বা মায়ের বাড়িতে একটা বড় রকম পরিবর্তনের চেষ্টা চলছে। নানা কারণে এর অনেকটাই মহাপুরুষজীকে জানানো হতো না। একদিন কর্তৃপক্ষ আমাকে আদেশ করলেন অমুক সময়ে বিকালে ঘাটে নৌকা প্রস্তুত থাকবে এবং তুমি তোমার জিনিসপত্র নিয়ে অপর কয়েকজন সাধুর সঙ্গে উদ্বোধনে যাবে। সেখানে স্বামী বিরজানন্দ প্রেসিডেন্ট হবেন, আত্মবোধানন্দ বা সত্যেন মহারাজ ম্যানেজার হতে যাচ্ছেন, তিনি কিছুদিন থেকে তোমাকে কাজ শিখিয়ে দেবেন এবং তোমাকেই ম্যানেজার হতে হবে। পূর্বেই আঁচ পেয়েছিলাম এ ব্যবস্থাটা মহাপুরুষজীকে না জানিয়েই করা হচ্ছে, তবু গুরুদেবকে না জানিয়ে বা তাঁকে প্রণাম না করে আমার এ কাজে অগ্রসর হওয়া অনুচিত এই ভেবে আমি তাঁর ঘরে গেলাম এবং প্রণাম করে সব কথা বললাম; তিনি শুনে খুব গম্ভীর এবং চিন্তামগ্ন হলেন কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। অগত্যা আমি নৌকায় গিয়ে উঠলাম। এর পরবর্তী সব ঘটনা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ইতিহাসে লিখিত আছে, তবে আমাকে ওখানে বেশিদিন থাকতে হয়নি; কিছুদিন পরে সত্যেন মহারাজ ম্যানেজারের কাজ করতে রাজি হলেন এবং আমি বছর দেড়েক উদ্বোধনে কাজ করে দেওঘরে ফিরে গেলাম।...

আর একটি দুঃখের ঘটনা, মহাপুরুষজী তখন পক্ষাঘাত রোগে চলৎশক্তি ও বাক্যহীন হয়ে বিছানায় শুয়ে থাকতেন। আমি দেওঘর থেকে একটি সুন্দর বড় পাকা পেঁপে নিয়ে গিয়েছিলাম শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেবার জন্য। ওটি দেখে, মহাপুরুষজীর একজন সেবক বললেন—'ওঁকে দেখিয়ে নিয়ে এস', আমি সেটি নিয়ে তাঁকে দেখাতে গেলে তাঁর মুখ একটা বেদনা ও বিরক্তিতে ভরে উঠল। সেখানে আর কেউ উপস্থিত ছিলেন না যিনি বুঝিয়ে দিতে পারতেন মহাপুরুষজী ঠিক কি চান। পরে আমার মনে হয়েছিল তিনি হয়ত বলতে চেয়েছিলেন এটি ঠাকুরকে দাও

আমার কাছে কেন এনেছ? কারণ তাঁর স্বভাবই এই ছিল যে, কেউ কিছু নিয়ে এলে জিজ্ঞাসা করতেন ঠাকুর ঘরে গিয়েছিলে কি? এবং ঠাকুরকে কিছু দিয়েছ কি? সে বেদনাভরা মুখের স্মৃতি আজও আমার মনে আছে এবং আজও তা আমাকে পীড়া দেয় যে আমি এমন বোকা তাঁর ভাব বুঝতে পারলাম না।...

বিরক্তি দিয়ে স্মৃতি কথা শেষ না করে কয়েকটা বিচ্ছিন্ন ঘটনার কথা লিখে যাই। একবার লালগড়ের রাজা যোগেন্দ্রনাথ সাহশ রায় একখানি জরিদার মূল্যবান শাল মহাপুরুষজীকে অর্পণ করলে তিনি বলে উঠলেন এরপর একখানি কালো পেড়ে ধুতি নিয়ে এস এবং একটি ছড়ি দাও আমি সেই ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে এবং শিস দিতে দিতে বেড়িয়ে আসি।...

একদিন সকালে আমরা জনকয়েক সাধু-ব্রহ্মচারী মহাপুরুষজীর সামনে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় একজন সাধু প্রণাম করে বললেন, মহারাজ আমি হৃষীকেশে তপস্যায় যাচ্ছি। তখন মহাপুরুষজী বললেন—"একজন সাধু তপস্যায় যাচ্ছিল। তাকে অন্য সাধু জিজ্ঞাসা করল—স্বামীজী, 'আপ কাঁহা জা রহে হ্যাঁয়?' স্বামীজী জোর গলায় উত্তর দিলেন—'মৈ হৃষীকেশ জ রহা হুঁ।' তারপর যখন সেই সাধু হৃষীকেশ থেকে ফিরছে, তখন আর একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, স্বামীজী 'আপ কঁহা সে অ রহে হ্যাঁয়।' স্বামীজী তখন সরু গলায় টেনে টেনে বলল—'আ—রে—ভা—ই—হৃ—ষী—কে—শ সে'। তত দিনে সত্রের রুটি খেয়ে এবং ম্যালেরিয়ায় ভুগে স্বামীজীর অস্থিচর্মসার হয়ে গেছে।"...

সে বারে তিনি সবেমাত্র উটির থেকে ফিরে এসেছেন এবং মঠ বাড়ির একতলায় গঙ্গার ধারের বারান্দায় সন্ধ্যার সময় বসে কথা বলছেন। সামনে দাঁড়িয়ে আছে জন কয়েক সাধু ও ভক্ত; উটিতে দীর্ঘকাল থাকার ফলে তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছিল এবং বর্ণ বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল তাঁকে দেখাচ্ছিল বেশ সুন্দর এবং তিনি উৎফুল্লভাবে উটির কথা বলে যাচ্ছিলেন—সে জায়গা কত সুন্দর, কি রকম তাঁর অনুভূতি হয়েছে, ভক্তরা কত সজ্জন ইত্যাদি। সব কথাই ভাল লাগছিল এবং আনন্দে মন ভরে উঠছিল কিন্তু কোন কথা মনে করে রাখতে পারিনি।

মহাপুরুষ মহারাজ তখন অতি বৃদ্ধ। নিজের ঘরেই সর্বদা থাকেন। এমন সময় একদিন সকালে ৺কালীপূজার প্রসাদ একটা বড় থালায় সাজিয়ে তাঁর সামনে ধরতে তিনি বললেন—এত খাব কি করে? মা তো দৃষ্টি ভোগ করেন কিন্তু আমাকে মুখে খেয়ে পেটে হজম করতে হবে। তবু প্রসাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে কিঞ্চিৎ মাত্র গ্রহণ করলেন।

মহাপুরুষ মহারাজের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি*

স্বামী ভূতেশানন্দ

অবতার তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে যে, কিভাবে আমরা অবতারকে চিনবো। অবতারকে সম্পূর্ণরূপে চেনা মানুষের পক্ষে সম্ভব না হলেও যখন বহু অভিজ্ঞ ব্যক্তি মিলে তাঁকে অবতার বলি তখন তা তাঁর কোন বৈশিষ্ট্যকে লক্ষ্য করেই বলি, যে বৈশিষ্ট্য যুগের এক বিশিষ্ট অভাব পূরণ করে, এমন এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা জ্বেলে রেখে যায় যা আমাদের ভবিষ্যৎ ধর্মজীবনকেও আলোকিত করে।

অবতারকে জানা যে খুবই কঠিন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কারণ তিনি এত গভীর, এত বিশাল যে আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তার পরিমাপ করা যায় না। ঠাকুরের কথায় বলা যায় সমুদ্রের জল কি একটা ঘটিতে ধরে? যিনি সমুদ্রের চেয়েও গভীর, আকাশের চেয়েও বিশাল, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে যে তাঁকে বোঝা যায় না তা আমরা নিজেদের দিকে তাকালেই বুঝতে পারি। তবুও তিনি আসেন, তাঁর গভীরতা ও বিশালতাকে আবরণ দিয়ে ঢেকে রেখে যাতে আমরা অন্তত কিছুটা তাঁকে বুঝতে পারি।

সাধারণ মানুষ আমরা। শুদ্ধ বুদ্ধি না থাকায় তাঁকে সাধারণ মানুষ বলেই মনে করি। যেমন গীতায় ভগবান বলেছেন,—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥

যারা মোহগ্রস্ত তারা মানুষদেহধারী বলে, আমাকে সাধারণ মানুষ বলে অবজ্ঞা করে; তারা আমার যে লোকোত্তর দিব্য জন্ম-কর্ম তা জানে না, কিন্তু এই সাধারণের মধ্যেও কয়েকজন এমন অসাধারণ ব্যক্তি থাকেন যাঁদের কাছে তত্ত্বের কিছুটা প্রকাশিত হয়, বিশাল সূর্যের কয়েকটি রশ্মির প্রতিফলন হয়।

এঁরাই হলেন অবতারের পার্ষদ যাঁদের জীবনালোকেই অবতারকে চিনে নিতে হয়। মহাপুরুষ মহারাজ বাইবেলের যিশুখ্রিস্টের উক্তি থেকে উদ্ধৃত করে একটি

* বারাসত শ্রীরামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমে প্রদত্ত একটি ভাষণের অনুলিপি।

কথা প্রায়ই বলতেন, "He who has seen the Son, has seen the Father।" যে সন্তানকে দেখেছে সে পিতাকেও দেখেছে। তাই অবতারের পার্ষদ যাঁরা তাঁদের দেখলে তাঁদের ভিতর দিয়ে অবতারের কিছুটা ধারণা করা যায়, যদিও তাঁরা নিজেরা বলেছেন যে তাঁরা অবতারের জীবনের অসীম বিস্তারের কতটুকুই বা প্রকাশ করতে পারেন, তবুও তাঁরা জানেন এবং বলেন যে তাঁদের মধ্য দিয়ে সেই অবতারের কিরণেরই প্রতিফলন হচ্ছে। একবার এক ভক্ত দীক্ষার্থী মহাপুরুষ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি মায়ের কাছ থেকে দীক্ষা নেবেন না স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছ থেকে দীক্ষা নেবেন। কিছুমাত্র চিন্তা না করে মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, "একই কথা। একই গঙ্গার জল দুই নল দিয়ে আসছে।"

পূর্ণ সূর্যের কিরণে আমরা ঝলসে যাই। তাই অবতার যখন আসেন তখন তাঁর নিজের প্রকাশকে অনেকটা আবৃত করেই আসেন সর্বসাধারণের সহনীয়রূপে। আর তাঁর কাজ তাঁর স্থূলদেহ অবসানের পরও অব্যাহত ধারায় চলতে থাকে। তাঁর পার্ষদদের মধ্য দিয়ে, যাঁদের ভিতর দিয়ে তাঁর তত্ত্ব সর্বসাধারণের কাছে সহজগম্যরূপে প্রকাশিত হয়। এমনই বহু কিরণের প্রতিফলন যাঁদের মধ্য দিয়ে হয়েছে তাঁদের মধ্যে মহাপুরুষ মহারাজ অন্যতম। আমি এই পার্ষদদের পরস্পরের সঙ্গে তুলনা করতে চাই না। আর তুলনা করার সামর্থ্যও আমার নেই। কারণ আরও প্রাচীন যাঁরা তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার সুযোগ আমাদের হয়নি, আর সুযোগ হলেও বোঝার সামর্থ্যই বা আমাদের কতটুকু ছিল!

তবু মহাপুরুষ মহারাজকে যেভাবে দেখেছি তাতে আমাদের চোখ ভরে গেছে। আমাদের জীবনের যত সমস্যা তার সহজ সরল সমাধান তাঁর কাছে পেয়েছি। প্রশ্ন করতে হয়নি তার আগেই তার উত্তর তাঁর কাছ থেকে এসেছে, তাঁর জীবন দেখে সেই উত্তর আরও পরিষ্কার হয়ে গেছে। তাঁর সঙ্গে একসঙ্গে বাস করে তাঁকে দেখবার বহু সুযোগ আমরা পেয়েছি কিন্তু তাঁকে বোঝবার চেষ্টা করিনি কারণ সেই বুদ্ধি আমাদের ছিল না। তবু যা পেয়েছি তাই আমাদের যথেষ্ট পাথেয়।

প্রথম দিকে মঠে আসা-যাওয়া করার সময় তাঁকে দেখেছি, প্রণামও করেছি। কিন্তু ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসার সুযোগ তখনো হয়ে ওঠেনি। মঠে আসার পর মাতা, পিতা, বন্ধু—সকলের স্নেহ আশীর্বাদ ও শাসন সব একসঙ্গে পেয়েছি তাঁর কাছ থেকে। কত রকম করে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি আমাদের ঘিরে রাখতো, কত রকম স্নেহ দিয়ে যে তিনি আমাদের আকর্ষণ করে রাখতেন তা ভাবলে অবাক হতে হয়।

তাঁকে দেখেছি সবসময় শ্রীরামকৃষ্ণভাবে ভরপুর, শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ, শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া যেন অন্য কোন চিন্তা তাঁর নেই। ঠাকুরভাঁড়ারে যখন কাজ করতাম তখন

তিনি সযত্নে প্রতিটি কাজ কি রকম করে করতে হয় তা শিখিয়ে দিতেন যাতে ঠাকুরসেবার কোন ত্রুটি না থাকে। বলতেন, "ঠাকুর ওখানে সাক্ষাৎ বর্তমান এই কথা সবসময় মনে রাখবে। তিনি কেবল ছবি নন বা বিগ্রহ নন, তিনি সাক্ষাৎ বর্তমান।" ঠাকুর সম্বন্ধে এঁদের দৃষ্টি—তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি এই সঙ্ঘকে পরিচালনা করছেন আর তাঁরা হলেন তাঁর হাতের যন্ত্র মাত্র।

নিজেকে সঙ্ঘনায়করূপে কখনও তাঁকে অভিমান করতে দেখিনি। অভিমানশূন্যতা যে কতদূর হতে পারে তা তাঁর জীবন দেখলেই বোঝা যায়। এ সম্বন্ধে অনেক কথা প্রচলিত। তাঁর এক পোষা কুকুর ছিল। তাকে দেখিয়ে তিনি বলতেন যে ওটা এর কুকুর, আর নিজেকে দেখিয়ে বলতেন যে এটা হচ্ছে ঠাকুরের কুকুর। এই রকম প্রভুর প্রতি আনুগত্য ছিল তাঁর। তাঁকে দেখলে বোঝা যেত যে সঙ্ঘনায়ক প্রকৃতপক্ষে সঙ্ঘসেবক ছাড়া আর কিছু নয়। আর সে সেবার অর্থ হলো সমভাবে সঙ্ঘের প্রতিটি শাখা-প্রশাখার প্রতি সতর্কদৃষ্টি রাখা যাতে তাদের কল্যাণ হয়। আমাদের সামান্য কোন অসুবিধা দেখা দিলে তিনি সত্বর সেটা দূর করতে সচেষ্ট হতেন। একটা দৃষ্টান্ত বলছি। তাঁর জন্য কলকাতার এক ডাক্তারের কাছে ওষুধ আনতে যেতে হতো। একবার আমি গেছি ওষুধ আনতে। তখন বেলুড় থেকে কলকাতা যাতায়াত খুব সহজ ছিল না। অনেক অসুবিধা ছিল। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে গেছে অথচ তখনও আমি ফিরিনি বলে মহাপুরুষ মহারাজ খুব চিন্তিত। বারে বারে জিজ্ঞাসা করছেন আমি ফিরেছি কিনা। আমি মঠে ঢোকা মাত্রই সবাই আমায় বললেন, "যাও, মহাপুরুষ মহারাজ তোমার জন্য খুব চিন্তিত হয়েছেন।" আমি ছুটতে ছুটতে তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হলাম। যেতেই তিনি বললেন, "তোমার এত দেরি হলো!" আমি বললাম, "মহারাজ, ডাক্তার বাড়ি ছিলেন না। ডাক্তার আসতেই আমি ওষুধ নিয়ে আসছি।" শুনে তিনি বললেন, "ডাক্তার এই রকম করে ভোগাচ্ছে, যাও, এই ডাক্তারের ওষুধ আর খাব না।" এই কথা শুনে আমরা খুবই চিন্তিত হলাম। এই ডাক্তারকে তিনি খুবই স্নেহ করতেন এবং তাঁর ওষুধে মহারাজের অনেক উপকারও হচ্ছিল। তাই এহেন ডাক্তারের ওষুধ খাব না বলে যখন তিনি ধনুক-ভাঙা পণ করলেন তখন তা আমাদের খুবই চিন্তায় ফেলল। তাড়াতাড়ি ডাক্তারকে খবর পাঠান হলো। পরদিন ডাক্তার এলে তাঁকে সব বলে বলা হলো, 'দেখুন যদি মানভঞ্জন করাতে পারেন।' ডাক্তার এসে অতি বিনীতভাবে হাতজোড় করে ক্ষমা চাইলেন। মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, "তুমি এ রকম করে সাধুদের ভোগাচ্ছ কেন? তোমার কাছে ছাড়া কি ওষুধ অন্য কোথাও পাওয়া যায় না? লিখে দাও, আমরা আনিয়ে নেব।" ডাক্তার অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন "জানি মহারাজ ওষুধ অন্য জায়গায় পাওয়া যায়, কিন্তু আমাকে এইটুকু সেবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন না, এই প্রার্থনা।" মহাপুরুষ

মহারাজ আশুতোষ, শুনে একেবারে জল হয়ে গেলেন। বললেন, "যাও, এরপর থেকে যেন এই রকম না হয়।"

আমাদের মতো তুচ্ছ, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ব্যক্তির জন্য তাঁর এত চিন্তা! আমি শুধু ব্যক্তিগতভাবে বলছি না, আমাদের প্রত্যেকের জন্য ছিল তাঁর এইরকম চিন্তা। কোথায় কোন লোক অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে তার জন্য তাঁর চিন্তা, কি ওষুধ দেওয়া যায়, কি পথ্য দেওয়া যায়—এইসব চিন্তা। শুধু সাধুদের জন্যই নয় মঠের বাইরে যারা প্রতিবেশী তাদেরও খোঁজ নিতেন তিনি। মঠের ডাক্তার এলে বলতেন, "অমুক-অমুক লোক অমুক-অমুক জায়গায় অসুস্থ, তাদের জন্য ওষুধের ও পথ্যের ব্যবস্থা হয়েছে তো?" এমনই ছিল তাঁর চিন্তা—প্রতিটি মানুষের জন্য।

তাঁর দৈনন্দিন দিনচর্যার মধ্যে ছিল সকাল বেলায় সমস্ত মঠটিকে ঘুরে ঘুরে ভাল করে দেখা, সব বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, এমন কি গরুর ঘরগুলিতে গিয়ে গরুগুলির খোঁজ খবর নেওয়া ও তাদের হাতে করে কিছু খাওয়ানো পর্যন্ত। তাঁর হাতে খেয়ে তারা যেমন তৃপ্তি বোধ করত, উনিও তেমনি তাদের খাইয়ে তৃপ্তি পেতেন। ভাঁড়ারের পরিত্যক্ত ফল, সব্জীর খোসা, নিজে হাতে করে ওদের খাওয়াতেন এবং গরুরাও যেন তাঁর সামনে প্রফুল্ল থাকতো।

আর কুকুরের তো কথাই নেই। কুকুরের জন্য তাঁর চিন্তার শেষ নেই। তাকে দেখাশোনা করা তাকে যত্ন করা ইত্যাদি।

যতদিন তিনি সুস্থ ছিলেন প্রতিদিন অতি ভোরে উঠে আসনখানি বগলে করে গিয়ে পুরানো ঠাকুর ঘরে চলে যেতেন, দীর্ঘকাল ধ্যানস্থ থাকতেন। আর আমরা তিনি যতক্ষণ না ওঠেন, ততক্ষণ ওঠা শোভন নয় মনে করে, বসে থাকতুম। অনেক পরে যখন তিনি ঘরে আসতেন তাঁর ঘরে তাঁর জলখাবার দেওয়া হতো। সেই সময় আমরা তাঁকে প্রণাম করতাম। তাঁর সঙ্গে একটা কথা বলে সকলে তৃপ্তিবোধ করত। ভাঁড়ারিকে জিজ্ঞাসা করতেন, "ঠাকুরকে কি কি ভোগ দেবে আজ।" শুনে বলতেন, "আজ এইটি-এইটি দিও।"

আমার একবার কাশীতে সংস্কৃত শাস্ত্র পড়বার ইচ্ছা হলো। তিনি শুনে বললেন, যদি ব্যাকরণাদি পড়তে চাও তো তার কোন সার্থকতা দেখি না। আর "যদি বেদান্ত পড়তে চাও তো আমাদের মঠে ভাল অধ্যাপক আছেন, তাঁর কাছে পড়লেই যথেষ্ট। শুধু বেদান্ত পড়বার জন্য কাশীতে যাবার প্রয়োজন নেই," সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে আমি সে ইচ্ছা ত্যাগ করলাম। তাই দেখি তিনি বিদ্যা চর্চাতে উৎসাহ দিতেন কিন্তু যে কোন বিদ্যার চর্চা নয়। যে বিদ্যা আমাদের জীবনকে উন্নত করবে, আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে—সেই বিদ্যাতেই তিনি উৎসাহ দিতেন। বিদ্যার

মাধ্যমে আত্মানুভূতি, তাই ছিল লক্ষ্য—আর তা ঠাকুরের আদর্শের মাধ্যমেই আসুক এটাও তিনি চাইতেন।

আর একবার তাঁর এক সেবকের গান শিখবার ইচ্ছা হলো। সঙ্গীতের দিকে তাঁর খুব ঝোঁক ছিল। তাই সেই সেবক লক্ষ্ণৌ-এ গিয়ে গান শিখতে চাইলেন। শুনে মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, "যাও, মর গে"। তিনি টাকা দিলেন কিন্তু কোন আশীর্বাদ করলেন না বা উৎসাহ দিলেন না। এই হলো এক দিক। আবার অন্য দিকে তাঁকে দেখি বিভোর হয়ে আগ্রহভরে গান শুনতে আর বলতে যে 'সঙ্গীতকে মানুষের জীবনে সাধনার বড় অঙ্গ করা উচিত।' একদিনের ঘটনা বলছি। সেদিন ছিল জন্মাষ্টমী। চিরাচরিত প্রথা অনুসারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মের বিবরণ ভাগবত থেকে পড়া হলো। তিনি সেখানে এসে বসে শুনলেন। পাঠের পর বললেন, 'এবার একটু গান হোক।' এখন আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে সেদিন সেখানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে সাহস করে এগিয়ে এসে গান করার মতো কেউ ছিলেন না। কেন না মহাপুরুষ মহারাজের সামনে গান করতে সকলেরই সঙ্কোচ। কেউ কিছু করছে না দেখে তিনি নিজেই হাততালি দিয়ে গান করতে আরম্ভ করে দিলেন ঃ 'হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।' তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল অতি সুমিষ্ট। সঙ্গীত সম্বন্ধে তাল লয় বোধও পুরোপুরিই ছিল। এই গানটি করে তিনি তাঁর ঘরে গেলেন। এই সময় আমি তাঁকে একটু Massage করতাম। সেটা করতে হতো ডাক্তারদের নির্দেশ অনুসারে যাতে তাঁর শরীরে রক্ত-সঞ্চালন ঠিকমত হয়। তাঁকে Massage করছি আর তিনি শুয়ে শুয়ে আক্ষেপ করছেন "যা যা মজা লোটবার আমরাই লুটেছি, এ ব্যাটারা সব শুকিয়ে গেছে।" এই যে কেউ গান করলেন না এতে তিনি এতই দুঃখবোধ করেছিলেন যে বারবার আক্ষেপ করছিলেন। ইতোমধ্যে আমাদের যেখানে গান হতো সেই visitor's room-এ সকলে গান ধরেছে। শুনে তিনি খুব আনন্দ করলেন, বললেন, "না—এইতো গাইছে, বাঃ বাঃ এইতো বেশ গাইছে, আমার সামনে গাইতে বোধ হয় লজ্জা করছিল।" ঠাকুরের কাছে বারবার প্রার্থনা করতে লাগলেন, "ঠাকুর এদের আনন্দে রাখ, এদের আনন্দে রাখ।"

মঠে যখন ভজন-সঙ্গীত হতো তিনি বসে-বসে শুনতেন; আর শুনতে-শুনতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে স্থির হয়ে যেতেন।

আর একদিনের কথা বলছি। সাধারণত তিনি তখন সকালে জলখাবার খাওয়ার পর মঠে ঘুরে কাজকর্ম দেখাশোনা করতেন। এখন যেখানে মঠ অফিস আমরা সেখানে আছি, আর তিনি উঠোন দিয়ে এসে মঠবাড়ির দিকে যাচ্ছেন। এমন সময় আমাদের একজন সাধু তাঁকে এক জায়গায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সামনে

গিয়ে হঠাৎ প্রণাম করেছেন। তখনই উনি হাঁটতে আরম্ভ করলেন। সামনে ঐ সাধুটি থাকায় উনি পড়ে গেলেন। পড়ে গিয়ে তাঁর হাতে চোট লাগল, খুব ব্যথা লাগল। সাধুটিকে বকলেন, বললেন, "জান না, কি রকম করে প্রণাম করতে হয়।" পরে তিনি ঘরে আসার পর আমি তাঁকে Massage করছি, তখন বলছেন, "জান, ওকে বকলুম বটে, কিন্তু ওর দোষ নেই। ও কি করে জানবে যে তখন আমি কিছু দেখছিলাম না।" চোখ চাওয়া, সম্পূর্ণ সজাগ, দৃষ্টি সামনের দিকে, অন্যদিকে নয়, অথচ একজন এসে তাঁকে প্রণাম করছেন তিনি দেখতে পেলেন না। একে বলে সহজ সমাধি অবস্থা। অর্থাৎ সম্পূর্ণ জেগে চোখ চেয়েও মানুষ ভগবানের ভাবে এমন বিভোর, এমন অন্তর্মুখীন হতে পারে যে বাহ্য কোন বস্তু তাঁর চোখে পড়ে না—এটা আমাদের শোনা কথা ছিল বটে তবে চাক্ষুস দেখবার সুযোগ ঐ দিন হয়েছিল।

অন্য সময়েও তিনি এক জায়গায় চুপ করে বসে সমাধিস্থের মতো স্থির, নিস্পন্দ হয়ে যেতেন। অনেক সময় তিনি মঠের মধ্যে এসে মঠের উঠানে একটা বেঞ্চি পাতা থাকতো সেখানে বসতেন। কখনও বা গঙ্গার দিকে Lawn-এ ঐ রকমভাবে স্থির হয়ে বসে থাকতেন। হয়ত তামাক খেতে বসেছেন, ধীরে ধীরে তামাক খাওয়া বন্ধ হয়ে যেত; তিনি স্থির হয়ে বসে থাকতেন। এইটি আমরা মহাপুরুষ মহারাজের জীবনে বারবার প্রত্যক্ষ করেছি। এই জগৎটা তাঁর কাছে যেন থেকেও নেই, যখনই ইচ্ছা তখনই তিনি মনটাকে গুটিয়ে নিতে পারতেন। সর্বদাই একটা স্বাভাবিক অন্তর্মুখীন ভাব অথচ জোর করে মনটাকে বাইরে রাখছেন ঠাকুরের কাজের জন্য, এই রকম আমাদের মনে হতো। সমুদ্রের মতো অনন্ত, অসীম অথচ স্থির, অচঞ্চল স্থিতপ্রজ্ঞের অবস্থা ছিল তাঁর। এমন কি মঠের চরম বিপদের সময়ও তাঁকে এইরকম অচঞ্চল থাকতে দেখা গেছে। এক সময় মঠকে এমন সব প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে পড়তে হয়েছিল যে আমাদের মতো নবাগতদের মনেও এক দুশ্চিন্তার ছায়া নেমে এসেছিল। কিন্তু মহাপুরুষ মহারাজের দিকে যখনই তাকিয়ে দেখেছি তখনই মনে হয়েছে যে এইসব বিপদের ছায়া যেন তাঁকে এতটুকুও চঞ্চল করতে পারছে না। তিনি সকলকে বলছেন, "দেখ, তোমরা এত ভয় পাচ্ছ কেন? এটা ঠাকুরের সঙ্ঘ, ঠাকুরই এই সঙ্ঘকে রক্ষা করছেন। কিছুতেই এর কোন ক্ষতি হবে না।" তাঁর কথায় আমাদের মনে অসীম সাহস ফিরে পেয়েছি আর ভেবেছি যে ইনি কি আমাদের চেয়ে এই সঙ্ঘকে কম ভালবাসেন! সব সময় তিনি জানতেন যে এই সঙ্ঘকে চালাচ্ছেন ঠাকুর। এই সঙ্ঘের হাল তাই তাঁর হাতে। ঠাকুর তাঁকে দিয়ে যা করাচ্ছেন তিনি তাই করছেন আর কতদূর করাবেন তা ঠাকুরই জানেন। —এই

সেই পূর্ণ শরণাগতি, পূর্ণ নির্ভরতা—যা তাঁকে স্থির অচঞ্চল রেখেছিল সব বিপদের ভিতরেও।

এই সঙ্ঘের কাজের জন্য তিনি আমাদের কতভাবেই না প্রেরণা দিচ্ছেন, উৎসাহিত করছেন, বলছেন, "দেখ যারা এখানে আমাদের কাছে থাকে, ভেবোনা আমরা তাদেরই বেশি ভালবাসি। যারা দূরে আছে, ঠাকুরের কাজ করতে দূরে যাচ্ছে তাদের প্রতিও আমাদের সমান ভালবাসা রয়েছে।" তাই আমরা যখন কাছে থেকে তাঁর সেবা করেছি, তখন যেমন তাঁর স্নেহ আস্বাদন করেছি তেমনই স্নেহ সমভাবে বর্ষিত হয়েছে আমাদের উপর যখন আমরা তাঁর কাছ থেকে দূরে ছিলাম। এ অনুভব আমাদের বারবার হয়েছে। আমরা তখন Midnapore-এ Relief কাজে ব্যস্ত। দুর্গাপূজার সময়; মঠে দুর্গাপূজা হচ্ছে। আমাদেরই মধ্যে একজন পূজা দেখার লোভ সামলাতে না পেরে মঠে এসেছেন পূজা দেখতে। এসে মহাপুরুষ মহারাজকে যেই প্রণাম করতে গেছেন তিনি বললেন, "তুমি এইভাবে চলে এলে কি করে? তোমার ভাইরা যারা এখন সেখানে কাজ করছে তারাও কি এই দুর্গাপূজার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে না? তুমি নিজের কথাই ভাবলে, তাদের কথা একটুও ভাবলে না?" এই কথা শুনে তাকে মাটিতে মিশে যেতে হলো। ঠাকুরের কাজ, তাই তার ওপর ছিল তাঁর এই সতর্ক দৃষ্টি।

সেই মহাপুরুষ মহারাজ সম্পর্কে আমার জীবনের একটা ঘটনার কথা বলি। ব্যক্তিগত জীবনের কথা বলতে সঙ্কোচ হয়। কিন্তু না বললে তাঁর জীবনের কথা প্রকাশ করতে পারি না, তাই বলছি। যে সময়ের কথা বলছি তখন মহাপুরুষ মহারাজের সেবার অধিকার একটু হয়েছে। তাঁর পূত সান্নিধ্য খুবই ভাল লাগছে। অথচ মনের মধ্যে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগছে কিছুদিন নির্জনে গিয়ে তপস্যা করবার। আবার মহাপুরুষ মহারাজের সেবার সুযোগ যেটুকু পাচ্ছি সেটুকু থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছি না। এমনই এক সময় একদিন সন্ধ্যায় তাঁকে Massage করছি। ইলেকট্রিকের আলো তখন ছিল না। ঘরে টিমটিম করে shade দেওয়া একটা আলো জ্বলছে। সেই সময় বললাম, "মহারাজ একটা কথা বলবো বলে ভাবছি।" মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, "কী, বলো?" তখন বললাম, "দেখুন আমার মনে একটা বড় সংশয় উপস্থিত হয়েছে। একবার মনে হচ্ছে যে বয়স হয়ে যাচ্ছে একটু নির্জনে গিয়ে সাধন ভজন করি। আবার আপনার সেবা করার যে সুযোগ পাচ্ছি নিজেকে তা থেকে বঞ্চিত করতেও ইচ্ছা হচ্ছে না। কোনটা যে শ্রেয় তা বুঝে উঠতে পারছি না।" মহারাজ শুয়ে ছিলেন, তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন। খুব জোর দিয়ে বললেন "যাবে বৈকি, যাবে বৈকি, নিশ্চয়ই যাবে।"

তারপর ধ্যান ভজনের সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিয়ে বললেন, "কোথায় গেলে অনুকূল হবে আমিও ভাবছি, তুমিও ভাব" তার আগে আমি যে কিছুদিন অসুস্থ ছিলাম সে কথাটি তাঁর মনে ছিল। তারপর বললেন, "তপস্যা করতে যাবার আগে খুব করে চুটিয়ে ধ্যান-জপ করে ভাব জমিয়ে নাও, তাহলে খুব লাভ হবে।" সেদিন আর তাঁকে Massage করা সম্ভব হলো না, করতে দিলেনই না। সেদিন এইসব প্রসঙ্গই চলল সর্বক্ষণ। আমার মনে হলো তাঁর সেবার ক্রটি হলো। এরপর থেকে রোজই তাঁর কাছে গেলেই বারবার প্রশ্ন করতেন, "জপ-ধ্যান ভাল হচ্ছে তো? আমি ভাবছি কোথায় গেলে তোমার ভাল হবে।" তারপর একজন সাধু ভাল গান করতে পারতেন, তাঁকে ডেকে ভজন করতে বললেন। এ কয়দিন এই প্রসঙ্গ, এই রেশই চলল। তারপর একদিন বললেন, "তুমি ৺কাশীতে যাও। ৺কাশী ৺বিশ্বনাথের স্থান, খুব অনুকূল। তোমার শরীর যদি খারাপ হয় সেবাশ্রম আছে। আমি সেবাশ্রমের অধ্যক্ষকে লিখে দিচ্ছি।" প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন। তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে গেলাম। তারপর চিঠি পত্রের আদান-প্রদান হতো। কত যে আশীর্বাদ করতেন তার ভিতর দিয়ে তার কথাই নেই। খুব জোর দিয়েই বলতেন যে এ জীবনেই চরম বস্তু লাভ করতে হবে এবং তার জন্য কোন্ কোন্ দিক দিয়ে সাবধান হতে হবে তাও বলে দিতেন।

আমি তখন উত্তর কাশীতে আছি। একজন সাধু আমাদের সাধুদের সেখানে থাকার কষ্ট দেখে একটি ছোট কুটিয়া করতে টাকা দিতে চাইলেন। তখন মহারাজকে সব লিখলাম। মহারাজ বললেন, "দেখ যদি ঘরবাড়ি করতে হয় তবে চলে এস। এখানে আমাদের বহু জায়গায় অনেক ঘরবাড়ি করা হচ্ছে। আর যদি তপস্যাই করতে হয় তো ওসব মন থেকে ছেড়ে দিয়ে তাঁর উপর নির্ভর করে থাক।" আমি তখনই সে চিন্তা পরিত্যাগ করলাম। তপস্যা করতে হলে, নিরালম্ব হয়ে করতে হবে। তপস্যা, সাধন-ভজনের কথা বলবার সময় তিনি আনন্দের উপর জোর দিতেন যাতে আনন্দের ভাব আমাদের মনে আসে। দুঃখ, পাপী, তাপী, এসব কথা তিনি পছন্দ করতেন না। একদিন সাহস করে বললাম, "মহারাজ ঠাকুর কি রকম করে ভোরবেলায় আপনাদের সাধন-ভজন করাতেন একটু বলুন না।" সঙ্গে সঙ্গে যেন তাঁর স্মৃতিপটে সেই সব দিনের ছবি ভেসে উঠল। গভীর ভাবের সঙ্গে বললেন, "আর বাবা সাধন-ভজন! ঠাকুর যখন ভোরবেলায় মধুর স্বরে নাম গুণগান করতেন তখন যেন পাষাণ গলে যেত। আর সাধন-ভজন করব কি? তাঁর সেই মধুর কণ্ঠের ভাবাবেগপূর্ণ গীত শুনলে সবাই মুগ্ধ হয়ে যেত।"

এই যে সাধনের ধারা মনে করিয়ে দিলেন তা শুধু struggle নয়। ভাবের

প্রবাহ এমনিই বইছে শুধু তাতে গা ভাসিয়ে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া। কত উপদেশ দিলেন সেসব অনেক ভুলে গেছি, প্রসঙ্গক্রমে সব মনেও আসে না। তবে এটুকু বুঝতে পারি যে—মন্দাকিনীর ধারেই আমরা বাস করেছি, তাতে আমাদের জীবনকে পবিত্র করার উপযোগী উপাদান ভরপুর ছিল। যদি তাতে আমাদের জীবন সার্থক হয়ে থাকে তো হয়েছে। আর যদি না হয়ে থাকে তো সেটা—চরম দুর্ভাগ্য।

আর বেশি প্রসঙ্গের অবতারণা না করে তাঁর কাছে একান্তভাবে প্রার্থনা করি যে তিনি যেন আমাদের ভিতর প্রেরণা দিন। তাঁর জীবন আমাদের জীবনকে প্রেরণা দিক; আমাদের আলোকবর্তিকা হয়ে উঠুক, তাঁর আশীর্বাদ আমাদের অক্ষয় সম্পদ হোক, তাঁর কৃপায় আমাদের জীবন যেন সার্থক হয়ে উঠে।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

স্বামী পুণ্যানন্দ

১৯২১ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে পরমপূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের দর্শন লাভে আমি ধন্য হয়েছিলাম। পূর্ববঙ্গে আমার পূর্বাশ্রমের বাড়ি ছিল। ঢাকায়ই থাকতাম। ঢাকা থেকে কলকাতা আসবার প্রাক্কালে ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের তদানীন্তন অধ্যক্ষ স্বামী আত্মানন্দজী (শুকুল মহারাজ) আমাকে বলেছিলেন, "কলকাতা যাচ্ছ। বেলুড় মঠে যেও। মহাপুরুষ মহারাজকে দর্শন করে এসো।" সে নির্দেশের ফলেই আমার জীবনে সেই পুণ্যপুরুষের প্রথম আবির্ভাব ঘটে, প্রথম প্রকাশ হয়।

'গিরিশ স্মৃতিভবনের' যে কক্ষটিতে বেলুড় মঠের বর্তমান অধ্যক্ষ বাস করেন, তখনকার দিনে মহাপুরুষ মহারাজ সেই কক্ষটিতে বাস করতেন। শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ, যাঁকে মঠের সকলেই 'রাজা মহারাজ' বলে সম্বোধন করতেন, তিনিও সেই বেলুড় মঠেই ছিলেন। অবশ্য তিনি বাস করতেন মঠ-বাড়িটিতে।

মফঃস্বল শহর থেকে প্রথম কলকাতায় এসেছি, রাস্তাঘাটের সঙ্গে তেমন পরিচয় তখনও হয়নি। কাজেই, কতকটা শঙ্কিতচিত্তে বেলুড় মঠের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলাম। বেশ মনে পড়ে বড়বাজার ঘাট থেকে ফেরি স্টিমারে কুঠিঘাট পৌঁছাই। বাস অনেক পরের কথা। কাজেই, কুঠিঘাট থেকে খেয়া নৌকায় বেলুড় মঠে পৌঁছতে

হতো। আমি যখন কুঠিঘাটে পৌঁছেছি তখন খেয়া নৌকাটি অপরপারে ছিল। সুতরাং বেশ কিছুক্ষণ আমাকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। সেই সময়টুকুতে কুঠিঘাটের জেটির ওপর বসে উৎসুক-দৃষ্টিতে বেলুড় মঠের দিকে চেয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, ঐ বেলুড় মঠ, ঐখানে স্বামীজী বাস করতেন। আজও মনে পড়ে প্রথম আবিষ্কারের কি এক অব্যক্ত আনন্দ সেদিন যেন আমার অন্তরটিকে পূর্ণ করে দিয়েছিল! গঙ্গার অপরতীরে ক্বচিৎ দুই-এক জন গৈরিকপরিহিত সন্ন্যাসীর মূর্তি দেখতে পাচ্ছিলাম, আর মনে হচ্ছিল তাঁরা যেন দেবদূত, এই কঠিন, মাটির পৃথিবীতে বহুজন-কল্যাণ-কামনা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ইতোমধ্যে নৌকা এসে গেল এবং আমিও কিছুক্ষণের মধ্যেই বেলুড় মঠে উপস্থিত হলাম। বলা বাহুল্য মঠের পুণ্য মাটিতে সেই আমার প্রথম পদক্ষেপ অথবা জীবনের এক নূতন অধ্যায়ের সেই প্রথম সূত্রপাত। মঠে গিয়ে পুরাতন ঠাকুরঘরে প্রণামাদি সেরে একজন সন্ন্যাসীর নির্দেশে আমিও উপরে উঠে গিয়েছিলাম এবং জীবনে প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর পুণ্য দর্শনলাভে কৃতার্থ হয়েছিলাম। সেদিনের স্মৃতি আজও যেন চোখের সামনে ভাসে।

গঙ্গার দিকের বারান্দায় দক্ষিণাস্য হয়ে একখানি আরাম-কেদারায় স্বামী ব্রহ্মানন্দজী সেদিন বসেছিলেন। এই বিরাট পুরুষের কথা পুস্তকে পড়েছিলাম, অনেকের মুখেও শুনেছিলাম। কিন্তু সেদিন তাঁকে প্রত্যক্ষ দর্শন করেই মনে হয়েছিল বাইবেলের সেই অমর উক্তি ঃ 'He who hath seen the son, hath seen the Father'. মনে হয়েছিল—এই সেই রাখাল-রাজ, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানস-সন্তান, যিনি ছায়ার মতো ঠাকুরের সঙ্গে থেকেছেন, ঠাকুরের হাতে খেয়েছেন, একই শয্যায় ঘুমিয়েছেন, তাঁর কোলে বসে কত অপার্থিব স্নেহ ভালবাসা আস্বাদ করেছেন! সেদিন তাঁকে দেখে আরও মনে হয়েছিল যে, তাঁর মনটি এ জগতের কোন বস্তুতেই আবদ্ধ নেই। মুখে দু-চারটি কথা মধ্যে মধ্যে তিনি বলছিলেন সত্য, কিন্তু সে যেন অন্য কোন জগৎ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে বলার মতো। তাঁর ইজি-চেয়ারটির দুই পার্শ্বে দু-জন সেবক বসেছিলেন, আর তাঁদের মাঝখানটিতে তিনি উপবিষ্ট, ঠিক যেন এক রাজাধিরাজের মতো। স্বামী বিবেকানন্দ যে কেন তাঁকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন, সে কথা যেন প্রথম দিনেই মুহূর্ত মধ্যে আমি উপলব্ধি করেছিলাম। একটু পরেই আস্তে আস্তে সামনে অগ্রসর হয়ে মহারাজকে (স্বামী ব্রহ্মানন্দজী) প্রণাম করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন—"কোত্থেকে আসছ?" আমি সংক্ষেপে আমার পরিচয় দিয়েছিলাম। আমার উত্তর শুনে মহারাজ বলেছিলেন—"কোন বাড়িতে গেলে প্রথমে সে বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠের সঙ্গে দেখা করতে হয়। তুমি কি

মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে দেখা করেছ? আগে সেখানে যাও, তাঁকে দর্শন কর।” হতে পারে ভ্রম, তথাপি মনে হয় মহারাজ হয়তো তাঁর ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন যে, উত্তরকালে মহাপুরুষ মহারাজের কৃপা এবং আশীর্বাদই আমার জীবন-পথের পরম পাথেয় হবে। তাই সাক্ষাৎমাত্রেই তাঁকে দর্শন করবার জন্য তিনি আমাকে বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং সে নির্দেশ অনুসারেই প্রথম পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের পুণ্যদর্শনলাভে আমি ধন্য হয়েছিলাম। ঘটনাটি এরূপ ঘটেছিল ঃ মহারাজের সামনে থেকে সরে এসে ধীরে ধীরে 'গিরিশ স্মৃতিভবনের' তলায় দক্ষিণদিকে বারান্দায় আমি উপস্থিত হলাম। মহাপুরুষ মহারাজ তখন সে বারান্দাটিতেই বসেছিলেন। সেখানেই আমি তাঁকে প্রথম দর্শন করলাম। নিকটে গিয়ে প্রণাম করবার পর তিনি প্রশ্ন করেছিলেন—শ্রীমহারাজকে দর্শন করেছি কিনা। আমি বলেছিলাম—“করেছি।” তদুত্তরে তিনি মৃদুহাস্যে বলেছিলেন—“মহারাজকে দর্শন করলে মঠে আর কাহাকেও দর্শন করবার প্রয়োজন হয় না।”

১৯২২ খ্রিস্টাব্দে রাজা মহারাজের মহাসমাধির কয়েকদিন পরে রামকৃষ্ণসঙ্ঘে যোগদানের সৌভাগ্য আমার জীবনে উপস্থিত হয়। আমি সংসারত্যাগ করে সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করি। এরপর ১৯২২ থেকে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত যে কাল, সে কালটিতে পরমপূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের স্নেহচ্ছায়ার মধ্যেই আমি লালিত, পালিত ও বর্ধিত হয়েছিলাম!...

এখন আমার মঠজীবনের প্রথমদিকের দু-একটি কথা বলছি। আমি তখন মেদিনীপুরে, রামকৃষ্ণ মিশনের একজন কর্মিরূপে মেদিনীপুরের একটি কেন্দ্রে কাজ করি। মঠে তখন এক বিরাট পুকুর কাটা হয়েছিল। মেদিনীপুরের শ্রীগ—বাবু একটি নূতন মাছ-ধরবার জাল দিয়ে দিলেন মঠে পৌঁছে দেবার জন্য। আমি জালটি নিয়ে মঠে এসেছিলাম। শ্রীগ—বাবু মহাপুরুষ মহারাজের শিষ্য ছিলেন। সুতরাং জালটি মহাপুরুষজীর ঘরে রেখে তাঁকে বলেছিলাম, “মহারাজ, আপনার শিষ্য শ্রীগ—বাবু এই জালটি পাঠিয়েছেন মাছ ধরবার জন্য।” “আপনার শিষ্য” কথাটিতে মুহূর্তে তাঁর ভাবান্তর ঘটেছিল। তিনি আমাকে মৃদু ভর্ৎসনা করেছিলেন। বলেছিলেন, “ও কথা বলিসনি। আমি কারুর গুরু নই। কেউ আমার শিষ্যও নয়। সবই ঠাকুরের। সবাই তাঁর সন্তান। আমি শুধু পরিচয় করিয়ে দিই, বুঝলি।”

আর একদিন, তখন আমরা যুবক-কর্মীরা, কেউ কেউ 'গিরিশ স্মৃতিভবনের' নিচের তলায় বাস করি, উপরে থাকেন মিস ম্যাকলাউড, যাঁকে আমরা আদর করে 'টানটিন' বলে ডাকতাম। একদিন গভীর রাত্রে একটি চোর টানটিনের ঘরে ঢুকে তাঁর গলার 'নেকলেসটি' ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে। টানটিন টের পেয়ে চেঁচিয়ে

উঠতেই আমরা দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ি এবং চোরটা সিঁড়ির মুখেই ধরা পড়ে। আমিই তাকে বেশ কিছু উত্তম-মধ্যম দিয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেললাম। তারপর রাত্রি ভোর হতেই তাকে ধরে নিয়ে জ্ঞান মহারাজের ঘরের রোয়াকের সামনে বসিয়ে রাখলাম। তখনকার দিনে মহাপুরুষ মহারাজ প্রতিদিনই ধ্যান-জপ সেরে একটি লাঠি হাতে সমস্ত মঠবাড়ি ঘুরে দেখতেন। ঐ সময়, বিশেষ করে মঠের গরুগুলিকে তিনি পর্যবেক্ষণ করতেন। এটি তাঁর নিত্যকার অভ্যাস ছিল। সেদিনও যথাসময়ে তিনি বেড়াতে যাচ্ছিলেন। তাঁকে চোরের কথা বলতে তিনি রহস্য করে চোরকে বলেছিলেন, "হ্যাঁরে, এখানে চুরি করতে আসতে হয়? ছেলেরা চাঁদা করে মার দিলে যে তুই মরে যাবি!" একথা বলেই তিনি ভ্রমণে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই ভ্রমণ শেষ করে নিজের ঘরে বসে যখন তিনি প্রাতরাশ খাচ্ছেন তখন টানটিন খটখট করে এসে বললেন, "মহাপুরুষ মহারাজ, শুনেছেন আমার ঘরে একটা চোর ঢুকেছিল। আমার মনে হয়, চোরটি ভক্ত। তা না হলে ঘরে কত জিনিস ছিল, সেসব না নিয়ে আমার গলার নেকলেসটা নিতে যাবে কেন? আপনি তো জানেন, ঐ নেকলেসটার মধ্যে স্বামীজী-প্রদত্ত 'লকেটটি' আছে। আমার বিশ্বাস, সেই লকেটটা নেওয়াই চোরটার মতলব ছিল।" একান্ত সরল বালক-স্বভাব মহাপুরুষ মহারাজ সে কথা বিশ্বাস করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই আমার ওপর আদেশ হলো চোরকে গঙ্গাস্নান করাতে। আমার তখন কি সঙ্কটময় অবস্থা! যাকে রাত্রিতে প্রহার করেছি, দড়ি দিয়ে বেঁধে পুলিসে দেবার মতলবে রেখেছি, তাকেই এখন গঙ্গাস্নান করাতে হবে! দুর্দৈব আর কাকে বলে! কিন্তু মহাপুরুষ মহারাজের আদেশ—পালন করতেই হলো। তিনি তার জন্য একখানি সুন্দর তাঁতের কাপড় ও চাদর পাঠিয়ে দিলেন। চোর গঙ্গাস্নান করল এবং স্নানের পর সেই কাপড় ও চাদর পরিধান করে দিব্যি মঠের মাঠে বেড়াতে লাগল। তারপর কি মনে করে মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করতেও এগিয়ে গেল। তিনি তখন তাকে সস্নেহে জিজ্ঞেস করলেন, "কি রে, সাধু হবি?" চোর কি উত্তর দিয়েছিল সে কথা আর এখন মনে নেই। তার উত্তর-জীবনে মহাপুরুষ মহারাজের সেই প্রশ্ন কোন অর্থে রূপায়িত হয়েছিল কিনা তাও জানি না। তবে মহামানবের করুণা এবং শুভ-কামনা কখনও ব্যর্থ হয় না। হয়তো, সেই চোরের জীবনেও ঐ প্রশ্নটি কোন-না-কোন পর্যায়ে ফলপ্রসূ হয়ে থাকবে।...

আবার মেদিনীপুরের কর্মজীবনের কথায় ফিরে যাচ্ছি। সেখানে থাকবার সময় একবার প্রবল ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়েছিলাম। মিশনের সেকালের কর্মসচিব স্বামী শুদ্ধানন্দজীর আদেশে পরে আমাকে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আসতে হয়েছিল। প্রথমে 'অদ্বৈত আশ্রমে', পরে 'উদ্বোধনে' আমার চিকিৎসা হয়। শরীর তখন অত্যন্ত জীর্ণ, স্বাস্থ্য প্রায় ভেঙ্গে পড়েছে। সামান্য ঝোলভাতও হজম হতো

না। এমনি অবস্থায় ৺কালীপূজার পরদিন মঠে গেছি। মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করতেই তিনি আমাকে অসুখের কথা জিজ্ঞেস করলেন। আমার শরীর মন তখন খুবই দুর্বল। হতাশা যেন আমাকে চেপে ধরেছে। আমার কথায়ও সেই হতাশার সুর প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গে গভীর স্নেহে আশ্বাস দিয়ে বললেন, "অত ভেঙ্গে পড়ছিস কেন? নিরাশ হবার কি আছে?" তারপর জিজ্ঞেস করলেন আমি 'উদ্বোধনের' কোন্ ঘরটাতে আছি। আমি বলেছিলাম—"ঢুকবার পথের ডানদিকের ছোট ঘরটিতে আমি থাকি।" তিনি বলেছিলেন, "ঠিক হয়েছে। উপরে মা খাটে ঘুমোন, তুমি ঠিক নিচে আছ। কোন ভয় নেই। যাও, নিচে যাও। রাত্তিরে ৺কালীপুজো হয়েছে, প্রসাদ আছে, মহাপ্রসাদ খাও গিয়ে।" আমি শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলাম। সামান্য ঝোলভাত তখন হজম হয় না। বাসি খিচুড়ি ও মহাপ্রসাদ খেলে কি অবস্থা হবে! তিনি বুঝতে পেরে দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, "যা মায়ের প্রসাদ খাগে, কিছু হবে না।" একে গুরুর নির্দেশ, তার ওপর নিজেরও বোধ হয় কিছুটা লোভ ছিল, তাই প্রসাদ খেলাম। এবং খাওয়াটা কিছু বেশিই হয়ে গেল। কিন্তু বিচিত্র এই যে, সেদিন বিকেলে জ্বরও হলো না, পেটেরও কোন গোলমাল হলো না। অথচ বেশ কিছুদিন যাবৎ রোজ বিকেলে আমার জ্বরও হতো, অম্বলের ভাবও দেখা যেত। এর কয়েকদিন পর মঠে গিয়ে তাঁকে এই ঘটনার কথা বলেছিলাম। তিনি হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, "কেমন, আমি জানতাম কিছু হবে না। মা উপরে রয়েছেন, নিচের ঘরে তুই রয়েছিস, আমি জানতাম তুই ভাল হয়ে যাবি।"...সেইদিনই কথাপ্রসঙ্গে বললেন, "পুরী যা, পুরী থেকে বায়ু পরিবর্তন করে আয়। চক্রতীর্থে বিজয়গোপাল আশ্রম করেছে। আমায় অনুরোধ করেছে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু আমি কি করে যাব! তুই যা। ওই যে কুলুঙ্গীতে ঠাকুরের ফটো রয়েছে, ওখানা নিয়ে গিয়ে আমার নাম করে সিংহাসনে বসিয়ে দিবি। তা হলেই হবে।" আমি চুপ করে দাঁড়িয়েছিলাম। ভাবছিলাম আমার কাছে টাকা নেই, কিভাবে যাব! তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পেরে বলেছিলেন, "দ্বিজেনকে বল, যাতায়াতের খরচ দিয়ে দেবে।" যথাসময়ে পুরী আশ্রমের দ্বারোদ্ঘাটনের সময় আমি যোগদান করেছিলাম। মনে আছে সন্ধ্যারতির পর সদলবলে গৌরী-মা আশ্রমে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং আমি একখানা কীর্তনগান শুনিয়েছিলাম, গানটি ছিল—

'যাকে দেখলে পরাণ নেচে ওঠে
হরির নাম আপনি ফোটে
অমন মনের মানুষ মিলে কই?'

গানটি শুনে বৃদ্ধা তপস্বিনী আমাকে অজস্র আশীর্বাদ করেছিলেন।

* * *

১৯৩২ সালের মধ্যভাগে আমার উপর রেঙ্গুন সেবাশ্রমে যাবার আদেশ হয়। স্বামী শ্যামানন্দের কাছ থেকে ধীরে ধীরে কাজকর্ম বুঝে নিয়ে অদূর ভবিষ্যতে আমাকেই ঐ সেবাশ্রমের ভারপ্রাপ্ত কর্মী হতে হবে—এই ছিল নির্দেশ। ইতঃপূর্বে বঙ্গদেশের বাইরে কখনো কোন কেন্দ্রে কাজ করিনি। ইংরেজিতে কথা বলতেও অভ্যস্ত নই। তাই কিছুটা ভয় এবং কিছুটা সংশয় মনে জেগেছিল। মহাপুরুষ মহারাজের শারীরিক অবস্থাও তখন ক্রমশ অবনতির দিকে যাচ্ছে। সুতরাং তাঁকে ছেড়ে যেতেও মন এগুচ্ছিল না। তাই জাহাজে ওঠবার আগের দিন সন্ধ্যায় তাঁর কাছে গিয়ে কেঁদে ফেলেছিলাম। তিনি অতি মধুর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "কাঁদছিস কেন?" আমি বলেছিলাম, "মহারাজ, আর আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে কিনা জানি না! আমার অত বড় কেন্দ্রের ভার নিয়ে বিদেশে যেতেও কেমন ভয় হচ্ছে।" তিনি সস্নেহে বললেন, "সে কিরে, ভয় কি? কাজ কি তুই করবি? তোর ভিতর দিয়ে কাজ করবেন ঠাকুর। আর আমার শরীরের কথা বলছিস? এই শরীরটাই কি সব? আমার আশীর্বাদ সব সময় থাকবে। শরীর থাকলেও থাকবে, না থাকলেও থাকবে। আর যদি ঠাকুরের ইচ্ছা হয় তবে আবার দেখাও হবে।" এই বলেই পার্শ্বস্থ সেবককে বললেন, "একখানি ভাল কাপড়, একটি সিল্কের জামা ওকে দাও। রেঙ্গুন আশ্রমের মোটর গাড়ি আছে। সিল্কের জামা গায়ে দিয়ে ও মোটরে চড়বে।" ঐ ভালবাসা, ঐ স্নেহ—যার কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি, কিন্তু আজীবন উল্লেখ করলেও যার অন্ত পাব না—সেই স্নেহ-ভালবাসাই আত্মীয়স্বজনের শত বন্ধন থেকে আমাকে সহজে মুক্ত করেছিল। এর পরই রেঙ্গুন চলে গেলাম। তারপর আবার তাঁর কাছে যখন এলাম, তখন তিনি স্ট্রোকের আঘাতে শয্যাশায়ী। রেঙ্গুন থেকে ফেরবার দিনটির কথা মনে পড়ে। সেদিন বন্ধুবর স্বামী বিমুক্তানন্দও মহীশূর থেকে মঠে ফিরে আসেন। আমরা দুজনেই বিকালের দিকে একসঙ্গে তাঁকে দর্শন করতে যাই। সেবকরা বিশেষ করে সাবধান করে দিয়েছিলেন যেন কোন ভাবের আবেগ প্রকাশ না করি। কিন্তু যখন সেই স্নেহময় পিতা, গুরু, জীবনের পরম কান্ডারিকে বাক্‌শক্তিহীন অবস্থায় শয্যার উপর শায়িত দেখলাম, তখন আমরা উভয়েই সহসা কেঁদে ফেলি। আমাদের কান্না তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। তাই করুণায় আর্দ্র হয়ে আমাদের উভয়ের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে ইশারায় আশ্বাস দিয়ে যেন বললেন—"কেঁদো না। ভয় কি? আমি আছি, আমি থাকব।"...

এখন মাঝে মাঝে যখনই তাঁর অনিন্দ্য-সুন্দর মূর্তিটি মনে করি, যখনই তাঁর সস্নেহ আশীর্বাদ কর্ণে ধ্বনিত হয়—তখনই মনে হয় কর্ম মিথ্যা, বাহ্যিক কল-কোলাহল যশ-খ্যাতি সব মিথ্যা, সত্য শুধু তাঁরই করুণা, অক্ষয় শুধু তাঁর কল্যাণ-কোমল স্পর্শটুকু।...

আজ তাই তাঁর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে আমার সমগ্র অন্তরটি দুই করপুটে ভরে অর্ঘ্যরূপে নিবেদন করে আমি কৃতকৃতার্থ হচ্ছি ঃ

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

মহাপুরুষজীর স্মৃতিকথা

স্বামী বিজয়ানন্দ

১৯১৯ সালের অক্টোবর মাসে আমি পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের পদপ্রান্তে প্রথম উপস্থিত হই। সংসারে আমি অল্পবয়সে বাবা ও মাকে হারাই। আমার ভাই বা বোন ছিল না। সুতরাং আমার কৈশোর এবং যৌবনের প্রথমে সত্যিকার ভালবাসা পাইনি। মঠে এসে প্রথম দিন থেকে ঐ ভালবাসা অযাচিতভাবেই পাই। যখন আমি পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালাম, তিনি বললেন, "আহা, তোমার সারারাত খাওয়া হয়নি দেখছি; ও দেবেন, ওর জন্য একটু চায়ের ব্যবস্থা কর।" তাঁর গলার স্বরে ভালবাসা ঝরে পড়ছিল। আমি নিচে নেমে এলাম।...

মাত্র চারদিন মঠে থাকার পর আমার ম্যালেরিয়া হয়। প্রথম দিনেই জ্বর খুব বেড়ে যায়। প্রায় অর্ধচৈতন্য অবস্থায় আমি গেস্ট হাউসের দিকে যাই। আমাকে একজন বা দুজন ধরে নিয়ে যায়। ঐ অবস্থায় আমি কয়েকবার বলেছিলাম, "কি জায়গায় এলাম—মঠ, বেলুড়, হাওড়া?" জ্বর ছেড়ে যেদিন প্রথম পথ্য পাই, সেদিন দেখি এক অদ্ভুত ব্যাপার—পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ স্বহস্তে আমার জন্য মাছের ঝোল রেঁধেছেন! ভাত আর মাছের ঝোল খাবার সময় তিনি হেসে বললেন, "কি পশুপতি, কেমন লাগছে—মঠ বেলুড়, হাওড়া?" অজস্র চোখের জলে বুক ভেসে গেল। এ কি অযাচিত ভালবাসা!

আমি জপ-ধ্যান কি বস্তু তা জানতাম না। মহাপুরুষজী একদিন আমাকে একান্তে ডেকে এই উপাসনা শিখিয়ে দিলেন ঃ "হে ভগবান, অনেকে বলে তুমি আছ, আবার কেউ কেউ বলে তুমি নেই, আমি তোমার সম্বন্ধে কিছুই জানি না। দয়া করে তুমি নিজে আমার অন্তরে তোমার কথা জানিয়ে দাও।" কয়েকদিন সকাল-সন্ধ্যায় ঐ প্রার্থনা করাতে আমার আস্তিক্য-বুদ্ধি ধীরে ধীরে গড়ে উঠল।...

এরপর এল পূজ্যপাদ স্বামীজীর জন্মতিথির সময়। তার দু-তিন দিন আগে একদিন সকালে মহাপুরুষজী যখন ঠাকুরঘর থেকে নিজের ঘরে আসছিলেন, তখন ভাবাবস্থায় সুমিষ্ট স্বরে বলছিলেন, "কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্, রাম রাঘব রক্ষ মাম্।" আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বল দেখি কার কথা।" আমি বললাম, "চৈতন্যদেবের।" তিনি বললেন, "ঠিক বলেছ, যখন তিনি দাক্ষিণাত্যে যান তখন প্রেমোন্মাদে দুই হাত তুলে ঐ বলতে বলতে যান।" ঘরে বসেছেন চেয়ারে। আমি তাঁকে প্রণাম করে উঠবামাত্র বললেন, "তোমাকে দেব, কেন দেব না, তোমাকে নিশ্চয় দেব।" আমি অবাক হয়ে ভাবছি—কি দেবেন! তখন তিনি বললেন, "স্বামীজীর আসছে জন্মতিথিতে তোমাকে ব্রহ্মচর্য দেব।" আমি মহানন্দে তাঁকে প্রণাম করলাম।

কিছুদিন বাদে রাজা মহারাজ মঠে এলেন। মঠের উঠানে তিনি বড় বেঞ্চে বসে তামাক খাচ্ছেন। একে একে সকলে তাঁকে প্রণাম করছে। তখন মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, "রাজা, এ ছেলেটির নাম পশুপতি, এর কথাই তোমাকে লিখেছিলুম, "এ আমাদের সকলকে খুব ভালবাসে।" অহেতুকী ভালবাসা ও দয়ার বিগ্রহ মহারাজ ও মহাপুরুষ মহারাজ আমার জীবন ধীরে ধীরে গড়ে তুলতে লাগলেন।

একবার দারুণ বুকের ব্যথায় ভুগি। একদিন রাজা মহারাজ ও মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে দেখতে আসেন! সঙ্গে দুর্গা ডাক্তার—একজামিন করে বললেন—"হার্ট ভালই আছে—মনে হচ্ছে একটা বড়গোছের 'নার্ভাস শক' পেয়েছে।" তখন শ্রীমহারাজ ও মহাপুরুষ মহারাজ আনন্দিত হয়ে বললেন, "শিগ্‌গির সেরে উঠবে ইত্যাদি।"...

পূজনীয় কালী মহারাজ যখন মঠে এলেন, তখন কিছুদিনের জন্য পূজনীয় মহাপুরুষজী গেস্ট হাউসে বাস করেন। আমি, অনঙ্গ আর দুজন পিছনের ঘরে থাকতাম। রোজ সকালে মহাপুরুষজী বারান্দায় তাঁর মধুরস্বরে গাইতেন, "জাগ সকলে অমৃতের অধিকারী!" আমি হাতমুখ ধুয়ে তাঁর পায়ের তলায় বসে জপ-ধ্যান করতাম। অল্প সময়ে মন স্থির হয়ে যেত এবং খুব আনন্দ হতো। ঐ সময়ে একদিন খুব ভাবের সঙ্গে আমাকে বলেন, "জান, শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে তাঁর নিজস্ব করেছেন। তাঁর কৃপায় আমি ঈশ্বরকোটি হয়েছি। আমার জন্ম-মৃত্যু নেই।"...

কতবার দেখেছি ঠাকুরঘরে মহাপুরুষ মহারাজের ধ্যানমূর্তি। সকলে চলে গিয়েছে, আমি বাইরের বারান্দায় একলা, ভিতরে মহাপুরুষ মহারাজ—তাঁর স্থির নিস্পন্দ দেহ, শুধু প্রেমাশ্রুতে বুক ভেসে যাচ্ছে! একদিন ঐ অবস্থা থেকে উঠে নিজের ঘরে আসবার সময় টলতে টলতে গাইতে লাগলেন—"কে বলে কালী কালো" ইত্যাদি।

একদিন তিনি তাঁর ঘরে চেয়ারে উপবিষ্ট আছেন। আমি তাঁর পায়ের তলায় বসে আছি। ঠাকুরঘরের দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে বললেন, "উনিই মালিক, আমি তাঁর কুকুর, আর তুমি হচ্ছ আমার কুকুর। এইখানে স্থির হয়ে বসে থাক। কখনো নড়ো না।" তারপর এক দোঁহা গাইলেন, "দুয়ার ধনি বস পড়া রহি, ধক্কা ধনি বস খাই। কন ধনিকা নিবাহ হোয়া, দুয়ার ছোড় না যাই।"...

একদিন অনঙ্গের প্ররোচনায় তাঁকে যখন প্রশ্ন করি, "কুণ্ডলিনী যখন ওঠে তখন কি অনুভূতি হয়?" তখন তিনি আমাকে তাঁর নিজের অনুভূতির কথা বলতে বলতে শেষে বললেন, "মা আর বলতে দিচ্ছেন না।"...

কতদিন সন্ধ্যার আগে তিনি যখন মঠে বেড়াতেন, আমি তাঁর সঙ্গে থাকতাম। এই সময়ে অনেকবার তিনি আমাকে বলেছিলেন, "ঠাকুরকে ধরে থাক, ভক্তি মুক্তি সব হয়ে যাবে। তাঁর স্মরণ-মনন করলে চিত্ত শুদ্ধ হয়। জোর করে লেগে যাও। আমি বলছি তোমার সব হয়ে যাবে। তুমি আমাদের ভালবাসা পেয়েছ। মহারাজ তোমাকে কৃপা করেছেন। যাই কর না কেন, কখনও ভুলো না যে তুমি আমাদের আশ্রিত।"...

যতদিন তাঁর শরীর সুস্থ ছিল, মাঝে মাঝে আমাকে তাঁর চিঠি পড়তে ও উত্তর দিতে হতো। একদিন সন্ধ্যার পর আমাকে ডেকে এক চিঠির উত্তর লিখতে বললেন। ঘর অন্ধকার, আমি অফিস থেকে আলো আনতে যাচ্ছি। তখন তিনি বললেন— "ওপর থেকে শুনে যাও। ৩১ নম্বরের চিঠি, অফিসে গিয়ে এই কথা জবাব লেখ।" আমি অবাক হয়ে শুনে ৩১ নম্বরে চিঠি নিয়ে অফিসে গেলাম। সত্যসত্যই ঐ চিঠি। কি অদ্ভুত পর্যবেক্ষণ!

আর একদিন আমাকে বলেন, "বেলা আটটা। ৭।৫৯ মিনিট বা ৮।১ মিনিট নয়।" আমার ঘড়ি ছিল না। তিনি তাঁর নিজের ওমেগা ঘড়ি আমাকে দেন। ঐ ঘড়ি এখানকার ঠাকুরঘরে এখনও আছে।...

একবার শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সময় আমার ওপর পান সাজার ভার পড়ে। আমি প্রথম পানটা খেয়ে দেখলুম চুন খয়ের ঠিক দিয়েছি কিনা। এ খবর কৃষ্ণলাল মহারাজের কানে যেতে তিনি রেগে গিয়ে আমাকে মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে ডেকে পাঠালেন। আমি তাঁর ঘরে পৌঁছে শুনলাম, "মহারাজ, এই ছোঁড়া মহা অভক্ত, ওকে দূর করে দিন। ইত্যাদি।" পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ আমার কথা শুনে বললেন, "কেষ্টলাল, ও তো কোন অন্যায় করেনি। ও মা দুর্গাকে জ্যান্ত মনে করে, যাতে পান খেয়ে তাঁর গাল না পোড়ে সেইজন্য প্রথম পানটা খেয়ে পরীক্ষা করেছে মাত্র। ওতে কোন অপরাধ হবে না।"...

নানান সময় অনেক কিছু অপরাধ করেছি, তাতে তাঁর বকুনিও খুব শুনেছি, মনে কষ্টও হয়েছে, অভিমানও করেছি, কিন্তু তিনি প্রত্যেক বারই বলেছেন; "তোমাদের দোষ-ত্রুটি যদি না শুধরে দিই, তাহলে কেন বেঁচে আছি। ঠাকুর এ জন্যই এই শরীর রেখেছেন।"

এ দেশে আসার দিন আমাকে বলেন, "হয়তো এই দেহে আমাকে আর দেখতে পাবে না। শরীরটা একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছে। মনটাও দেহ থেকে উঠে গিয়েছে, কেঁদো না। যখনই কোন বিপদে পড়ে আমাকে স্মরণ করবে, দেখবে আমি তোমার কাছে আছি। যাও, প্রাণ ভরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ও স্বামীজীর বাণী প্রচার কর। নিজে ধন্য হবে ও জগতের কল্যাণ হবে।"

পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে তাঁর ছেলের মতন দেখতেন এবং সেই ভাবে ভালবাসতেন। তাঁর কৃপায় আজ ধীরে ধীরে অনুভব হচ্ছে—"স ঈশঃ অনির্বচনীয়প্রেমস্বরূপঃ।"

শুভম্

পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতিকথা

স্বামী অজয়ানন্দ

ইংরেজি ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের বর্ষাকালে একদিন বেলুড় মঠ-প্রাঙ্গণে পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজকে প্রথম দর্শন করি। সে সময় তাঁর যে জ্যোতির্ময় মূর্তি, উজ্জ্বল বর্ণ ও স্বাস্থ্য দেখেছি তা পরে আর বেশিদিন দেখতে পাইনি। মাদ্রাজ অঞ্চলের কয়েকটি ভক্তের সঙ্গে তিনি ইংরেজিতে কথা বলছিলেন। মঠের একজন প্রবীণ সাধু মহাপুরুষজীর কাছে আমার পরিচয় দেবার উদ্দেশ্যে বললেন, "এ ছেলেটি University-তে M. A. (বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ.) পড়ছে, পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দ) একে জানেন এবং স্নেহ করেন। তাঁর কাছেই সাধু হবার জন্য মঠে এসেছিল, এখন যদিও লেখাপড়া করছে তবে পরে সাধু হবে—এ ভাবও আছে।"

পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "দেখো, যেন ভেবে ভেবেই life-এর best part (জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ) কাটিয়ে দিও না; সময় থাকতেই উঠে পড়ে লাগতে হয়।" তারপর আবার ভক্তদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।

কাজেই সেদিন আর বেশি কথাবার্তার সুযোগ হয়নি। এর পরেও কয়েকদিন মঠে তাঁকে দেখেছি, কিন্তু কথা বলার বিশেষ সুযোগ পাইনি। তাছাড়া আমি সে সময় পূজনীয় রাজা মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা নেবার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু নানা বাধা-বিঘ্নের জন্য আমার সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি।

পূজনীয় রাজা মহারাজের শরীরত্যাগের পর ইংরেজি ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে কৃপা করে দীক্ষা দেন। এর আগে কথাপ্রসঙ্গে একদিন মহাপুরুষজী বলেছিলেন, "ঠাকুরকে ঠিক ঠিক অবতার বলে যদি গ্রহণ করতে পারো, তবেই এখন দীক্ষা হতে পারে, নয়তো বুঝবো এখনও তোমার সময় হয়নি।" আমি উত্তরে বলেছিলাম, "মহারাজ, অনেক দিন পূর্বেই আমার সে বিশ্বাস হয়েছে, তবে আমার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কয়েকজন ব্রাহ্ম-সমাজের সভ্য, তারা অনেক সময় তর্ক করে আমাকে অন্যরকম বুঝিয়েছিল, কিন্তু ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে পূজনীয় বাবুরাম মহারাজকে দেখা অবধি আমার সে সংশয় চিরকালের জন্য দূর হয়ে গিয়েছে, এখন শ্রীশ্রীঠাকুরকে পূর্ণ-অবতার বলে আমার দৃঢ় ধারণা হয়েছে।"

যা হোক দীক্ষাগ্রহণের পর একটা নূতন জীবনধারা আরম্ভ হলো বলা যায়। এর অল্পদিন পরেই পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ ভবানীপুর গদাধর আশ্রমের তদানীন্তন অধ্যক্ষকে বলে আমার সেখানেই থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। আমি যদিও তখন সরকারি চাকরি করছিলাম, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে কিছু বাধা-বিঘ্ন দূর হলেই চাকরি ছেড়ে সাধু হব—এ সংকল্প আমার মনে ছিল এবং পূজনীয় মহাপুরুষজীও তা বিশ্বাস করতেন। সুতরাং তখন থেকেই আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বা মেসে-হস্টেলে না থেকে যাতে সাধুসঙ্গে থাকি, মহাপুরুষজীর এরূপ ইচ্ছা জেনে আমি সাগ্রহে এ প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলাম।

গদাধর আশ্রমে বাসকালে মঠে ঘন ঘন যেতাম এবং পূজনীয় মহাপুরুষজীর সঙ্গে আলাদা কথা বলার সুযোগও পেতাম। এর দুই-তিন মাস পরেই ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে পূজার পর মহাপুরুষজী কিছুদিন গদাধর আশ্রমে এসে বাস করেছিলেন, তখন তাঁর কিছু সেবা করার সুযোগও পেয়েছিলাম। মহাপুরুষ মহারাজ ভোর চারটার সময় ঠাকুরঘরে বসে অধিকাংশ দিন প্রায় আড়াই ঘণ্টাকাল একেবারে নিশ্চল ও নিস্পন্দভাবে ধ্যানে মগ্ন থাকতেন, সে সময়ে তাঁর বাইরের কোন বিষয়ে, এমন কি নিজের দেহ সম্বন্ধেও কোন হুঁশ থাকত না। আমার সে সময় মনে হতো তাঁর এই ধ্যানের ফলে সেখানে একটা spiritual atmosphere (আধ্যাত্মিক আবহাওয়ার) সৃষ্টি হচ্ছে এবং তাতে পরে বহু ভক্তের কল্যাণ হবে, এই ধারণা

নিয়ে পূজনীয় মহাপুরুষজীর কাছেই পেছনে বসে ধ্যানের চেষ্টা করতাম, কিন্তু এতক্ষণ বসে ধ্যান করা তো দূরের কথা, স্থিরভাবে দু-ঘণ্টা বসাও আমার পক্ষে কষ্টকর ছিল। মহাপুরুষজী বোধ হয় এ কথা বুঝেই একদিন আমাকে বললেন, "তোমাকে এতক্ষণ বসতে হবে না। মনের সঙ্গে কেবল টানাটানি করলেই কি ধ্যান হয়? আগে চিত্তশুদ্ধি, তারপর ধ্যান।"

এ সময়ে একবার তাঁর কাছে বলেছিলাম, "আমি শ্রীশ্রীঠাকুরকে হৃৎপদ্মে উপবিষ্ট কল্পনা করে ইষ্টরূপে ধ্যানের চেষ্টা করি, কিন্তু মাঝে মাঝে মা কালীর মূর্তি, বিশেষত দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের ভবতারিণীর মূর্তি মনে আসে।" তিনি উত্তরে বললেন, "তাতে কোন ক্ষতি হবে না। মা আর ঠাকুর কি পৃথক? শুধু দৃষ্টি রাখবে মন বিষয়বস্তুর পেছনে না যায়।" এ কথায় মনে খুব শান্তি পেয়েছিলাম। কেন না দীক্ষার পূর্বে যখন তিনি বলেছিলেন, "ঠাকুরকে যদি ঠিক ঠিক অবতার বলে গ্রহণ করতে পারো তবেই তোমার দীক্ষা হতে পারে।" তখন থেকেই আমার ধারণা হয়েছিল—অতঃপর শ্রীশ্রীঠাকুর ছাড়া অন্য কোন দেব-দেবীর ধ্যান করা চলবে না।...

* * *

দুবৎসর গদাধর আশ্রমে থাকার পর হঠাৎ আমার স্বাস্থ্য খারাপ হতে লাগল এবং অজীর্ণ ও অনিদ্রা দেখা দিল। তখন একবার চাকরি ছাড়ার প্রস্তাব করে পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজকে পত্র লিখেছিলাম, তিনি বোধ হয় তখন দক্ষিণ-ভারতে ছিলেন। উত্তরে মহাপুরুষজী আমাকে লিখলেন, "চাকরি ছেড়ে এসো না, বরং ছ-মাসের ছুটি নিয়ে আমাদের কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়ে থাকো। শরীর সুস্থ হলে পরে Resignation (কর্মপরিত্যাগের পত্র) দিতে পারো।"

অনেকের পরামর্শে সে সময় দেওঘর বিদ্যাপীঠে গিয়ে চার মাস ছিলাম। শরীর নিয়ে অতি মাত্রায় ব্যস্ত ছিলাম এবং খাদ্য ও পথ্য সম্বন্ধে নানারকম পরীক্ষা ও আলোচনা করা আমার একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। এ নিয়ে সাধুরা কেউ কেউ আমার সম্বন্ধে সমালোচনা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতেন। পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ সে সময় (ইংরেজি ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের শীতকালে) দেওঘর বিদ্যাপীঠে ছিলেন। তিনি এসব জানতে পেরে আমাকে একদিন বললেন, "এরা অনেকে তোমার অবস্থা হয়তো ঠিক বুঝতে পারছে না। যা হোক, তুমি সেজন্য মনে দুঃখ করো না। এখানকার কর্তৃপক্ষকে বলে তোমার যা একান্ত দরকার সে রকম ব্যবস্থা করে নিও, কিন্তু এসব নিয়ে অন্য কারো সঙ্গে অনাবশ্যক আলোচনা করবে না। শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মনকে রুগ্ণ করে ফেলো না, তাহলে পরে কষ্ট পাবে।"

একথায় যদিও আমার মনের কিছুটা পরিবর্তন হয়েছিল, কিন্তু শরীর সুস্থ না হওয়ায় চার মাস পর দেওঘর থেকে পশ্চিমে পাটনা, কানপুর প্রভৃতি স্থানে কিছুদিন থেকে পুনরায় চিকিৎসার জন্য কলকাতায় যেতে হয়েছিল এবং প্রায় দুবৎসর পুনরায় চাকরিও করতে হয়েছিল। সংসারে আমার কিছু প্রতিবন্ধক ছিল, মহাপুরুষজী তা জানতেন। একদিন আমার কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে কথাবার্তার সময় তিনি আমার সম্বন্ধে ইংরেজিতে বলেন, "What can poor...do? His grandfather refuses to die. (বেচারী কি করতে পারে বলো? এর ঠাকুরদাদা মরবার নামটিও করেন না)। তাঁকে ছেড়ে সে আসতে পারবে না।" এই ৪।৫টি বন্ধু সকলেই গদাধর আশ্রমের member (সভ্য) এবং পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজেরই শিষ্য। তাঁরা এসে আমাকে বললেন, "পূজনীয় মহাপুরুষজী যখন একথা বলছেন তখন মনে হয় তোমার বন্ধনটা শীঘ্রই কেটে যাবে।" সত্যিই এর কয়েক মাস পরেই আমার পিতামহের শরীর যায়।

পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ তখন (ইংরেজি ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে পূজার পরে) কাশীধামে ছিলেন, তাঁকে এ ঘটনা জানিয়ে চাকরি ত্যাগ করে কাশী যাবার ইচ্ছা জানাই। তাতে তিনি উত্তর দেন, "Resignation (কাজে ইস্তফা) দিয়ে এসো না, ছুটি নিয়ে এসো। এখানে এসে কথাবার্তার পর যা হয় স্থির করা যাবে।"

কাশী যাবার পর মহাপুরুষজী আমাকে সংঘে যোগদানের অনুমতি দেন এবং কিছুদিনের জন্য কাশীতে থাকার কথা বলেন। এ সময় প্রায় তিন মাস কাশীতে ছিলাম। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর ঘরে বসে অপূর্ব আধ্যাত্মিক আনন্দ পেয়েছি। এবং আমার অনেক সমস্যার সমাধানও তাঁর কৃপায় হয়েছে—এতে সংশয় নেই। তিনি যে সাধু ও ভক্তদের নানা অতীন্দ্রিয় ভাবে এবং অনেক সময় আধ্যাত্মিক জগতে সাহায্য করতেন তারও কিছু কিছু পরিচয় পেয়ে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করেছি।

কাশী থেকে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে দেওঘর বিদ্যাপীঠে যোগদান করি। গ্রীষ্ম ও পূজার ছুটিতে মাঝে মাঝে মঠে গিয়ে থাকতাম এবং পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের স্নেহ ও আশীর্বাদলাভের অনেক সুযোগ পেয়েছি।

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ২রা জানুয়ারি শ্রীশ্রীমায়ের জন্মদিনে তিনি কৃপা করে আমাকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করেন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের শেষে আমি বিদ্যাপীঠ থেকে মঠে চলে আসি। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ১০ জানুয়ারি স্বামীজীর (স্বামী বিবেকানন্দ) জন্মদিনে পূজনীয় মহাপুরুষজী আমাকে ও আরো ১২ জন ব্রহ্মচারীকে কৃপা করে সন্ন্যাস দেন। তারপর আমি প্রায় এক বৎসর কলকাতা অদ্বৈত-আশ্রমে ছিলাম।

তখন প্রায় প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় মঠে যেতাম এবং সোমবার সকালে অদ্বৈত-আশ্রমে ফিরতাম। এ সময় তাঁর দিব্যসঙ্গলাভ ও সামান্য কিছু সেবা করবার সুযোগ পেতাম এবং মাঝে মাঝে তাঁর কিছু চিঠিপত্র লিখবার ভারও তিনি আমাকে দিতেন।

অনেক সময় আমার পরিচিত প্রবীণ ভক্তদেরও মহাপুরুষজীর কাছে নিয়ে গিয়েছি। অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি কিভাবে আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা তাঁদের মনে শান্তি দিয়েছেন তা প্রত্যক্ষ করে ধন্য হয়েছি। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন তাঁর কাছে দীক্ষাগ্রহণ করেছেন, কিন্তু তিনি গুরুভাবে শিষ্যদের সব ভার গ্রহণ করছেন—এ ভাব কখনও তাঁর মধ্যে দেখিনি। তিনি সর্বদাই যেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরণে তাঁদের সমর্পণ করে দিচ্ছেন এবং এরপর শ্রীশ্রীঠাকুরই তাঁদের সব রকমে রক্ষা করবেন—মনে হয় এই ছিল তাঁর আন্তরিক ভাব।

* * *

কলকাতা অদ্বৈত-আশ্রমে থাকার পর আমার স্বর্গাশ্রমে গিয়ে কিছুকাল একান্ত বাসের ইচ্ছা হয়। কিন্তু আমার স্বাস্থ্য হৃষীকেশে থাকার উপযুক্ত নয় মনে করে মঠ-কর্তৃপক্ষের মধ্যে কয়েকজন তাতে প্রবলভাবে বাধা দিয়েছিলেন। আমি নিরুপায় হয়ে পূজনীয় মহাপুরুষজীকে এক রাত্রে আমার সমস্যার কথা জানালাম। তিনি উত্তরে বললেন, "দেখ, আমার পক্ষে এ বিষয়ে কিছু বলা মুশকিল; আজকাল এখানে Working Committee (কার্যকরী সমিতি) প্রভৃতি হয়েছে, তারাই এ সব বিষয় নিয়ে আলোচনার পর সব ঠিক করে; সুতরাং আমার পক্ষে কিছু না বলাই ভাল।"

আমি উত্তরে বললাম, "মহারাজ, আপনি আমার ইহ-পরকালের আশ্রয়, আমার আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য যা করা উচিত কৃপা করে তা বলে দিন, আমি এ বিষয়ে অন্য কারও সঙ্গে আলোচনা করবো না।" উত্তরে তিনি কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, "নির্জনে তপস্যার আকাঙ্ক্ষা যদি ঠিক ঠিক হয়ে থাকে, তবে কারো কথায় বিচলিত না হয়ে ঠাকুরের উপর নির্ভর করে চলে যাও, তাঁর ইচ্ছায় সব ঠিক হয়ে যাবে।"

ইংরেজি ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে পূজার পর কলকাতা থেকে রওনা হয়ে পথে কাশীতে ১৫।২০ দিন থেকে নভেম্বর মাসে সোজা স্বর্গাশ্রমে গিয়ে উঠলাম। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমি নিজে যা কখনও ভাবতে পারিনি তাই হলো—প্রায় দেড় বৎসর স্বর্গাশ্রমে ছিলাম, কিন্তু ঐ সময়ে কখনও কোন অসুখ বিসুখ হয়নি এবং স্বাস্থ্য আশাতীতভাবে ভাল ছিল, সুতরাং ধ্যান জপ ও পড়াশোনায় সময়ের খুব সদ্ব্যবহার

করা সম্ভব হয়েছিল। পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের আন্তরিক আশীর্বাদের ফলেই যে তা সম্ভব হয়েছিল, এতে আমার আদৌ সংশয় নেই।

ইংরেজি ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের সন্ন্যাসরোগাক্রমণ হওয়ার সংবাদে আমরা কয়েকজন হৃষীকেশ থেকে মঠে চলে আসি। মহাপুরুষজী তখন বাক্‌শক্তিহীন হয়ে পড়েছেন, কিন্তু মুখমণ্ডলের প্রশান্তভাব বিন্দুমাত্র ম্লান হয়নি। আমি গিয়ে প্রণাম করতেই তিনি শুধু বামহাতটি একটু তুলে আশীর্বাদ করলেন। এ সময় মহাপুরুষজীর বয়স প্রায় ৮০ বৎসর হয়েছিল, তিনি যে আরোগ্যলাভ করে আবার কথাবার্তা বলতে পারবেন সে আশা যেন সকলেই ছেড়ে দিয়েছেন বলে মনে হলো, তথাপি কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করে দুমাস মঠে থাকার অনুমতি পেলাম। দুমাস পর কর্তৃপক্ষের আদেশে আমাকে মাদ্রাজে যেতে হলো, সেখানে যাবার ৭।৮ মাসের মধ্যেই শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের মহাসমাধির সংবাদ পেলাম। একটা নিদারুণ বিষাদ ও শূন্যতার ভাব মনকে সে সময় অভিভূত করেছিল, কিন্তু পরে তাঁরই কৃপায় মনে এক অনুভূতি হলো যে, তিনি অতীন্দ্রিয়ভাবে আমাকে সর্বদাই সাহায্য করছেন এবং যে কোন সঙ্কটে আন্তরিক প্রার্থনা করলেই তিনি সব সমস্যার সমাধান করে দেবেন। এ অনুভূতি যে শুধু কল্পনা ও অনুমান নয় তা জীবনের অনেক ঘটনার মধ্যেই উপলব্ধি করেছি।

পূজনীয় মহাপুরুষজীর বালকের মতো সরলতা ও নিরভিমানিতা আমাদের মুগ্ধ করেছে। তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে নানা ভাবের সমাবেশ থাকায় সকলে তাঁকে সহজে বুঝতে পারত না; কিন্তু যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে তাঁর সঙ্গে মিশবার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরাই চিরদিনের জন্য তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। এসব স্মৃতি তাঁদের হৃদয়ে একটি অমৃত-ভাণ্ডারের মতো সঞ্চিত হয়ে আছে। যখনই হৃদয় অবসন্ন ও ভারাক্রান্ত হয়, তখনই এ সকল পুরাতন স্মৃতিকথা তাঁদের সঞ্জীবিত করে।

শ্রীমহাপুরুষ মহারাজজীর পুণ্য স্মৃতিকথা

স্বামী বিশ্বরূপানন্দ

পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজজীর পাদস্পর্শের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সে আজ অনেক বৎসরের কথা—সম্ভবত ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে, অথবা ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকে। প্রথম যেদিন বেলুড় মঠে যাই, দর্শনের জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো। আমার মতো আরও ৫।৭ জন অপেক্ষা

করছিলেন। হঠাৎ সকলেই চঞ্চল হয়ে উঠলেন, চুপি চুপি বলাবলি করতে লাগলেন সকলে, 'উনি নামছেন অর্থাৎ মঠবাড়ির দোতলা থেকে নিচে নামছেন।' মহাপুরুষজী ধীরে ধীরে নেমে এলেন। দেখলাম মাথায় জটা নেই, হাতে চিমটা নেই, কৌপীনমাত্রসম্বল নন। আবার পায়ে চটি জুতো! আমার ভক্তি হলো না। সকলেই তাঁকে প্রণাম করলেন। আমার যতদূর মনে হয়, আমি 'দুত্তোর, ভাল সাধু দেখতে এলাম, এ কি সাধু রে বাবা!' এ জাতীয় কিছু কথা মনে মনে আলোড়ন করতে করতে বোধহয় প্রণাম না করেই প্রস্থান করলাম। এই হলো আমার তাঁকে প্রথম দর্শন।...

কোন কিছু লেখা নেই; হয়তো বা স্মৃতি থেকে লিখছি তা ঠিক বাস্তবতানুগ হবে না। তবুও সংকলকের বিশেষ অনুরোধে কিছু লিখতে হচ্ছে। যা হোক, এভাবে মঠ থেকে চলে এলাম এবং সাধু খোঁজার পালা চলল। নানাস্থানে ঢুঁ মারলাম। ঐ সময়ে পূজ্যপাদ রাজা মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) ছিলেন বোধ হয় ভুবনেশ্বরে। এদিক ওদিক ঘুরলাম কিছুদিন। কোথাও কিছু পছন্দ হলো না। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' পড়েছিলাম। তাই পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ মহারাজকে এক চিঠি লিখলাম। বেশ চমৎকার উত্তর এল। এভাবে কিছুদিন পত্রব্যবহার চলল। একদিন গিয়ে স্বামী সারদানন্দজীর কাছে হাজির হলাম 'উদ্বোধনে'। দেখলাম—জটাজূট ও কৌপীন তো নেই-ই, উপরন্তু মহাগম্ভীর পুরুষ। পরিচয় শুনে বললেন, "বোস।" তারপর সামান্য কিছু কথাবার্তা হলো। তাঁকে কেমন যেন ভাল লাগল। প্রণাম করে ফেললাম। ২।১ দিন তাঁর কাছে যাতায়াত করলাম। আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপা পেতে চাই তা দৃঢ়ভাবে বলাতে, তিনি নিজের কাছে বোধ হয় ২।১ রাত রেখে আমাকে চিঠি দিয়ে বেলুড় মঠে পাঠিয়ে দিলেন। মঠে গিয়ে দেখি—মঠবাড়ির নিচের বারান্দায় পূজ্যপাদ মহাপুরুষজী বসে আছেন। এবার কি ভেবে জানি না, তাঁকে প্রণাম করে ফেললাম। তিনি চিঠি পড়ে বললেন, "বেশ, বেশ, তোমাদের জন্যই তো স্বামীজী মঠ তৈরি করে গিয়েছেন। কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছ, এখানেই থাক। এই তো তোমাদের স্থান।" থেকে গেলাম মঠে। রোজ রাত্রে পূজ্যপাদ মহাপুরুষজীর পা টিপতে যেতাম। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজী সম্বন্ধে কত কথা বলতেন!—তা আজ আর স্মরণ নেই, তবে তাঁর কথা অভিভূত হয়ে শুনতাম এবং মনে হতো এবার ঠিক স্থানে এসেছি। এঁরা ইচ্ছা করলে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিয়ে দিতে পারেন। তাঁর কথা শুনতে শুনতে অভিভূত হয়ে পড়তাম।

একদিন তিনি বলছেন—"সকলেরই একদিন মুক্তি হবে, কেউ বাদ যাবে না।" আমি মুখফোড় লোক, বলে বসলুম, "তবে আর এসব প্রচেষ্টার সার্থকতা কি?

ধ্যানভজন তো করাই দায়। মুক্তি তো একদিন হবেই। এসব হাঙ্গামার তবে আর দরকার কি?” তিনি বললেন, “এই চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র কতবার যাচ্ছে, কতবার আসছে। সৃষ্টি অনন্ত। সেই অনন্তকালের মধ্যে কখন তোমার পালা আসবে, তুমি জান না। সেই অনন্তকাল দুঃখ ভোগ কর, পুনঃপুনঃ জন্ম-মৃত্যু-যাতনা ভোগ কর, রোগ শোক দারিদ্র্য ভোগ কর। এতে রাজি তো? তা যদি না হও তো তাঁকে পাবার চেষ্টা কর। তাঁর কৃপায় এই জন্মেই সমস্ত যন্ত্রণার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে। এটা কি লোভনীয় নয়?” আমি নির্বাক।...

একদিন বিকালের দিকে, তাঁর সামনে বসে আছি। একটি ছোকরা, প্রায় আমারই বয়সী, এসে প্রণাম করে বলল—“আমায় কৃপা করুন।” পূর্বে ঐ যুবকের সঙ্গে কোন কথাবার্তা কোনদিন তাঁর হয়েছিল কিনা জানি না। তিনি তার প্রার্থনা শুনে বলে বসলেন, “দেখ, আমরা কুঁড়ের বাথান তৈরি করিনি। আমাদের কৃপা পেতে হলে শ্রীশ্রীঠাকুর স্বামীজীর কাজ করতে হবে।” যতদূর মনে আছে ছেলেটি বোধ হয় কাজ করতে অস্বীকার করে চলে গেল।

মহাপুরুষজীর কাছে বাস করবার আমার এ সৌভাগ্য বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। তিনি অন্য কর্মকেন্দ্রে আমায় পাঠিয়ে দিলেন, তবু মাঝে মাঝে মঠে আসতাম ও তাঁর শ্রীমুখে শ্রীশ্রীঠাকুরের কত কথা শুনতাম।...

এরপর কাশীতে মহাপুরুষ মহারাজের দর্শনের সৌভাগ্য দু-বার কয়েক মাস ধরে পাই। সে সময় তিনি তপস্যার উপর খুব জোর দিতেন। বলতেন, “দেখ, সারাদিন হই হই করলে কি হবে? নিয়মমত জপধ্যান কর।” ঐ সময়ে একদিন হীরেন মহারাজের কথা উঠল। একজন বললেন, “হীরেন রাজপুরে তপস্যা করছে।” মহাপুরুষজী শুনে খুব খুশি হয়ে বললেন, “দেখ, ছেলেটার ভিতর মাল আছে। খাটছে, ওর হবে।” এর মধ্যেই অপর একজন বলে বসলেন, “না, মহারাজ, সে তো নেমে আসছে।” তিনি শুনেই বললেন, “আরে, এ তো দেখছি মহা হতভাগা, লেগে থাকতে পারে না, ওর কিছু হবে না।” এ সময়ে অপর একজন বললেন, “না, মহারাজ, সে গঙ্গাহীন দেশে থাকবে না। অনুপ শহরে যাচ্ছে।” শুনেই তিনি বললেন, “তাই বল! ছেলেটার গঙ্গাভক্তি আছে, ওর হবে।” এই সময় আমরা তাঁর মুখে ক্রমাগত জপ-ধ্যান ও তপস্যার কথাই শুনতাম; কেউ সেজন্য চেষ্টা করছে শুনলে, তিনি খুব প্রশংসা ও আনন্দ করতেন।...

এর বেশ কয়েক বৎসর পরে, সেবাশ্রম-সংক্রান্ত কোন কাজ শিখবার জন্য আমি কলকাতায় যাই। মঠে গিয়ে মহাপুরুষজীকে প্রণাম করতেই, কেন গিয়েছি শুনেই কেমন যেন গম্ভীর হয়ে বললেন, “তা বেশ।” উৎসাহ দিলেন বলে তো মনে হলো

না। ঐ কার্যোপলক্ষে আমাকে প্রায় ছ-মাসেরও বেশি কলকাতায় থাকতে হয়। প্রতি রবিবারেই মঠে যেতাম। রবিবার মঠে থেকে সোমবার ফিরতাম। আমি গিয়ে প্রণাম করলেই ব্যস্ত হয়ে তিনি জিজ্ঞেস করতেন, "আর কতদিন বাকি?" আমি যথাযথ উত্তর দিতাম। একবার তাঁর ব্যস্ততা দেখে বললাম, "মহারাজ, কাজটা তা হলে ছেড়ে দি।" তিনি বললেন, "না, আমাদের ঠাকুরের তা শিক্ষা নয়। যা ধরেছ, তা শেষ করতে হবে।" আর একদিন গিয়ে প্রণাম করতেই ব্যস্ততা সহকারে জিজ্ঞেস করলেন, "আর কত বাকি?" আমার উত্তর শুনে বললেন, "তোমার সন্ন্যাসটা premature (নিয়মিত সময়ের পূর্বে) হয়ে গেছে। বাবা! কাজের দিকে এত ঝোঁক! এ তো ভাল কথা নয়। দেখ, তুমি কাজ শেষ করে কাশী ফিরবার আগে আমার কাছে কিছুদিন বাস করে যেও। আর দেখ, তোমাকে একটা বিশেষ কথা বলব। সে সময় আমাকে মনে করিয়ে দিয়ে তা জিজ্ঞেস করে নিও।"

পরে কাজ শেষ করে মঠে মহাপুরুষজীর কাছে গিয়ে রইলাম। বোধ হয় একমাস ছিলাম। একদিন দোতলার বারান্দায় তিনি বসেছিলেন। আমি হাতপাখা দিয়ে বাতাস করছিলাম। সেবক শঙ্কর মহারাজ ছাড়া সে সময় অন্য কেউ ছিলেন না। সুযোগ বুঝে আমি জিজ্ঞেস করলাম, "মহারাজ, আমাকে কি বিশেষ কথা বলবেন বলেছিলেন। আপনাকে মনে করিয়ে দেবার কথাও বলেছিলেন।" তিনি বললেন, "ওঃ, হাঁ।" এই সময়ে "ক্ষিতীন্দ্র, তামাক দাও তো" বলে শঙ্কর মহারাজকে সেখান থেকে সরিয়ে দিলেন, আমাকে বললেন "বোস।" আমি তাঁর শ্রীচরণের কাছে বসলাম। তিনি বললেন, "দেখ, বাবা, সাধু হয়েছ, শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপালাভের চেষ্টা করতে হবে। ধ্যানজপই সেই চেষ্টা। দেখ, কাজ, গরিবের সেবা ইত্যাদি ভাল কথা। ওর দ্বারা চিত্তশুদ্ধিক্রমে খানিকটা সাহায্য হয় মাত্র। সব সময় তো ধ্যানজপ করতে পারবে না। তখন কি করবে? সৎকাজ করবে, গরিবের সেবা করবে। হাঁ, নারায়ণজ্ঞানে করবে, তা খুব ভাল। তবে কি জান—সৎকাজ কার্যমাত্র, তোমাকে কিছুটা সাহায্য করতে পারে, সঙ্গে তা যাবে না। যদি ভগবানের নাম করতে পার, সেটাই আসল জিনিস, তাই তোমার সঙ্গে যাবে। এই বাবা, তোমাকে সারকথা বলে দিলাম।" এই বলে মহাপুরুষজী তাঁর দুটি হাতই আমার মাথায় রেখে আশীর্বাদ করলেন। তারপর কাশীতে ফিরে শিক্ষাকরা কাজ আরম্ভ করলাম বটে, কিন্তু এমন ঘটনাপ্রবাহের মোড় ফিরে গেল যে, ঐ কাজ থেকে আমাকে ছিটকে বাইরে পড়তে হলো। এটা কি তাঁরই অমোঘ আশীর্বাদের ফল—কে বলবে?...

একদিন কাশীতে অম্বিকাধামে মহাপুরুষজী ও পূজনীয় কেদারবাবা বসে আছেন। আমি হাতপাখা দিয়ে মহাপুরুষজীকে বাতাস করছিলাম, এমন সময় একজন পাঞ্জাবী

সাধুগোছের লোক এসে কেদারবাবার হাত দেখতে চাইলেন। হাত দেখে তিনি বললেন, "মৃত্যুকালে গুরুকৃপায় ইষ্টদর্শন হবে।" লোকটি মহাপুরুষ মহারাজের হাত দেখতে চাইলেন; তিনি হাসতে হাসতে হাত বাড়িয়ে দিলেন; লোকটি মহাপুরুষজীর হাত দেখে বললেন, "আপকো ব্রহ্মদর্শন হো যায় গা।" মহাপুরুষজী হাসতে হাসতে বললেন, "হোগা, ক্যা জী, বলো 'হো গিয়া'।"

ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতি

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

যিনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাসহচর অন্তরঙ্গ পার্ষদ, স্বামী বিবেকানন্দ-প্রদত্ত 'মহাপুরুষ' যাঁর মহা সম্মানের নাম, সেই পরম পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের সম্বন্ধে কোন কথা বলতে যাওয়া আমার মতো অযোগ্য লোকের বাচালতা বা ধৃষ্টতা মাত্র। এ যেন গন্ধর্ব-রাজ পুষ্পদন্তের ভাষায়—

কৃশপরিণতি চেতঃ ক্লেশবশ্যং ক্ব চেদং
ক্ব চ তব গুণসীমোল্লঙ্ঘিনী শশ্বদৃদ্ধিঃ।
ইতি চকিতমমন্দীকৃত্য মাং ভক্তিরাধাদ্
বরদ চরণয়োস্তে বাক্যপুষ্পোপহারম্ ॥

—হে বরদ। ক্লেশসমূহ দ্বারা ক্লিষ্ট আমার এই সসীম বুদ্ধিই বা কোথায়, আর তোমার অসীম গুণময়ী নিত্যা বিভূতিই বা কোথায়?—এ ভাবনায় ভীত আমাকে একমাত্র ভক্তিই নির্ভীক করে তোমার পদ-যুগলে স্তুতিরূপ পুষ্পোপহার অর্পণ করাল।

১৯২১ খ্রিস্টাব্দের শরৎকালের অপরাহ্নে একদিন আমি ও বরাহনগর অনাথ আশ্রমের তখনকার পরিচালক ব্রহ্মচারী সত্য মহারাজ বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীর দর্শনলাভের জন্য কুঠিঘাট থেকে খেয়া-নৌকায় পার হয়ে বেলুড় মঠের পুরানো দক্ষিণদিকের ফটক দিয়ে বেলুড় মঠের আঙ্গিনায় প্রবেশ করলাম। পুরাতন ঠাকুরঘরে প্রণাম করে মহাপুরুষ মহারাজ গঙ্গার ধারের বারান্দায় বড় বেঞ্চিতে বসেছিলেন দেখে আমরা তাঁকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করতেই তিনি সত্য মহারাজকে আশ্রমের কুশল জিজ্ঞেস করলেন। সত্য মহারাজই আমার কথা বললেন, "এ সাধু হতে এসেছে, শরৎ মহারাজজী আমার কাছে বরাহনগর অনাথ আশ্রমে পাঠিয়েছেন।" শুনেই মহাপুরুষজী খুব খুশি হয়ে বললেন, "বেশ বেশ।"

আমি মহাপুরুষ মহারাজের ঐ আনন্দময় মূর্তি দেখে খুবই মুগ্ধ হলাম। তিনি আমাকে বললেন, "সত্য যেমন যা বলবে তার কথামত কাজ করবে।" তখন তাঁর সেই দিব্যকান্তিযুক্ত দেহ বার্ধক্যবশত একটু সামনের দিকে ঝুঁকে যাওয়া সত্ত্বেও বেশ বলিষ্ঠ সুঠাম এবং সুন্দর মুখমণ্ডল যেন ব্রহ্মজ্যোতিতে উদ্ভাসিত ছিল। ঐ সঙ্গে তাঁর অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি। আমরা বহুদিন সকালে দেখেছি তিনি যখন সাধু ব্রহ্মচারীদের কাছে ঠাকুর-স্বামীজী সম্বন্ধে কথা বলতেন, তখন যেন একেবারে তন্ময় হয়ে যেতেন। তাঁর শ্রীমুখের ঐসব বাণী শুনবার জন্য কলকাতা থেকে নৃপেন্দ্র সাহু প্রভৃতি কয়েক জন ভক্ত নিত্য তাঁর সঙ্গ করতে মঠে আসতেন। তাঁর কথা শুনতে শুনতে শ্রোতাদের সময়ের জ্ঞান থাকত না। অনেক দিন ঠাকুরের কাঁচা ভাণ্ডারের ভাণ্ডারি বসন্ত মহারাজ নিচে থেকে ডাকতেন—"আটটা বেজে গেল, ঠাকুরের তরকারি কাটা হচ্ছে না, কাজকর্ম বন্ধ থাকছে যে।"...

মহাপুরুষ মহারাজ বেলুড় মঠে তাঁর ঘরে থাকতেন, কিন্তু কোথায় কি হচ্ছে তা শুনে যথাবিহিত ব্যবস্থা করতেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর কিংবা ডিসেম্বর মাসে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ যখন আমেরিকা থেকে ভারতবর্ষে এলেন তখন মহাপুরুষজী যে ঘরটিতে বাস করতেন, সেই ঘরখানি অভেদানন্দ মহারাজের জন্য ছেড়ে দিয়ে নিজে গেস্ট হাউসের (নিচের তলার) পূর্বদিকের ঘরটিতে বাস করতে লাগলেন। তখন ও বাড়িতে নিচে কোন পায়খানা বা কলের জল ছিল না। মহাপুরুষ মহারাজ নানা অসুবিধা সত্ত্বেও এ বাড়িতে বাস করতে লাগলেন। তখন ওদিকটায় এত নীরব ও শান্ত পরিবেশ ছিল যে, দর্শনার্থীরা নিঃশব্দে তাঁর ঘরের বারান্দায় বসে থাকতেন। আমরাও তাঁর বারান্দায় গেলে খুব সাবধানে যেতাম, যাতে তাঁর কোন অসুবিধা না হয়।...

১৯২২ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের দেহত্যাগের পর মহাপুরুষ মহারাজ প্রেসিডেন্ট হয়ে একেবারে যেন অন্য লোক হয়ে গেলেন।

তাঁর সেই প্রেমময় আচরণ সকলকে মহা আনন্দে রেখেছিল। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদী জিনিস ছাড়া অন্য কোন জিনিস খেতেন না। একদিন স্বামী বিজয়ানন্দজীকে কোন ভক্ত মহাপুরুষ মহারাজের জন্য কিছু সন্দেশ কিনে দিয়েছিলেন; তিনি সন্দেশ এনে মহাপুরুষ মহারাজের টেবিলের উপর রেখে ঐ সন্দেশের কথা বলাতে মহাপুরুষ মহারাজ সব শুনে বিজয়ানন্দজীকে বলেছিলেন, "তুমি জান আমি প্রসাদী জিনিস ছাড়া কিছু খাই না, তবু ঐসব জিনিস ঠাকুরভাণ্ডারে না দিয়ে এখানে আনলে কেন?" তিনি সব জিনিসই শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিবেদন করে তবে প্রসাদ পেতেন।

একবার রেঙ্গুন কিংবা কোয়ালালামপুর থেকে মেঙ্গোস্টিন এসেছে বাক্সবন্দি হয়ে।

খুলে দেখা গেল সবই প্রায় নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তিনি উপর থেকে তা শুনে নিচে নেমে এসে দেখে বললেন, "এ থেকে কয়েকটা ভাল দেখে ঠাকুরকে দাও—তাঁর ইচ্ছা হয় গ্রহণ করবেন, তিনি অন্তর্যামী; ভক্ত কত আগ্রহ করে পাঠিয়েছে! তোমরা ঠাকুরকে না দিয়েই ফেলে দেবে? তার চেয়ে তাঁকে দেখাও, তিনি ইচ্ছা করলে গ্রহণ করবেন।" আর একদিনের কথা মনে পড়ে—কালিকানন্দ স্বামীর দিদি নানারকম মিষ্টান্নাদি ঘরে তৈরি করে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য নিয়ে এসেছেন। তাঁরা যখন উপরে ঠাকুরদর্শন করতে গেলেন, তখন মহাপুরুষ মহারাজ নিচে নেমে এসে ঠাকুরভাণ্ডারে ঢুকে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কিছু সন্দেশ বা মিষ্টি আছে?" আমি "না" বলাতে তিনি কালিকানন্দ স্বামীর দিদির আনা মিষ্টি থেকে কিছু মিষ্টি নিয়ে ঠাকুরভাণ্ডারের ভিতর যে ঠাকুরের ছবি ছিল সেখানে নিবেদন করে বললেন, "এ থেকে ওদের প্রসাদ দিও।" ভক্তদের প্রতি তাঁর কি করুণাই না ছিল!...

শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীর এক শুভ জন্মতিথিতে আমরা নিত্যকার মতো তাঁকে প্রণাম করতে গিয়েছি। তিনি সেদিন নতুন কাপড় পড়ে বসে আছেন, জনে জনে তাঁকে প্রণাম করে চলে যাচ্ছেন, এর মাঝে কেউ দু-একটি কুশলপ্রশ্ন তাঁকে করছেন। আমি তাঁর কাছে প্রার্থনা করলাম, "মহারাজ, আশীর্বাদ করুন যাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি হয়।" তিনি খুব প্রসন্ন হয়ে বললেন, "হ্যাঁ, তোমাদের তো ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি আছেই, তবে তো তাঁর কাছে এসেছ। তিনিই 'গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ। প্রভবঃ প্রলয়স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥' তাঁকে এই ভেবে যদি কেউ সব সমর্পণ করে পড়ে থাকে, তা হলে তিনি দেখবেনই; তোমার কিসে কল্যাণ হবে তা তিনি জানেন। তিনি যে অন্তর্যামী। তিনি যে আমাদের অতি আপনার, তাঁর কাছে না চাইলেও তিনি যা দরকার তা দিয়ে ভক্তের কল্যাণ করেন। আমি তো জানি, যখন যা দরকার তিনিই সব দিচ্ছেন। তোমাদের ভাবনার কিছু নেই। তিনি আছেন বিশ্বাস করো।"...

আর একদিনের ঘটনা। মঠের গরুগুলির তত্ত্বাবধানকারী একজন ব্রহ্মচারী আর ভাণ্ডারি এ দুজনে বচসা হওয়ার পর একজন যখন মহাপুরুষ মহারাজের কাছে গিয়ে জানাল, "মহারাজ, আমি এখানে থাকবো না", তখন মহাপুরুষ মহারাজও খুব শান্ত গম্ভীর হয়ে বললেন, "তা বেশ; তোমার যদি এখানে থাকার ইচ্ছা না হয় থাকবে না। তবে তোমাকে বলে রাখছি, এখান থেকে তোমাকে কেউ তো ডেকে আনতে যায়নি। তুমি ঠাকুরকে ভালবাস, আমাদের শ্রদ্ধা কর, তাই না এখানে ঠাকুরের আশ্রয়ে এসেছ। কে কি বললে তাতেই যদি ঠাকুরের আশ্রয় থেকে আমাদের সঙ্গ ছেড়ে চলে যেতে চাও তো যাও। কিন্তু কোথায় যাবে? কোথায়

ঝগড়া-কলহ নেই? সকলেই যদি নিজের নিজের চরকায় তেল দেয় তা হলে সব চরকাতেই তেল পড়ে, তখন চরকাতে আর আওয়াজ হয় না।” মহাপুরুষ মহারাজের এই উপদেশ শুনে এবং এই স্বাধীনতা দেওয়ার পর তারা দুজনেই বেলুড় মঠেই থেকে গেল।

মহাপুরুষজী একদিন বললেন, “দেখ, তোমরা কি উদ্দেশ্য নিয়ে কথা বল, কে কি কর তা আমি জানি। তোমাদের কার কি মনোভাব তা বুঝতে পারি। তবুও অনেক রেখে ঢেকে বলতে হয়, যাতে তোমাদের কল্যাণ হয় তেমন কথাই তোমাদের বলি।”

দীর্ঘদিন মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গ করার সৌভাগ্য হলেও তখন সেই প্রত্যক্ষ দেবতাকে আমি চিনতে পারিনি। এখন যত দিন যাচ্ছে ততই ভাগবতের কথার মতো মনে হয়—চাঁদের উজ্জ্বল প্রতিবিম্বের সঙ্গে মৎস্যকুল খেলা করে এবং মনে করে চন্দ্র তাদেরই মতো একজন। আমার অবস্থাও বাস্তবিক তাই। এখন যখনই গীতা পড়ি তখনই অনুভব করি গীতায় স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ যা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছেন, কিংবা গুণাতীতের লক্ষণ যা বলেছেন তা মহাপুরুষ মহারাজের জীবনে পরিস্ফুট দেখতে পাওয়া যেত। শ্রীশ্রীঠাকুরের উপর তাঁর অচল অটল বিশ্বাস দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছি, শ্রীশ্রীঠাকুরকে ভক্তি করতে শিখেছি।...

শাস্ত্রে আছে “জিতং সর্বং জিতে রসে।” আমরা দেখেছি মহাপুরুষ মহারাজকে অতি উপাদেয় খাদ্য দিলেও তিনি তার অতি সামান্যমাত্রই গ্রহণ করে সে জিনিসের তারিফ করে বলতেন, “বা! বেশ, বেশ।” তিনি স্বল্পাহারী ছিলেন। তাঁর জন্য পৃথক যে ঝোল রান্না হতো, স্বামী সারদানন্দজী রহস্য করে সেই ঝোলের নাম দিয়েছিলেন ‘মহাপুরুষের ঝোল।’ কারণ তাতে সামান্য নুন ও আদার রস ছাড়া অন্য কোন মসলা দেওয়া হতো না। তিনি কিন্তু সেই ঝোল খুব তৃপ্তির সঙ্গে খেতেন। যে জিনিস যত উপাদেয় হতো সে জিনিস তিনি তত কম পরিমাণে গ্রহণ করতেন। রসনা-সংযম আমরা প্রত্যক্ষ করেছি তাঁর জীবন দেখে।

আমাকে তিনি যথেষ্ট স্নেহ করতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলতে পারি—একবার স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ (হরিশ মহারাজ) আমাকে ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের কর্মী করে বেলুড় মঠ থেকে নিয়ে যাবার জন্য তদানীন্তন সম্পাদক স্বামী শুদ্ধানন্দ মহারাজকে বলে ঠিক করে ফেলেছিলেন। ঢাকা রওনা হবার দিন স্বামী শুদ্ধানন্দজী সকালে মহাপুরুষজীকে জানাতেই তিনি এককথায় বলে দিলেন, “না, শুদ্ধকে ঢাকা পাঠানো চলবে না, অন্য কাকেও পাঠাও।” তাঁর পূতসঙ্গচ্যুত হতে হলো না ভেবে আমিও খুবই আনন্দিত হলাম। তিনি যেমন গম্ভীর, তেমন প্রাণখোলা আলাপও করতেন।

তাঁর উপদেশের মধ্যে কোন সংশয় থাকতো না। তাঁর সেই স্নেহ-ভালবাসা জীবনে ভুলবার নয়। যা তাঁর স্মৃতি তার তুলনা দেবার কোন দৃষ্টান্ত নেই। তাঁর স্মৃতি আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে পরিচালিত করুক, ইহাই তাঁর শ্রীচরণে প্রার্থনা। কোথায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদ শিবতুল্য স্বামী শিবানন্দ মহারাজ আর কোথায় আমার অসমর্থ লেখনীর অযোগ্য লেখা স্মৃতিকথা!

সুবিখ্যাতো গুণাতীতো মহাপুরুষো নিশ্চিতঃ।
সর্বপূজ্যো মহামুনিঃ শিবানন্দায় তে নমঃ ॥

শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতিকথা

স্বামী দেবানন্দ

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাসহচর পূজ্যপাদ রাজা মহারাজ—স্বামী ব্রহ্মানন্দ, মহাপুরুষ মহারাজ—স্বামী শিবানন্দ প্রভৃতির স্মৃতিকথা আজ স্মরণ-মনন করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। রাজা মহারাজ ও মহাপুরুষ মহারাজকে আমি প্রথম দর্শন করি বেলুড় মঠে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে। তখন আমার বয়স ১৭ বৎসর মাত্র। মঠে তখন রাজা মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ প্রভৃতি অনেকেই রয়েছেন। সকলকেই সশ্রদ্ধ প্রণাম করেছি এবং তাঁদের স্নেহ-করুণার স্পর্শ পেয়ে ধন্য হয়েছি।

সাধু হবার আকাঙ্ক্ষা নিয়েই বেলুড় মঠে এসেছি জেনে পূজ্যপাদ মহারাজরাও খুশি হলেন মনে হলো। রাজা মহারাজ আমাকে বললেন, "তুই এঁদের সঙ্গে কথা বল, আমি উঠি।" পিতার কাছে সংস্কৃত পড়া ছেড়ে এই অল্প বয়সে মঠে আসার কারণ সম্বন্ধে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজকে আমি সরলভাবে কয়েকটি কথা নিবেদন করলাম। তাঁরা আমার কথা শুনে খুব সহানুভূতি প্রকাশ করলেন।

পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজ আমাকে বললেন, "বেশ তো, সাধু হবে ভাল কথা, পিতার কাছে আরও কিছুকাল শাস্ত্রাদি পড়াশুনা করে এখানে চলে আসবে। তোমার তো ভাগ্য ভাল। ভয় কি? এখন কম বয়স, ফিরে গিয়ে পড়াশুনা কর, পরে এলে তোমাকে রাখা হবে।" উত্তরে আমি বললাম, "ছোটবেলা থেকে মাতাপিতার কাছে ধর্মকথা, শাস্ত্রের কথা শুনে আসছি, কিন্তু জীবন তৈরি

কোথা কই? তাই আপনাদের কাছে থেকেই যদি পড়তে হয় পড়ব। সাধুসঙ্গ ছেড়ে ফিরে যেতে ইচ্ছা হয় না।” তখন মহারাজরা দুজনেই বললেন, “মঠে তো সংস্কৃত পড়াবার ব্যবস্থা নেই, তবে এই গ্রামে একজন বড় পণ্ডিত আছেন, তাঁর টোলে গিয়ে যদি পার তো পড়, তিনি রাজি হলে পড়া ও সাধুসঙ্গ দুই-ই হবে।” এই বলে বাবুরাম মহারাজ নিজেই একটু হেঁটে গিয়ে আমাকে পথ দেখিয়ে দিলেন। আমি যেতেই পণ্ডিতমশাই নামধাম পরিচয় নিলেন এবং ওখানে পড়ার উদ্দেশ্য জেনে রেগে গিয়ে বললেন, “আমি তোমার পিতা আশুতোষ স্মৃতিতীর্থ মশায়কে জানি ভালভাবেই। তিনি বিখ্যাত পণ্ডিত। কত ছাত্র তাঁর, তাঁকে ছেড়ে তুমি আমার কাছে পড়বে? আমি এক্ষুনি তাঁকে সংবাদ দিচ্ছি তোমাকে মঠ থেকে ধরে নেবার জন্য।” আমি এই কথায় হতাশ হয়ে মঠে ফিরে এসে মহারাজদের জানালাম। তাঁরা বললেন, “এবার বাড়ি ফিরে যাও, আরও কিছুকাল পড়াশোনা করে চলে আসবে, কেউ তোমাকে বেঁধে রাখতে পারবে না।”

কয়দিন বেলুড় মঠেই বাস করলাম মহারাজদের সৎসঙ্গলাভের আশায়। ইতোমধ্যে জনৈক আত্মীয় আমাকে নিতে এসেছিলেন। আমি মহারাজদের শুভাশীর্বাদ নিয়ে দেশে যাত্রা করলাম। যেতে যেতে মনে হলো আর কখনও বাড়ির কাছাকাছি কোন মঠেই যোগ দেব না। দূরেই যাব, যাতে কেউ কোনও সন্ধান না পায়। বৎসরাধিক কাল পিতার কাছে আবার সংস্কৃত পড়ে পরীক্ষা দিলাম। উত্তীর্ণ হলেও নির্জনে সাধন-ভজন ও সাধুসঙ্গলাভের আকাঙ্ক্ষায় মনপ্রাণ আবার ব্যাকুল হয়ে উঠল। যোগাভ্যাস করার ইচ্ছাও বলবতী হলো। অনেক ধর্মগ্রন্থও পড়লাম। যোগাভ্যাস করব বলে আসামের জঙ্গলে এক পরমহংসের কাছে যাওয়া স্থির করলাম। অন্তরে শ্রীঠাকুরকে অসংখ্য প্রণাম জানিয়ে গোপনে আবার বের হলাম ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের আগস্টে। কলকাতায় বাগবাজারে গিয়ে প্রথমে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন ও প্রণাম করে ৺কামাখ্যা যাই। পরে ঐ যোগীর কাছে গিয়ে যোগাভ্যাস করতে থাকি। কিছুকাল পর পুলিসের লোক সন্ধান পেল এবং আমার এক আত্মীয় পণ্ডিতমশাই এসে তিন দিনের জন্য রিটার্ন-টিকিট করে আমাকে দেশে নিয়ে গেলেন। পরে এক অভাবনীয় ঘটনা হলো। বাড়িতে আমার টিকিট কেড়ে নিয়ে ফেলে দেয়া হলো এবং আত্মীয়স্বজনরা আমাকে একপ্রকার বন্দি করেই রাখলেন।

কিছুকাল পরে আবার তীব্র বৈরাগ্য হওয়ায় ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে, ১৯ বছর বয়সে সংসার ত্যাগ করে একাকী উত্তরাখণ্ডে হিমালয়ের উদ্দেশ্যেই যাত্রা করি। উত্তরাখণ্ডে থেকে ভগবানের আরাধনায় জীবন-উৎসর্গ করার সঙ্কল্প। অনেক কষ্ট, ব্যথা, ভয় ও দুঃখ-বিপদের ভিতর দিয়েই এক সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে

হিমালয়ে উপস্থিত হলাম। পথে হরিদ্বারে বিল্বকেশ্বর পাহাড়ের উপর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম এবং উত্তরাখণ্ডের এক প্রাচীন সাধুর নির্দেশমত হরিদ্বারের কাছে কনখল রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে এসে উপস্থিত হলাম। পূর্বে এই আশ্রমের বিষয় কিছুই আমার জানা ছিল না। স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য আশ্রম-অধ্যক্ষ স্বামী কল্যাণানন্দ সব শুনে আমাকে সাদরে আশ্রয় দিলেন। সুস্থ হয়ে কয়দিন পরে আশ্রমের সেবাকার্যে ব্রতী হই।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে পূজ্যপাদ হরি মহারাজের সঙ্গ করার জন্য তাঁর অনুমতি নিয়ে ৺কাশীধামে আসি এবং তাঁর কাছেই থাকি কিছুকাল। এই সময় লাটু মহারাজকেও মাঝে মাঝে দর্শন করার সৌভাগ্য হয়। হরি মহারাজের হৃদয়স্পর্শী বাণী, জ্ঞান-বৈরাগ্যপূর্ণ উপদেশ ও তাঁর মধুর স্মৃতি আজও আমার অন্তরের সম্পদ হয়ে রয়েছে। দুটি মাস তাঁর সঙ্গ ও একটু সেবা করার সুযোগ লাভ করে ধন্য হই।

১৯১৯ খ্রিঃ অক্টোবরে পূজ্যপাদ রাজা মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) দর্শনাকাঙ্ক্ষায় বেলুড় মঠে যাই, পরে বাগবাজার বলরাম মন্দিরে তাঁকে দ্বিতীয়বার দর্শন করি। তাঁর অহৈতুকী কৃপার আকর্ষণ জীবনে ভুলব না। প্রণাম করার সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "এত দেরি করে কেন এলি? এবার দীক্ষা নিয়ে নে। বল, মার কাছ থেকে নিবি, না আমার কাছ থেকে নিবি? কি ইচ্ছা তোর?" শ্রীমা তখন জয়রামবাটী আছেন জেনে আমি বললাম, "এ সময় ওখানে যাওয়া তো কষ্টকর, পূর্বে কখনও যাইনি, পথও জানি না।" তখন মহারাজ বললেন, "বেশ তো, তোকে আমিই মন্ত্র দেব মঠের ঠাকুরঘরে বসে। তুই মঠে যা, আমি পাঁজি দেখে শুভদিনে গিয়ে তোকে দীক্ষা দেব।" মহারাজ কয়দিন পরে এসে আমাকে বেলুড় মঠের পুরাতন ঠাকুরঘরে দীক্ষা দিলেন। তাঁর অসীম দয়ার পরিচয় পেয়ে কৃতকৃতার্থ হলাম। এক অনাবিল আনন্দে মনপ্রাণ ভরে গেল। জন্মজন্মান্তরের পুণ্যবলেই ঠাকুরের মানসপুত্র রাজা মহারাজের কৃপা পেলাম।

রাজা মহারাজের নির্দেশে আমি মঠেই রইলাম, নিত্যই মহারাজদের প্রণাম ও দর্শনের আনন্দলাভ করেছি এবং বিশেষ করে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের উপদেশ লাভ করে দিনগুলি আনন্দেই কাটতে লাগল। দীক্ষার পরে তাঁকে প্রণাম করতেই মহাপুরুষজী স্নেহভরে বলেছিলেন, "ঠাকুর, মা, স্বামীজী এবং মহারাজ এঁরা সবাই এক। মহাসৌভাগ্যের ফলে তুমি আজ মহারাজের কৃপা পেলে। খুব জপ, ধ্যান, প্রার্থনা করবে। তাঁর কৃপায় জীবন ধন্য হবে। নিত্য সরল, ব্যাকুল প্রাণে তাঁকে ডাকবে। ভজন, কীর্তন ও আরতিতেও নিত্য যোগ দেবে। আমিও এ

বয়সে নিত্য ভোরে গিয়ে ঠাকুরঘরে ধ্যান-জপ করি। তোমরাও করবে।" মহারাজদের জ্ঞান-বৈরাগ্য-ত্যাগ-তপস্যাপূর্ণ জীবন দেখে মুগ্ধ হলাম। কত কৃপাদৃষ্টি, কত স্নেহপ্রীতি তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না! দেখা হলেই কুশল প্রশ্ন করতেন এবং সুন্দর সুন্দর উপদেশ দিতেন। তাঁদের পদধূলি ও আশীর্বাদে মনপ্রাণ আনন্দে পূর্ণ হতো। আজও সেসব আমার জীবনে অমূল্য সম্পদ হয়ে রয়েছে।...

* * *

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে কনখল থেকে কাশী হয়ে ৺দুর্গাপূজা নাগাদ আমি যখন মঠে আসি, তখন মহাপুরুষ মহারাজের একটু পূতসঙ্গ ও আশীর্বাদলাভের সৌভাগ্য হয়। তাঁকে প্রণাম করতেই তিনি কনখল সেবাশ্রম, স্বামী কল্যাণানন্দ ও স্বামী নিশ্চয়ানন্দ প্রভৃতির কথা জিজ্ঞেস করেন। সব শুনে মহাপুরুষজী বললেন, "উত্তরাখণ্ড বড়ই পবিত্র ও সাধনোপযোগী স্থান। গঙ্গা ও হিমালয়ের কি রমণীয় দৃশ্য! কত ঋষি-মুনি, সাধু-সন্ন্যাসী কনখল, হরিদ্বার, হৃষীকেশ প্রভৃতি মহাতীর্থে যুগযুগ ধরে তপস্যা করেছেন এবং এখনও করছেন! কত উন্নত সাধক ও ত্যাগী পণ্ডিত সন্ন্যাসীকে আমরাও দেখেছি। তাঁরা অনেকেই এখন দেহ রেখেছেন। তবে কয়েকজন উন্নত সাধু এখনও আছেন—তোমরাও দেখে থাকবে।

"হিমালয়ের পাদদেশে বাস করে নর-নারায়ণের সেবা এবং সাধন-ভজন করার সুযোগ মহাভাগ্যেই হয়ে থাকে। ঠাকুরের অপার করুণা তোমাদের উপর, তাই এই অল্প বয়সেই সর্বস্ব ত্যাগ করে মোক্ষকামী হয়ে প্রভুর আশ্রয় নিতে পেরেছ। ভগবৎকৃপা লাভ করতে বেশি বয়স, বিদ্যাবুদ্ধি বা পাণ্ডিত্যের আবশ্যক হয় না। চাই শুধু পবিত্রতা, সরলতা, আন্তরিকতা ও ব্যাকুলতা।

"অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। তিনি জীব-জগতের কল্যাণের জন্যই নরদেহ-ধারণ করে এবার এসেছেন। জপধ্যান, পূজাপাঠ, সেবা ও প্রার্থনাদির সাহায্যেই তাঁকে হৃদয়ে উপলব্ধি করতে হবে। তিনিই আমাদের মা, বাপ, গুরু এবং যথাসর্বস্ব। তাঁকেই সর্বদা ধরে থাকবে। শত ঘাতপ্রতিঘাতেও তোমাকে টলাতে পারবে না। চাই অচল অটল বিশ্বাস। জীবনের শত বাধা-বিঘ্ন তিনিই দূর করে দেবেন। তিনিই জীবন্ত, জাগ্রত দেবতা। তিনিই যুগাবতার। তিনি সর্বদাই আমাদের হাত ধরে আছেন, চিন্তা বা ভয়ের কোনই কারণ নেই। জানবে শ্রীভগবানেরই বাণী ঃ 'ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি'—তাঁর ভক্তের কদাপি বিনাশ নেই। যে ঠিক ঠিক ডাকে, সেই তাঁকে পায়। তবে তাঁর কৃপাই হচ্ছে মূল! তিনি বড় দয়াময়। শুধু কাতর প্রার্থনায় তিনি ধরা দেন।" মহাপুরুষজীর এই সব অমৃতময়ী বাণী শুনে পরম তৃপ্তি লাভ করলাম। সশ্রদ্ধ প্রণাম করে তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে সেদিন নিচে এলাম।...

রাজা মহারাজ ভুবনেশ্বর চলে যাওয়ায় তিনি ১৯২০ খ্রিঃ ১২ জানুয়ারি পৌষ কৃষ্ণা-সপ্তমীতে আমাকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করার জন্য পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজকেই ভার দিলেন এবং আমাকেও রাজা মহারাজ এ বিষয় পত্রে জানালেন। আমি সানন্দে স্বামীজীর শুভ জন্মতিথিতে আরো কয়েক জনের সঙ্গে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের কাছ থেকেই ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণ করলাম। তিনি খুশি হয়ে নাম দিলেন ব্রহ্মচারী বৈরাগ্যচৈতন্য। ঐ শুভদিনে তাঁর অফুরন্ত আশীর্বাদ লাভ করে কৃতার্থ হলাম।

ঐ ব্রহ্মচর্যব্রতানুষ্ঠানের পূর্বে একদিন মহাপুরুষজী আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে নেন। গিয়ে দেখি তিনি যেন ভাবস্থ হয়ে বসে আছেন। কিছু পরে নিজে নিজেই ভাবাবেশে শিবমহিম্নস্তোত্র আবৃত্তি করলেন। পরে আমি তাঁকে প্রণাম করতেই আমাকে তাঁর সামনে বসতে বলে বললেন, "দেখ, আমি যুগাবতার শ্রীঠাকুরের পদাশ্রিত দাস, তাঁর ইচ্ছাতেই তোমাকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করব এই শুভদিনে। তোমাকে ব্রহ্মচর্য দেবার জন্য রাজা মহারাজও ভুবনেশ্বর থেকে আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। শুদ্ধ পবিত্র মনেই শ্রীঠাকুরের প্রতিবিম্ব পড়ে। সরল ও শুদ্ধ জীবনেই তাঁকে জানা যায়। ব্রহ্মচর্য ও ত্যাগ-তপস্যাই প্রকৃত শান্তির পথ দেখাতে পারে। তাঁকে পাবার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে হবে। দেহ, মন, প্রাণ—সবই তাঁর চরণে উৎসর্গ করতে হবে। শ্রীভগবান অর্জুনকে বলেছেন, 'তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।' সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করবে—'ঠাকুর, আমি বিশ্বাস-ভক্তি-জ্ঞান ও বুদ্ধিহীন, আমাকে তোমার দয়া করতেই হবে। বিবেক বৈরাগ্য জ্ঞান ভক্তি ও পবিত্রতা দিয়ে আমাকে পূর্ণ কর।' নিত্য এভাবে তাঁর কৃপার জন্য নির্জনে বসে প্রার্থনা করবে, আর বিবেক-বৈরাগ্য সর্বদা জাগ্রত রাখবে। তাঁকে লাভ করবই—এই হবে জীবনের মূলমন্ত্র।" এরূপ উপদেশ দিতে দিতে তিনি যেন অন্য জগতে চলে গেলেন—গভীরভাবস্থ! কিছু পরে মধুর কণ্ঠে সুন্দর একটি ভজন গান ধরলেন। গানটি শেষ হতেই আবার অন্তর্মুখ অবস্থা, মনে হলো আনন্দ-সাগরে ডুবে আছেন। একটু পরে আমাকে বললেন, "এখন গিয়ে ভিজিটার্স রুমে সাধুদের ভজনগান শোনো। ভজন, কীর্তন শুনলে অন্তরে খুব আনন্দ পাবে। মনটাও শান্ত ও সরস হবে। ধর্মসঙ্গীত ভাবভক্তির খুব সহায়ক। নিত্য ওতে যোগ দেবে এবং পারো তো ওদের সঙ্গে গানও গাইবে।" তখন মঠে সান্ধ্য আরাত্রিকের পর নিত্য ভজন-কীর্তন হতো, আমিও গান খুব ভালবাসতাম। মহাপুরুষজীও সুন্দর গান গাইতে পারতেন। তখন মঠ আনন্দ-মুখর পরিবেশে সর্বদাই পূর্ণ থাকতো। প্রাতে ও সন্ধ্যায় মঠের সাধু ও ভক্ত সবাই গিয়ে ঠাকুরের অন্তরঙ্গ লীলাপার্ষদদের প্রণাম

করতেন। তাঁদের উপদেশ শোনার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতেন। সকলের জন্য তাঁদের হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত থাকতো।

* * *

কিছুদিন মঠবাসের পর মহাপুরুষ মহারাজের আশীর্বাদ ও উপদেশ নিয়ে কনখল রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়ে আবার সেবাকার্যে ব্রতী হলাম। পূজা, পাঠ, সেবা ও ধ্যানজপাদিতে দিনগুলি আনন্দেই কাটতে লাগল।

১৯২১ খ্রিঃ মার্চ মাসে শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথি-উৎসবের পূর্বেই রাজা মহারাজের দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় ৺কাশীধামে এসে সেবাশ্রমে উঠি। তখন রাজা মহারাজ অদ্বৈত আশ্রমে রয়েছেন। পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজ, হরি মহারাজ প্রভৃতিও আছেন। সকলকেই সশ্রদ্ধ প্রণাম করলাম। তাঁরা আমার কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন।

পরে একদিন স্বামী শুদ্ধানন্দ মহারাজ ও স্বামী জগদানন্দ মহারাজকে প্রণাম করতেই তাঁরা বললেন, "তোমার একটি শুভ সংবাদ আছে। তুমি তৈরি হও, রাজা মহারাজ তোমাকে সন্ন্যাস দেবেন। কি করতে হবে না হবে পরে এসে আমাদের কাছে জেনে নেবে।" আমি তো অবাক! বললাম, "আমাকে বুঝি পরীক্ষা করছেন। আমি তো মহারাজকে এ বিষয় কিছু বলিনি।" তখন ওঁরা বললেন, "বেশ, মহারাজের কাছে গেলেই সত্য-মিথ্যা শুনতে পাবে।" পরদিন প্রাতে মহারাজকে প্রণাম করতেই তিনি বললেন, "তুই তৈরি হবি, ঠাকুরের শুভ জন্মতিথিতে তোকে সন্ন্যাস দেব। শুদ্ধানন্দের কাছ থেকে সব জেনে বুঝে নে।" আমি তো অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর অহৈতুকী কৃপার পরিচয় পেয়ে আনন্দে বিহ্বল হলাম।

১৯২১ খ্রিঃ মার্চে (১৩২৭, ফাল্গুন) শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজার রাতে কাশী অদ্বৈত আশ্রমে রাজা মহারাজ আরো কয়েক জনের সঙ্গে আমাকে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত করায় মহানন্দের অধিকারী হলাম। ঠাকুরের মানসপুত্র ব্রজের রাখাল রাজা মহারাজের অপার করুণা লাভ করায় জন্ম ও জীবন সার্থক বোধ হতে লাগল। মহারাজের স্নেহস্পর্শে এবং সরল মধুর উপদেশে আমার অন্তর এক অনির্বচনীয় আনন্দে পূর্ণ হলো। মহারাজের অন্তর্মুখীন ভাব ও সদানন্দময় নির্লিপ্ত অবস্থা দেখে আনন্দ ও বিস্ময়ে অভিভূত হলাম।

ঐ সময়ের একটি ঘটনা চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। মনে হয় কাশী অদ্বৈত আশ্রমে শিবচতুর্দশীর দিনে ঠাকুরের নূতন প্রতিকৃতি-প্রতিষ্ঠার (পটপরিবর্তন) সময় পূজ্যপাদ রাজা মহারাজ, হরি মহারাজ, শরৎ মহারাজ, খোকা মহারাজ প্রভৃতিকে একসঙ্গে দর্শন করার সৌভাগ্য আমার হয়। তাঁরা ঠাকুরের নামকীর্তন করতে করতে নেচে

নেচে সেদিন যেন প্রেমের বন্যা বইয়েছিলেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য! সে উন্মাদনা, সে মধুর ভাব আজও অবিস্মরণীয়। কত সাধু ও ভক্ত পূজনীয় মহারাজদের সেই তন্ময়তা ও সদানন্দময় ভাবাবস্থা দেখে মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছিলেন। সন্ন্যাসের পরে ৺বিশ্বনাথের স্থানে কিছুদিন রাজা মহারাজের দিব্যসঙ্গে কাটিয়ে কনখল সেবাশ্রমে ফিরে এসে সেবাকার্যে ব্রতী হই।

* * *

স্বামী কল্যাণানন্দ মহারাজের বিশেষ আগ্রহে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ কনখল সেবাশ্রমে গিয়েছিলেন; তখন তাঁর গভীর ধ্যানমগ্ন অবস্থা দেখে মুগ্ধ হয়েছি। শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও স্বামীজীর কথা বলতে বলতে তিনি আত্মহারা হয়ে যেতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের মহিমা ও অসীম দয়ার কথা কতই না বলতেন! সেবাশ্রমের সুন্দর শান্ত পরিবেশে তিনি ধ্যান, জপ ও মহাভাবে সর্বদাই যেন মাতোয়ারা হয়ে থাকতেন। তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও জ্ঞান-বৈরাগ্যের পরিচয় পেয়ে সবাই আনন্দিত ও বিস্মিত হতেন। অনেকেই বলতেন, এমন জ্ঞানী ও ত্যাগী তপস্বী দুর্লভ! কি এক অপূর্ব জ্যোতি তাঁর মুখমণ্ডলে প্রতিফলিত হতো! কথার ভিতর কত তেজ, কত আকর্ষণ! তাঁর হৃদয়স্পর্শী অমৃতময়ী বাণী ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির কথা শুনে সাধু-সন্ত ও ভক্তবৃন্দ সবাই মুগ্ধ হতেন। তিনি গীতা, উপনিষদের সার সিদ্ধান্ত সহজ সরল ভাষায় অল্প কথায় সকলকে বুঝিয়ে দিতেন। ঠাকুর-স্বামীজীর অলৌকিক জীবন, ত্যাগ, তপস্যা ও অনুভূতির কথা বলতে বলতে তিনি যেন সমাধিমগ্ন হয়ে যেতেন! পাহাড়-পর্বতে শুধু দৈহিক কৃচ্ছ্রসাধনকে তিনি উচ্চ স্থান দিতেন না। আসক্তি ও অহঙ্কারশূন্য হয়ে সাধন-ভজন এবং সেবাপূজায় যতদিন না মগ্ন হওয়া যায়, ততদিন অন্য তিতিক্ষার বিশেষ মূল্য নেই; ঠাকুরসেবা, দরিদ্রনারায়ণসেবা কোনটিই ছোট নয়, যে মনপ্রাণ দিয়ে করবে, সেই ধন্য হবে; ত্যাগ-বৈরাগ্য, সাধন-ভজন না থাকলে শুধু গেরুয়া পরলে কি হবে?—বলতেন। তিনি আরো বলতেন—এই মহাতীর্থে স্বামীজীর প্রবর্তিত নরনারায়ণের সেবা যারা করবে তারা পরমানন্দের অধিকারী হবে। কল্যাণানন্দ, নিশ্চয়ানন্দ বিশ্বপ্রেমিক স্বামীজীর নির্দেশেই এই আর্তনারায়ণের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছে। কত শ্রদ্ধা, ভক্তি, ত্যাগ এদের, এরা গুরুর আদেশ মাথা পেতে নিয়েছে।

অন্য একসময় মহাপুরুষ মহারাজ বলেছিলেন, "ঠাকুর-স্বামীজী শুধু ভারতের জন্য নয়, সমগ্র পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য এসেছিলেন। তাঁদের অলৌকিক জীবন, ত্যাগ, তপস্যা ও অনুভূতির কথা যারা স্মরণ করবে তারাই ধন্য হয়ে যাবে। আমরা বাবা, তাঁদের ছাড়া আর কিছুই জানি না, আমরা তাঁদের দাসানুদাস।" উত্তরাখণ্ডের

বহু সাধু, ভক্ত ঠাকুরের এই লীলাসহচর আধ্যাত্মিকশক্তিসম্পন্ন মহান পুরুষকে দর্শন করবার জন্য সেবাশ্রমে আসতেন এবং তাঁর জ্ঞানগর্ভ অমৃতময়ী বাণী শুনে পরম তৃপ্তিলাভ করতেন।

কনখলে প্রায় সাত-আট দিন মহাপুরুষ মহারাজের পুণ্যদর্শন ও দিব্যসঙ্গলাভে আমরা ধন্য হয়েছিলাম। মাঝে মাঝে দেখতাম—কী অপূর্ব ভাবগম্ভীর অবস্থা, যেন ধ্যানে তন্ময় হয়ে আছেন! সেবাশ্রমে দু-জনকে সন্ন্যাসদীক্ষা দিয়ে সাতদিন পর তিনি কাশীধামে চলে আসেন।...

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের শেষে কনখল থেকে মহাপুরুষজীকে আমি এক পত্র দিই, তাতে লিখি—আপনি এখান থেকে কাশীধাম চলে যাবার পরে লছমনঝোলার কিছুদূরে গরুড়চটির উপর পাহাড়ের একটি নির্জন মনোরম কুটিয়াতে একাকী থেকে কিছুদিন যাবৎ একটু সাধন-ভজন করছি। আপনি আশীর্বাদ করবেন যেন শ্রীশ্রীঠাকুর ও আপনাদের প্রতি অটল বিশ্বাস, অসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তি রেখে এই দ্বন্দ্বপূর্ণ চিরদুঃখময় নামরূপাত্মক প্রতিভাসযুক্ত জগৎ বিস্মৃত হয়ে ইহজীবনেই সেই নির্বাণ-মোক্ষের অধিকারী হতে পারি। পত্রোত্তরে মহাপুরুষজী জানিয়েছিলেন তাঁর আন্তরিক অফুরন্ত স্নেহাশীর্বাদ এবং লিখেছিলেন—"আমি জানি তুমি নির্জনে পাহাড়ে একাকী তপস্যা করছো, প্রভু তোমাকে সর্বাবস্থায় সর্বত্র দেখছেন, তুমি নির্জনে নিঃসঙ্গভাবে থেকে তাঁর স্মরণ-মনন করে আনন্দে জীবন কাটাও—এই আমার প্রভুর নিকট প্রার্থনা। তোমার ব্যাকুল কাতর প্রার্থনা তিনি অবশ্যই শুনবেন। নির্জনে বেশি কঠোরতা করে শরীরকে কষ্ট দেবে না। তাঁর ধ্যান-জপ-স্মরণ মনন পাঠ ও নামকীর্তনে হৃদয় ভরপুর থাকলে অন্য কোন কিছুই আবশ্যক হবে না। তুমি রাজা মহারাজের কৃপা পেয়েছ, তিনি তোমাকে স্বেচ্ছায় সাদরে দীক্ষা ও সন্ন্যাস দিয়েছেন—তুমি তো মহাভাগ্যবান। তোমার ভাবনা কি? ভক্তি, বিশ্বাস, ত্যাগ, তপস্যা নিয়ে সর্বদা আনন্দে থাকো। ত্যাগ, বৈরাগ্য ও জ্ঞানের আগুন প্রজ্বলিত থাকলে চিন্তা-ভয়ের কোনই কারণ নেই। প্রভু তোমায় বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞান, ভক্তি ও পবিত্রতা দিয়ে পূর্ণ করুন, তাঁর ধ্যানে সর্বদা ডুবে থাকো—এই আমার আন্তরিক প্রার্থনা।"

* * *

আমাদের প্রতি মহাপুরুষ মহারাজের স্নেহ-মমতার অন্ত ছিল না। মনে পড়ে এক সময় বেলুড় মঠে আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়ি। পূজ্যপাদ মহাপুরুষজী আমার জন্য বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ঔষধ-পথ্যাদির ত্রুটি যাতে না হয়, তার দিকেও লক্ষ্য করতেন। একদিন অন্নপথ্য পেতে বেশ দেরি হওয়ায় মহাপুরুষ মহারাজ

নিজেই ছুটে গিয়ে সব ব্যবস্থা করতে অগ্রসর হচ্ছেন দেখে আমরা মুগ্ধ ও বিস্মিত হলাম! তাঁর স্নেহপ্রীতি ও অফুরন্ত আশীর্বাদের তুলনা নেই। শ্রীরামকৃষ্ণসন্তান মহারাজদের কাছ থেকে এত ভালবাসা না পেলে আমার পক্ষে সাধুজীবন যাপন করা সম্ভব হতো কিনা কে জানে? তাঁদের কাছে পিতামাতার স্নেহ পেয়েছি।...

অন্য এক সময়ে কথাপ্রসঙ্গে মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "উত্তরাখণ্ডের সাধুদের তোমার কেমন মনে হলো? তুমি তো অনেক বছর ওদেশের সাধুদের কাছে থেকে এলে।" আমি উত্তরে বললাম, "সাধন-ভজনে কে কতটা উন্নত তা বলা কঠিন। তবে ত্যাগ, তিতিক্ষায় তাঁরা বেশ উন্নত মনে হয়। তাঁরা নির্জনে যে কোন স্থানেই নিশ্চিন্তে বাস করে থাকেন। কোন আসবাবপত্র না থাকায় চোরের ভয়ও নেই। তাঁদের সম্বল শুধু কৌপীন, আঁলখাল্লা, লাঠি ও কমণ্ডলু। কোথাও যেতে হলে কুলি বা গাড়ির কথা ভাবতে হয় না। পোঁটলা-পুঁটলি, তালাচাবি কিছুই তাঁদের নেই। সুতরাং এ বিষয়ে তাঁরা বেশ মুক্ত। আমাদের তো কোথাও যেতে এবং থাকতে হলে অনেক কিছুই ভাবতে হয় এবং নিতে হয়। সব যোগাযোগ না হওয়া পর্যন্ত বের হতেই পারি না। এমন কি তপস্যা করতে গেলেও অনেক লটবহর সঙ্গে নিতে হয়। তাই মনে হয় আমাদের চেয়ে তাঁরা অনেক কষ্টসহিষ্ণু ও অল্পে সন্তুষ্ট; বিলাসীও নয়।" আমার সব কথা শুনে মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, "দেখ, ঐ সবই বাইরের জিনিস, আসল কথা শ্রীভগবানের ধ্যান, জপ, আরাধনা। তাঁর উপর টান ভালবাসা না এলে ঐ ত্যাগের বিশেষ মূল্য নেই। ধ্যানজপ না বাড়িয়ে শুধু কঠোরতা করে শরীরকে কষ্ট দেওয়া আমাদের ঠাকুর পছন্দ করতেন না। ওটা শুধু লোক-দেখানো ধর্মেই দাঁড়িয়ে যায়। অবশ্য যাঁরা যথার্থ ত্যাগী ও আত্মারাম সন্ন্যাসী তাঁদের সম্বন্ধে বলার কিছুই নেই। আর বিশেষত বাঙালি শরীরে এত কঠোরতা সইবে না, কয়দিন পরেই অসুস্থ হয়ে পড়বে, ধ্যানজপ করতেই পারবে না। তাই যার যতটা সয় তার ততটাই করা উচিত। তবে শুধু শরীর শরীর করাও ভাল নয়। সব সময় জীবনের আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য ভগবানলাভ। সেদিকে এগুবার চেষ্টা করতে হবে। কিছু না খেয়ে ল্যাংটা হয়ে ঘোরা ভাল নয়। চাই শুধু জ্ঞান ভক্তি বিশ্বাস বিবেক বৈরাগ্য আন্তরিকতা ব্যাকুলতা। ভগবানের উপর অনুরাগ না এলে কিছুই হবে না, জেনো।" মহাপুরুষ মহারাজের এসব কথায় আমি খুশি হয়ে বললাম, "সাধুজীবনে বিবেক বিচার সংযম এসবই আসল জিনিস, বাইরের কঠোরতার মূল্য খুবই কম, ওতে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী হওয়া যায় না।"

* * *

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের কথা। একদিন মহাপুরুষজী ঠাকুরঘর থেকে এসে তাঁর ঘরে সবেমাত্র বসেছেন এবং আমি তাঁকে প্রণাম করে দাঁড়াতেই আমার হাতে ঠাকুরের প্রসাদ দিলেন, আমি আনন্দে গ্রহণ করলাম। পরে মহাপুরুষজী বলছেন—"ঠাকুরই আমাদের সব, তোমরা তাঁকেই ধরবে; আমরাও তাঁকেই ধরে আছি। ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করলেই সব পাবে। জানবে ভগবানই শ্রীরামকৃষ্ণরূপে জীব-কল্যাণের জন্য এসেছেন। তাঁর সেবা, আরাধনা করলেই সব হবে। তিনিই জগদ্গুরু, তিনিই ভক্তের ভগবান, আমাদের মা বাপ গুরু ও জীবন-সর্বস্ব। তাঁকে যত ডাকবে ততই প্রেম ভক্তি বাড়বে। তাঁর শরণাগত হওয়া ছাড়া আর অন্য উপায় নেই, জানবে তিনি পরম দয়াল। একাকী নিঃসম্বল অবস্থায় হিমালয়ে গিয়ে মাঝে মাঝে তপস্যা করছ—এ পরম ভাগ্যের কথা। উত্তরাখণ্ড দেবদুর্লভ স্থান ও পরম পবিত্র। চতুর্দিকে শান্ত নীরবতা! এইসব স্থানে গেলেই একটা spiritual current (আধ্যাত্মিক শক্তিপ্রবাহ) অনুভব করা যায়। তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গগুলির কি অপূর্ব দৃশ্য! মনে হয় পরমপিতার ধ্যানে যেন সমগ্র জগৎ সমাধিস্থ। তোমার সৌভাগ্য—কম বয়সেই এই সব স্থানে গিয়ে তাঁর আরাধনা করতে পেরেছ।"...

বেলুড় মঠে থাকাকালে কল্যাণেশ্বর মহাদেবের ও দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর পূজা দেবার জন্য আমাকে বিভিন্ন দিনে মহাপুরুষজী কয়েক বার পাঠান। তাঁর নির্দেশমত গঙ্গাস্নানান্তে পূজার দ্রব্যাদি নিয়ে আমি পূজা দিতে যাই। ফিরে এসে তাঁকে প্রসাদ দিই এবং সব কথা বলি। তিনি আনন্দে প্রসাদ গ্রহণ করেন, নির্মাল্য মাথায় দেন এবং 'মা মা' বলতে বলতে যেন ভাবস্থ হয়ে পড়েন। কিছু পরে এই প্রসাদ ও নির্মাল্য আমাকেও দেন। দেখলাম তাঁর কত আনন্দ, কত তৃপ্তি এই প্রসাদ ও নির্মাল্য ধারণ করে! তাঁর এই প্রশান্ত মূর্তি ও সহাস্য বদন আমরা অনেক সময়ই প্রত্যক্ষ করেছি। এরূপ আনন্দময় মহাপুরুষ জীবনে খুবই কম দেখেছি। এঁদের পূত সঙ্গলাভ মহাভাগ্যেই হয়ে থাকে।

শরীরের কথা জিজ্ঞেস করলে মহাপুরুষজী প্রায়ই বলতেন, "ভালই, তবে এ ষড়বিকারশীল শরীরের কোনই বিশ্বাস নাই—এই ভালো, এই মন্দ। পরিবর্তনশীল ক্ষণভঙ্গুর এই দেহ, শুধু তিনিই নিত্য এবং সকল শান্তি ও আনন্দের প্রস্রবণ। আর জানবে, ত্যাগই হচ্ছে ভারতের সনাতন পতাকা।"...

১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকে আমি বেলুড় মঠে এসে কয়েকদিন বাস করি এবং মহাপুরুষজীর দর্শন লাভ করি। তখন তিনি বেশ অসুস্থ, হাঁপানিতে খুবই কষ্ট পাচ্ছেন। একটু কথা বলতেও কষ্ট। দুরারোগ্য ব্যাধির বিষম যন্ত্রণা যে ভাবে হাসি মুখে সহ্য করছেন তা আমাদের কল্পনারও অতীত। এই অবস্থাতেও সকলকে হাত

তুলে আশীর্বাদ করছেন। এত কষ্ট ও ব্যথার মধ্যেও তাঁর মুখ চোখ দেখে মনে হতো, তিনি যেন মহানন্দেই আছেন। যেন কোন যন্ত্রণাই তাঁর নেই। সর্বদাই স্নেহ ও করুণা মাখা দৃষ্টি সবারই উপর।...

আজ তিনি স্থূলদেহে নেই, তাঁর মধুর স্মৃতি, তাঁর অমূল্য উপদেশ আমার অন্তরে অমর হয়ে রয়েছে। আজ শ্রীভগবানের চরণে শুধু প্রার্থনা—

"প্রক্ষাল্য ধূলি-মলিনং তনয়ং স্বকীয়ম্।
ক্রোড়ে নয়াশু জগদীশ কৃপানিধান ॥"

—হে কৃপাময় পরমপিতা! দয়া করে আমার সব মলিনতা দূর করে তোমার নিজ সন্তানকে অভয় ক্রোড়ে শীঘ্র নিয়ে চল।

"জননীং সারদাং দেবীং রামকৃষ্ণং জগদ্‌গুরুম্।
পাদপদ্মে তয়োঃ শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ ॥"

মহাপুরুষ-সংসর্গে

স্বামী অনুপমানন্দ

ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহাপুরুষং শিবকল্পম্।
প্রসন্নবদনং সদ্‌গুরুং ভবকর্ণধারম্ ॥

১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে মাসিক 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'স্বামী বিবেকানন্দ' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করে স্বামীজীর নাম প্রথম জানতে পারি। তখন আমি স্কুলের ছাত্র। ক্রমে জানতে পেলাম কলকাতার অনতিদূরে গঙ্গার অপর তীরে স্বামীজী মঠ স্থাপন করেছেন, সেই মঠে সন্ন্যাসীরা বাস করেন। মাঝে মাঝে সাধু-দর্শনের বাসনা মনে জাগতে থাকে। কিছুদিন পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসব। আমার জনৈক বন্ধু উৎসব দেখতে যাবে বলল। আমার যাবার ইচ্ছা থাকলেও যাওয়া হলো না। বন্ধু উৎসব থেকে ফিরে এলে তার কাছে উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ শুনে খুব আনন্দ হলো।

ঐকালে একদিন 'বিবেকানন্দ সোসাইটির' মাসিক ধর্মালোচনা-সভায় যোগদান করতে গিয়ে দেখি যে একখানি চেয়ারে প্রিয়দর্শন সৌম্যমূর্তি একজন সাধু বসে আছেন এবং এক ভদ্রলোক ধর্মপ্রসঙ্গে বক্তৃতা দিচ্ছেন। বক্তৃতার পরে আমরা সাধুকে প্রণাম করে চলে আসবার সময় অনুসন্ধানে জানলাম যে, চেয়ারে উপবিষ্ট

সাধু শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ পূজ্যপাদ স্বামী প্রেমানন্দ (বাবুরাম মহারাজ)। শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদদের মধ্যে বাবুরাম মহারাজকেই আমি প্রথম দর্শন করি।

এর কিছুদিন পরে আমার জনৈক সহপাঠীর সঙ্গে একদিন আহিরীটোলার ফেরি স্টিমারে পার হয়ে পদব্রজে বিকাল ৪টা নাগাদ বহুবাঞ্ছিত বেলুড় মঠে উপস্থিত হলাম। সে বোধ হয় ১৯১৫।১৬ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মকাল। সাধুদর্শনে খালি হাতে যেতে নেই—'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে' পড়েছিলাম; তাই সঙ্গে সামান্য মিষ্টান্ন নিয়েছিলাম। ঠাকুরভাণ্ডারে মিষ্টান্ন দিয়ে উপরে পুরাতন ঠাকুরঘরে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রণাম করলাম।

ঐ সময়ে মঠবাড়ির পূর্বদিকের বারান্দায় একজন সৌম্যদর্শন দীর্ঘকায় সাধু পায়চারি করছেন দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করে জানলাম তিনি পূজ্যপাদ শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ (স্বামী শিবানন্দ)। নিকটে গিয়ে প্রণাম করতে স্মিতহাস্যে মধুরকণ্ঠে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কোথা থেকে আসছ? কি কর?" ইত্যাদি। যথাযথ উত্তর দিয়ে বললাম, "অনেক দিন থেকে সাধুদর্শনের ইচ্ছা, তাই আজ দর্শন করতে এসেছি।" তিনি বললেন, "বেশ বেশ! মধ্যে মধ্যে আসবে। ঠাকুরদর্শন করেছ? ওখান থেকে একটু প্রসাদ নিয়ে যাবে।" আমরা তাঁকে প্রণাম করে ঠাকুর-ভাঁড়ার থেকে প্রসাদ নিয়ে কলকাতা অভিমুখে রওনা হলাম। এই আমার প্রথম মঠদর্শন এবং শ্রীমহাপুরুষ মহারাজকে দর্শন ও প্রণাম। তাঁকে আমার খুব ভাল লেগেছিল, এই প্রথম দর্শনেই তিনি আমার অন্তর জয় করেছিলেন।

তারপর থেকে মঠে যাবার আকর্ষণ বাড়তে লাগল, ছুটি পেলেই মঠে যেতাম। ঠাকুরঘরে গিয়ে দর্শন ও প্রণামের পর পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করতে যেতাম। পরে নিচে নামলে জ্ঞান মহারাজ কাজ করতে বলতেন—কোনদিন গঙ্গা থেকে বাঁকে করে জল আনা, কোনদিন বাগানে জল দেওয়া, কোনদিন বা মাঠের চোর কাঁটা তোলা। ঐ সময়ে আরও যে সব ছেলেরা মঠে আসত, তারাও ঐসব কাজ আনন্দের সঙ্গে করত। তখন মঠে অনেক সাধুর সঙ্গে আলাপ হয় এবং একটা আত্মীয়তার ভাব গড়ে ওঠে। সাধুদের ত্যাগবৈরাগ্যপূর্ণ জীবন ও বেলুড় মঠের পবিত্র পরিবেশ মনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। মনে হতো ঠাকুরের ঐটুকু সেবা করতে পেরে নিজে কৃতার্থ হচ্ছি। তখন মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে কোন কোন দিন অনেকক্ষণ বসতাম এবং তাঁর কথাবার্তা শুনতাম। সেসব প্রসঙ্গ এখন তেমন কিছুই মনে নেই, তবে তাঁর সব কথার মর্মার্থটুকু মনে আছে—"ঠাকুরই সব। আমরা বাপু, ঠাকুর ছাড়া আর কিছুই জানি না। তিনিই আমাদের সব।" তখন মনে হতো মহাপুরুষ মহারাজ সব ছেড়ে ঠাকুরকেই জীবনের সর্বস্ব

করেছেন। আমারও ঐরূপ করা উচিত। শ্রীভগবানই জীবনের অবলম্বন, সংসারে সারবস্তু। তখনই সব ছেড়ে মঠে যোগ দেবার আকাঙ্ক্ষা জাগত। যাতায়াত করতে করতে মাঝে মাঝে মঠে রাত্রিবাস করার ইচ্ছা হতো। প্রথমে বলতে ভয় পেতাম। একদিন শ্রীমহাপুরুষ মহারাজকে বলতে তিনি সানন্দে সম্মতি দিয়ে বললেন, "এ ঠাকুরের স্থান, এখানে রাত্রিবাস করা খুব ভাল।"

একদিন মঠে রাত্রিতে আছি। প্রিয় মহারাজ আমায় ডেকে বললেন, "তুই গা-হাত-পা টিপতে পারিস?" আমি জানি বলাতে তিনি পূজ্যপাদ খোকা মহারাজের (স্বামী সুবোধানন্দ) খাটের কাছে আমাকে নিয়ে গিয়ে বললেন—"মহারাজের গা-হাত-পা একটু টিপে দে।" পা টিপতে গিয়ে দেখি পায়ের গুলি ও ঊরু বেশ শক্ত। যুবাবয়সী আমারও তখন শরীর বেশ সবল ছিল। আমার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে গা-হাত-পা টেপাতে তিনি আরাম বোধ করতে লাগলেন। সেদিন খোকা মহারাজের সামান্য সেবা করতে পেরে নিজেকে কৃতার্থ মনে করলাম।...

মঠে ৺শারদীয়া পূজা। জনৈক বন্ধুর সঙ্গে মঠে পূজা দেখতে গিয়েছি। বেলা ৮।৯ টা হবে। মণ্ডপের অদূরে দাঁড়িয়ে পূজা দেখছি। পুরাতন ঠাকুরমন্দির ও মঠবাড়ির খোলা জায়গায় হোগলা দিয়ে মণ্ডপ তৈরি হয়েছে। ব্রহ্মচারী হরিপদ পূজক ও স্বামী আত্মানন্দ (শুকুল মহারাজ) তন্ত্রধারক। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে পূজা দেখার পর বেলা প্রায় ১২টার সময় উপস্থিত ভক্তগণের মধ্যে অনেকেই পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছেন দেখে আমারও পুষ্পাঞ্জলি দেবার ইচ্ছা হলো, কিন্তু সকালে জল খেয়েছি তাই কি করব স্থির করতে পারছিলাম না। সে সময় মঠবাড়ির পশ্চিমের বারান্দায় হেলান দেওয়া বেঞ্চে পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দ) বসে ছিলেন। তাঁকে প্রণাম করে জিজ্ঞেস করলাম, "মহারাজ, পুষ্পাঞ্জলি দেবার ইচ্ছা, কিন্তু সকালে জল খেয়েছি।" উত্তরে মহারাজ বললেন, "মায়ের কোলে ছেলে কত হাগে মোতে। তোরা মায়ের ছেলে, জল খেয়েছিস—তাতে কি হয়েছে?" আমরা দুই বন্ধু মায়ের পাদপদ্মে আনন্দে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে ধন্য হলাম। পরে ভোগের পর প্রসাদ পেয়ে বিকেলে কলকাতা ফিরলাম।...

বোধ হয় সেই বৎসরই স্বামীজীর তিথিপূজায় মঠে গিয়েছি। সেদিন রাজা মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ), মহাপুরুষ মহারাজ, খোকা মহারাজ সব মঠে আছেন। তখন স্বামীজীর উৎসব খুব ঘটা করে হতো। মঠের উঠানে আন্দুলের কালীকীর্তন খুব জমেছে। মহারাজগণ সব মঠের পশ্চিমের বারান্দায় হেলান-দেওয়া বেঞ্চে বসে কীর্তন শুনছেন। শেষ হবার আগে "আর কেন মন এ সংসারে, যাই চল সেই নগরে। যেথায় দিবানিশি পূর্ণশশী আনন্দে বিরাজ করে।" এই গানটি সকলে নেচে

নেচে গাইতে আরম্ভ করলেন, তখন এক অপূর্ব ভাবের সঞ্চার হলো। রাজা মহারাজ ভাবে বিভোর হয়ে কীর্তনে যোগ দিয়ে কীর্তনীয়াদের সঙ্গে দুহাত তুলে অপূর্ব নৃত্য করতে লাগলেন। আমরা মুগ্ধনেত্রে ঐ মধুর নৃত্য দেখতে দেখতে দেশকালের কথা সাময়িকভাবে বিস্মৃত হলাম। সেদিনের সেই কীর্তনানন্দের ছবি হৃদয়পটে আজও অঙ্কিত হয়ে আছে।...

সেবার শিবরাত্রির উপবাস করে মঠে গিয়েছি। পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করে বললাম—"আজ রাতে মঠে থেকে শিবরাত্রির পূজা দেখব।" মহাপুরুষজী আনন্দে অনুমতি দিয়ে বললেন, "বেশ বেশ, খুব আনন্দ কর!" স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দ পূজক, চার প্রহরে চারবার পূজা করবেন। পুরাতন ঠাকুরঘরের নিচে খাবার দালানে পূজার আয়োজন হয়েছে। তানপুরা সহ নীরদ মহারাজ ও বাসুদেবানন্দ মহারাজ পূজাস্থানে উপস্থিত হয়েছেন, ভজন গাইবেন। সেই সঙ্গে অন্যান্য সাধুব্রহ্মচারী এবং বিশিষ্ট ভক্তগণও উপস্থিত আছেন। অনেকক্ষণ শিবের গান হলো। গান খুব জমেছিল। শেষ প্রহরে নীরদ মহারাজ শিব সেজে এবং ডাঃ কাঞ্জিলাল ভৈরব সেজে এলেন এবং নেচে নেচে 'তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা, বোম্ বব বাজে গাল' গানটি গাইতে লাগলেন। গান ও নৃত্য চলল, রাত্রি কেটে গেল আনন্দে। হোম হয়ে পূজা শেষ হলো। ভোরে গঙ্গাস্নান করে ঠাকুরপ্রণামান্তে মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করে সকলে পাতা পেতে প্রসাদ পেতে বসলাম। উঠানে সাধু, ব্রহ্মচারী ও ভক্তেরা প্রসাদ পেলেন আর উপরের জানালা দিয়ে মহাপুরুষ মহারাজ দেখে আনন্দ করতে লাগলেন।...

১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যভাগে আমি কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে স্টার থিয়েটারের কাছে বিবেকানন্দ সোসাইটিতে বাস করতে আরম্ভ করি। ঐ সময়ে বাগবাজারে রামকান্ত বসু স্ট্রিটে বলরাম মন্দিরে পূজ্যপাদ শ্রীমহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) ও হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ) থাকতেন। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে ডানদিকের ছোট ঘরে রাজা মহারাজ থাকতেন, আর বাড়ির ফটকে ঢুকে ডানদিকের ঘরে হরি মহারাজ। সুবিধামত তাঁদের দর্শন করতে যেতাম। একদিন সকালে বলরাম মন্দিরে গিয়েছি। নিচে হরি মহারাজকে প্রণাম করে উপরে রাজা মহারাজের ঘরে ঢুকে দেখলাম সেখানে শ্রীমহাপুরুষ মহারাজও বসে আছেন তাঁদের উভয়কে প্রণাম করে দাঁড়াতে সেখানে একজন যুবক সন্ন্যাসী এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা করতে দেখেছি। তাঁকে দেখেই মহাপুরুষ মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন, "কি হে, এত সকালে কোথা থেকে এলে?" উত্তরে তিনি বললেন, "গতকাল কলকাতা এসেছিলাম, মঠে ফিরতে পারিনি, তাই ভু-বাবুর বাড়িতে ছিলাম।" উত্তর শুনে

একটু বিরক্ত হয়ে মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, "এখনই ভক্তবাড়িতে রাত্রিবাস করা!" শ্রীমহারাজের দিকে চেয়ে বললেন, "মঠে বেশ ঠাকুরপূজা করছিল, এরই মধ্যে আবার কলকাতা এসে ভক্তবাড়ি রাত্রিতে বাস করতে আরম্ভ করেছে!" রাজা মহারাজ তাঁর দিকে চোখ তুলে বললেন—"ভোলা, দুষ্টু হচ্ছিস?" ভোলা মহারাজ মাথা নিচু করে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এই মৃদু ভর্ৎসনায়ই তিনি অনুতপ্ত হয়েছেন বলে মনে হলো। আমার তখন মনে হচ্ছিল—মঠের সাধুদের জীবনযাত্রার উপর এঁদের কি সর্তক দৃষ্টি! সন্ন্যাসীর ভক্তগৃহে বাস কল্যাণের নয়।...

আর একদিনের কথা—তখন কিছুদিন ধরে প্রতিদিনই সকালে শ্রীমহারাজের নিকট যেতাম। সকালে তাঁর ঘরে ৺জগদ্ধাত্রীস্তোত্র, ত্রিপুরাসুন্দরীস্তোত্র প্রভৃতি পাঠ হতো। ঐ সময় কয়েকজন যুবকভক্ত এবং একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোকও আসতেন। রাজা মহারাজ নিবিষ্টমনে স্তোত্র পাঠ শুনতেন, ভক্তরাও শুনতেন। স্তোত্রপাঠের পর সম্মুখের দেওয়ালে টাঙানো শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবির দিকে দৃষ্টিপাত করে করজোড়ে প্রণাম করতেন। ঐ সময়ে তাঁর হাত দুখানি থরথর করে কাঁপত এবং পরে হাত চিৎ করে কোলের উপর রেখে ধ্যানস্থ হতেন। আমরাও ঐ সময় সেখানে বসে ধ্যান করতাম। অন্য সময়ে আমাদের ধ্যান হতো না, কিন্তু ঐ সময়ে আমাদের বেশ ধ্যান হতো। সেদিন ধ্যান ভাঙবার পর মহারাজ দক্ষিণের বারান্দায় পায়চারি করতে যাবেন। তাঁর চটিজোড়া তখন উত্তরের বারান্দায় ছিল। ঐ বৃদ্ধ ভদ্রলোক চটিজোড়াটি এনে তাঁর পায়ের কাছে রেখে পাদস্পর্শ করে প্রণাম করতে যেতেই তিনি বিরক্তি প্রকাশ করে পেছনে সরে গেলেন, পাদস্পর্শ করতে দিলেন না। 'কথামৃত'-এ পড়েছিলাম ঠাকুর সকলকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে দিতেন না। যাঁদের দিতেন না তাঁরা অতর্কিতে পাদস্পর্শ করলে যন্ত্রণা অনুভব করতেন। আজ শ্রীমহারাজেরও তাই দেখলাম। কিন্তু আমার মহাভাগ্য যে, আমাকে পাদস্পর্শ করে প্রণাম করতে তিনি কখনও আপত্তি করেননি।

আর একদিন সন্ধ্যার একটু আগে বলরাম মন্দিরে গিয়ে দেখি রাজা মহারাজ ঘরে নেই। জিজ্ঞেস করে জানলাম তিনি ছাদে বেড়াচ্ছেন। তাড়াতাড়ি ছাদে গেলাম, মহারাজ ধীরে ধীরে আপন মনে ভাবস্থ হয়ে পাদচারণ করছেন; কোন দিকে লক্ষ্য নেই। আমি মুগ্ধনেত্রে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম। মন আমার আনন্দে ভরে গেল। পরে আমার দিকে হঠাৎ দৃষ্টি পড়তে জিজ্ঞেস করলেন, "তুই এখানে কি করে এলি? কি চাস?" আমি প্রণাম করে কৃতাঞ্জলি হয়ে দাঁড়িয়ে বললাম, "মহারাজ, কৃপা করে আমায় দীক্ষা দিন।" হেসে বললেন, 'দীক্ষার জন্য অত ব্যস্ত হবি না, সময়ে দীক্ষা হয়ে যাবে।" সেদিন আরও কয়েকটি কথা বলেছিলেন।

আর একদিনের কথা—বলরাম মন্দিরে সকালে গিয়ে দেখলাম সেদিন মহাপুরুষ মহারাজও সেখানে আছেন। দুই মহাপুরুষ একখানা বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসে আছেন। আমি প্রণাম করতেই রাজা মহারাজ আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, "ছেলেটি প্রায়ই এখানে আসে—বেশ ভাল।" মহাপুরুষজী আমাকে আগে থেকেই জানতেন, তিনি বললেন, "হ্যাঁ, ওকে আমি জানি, ও ছুটির দিন প্রায়ই মঠে যায়।" এই ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষদের ঘন ঘন সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য হওয়ায় এবং তাঁদের পদপ্রান্তে বসে ত্যাগ-বৈরাগ্যের কথা শুনে শুনে সব ত্যাগ করে মঠে যোগ দেবার বাসনা বলবতী হলেও তখন মঠে যোগ দেওয়া হয়ে উঠেনি। আমাকে সামান্য কিছুদিনের জন্য অফিসে চাকরি স্বীকার করতে হয়েছিল। সে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের কথা—একদিন মঠে মহাপুরুষ মহারাজকে আমার সমস্যার কথা জানালাম। তিনি সব শুনে কলকাতার জনৈক ভক্তকে তাদের ফার্মে আমাকে চাকরি দেবার জন্য একখানি দীর্ঘ সুপারিশ-পত্র লিখে দিলেন। যদিও নানাকারণে সেখানে আমার চাকরি হয়নি, কিন্তু মহাপুরুষজীর কত দয়া ছিল, তিনি আমাকে কতটা স্নেহ করতেন এবং আমার সততা সম্বন্ধে তাঁর কত বিশ্বাস ছিল—তা সেই সুপারিশ-পত্রের প্রতি ছত্রে ফুটে উঠেছিল!...

সেদিন কোন উপলক্ষে ছুটি ছিল, মঠে গিয়ে দেখি মহাপুরুষজী তাঁর ঘরের দরজার কাছে বসে তামাক সাজছেন। কাছে গিয়ে প্রণাম করে বললাম, "দিন মহারাজ, আমি সেজে দিচ্ছি।" উত্তরে তিনি বললেন, "আরে না, তোমাকে আর সাজতে হবে না। হয়ে গেছে।" তখনও মহাপুরুষ মহারাজের কোন নির্দিষ্ট সেবক ছিল না। খুব সাদাসিধে ভাবে থাকতেন। সকলের সঙ্গে পঙ্গতে বসে আহার করতেন। ভোরে ঠাকুরঘর খোলার পর সেখানে বসে ৭।৭-৩০টা পর্যন্ত ধ্যান করতেন। তারপর নিচে নেমে এসে মঠবাড়ির পশ্চিমের বারান্দায় বা নিজের ঘরে বসতেন, তখন সাধু-ব্রহ্মচারীরা তাঁকে প্রণাম করতে যেতেন।

* * *

১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ১ বৈশাখ। সংসারত্যাগ করার সংকল্প নিয়ে ঐ দিন সকালে বেলুড় মঠে উপস্থিত হলাম। খালি পা। গঙ্গায় হাত-পা ধুয়ে ঠাকুর প্রণাম করলাম। পরে মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করে আমার মঠে যোগদান করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। তারই মাত্র কয়েক দিন পূর্বে রাজা মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) দেহত্যাগ করেছেন (২৫ চৈত্র)। মহাপুরুষজী খুবই শোকসন্তপ্ত প্রাণে উদাসভাবে বসেছিলেন। তাঁর চোখে মুখে ফুটে উঠেছিল গভীর অন্তর-বেদনার ছবি। মহাপুরুষজী হাত নেড়ে একটু আনমনাভাবে বললেন, "মঠে এখন জায়গা নেই।" তাঁর কথা শুনে হতাশায়

ভেঙ্গে পড়লাম। আমাকে বিষণ্ণ দেখে জনৈক সাধু বললেন, "মঠে থেকে যাও, ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে যাবে। রাজা মহারাজের দেহত্যাগে মহাপুরুষজী অন্তরে খুব আঘাত পেয়েছেন, তাই বোধ হয় তোমাকে ওরূপ বলেছেন।" তাঁর কথায় আশ্বস্ত হয়ে আমি তাই করলাম। মঠ-তত্ত্বাবধায়ক প্রিয় মহারাজ কিছু কাজ করতে নির্দেশ দিলেন। মঠে থেকে গেলাম। আমি সব সাধুদের সঙ্গে সকালে মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করতে যাই। প্রণাম করার পর তিনি আমাকে কুশলপ্রশ্ন করেন। ভাল আছি বলে উত্তর দিই, তিনি আর কোনও প্রশ্ন করেন না। এভাবে দু-তিন দিন কেটে গেল। আমি মনের আনন্দে আছি। বোধ হয় তৃতীয় কিংবা চতুর্থ দিনে মঠের কোষাধ্যক্ষ মহারাজ আমাকে মহাপুরুষজীর কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, "মহারাজ, বরাহনগর অনাথ-আশ্রমে কর্মীর প্রয়োজন আছে। মঠ কাছে, মঠে যাওয়া আসা করতে পারবে। একে ওখানে দিলে হয়।" মহাপুরুষ মহারাজ সম্মতি জানিয়ে বললেন, "বেশ, বেশ, ওখানে পাঠিয়ে দাও।"

বরাহনগরে যোগদান করার কয়েক দিন পরেই আমার কলেরা হয়। তখন বর্ষাকাল, শরীর খুব খারাপ। পরে মহাপুরুষজীর অনুমতি নিয়ে স্বামী শুদ্ধানন্দ আমাকে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য কাশী সেবাশ্রমে পাঠান। ইতঃপূর্বে মহাপুরুষ মহারাজের কাছে মন্ত্র-দীক্ষা প্রার্থনা করেছিলাম। 'পরে হবে' বলে এতদিন আমার দীক্ষা হয়নি। কাশী থেকে পুনরায় তাঁকে দীক্ষার কথা লেখায় তিনি লিখলেন, "ফিরে এলেই হবে।" দীক্ষার জন্য মন তখন বড়ই ব্যাকুল হয়েছিল। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কাশী থেকে ফিরে মহাপুরুষজীকে বলতে দীক্ষার দিন স্থির হলো।

সেদিন আরও কয়েক জনের দীক্ষা হয়। বরাহনগর আশ্রম থেকে বেলুড় মঠে পৌঁছতে আমার একটু দেরি হয়ে যায়। অন্ধ নিশিকান্তও সেদিন আমার সঙ্গে বরাহনগর আশ্রম থেকে দীক্ষা নিতে গেল। আন্দাজ ৯টার সময় আমরা মঠে আসি। জনৈক সাধু আমাকে বললেন, "এত দেরি করে এলে? মহাপুরুষ মহারাজ ঠাকুরঘরে বসে আছেন।" স্নান করে এসেছিলাম। গঙ্গায় হাত-পা ধুয়ে ঠাকুরঘরে যেতেই দেখি একজনের তখন দীক্ষা হচ্ছে। ঠাকুরঘরের দরজা বন্ধ। তার দীক্ষা হয়ে যেতে পূজারি স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দ আমাকে ডাকলেন। শ্রীমহাপুরুষজী তখন পূজকের আসনে বসেছিলেন। আমাকে ঠাকুরের পাদুকাধারের সামনে আসনে বসতে বললেন। আমি আসনে বসতে পাশের পুষ্পপাত্র থেকে একটি অর্ঘ্য সাজিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করে পাদুকায় অর্পণ করতে বললেন। মহাপুরুষ মহারাজ আবেগভরে খুব তন্ময়তার সঙ্গে অনেকক্ষণ প্রার্থনা করে আমাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে সমর্পণ করে দীক্ষামন্ত্র প্রদান করলেন। আমি অভিভূত হয়ে সে মন্ত্র উচ্চারণ করলাম। ভূমিষ্ঠ প্রণামান্তে

শ্রীগুরুদেবের পদরজ মস্তকে ধারণ করে ঠাকুরভাণ্ডার থেকে কমলালেবু এনে তাঁর হাতে দিয়ে পুনঃ প্রণত হলাম। তাঁর আদেশমত ঠাকুরঘরের বারান্দায় বসে কিছুক্ষণ জপ করলাম। নিশিকান্তের দীক্ষার পরে মহাপুরুষজী তাঁর ঘরে চলে গেলেন। ঠাকুরের ভোগের পর তিনি আহার করলেন। আমরা যখন পঙ্গতে প্রসাদ পেতে বসলাম সেবক মহারাজ গুরুদেবের প্রসাদ এনে আমাদের দিলেন।

বিশ্রামান্তে বৈকালে গুরুদেবকে প্রণাম করতে গেলাম। তখন তিনি খুব আবেগের সঙ্গে নিত্য নিয়মিত ইষ্টমন্ত্র জপ এবং আন্তরিক প্রার্থনা করতে উপদেশ দিলেন। আমিও সেই সন্ধ্যায় পরিপূর্ণ অন্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর ও মহাপুরুষ মহারাজকে ধ্যান করতে করতে বরাহনগর আশ্রমে ফিরে গেলাম।

ইতঃপূর্বে পূজ্যপাদ রাজা মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) বলেছিলেন—নামজপের সঙ্গে ধ্যান করতে হবে। অথচ মহাপুরুষ মহারাজ কেবলমাত্র জপ করতেই বলেছিলেন। এতে মনে বেশ খট্‌কা লাগল। তাই একদিন মঠে এসে মহাপুরুষ মহারাজকে জিজ্ঞেস করতে তিনি বললেন, "প্রেমের সঙ্গে নাম করলে ধ্যান আপনিই হবে। নাম-নামী অভেদ।"

এর পরে যতই জপে মন বসত ততই তাঁর কথার সত্যতা উপলব্ধি করতে লাগলাম এবং উভয়ের কথায় সামঞ্জস্য খুঁজে পেয়ে মন অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে গেল।...

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাস, স্বামীজীর তিথিপূজা। পূর্বেই শুনেছিলাম যে, সেদিন অনেকেই ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণ করবে। তাই তিথিপূজার পূর্বদিন মঠে গিয়ে মহাপুরুষ মহারাজের কাছে ব্রহ্মচর্যের প্রার্থনা জানালাম। তিনি সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে বললেন, "প্রবীণ সাধুদের অনুমতি নিয়ে এসো, তোমার ব্রহ্মচর্য হয়ে যাবে।" কোন কোন প্রাচীন সাধু বললেন, "অল্পদিন মাত্র মঠে যোগদান করেছে, এত তাড়াতাড়ি ব্রহ্মচর্য হওয়া উচিত নয়।" স্বামী শুদ্ধানন্দও তাঁদের কথা সমর্থন করলেন। স্বামী প্রকাশানন্দ তখন আমেরিকা থেকে মঠে এসেছেন। তিনি আমার সহায়ক হয়ে মত দেওয়াতে আর কেউ কোন আপত্তি করলেন না। মহাপুরুষজীকে ঐ কথা বলতেই তিনি 'বেশ, বেশ' বলে আনন্দ প্রকাশ করলেন।

স্বামীজীর জন্মতিথিপূজার দিন দিনের বেলায়ই ঠাকুরঘরের পাশের ঘরে হোম হয়েছিল। মহাপুরুষ মহারাজ, অভেদানন্দ মহারাজ, খোকা মহারাজ ও অনেক প্রবীণ সাধুর উপস্থিতিতে স্বামী শুদ্ধানন্দ আচার্যের আসন গ্রহণ করে ব্রহ্মচর্যের মন্ত্র পাঠ করালেন এবং আমরাও সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র উচ্চারণ করে হোমাগ্নিতে আহুতি দিলাম। সেদিন বোধ হয় আমরা ১৫ জন ব্রহ্মচারী ঐ ব্রতে দীক্ষিত হয়েছিলাম। মহাপুরুষজী সকলকেই চৈতন্যাখ্য নূতন নাম দিলেন। আমার নাম হলো 'বিজ্ঞানচৈতন্য'। আমরা

সকলেই শিখাসূত্র ও বহির্বাস ধারণ করে তাঁকে প্রণাম করলাম। তিনি খুব আশীর্বাদ করলেন। আমাদের ব্রহ্মচর্যব্রতগ্রহণ যাতে সার্থক হয়, সেজন্য ঠাকুরের কাছে খুব প্রার্থনা করলেন। তাঁর প্রার্থনা শুনে মনে হলো—তিনি আমাদের ত্যাগের পথে নিয়ে যাবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব যেন নিজের উপর নিয়েছেন। ঐ ব্রহ্মচর্যব্রতগ্রহণের দিনটি জীবনে বিশেষ স্মরণীয় হয়ে আছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের নামে তাঁরই একজন অন্তরঙ্গ পার্ষদ বেলুড় মঠে সঙ্ঘের সাধুদের সামনে ঐ পবিত্র ব্রতে আমাকে দীক্ষিত করেছিলেন, সেজন্য নিজেকে মহাসৌভাগ্যশালী মনে করছি।...

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে স্বামীজীর জন্মতিথিপূজার দিন আমার সন্ন্যাস হয়। তখন ব্রহ্মচর্যের তিন বৎসর পর সন্ন্যাস হবার নিয়ম ছিল, আমার তিন বৎসর পূর্ণ হওয়ায় প্রবীণ সাধুদের কাহারও তেমন আপত্তি ছিল না। স্বামী শুদ্ধানন্দ বললেন—সন্ন্যাস তিনবার চাইতে হয়। প্রথমবার সন্ন্যাস প্রার্থনা করায় পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, "প্রবীণ সাধুদের মত নিয়ে এস, হয়ে যাবে।" দ্বিতীয়বার তাঁদের মত আছে বলায় মহাপুরুষজী বললেন, "তা বেশ বেশ।" তৃতীয়বার বলতে যাওয়ায়, একটু বিরক্ত হয়ে মহাপুরুষজী বললেন, "আবার বলতে এসেছ, এতে তোমার case (প্রস্তাব) খারাপ করছ।" আমি বললাম, "মহারাজ, সুধীর মহারাজ (স্বামী শুদ্ধানন্দ) বললেন সন্ন্যাস নাকি তিনবার চাইতে হয়।" শুনে মহাপুরুষ মহারাজ হেসে চুপ করে রইলেন।

ঐ দিন আমাদের চার জনের সন্ন্যাস হয়। মহাপুরুষজী কৃপা করে আমায় 'অনুপমানন্দ' নাম দিয়েছিলেন। তাঁর দেওয়া নামটি আমার কাছে খুবই পবিত্র। রাত্রে ৺কালীপূজা হলো। সেই পূজার হোমাগ্নিতে আমরা বিরজামন্ত্রে আহুতি দিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করলাম। স্বামী শুদ্ধানন্দ আচার্যের আসনে উপবিষ্ট হয়ে আমাদের মন্ত্র পড়ালেন। পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ, শরৎ মহারাজ ও খোকা মহারাজের উপস্থিতিতে আমরা সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করি। মহাপুরুষ মহারাজ আমাদের শিখা কাটলেন। শিখাসূত্র হোমাগ্নিতে আহুতি দেয়া হলে গুরুদেব আমাদের প্রেষমন্ত্র ও মহাবাক্য শুনিয়ে সন্ন্যাস-ব্রতে দীক্ষিত করলেন। আমরা দণ্ড ভাসিয়ে গঙ্গাস্নানান্তে শ্রীগুরুপদে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে উঠতেই মহাপুরুষজী আমাদের কৌপীন ও গেরুয়া-বহির্বাস প্রদান করলেন এবং সন্ন্যাসের কঠিন নিয়ম ও এই পবিত্র সঙ্ঘজীবনের সুউচ্চ আদর্শ ওজস্বিনী ভাষায় আমাদের হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করে দিলেন। "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" স্বামীজীর এই মহামন্ত্র আমাদের জীবন-পথের লক্ষ্য হোক বলে নির্দেশ করলেন।

*　　　　*　　　　*

বরাহনগর আশ্রমে কর্মিরূপে বাসকালে আমার কোন সহকর্মীর ব্যবহারে মনে খুব আঘাত পাই। সেই সময় বৈরাগ্য অবলম্বনে পদব্রজে পুরীধাম গিয়ে তপস্যায় কাল কাটাব এরূপ সংকল্প নিয়ে মঠে গেলাম। পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের শ্রীচরণে প্রণাম করে দাঁড়াতেই তিনি মুখ দেখে আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে বললেন, "তোমার কি হয়েছে?" তখন আমার সংকল্পের কথা গুরুদেবকে রুদ্ধকণ্ঠে জানাতে তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "কোথায় যাবে? পায়ে হেঁটে পুরী? মঠে ঠাকুর রয়েছেন, তাঁর কাছে কয়েক দিন মঠেই থাক। এখন যাও ঠাকুরঘরে গিয়ে কিছুক্ষণ জপ কর। মন ভাল হয়ে যাবে।" শ্রীগুরুর স্নেহমাখা ঐ কয়েকটি কথাতেই আমার মনের সব গ্লানি দূর হয়ে গেল। আমি সেই সংকল্প ত্যাগ করে মঠে কয়েক দিন বাস করে আবার বরাহনগর আশ্রমে ফিরে গেলাম।...

* * *

শেষের কয়েক বৎসর মহাপুরুষজীকে দেখলেই মনে হতো তিনি সর্বদা দিব্যানন্দে ভরপুর হয়ে আছেন। তখন তাঁর দর্শন ও কৃপাপ্রার্থী হয়ে বহু ভক্তের সমাগম হতো। তিনিও সকলকে অকাতরে কৃপা বিতরণ করে সকলের মনে শান্তির অমৃতবারি-সিঞ্চনে কৃতার্থ করতেন। মহাপুরুষজীকে একদিন বলতে শুনেছিলাম, "আমি মা-গঙ্গা হয়ে গেছি।" দীক্ষাদান সম্বন্ধে বলতেন, "আমি তো আর গুরু নই, ঠাকুরই গুরু; আমি তাঁর নাম শুনিয়ে তাঁর পায়ে সঁপে দি। তিনিই সব জানেন।" হাঁপানিতে তখন খুব কষ্ট পেতেন, রাত্রে ঘুম হতো না। সকালে প্রণাম করতে গিয়ে কেমন আছেন জিজ্ঞেস করলে বলতেন, "আমি ভাল আছি, খুব ভাল আছি; তবে শরীরটা ভাল নেই। তিনি এ জ্ঞান দিয়েছেন—আত্মা আলাদা আর শরীর আলাদা; শরীর কষ্ট পায়, আমি আনন্দে আছি।"

বিভিন্ন পরিবেশে মহাপুরুষজীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য-লাভের সৌভাগ্যের ফলে তিনি আমাদের মনে এই দৃঢ় ধারণা গেঁথে দিয়েছেন যে, ঠাকুরই সব আর ঠাকুর, মা স্বামীজী আলাদা নন। তিনি বলতেন, "আমরা বাপু, ঠাকুর ছাড়া অন্য কিছু জানি না। তাঁকে আন্তরিক ডাকলে, প্রেমের সঙ্গে তাঁর নাম করলে সব হবে। কাতর হয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা কর, খুব প্রার্থনা কর; জ্ঞান, ভক্তি, বিশ্বাস তিনি দেবেন।"...

১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের শীতকালের কথা। আমি তখন গয়ায় ব্রহ্মযোনি পাহাড়ে কয়েক মাস ছিলাম। সেখানে খবর পেলাম শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ কাশীধামে এসেছেন। গুরুদেবের ও শ্রীবিশ্বনাথের দর্শন-মানসে কয়েক দিনের মধ্যেই ৺কাশীতে এলাম। মহাপুরুষজী তখন অদ্বৈত আশ্রমের দোতলার পশ্চিমদিকের ঘরে অবস্থান করছিলেন। দেখলাম সেখানে মহাপুরুষজীকে কেন্দ্র করে আনন্দের হাট বসেছে।

সকালে মহাপুরুষজী তাঁর ঘরে খাটে পূর্বাস্য হয়ে বসে থাকেন। দু-আশ্রমের সাধু-ব্রহ্মচারিগণ ও বাইরের ভক্তেরা তাঁকে প্রণাম করতে আসেন। এমন কি আশ্রমের পাচক, পরিচারকরাও প্রণাম করতে আসে। তারা প্রণাম করে চলে যায়। সাধু, ব্রহ্মচারী ও ভক্তেরা তাঁর শ্রীমুখের সৎপ্রসঙ্গ তন্ময় হয়ে শুনতে শুনতে প্রায় ঘণ্টাখানেক অতিবাহিত করেন। পরে সকলে প্রণাম করে সানন্দচিত্তে যে যাঁর কাজে চলে যায়। সন্ধ্যা-আরতির পর আবার অনুরূপ দৃশ্য। মহাপুরুষজী নিচে ঠাকুরদালানে একটি চেয়ারে উপবিষ্ট, সাধু-ব্রহ্মচারী ও ভক্তেরা প্রণাম করতে আসেন আবার সৎপ্রসঙ্গের অবতারণা হয়, সকলের মন এক উচ্চ আধ্যাত্মিক রাজ্যে চলে যায়। সকলে তন্ময় হয়ে শোনেন এবং বিমল আনন্দ অনুভব করেন। এভাবে কয়েক দিন আনন্দে কাটিয়ে আমি আবার কার্যোপলক্ষে গয়ায় ফিরে আসি। মহাপুরুষজী আরও কিছুদিন কাশীতে ছিলেন।...

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে রেঙ্গুন যাবার পূর্বে আলমোড়া থেকে প্রত্যাবর্তন করে মঠে এলাম। পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করতে তাঁর ঘরে গিয়ে দেখলাম তাঁর শরীর জরাগ্রস্ত, বিছানায় বসে আছেন, হাঁপানিতে কষ্ট পাচ্ছেন। প্রণাম করে জিজ্ঞেস করলাম, “মহারাজ, কেমন আছেন?” উত্তরে বললেন, “আমি বেশ ভাল আছি, তবে শরীরটা জীর্ণ হয়ে গেছে, হাঁপানিতে কষ্ট পাচ্ছে। ঠাকুর এই জ্ঞান দিয়ে দিয়েছেন যে, আমি নিত্য মুক্ত আত্মা, রোগগ্রস্ত হই না। শরীরটাই ভুগছে।”

শরীরের কষ্ট ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষকে কখনই বিষাদগ্রস্ত করতে পারেনি। এই রোগযন্ত্রণার মধ্যেও তিনি আনন্দময়। আমি আলমোড়ায় এক বৎসর ছিলাম, সেখানে একান্তে ধ্যানজপাদি করতাম। সেখান থেকে চলে আসার কারণ মহাপুরুষজী জিজ্ঞেস করতে আমি বললাম, “মঠের সেক্রেটারি মহারাজের আদেশে রেঙ্গুনে কর্মিরূপে যেতে হবে।” শুনে মহাপুরুষজী কিছু বললেন না, গম্ভীর হয়ে গেলেন।

রেঙ্গুনযাত্রার দিন মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করতে গিয়ে দেখি সেদিন স্বামী অশোকানন্দও আমেরিকা যাত্রার পূর্বে তাঁকে প্রণাম করে আশীর্বাদ নিতে এসেছেন। মহাপুরুষজী তাঁকে খুব আশীর্বাদ করে বললেন, “তুমি ঠাকুরের কাজ করতে যাচ্ছ, তাঁর আশীর্বাদ তোমার উপর রয়েছে। তোমরা তাঁর messengers (বার্তাবহ)। কিছু ভয় নেই, যাও তাঁর কাজ কর।” আশোকানন্দজী হাঁটু গেড়ে বসে বললেন, “মহারাজ! আশীর্বাদ করুন যেন কাম-কাঞ্চনে মন না যায়। তাঁর কাজ যেন ঠিক করতে পারি।” মহাপুরুষজী স্বামী অশোকানন্দের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। আমিও তারপরই তাঁকে প্রণাম করে আশীর্বাদ প্রার্থনা করলাম এবং তিনিও আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। আমার সহযাত্রী গিরিশ

(পরাত্মানন্দ) এবং শশী (বুদ্ধাত্মানন্দ)-ও প্রণাম করে আশীর্বাদ পেলেন। আমরা প্রশান্তঃকরণে যাত্রা করলাম।

দুই বৎসর রেঙ্গুনে থেকে মঠে ফিরে আসি। রেঙ্গুনে অবস্থানকালেই আমি রাজকোটের কর্মিরূপে যাবার জন্য আদিষ্ট হয়েছিলাম। মঠে কয়েক দিন থেকেই রাজকোট যেতে হবে।

পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করতে গিয়ে দেখলাম তিনি বিছানায় বসে হাঁপানিতে কষ্ট পাচ্ছেন। তাঁকে খুবই ক্লান্ত বলে মনে হলো। ছোটছেলের মতো মুখ দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়ছে। তাঁকে প্রণাম করতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কোথা থেকে এলি?" রেঙ্গুন থেকে এসেছি শুনেই বললেন, "ম্যাংগোস্টিন এনেছিস তো?" শ্রীঅশ্বিনীকুমার ঘোষ তাঁর জন্য আমার সঙ্গে ম্যাংগোষ্টিন পাঠিয়েছিলেন—তাই এনেছি, বললাম। দুর্ভাগ্যক্রমে সে সময় আমার হাতে পয়সা-কড়ি না থাকায় আমি মহাপুরুষজীর জন্য কিছুই আনতে পারিনি, এজন্য আমার প্রাণে বড়ই বেদনা অনুভব করলাম। আমার রেঙ্গুন থেকে আসবার কয়েক দিন পর পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ একদিন ডাণ্ডিতে বসে সাধুবৃন্দ কর্তৃক বাহিত হয়ে মঠের সব জায়গা আনন্দ করতে করতে পরিদর্শন করছিলেন। এই তাঁর শেষ মঠ-পরিক্রমা। এর কয়েক দিন পরেই আমি সেদিন মঠেরই কোন কাজে কলকাতা গিয়েছিলাম, বৈকালে মঠে ফিরে শুনলাম কয়েক ঘণ্টা পূর্বে আহার করবার সময় তিনি সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হয়েছেন। অবিলম্বে সংবাদ কলকাতার নানাস্থানে প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নানাদিক থেকে ভক্ত নরনারী মহাপুরুষজীর দর্শনের জন্য মঠে সমবেত হচ্ছেন। অনেক ডাক্তার এসেছেন। তখন আমার মনের অবস্থা কিরূপ হয়েছিল তা ভাষায় বর্ণনা করবার শক্তি আমার নেই। যিনি আমার জীবনের অবলম্বন, যাঁকে অবলম্বন করে আমার সাধুজীবন, তিনি আজ দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত। জীবনের আশা খুবই কম। তাঁর এই রোগ-নিরাময়ের জন্য যথাসম্ভব সর্বপ্রকার চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষা চলতে লাগল। কয়েক দিন পরেই আমি রাজকোট যাবার জন্য আদিষ্ট হলাম। মহাপুরুষজীকে প্রণাম করে বিষাদগ্রস্ত মনে রাজকোট যাত্রা করলাম। স্থূলশরীরে গুরুদেবের পাদপদ্মে এই আমার শেষ প্রণাম। তাঁর অমৃতময় উপদেশ স্মরণ হয়—"বাবা, ঠাকুরই আমাদের সর্বস্ব, তাঁর কাছে জ্ঞান-ভক্তি-লাভের জন্য আকুল প্রার্থনা কর। তাতে সব হবে।" শ্রীগুরুর ত্যাগ-তপস্যাপূত আনন্দময় মূর্তি আজ ধ্যানের বস্তু, জীবনপথের পাথেয়।

ওঁ তৎ সৎ ওঁ

মহাপুরুষজীর স্মৃতিকথা

স্বামী গোপেশ্বরানন্দ

আমার মহাসৌভাগ্যক্রমে শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য ও শ্রীমোক্ষদামোহন দাস মহাশয়দ্বয়ের সঙ্গে কলকাতায় যাই এবং শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করি।

১৩২৫ সালের ২৪ আশ্বিন অপরাহ্নে বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা দর্শন করতে যাই এবং পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করার সৌভাগ্য লাভ করি। এই আমার প্রথম দর্শন। পূজনীয় স্বামী প্রেমানন্দজী ঐ সালের শ্রাবণ মাসে দেহত্যাগ করেন, সেজন্য ঐ বৎসর প্রতিমা গড়ে মঠে পূজা হয়নি। ২৪ আশ্বিন ছিল মহাষ্টমী। সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের আরতির পর মঠের উঠানে মহাপুরুষজী কয়েকজন সাধু-ভক্তসহ খোলকরতালযোগে মায়ের গান আরম্ভ করলেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য! পূজার কয়দিন মঠে থেকে ৺বিজয়ার দিন বিকালে প্রণামাদি করে কলকাতায় ফিরে আসি।

১৯২২ সাল হতে প্রতিবৎসরই মঠে যাতায়াত করতাম। প্রথমে মঠে বাস করা সম্ভব হতো না। কলকাতা থেকে প্রায় প্রতিদিন মঠে গিয়ে প্রণামাদি করে আসতাম। অজ্ঞ বলে ধর্মবিষয়ক কোন প্রশ্নই মনে জাগত না এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের একজন প্রধান পার্ষদ ও বেলুড় মঠের অধ্যক্ষের সঙ্গে আলাপ করার সাহসও ছিল না। একটু দূরত্ব রেখেই দর্শন করতাম। এই দর্শনেই আমার ক্ষুদ্র আধারটি পূর্ণ হয়ে যেত।

যখন মঠে কয়েকদিন থাকবার অনুমতি পেতাম, সকালবেলা ঠাকুর প্রণাম করেই মহাপুরুষজীর ঘরে যেতাম। তিনি একটু বেলায় ঠাকুরঘর হতে ফিরে তাঁর ঘরে নির্দিষ্ট চেয়ারটিতে বসে আছেন দেখা যেত। সেবক তাঁর পাদুকা পা থেকে পৃথক করে সামনের দিকে রাখতেন এবং ঐ পাদুকা স্পর্শ করেই সকলে প্রণাম করে পেছন দিকে সরে একে অন্যের সঙ্গে প্রায় ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে অনিমেষ নয়নে চেয়ে থাকতাম। দেখতাম তিনি যেন আমাদেরও পারিপার্শ্বিক সব কিছু দেখবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু চেষ্টা সত্ত্বেও সাধারণভাবে কিছু দেখবার বা বলবার অবস্থায় মনকে নামাতে পারছেন না। তিনি ঠাকুরঘর হতে নামবার পূর্বেই গড়গড়াতে তামাক সেজে রাখা হতো এবং নলটা প্রায় মুখের কাছেই থাকত। তিনিও

নলটা মুখে নেবার চেষ্টা করতেন, কখনো বা নিতেন, কিন্তু টান দেবার শক্তি থাকত না। এখন 'কথামৃতা'দি পাঠ করে দেখি যে, মহামানবদের জীবকল্যাণে সমাধিভূমি থেকে মন নামাতে কতই না চেষ্টা করতে হয়!

যখন তিনি সহজ অবস্থায় আসতেন তখন সকলকে মধুরস্বরে জিজ্ঞেস করতেন, "কেমন আছ?" কাকেও বা জিজ্ঞেস করতেন—"রাত্রে ভাল ঘুম হয়েছে তো?" তখন একে একে সকলে তাঁর শ্রীপদ স্পর্শ করে প্রণাম করে চলে আসতেন। এই সময়ের দর্শন বোধ হয় সকলকেই এক অজানা বস্তুর সন্ধান দিত। তাঁকে প্রণাম করার ফলে সারাটা দিন ও রাত যেন একটা আনন্দের নেশায় কেটে যেত। মঠের আবহাওয়াটাই যেন ভাবময় হয়ে উঠত।...

একবার আমার সঙ্গে দু-জন ভক্ত দীক্ষা নেবার জন্য মঠে গিয়েছিলেন। কলকাতা থেকে আমরা যাতায়াত করতাম। মঠে গিয়ে প্রণাম করে প্রার্থনা জানাতেই মহাপুরুষ মহারাজ তাঁদের দীক্ষা দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। চারশ মাইল দূর থেকে এসেছেন বিশেষ আশা নিয়ে। দীক্ষা হবে না শুনে তাঁদের মনের অবস্থা কিরূপ হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। আমি তাঁদের আশ্বাস দিয়ে শ্রীঠাকুরকে ব্যাকুল হয়ে ডাকতে বললাম এবং রোজই মঠে যেতাম সকালে ফেরি-স্টিমারে। একদিন মঠে তাঁকে প্রণাম করতে গিয়ে দেখি তিনি তাঁর ঘর থেকে স্বামীজীর ঘরের দিকে আপন মনে পায়চারি করছেন। নিচে থেকে দাঁড়িয়ে আমরা ঐ অবস্থায় তাঁকে দেখতে লাগলাম। আমার মনে হলো তিনি যেন ভাবাবেগে পায়চারি করছেন। বাইরের কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ নেই। দীক্ষাপ্রার্থী দু-জনের মধ্যে বিনোদবাবুকে বললাম, "আপনি নির্ভয়ে এখন যান, প্রণাম করে আপনার প্রার্থনা নিবেদন করুন।" মহাপুরুষজী যখন স্বামীজীর ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন তখন বিনোদবাবু গিয়ে প্রণাম করতেই অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে তিনি বললেন, "কি চাই, বাবা?" ভক্ত বললেন, "আমাকে কৃপা করুন, দীক্ষা দিন।" তিনি বললেন, "কৃপা তো সততই বইছে। আর দীক্ষা? শ্রীঠাকুরের নামই তো দীক্ষা" ভক্ত বললেন, "আমাকে তাই দিন।" মহাপুরুষজী বললেন, "এই তাঁর নাম।" বলে পূত গম্ভীর স্বরে শ্রীরামকৃষ্ণনাম উচ্চারণ করলেন। ভক্ত তখন বললেন, "আমার দীক্ষা হয়ে গেল, আপনি আমার গুরু?" "হাঁ, দীক্ষা হয়ে গেল, আমি তোমার গুরু।" ভক্ত প্রণাম করে বললেন, "আপনার পা আমার মাথায় দিন।" "হাঁ, হাত দেব, পা দেব, সব দেব।" এই বলে ভক্তের মাথায় হাত রেখে এবং পরে ডান পা রেখে ভক্তটিকে আশীর্বাদ করলেন এবং স্পর্শ দিয়ে পবিত্র করলেন। ভক্ত—"ঠাকুরকে কিভাবে ধ্যান করব?" "হৃদয়ে ধ্যান করবে।" ভক্ত বললেন, "আর আপনাকে?" "হাঁ, একেও করতে পার, এর ভিতরেও তিনি আছেন।" ভক্ত—"আমি

যে গুরুদক্ষিণা কিছুই দিতে পারলাম না।” মহাপুরুষজী—“এখন না হোক পরে কিছু দিলেই হবে।” আমরা অবাক হয়ে সব কিছু দেখছিলাম এবং শুনতে পাচ্ছিলাম। বিনোদবাবু নেমে এলে দ্বিতীয় ব্যক্তি গিয়ে ঐ ভাবে প্রার্থনা জানাতে তাঁকেও তিনি কৃপা করলেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঐ অবস্থায়ই। মহাপুরুষজীকে ঐ কৃপামূর্তিতে দর্শন করে আমরাও ধন্য হলাম।

* * *

১৯১৯ সালে হবিগঞ্জ শহরের অদূরে একটি নদীর অপর পারে ঋষি (চামার) দের পল্লিতে শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত (পরে স্বামী অশোকানন্দ) ছেলেমেয়েদের পড়াবার জন্য যাতায়াত করতেন! কিছুদিন পরে তিনি অন্যত্র চলে যান ও মাদ্রাজ মঠে যোগদান করে সাধু হন। ঐ শিক্ষাদানকার্যটি ঐ বৎসরের শেষ দিক হতে আমি গ্রহণ করি। কয়েকজনের চেষ্টায় ১৯২০ সালে হবিগঞ্জে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আশ্রম থেকে ঋষিদের (মুচিদের) শিক্ষা এবং উদরান্ন সংস্থানেরও চেষ্টা হতে থাকে। সে সময় এইসব কাজের রিপোর্ট মঠে পাঠান হতো। সেই সূত্রেই পূজনীয় মহাপুরুষজীও ঐ কার্যাবলীর কথা কিছু জানতেন এবং ঐ কাজটি মহাপুরুষজীর খুবই প্রিয় ছিল। ঐ গরিব দুঃস্থ ও নিম্নশ্রেণীর লোকদের শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে উন্নত করা তাঁর প্রাণের একান্ত ইচ্ছা ছিল, বলতেন, “এই হলো স্বামীজীর প্রিয় কার্য।” আমি ঐ কাজের ভার নিয়েছি বলে তিনি আমাকে খুব ভালবাসতেন। মঠে গিয়ে প্রণাম করলেই তিনি মজা করে হাসতে হাসতে বলতেন, “কি রে, মুচির বামুন—কাজকর্ম কেমন হচ্ছে?” তারপর সব শুনতেন আগ্রহ করে—আনন্দ প্রকাশ করতেন।

বোধ হয় ১৯২৭-২৮ সালের ঘটনা। একটি চামারের ছেলেকে দীক্ষা দেবেন কিনা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, “ঠাকুর-স্বামীজীর আগমনই তো দীন, দরিদ্র, অজ্ঞ ও পতিতদের উদ্ধারের জন্য। তুমি ছেলেটিকে পাঠিয়ে দিও। তবে সুধীরকে (স্বামী শুদ্ধানন্দ) একটু জিজ্ঞেস কর।” স্বামী শুদ্ধানন্দ মহারাজ তখন কর্মসচিব। তাঁকে জিজ্ঞেস করায় তিনিও সানন্দে মত দিলেন। আমি সুযোগমত সঙ্গী পেয়ে ঐ চামারের ছেলেটিকে পাঠিয়ে দিলাম। সে মঠে গিয়ে মহাপুরুষজীকে প্রণাম করে আমার চিঠি দিতেই তার খাবার জায়গা কোথায় হবে নিজেই বলে দিলেন। সেদিন হতে প্রত্যহ প্রণাম করতে গেলেই তার শরীর কেমন আছে, ভাল লাগছে কিনা ইত্যাদি জিজ্ঞেস করতেন। তখন সে সাধুদের পঙক্তিতে না বসে বারান্দায় বসে খেত। যেদিন তাকে দীক্ষা দেবেন, সেবক জিজ্ঞেস করলেন—“ওর দীক্ষা কোথায় হবে?” মহাপুরুষজী বললেন—“কেন, ঠাকুরঘরেই হবে।” এবং ঐদিন থেকে তাকে

পঙক্তিতে বসে সকলের সঙ্গে খাবার আদেশ দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম দিয়ে ঐ অচ্ছুৎ বালককে পঙক্তিতে তুলে নিলেন।

*   *   *

১৯২৯ সালের মে বা জুন মাস হবে, মঠে গিয়েছি। সঙ্গে একটি ছাত্র দীক্ষাপ্রার্থী। আমি প্রণাম করার পর সেও প্রণাম করল। মহাপুরুষজী জিজ্ঞেস করলেন, "এটি কে?" তার পরিচয় দিয়ে দীক্ষার কথা বলতেই প্রথমটা যেন একটু বিরক্তির সঙ্গে বললেন, "তোমার ঐ এক কাজ, দীক্ষা আর দীক্ষা। শুধু লোক পাঠাতে থাকবে, দীক্ষা নিয়ে সকলেই মুক্ত হয়ে যাক। আমার শরীর কেমন আছে সে খবর নেবার প্রয়োজন নেই। আমি, বাবা, দীক্ষা দিতে পারব না।"

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদদের কাছে যারা দীক্ষা পাবে তাদের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। যা হোক বিরক্তির মধ্যেও মহাপুরুষজী আমার ধারণাকে শ্রীমুখে স্বীকার করায় মনে খুব আনন্দ অনুভব করলাম। ছাত্রটিও মঠে থাকবার অনুমতি পেল। তাকে বলে দিলাম—রোজ সকালে প্রণাম করবে এবং মনে মনে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে খুব প্রার্থনা করবে; একদিন তিনি নিজেই তোমাকে বলবেন এবং দীক্ষা দেবেন—এ আমি বিশ্বাস করি। শেষে তাই হলো। একদিন তিনি তাকে ডেকে নিজেই দিন স্থির করে দীক্ষা দিলেন। দীক্ষান্তে সে আমাকে বলল, "গুরুদেব আমাকে বললেন যে, আমি যদি মন্ত্র ভুলে যাই, তাহলে কোন গুরুভাইয়ের কাছ থেকে আমি যেন মন্ত্র জেনে নিই।" একই দিনে হবিগঞ্জের আরও একজনের দীক্ষা হয়। কথাটা আমি শুনলাম মাত্র। কিছুদিন পরে সে পড়া ছেড়ে রাজনীতিতে যোগ দেয় এবং মাঝে মাঝে কঠিন রোগ ভোগ করে। ১৯৩১-৩২ সালে অন্যান্য উপসর্গসহ অনিদ্রারোগে সে ভুগতে থাকে। অন্যত্র থাকবার স্থান না থাকায় সে আশ্রমেই ছিল। আশ্রমে আগত ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনায় সে ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করত। এমন কথা বলত যে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তখন তার কোন বিশ্বাসই ছিল না। আমি একদিন তাকে বললাম—"এ কি শোনা যাচ্ছে? তুমি নাকি ভগবান মান না? ঠাকুরকে বিশ্বাস কর না? একথা কি সত্য? তুমি কি নাস্তিক হয়ে গেলে?" উত্তরে সে বলল, "সত্যই মানি না। ভগবানের অস্তিত্বেই যে আমার সন্দেহ! ঠাকুরকে বিশ্বাস করব কি করে?" আমি বললাম—"আচ্ছা, মহাপুরুষ মহারাজের কথা কি তোমার কখনও মনে হয়? তিনি তোমার গুরু—এই বিশ্বাস আছে কি?" সে বলল, "খুবই আছে এবং চিরকালই থাকবে।" তা শুনে আমি আশ্বস্ত হলাম। ভাবলাম—হাল যখন ঠিক আছে, এ নৌকা ডুববে না। গুরুই সব সংশয় কাটিয়ে পারে নিয়ে যাবেন। "সংশয়-রাক্ষস-নাশ-মহাস্ত্রম্, যামি গুরুং শরণং ভব-বৈদ্যম্।"

ক্রমে সুস্থ হয়ে সে কোথাও চলে গেল। অনেকদিন পরে আসাম নওগাঁ হতে এক বিস্তৃত পত্রে সে জানাল—"আমার যা কিছু সব শ্রীগুরুর কৃপায় ফিরে পেয়েছি। আমার কাছেই সব ছিল, কেবল সংশয় আমাকে সর্বদা প্রতারিত করত। দীক্ষার সময় আমাকে শ্রীগুরু বলে দিয়েছিলেন যে, যদি মন্ত্র ভুলে যাই আমার গুরুভাইয়ের কাছ থেকে যেন জেনে নেই। দু-বার জেনে নিয়ে তবুও যখন ভুলে গেলাম, তখন স্থির করলাম যে, আর জিজ্ঞেস করে জেনে নেব না। যা হবার হোক। ক্রমে আমার বিশ্বাসাদি সব চলে গেল। বার বার নানা অসুখ ও অনিদ্রায় এতদিন ভুগেছি। আমি যখনই ইষ্টমন্ত্র স্মরণ করেছি তখনই একটা অন্য নাম মনে এসে আমাকে বিভ্রান্ত করেছে। এত দুর্ভোগের পর শ্রীগুরুর কৃপায় এখন আমি যেন রাহুমুক্ত হয়েছি। শ্রীগুরু ও ইষ্টে পূর্ণ বিশ্বাস ফিরে পেয়ে আনন্দ বোধ করছি।"

এই সংবাদ পেয়ে বুঝতে চেষ্টা করলাম গুরুর গুরুত্ব। আর গুরু ছিলেন ত্রিকালদর্শী পুরুষ। প্রথম দেখামাত্রই মহাপুরুষজী বুঝেছিলেন যে, এ বালকের জীবন সহজ সরল নয়। তাই দীক্ষার কথায় তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু পরে পরমদয়াল শিবানন্দ তাকে দীক্ষা দিয়ে শিববৎ তার সমস্ত বিষ নিজে গ্রহণ করে অমৃত বিতরণ করলেন। রসিক মেথরকে উদ্ধার করা, শেষ সময়ে দর্শন দিয়ে তার কৈবল্য মুক্তির ব্যবস্থা করা যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঘটনা—তেমনি চামার ও অন্য নীচ জাতির লোকদের শ্রীরামকৃষ্ণের নাম দিয়ে উদ্ধার করাও মহাপুরুষ জীবনের একটি বড় ঘটনা। তাতে করে ঠাকুর, স্বামীজী ও তাঁদের আগমন যে দীনদরিদ্র, তাবৎ অস্পৃশ্যদের উদ্ধারের জন্য তা তিনি জানিয়ে দিলেন জগৎকে।

এই পরমদয়ালের কৃপা আমার উপরও অজস্র বর্ষিত হয়েছে ও হচ্ছে। তাঁর দয়াতেই এই শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে স্থান পেয়েছি। তিনিই কৃপা করে এই অযোগ্যকেও ব্রহ্মচর্য-দীক্ষা ও সন্ন্যাস-দীক্ষা দান করেছেন। এতকাল পরেও অনুভব করি তিনি পথপ্রদর্শকরূপে আমাকে হাত ধরে নিয়ে চলেছেন। ১৯২৯ সালের সিলেট-কাছাড় বন্যা-সেবাকার্য করতে গিয়ে এত কাজের চাপে পড়লাম যে, আর মঠে এসে তাঁর শ্রীচরণদর্শন করতে পারিনি। কিন্তু তাঁর কাছে যা পেয়েছি তাতেই অন্তর ভরে আছে।

মহাপুরুষজীর স্মৃতিকথা

স্বামী মুকুন্দানন্দ

কাশী হতে ১৯১৯ সালে পূজার কয়েকদিন পূর্বে বেলুড় মঠে গিয়েছি, মঠে পূজা হবে, প্রতিমা তৈরি হচ্ছে। মহাপুরুষজীকে প্রণাম করতে গিয়েছি, প্রণাম করতেই আমি কাশী থেকে আসছি শুনে তিনি খুব আনন্দিত হলেন ও বললেন, "বেশ করেছ, মা আনন্দময়ী আসছেন, মায়ের কাজ করতে হবে।" পরে দেবেনদাকে ডেকে বললেন, "এই ছেলেটি কাশী থেকে এসেছে, তোমার সঙ্গে মার কাজে লাগিও।" আমাকে বললেন, "তোমাদের অনেক কাজ করতে হবে। এই দেখ না সেদিন চারজন ব্রহ্মচারী না বলে চলে গেছে।" পরে শুনলাম উমেশ, ভোলানাথ প্রভৃতি না বলে মঠ হতে জয়রামবাটী হয়ে কাশী গিয়েছিল। যাই হোক আমার ভয় ভেঙে গেল। মহাপুরুষ মহারাজ সম্বন্ধে একটু ভয় ছিল। সকাল-সন্ধ্যায় তাঁকে প্রণাম করতে গেলে তিনি খুবই স্নেহ করতেন। সেবার ১৯১৮ সালে তাঁকে যখন প্রথম দর্শন করেছিলাম, তখন বেশ ভয় হয়েছিল।

মহাপুরুষজীর অনেক কৃপা পেয়েছি। তিনি আমাকে মঠে শ্রীশ্রীঠাকুর-পূজা করার অনুমতি দেন এবং অনেক আশীর্বাদ করেন। সেসব ঘটনা স্মরণ করে আমার চোখে জল আসে। কিভাবে ঠাকুরের পূজা করতে হবে, কিভাবে জিনিসপত্র যত্ন করে রাখতে হবে—সব বিষয় তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর কৃপায় কিছু কিছু অনুভূতিও যে না হয়েছে তা নয়।

কোন সময় সামান্য সর্দি হয়েছে, মঠে অন্য পূজারি তখন নেই, মহাপুরুষজী শ্রীশ্রীঠাকুর উঠাবার জন্য আমার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি ঘড়ি দেখবার জন্য উঠেছি (আমি তখন মঠের উপরেরই এক ঘরে থাকতাম)। আমাকে দেখে তিনি বললেন—"আমিই আজ শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা করি, তোমার শরীরটা খারাপ, তুমি বিশ্রাম নাও।" আমি বললাম—"তা কি হয়, মহারাজ, আমরা থাকতে আপনারা এই বয়সে ঠাকুরপূজা করবেন! আমার শরীর একটু ভালই আছে, কোন কষ্ট হবে না।"...

দীক্ষা দেওয়ার সময় তিনি যেন আর এক মানুষ হয়ে যেতেন! শ্রীশ্রীঠাকুরকে

অর্ঘ্য দেবার সময় দেখেছি, ভাবে তাঁর হাত থরথর করে কাঁপছে। তিনি ধ্যানস্থ হয়ে অনেকক্ষণ থাকতেন, শিষ্যদের কার কি ভাব, কাকে কি মন্ত্র দিতে হবে, তা দেখে নিতেন, পরে আমাকে তাদের ডাকতে বলতেন, আমিও এক একজন করে তাঁর সামনে বসিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিতাম। পরে যখন দীক্ষা শেষ করে বাইরে আসতেন, তখন টলতে টলতে আসতেন তখনও যেন পূর্ণ ভাবস্থ। আমরা শুনেছি শ্রীশ্রীঠাকুরই নাকি তাঁকে মন্ত্র বলে দিতেন।

মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের মঙ্গল আরাত্রিকের সময় বা একটু পরে তিনি তাঁর নির্দিষ্ট আসনে মন্দিরের ভিতর বসতেন। সমাহিত অবস্থায় প্রায় দু-ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা কাটত, পরে তিনি ঘরে যেতেন। যাবার সময় একবার দক্ষিণদিকের বারান্দা ও ধ্যানঘর দেখে যেতেন—ছেলেরা জপ-ধ্যান করতে এসেছে কিনা। সকালে ঘরে বসেই মঠের সমস্ত খবর নিতেন এবং ধর্মপ্রসঙ্গ করতেন। এক এক সময় তাঁর ব্রহ্মভাবের এত প্রকাশ হতো যে তিনি বলতেন, "আমার যেন দেহধারণ হয়নি, আমি যেন সংসারে আসিনি।" তিনি সব সময় ঠাকুরের ভাবে ভরপুর হয়ে থাকতেন। তাঁর শরীর-মনটাই রামকৃষ্ণময় হয়ে গিয়েছিল।

তখন বিশেষ বিশেষ দিনে ঠাকুরের "আত্মারামের কৌটা" বের করে 'মহাস্নান' করানো হতো (যেমন মহাষ্টমী, স্নানযাত্রা, ১ বৈশাখ, শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজা ইত্যাদি)। সেই সময় মহাপুরুষ মহারাজ এসে 'আত্মারামকে' স্নান করাতেন এবং আত্মস্থ হয়ে অনেকক্ষণ প্রভুর কৌটা মাথায় ধারণ করে থাকতেন, তখন দেখতাম তাঁর সব শরীর যেন কাঁপছে। পরে আমরা পূজা করে বন্ধ করে দিলে বলতেন, "খুব সাবধানে কাজ করো। প্রভু জাগ্রত আছেন, তাঁর সেবা খুব সাবধানে করবে।" পরে ইষ্টকবচটিও নিয়ে মস্তকে স্পর্শ করতেন এবং বলতেন, "আমার বাবা করে দিয়েছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের গাত্রদাহের সময়, এতে 'মা' (মা-কালী) সাক্ষাৎ বিরাজিতা আছেন। খুব যত্নে রেখ এবং সাবধানে পূজা করো।" এই ইষ্ট-কবচেই তখন রোজ ৺মাকালীর পূজা হতো। বিশেষ পূজার সময় ও কালীপূজার সময় কত আমাদের বলতেন—"মা সাক্ষাৎ বিরাজ করছেন, তোমরা তাঁর পূজা কর।" তিনি মাথায় হাত দিয়ে অনেক সময় আশীর্বাদ করেছেন। তিনি একদিকে ব্রহ্মজ্ঞশিরোমণি, অন্যদিকে মার একান্ত ভক্ত। ঠাকুরই তাঁর মা। তিনি বলতেন যে, ঠাকুর তাঁর চিবুকে হাত দিয়ে আদর করতেন। ৺দুর্গাপূজার একমাস পূর্ব হতে তিনি মার আগমনী গান গাইবার জন্য আদেশ করতেন, নিজেও গুনগুন করে কখনো বা জোরে আগমনী গান গাইতেন। একমাস পূর্ব হতে আনন্দের হাট বসত। দেওঘর, জামতাড়া যখন গিয়েছিলেন সেখানেও আনন্দের হাট বসিয়েছিলেন। জামতাড়ায়

তিনি দু-তিনজনকে মন্ত্রদীক্ষা ও একজনকে সন্ন্যাস দিয়েছিলেন। সরল সাঁওতালদের নিয়ে খুব আনন্দ করতেন। এরূপ অনেক সব ব্যাপার হয়েছে।

* * *

ঐ সময় কিছুদিন থেকে 'কৈলাস' দর্শনে যাবার ইচ্ছা মনে খুব বলবতী হয়েছে। ১৯২৬ সালের জুন মাস। আমি ও মনু (স্বামী অচিন্ত্যানন্দ) দু-জনে মহাপুরুষ মহারাজের কাছে মহাদেবের প্রিয়স্থান 'কৈলাস' দর্শনে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করতে গিয়েছি। আমি তখন মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরে পূজা করি। ঐদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের বৈকালিক ভোগ প্রভৃতি সেরে তাঁর ঘরে গেলাম। আমরা প্রণাম করে দাঁড়াতেই তিনি হেসে হেসে বলছেন—"কি শশধর, কি খবর?" আমি একটু ইতস্তত করে পরে বললাম—"আমাদের কৈলাসদর্শনে যাবার ইচ্ছা হয়েছে, তাই আপনার অনুমতি নিতে এসেছি।"

প্রথমে তিনি একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন, পরে সুর করে বললেন—"খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে, কাল করলে এঁড়ে গরু কিনে। কোথায় যাবে? সে অতি দুর্গম তীর্থ। এখানে তুমি ঠাকুরের পূজা করছো। ওতেই সব হবে। তাঁর পূজা করছো, তোমাদের কোন অভাব থাকবে না।"

তিনি আর অনুমতি দিলেন না। সেবার যাওয়া হলো না। মনটা খুব খারাপ হয়ে রইল। সেদিন ঠাকুরের আরাত্রিকের পর ধ্যান করতে বসেছি, প্রথমে মন কিছুতেই বসছে না—কৈলাসদর্শনের কথাই কেবল মনে আসছে! কিছুক্ষণ পরে এক অপূর্ব দিব্যদর্শন হলো! আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। ৺কৈলাসপতির দর্শন হয়েছিল। সে অনুপম দর্শনের কথা প্রকাশ করার নয়। অনেক পরে ভোগের ঘণ্টা পড়তে উঠলাম। মন এক দিব্য আনন্দে ভরপুর। সারারাত যেন এক নেশায় ছিলাম। পরের দিন সকালে মহাপুরুষজীকে প্রণাম করতে গিয়েছি—তিনি হেসে বললেন, "কেমন আছ? এখনও কি কৈলাস মাথায় ঘুরছে?"

আমি বললাম—"না, মহারাজ।" পরে রাত্রের দর্শনের কথা বললাম। তিনি বললেন—"শ্রীশ্রীঠাকুরই কৃপা করে তোমায় দর্শন দিয়েছেন। ঠাকুরই সব, তিনিই কৈলাসপতি, তিনিই বৈকুণ্ঠপতি, তিনিই সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম।"

আমি বললাম—"আপনার কৃপাতেই তা হয়েছে।"

তিনি গম্ভীর হয়ে রইলেন। আমার কিন্তু বিশ্বাস, মহাপুরুষ মহারাজের কৃপাতেই ঐ দিব্যদর্শন হয়েছিল।

* * *

মহাপুরুষজীর কাছে কেউ কৃপালাভে বঞ্চিত হতো না! এমন কি যারা সমাজে পতিত-পতিতা তারাও বাদ যেত না। তিনি চামারদেরও কৃপা করেছেন।

১৯২৪ সাল হবে। গরমের সময় কলকাতার বিখ্যাত অভিনেত্রী...তার ছোট মেয়েটিকে মহাপুরুষজীর কাছে দীক্ষার জন্য মঠে এনেছে। পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের অনুমতি পেয়েছে। অনেক জিনিসপত্র এনেছে, ফল-মিষ্টি কাপড়চোপড় প্রচুর। ভোগের জন্য অনেক টাকা দিয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের ষোড়শোপচারে পূজা হোম ইত্যাদি হচ্ছে।...দীক্ষাদি তো হয়ে গেল। ভোগ উঠবার পূর্বে আমি পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের কাছে গিয়ে ভোগ নিবেদন সম্বন্ধে মনে যা শঙ্কা এসেছিল তা নিবেদন করি। তিনি সব শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন। শেষে বললেন—"কে ভাল, কে মন্দ আমরা জানিনা? শ্রীশ্রীঠাকুর কি কেবল আমাদের জন্যই এসেছিলেন—এদের জন্য আসেন নি? ঠাকুর চৈতন্যলীলা-অভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন এবং সেখানে অভিনেত্রীদের প্রণাম গ্রহণ করেছিলেন, ইত্যাদি।"

মহাপুরুষজী আমাকে ভোগ দেবার অনুমতি দিলেন। তিনি কাউকে বঞ্চিত করতেন না। সকল স্তরের লোকের প্রতি তাঁর কৃপা-বিতরণ আমরা স্বচক্ষে দেখেছি। কেউ রিক্তহস্তে দীক্ষা নিতে এলে তিনি ঠাকুর-ভাঁড়ার থেকে একটি ফল কিংবা একটি হরীতকী তাঁর হাতে দিতে বলতেন। তাঁর সকল লোকের প্রতিই ওরূপ সমদর্শিতা ও উদারতা ছিল। তিনি নিজের শরীর দেখিয়ে বলতেন—"এ খোলটার ভিতর ঠাকুর আছেন। তিনিই সব করছেন।"

* * *

সত্যকথা বললে তিনি খুব খুশি হতেন। একবার মঠের কাজের জন্য আমি আর একজন সাধুর সঙ্গে কার্শিয়াং গিয়েছিলাম এবং পরে ৺কামাখ্যাদি দর্শন করে পূর্ববঙ্গের কয়েকটি স্থান দেখে মঠে ফিরি।...পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে কোন কোন ভক্ত আমার কাজে খুব বিরোধিতা করেছিল। সেসব খবর তিনি ইতঃপূর্বেই পেয়েছিলেন। তাই মঠে পৌঁছে তাঁর সঙ্গে দেখা করতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন—"কি, কোথায় কোথায় গিয়েছিলে, ময়মনসিংহ-এ কি হয়েছিল?" আমি সব খুলে বলতে তিনি খুশি হয়ে বললেন—"হাঁ, তাতে ভয় কি? সত্যকথা বলতে ভয় করো না। তুমি তো সত্য ঘটনাই বলেছ। আমাদের সত্যের ঠাকুরই তোমাকে রক্ষা করেছেন।... আমাদের ঠাকুর সব ত্যাগ করেও সত্য ত্যাগ করতে পারেননি।"

* * *

১৯২৪-২৫ সালের ঘটনা হবে। একবার বর্ষাকালে শ্রাবণের শেষে বিকাল ৩-৩০টায় শ্রীশ্রীঠাকুরঘর খোলার জন্য ভাঁড়ারের সামনে অপেক্ষা করছি। মহাপুরুষ

মহারাজ বললেন—"দেখ তো, কে যেন 'নিলাম আম' গাছের আম পাড়ছে।" তিনি তাঁর ঘরের জানালা থেকে দেখতে পেয়েছিলেন। কয়েকটি ছেলে, এক ভদ্রমহিলা ও তাঁর স্বামী আম পাড়ছিল। তিনি তাঁর ঘর থেকে দেখতে পেয়ে বলছিলেন—"ঐ গাছের আম এখনো ঠাকুরদের দেওয়া হয়নি অথচ কে যেন আম পেড়ে নিয়ে যাচ্ছে!" আমরা গিয়ে দেখি যে, অনেকগুলি আম পেড়েছে, আমাদের দেখে ভদ্রলোক একটু সঙ্কুচিত হয়ে বললেন, "ছেলেরা পেড়ে ফেলেছে, এই আমগুলি আপনারা নিয়ে যান। এদের অপরাধ মাপ করবেন।"

আমরা আম সহ ওদের মহাপুরুষজীর কাছে নিয়ে এলাম। তিনি সব শুনে গম্ভীরভাবে বললেন—"এবার ঐ গাছের আম এখনো ঠাকুরদের দেওয়া হয়নি। তোমাদের এ আম তো ঠাকুরের ভোগে দেওয়া যাবে না। এসব তোমরাই নিয়ে যাও।" এবং আমাদের বললেন—"এদের ঠাকুরের প্রসাদ দাও।" তাঁরা ঠাকুরের প্রসাদ পেয়ে খুব খুশি হয়ে মহাপুরুষজীর প্রশংসা করতে করতে চলে গেলেন। পরে মাঝে মাঝে মঠে আসতেন এবং ক্রমে ঠাকুরের ভক্ত হলেন। তখন মঠে কয়েকটি বাতাবি লেবু, নিলাম আম, গোপাল ঘোবা ও জামরুল গাছ ছিল। প্রচুর ফল হতো। এখন সেখানে মন্দির হওয়াতে ঐ গাছগুলি সব কাটা পড়েছে।

* * *

১৯২৬ সালের জানুয়ারি মাসে মহাপুরুষ মহারাজ বেলুড় মঠ হতে প্রায় ত্রিশজন প্রবীণ-নবীন সাধু ও ব্রহ্মচারী সহ দেওঘর বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠা-কার্যের জন্য যান। আমরাও তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলাম। সেখানে কয়দিন ধরে উৎসবানন্দের হাট বসেছিল। বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি কয়েকজন সন্ন্যাসী সহ একদিন ব্রহ্মচারী বালানন্দজীর আশ্রম দেখতে গিয়েছিলেন। তাঁরা খুব যত্ন করে তাঁকে আশ্রম দেখালেন। ব্রহ্মচারী বালানন্দজীও মহাপুরুষজীর সঙ্গে খুব হৃদ্যতাপূর্ণ ভাবে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলছিলেন—এমন সময় তাঁর একজন প্রধান শিষ্য মহাপুরুষজীর সঙ্গে শাস্ত্রীয় বিচার করবার জন্য নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন। মহাপুরুষজী ঐ সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়ে বললেন—"আমাদের কাছে যদি কিছু জানবার প্রয়োজন থাকে তো (ব্রহ্মদর্শন বা ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে) তা জেনে নাও। আর যদি শুধু শাস্ত্রীয় বিচার বা তর্ক করতে চাও তো এই ছেলেদের সঙ্গে কর।" এই বলে স্বামী ওঁকারানন্দ প্রভৃতিকে দেখিয়ে দিলেন।

ইতোমধ্যে স্বামী ওঁকারানন্দ বালানন্দজীর শিষ্যকে বললেন—"এ কি করছেন আপনি! ওঁদের কাছে আমরা সিদ্ধান্ত বাক্য শুনব। যদি শাস্ত্রীয় বিচার করতে হয় তো আমাদের কাছে আসুন।" তাই শুনে বালানন্দজী তাঁর শিষ্যকে তিরস্কার

করলেন। শাস্ত্রীয় বিচার আর হলো না। শ্রীমহাপুরুষজী ঐ আশ্রমটি দেখে খুব খুশি হন এবং বালানন্দজীর সঙ্গে আলাপ করেও বিশেষ আনন্দিত হয়েছিলেন।

মঠে ফিরিবার পথে তিনি জামতাড়ায় নেমেছিলেন এবং ওখানে কয়েকদিন থেকে সকলকে খুব আনন্দ দিয়েছিলেন।

মহাপুরুষজীর স্মৃতি

স্বামী ঈশানানন্দ

১৯১২ সালে কলকাতায় এসে আমার প্রথম মহাপুরুষ মহারাজের দর্শন হয়। দেশে কোয়ালপাড়ায় ১৯০৯ সালে শ্রীশ্রীমা ও স্বামী সারদানন্দ মহারাজকে দর্শন করলেও শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যান্য ত্যাগি-সন্তানদের দর্শন ১৯১২-তে বাগবাজার শ্রীশ্রীমায়ের বাটিতে এসেই হয়েছিল। এভাবে আট-নয় জন মহাপুরুষের দর্শনলাভের সৌভাগ্য হলেও পূজ্যপাদ সারদানন্দ মহারাজ ও পূজ্যপাদ শিবানন্দ মহারাজের সঙ্গেই বেশি ঘনিষ্ঠতা হওয়ায় তাঁদের স্নেহ-ভালবাসা লাভের সুযোগ বেশি হয়। শ্রীশ্রীমায়ের দেশের লোককে তাঁরা অন্য চক্ষে দেখতেন। আমাদের দেখে তাঁদের মনে শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিই উদিত হতো বলে আমরা অন্যান্য ভক্ত অপেক্ষা বেশি আদরস্নেহ পেতাম।...

১৯১৮ সালে ৺গঙ্গাসাগর দর্শনান্তে আমার শরীর অসুস্থ হওয়ায় শরৎ মহারাজের (স্বামী সারদানন্দের) চিঠি নিয়ে বেলুড় মঠে গিয়ে কিছুদিন বাস করার সৌভাগ্য হয়। তখন পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজের শরীরত্যাগ হয়েছে; মহাপুরুষ মহারাজই মঠের কাজকর্মের তত্ত্বাবধান করেন। দুবেলা ঠাকুরঘরে ধ্যানান্তে মহাপুরুষজী নিজের ঘরে ফিরে গেলে আমরাও জপধ্যানের পর তাঁকে প্রণাম করতে যেতাম। বিশেষত প্রতিদিন সকালে তাঁর কাছে গেলে তিনি সকলকে খুবই স্নেহ-প্রীতির সঙ্গে কুশলপ্রশ্নাদির পরে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর কথা খুব বলতেন। প্রসঙ্গক্রমে তাঁদের দক্ষিণেশ্বরে বাস এবং তীর্থে তীর্থে ও হিমালয়ে তপস্যাময় জীবনের ঘটনা বলেও আমাদের মনে ত্যাগ-বৈরাগ্য, ঠাকুরের প্রতি একান্ত শরণাগতি ও ভক্তিভাব উদ্দীপিত করে দিতেন।

আমাকে দেখে একদিন মহাপুরুষজী বললেন—"এখন মঠে ম্যালেরিয়ার সময়, বাবা! খুব সাবধানে থাকবে এখানে, ঠাণ্ডা লাগাবে না।" আশ্চর্য পরদিনই আমার

ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হলো। সে জন্যে তার পরদিন সকালে তাঁকে আর প্রণাম করতে যাইনি। কিছুক্ষণ পরে তিনি নিজেই কয়েকখানি বিস্কুট নিয়ে আমার বিছানার পাশে উপস্থিত হলেন এবং গায়ে কপালে হাত দিয়ে জ্বর দেখে দুধ ও বিস্কুট খাবার ব্যবস্থা করে, দেবেন মহারাজকে আমার দেখাশোনার বিষয় সব বলে তবে নিশ্চিন্ত হলেন। তখন দেবেন মহারাজ খুব প্রাণ দিয়ে পীড়িত সাধু-ব্রহ্মচারীদের সেবা করতেন। দু-চার দিন জ্বরে ভুগে আমি সেরে উঠি, সাধ্যমত মঠের কাজকর্ম করি এবং দু-বেলা মহাপুরুষজীর ঘরে তাঁকে প্রণাম করতে যাই। একদিন আমাকে বললেন, "এখানে বেশ আনন্দে আছ তো?"

"ঠাকুরের স্থানে আপনাদের সঙ্গে খুব আনন্দে আছি" বলায় তিনি আমাকে খুব জোর দিয়ে বলতে লাগলেন—"এ শুধু ঠাকুরের স্থান কি? শ্রীশ্রীঠাকুর এখানে সাক্ষাৎ বিরাজ কচ্ছেন। আমরা দক্ষিণেশ্বরে তাঁর কাছে যেমন থাকতাম, বসে কথাবার্তা বলতাম, এখানেও তেমনি তাঁর অবস্থিতিতে মনপ্রাণ আনন্দে ভরে আছে। বাবা! তোমরা জয়রামবাটীতে মার কাছে যেমন তাঁর ফাইফরমাস খাটতে, কাজগুলি করতে এবং কত আনন্দে কাটাতে, এখানেও তাঁরই স্থানে ছোটখাট যে কোন কাজ করছো—আনন্দে থাকবে না? নিশ্চয়ই আনন্দে থাকবে। সংসারে মানুষ ভোগবাসনার পেছনে ছুটে দিনরাত দুঃখকষ্ট ও অশান্তি পায়, তোমরা কত ভাগ্যবান—ঠাকুরের স্থানে তাঁর কাজ নিয়ে সর্বদা আছ, তাঁর কাছেই রয়েছ। সব কাজই তাঁর কাজ—এটি পাকা করে বুঝলে, ব্যস, এটি হলেই আনন্দে থাকবে। এ খুব আনন্দ ও শান্তির স্থান। এখানে ঠাকুর নিত্য বিরাজ করছেন।"

আর একদিন সকালে তাঁর কাছে যেতেই আমাকে বলছেন, "দেখ, কাল্ল রাত্রে শরৎ মহারাজ সংবাদ পাঠিয়েছেন, আজ বিকেল চারটের সময় মা রাধুকে নিয়ে এখানে আসবেন, 'সোনার বাগানে' (বেলুড় মঠের উত্তরদিকের বাগানবাড়িতে) থাকবেন। রাধু অসুস্থ, তার কলকাতার গাড়ি-ঘোড়ার শব্দ ও লোকজনের গোলমাল সহ্য হয় না, তাই মা তাকে নিয়ে এখানে নির্জনে থাকবেন কিছুদিন। তোমরা ঐ বাড়িঘর ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে রাখ। তাঁর কথামত আমরা 'সোনার বাগানে' গিয়ে বাড়িঘর সাফ করছি এমন সময় তিনি নিজে ওখানে গেছেন এবং সব বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখাশুনা করে আমাদের খুঁটিনাটি নির্দেশ দিলেন। বেলা একটার সময় কাজ শেষ হলো। আমরা শ্রীশ্রীমায়ের আগমনপ্রতীক্ষায় আছি, এমন সময় খবর এল—মা-র আসা হবে না, সামনেই স্বামীজীর উৎসব আর রোজ আরতির ঘণ্টা, স্তবপাঠ ইত্যাদির শব্দ রাধু সহ্য করতে পারবে না। তাই মা রাধুকে নিয়ে নিবেদিতা স্কুলের (বোর্ডিং) বাড়িতে গেলেন। কিন্তু শ্রীশ্রীমার প্রতি মহাপুরুষজীর

শ্রদ্ধাভক্তি দেখে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। দু-এক দিন অন্তর আমাকে দিয়ে সকালে কিছু ফুল-ফল, আমরুলশাক, শাকসব্জি বাগবাজারে মার জন্য পাঠাতেন আর মায়ের খবর আনতে বলতেন।...

এর পর মঠে স্বামীজীর উৎসব হয়ে গেল। পরদিন বিকালে এক ব্রহ্মচারী মায়ের আদেশে উদ্বোধন থেকে আমাকে নিতে এসেছে, মার সঙ্গে জয়রামবাটী যেতে হবে। মহাপুরুষ মহারাজ তা শুনে খুবই আনন্দে আমাকে মার কাছে পাঠালেন। আমার যাতে কোন কষ্ট না হয়, তাই শীতে ব্যবহারের জন্য একখানি ভাল খদ্দরের মোটা চাদরও দিলেন।...

এর পূর্বে উদ্বোধনে থাকাকালীন শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথিপূজার দিনে তিনি যখন সকল ভক্তদের পূজা গ্রহণ করছিলেন তখন আমাকে বললেন, "আজ বিশেষ দিন, তুমি কিছু ফুল নিয়ে তোমার ও যারা আসতে পারেনি তাদের জন্য আমার পায়ে অঞ্জলি দাও। মঠ থেকে তারক আসতে পারেনি, তার নাম করেও পুষ্পাঞ্জলি দাও।"

বিকালে মহাপুরুষ মহারাজ ও অনেক সাধু-ব্রহ্মচারী মঠ থেকে একটি নৌকা করে মায়ের বাড়িতে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করতে এলেন। মহাপুরুষজী একটি বালকের মতো বদ্ধাঞ্জলি হয়ে কাঁপতে কাঁপতে মার পায়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে তাঁর পদধূলি নিয়ে ঐভাবে পিছু হটতে হটতে এলেন। শ্রীশ্রীমাও তাঁর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন, কোন কথাবার্তা হলো না। কিন্তু ভাব-গাম্ভীর্যে ঐ দৃশ্যটি আমাদের মনে অতি মধুর স্মৃতিরূপে রয়েছে।

পরে শরৎ মহারাজের ঘরে বসে কিছু ফলমিষ্টি প্রসাদ পেয়ে সকলকে নিয়ে তিনি মঠে ফিরে গেলেন।...

শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে যখন জয়রামবাটীতে যাই, তখন মহাপুরুষজী আমাকে মাসে দু-একখানি চিঠি লিখে মা কেমন আছেন—সেসব সংবাদ জানাতে বলেছিলেন। আমিও তাঁর নির্দেশমত মাঝে মাঝে তাঁকে শ্রীশ্রীমায়ের খবর দিতাম।

* * *

একবার ৺দুর্গাপূজার কয়েকদিন পূর্বে বেলুড় মঠ থেকে চারজন ব্রহ্মচারী মহাপুরুষজী প্রভৃতি মঠের কাউকে কিছু না বলে—পায়ে হেঁটে কাশী যাবার সঙ্কল্প নিয়ে জয়রামবাটীতে মার কাছে উপস্থিত হয়। তারা মাকে প্রণাম করে নিজেদের সঙ্কল্প জানায়। তাতে মা বললেন—"তোমরা মঠে ফিরে গিয়ে কিছুদিন ঠাকুরের ছেলেদের সঙ্গ কর, পরে তাদের মত নিয়ে কোন সময়ে কাশী যাবে।" কিন্তু তাদের দলপতি সঙ্কল্পে অটল; সে বললে—"না, মা, আমরা এখন মঠে ফিরে যাব না।

'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।' হেঁটে কাশী গিয়ে তপস্যা করবই। ফিরে যেতে মোটেই ইচ্ছে নেই।" পরদিন তারা হেঁটে কাশী রওনা হলো। এদিকে ঠিক পরদিনই মহাপুরুষ মহারাজের চিঠিও পেলাম। তিনি আমায় লিখেছিলেন—"ব্রহ্মচারীরা সম্ভবত জয়রামবাটীতে মার কাছে গিয়েছে। তাদের আমার কথা বলে শীঘ্র মঠে পাঠিয়ে দিও। তারা এ সময় মার কাছে গিয়ে তাঁকে বিব্রত করেছে। সেজন্য মার কাছে আমার জন্য ক্ষমা চেয়ো ইত্যাদি।" আমি উত্তরে জানিয়ে দিলাম, তারা মার আদেশ পালন না করেই কাশীতে চলে গিয়েছে। আমার এ চিঠি পেয়ে মহাপুরুষজী কাশীতে অদ্বৈতাশ্রমের অধ্যক্ষ চন্দ্র মহারাজকে লিখলেন—"ব্রহ্মচারী চারজন মার আদেশ অমান্য করে কাশী গিয়েছে, তাদের আশ্রমে স্থান দিও না। তারা বাইরে থেকে তপস্যা করবে।"

ব্রহ্মচারীরা তাই করতে লাগল, কিন্তু তাদের মধ্যে একজন (ভোলানাথ) অল্পবয়স্ক পাড়াগাঁয়ের ছেলে মাধুকরী ও থাকার কিছু ব্যবস্থা করতে না পেরে মার কাছে কাতরভাবে সব জানিয়ে কাশী অদ্বৈত আশ্রমে থাকার প্রার্থনা জানাল। ঐ চিঠি পেয়ে দয়াময়ী মা মহাপুরুষ মহারাজ ও চন্দ্র মহারাজকে চিঠি লিখে তাকে রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মহাপুরুষজী শ্রীশ্রীমায়ের আদেশ শিরোধার্য করে চন্দ্র মহারাজকে লিখে অদ্বৈতাশ্রমে ভোলানাথকে রাখার সব ব্যবস্থা করে দিলেন। তখন মহাপুরুষজীর আদেশ নিয়েই চন্দ্র মহারাজ অদ্বৈতাশ্রমের সব কাজ করতেন। ঠাকুরের সকল সন্তানই মার প্রতি সর্বদা পূর্ণ-আনুগত্য রাখতেন।

ঐ বছর কিছুদিন পরে কলকাতার একটি যুবক ভক্ত জয়রামবাটীতে এসে মার কাছে সাধু হবার প্রার্থনা জানায়। মা তার সব কথা শুনলেন। রাত্রে মা ছেলেটির কথা উত্থাপন করে আমায় বললেন, "ছেলেটি মঠে যোগ দিতে চায়। মাস্টার মশাই-এর বাড়ির কাছে আমহার্স্ট স্ট্রিটে এর বাড়ি। বাড়িতে মা-ভাইরা সব আছে; মাস্টার বলছে—এত তাড়াহুড়া করে নাইবা সাধু হলে, পরে যা হয় স্থির করবে। মঠে তারক কিন্তু একে খুব উৎসাহ দিচ্ছে। মাস্টার হাজার হোক সংসারী কিনা আর তারক সাদা সাধু লোক—ঠাকুরের জ্বলন্ত ত্যাগের আদর্শ নিয়ে আছে। আহা সাধু হওয়া কত ভাগ্যে হয়! তারক ঠিকই বলেছে—সংসারে একবার পড়লে আর উঠতে পারে ক-জন? ছেলেটির মনেও খুব জোর আছে। মঠে থাকার প্রবল আগ্রহ; লেখাপড়াজানা—বোকা হাবা নয় ও।" পরদিন ছেলেটি এসে মাকে আবার ঐ ইচ্ছা জানাতে মা বললেন—"তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক, বাবা! তারক যা বলেছে তা খাঁটি কথা। ও তো বহু ভাগ্যের কথা।" ভক্তটি শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ নিয়ে মঠে যোগদান করল।

দু-এক মাস পরে মা অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় উদ্বোধনের বাড়িতে এলেন। মঠ থেকে মহাপুরুষ মহারাজ প্রায়ই নৌকা করে এসে শরৎ মহারাজের ঘরে তাঁর কাছে বসে শ্রীশ্রীমার শারীরিক অবস্থার বিষয় সব আলোচনা করে সংবাদ নিয়ে মঠে ফিরে যেতেন। শ্রীশ্রীমার কাছে যেতেন না পাছে তাঁর কষ্ট হয় বা তিনি কোনপ্রকার বিব্রত বোধ করেন। শেষের দিকে মা সর্বদা গঙ্গাতীরে যাবার জন্যে খুব আগ্রহ প্রকাশ করতেন। বলতেন—"গঙ্গাতীরে নিয়ে চল, গঙ্গাতীরে গিয়ে আমি জুড়োব।"

শ্রীশ্রীমার দেহত্যাগের পর তাঁর শরীর যখন বেলুড় মঠে আনা হলো, তাঁর দেহ সৎকারের স্থান নির্বাচনের জন্য নানা জনে নানা স্থান মনোনীত করেন, কিন্তু মহাপুরুষ মহারাজ সব বাতিল করে শ্রীশ্রীমার জন্য গঙ্গাতীরে ঐ স্থানটি নির্বাচন করেন। তিনি বলেছিলেন—"শ্রীশ্রীমা শান্তিতে গঙ্গার দিকে চেয়ে থেকে সকলকে চিরশান্তি দান করবেন।"...

শ্রীশ্রীমার নরলীলাসংবরণের পর কিছুদিন বেলুড় মঠে গিয়ে থাকি। তখন সারা দেশে অসহযোগ ও বিদেশী-বর্জন আন্দোলন চলছিল। মঠে একটি শিল্প-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে, আমি মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের কিছু কিছু কাজ করা ছাড়াও দৈনিক তাঁতশালায় গিয়ে ছাত্রদের ও ব্রহ্মচারীদের তাঁত শেখাতাম। ঐ সময় মঠে রাত্রে ঠাকুরের ভোগ ওঠার পর ভিজিটারস-রুমে নিত্য ভজনগান হতো, আবার রাত্রে আহারের পর সকলে সমবেত হয়ে 'কথামৃত' পাঠ শুনত। মহাপুরুষ মহারাজও যোগদান করতেন। আমি তখন মধ্যে মধ্যে তবলা বাজাতাম। কিন্তু আমার শরীর দুর্বল থাকায় তবলার বোল খুব স্পষ্ট উঠত না। এক একদিন মহাপুরুষ মহারাজ আমার হাত থেকে বাঁয়াটি নিয়ে তাতেই বাঁয়া তবলার বোল সুন্দরভাবে বাজিয়ে দেখাতেন আর রহস্য করে আমায় বলতেন—"তবলা বাজাতে হাতে জোর নেই, কিন্তু তাঁতবোনার সময় বিদ্যুৎগতিতে মাকু চালায় ঐ হাড়ে।" মহাপুরুষ মহারাজের জীবন—কথা ও কাজে, উপদেশ ও আচরণে সব বিষয়েই সামঞ্জস্যপূর্ণ, পরিষ্কার ও নিখুঁত ছিল। আমাদেরও বলতেন—"জীবনটি নিখুঁত করতে চেষ্টা করবে।"

মঠে থাকার সময় রোজ নিয়মমত খুব সকালে ঠাকুরঘরে জপধ্যান করতে যেতাম। দেখতাম মহাপুরুষ মহারাজও ঠাকুরঘরে তাঁর নির্দিষ্ট স্থানটিতে মৃগচর্মের আসনে বসে ধ্যান করছেন। একদিন ঠাকুরঘর থেকে আমার ঘরে এসে দেখি যে তিনি ওখানে রয়েছেন। আমায় দেখেই বললেন—"কেমন আছ? আমি হাতজোড় করে বললাম—"ভাল আছি, মহারাজ।" আবার বলছেন—"বেশ আনন্দে আছ তো?" আমি জানালাম—"হাঁ মহারাজ, আপনাদের কাছে খুব আনন্দে আছি।"

উত্তরে তিনি বললেন—"কেন আনন্দে থাকবে না, এখানে ঠাকুর সশরীরে বিরাজ কচ্ছেন। আর তুমি মায়ের দেশে তাঁর কাছে কেমন আনন্দে থাকতে? তোমাকে দেখলে আমাদের মনেও মায়ের স্মৃতি জেগে আমাদেরও আনন্দ হয়। খুব আনন্দে থাকবে। কেন আনন্দে থাকবে না?"—এ কথা বারবার বলতে বলতে বসে গান ধরলেনঃ "মা যার আনন্দময়ী সে কি নিরানন্দে থাকে? ইহকালে পরকালে মা তারে আনন্দে রাখে।..." ইত্যাদি। দুটি হাত তুলে আনন্দে যেন নৃত্যের ভঙ্গিতে "জয় মা, জয় মা" বলতে বলতে উপরে নিজের ঘরে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখলাম, তিনি গুনগুন স্বরে গাইছেন—"আর কিছু নাই সংসারের মাঝে কেবল শ্যামা সার রে। একবার হেরিলে ও-কায়, সব দুঃখ যায়—এই গুণ শ্যামা মার রে।"

শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতিকথা

স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ

আমি ১৯১৬ সালে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের শ্রীচরণ প্রথম দর্শন করি। তখন তিনি বেলুড় মঠের মহন্ত। মঠের পুরাতন ঠাকুরের মন্দিরের নিচের তলায় খাবারঘরে তিনি আমাদের সকলের সঙ্গে প্রসাদ পেতেন। সেদিন আলু, বেগুন, পালংশাকের সঙ্গে বকফুলের ডাঁটা দিয়ে চচ্চড়ি হয়েছিল। তিনি বকফুলের ডাঁটার গুণবর্ণনা করেছিলেন। সব মনে নেই, তবে সর্দি-কাশির পক্ষে উপকারী এই কথা মনে আছে। বিকালে স্বামীজীর ঘরের দক্ষিণের বাগানে গোলাপ গাছের গোড়া পরিষ্কার করার সময়ে সঙ্গী সাধুদের জিজ্ঞেস করি—"এই গোলাপটির কি নাম?" তাঁরা নাম না জানায় বলেছিলেন, "আমরা কেবল গোলাপ ফুল বলেই জানি। গোলাপ ফুলের আবার নাম কিরে?" আমি তখন কতকগুলি গোলাপের নাম বলি। তাঁরা মহাপুরুষ মহারাজকে বলেন, "এইটুকখানি ছেলে আবার গোলাপের নাম জানে!" তিনি খুশি হলেন। আমি দেখতে বেঁটে হলেও তখন ম্যাট্রিক ক্লাশে পড়ি। সন্ধ্যা হয় হয় দেখে একজন স্বামীজী আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুই রাত্রে মঠে থাকবি নাকি?" আমি 'হ্যাঁ' বলায় তিনি বললেন, "তুই মহাপুরুষ মহারাজের অনুমতি নিয়েছিস? নতুবা তোকে তো থাকতে দেবেন না!" আমি ভয়ে কেঁদে ফেলি। তখন একজন মহারাজ দয়া করে বলেন, "তোর ভয় নেই; চল, আমি মহাপুরুষ মহারাজকে বলে দিচ্ছি।" তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে মহাপুরুষ মহারাজকে

বললেন—"মহারাজ, এই ছেলেটি জয়রামবাটী থেকে মার কাছে উদ্বোধনে এসেছে। ছোটবেলায়ই মার কৃপা পেয়েছে ও মার খুব সেবা করে। মা মঠ-দর্শনের জন্য একে পাঠিয়েছেন। রাত্রে মঠে থাকবে।" মহাপুরুষ মহারাজ শুনে খুশি হয়ে বললেন, "তোর য-দিন খুশি মঠে থাক।" আমি তিনদিন মঠে থেকে উদ্বোধনে ফিরি।

* * *

পরবর্তী ঘটনা—একদিন মহাপুরুষ মহারাজ বিকালে ভাণ্ডারি মহারাজকে জিজ্ঞেস করলেন, "আজ কি তরকারি দিয়েছ?" তিনি উত্তর দিলেন, "মহারাজ, আজ আলু-পটলের ডালনা দিয়েছি।" তাতে তিনি বলেন, "পোশাকি চলবে না। এখন পটলের খুব দাম—৫.০০ টাকা মন। যখন সস্তা হবে তখন চলবে। এখন দুটো কুমড়ো কেটে ওর সঙ্গে দিও।"

আর একদিন মহাপুরুষজী সোজা ভাঁড়ারে এসে আমাকে আধপোয়া চাল ওজন করতে বললেন। আমি তখন ব্রহ্মচারী ও ভাঁড়ারির কাজে সাহায্য করি। চাল ওজন করে দেখালাম। তিনি মুঠোর মাঝে মেপে নিলেন। শুনলাম পরে তাঁর জন্য বেশি চাল রান্না করা হয় বলে সেবককে বকেছিলেন। আর একদিন সকালে, যখন আমরা সকলে তাঁকে প্রণাম করতাম, তখন ভাণ্ডারিকে জিজ্ঞেস করলেন, "কি কি রান্না হবে ঠাকুরের ভোগের জন্য?" ভাণ্ডারি উত্তর দিলেন, "আজ শনিবার। একটু মাছ হবে এবং পোস্ত ও কলাইয়ের ডাল হবে।" তাতে তিনি বললেন, "ঠাকুর খেতেন, মাও কলাইয়ের ডাল ও পোস্ত ভালবাসতেন। বাঙালরা কলাইয়ের ডাল পছন্দ করে না। কিন্তু আমরা দেব।"

* * *

আমাদের সন্ন্যাসের সময়ে হঠাৎ ১৯২৮ সালের জানুয়ারি মাসে স্বামীজীর জন্মদিনের কয়েকদিন আগে কাশী থেকে দেওঘর বিদ্যাপীঠে টেলিগ্রাম এল, "Brahmacharins three years complete, come for Sannyas... Shivananda." আমরা তিনজন গেলাম। আমার সঙ্গে সৎস্বরূপানন্দজী ও গম্ভীরানন্দজী ছিলেন। এঁরা দু-জন হঠাৎ টেলিগ্রাম পেয়ে একটু আশ্চর্যান্বিত হলেন। তখন আমি বললাম, "আমি ১৯২৭ সালের ডিসেম্বর মাসে শ্রীশ্রীমার তিথিপূজায় কাশীতে সন্ন্যাস হবে জেনে মহাপুরুষ মহারাজের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম, আমাকে কৃপা করে সন্ন্যাস দিতে। কারণও দেখিয়েছিলাম যে, আমি মার কৃপাপ্রাপ্ত, তাঁর জন্মদিনে সন্ন্যাস পেলে খুব আনন্দ হবে।" তার উত্তরে তিনি লেখেন—"তোমাদের ওখানে আরও যারা আছে তাদেরও স্বামীজীর তিথিপূজায় একসঙ্গে মঠে সন্ন্যাস

দেব—তখন আমি মঠে হয়তো যাব—তোমাদের কাছে হবে।” কিন্তু তাঁর মঠে তখন যাওয়া হয়নি বলে এই টেলিগ্রাম এসেছে।

আমাদের সন্ন্যাসের দিনে মহারাজ আদেশ দিলেন, “দুপুরে ঠাকুরের ফল মিষ্টি প্রসাদ নেবে। সারা দিনরাত উপোস করতে হবে না।” সঙ্গে সঙ্গে কাশী অদ্বৈত আশ্রমের পূজক ও ভাণ্ডারিকেও আদেশ দিলেন যেন আমাদের ডেকে প্রসাদ দেওয়া হয়। কিন্তু আমরা প্রসাদ গ্রহণ করব জেনে, স্বামী হরানন্দজী আমাদের বললেন, “হ্যাঁ, জীবনে একদিনই সন্ন্যাস হবে—তাও উপোস করতে পারবে না? খেয়ে দেয়ে সন্ন্যাস নেবে?” এজন্য আমরা প্রসাদ না নেওয়ায় মহারাজ আমাদের সকলকে তাঁর কাছে ডাকলেন এবং তাঁর সামনেই প্রসাদ নিতে বললেন। আরও বললেন, “হরানন্দ কি জানে? উপোস করলেই কি সব হয়ে গেল? আমি যা বলেছি তাই কর। একটু প্রসাদ নিলে ভালই হবে। সারা দিনরাত উপোস করলে ক্ষিদের জ্বালায় মন্ত্রের দিকে মন যাবে না।” আমি সন্ন্যাসের পরে জিজ্ঞেস করলাম, “মহারাজ, এখন কি প্রেষ মন্ত্রাদিই জপ করব? শ্রীশ্রীমা যে জপ দিয়েছেন তা ছেড়ে দেব?” তার উত্তরে তিনি বিস্মিতভাবে বললেন, “আরে না, না। মা যে মন্ত্র দিয়েছেন সেইটিই আসল মন্ত্র—তা কি ছাড়তে আছে?” সন্ন্যাসের পরে দণ্ড-বিসর্জনের জন্য ভোরে গঙ্গাস্নানে যাবার সময় ঠাণ্ডা লাগবে ভেবে আমাদের গরম জামা, চাদর ও কম্বল নিয়ে যেতে বললেন। কিন্তু আমাদের ভোরবেলায় গঙ্গার জল গরম এবং স্নান করতে আরামদায়কই লেগেছে বলায় খুব খুশি হলেন।

আমি পরদিন সকালে তাঁকে প্রণাম করতেই তিনি কিভাবে ছিলেন বলে বললেন, “রামময় সন্ন্যাসী হয়ে গেল। আমাদের সঙ্গে ডোন্ট কেয়ার (Don't care)।” আমি তখন বললাম, “মহারাজ, তা কি হয়? চিরদিন আপনার চরণের দাস হয়ে থাকব।” তখন তিনি বললেন, “না, না, সন্ন্যাসী স্বাধীন।” বিকালে গিয়ে দেখি—মহারাজ আস্তে আস্তে ‘মতি, ও মতি’ বলে ঘুমন্ত মতিকে (স্বামী শিবস্বরূপানন্দ) ডাকছেন। কিন্তু গত রাত্রে সন্ন্যাসের জন্য রাত জাগায় মতি মহারাজের ঘুম ভাঙল না। আমি ডেকে দিতে যাওয়ায় নিষেধ করলেন ও ঘরে চলে গেলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঘরে গিয়ে কিছু সেবার কাজ আছে কিনা এবং আমি করতে পারি কিনা প্রার্থনা করায় বললেন, “না, কিছু করতে হবে না।” মতি মহারাজ জাগতেই ঐ কথা শুনে বললেন, “আহা! হয়তো এক গেলাস জল দিতে হতো। এই সময়ে শুধু এক গেলাস জল খান। আমি তাঁর জলে সামান্য একটু মিছরিগুঁড়ো মিশিয়ে দিই। তাতে জলের বেশ স্বাদ হয় ও আনন্দের সঙ্গে খান। আপনি সেটি জানেন না। আপনি আমাকে ঠেলে উঠালেন না কেন?”...

আমাকে একটা কথা তিনি অনেকবার বলতেন। ভুলে যেতেন যে আরও কয়েকবার বলেছেন। আমি বদনগঞ্জ স্কুলের ছাত্র ছিলাম। তাই আমাকে ও অমূল্যকে (অলোকানন্দকে) দেখেই বলতেন, "হ্যাঁ, একবার মার জন্য তোমাদের কয়াপাট (অমূল্যের জন্মস্থান কয়াপাটে) বদনগঞ্জের হাট থেকে তরকারি কিনতে গিয়েছিলাম। মা বলে দিয়েছিলেন, 'বাবা, মাথায় করে এনো না—একটা মুটে করে আনবে।' তাই হাট করে একটি মুটে ঠিক করলাম। তাকে জিজ্ঞেস করলাম—'তুই জয়রামবাটী জানিস?' তাতে সে বলেছিল—'হ্যাঁ বাবু, জয়রামবাটী কেনে জানবনি? আমি জানি।' তখন তার মাথায় মোট দিয়ে কিছুদূর আসবার পরে সে বলে উঠল—'বাবু মশায়, রাস্তাটির তো ঠাওর পাচ্ছিনি।' তখন আমি বললাম—'বলিস কিরে, আমি তোর ভরসায় যাচ্ছি, তুই বলেছিলি রাস্তা জানিস।' তখন লোকদের জিজ্ঞেস করে করে আসি।"...

একবার দেওঘর বিদ্যাপীঠ থেকে আমি কিছু ভাল ভাল গোলাপফুল নিয়ে মঠে গিয়ে মহারাজকে দেখিয়ে ঠাকুরঘরে নিয়ে যাই। একটি ফুলের নাম Frei Frau Ida Von Schubert বলায় বললেন—"আরে বাপরে! এত বড় নাম কি করে মনে রাখ?" অনেকগুলি ফুল খুব সুগন্ধ ছিল। গন্ধের জন্য খুব প্রশংসা করলেন। ঠিক ঐ সময়েই ভাব মহারাজ (স্বামী রামেশ্বরানন্দজী) জামতাড়া আশ্রম থেকে কতকগুলি বড় বড় Paul Neyron গোলাপ নিয়ে যান। তাতে গন্ধ না থাকায় বললেন, "এগুলি নির্গন্ধ। কেবল বিরাট আকার।"

একবার অপূর্বানন্দজী আমার সম্বন্ধে মঠে মহারাজের কাছে কিছু বলতে গিয়ে বুঝলেন মহারাজ আমাকে ঠিক চিনতে পারছেন না। তিনি 'দেওঘর বিদ্যাপীঠের রামময়' বলেছিলেন। আমি শুনে দুঃখিত হয়ে বলেছিলাম, "জয়রামবাটীর রামময় বললে চিনবেন।" মঠের ফেলারামকে ঐ নামটি খারাপ বলে বদলে রামময় নাম দেওয়ায় এই গোলমাল হয়। পরের দিন সকালে প্রণাম করতে যেতেই অপূর্বানন্দজী বললেন, "এই রামময়ের কথা কাল বলেছিলাম।" শুনেই মহারাজ বললেন, "ওঃ মায়ের রামময়! চিনেছি।"...

মঠের দুর্গাপূজার পুঁথি আমি একবার খুব ধরে ধরে পরিষ্কার করে লিখেছিলাম।" যেদিন লেখা শেষ হলো তারপর দিনই আমি দেওঘর বিদ্যাপীঠে ফিরে যাবার আগে সকালবেলা মহারাজকে প্রণাম করে পুঁথিটি তাঁর হাতে দিলাম। তিনি একটু দেখেই খুব খুশি হয়ে বললেন, "এ্যাঁ! এ যে একেবারে ছাপার মতো লিখেছ! খুব কাজ করেছ, বাবা।" পরে শঙ্কর মহারাজকে ডেকে বললেন, "রামময়ের হাত ভরে সন্দেশ দাও।" তখনই শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদী জুঁই ফুলের গোড়ে মালাটি মহারাজকে

দিতে এলে মহারাজ স্বহস্তে আমার গলায় পরিয়ে দিলেন। আমি প্রণাম করায় মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন।...

এক সময়ে ডাক্তারদের পরামর্শে তিনি রোজ বিকালে স্টিমারের প্রথম শ্রেণীর মাসিক টিকিট করে গঙ্গার উপরে কিছুক্ষণ বেড়াতেন। আমি তখন ব্রহ্মচারী গোপালচৈতন্য। আমার উপরে ভার ছিল একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন রোজ পরিষ্কার করে ঠিক ঐ সময়ে বেলুড় স্টিমারঘাটে যথাসময়ে হাজির হয়ে মহারাজকে মঠে নিয়ে আসতে হবে। প্রথম দিনে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "জয়রামবাটীর দিকে এই লণ্ঠন আছে?" আমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলেছিলাম, "কি বলছেন, মহারাজ! এসব এখন ঘরে ঘরে। এমন কি day-light প্রভৃতিও আছে।" শুনে খুব খুশি হলেন।...

একবার সন্ধ্যারতির পর মঠে আমরা ধ্যানঘরের সামনে বারান্দায় ধ্যানজপে বসেছি। এমন সময় জনৈক সাধু মহারাজকে একা উঠানে চেয়ারে বসে থাকতে দেখে প্রণাম করে বললেন, "মহারাজ, এতদিন হয়ে গেল সাধু হয়েছি, কিন্তু কিছুই হলো না।" মহারাজ গম্ভীরভাবে বললেন, "তা যখন এতদিনেও কিছু হলো না তখন কি আর করবে, বাড়ি ফিরে যাও এবং ভাইদের মতো সংসার করগে।" তা শুনেই সে সন্ন্যাসী বললেন, "না, মহারাজ, সেটি আর হবে না। একেবারে মন থেকে ওসব মুছে গেছে।" তখন খুশি হয়ে মহারাজ বললেন, "তা হলেই বোঝ কিছু হয়েছে। অন্তত এটা বুঝেছ যে ভাইদের সংসারে নানা কষ্ট, তুমি বেশ শান্তিতে আছ। দেখ, কঠিন উজান স্রোতে নৌকা বহু কষ্ট করে চালাতে গিয়ে মনে হয় নৌকা যেন এগুচ্ছে না। কিন্তু যখন ঐ দূরের ঘাটের পাশের খেজুর গাছটার দিকে নজর পড়ে তখন মনে ভরসা হয় যে, ঐখান থেকে শুরু করেছিলাম যাত্রা, অনেকটা এগিয়েছি। এই সুকঠিন সাধনমার্গেও তাই জানবে। ঠাকুরের উপর ভরসা রেখে চলতে থাক। তাঁর কৃপায় সব হবে।"...

ঠাকুরের ভোগ উঠার পর রাত্রে অভ্যাগতদের কক্ষে গান হতো। শঙ্কর মহারাজ গান গাইছেন। মহাপুরুষজী উপর থেকে বললেন, "দেখ তো, ক্ষিতীন্দ্র বোধ হয় বই দেখে গান গাইছে। তাই গানের দিকে মন নেই। ওকে বারণ কর। যে গান মুখস্থ আছে গাইতে বল।" বিদ্যাপীঠের ছেলেদেরও বই দেখে গাইতে দিতেন না। গিরিজা মহারাজ (ধীরেশানন্দ) গান গাওয়ায় বললেন, "গিরিজার বেশ মিষ্টি গলা, তবে মেয়েলি মিহি সুর। কীর্তনে বেশ হবে।" বোধচৈতন্যের (চণ্ডিকানন্দের) রচিত মার গানের একটি কলিতে ছিল, "আবিলতাভরা হৃদয় আমার, কেমনে পূজিব শ্রীপদ তোমার"—ঐটি শুনেই বললেন, "না, না, আমরা মায়ের ছেলে। আমাদের কেন আবিলতাভরা হৃদয় হবে? ঐ লাইন বদলাতে বল।" একবার মাকে

জয়রামবাটীতে রান্না করে খাইয়েছিলেন, সে কথাও বললেন—মা কিছুতেই নাকি রাজি হচ্ছিলেন না, বলেছিলেন, "আমি মা—আমি ছেলেদের রেঁধে খাওয়াব।" কিন্তু তিনি শোনেননি। বলেছিলেন, "আপনি তো রোজই আমাদের খাওয়ান। একদিন আপনাকে খাওয়াবই।"...

১৯২০ সালের দুর্গাপূজার সময়ে উপরে ঠাকুরঘরে ভোগ ওঠার সময়ে যেন কেউ উপরে না যায় এজন্য আমাকে সিঁড়ির মুখে পাহারা দিতে বলেন। এমন সময়ে কয়েকটি যুবতী মেয়ে উপরে যাবার জন্য চেষ্টা করে। আমি অনুনয় করা সত্ত্বেও তারা আমাকে ঠেলে দিয়ে উপরে যাবার উপক্রম করছে দেখতে পেয়ে মহারাজ গম্ভীরস্বরে তাঁর ঘর থেকে ধমক দিয়ে তাদের থামালেন, পরে তাদের ডেকে বকলেন।

আমি একদিন দক্ষিণদেশীয় ভক্ত নরনারীকে সঙ্গে নিয়ে সব দেখাচ্ছিলাম। মহারাজ দেখতে পেয়ে গঙ্গেশানন্দজীকে বলেন, "রামময়কে কেন ওদের সঙ্গে দিলে? পাড়াগাঁয়ের ছেলে। ও কি কথা কইতে পারবে?" তখন তিনি বললেন, "পাড়াগাঁয়ের হলে কি হবে?" রামময় যে বি. এ. পড়ছে।" তখন তিনি খুশি হলেন। আমি বেঁটে বলে তাঁর ধারণা ছিল আমি হয়তো স্কুলে পড়ি—ইংরেজিতে কথা কইতে পারব না।...

একবার ছোট নগেন (ব্রহ্মচারী অক্ষরচৈতন্য) মঠে কিছু কাজের ত্রুটির অপরাধে মহাপুরুষ মহারাজ কর্তৃক মঠ থেকে বিতাড়িত হবার ভয়ে জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমার কাছে হেঁটে হেঁটে চলে আসেন; আমি তখন মার কাছে ছিলাম। মাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে কাঁদতে লাগলেন। মা মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন, "বাবা, তুমি সব ছেড়ে ঠাকুরের উপর ভরসা করে সাধু হয়েছ। তোমার কিসের দুঃখ? কেন কাঁদছ?" তখন তিনি বললেন, "মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে মঠ থেকে তাড়িয়ে দেবেন বলে আপনার কাছে এসেছি।" মা ভরসা দিয়ে বললেন, "কিছু ভয় নেই, বাবা। আমি তারককে চিঠি লিখে দিচ্ছি। তোমাকে কিছুই বলবে না।" তখন মা আমাকে চিঠি লিখতে আদেশ দিলেন। মা যেমন বলে যেতে লাগলেন, আমি ঠিক তাই লিখলাম। এখনও মনে হয় যেন কাল এই ঘটনাটা ঘটেছিল। চিঠি এইরূপ ঃ কল্যাণবরেষু, বাবাজীবন তারক, ছোট নগেন তোমার কাছে কি অপরাধ করেছে? তুমি তাকে তাড়িয়ে দেবে বলে ছেলে আমার কত কষ্ট করে হেঁটে আমার কাছে পালিয়ে এসেছে। তা বাবা, মার কাছে কি ছেলের অপরাধ আছে? আমি তাঁকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তাকে কিছু বলো না। আমার আশীর্বাদ জানবে। ইতি আশীর্বাদিকা তোমার মা।

ছোট নগেন মঠে গিয়ে মন্দিরে প্রণাম করে মহাপুরুষ মহারাজের কাছে যেতেই তিনি উঠে আলিঙ্গন করে বলেছিলেন, "ব্যাটা, তুই আমার নামে নালিশ করতে একেবারে হাইকোর্টে গিয়েছিলি?"

নিম্নলিখিত ঘটনাটি স্মৃতি নয়, শ্রুতি ঃ

স্বামীজীর জনৈক সন্ন্যাসী শিষ্যের মুখ হতে শুনেছিলাম—স্বামীজী যখন প্লেগের সেবাকার্যের জন্য প্রচুর অর্থ পাচ্ছিলেন না, তখন বেলুড় মঠের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে সে টাকা দিয়ে সেবাকার্য চালাতে মনস্থ করেছিলেন, তখন মহাপুরুষ মহারাজ বলেন, "স্বামীজী, তুমি তো সব কাজ মাকে জিজ্ঞেস করেই কর, এই ব্যাপারে মার অনুমতি নেবে না?" তাতে স্বামীজী বলেন, "ঠিক বলেছেন, তারকদা। আমার ভুল হয়েছে। এখনই যাচ্ছি মার অনুমতি নিতে।" সঙ্গে পূজ্যপাদ রাজা মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, শরৎ মহারাজ প্রভৃতি চললেন। মাকে প্রণাম করে স্বামীজী বললেন, "মা, রোগীদের সেবার জন্য টাকা নেই। এজন্য মঠের সম্পত্তি বিক্রি করে ঐ টাকা দিয়ে সেবাকাজ চালাব মনে করেছি। আমরা তো সাধু, গাছতলায় জীবন কাটিয়ে দেব। আপনার অনুমতি চাই!" শ্রীশ্রীমা সব কাজেই নরেনকে অনুমতি দেন। কিন্তু এই ব্যাপারে অনুমতি দিলেন না। তিনি বললেন, "না বাবা, মঠ বিক্রি করতে পারবে না। এ তোমার মঠ নয়, ঠাকুরের মঠ। তোমরা শক্তিমান ছেলে গাছতলায় জীবন কাটাতে পার। কিন্তু পরে আমার যেসব ছেলেরা আসবে তারা গাছতলায় জীবন কাটাতে পারবে না। তাদের জন্য এই মঠ।" স্বামীজী মার আদেশ শিরোধার্য করে মঠ বিক্রি করলেন না।

মহাপুরুষজীর পুণ্যস্মৃতি

স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ

১৯২২ সালের বর্ষাকাল। কলকাতা হতে পূজনীয় শরৎ মহারাজের চিঠি নিয়ে পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের দর্শন আকাঙ্ক্ষায় প্রথম বেলুড় মঠে আসি। অন্তরে ভয়—মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে ব্যবহারের আচার নিয়ম কিছু জানা নেই, কি ভুলভ্রান্তি করে বসি! যা হোক বেলুড় মঠ দেখে খুবই ভাল লাগল। বড়ই শান্তিপূর্ণ স্থান। খুবই পুণ্যভূমি বলে বোধ হলো। সৌভাগ্যক্রমে মঠ বাড়িতে এসে নিচেই মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে দেখা হলো। দিব্যকান্তি পুরুষ—মুখে যেন একটা আভা

খেলছে। মঠ-ভূমিতে সকালবেলা পাদচারণ করে তিনি সবেমাত্র ফিরে এসেছেন, একটা খুব প্রসন্নভাব তাঁর সর্বাঙ্গে পরিস্ফুট। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলাম এবং শরৎ মহারাজের চিঠিখানা তাঁর হাতে দিলাম। তিনি খুলে পড়লেন ও বললেন, "দীক্ষা নেবে? আচ্ছা হবে।" পরের দিন তৈরি হয়ে আসতে বললেন। আমার উৎকণ্ঠা অনেক পরিমাণে লাঘব হলো। তখন মঠে প্রসাদ পেতে হলে মহাপুরুষ মহারাজের অনুমতি নিতে হতো। আমি একটু ইতস্তত করে প্রসাদ পাবার অনুমতি চাইলাম। আমার সঙ্কোচ দেখে তিনি তখন একটু হেসে রহস্য করে বললেন, "কোথায় খাবে—এর এখন সে চিন্তা হয়েছে। তা, এখানেই প্রসাদ পাবে।" এরপর রাত্রিবেলাও মঠে থাকবার অনুমতি দিলেন। এই আমার প্রথম মহাপুরুষ মহারাজকে দর্শন। একটা অপূর্ব ভাব নিয়ে কলকাতায় ফিরলাম। শরৎ মহারাজ ও মহাপুরুষ মহারাজকে দেখে কেবলই মনে হতে লাগল, এমন অতিমানব—মহাপুরুষরাও তাহলে এ জগতে বাস করেন! তাঁদের জীবন-মাহাত্ম্য অল্পই বুঝেছিলাম। তবু তাঁরা যে সাধারণ মানব-ভূমির ঊর্ধ্বে, তা তাঁদের দেখে মনে খুব দৃঢ়মূল হয়ে গিয়েছিল। সেবারে তাঁর কৃপালাভ করে ফিরে যাই।...

এর বৎসর-তিনেক পরে পুনরায় আসি—এবার মঠে যোগদানের জন্য। মহাপুরুষ মহারাজ দয়া করে আমায় মঠে গ্রহণ করেন এবং কলকাতার একটি শিক্ষাকেন্দ্রে বাস করার জন্য পাঠান। সেখান হতে প্রায়ই মঠে যেতাম এবং তাঁর শ্রীচরণ-দর্শন ও আশীর্বাদলাভ করে ধন্য হতাম। সকাল-বিকাল বহু দিন তাঁর ঘরে অন্য অনেকের সঙ্গে বসে তাঁর উপদেশবাণী শুনেছি ও অপূর্ব প্রেরণা নিয়ে ফিরে গিয়েছি। শ্রীশ্রীঠাকুরের উপর তাঁর একান্ত নির্ভর ও আত্মসমর্পণ সব সময়ই তাঁর কথায় ফুটে উঠত। এমন আত্মভোলা শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ পুরুষের দর্শন আধ্যাত্মিক জগতের কত নূতন সত্যের দ্বার মনের সামনে খুলে দেয়!

একবার শ্রীরাজা মহারাজের জন্মতিথি-উৎসবের কথা মনে পড়ে। এইসব উৎসবে তখন শুধু খুব নিকট ভক্তদেরই সমাগম হতো এবং মঠে খুব একটা আধ্যাত্মিকতার ভাব গমগম করত। অতি প্রত্যুষে স্নান সেরে কিছু ফুল সংগ্রহ করে আমরা মঠে এসেছি। ঠাকুরঘরে প্রণাম করে মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করতে তাঁর ঘরে গেছি। আরও অনেকে উপস্থিত। তিনি বললেন, "আজ মহারাজের জন্মদিন। খুবই পুণ্যদিন। মহারাজই তো আমাদের মঠ-মিশনের চিরদিনের প্রেসিডেন্ট। আমি কে? ভরত যেমন রামচন্দ্রের পাদুকা সিংহাসনে রেখে রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন, আমিও তেমনি মহারাজের পাদুকা মাথায় করে তাঁরই কাজ চালাচ্ছি। তিনিই প্রেসিডেন্ট।" শিবসম নিরভিমান পুরুষের

কথা শুনে মনে হলো, তিনি যা বলেছেন তা তাঁর অন্তরের ভাব এবং এই দীনভাব নিয়ে তিনি প্রেসিডেন্টের কাজ করছেন। তিনি প্রেসিডেন্ট বটে, কিন্তু তাঁর মন এর বহু ঊর্ধ্বে বিচরণ করত। অভিমান, অহংকার, পদগৌরব সেখানে পৌঁছতে পারে না।...

একটি ঘটনা বিশেষ করে মনে পড়ছে। খুব সম্ভব ১৯৩০ সাল হবে। আমার পরিচিত একটি ছেলে আসামের কাছাড় জেলা থেকে এসেছে দীক্ষাপ্রার্থী হয়ে। মহাপুরুষ মহারাজের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করবে, কিন্তু তাঁকে পূর্বে চিঠি-পত্রাদি কিছু লেখেনি। আমি নানা কাজে একান্ত ব্যস্ত থাকার দরুন তাকে সঙ্গে করে মঠে নিয়ে যেতে পারিনি। আমার এক বন্ধু মহাপুরুষ মহারাজের সেবক ছিলেন। তাঁকে এই ছেলেটির দীক্ষার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করে একখানা চিঠি লিখে ছেলেটির হাতে দিয়ে বললাম, "তুমি চিঠিখানা অমুক মহারাজের হাতে দেবে। তিনি সব ব্যবস্থা করবেন।" সেবক ছেলেটিকে মহাপুরুষ মহারাজের কাছে নিয়ে গিয়ে আমার লিখিত চিঠি তাঁকে পড়ে শুনালেন। এদিকে ভক্তটি ইতোমধ্যে মহাপুরুষ মহারাজের সামনে এমন এক নীতি-গর্হিত ব্যবহার করে বসল, যাতে তিনি তার উপর বিরক্ত হয়ে তাকে বলেন, "যে তোমাকে চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছে, তাকে নিয়ে এস; তারপর দীক্ষার কথা ভেবে দেখব।" তিনি কোন অভদ্র আচরণ কখনই পছন্দ করতেন না। হাব-ভাব, আচার-আচরণে ভদ্রোচিত ব্যবহারই তাঁর সম্মত ছিল।

ছেলেটি বিকেলবেলা কলকাতায় ফিরে এসে আমাকে বলল, "তিনি আপনাকে যেতে বলেছেন।" তার অধিক আর কিছু যে ঘটেছে, তা কিছুই সে উল্লেখ করেনি। পরের দিন তাকে নিয়ে আমি মঠে গেলাম। মঠবাড়িতে প্রবেশ করা মাত্রই কেউ কেউ বলতে লাগলেন, "তুমি কাকে দীক্ষার জন্য পাঠিয়েছিলে? আচার-ব্যবহার, কিছুই জানে না। মহাপুরুষ মহারাজের সামনে সে এমন ব্যবহার করেছিল যে তিনি খুবই বিরক্ত হয়েছিলেন।" সব শুনে আমার বেশ ভয় হলো। বুঝলাম, দীক্ষা তো হবেই না, উপরন্তু আমার ভাগ্যেও অনেক গালমন্দ আছে। যা হোক ভয়ে ভয়ে ছেলেটিকে নিয়ে তাঁর ঘুরে ঢুকে তাঁর পদপ্রান্তে প্রণত হলাম। তিনি নির্বিকার পুরুষ। সস্মিত মুখে আমাদের গ্রহণ করলেন। পূর্বদিনের কথা কিছুই বললেন না। আমি কিন্তু সাহস করে দীক্ষার কথা পুনরায় উত্থাপন করতে ভরসা পেলাম না। ঘর থেকে বাইরে আসার পর তাঁরই প্রধান সেবক দীক্ষার কথা উঠাইনি শুনে বললেন, "আবার গিয়ে দীক্ষার কথা বল। ওঁদের গালমন্দও আশীর্বাদ তুল্য। আমাদের শিক্ষার জন্যই তাঁরা গালাগাল দেন। তাঁর কথায় সাহস পেয়ে পুনরায় ছেলেটিকে নিয়ে তাঁর ঘরে প্রবেশ করে বললাম, "মহারাজ, এই ছেলেটি দীক্ষার জন্য

এসেছিল। দয়া করে কৃপা করলে কৃতার্থ হয়ে যাবে।” তিনি অমনি বললেন, “দীক্ষা! তা আগামী কাল তাকে স্নান করে আসতে বল। দীক্ষা হয়ে যাবে।”

পূর্বদিন যে এতকিছু ঘটেছে তার বিন্দুমাত্রেরও উল্লেখ নেই। বরং প্রসন্ন হয়ে ছেলেটির আধ্যাত্মিক জীবনের ভার নিতে সহজে রাজি হলেন। আমি কল্পনায়ও তা ভাবতে পারিনি। পরে বুঝলাম, প্রবাদ যে আছে ‘সাধুর রাগ জলের দাগ’, তা মাত্র কথার কথা নয়, অক্ষরে অক্ষরে সত্য। এঁরা সংস্কারমুক্ত মহাপুরুষ। কোন সংস্কারই (রাগ, দ্বেষ) এঁদের মনে রেখাপাত করতে পারে না। উদাসীন পুরুষ। কারও হাজার গর্হিত আচরণও মনে করে রাখেন না। ক্ষমাই এঁদের স্বভাবগত। ছেলেটি পরের দিন দীক্ষালাভ করে মহানন্দে ফিরে গেল।

অনুরূপ আর একটি ঘটনা ঘটতে দেখেছিলাম। বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি-পূজা। দিনের উৎসব মহানন্দে সম্পন্ন হয়েছে। রাত্রে কালীপূজা হলো। তারপর ভোররাত্রে ব্রতধারীদের সন্ন্যাস ও ব্রহ্মচর্য হবে। পুরানো ঠাকুরঘরের নিচে হলঘরে হোমাদি হয়ে গেল। এবারে নবদীক্ষিত সন্ন্যাসীরা সমবেত হয়ে অপেক্ষা করছেন। অনুমতি হলেই একে একে মহাপুরুষজীর ঘরে প্রবেশ করবেন। ইতোমধ্যে শোনা গেল মহাপুরুষ মহারাজের কঠোর স্বর। একজন সেবক কি বিষম ভুল করেছেন। তাই তিরস্কার করে তাঁকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলছেন। আমরাও নূতন সন্ন্যাসীদের দীক্ষাদি দেখবার জন্য সেখানে উপস্থিত ছিলাম। সকলেই প্রমাদ গণলাম। এই শুভক্ষণে কোথায় শ্রীগুরুকে প্রসন্নমূর্তিতে পেয়ে তাঁর আশীর্বাদ পেয়ে সকলে ধন্য হবে, তা না তিনি তদ্বিপরীত—রুষ্ট মনে রয়েছেন। যাই হোক, যথাসময়ে সন্ন্যাসীদের ডাক পড়ল। আমরাও সেই সঙ্গে ভিতরে গেলাম। গিয়ে দেখলাম, সে কি অপূর্ব শান্ত সৌম্য প্রসন্ন মূর্তি! অপার আশীর্বাদ নিয়ে যেন মূর্তিমান করুণাবিগ্রহ বসে আছেন! মুহূর্তের মধ্যে কি পরিবর্তন! অতি স্নেহের সঙ্গে একে একে সন্ন্যাসীদের গ্রহণ করলেন। তাদের শিখা কাটলেন। কারো শিখা স্থূল, কারো ক্ষীণ এই নিয়ে রহস্য করলেন। অজস্র আশীর্বাদ ও যত্নে সকলকে পরিতুষ্ট করে বিদায় দিলেন। আমাদের শুধু মনে হলো, মুহূর্তপূর্বে না ইনি ভীষণ রেগে গিয়েছিলেন! কোথায় গেল সে রাগ!

এঁরা লোকশিক্ষার জন্য ক্রোধের ভানমাত্র করতেন। প্রেমময় ভগবানই এঁদের সমগ্র মন-প্রাণ জুড়ে বসেছিলেন। মহাপুরুষদের অন্তরের অন্তস্তলে ক্রোধ দ্বেষ কিছুই নেই। কেবল একটা প্রয়োজনবোধে কৃত্রিম আবরণ সময় সময় গ্রহণ করেন মাত্র। কাজ হয়ে গেলে আবার তৎক্ষণাৎ তা মিলিয়ে যায়। উপরে তরঙ্গ উঠলেও সমুদ্রের অতল গভীরে সদাই শান্ত। শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরুষদের লক্ষণ সব লিপিবদ্ধ

আছে—তার মধ্যে একটি হচ্ছে—“মুনিঃ প্রশান্তঃ গম্ভীরঃ দুর্বিগাহ্যঃ দুরত্যয়ঃ।” মহাপুরুষ মহারাজের মনও ছিল তেমনি। তিনি একবার এক সেবককে বলেছিলেন, “আমাদের আশীর্বাদ ছাড়া আর কিছুই নেই। সকলের কল্যাণকামনা নিয়েই বসে আছি। গালমন্দ—এও তোমাদের মঙ্গলের জন্যই করি।” অন্য সময় বলেছেন—“ক্রোধোঽপি দেবস্য বরেণ তুল্যঃ” ইত্যাদি। তাঁদের সব ব্যবহারের পেছনে একমাত্র লোককল্যাণকামনা বর্তমান। আর কিছুর স্থান সেখানে নেই।...

শেষের দিকে তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়েছিল। হাঁপানির অসুখে অনেক রাত্রেই ঘুম হতো না। একদিন বিকালে তাঁর ঘরে গিয়েছি। দেখলাম আরও অনেকে উপস্থিত আছেন। একজন প্রবীণ সন্ন্যাসী জিজ্ঞেস করলেন, “মহারাজ, আজ কেমন আছেন?” তিনি অমনি বললেন, “যদি শরীরের কথা জিজ্ঞেস কর তো শরীর ভাল নয়। দিন দিন ক্ষীণ ও দুর্বল হয়ে আসছে। আর যদি আমার কথা বল, তবে আমি বেশ আছি। আমি তো আত্মস্বরূপ; রোগ, জরা, মৃত্যু আমার কিছুই নেই। আমি এই জেনেছি—শরীর থেকে আমি ভিন্ন। শরীরের দুঃখ কষ্ট আছে, কিন্তু আমি তা থেকে পৃথক। আত্মারামের আনন্দের তাতে কিছু ব্যাঘাত নেই।” শুনে আমাদের মনে হলো যেন উপনিষদের ঋষি তাঁর আত্মানুভূতির কথা বর্ণনা করছেন। আর আমরা সব সেই প্রত্যক্ষ উপলব্ধির কথা তাঁর মুখে শুনছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর ভাব ও কাজের প্রসার হচ্ছে জানলে তাঁর আনন্দের আর সীমা থাকত না। আমি যে কেন্দ্রে থেকে কাজ করতাম, তার কাজের প্রসার হওয়াতে প্রতিষ্ঠানটিকে স্থানান্তরিত করে নিজস্ব বাড়িঘর প্রস্তুত করবার জন্য এক ধনাঢ্য ব্যক্তি কলকাতার উপকণ্ঠে একখণ্ড বড় জমি দান করেন। দানপত্র রেজিস্ট্রি হবে। ঐ কেন্দ্রের মোহন্ত দানপত্রটি নিয়ে মহাপুরুষ মহারাজের আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে আমায় বেলুড় মঠে পাঠালেন। অপরাহ্নে তাঁর বিশ্রামের পর ঘরে ঢুকে আমি সব কথা তাঁকে নিবেদন করা মাত্র অপার আনন্দের সঙ্গে তিনি অজস্র আশীর্বাদ বর্ষণ করলেন। আমিও তাঁর এই প্রসন্নতার সুযোগ পেয়ে আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করবার জন্য তাঁকে প্রার্থনা জানালাম। অশেষ করুণায় তিনি তাই করলেন এবং এই আশ্বাস-বাণী উচ্চারণ করলেন, “তোর হবে, তোর হবে।” তাঁর সেই আশীর্বাদই চিরদিন জীবনের সম্বল হয়ে রয়েছে।

অস্ফুট স্মৃতিকথা

স্বামী বোধাত্মানন্দ

১৯২২ সালের জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে একদিন সকালে ভারাক্রান্ত মনে বেলুড় মঠে উপস্থিত হই। জনৈক সাধুকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল মঠাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ উপরের ঘরেই আছেন। তিনি কি আমার মতো ক্ষুদ্র ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করবেন—এ সংকোচ মনে ছিল, কিন্তু সন্ন্যাসীটি আশ্বাস দিয়ে বললেন—"ঐ জন্যই তো তাঁরা দেহধারণ করেছেন, যাওনা উপরে; তবে আজ বেলা হয়ে গিয়েছে, তাঁর স্নানাদির সময় হয়েছে।" আমি সেদিন ফিরে এসেছিলাম, সম্ভবত পরের দিনই আবার যাই। সাধুর কথায় ভরসা পেয়ে উপরে পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে প্রবেশ করে তাঁকে প্রণাম করলাম। কথা-প্রসঙ্গে নিজের সাধু হবার ইচ্ছাও প্রকাশ করলাম, কিন্তু তখনই তাতে তিনি সম্মতি প্রকাশ করলেন না। কেন না মন প্রস্তুত নয়। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর আমি কলকাতায় সৎসঙ্গের অভাবে কেমন করে থাকব, একথা বলায় তিনি বললেন, "তা যদি বল তো একখানা চিঠি লিখে দিই" এবং তৎক্ষণাৎ খাট থেকে উঠে চেয়ারে বসলেন এবং আমার জন্য কলকাতা স্টুডেন্টস হোমের অধ্যক্ষ ব্রহ্মচারী অনাদিচৈতন্য মহারাজকে একখানি পত্র লিখে আমার হাতে দিলেন। মহাপুরুষের অন্তর্দৃষ্টি, নিজ মনের দুর্বলতা, তাঁর অহেতুক কৃপা ও সহানুভূতির কথা ভাবতে ভাবতে সেদিন কলকাতা ফিরলাম।...

কিছুদিন যাতায়াতের পর একদিন মহাপুরুষজী আমাকে বললেন, "তুমি মাস্টারমহাশয়ের কাছে যাও?" জিজ্ঞেস করলাম, "কে মাস্টারমহাশয়?" তিনি বললেন, "মাস্টারমশায় শ্রীঠাকুরের ভক্ত, 'কথামৃত'-লেখক; তুমি তাঁর কাছে যেও, খুব আনন্দ পাবে।" এই বলে একখানি ব্যবহৃত খামের উপরে মাস্টারমহাশয়ের নাম ও ঠিকানা লিখে দিলেন। আমি তা নিয়ে একদিন আমহার্স্ট স্ট্রিটস্থ মর্টন ইনস্টিটিউশনে মাস্টারমশায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি এবং ক্রমশ তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে অতিশয় আনন্দ অনুভব করি। মাস্টারমশায় একদিন বললেন, "সাধুদর্শনই পুণ্য, but Sadhu at his best when he is meditating, one with God.—

কিন্তু সাধুর সে ভাবটিই শ্রেষ্ঠ যখন তিনি ধ্যানমগ্ন, শ্রীভগবানের সঙ্গে একেবারে এক হয়ে আছেন।” ডানহাতটি সঞ্চালিত করে এমন ভাবের সঙ্গে ঐ কথা বললেন যে, তাঁর ঐ কথার প্রভাবে ধ্যানস্থ সাধু দেখবার আশায় স্টিমারের একটি মাসিক টিকিট কিনি এবং আমহার্স্ট স্ট্রিট ও বৌবাজারের মিলনস্থানের নিকট হতে রোজ ভোর সাড়ে চারটার সময় রওনা হয়ে হেঁটে জগন্নাথঘাটে ছয়টার সময় স্টিমার ধরে মঠে আসতে থাকি। তখন কার্তিক মাস। কোনদিন ধ্যানঘরে ধ্যানরত কোন সাধুকে দেখতে পেলে হাতে যেন স্বর্গ পেতাম। এইভাবে অপর সাধুগণকেও শ্রদ্ধার চোখে দেখতে শিখি। এটি আমার পক্ষে একান্ত দরকার ছিল। আমার বিদ্যালয়ের দীর্ঘদিনের জনৈক বন্ধু, সেই আমাকে ইতঃপূর্বে একদিন প্রথম বেলুড় মঠে এনেছিল—সর্বশ্রেষ্ঠ একজন সাধু দেখাবার জন্য। মঠ-মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজই তাঁর লক্ষিত সাধু। বন্ধুর কৃপায় ১৯২২ সালে শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসবের দিনে পূজনীয় ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে একদিনের জন্য দর্শন করবার সৌভাগ্য হয়েছিল। তখন মঠে পূর্বে যেখানে দুর্গাপূজা হতো সেখানেই কালীকীর্তন হচ্ছিল, শ্রীমহারাজ তখন দাঁড়িয়ে কীর্তন শুনছিলেন। তাঁর পায়ের সুদৃঢ় মাংসপেশী, কাপড় একটু হাঁটুর দিকে তোলা, মাথায় কানঢাকা টুপি, পশ্চিমাস্য হয়ে দাঁড়িয়ে তখন উপরে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন—ঐ অবস্থায় তাঁকে দর্শন করে খুবই আনন্দ হয়েছিল। সে দিব্যমূর্তি আজও হৃদয়ে আঁকা আছে।...

ক্রমে যতই দিন যেতে লাগল মহাপুরুষের পুণ্যপ্রভাব ততই হৃদয়ঙ্গম হতে লাগল। সাধু হবার পথের বাধা-বিঘ্নগুলি পরিষ্কার হয়ে যেতে লাগল। দীক্ষা নেবার ইচ্ছাও মনে জাগল। যে স্টুডেন্টস হোমের অধ্যক্ষের নিকট তিনি প্রথমদিনেই আমার প্রতি কৃপা করে পত্র লিখে দিয়েছিলেন, তাঁদের প্রতি শনিবারের শাস্ত্রপাঠের সময় আমি তা শুনতে যেতাম।

একদিন সেখানকার একজন সাধুকে জিজ্ঞেস করলাম, “কি করে উদ্ধার হওয়া যায়?” তিনিও তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, “যদি উদ্ধার হতে চান, মহাপুরুষ মহারাজের আশ্রয় গ্রহণ করুন।” কথাটি আমার হৃদয় স্পর্শ করল। পরদিন রবিবারে মঠে এলাম। মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎও হলো, কিন্তু দীক্ষার কথা বলবার সুযোগ আর হলো না। ক্রমে সন্ধ্যা হলো। শেষ স্টিমারখানিও চলে গেল। মহারাজ তখন নিচে নেমে জ্ঞান মহারাজের বারান্দার কাছে এলেন। আমি সুযোগ বুঝে ভূমিকার ছলে বললাম, “মহারাজ, কয়েকমাস ধরে তো আসছি এখানে, কি হলো তা আপনি জানেন।” তিনি বললেন—“হবে আবার কি, ডেকে যাও।” আমি তখন দীক্ষার জন্য প্রার্থনা জানালাম। তিনিও প্রসন্নভাবেই বললেন, “কাল

এসো।” তখন শেষ স্টিমার চলে গিয়েছে, সুতরাং হেঁটেই লিলুয়ার ট্রেন ধরে কলকাতা ফিরলাম।

পরদিন বৈশাখ-সংক্রান্তি—১৯২৩। সেদিন সকালেই মঠে গেলাম। জানলাম আরও কয়েক জনের দীক্ষা হবে। মনে আছে শ্রীজগদীশ চক্রবর্তী যিনি পূজনীয় মহারাজের বিশেষ সেবা করেছিলেন, তিনিও সেদিন দীক্ষার্থী। প্রথমে তাঁর দীক্ষা হতে আমার সুযোগ এল। ঠাকুরঘরে প্রবেশ করে দেখলাম পূজনীয় মহারাজ উত্তরমুখে পদ্মাসনে উপবিষ্ট।...

ক্রমে দীক্ষা সমাপ্ত হলো। তাঁর দীক্ষাদান মানে স্থূল বুদ্ধিতে এই বুঝলাম যে, যুগাবতার শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে শিষ্যকে সমর্পণ। তাঁর অসীম স্নেহের পরিচয়ও পেলাম। দীক্ষাদানের পর তাঁর ঘরের দক্ষিণদিকের ছোট বারান্দার রেলিং-এর কাছে তাঁর সদ্যো-দীক্ষিত জনৈক শিষ্য প্রাণের আকুতি নিবেদন করছেন। করুণাধার গুরুও অভয়-আশ্বাস দিয়ে বলছেন, “ভয় কি, বাবা, শান্তি পাবে।” অত্যন্ত আবেগভরে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি ‘শান্তি পাবে’ কথাটি উচ্চারণ করলেন।...

তাঁর মুখে ঈশ্বরীয় কথা কি প্রাণস্পর্শী ও আলোকপ্রদ ছিল! তাঁর কথায় কি জোর! কি দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে বলতেন, আশ্বাস দিতেন! শিষ্যের মনে সে সময় কোন সংশয় থাকত না। হৃদয়ে বিশ্বাস জাগত, বল আসত। একদিন তাঁর ঘরে জনৈক শিষ্যকে বললেন, “ভয় কি? কার আশ্রয়ে এসেছ? ঠাকুর জীবন্ত দেবতা, সব ঠিক করে দেবেন।” অপর একদিন উঠানে যেখানে আগে দুর্গাপূজা হতো সেখানে নিরালায় তাঁকে প্রশ্ন করলাম—“কৃষ্ণ, কালী এসব কি এক?” তিনি বললেন, “এক, এক—সব এক, বাবা। নামরূপের পারে যেতে হবে।” ঈশ্বর-প্রসঙ্গে একদিন বলেছিলেন—“সকলের মধ্যে সেই এক ভগবান আছেন, বৃক্ষ-লতায় পর্যন্ত—তাঁকে পেতে হবে।” পরে ঐ বিষয়টি পরিষ্কার করে এক চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন, “নিজের মধ্যে ভগবানের উপলব্ধি করলে সর্বজীবে সর্ব পদার্থে তিনি রয়েছেন—এ জ্ঞান স্বতই উদিত হয়, অতএব নিজের মধ্যে তাঁকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা কর; চোখের দৃষ্টি বদলে যাবে তাঁর কৃপায়। তিনি বড় দয়াল, অহেতুক কৃপাসিন্ধু।...” সন্ন্যাসের পর পুনরায় জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেছিলেন—“সন্ন্যাস মানেই অভেদ; ও জ্ঞান আপনি আসবে।” একদিন তাঁর ঘরে নিত্য ও লীলা সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে বললেন, “ঠাকুর বলতেন—লীলা উপরে ফৎ ফৎ করছে, নিত্য ধীর স্থির গম্ভীর।” কি গভীর ভাবের সঙ্গে তিনি এসব কথা সেদিন বলেছিলেন! সে সঙ্গে এও বলেছিলেন—“এখন এসব কথা এক কান দিয়ে শুনলে

আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে যাবে। ভিতরে চিন্ময়ী মা আছেন, তিনি জাগলে সব বুঝতে পারবি।"

কোনরূপ প্রশ্ন না করে শুধু তাঁর কাছে উপস্থিত থাকলেও অনেক জ্ঞানের কথা শোনা যেত। একবার তাঁর জন্মতিথির দিন তিনি নিজের ঘরে বসে তামাক খাচ্ছিলেন, পাশের ছাদে তাঁর একটি ফটো তোলার ব্যবস্থা করা হচ্ছিল। তিনি নিজে নিজেই বলে উঠলেন, "নিরাকারের আবার ফটো।" কাছেই দাঁড়িয়েছিলাম, তাই একথা স্পষ্ট শুনতে পেলাম।

একদিন বললেন, "সাধু কে বল দেখি?" পরে নিজেই উত্তর দিলেন, "'যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ' (যাঁর দ্বারা অপরে উদ্বিগ্ন হন না, যিনি অপরের কাছ থেকেও উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না), তিনিই সাধু।"

একবার মঠে এসে তাঁর ঘরে গিয়েছি। তিনি টেবিলের উপরে রাখা কয়েকটি ফল দেখিয়ে বললেন, "এগুলি অমুক, অমুককে (রোগীকে) দিয়ে এসো।" এ থেকে রোগীদের প্রতিও তাঁর দৃষ্টি আছে তা বুঝলাম।...

যখন 'কথামৃত'-পাঠ করতেন, তখন তিনি অন্তরের গভীরে ডুবে যেতেন। বুঝিবা দক্ষিণেশ্বরের অভূতপূর্ব মধুর স্মৃতিগুলি জীবন্ত হয়ে তাঁর মানসপটে ফুটে উঠতো। তখন বিশেষ প্রয়োজন হলে অতি কষ্টে সে ভূমি থেকে মনকে নামিয়ে আনতেন। একবার তিনি তাঁর ঘরে খাটের দক্ষিণপাশে চেয়ারে পশ্চিমাস্য হয়ে বসে এভাবে 'কথামৃত'-পাঠে নিবিষ্ট ছিলেন। আমি গিয়ে জনৈক বিশিষ্ট ভক্তের প্রণাম নিবেদন করলাম। তিনি কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে মুখ তুলে এই কথা কয়টিমাত্র উচ্চারণ করলেন, "তাকে আমার আশীর্বাদ দিও।"...

যুগাবতার শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ করতে পাওয়া মহা সৌভাগ্যের কথা। শ্রদ্ধার সঙ্গে সযত্নে তা সম্পাদন করলে তাতে সাধকের পরম কল্যাণ হয়—এভাবের নির্দেশও তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যেত। দেওঘর হতে একবার মঠে এসেছি। সেখানকার জনৈক ব্রহ্মচারী নিজের শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতাবশত কাজকর্ম তেমন ভালভাবে করতে পারতো না। পূজনীয় মহাপুরুষজী তার সঙ্গে কথাবার্তায় একটু উত্তেজিত হয়েছিলেন। ব্রহ্মচারীটি তাঁর ঘর থেকে বাইরে আসার পর আমি তাঁর ঘরে প্রবেশ করলাম। তিনি সেভাবেই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কিভাবে কাজ করতে হয় বল দিকি?" আমি তখন ব্রহ্মচারী। এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। হঠাৎ এভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে ঠিক জবাব দিতে পারছিলাম না দেখে তিনি পুনরায় আরও একটু জোরের সঙ্গে বললেন, "মনে পড়ছে না বুঝি?" তখন আমার

মুখ হতে বার হলো—" Privilege (সৌভাগ্য) মনে করে।" তিনিও তৎক্ষণাৎ বলতে লাগলেন—"That's it, that's it." (—ঠিক তাই)।

বিদ্যাপীঠের ছোট ছোট ছেলেদের যাতে কোন কষ্ট না হয় সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলেন, "ওদের নিজের ভাই-এর মতো, দেখবি।" অনেক দিন পর মঠে একদিন ছাত্রদের কি দৃষ্টি নিয়ে পড়াতে হবে, তার আভাস দিয়ে বলেছিলেন, "শিক্ষক, শিক্ষা, ছাত্র—এক জানবি।" এ ভাবটি অবশ্য খুবই উচ্চ, কিন্তু মনে হয় অহঙ্কার বিসর্জন দিয়ে সম্পূর্ণ নিষ্কাম হবার এই প্রকৃষ্ট পন্থা।...

অবতারপুরুষগণ জগতের কল্যাণের জন্যই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, লক্ষ্যভ্রষ্ট মানুষকে শান্তির পথ দেখিয়ে দেন, ভক্তগণের কল্যাণই নিয়ত কামনা করেন। তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের মধ্যেও এইভাব যথোচিত প্রকটিত হয়। কেননা তাঁরা যে তাঁরই। অবতারের অভিলষিত কর্ম-সম্পাদন ছাড়া তাঁদের যে আর কিছু কাম্য নেই। তাঁর কৃপায় তাঁদের জীবন ধন্য ও কৃতার্থ হয়ে যায়। ভক্তগণের কল্যাণ-কামনাই তাঁদেরও একমাত্র কাম্য। এই ভাবের পরিচয় পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের আচরণেও পেয়েছিলাম। একবার গ্রীষ্মাবকাশের পর দেওঘরে ফিরে যাব, কিন্তু পূর্বে দেখাশুনা হলেও যাবার সময় তাঁকে একবার প্রণাম করে যাবার প্রবল ইচ্ছা। কিন্তু আমাকে আড়াইটা তিনটা নাগাদ রওনা হতে হবে। পূজনীয় মহারাজ তখন স্বামীজীর ঘর ও খোকা মহারাজের ঘরের মধ্যবর্তী স্থানে দ্বিপ্রহরের আহারের পর বিশ্রাম করতেন—সম্ভবত হাওয়ার জন্য। বিশ্রামের পর তিনি উঠে পূর্বদিকের বারান্দায় দক্ষিণেশ্বরের দিকে মুখ করে একখানি চেয়ারে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁকে বিরক্ত করবার ইচ্ছা আদৌ ছিল না। কাজেই আমি খোকা মহারাজের ঘরের ভিতর দিয়ে বারান্দায় এলাম। তাঁকে প্রণাম করে উঠেই পুনরায় ফিরবার চেষ্টা করছি, এমন সময় তিনি নিজেই আমাকে ডেকে বললেন, "দ্যাখ, যতদিন এ শরীর থাকে, ততদিন এই প্রার্থনা যে, ঠাকুরের ভক্ত যে যেখানে আছে—সকলের জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য হোক। এই একমাত্র প্রার্থনা।" তিনি দু-বার শেষোক্ত বাক্যটি খুব ভাবের সঙ্গে উচ্চারণ করলেন। পরে বুঝলাম, তাঁদের শরীর-ধারণ ভক্তদের কল্যাণের জন্যই। তাঁর সেই করুণাঘন মূর্তিটি আজও হৃদয়ে আঁকা রয়েছে।

শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ-স্মৃতিকথা*

স্বামী সম্ভবানন্দ

মহৎ ব্যক্তিরা স্বভাবত সরল। বাইরের দিক থেকে তাঁদের এত সাধারণ মনে হয় যে, অনেক সময় আমরা তাঁদের সঠিক মূল্যায়ন করতে পারিনা। কিন্তু একবার তাঁদের সঙ্গে বসবাস করতে শুরু করলে বা তাঁদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এলে তাঁদের মহত্ত্ব সুনিশ্চিতভাবে ধীরে ধীরে আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করে।

প্রকৃত পক্ষে আমার জীবনে এটি বিশেষ সৌভাগ্য যে, আমার আধ্যাত্মিক জীবনের শুভারম্ভে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের এরূপ দুজন মহৎ ব্যক্তিকে আমি শুধু দেখিনি, পরন্তু তাঁদের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সংস্পর্শে এসেছিলাম। তাঁরা হলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তদানীন্তন অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ এবং সহকারী অধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ, যাঁকে স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ 'মহাপুরুষ' নামে অভিহিত করেছিলেন, সুতরাং তখন থেকে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সমস্ত সাধু এবং ভক্তদের কাছে 'মহাপুরুষ মহারাজ' নামেই পরিচিত ছিলেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাসে মাদ্রাজে রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্টস হোমের ছাত্রাবাস-ভবনের উদ্বোধনের পর দুজন স্বামীজী সদলবলে বাঙ্গালোর আশ্রমে উপস্থিত হলেন। তাঁদের আগমনের সংবাদ পূর্বেই প্রচারিত হওয়ায় আশ্রমের সমস্ত সাধু-ব্রহ্মচারী এবং স্থানীয় ভক্তরাও সাগ্রহে তাঁদের আগমনের প্রতীক্ষায় ছিলেন। বাঙ্গালোর আশ্রমের তদানীন্তন অধ্যক্ষ স্বামী নির্মলানন্দজী মহারাজ যথোচিত সম্মানের সঙ্গে তাঁদের অভ্যর্থনা করলেন এবং আন্তরিক স্বাগত জানালেন। আমরা আশ্রমবাসিগণ অত্যন্ত আনন্দিত হলাম এবং আমাদের মধ্যে এ দুই স্বর্গীয়-সত্তাকে পেয়ে গৌরব অনুভব করলাম।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ('রাজামহারাজ' বলে পরিচিত) বিশেষ আত্মসমাহিত ছিলেন। নির্জনতা তাঁর প্রিয় ছিল, সুতরাং তিনি লোকসঙ্গ সর্বদা পছন্দ করতেন না। যিনি তাঁর পবিত্র ভাব-সমাধি ও তপস্যা-সুন্দর জীবনের বিন্দুমাত্র সংস্পর্শ লাভ করেছেন, তিনি বাস্তবিকই ভাগ্যবান। তিনি যেন আধ্যাত্মিকতার প্রতিমূর্তি ছিলেন এবং অন্যের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা সঞ্চারিত করবার ক্ষমতা তাঁর ছিল।

---

* মূল ইংরেজি থেকে অনূদিত।

মহাপুরুষ মহারাজ কিন্তু একটু ভিন্ন প্রকৃতির ও স্বভাবের ছিলেন। যদিও তিনি বহুক্ষণ ধ্যানে অতিবাহিত করতেন, তবু তিনি সকলের সঙ্গে মেলামেশা এবং ধর্মপ্রসঙ্গ, বিশেষ করে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গ করতেন।

তখনকার দিনে (এখনও তাই) আমাদের আশ্রমের সাধারণ নিয়ম ছিল—প্রতিদিন আরতির পর আশ্রমবাসীরা ও ভক্তরা ভক্তিমূলক গান গাইতেন এবং একাদশীর দিন রামনাম-সংকীর্তন করতেন। মহারাজের সঙ্গে আগত সাধুদের মধ্যে অনেকে সুগায়ক ছিলেন। তাঁরা সন্ধ্যাকালে আশ্রমের প্রার্থনামন্দিরে (নিকেতনে) ভজন গাইতেন এবং মহাপুরুষ মহারাজ অনেক সময় তাতে যোগ দিতেন। তাতে স্বভাবতই গায়ক ও শ্রোতারা অনুপ্রাণিত হতেন।

নিয়ম ও শৃঙ্খলা—এ দুটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল মহাপুরুষ মহারাজের জীবনে। শেষরাত্রি ৩টার সময় তাঁকে ধ্যানমগ্ন দেখা যেত এবং সে ধ্যান চলত সকাল পর্যন্ত। তারপর তিনি প্রাতর্ভ্রমণে বের হতেন, বেশির ভাগ দিন এক মাইল দূরে অবস্থিত লালবাগ পর্যন্ত। ফিরে এসে মহারাজের সঙ্গে দেখা করতেন এবং তারপর তাঁরা দুজনে অন্যান্য সাধু ও ভক্তদের প্রণাম গ্রহণ করতেন।

প্রাতরাশের পর মহাপুরুষজী চিঠিপত্রাদিতে মনোনিবেশ করতেন। স্বামী অনন্তানন্দ তাঁর সেবক ছিলেন, কিন্তু তিনি সেবকের উপর নির্ভর না করে বেশির ভাগ কাজ নিজেই করতেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি মহারাজের সঙ্গে বাগানে যেতেন। তাঁরা বাগানের কাজ ভালবাসতেন বলে এ বিষয়ে তাঁদের বিশেষ উৎসাহ ছিল।

সে বছর তাঁরা বাঙ্গালোরে তিন মাসের কিছু বেশি ছিলেন। তাঁদের উপস্থিতির সুযোগে স্থানীয় বিশিষ্ট লোকেরা তাঁদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে নিজেদের বাড়িতে প্রায় ধর্মপ্রসঙ্গ ও ভজনের ব্যবস্থা করতেন। মহাপুরুষজী আনন্দের সঙ্গে এই সমস্ত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে ভক্তদের মনে প্রচুর আনন্দ দিতেন।

মহাপুরুষজীর বাঙ্গালোরে অবস্থানকালে তাঁর কিছু ব্যক্তিগত সেবা করবার বিশেষ সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তাতেই তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসবার এবং তাঁর মহৎ গুণরাশির কিছু পরিচয় পাবার সুযোগ লাভ করি। বাঙ্গালোর সমুদ্রতট হতে ৩২০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত, কাজেই সেখানকার জলবায়ু মনোরম। প্রতিদিন সকালে আমি বাজারে যাবার পূর্বে তাঁর গরম কাপড় ও কম্বল রোদে দিতাম। বাজার থেকে ফিরে এসে আমি ওগুলি তাঁর ঘরে নিয়ে গিয়ে ঠিকভাবে পাট করে রাখতাম। নিয়মমত একদিন আমি গরম বস্ত্রাদি রোদে দিয়ে বাজারে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে কিন্তু সেগুলির একটিও সেখানে দেখতে পেলাম না। আমি মনে

করেছিলাম যে, অন্য কেউ সেগুলি ভিতরে তুলে রেখেছে। পরে জানতে পারলাম যে, সেগুলি সবই চুরি হয়েছে। স্বভাবত আমি এতে অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলাম, কিন্তু মহাপুরুষজী আমাকে কিছুমাত্র তিরস্কার করলেন না দেখে আমি অত্যন্ত বিস্মিত হলাম। তিনি এ ক্ষতি সহজভাবেই দেখলেন। আমাদের প্রতি তাঁর স্নেহ, করুণা এত গভীর ছিল যে, আমরা না চাইতেই তিনি আমাদের সকল দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করতেন। এ ঘটনায় তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভক্তি আরো বেড়ে গেল।...

প্রতি বছরই আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে বাঙ্গালোরে একটি বড় ফুলের প্রদর্শনী হতো। সম্ভবত এটি দক্ষিণ ভারতের সবচেয়ে বড় 'ফুলের প্রদর্শনী'। হাজার হাজার লোক এ প্রদর্শনী দেখতে আসত। সে বছর সরকারি বাগানের কার্যাধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় স্বামীজীদের সেটি দেখতে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানান এবং তাঁরা অন্যান্য সাধুদের সঙ্গে নিয়ে প্রদর্শনী দেখতে যান। শত শত বিভিন্নজাতীয় মনোহর ফুলের সমারোহ দেখে তাঁরা, বিশেষ করে বাগানের কাজে বিশেষজ্ঞ রাজামহারাজ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

সে সময় মাদ্রাজ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী শর্বানন্দ প্রতিমায় দুর্গাপূজা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মহারাজজী তাতে সম্মতি দিলেন এবং তার যথাযথ ব্যবস্থা করলেন এবং ৪ অক্টোবর মহাপুরুষজীর সঙ্গে তিনি মাদ্রাজ যাত্রা করলেন। সেই তাঁর শেষ বাঙ্গালোর আসা। পরের বছর ১০ এপ্রিল তিনি কলকাতায় মহাসমাধিতে লীন হলেন।

অনেকে মনে করেন এবং হয়তো তাঁদের ধারণা ঠিক যে, ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ মহাপুরুষ মহারাজকে সঙ্গে করে ১৯২১ সালে বাঙ্গালোরে এবং দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য স্থানে এনেছিলেন এবং মঠ ও মিশনের বিভিন্ন শাখার সাধুদের ও ভক্তদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন যাতে তিনি তাঁর যোগ্য উত্তর-অধ্যক্ষ হিসাবে তাঁদের সকলকে পরিচালিত করতে পারেন। পরবর্তী ঘটনাসমূহের দ্বারা তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়।...

* * *

১৯২৪ সালে মহাপুরুষজী পুনরায় বাঙ্গালোরে আসেন। আসবার পূর্বে কুনুরে নীলগিরি-পাহাড়ে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য তিনি কিছুদিন ছিলেন। তাঁর সেখানে থাকার ফলে উতকামণ্ডের ভক্তরা সেখানে একটি আশ্রম স্থাপনের জন্য উৎসাহিত হলেন। স্থানীয় এক রজকের বদান্যতায় দু-একর জমি ঐ উদ্দেশে সংগৃহীত হলো। ভক্তদের বহুদিনের অভিলাষ পূর্ণ করার জন্য মহাপুরুষ মহারাজ ১৯২৪ সালের ১১ জুলাই

আশ্রমের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করলেন। ঐ আশ্রমটি করবার জন্য সেখানকার ভক্তদের উৎসাহ ও পরামর্শ দান করতে একাধিকবার তিনি সেখানে যান। নীলগিরি থেকে বাঙ্গালোর আসার পথে স্থানীয় ভক্তদের বিশেষ আগ্রহে তিনি কয়েকদিনের জন্য নেত্রাম-পল্লী আশ্রমে (মাদ্রাজের উত্তর আরকট জেলাতে) গিয়েছিলেন এবং কয়েকজন ভক্ত তাঁর কাছে দীক্ষা পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত ও কৃতার্থ বোধ করেছিলেন। এতে দেশের সে অংশে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী-প্রচারের বিশেষ সহায়তা হয়।...

বাঙ্গালোরে ঐ সময় মহাপুরুষ মহারাজ রাত্রি ৩টা থেকে সকাল পর্যন্ত বহুক্ষণ ধ্যানে অতিবাহিত করার পর সাধুভক্তদের সঙ্গে ধর্মপ্রসঙ্গ করতেন, পুনরায় অপরাহ্ণেও। মন্দিরে প্রত্যহ সন্ধ্যারতিতে তিনি যোগ দিতেন। আরতির সময় দীন ভক্তের মতো তিনি করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। তারপর সমবেত ভজনেও যোগ দিতেন।

সে বছর বাঙ্গালোরে কয়েকজন ভক্তকে তিনি দীক্ষা দিয়েছিলেন। বাঙ্গালোর ক্যান্টের 'আন্নাভাসথিসঙ্ঘম্' কর্তৃক বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি প্রবীণ সাধুদের নিয়ে সেখানে যান। সেখানকার উদ্যোক্তারা এবং অন্যান্য ভক্তরা তাঁর উপস্থিতিতে বিশেষভাবে উদ্দীপিত হন। তিনি তাঁদের কর্মপ্রচেষ্টার সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করেন এবং সরল ধর্ম-উপদেশ দিয়ে সকলকে আনন্দ দান করেন। তাঁর অনুগামীদের মধ্যে একজন সন্ন্যাসীর বক্তৃতার পর ভজন এবং কীর্তন হয়।...

সে বছর কাবেরী-বন্যা রুদ্রমূর্তি ধারণ করার ফলে বহু লোককে গৃহহীন হতে হয়। সে দুর্বিপাকের কথা শুনে মহাপুরুষ মহারাজ অত্যন্ত বিচলিত হন। সঙ্গে সঙ্গে মাদ্রাজ মঠ বন্যাক্লিষ্টদের সাহায্যকল্পে ত্রাণকার্য শুরু করে দেয়। এই একই উদ্দেশ্যে বাঙ্গালোর আশ্রমের অধ্যক্ষ আরও দুজন সাধুকে নিয়ে কেরালায় যাত্রা করেন। ফলে আশ্রমের সমস্ত দায়িত্ব মহাপুরুষ মহারাজের ওপর এসে পড়ে এবং তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সে কাজ করেন। আমি বাঙ্গালোর আশ্রমের পুরাতন কর্মী বলে স্থানীয় অবস্থা জানতাম; সেজন্য অনেক কাজ আমার উপর এসে পড়ত এবং আমিও তাঁর উপদেশ মতো সব কাজ করতাম। এতে পুনরায় আমার পক্ষে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসবার সুযোগ হলো। আমি প্রকৃতই তাঁর মহানুভবতা, মহাপ্রাণতা এবং নিরভিমানতা দেখে মুগ্ধ হয়ে যাই।

স্বাস্থ্য ভাল রাখবার জন্য আমি নিয়মমত শারীরিক ব্যায়াম করতাম। এ বিষয়েও মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে উৎসাহ দিতেন। তিনি তাতে বিশেষ সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে 'Tony's chest Developer' কেনবার জন্য ত্রিশ টাকা দিলেন। এতে আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি করবার উৎসাহ আরও বেড়ে গেল।...

বাঙ্গালোর আশ্রমে তাঁর উপস্থিতি সেখানকার আধ্যাত্মিক পরিবেশকে নিশ্চিতরূপে আরও উন্নত করতে সাহায্য করেছিল। তাঁর অনুপ্রেরণায় ভজন, ধ্যান, জপ, পূজা, ধর্মালোচনা আমাদের দৈনন্দিন কাজের বিশেষ অঙ্গ হয়ে উঠল। যে সব ভক্ত সে সময় তাঁর কাছে দীক্ষালাভ করে ধন্য হয়েছিলেন, তাঁরা জীবনাদর্শের প্রতি আন্তরিকভাবে অনুগত ছিলেন এবং পরবর্তী কালে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী-প্রচারের কাজে অনেক সাহায্য করেছিলেন।

আমার বিশেষ করে একজন ভক্তের কথা মনে আছে, যিনি মাদ্রাজ থেকে বাঙ্গালোর এসে মহাপুরুষজীর কাছে দীক্ষাগ্রহণ করলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ পূজাদিরও ব্যবস্থা করেছিলেন। শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ গুরুদক্ষিণা হিসাবে তিনি কতকগুলি মূল্যবান পরিধেয় বস্ত্র এবং নগদ ১০০১ (একহাজার এক) টাকা প্রণামী দিয়েছিলেন। সে সময় এ টাকার পরিমাণ কম ছিল না। কিন্তু মহাপুরুষ মহারাজ সেসব কিছুই নিজে গ্রহণ করলেন না। সব টাকাকড়ি ও বস্ত্রাদি মঠ ও মিশনের বিভিন্ন শাখায় বিতরণ করে দিলেন। তিনি প্রায় বলতেন, "শ্রীরামকৃষ্ণই জগতের প্রকৃত শিক্ষাদাতা, আচার্য, গুরু; আমি প্রভুর দীন সেবক এবং বার্তাবহমাত্র।" তাঁর ভিতর গুরুভাব আদৌ ছিল না।

যদিও তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ হিসাবে এসেছিলেন, তবু তাঁর সরল অনাড়ম্বর জীবনধারার কোনরূপ পরিবর্তন হয়নি।

১৯২৬ সালে পুনরায় মহাপুরুষ মহারাজকে বাঙ্গালোরে আমাদের মধ্যে পাবার সৌভাগ্য হয়েছিল। তিনি মাদ্রাজ থেকে উটিতে গিয়ে প্রায় পাঁচ মাস সেখানে অবস্থান করে ২২ অক্টোবর বাঙ্গালোরে এলেন। স্বামী গঙ্গেশানন্দ ও স্বামী অপূর্বানন্দ এবং আরও কয়েকজন তাঁর সঙ্গে আসেন।

এবার তাঁর শুভাগমনে মহীশূর রাজ্যে রামকৃষ্ণ-আন্দোলন উদ্দীপিত হয়েছিল। তাঁর ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণায় ও পরিচালনায় মহীশূর শহরের ভক্তবৃন্দ দেওয়ান রোডস্থিত এক ভাড়াটিয়া বাড়িতে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন। স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ সেখানে মোহন্ত নিযুক্ত হলেন।

মহাপুরুষজী ভজন ও কীর্তন ভালবাসতেন বলে আরতির পর সন্ধ্যায় ভজন গানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বিভিন্ন ভজনের দল আশ্রমে এসে ভজনে অংশ গ্রহণ করতেন। পরিশেষে প্রসাদস্বরূপ মিষ্টান্ন বিতরণ করা হতো।...

আমরা মহাপুরুষ মহারাজকে সে বার বাঙ্গালোরে কেমন দেখেছিলাম, কিভাবে তাঁর অভ্যর্থনা করেছিলাম এবং তৎসংলগ্ন আরও বহুবিধ ঘটনার বিশদ বর্ণনা

করতে হলে প্রবন্ধটি আরও বড় হয়ে যাবে। কাজেই ১৯৩০ সালে বেলুড় মঠে আমি তাঁকে কেমন দেখেছিলাম তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে এ স্মৃতিকথা বরং শেষ করা ভাল।

যদিও কয়েক বছর পরে তিনি আমাকে পুনরায় বেলুড় মঠে দেখে খুবই আনন্দিত হলেন, কিন্তু আমি তাঁকে অসুস্থ দেখে খুবই দুঃখিত হলাম। বাঙ্গালোরের দিনগুলির কথা আমার স্মৃতিপথে উদিত হলো, যখন তাঁকে আমি আনন্দ ও উজ্জ্বলতায় পরিপূর্ণ দেখেছিলাম। এ চিন্তা বারবার মনে আসত এবং আমার মন অত্যন্ত দুঃখক্লিষ্ট হয়ে উঠত। যা হোক, আমি দেখলাম যে, সকলের প্রতি তাঁর প্রেম ও স্নেহ আরও বর্ধিত হয়েছে। তিনি প্রায়ই খোঁজ-খবর নিতেন আমার কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা এবং আমার সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করতেন। একদিন একজন সাধুকে পথপ্রদর্শক হিসেবে সঙ্গে দিয়ে তিনি আমাকে দক্ষিণেশ্বরে পাঠিয়ে দিলেন। ফিরে এলে তিনি আমার দর্শনাদি কেমন হলো তা সস্নেহে জিজ্ঞেস করলেন। আমি 'কথামৃত' পড়েছিলাম; তাই সে পবিত্র স্থানের প্রতিটি অঞ্চল আমার কাছে বিশেষ পরিচিত বলে বোধ হয়েছিল। কেবলমাত্র শ্রীগুরুমহারাজজীই (শ্রীরামকৃষ্ণদেবই) মানব-শরীরে ছিলেন না। আমি প্রকৃতই তাঁর অনুপস্থিতি বিশেষভাবে অনুভব করলাম। মহাপুরুষজী বললেন, "ঐ দক্ষিণেশ্বর স্থানটি অত্যন্ত জীবন্ত, পবিত্র তীর্থস্থান, মহান আধ্যাত্মিক জীবনের উদ্দীপনকারী।"

যখন সেই দীর্ঘ অতীত দিনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি এবং তাঁর সঙ্গে আমার ১৯২১, ১৯২৪, ১৯২৬ ও ১৯৩০ সালের পবিত্র ও আনন্দের দিনগুলির কথা চিন্তা করি, তখন তাঁর প্রতি আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। যদিও সে সময় তাঁর মহান আধ্যাত্মিক সত্তাকে উপলব্ধি করার মতো ক্ষমতা আমার ছিল না, তবু তিনি সর্বদাই প্রেম, পবিত্রতা ও করুণার প্রতিমূর্তিরূপে আমার হৃদয়ে বিরাজিত আছেন।

শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতিকথা*

স্বামী তপস্যানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহান শিষ্য পরমপূজ্যপাদ শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ স্বামী শিবানন্দজীর বিষয়ে সামান্য কিছু স্মৃতিকথাও লিখতে অক্ষমতা ও সঙ্কোচ বোধ করছি, কারণ তাঁর দিব্য-জীবনের মহত্ত্ব ধারণা ও বিশ্লেষণ করার সামর্থ্য আমার নেই; অধিকন্তু জনসাধারণের সামনে উপস্থাপিত করার মতো উপযোগী ঘটনাবলীরও নিতান্ত অভাব। 'স্মৃতিসংগ্রহ'-এর সংকলক স্বামী অপূর্বানন্দজীর অনুরোধ ও নির্দেশের বলেই আমার যৎ সামান্য চিন্তা লিপিবদ্ধ করতে সাহসী হয়েছি।

আমি নিজেকে পুরোপুরি অর্থে শ্রীমহাপুরুষজীর শিষ্য বলে দাবি করি। তাঁর কাছ থেকে মন্ত্রদীক্ষা, ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস গ্রহণ করেছি। কিন্তু তথাপি তাঁর সঙ্গলাভ করার খুব অল্প সুযোগই ঘটেছে এবং তাঁর জীবনের ঘটনাবলী ও উপদেশ সম্বন্ধে লিখবার উপাদানও আমার বেশি নেই। প্রথমত একথাটি বিশেষ করে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন আছে যে, ভারতের চিরন্তন ধারা অনুসারে গুরুর সেবা ও তাঁর সান্নিধ্যে বাস আধ্যাত্মিক জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বলে পরিগণিত। গীতা এতদূর পর্যন্ত বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি গুরুর সেবা করেনি, তার কাছে ঈশ্বরীয় কথা বলবে না। গুরু ও দেবতার প্রতি ভক্তিরহিত, শ্রবণে অনিচ্ছুক অনধিকারীর কাছে ধর্মকথা বলা উচিত নয়। 'ন চাঽশুশ্রূষবে বাচ্যম্'। রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের ঐতিহ্য ও নিয়মকানুনে ভারতে প্রচলিত যুগযুগান্তরব্যাপী ধারার কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, তাঁর প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্থূলশরীরের প্রতীক—শ্রীরামকৃষ্ণই সঙ্ঘের প্রকৃত গুরু, তিনিই ব্যক্তিনির্বিশেষে তাঁর সন্তানদের মাধ্যমে কাজ করছেন। ব্যাপক অর্থে জগদ্গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাকেই তপস্যা হিসেবে অনুসরণ করবার জন্য বিবেকানন্দ তাঁর অনুগামীদের বলেছেন। এই আদর্শ অনুসারে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সন্ন্যাসিগণ অনেকেই তাঁদের নিজ নিজ দীক্ষাগুরুর সান্নিধ্যে থাকবার সুযোগ খুব কমই পেয়ে থাকেন। তাঁরা সঙ্ঘের বহুদূরবর্তী কেন্দ্রগুলিতে কর্মিরূপে দায়িত্ব, অনাসক্তি ও আত্মোৎসর্গের ভাবে

---

* ইংরেজির অনুবাদ

অনুপ্রাণিত হয়ে সবরকম দৈহিক, মানসিক ও ধর্মীয় কাজ করেন। ঠিক ঠিক লৌকিক অর্থেও রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সব প্রতিষ্ঠান ও কর্ম সাময়িকভাবে সঙ্ঘের প্রধান বা স্থানীয় অধ্যক্ষের দায়িত্ব বটে এবং সে দায়িত্বে অংশ গ্রহণ করে কর্মীরা প্রকৃতপক্ষে তাঁদের মন্ত্রগুরুরই সেবা করছেন। গুরুশুশ্রূষার এই ব্যাপক অর্থই রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে বিশেষভাবে গৃহীত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য-ব্যক্তিত্ব ও বাণীর প্রতি আমি কিভাবে আকৃষ্ট হয়েছি, সে সম্বন্ধে বক্ষ্যমাণ স্মৃতিকথার অংশ হিসেবে কিছু লিখবার জন্য সংকলক আমাকে নির্দেশ দিয়ে খুবই উপযোগী কাজ করেছেন। কারণ শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর দীন সেবকদের যথার্থ আচার্য মদীয় দীক্ষাগুরু শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ (যাঁর স্মৃতিকথা এখানে লিপিবদ্ধ করছি) থেকে পৃথক্ নন। শ্রীরামকৃষ্ণের নাম ও শিক্ষার সঙ্গে আমি প্রথম পরিচিত হই বাল্যকালে যখন কালিকটে নিম্ন মাধ্যমিক শ্রেণীতে পড়ি। আমার গর্ভধারিণী মালয়ালম ভাষায় লিখিত একখানা পুস্তক পড়ছিলেন, তাতেই আমি তখন জানিতে পারি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ছিলেন ঈশ্বরদ্রষ্টা মহাপুরুষ এবং তাঁর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ একজন বড় বক্তা। মনে পড়ে, ঈশ্বরকে দেখা যায় কিনা—এ প্রশ্ন তুলে আমার এক সহপাঠী বন্ধুর সঙ্গে আমার তুমুল তর্ক হয়েছিল। সহপাঠী বলেন, ঈশ্বরদর্শন অসম্ভব; আমি বলি, ঈশ্বরদর্শন সম্ভব। আরও মনে পড়ে, আমার মতের সমর্থনে আমি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ঈশ্বরদর্শনের কথা উল্লেখ করি; বন্ধু অবশ্য তা মেনে নেননি।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও শিক্ষার সঙ্গে আমার প্রকৃত পরিচয় ঘটে দু-এক বছর পরে, যখন আমরা ঘটনাক্রমে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের একজন বড় ভক্তের গৃহে বাস করি। সুবিধার জন্য ঐ ভক্তের নাম এখানে শ্রী এ. বলে উল্লেখ করব। তিনি আমার জনৈক ঘনিষ্ঠ সহপাঠীর পিতা ছিলেন। এই বিশিষ্ট সহপাঠীর বাড়ির এক পুষ্করিণীতে অন্যান্য কয়েকটি বালকসহ আমি স্নান করতে যেতাম। কেরলে যে সব প্রাচীন ভক্ত রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সঙ্গে আগে থেকেই ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, আমার বন্ধুর পিতা শ্রী এ. তাঁদের অন্যতম। তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের কাছে মন্ত্রদীক্ষা পান, বেলুড় মঠ ও শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থানাদি দর্শন করেছেন; তাঁর গৃহে ঠাকুরঘরে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীসারদাদেবী, বিবেকানন্দ ও অন্যান্য শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদদের প্রতিকৃতি পূজিত হতো। যেসব মন্দিরে দেবদেবীর প্রস্তরমূর্তি আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্মণ-পুরোহিতগণ কর্তৃক পূজিত হয়, আমি পূর্বে সেসব মন্দিরেই যেতাম। শ্রী এ-র গৃহের ঠাকুরঘরে নরদেহধারী ভগবান ও মহাপুরুষগণের পূজার্চনা-দর্শন সম্পূর্ণ নূতন অভিজ্ঞতা। এতে আমার মন বিশেষভাবে প্রভাবিত হলো। অধিকাংশ দিনই

পুষ্করিণীতে স্নান সেরে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করে পূজা-আরতি প্রভৃতি অনুষ্ঠান ভক্তিভরে দর্শন করতাম। সেখানেই প্রথম শিক্ষা পাই—শ্রীরামকৃষ্ণ নরদেহধারী ভগবান, অবতার; তিনি রাম, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, শিব, জগন্মাতা ও অন্যান্য দেবদেবীর মতো আরাধ্য। কিছুদিন পরে আমাদের গৃহেও এরূপ একটি ছোটখাট ঠাকুরঘর স্থাপিত হলো; আমার গর্ভধারিণী আগে থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগিণী ছিলেন এবং বন্ধু গৃহের ভক্ত-পরিজনদের সঙ্গে মিলেমিশে এরূপ পূজার্চনায় আরও অধিক মনোনিবেশ করেন।

এ সময়ে স্বামী নির্মলানন্দজীর (তুলসী মহারাজ) সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করার সুযোগ আমার ঘটে। তিনি তখন কেরলে শ্রী এ.-র গৃহে কয়েকদিন অবস্থান করেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন এবং বরাহনগর মঠে শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্যগণের সাহচর্য লাভ করেছিলেন। তিনি অনেক বৎসর দক্ষিণভারতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা প্রচারে ব্রতী ছিলেন। আমি যে সময়ের কথা বলছি, তখন তিনি বাঙ্গালোর আশ্রমের অধ্যক্ষ এবং ত্রিবান্দ্রামে একটি কেন্দ্র স্থাপন করে সেখানে মঠের ভিত্তি স্থাপন করবার জন্য বেলুড় মঠের প্রথম অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজকে সাদর আহ্বান করেন। স্বামী নির্মলানন্দজীর বহুমুখী ব্যক্তিত্ব আমার মনে বিশেষ রেখাপাত করেছিল।...

পনেরো-ষোল বছর বয়সে যখন এস. এস. এল. সি. শ্রেণীতে পড়ি তখন থেকেই আমি স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতাবলী ও 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকা পড়তে আরম্ভ করি। এসব আমাকে খুব প্রভাবিত করলেও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিষ্যগণ লিখিত 'স্বামী বিবেকানন্দের জীবনচরিত' (প্রথম সংস্করণ) আমাকে যেমন মুগ্ধ করেছে আর কিছুই তেমন করতে পারেনি। দুর্ভাগ্যবশত প্রথম সংস্করণের সে জীবনচরিতখানি এখন আর ছাপা নেই। সহজ অথচ উদ্দীপনাময়ী ভাষায় লিখিত প্রথম দুইখণ্ড জীবনচরিত আমার মনে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রতি আবেগময় ও একনিষ্ঠ অনুরাগ সঞ্চারিত করেছে।

ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ—স্বামী শিবানন্দজীকে দর্শন করবার আমার প্রথম সুযোগ ও সৌভাগ্য হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের 'মানসপুত্র' বলে সুপরিচিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ ১৯২০-২১ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশন ছাত্রাবাসের উদ্বোধন-কার্য সম্পন্ন করবার জন্য শুভাগমন করেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের উচ্চ আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু সংবাদ সুদূর কেরলে ইতঃপূর্বেই পৌঁছেছিল তাঁর সংকলিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ' পুস্তিকার মাধ্যমে। কেরলের ভক্তদের কাছে তাঁর নাম সুবিদিত। ১৯১৬

খ্রিস্টাব্দে তিনি কেরল, ত্রিবান্দ্রাম ও কন্যাকুমারী পরিদর্শন করেন এবং অনেক ভক্তকে মন্ত্রদীক্ষা দেন।

কালিকট থেকে আমার গর্ভধারিণী ও কতিপয় ভক্ত দীক্ষাপ্রার্থী হয়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজকে দর্শন করবার জন্য মাদ্রাজ রওনা হন। স্বামী নির্মলানন্দজীও বাঙ্গালোর থেকে মাদ্রাজে পৌছেন। আমি তখন যুবকছাত্র, কিছু ইংরেজি জানি; সুতরাং ভক্তগণ আমাকেই দোভাষীর কাজ চালাবার জন্য নির্বাচন করায় আমিও তাঁদের সঙ্গী হলাম।

মাদ্রাজ মঠের তদানীন্তন অধ্যক্ষ স্বামী শর্বানন্দজী আমাদের সকলকেই রাজা মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ) দিব্য-সান্নিধ্যে নিয়ে গেলেন। 'মহারাজ' একখানা আরাম-কেদারায় উপবিষ্ট ছিলেন; তাঁর মুখমণ্ডল ধীর ও প্রশান্ত, চোখ অন্তর্মুখ ও সজাগ। স্বল্পভাষী তিনি ভক্তদের প্রশ্নের উত্তরে সামান্য দু-চারটি উপদেশ ও আশ্বাসবাণী দিলেন। দীক্ষার্থী সকলকেই দীক্ষাগ্রহণের অনুমতি দেন। ব্রহ্মচারী গোপাল মহারাজ (স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজী) দোভাষীর কাজ করেন।

আমরা জানতে পেলাম, রাজা মহারাজের সঙ্গে মাদ্রাজ মঠে আর একজন শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদও শুভাগমন করেছেন। ঐ অপ্রত্যাশিত ঘোষণায় অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে আমরা শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ স্বামী শিবানন্দজীর সান্নিধ্যে উপনীত হলাম। তিনি তখন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ। শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ একখানা চেয়ারে উপবিষ্ট ছিলেন। মহাপুরুষজীকে দর্শন ও প্রণাম করে আমার ধারণা হলো—তিনি অধিকতর মানবীয় অথচ অতীন্দ্রিয়-মহিমোজ্জ্বল, তাঁর মধ্যে এক বিরাট ব্যক্তিত্ব আকর্ষণীয় ও অভিব্যক্ত প্রকৃতির সঙ্গে সুসমঞ্জসরূপে মিলিত হয়েছে। তাঁর মুখমণ্ডল প্রসন্নমধুর হাসিতে সমুদ্ভাসিত। নতুন ভক্তদের পরিচয় দেওয়া হলে তিনি সদয় সম্মতি দ্বারা তাঁর শির-সঞ্চালন করলেন। তাঁর চুলের রঙ দেখে মনে হলো তিনি রাজা মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দজী) চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ, কিন্তু বয়স তাঁকে কোনরূপেই বৃদ্ধ করতে পারেনি। তাঁর মধ্যে পূর্ণস্বাস্থ্যের লক্ষণগুলি প্রকাশ পাচ্ছিল। রক্তিমাভ মুখমণ্ডল, বিস্ফারিত নয়নযুগল, চিন্তারহিত সদাপ্রফুল্ল সর্বানুকম্পী মনোভাব দেখে দর্শনার্থিমাত্রই তাঁর বিরাট দিব্য-সান্নিধ্যে গভীর শান্তি অনুভব করত। মহাপুরুষজী কৃপা করে ভক্তদের খোঁজখবর নিলেন এবং তাঁদের বললেন, "ভক্তি ও বিশ্বাসের সঙ্গে ভগবানের নাম করাই মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির শ্রেষ্ঠ উপায়।"

মাদ্রাজ মঠের চাঁদনীতে পৌছেই একটি মনোমুগ্ধকর দৃশ্য আমার চোখে পড়ে। ঐ দৃশ্যের স্মৃতি প্রায়ই মনে জাগে। সন্ধ্যার পর স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ মুক্ত বায়ু-সেবন করতে বের হলেন। শ্রীমহাপুরুষজীর সঙ্গে তিনি দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে

আছেন। কানঢাকা টুপি মাথায় এবং বেড়াবার লাঠিখানা হাতে রাজা মহারাজ অন্তর্মুখ, আর মহাপুরুষ মহারাজ প্রসন্ন ও দীপ্ত বদনে পাশে দণ্ডায়মান। এ এক অপূর্ব দৃশ্য! দুই পরমপূজ্য মহাপুরুষেরই দেহসৌষ্ঠব, পদমর্যাদা, প্রশান্ত ও দিব্যভাব চিত্তাকর্ষক। তাঁদের পবিত্র জীবন, সর্বানুকম্পা ও অন্তর্মুখ-ভাব সৃষ্টি করেছিল এক আকর্ষণীয় গাম্ভীর্য।

আমরা কয়েক সপ্তাহ মাদ্রাজে বাস করে পূজনীয় স্বামিপাদদ্বয়কে দর্শন এবং তাঁদের শ্রীমুখের উপদেশ শ্রবণ করেছি।

* * *

বিদ্যালয়ের শিক্ষা-সমাপনান্তে আমি কেরল ছেড়ে মাদ্রাজে কলেজে ভরতি হই। রাজা মহারাজ ও শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ তখনও দক্ষিণ-ভারতে ছিলেন। মাদ্রাজ ছাত্রাবাসের দ্বারোদ্ঘাটনের পর স্বামিপাদদ্বয় বাঙ্গালোর আশ্রম পরিদর্শনের জন্য বাঙ্গালোরে যান এবং দশহরার পূর্বে মাদ্রাজে প্রত্যাবর্তন করেন। স্বামী শর্বানন্দজীর বিশেষ ইচ্ছা ও আগ্রহে রাজা মহারাজের উপস্থিতিতে ও তত্ত্বাবধানে মাদ্রাজ মঠে সাড়ম্বরে ও যথাবিধি প্রতিমায় দুর্গাপূজা উদ্‌যাপনের আয়োজন হয়। সেবারই প্রথম দুর্গোৎসব উদ্‌যাপিত হয় মাদ্রাজ মঠে—তাও আবার স্বামিপাদদ্বয়ের দিব্য-উপস্থিতিতে; কাজেই উহা বাস্তবিকই এক অভূতপূর্ব অনুষ্ঠান বলে পরিগণিত হয় সকলের কাছে। স্বয়ং মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দজী) কলকাতা থেকে দুর্গাপ্রতিমা আনার ব্যবস্থা করেন। মাদ্রাজ মঠের প্রশস্ত হলঘরে দেবীপূজার আয়োজন হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এ দু-জন পার্ষদ ছাড়াও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল চট্টোপাধ্যায়ও (মঠে রামলাল দাদা নামে পরিচিত) ঐ পূজায় উপস্থিত ছিলেন। পূজানুষ্ঠানে মাদ্রাজ ও দক্ষিণ-ভারতের অন্যান্য স্থান ও কেন্দ্র থেকে বহু সাধু ভক্ত যোগদান করেন। স্বামী অখিলানন্দজী (তখন একজন ব্রহ্মচারী) পূজকের পদগ্রহণ করেন এবং স্বামী শর্বানন্দজী ছিলেন প্রধান তন্ত্রধারক।

আমি তখন মাদ্রাজে নবাগত এবং স্বভাবত একটু লাজুক ও ভীরু থাকায় ঐ বৃহৎ অনুষ্ঠানের ও পূজ্যপাদ স্বামিপাদদ্বয়ের সাক্ষাৎ উপস্থিতির পুরোপুরি সুযোগ গ্রহণ করতে পারিনি। যা হোক, দুর্গাপূজায় যোগদান করে কদিনই মঠে প্রসাদ পেয়েছি। পূজার সময়েই একদিন শ্রীমহাপুরুষ মহারাজকে প্রতিমার সামনে বসে ৺শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ করতে দেখেছি। ৺কুমারীপূজার (ছোট একটি বালিকাকে জগন্মাতারূপে পূজা) পর মহাপুরুষজী কুমারীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন এবং দেখলাম কুমারী হতবুদ্ধি হয়ে ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

দুর্গাপূজার পর রাজা মহারাজ ও মহাপুরুষ মহারাজ আরও কিছুকাল মাদ্রাজ মঠে অবস্থান করেন। মাঝে মাঝে আমি মাদ্রাজ মঠে গিয়ে পূজ্যপাদ মহারাজদ্বয়কে প্রণাম করেছি। রাজা মহারাজ কখনো মঠের স্তম্ভগুলির চারদিকে ঘুরে বেড়াতেন। অনেক দিন মহাপুরুষ মহারাজকে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যেতে দেখেছি; কখনো তিনি একাকী নিঃসঙ্গই যেতেন।

দুর্গাপূজার সময় আরও কয়েকটি যুবা-ছাত্রের সঙ্গে আমি পরিচিত হই—তাঁরাও মঠে যেতে শুরু করেন। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন কৃষ্ণ নাম্বিয়াতিরি (পরে স্বামী আগমানন্দ)—তিনি ইতঃপূর্বেই ত্রিবান্দ্রমে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে রাজা মহারাজের নিকট মন্ত্রদীক্ষা পেয়েছেন; আর দু-জন ছিলেন চিন্নু (পরে স্বামী চিদ্‌ভবানন্দ) ও টি. এস. অবিনাশিলিঙ্গম চেট্টিয়ার। অবিনাশিলিঙ্গম একজন বিশিষ্ট ভক্ত এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের অক্লান্ত কর্মী ছাড়াও পরবর্তী কালে রাজনৈতিক নেতারূপে খ্যাতি লাভ করেন। মনে পড়ে, অনেক সময় আমরা তিনজনই একত্র হয়ে মহাপুরুষজীর পদতলে বসে তাঁর শ্রীমুখের ধর্মোপদেশ শুনেছি—মহাপুরুষ মহারাজ প্রসন্ন হাস্যে ও ভাবব্যঞ্জক ভঙ্গিতে আমাদের সঙ্গে কথা কইতেন। ঐ সব প্রসঙ্গের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে এখন কিছু মনে নেই, কিন্তু এটা সত্য যে, তিনি করুণামাখা স্নেহপূর্ণ প্রফুল্ল মনোভাব এবং শান্ত ও গৌরবোজ্জ্বল প্রকাশভঙ্গি দ্বারা আমাদের মনে গভীরতম রেখাপাত করেছিলেন। দক্ষিণদেশে ছয়মাসেরও অধিককাল অবস্থানের পর রাজা মহারাজ ও মহাপুরুষ মহারাজ বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্তন করেন।

দক্ষিণ-ভারত-পরিভ্রমণের পর স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ বেশিদিন জীবিত ছিলেন না। ১৯২২ খ্রিঃ এপ্রিল মাসে তিনি মহাসমাধিযোগে শরীরত্যাগ করেন। তারপর শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ (প্রেসিডেন্ট) পদে সমাসীন হন।

অধ্যক্ষপদে সমাসীন হবার অনতিকাল পরে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে শ্রীমহাপুরুষজী আবার মাদ্রাজে শুভাগমন করেন। সে সময় পাঠ্যাবস্থায় আমার অনেকবার তাঁকে মাদ্রাজ মঠে দর্শন করার সৌভাগ্যলাভ হয়। মাদ্রাজে তিনি বেশিদিন ছিলেন না, সেবার নীলগিরি এবং বাঙ্গালোর প্রভৃতি স্থানে গিয়েছিলেন।...

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে মহাপুরুষ মহারাজ আবার মাদ্রাজে শুভাগমন করেন। আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি—সেবার ছিল মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার শেষ বর্ষ। মাদ্রাজ মঠে আমি তখন ঘন ঘন যাতায়াত করতাম, কাজেই মহাপুরুষজীকে বহুবার দর্শন করবার সৌভাগ্য হয়েছে। তিনি সহজগম্য ছিলেন—আমাদের মতো যুবকদের এবং গণ্যমান্য বড়লোকদের মধ্যে তিনি কোন

পার্থক্য করতেন না, সকলকেই সমভাবে গ্রহণ করতেন। মাদ্রাজ মঠের পুরোভাগে পশ্চিমদিকের প্রকোষ্ঠে—যেখানে বর্তমানে (১৩৭৫) মঠাধ্যক্ষ থাকেন—সেখানে মহাপুরুষজী অবস্থান করছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন দু-জন সেবক—স্বামী গঙ্গেশানন্দজী (দ্বিজেন মহারাজ) ও স্বামী অপূর্বানন্দজী (শঙ্কর মহারাজ)। মহাপুরুষজীর স্মৃতির সঙ্গে জড়িত সেবকদ্বয়ের কথা তদবধি সর্বদাই আমার মনে জাগে। এবারই আমি পরমপূজ্যপাদ শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করি। কারও কাছে থেকে সুপারিশ না নিয়ে দীক্ষা প্রার্থনা করতেই মহাপুরুষজী কৃপাপূর্বক সানন্দে আমাকে মন্ত্রদীক্ষা দেন। আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই দীক্ষার সেই বিশিষ্ট শুভদিনটি ছিল শ্রীগুরুদেব মহাপুরুষজীর পূত জন্মদিন। সেই দিনই আমার ছোটভাই-এর দীক্ষা হলো—ছোটভাই তখন মাদ্রাজের ছাত্র ছিল। মাদ্রাজ মঠের ঠাকুরঘরে আমাদের দীক্ষা হয়—ঐ ঠাকুরঘরে কিছু পরিবর্তন হয়েছে কয়েক বৎসর পর স্বামী শাশ্বতানন্দজী যখন মঠাধ্যক্ষ ছিলেন। দীক্ষানুষ্ঠান ছিল স্বল্পকালস্থায়ী ও অনাড়ম্বর, কিন্তু মনে গভীর রেখাপাতকারী। পূজান্তে গুরুদেব যেরূপ ভাবের সহিত শ্রীশ্রীঠাকুরের আরতি করেন, তাঁর সেই ভাবগম্ভীর অবস্থা, হাত তুলে প্রার্থনা, আশীর্বাদজ্ঞাপক ভঙ্গিতে আমাদের উপর আশীর্বাণী-বর্ষণ, তখনকার তাঁর করুণাময় পরমপূজ্য মূর্তি আমার স্মৃতিতে চিরজাগরূক রয়েছে। গুরুদেব উপদেশ দেন : 'মন্ত্র জপ করলে জ্ঞান ভক্তি বৈরাগ্য বৃদ্ধি পাবে।' দীক্ষানুষ্ঠানের পূর্বে পূজায় সাহায্য করেছিলেন জনৈক সন্ন্যাসী।

আমার দীক্ষার দিন পরমপূজ্যপাদ শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের শুভ জন্মতিথি দিবস থাকায় সেদিনটি মাদ্রাজ মঠে একটি ছোটখাট উৎসবরূপে উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজানুষ্ঠান ছাড়াও অনেক শিষ্য ও ভক্ত-জনসাধারণ মহাপুরুষজীকে প্রণাম, ঠাকুরঘরে পূজার্চনা দর্শন এবং প্রসাদগ্রহণ করতে সমবেত হন।

সে সময়ে আমি প্রত্যহই প্রাতে বা সন্ধ্যায় মহাপুরুষজীকে প্রণাম করতে যেতাম। তাঁর স্বাস্থ্য বেশ ভাল ছিল, যদিও শক্তি-সামর্থ্য কিছুটা কমে গিয়েছিল। কিন্তু তখনও তাঁর মুখমণ্ডল ছিল তেজোমণ্ডিত, শান্ত ও সদানন্দময়। তাঁর আচরণ সর্বদাই এত সরল, উদার ও আকর্ষণীয় ছিল যে, ঐ বিরাট মহামহিমান্বিত ব্যক্তিত্বের সামনে থেকে অনুভূত হতো পরিপূর্ণ শান্তি ও আনন্দ।

সে সময়ে মহাপুরুষজীর শ্রীমুখের কয়েকটি কথা শুনবার আমার পরম সৌভাগ্য হয়েছিল—কথাগুলি চিরদিন আমার মনে স্থায়ী রেখাপাত করেছে। একদিন মহীশূরের মহারাজার জনৈক প্রতিনিধি মহাপুরুষজীকে মাদ্রাজস্থমহীশূর প্রাসাদে

সাদর আমন্ত্রণ জানাতে এসেছিলেন সান্ধ্য-আরতির অব্যবহিত পরে। মাদ্রাজ মঠের পুরোভাগে বৃহৎ হলঘরে সকলে বসেছিলেন, আমি কাছে দাঁড়িয়ে। মহীশূররাজ-প্রতিনিধিকে মহাপুরুষজী বললেন ঃ 'কেহ খুব ধনী হতে পারে এবং মোটা মাইনে পেতে পারে, কিন্তু পরিণামে এর কী উপযোগিতা আছে? মৃত্যু এসে সবই গ্রাস করে। শরীরটা রোগমন্দির বই তো আর কিছু নয়!' ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, 'রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মতো একটা বিরাট প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ বা প্রধান হয়ে আপনি এর সর্বপ্রকার কর্ম পরিচালনা করছেন। কর্মগুলির প্রতি কি আপনি কোন আসক্তি বোধ করেন?' শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ চুপ করে রইলেন এবং কিছুক্ষণ অন্তর্মুখ থেকে উত্তর দিলেন, 'না।'

আর একদিন বেলা চারটায় মহাপুরুষজীকে প্রণাম করে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় মফঃস্বল থেকে আগতা একজন শিক্ষিতা মধ্যবয়স্কা তামিল ভক্তমহিলা মহারাজের প্রকোষ্ঠে এসে মহারাজকে প্রণাম করলেন। পরিচয় জানার পর মহাপুরুষজী ভক্ত-মহিলাকে জিজ্ঞেস করেন তাঁর সন্তান-সন্ততি আছে কিনা। প্রশ্ন শুনেই মহিলাটি বিহ্বল হয়ে পড়েন—তাঁর মুখে শোকের ছায়া নেমে এল। যে সাধু মহিলা-ভক্তটির পরিচয় দিয়েছিলেন তাঁর মুখে সব শুনে মহাপুরুষজী তখনই ব্যাপারটি বুঝতে পারলেন। মহিলা বালবিধবা, তাঁর কোন সন্তান-সন্ততি নেই। ঐ সুযোগে মহাপুরুষ মহারাজ তাঁকে উপদেশ দেন ঃ 'মা, বালবিধবা হয়েছ এবং তোমার সন্তান-সন্ততি নেই বলে দুঃখ করো না। এক হিসেবে তোমার আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে এটা এক মহান আশীর্বাদই হয়েছে। একবার ভেবে দেখ—যদি তোমার মাথার ওপর একটা বড় সংসারের গুরুভার ন্যস্ত থাকত তা হলে তোমার অবস্থাটা কেমন হতো? এখন তুমি মুক্ত, বিনা বাধায় আধ্যাত্মিক পথে চলতে পার। সাংসারিক অর্থে যেসব বিষয়কে আমরা দুর্ভাগ্য বলে মনে করি, সেগুলি পরে আধ্যাত্মিক দিক থেকে সৌভাগ্যই বহন করে নিয়ে আসে।' মহাপুরুষজীর অমৃতময়ী বাণী শুনে ভক্ত-মহিলাটির মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠল সম্ভবত এটা ভেবে যে, ভগবান ভক্তের জীবন নানা উপায়ে গঠন করেন—উপায়গুলি প্রথমত অপ্রিয় ও অকল্যাণকর মনে হয়, কিন্তু পরিণামে সার্থক হয়ে দাঁড়ায়।

একদিন সাধন-ভজন বিশেষত ধ্যান সম্বন্ধে শ্রীমহাপুরুষজীর উপদেশ লাভ করবার জন্য একটা সময় ঠিক করলাম। ধর্মগ্রন্থপাঠে তখন আমার মন উৎসাহিত হচ্ছিল এবং অনেক বিষয়েরই বিশদ ব্যাখ্যা জানবার জন্য একটা প্রয়োজনও বোধ করেছিলাম। গুরুদেব আমাকে যে মন্ত্র দিয়েছেন তার অর্থ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি কৃপা করে কয়েকটি কথায় মন্ত্রার্থ বলে দেন। তারপর ধ্যানের মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য

জানতে চাইলাম। উত্তরে তিনি সামান্য কয়েকটি কথা বলেন এবং বক্তব্যের সার-সংক্ষেপ করে মন্তব্য প্রকাশ করলেন, 'তুমি নিজেই সাধন-ভজন করতে করতে ঐসব বিষয়ে ক্রমশ অধিকতর আলোক পাবে এবং ভিতর থেকেই এসবের সমাধান হয়ে যাবে।' এত বছরের মধ্যে ঐসব বিচার্য-বিষয়ে কতখানি আলোক পেয়েছি জানি না, কিন্তু এটা শিখেছি যে, মনের একটা ক্রমোন্নতিশীল শক্তি আছে, যেসব ভাব একসময়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে হতো সেগুলি আরও পরিণত সময়ে সেরূপ থাকে না, অন্তরাত্মার পথ-প্রদর্শনে বিশ্বাস যদি যথার্থ হয়, তবেই তা শুধু গতানুগতিক বাহ্যানুষ্ঠান ও বিধিবদ্ধ স্বীকৃতির চেয়ে অধিকতর উচ্চভাবোদ্দীপক ও আলোকসম্পাতকারী হয়। মহান আচার্যগণ সকলেই বক্তৃতার চেয়ে আদর্শের মাধ্যমেই অধিক শিক্ষা দিয়ে থাকেন, তাঁরা মনের গ্রহণক্ষম ভূমিকার চেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকার উপরই বেশি নির্ভর করেন। উপনিষদের মহান ঋষিগণ এরূপই ছিলেন। যখন ইন্দ্র ও বিরোচন আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জানবার জন্য প্রজাপতির সমীপে উপনীত হন, তখন প্রজাপতি শুধু অস্পষ্ট ও অপরোক্ষ ভাবেই তাঁদের উপদেশ দিয়েছিলেন, যাতে তাঁদের মনে এর প্রতিক্রিয়া হয় এবং মন নিজের ভাবে ক্রমশ উন্নতির পথে অগ্রসর হয়; কয়েক বৎসর পরে তিনি জিজ্ঞাসু অধিকারীদের যথার্থ উপদেশ দিয়েছিলেন। ঠিক এমনি ভাবেই বলাকী সত্যকাম জাবালকে ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ দেন। আচার্যের যেসব গোধন ছিল সেগুলির শুধু তত্ত্বাবধান করতেই তিনি শিষ্যকে আদেশ দিয়েছিলেন। শিষ্যের শ্রদ্ধা বাকি সব কাজ করেছিল। মহান আচার্যগণ সঙ্কেতের মাধ্যমেই শিক্ষা দেন, বক্তৃতার মাধ্যমে নয়। শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ এরূপ একজন মহান আচার্য ছিলেন।

মহাপুরুষজী ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে শেষবার মাদ্রাজ আসেন। এর পরে আরও সাত-আট বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন। সুতরাং পরবর্তী কালে বেলুড় মঠে মহাপুরুষজীর পদপ্রান্তে আমি উপস্থিত হই আমার ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস দীক্ষার সময়ে। ব্রহ্মচর্য দীক্ষার সময় আমি বেলুড় মঠে যাই একদল তীর্থযাত্রীকে সঙ্গে নিয়ে, তাঁদের মধ্যে ছিলেন আমার গর্ভধারিণী মা। আমি এটা খুব শুভসূচনা মনে করি যে, ব্রহ্মচর্য দীক্ষার সময়ে আমার গর্ভধারিণী সঙ্গে ছিলেন, কারণ তিনিই সর্বপ্রথম শিক্ষাদাত্রীরূপে বাল্যকালে আমার ধর্মজীবন গঠন ও পরিচালন করেন এবং পরবর্তী কালে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শের সঙ্গে আমাকে পরিচিত করে দেন। স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজীর কাছে শুনেছি—যখন আমার গর্ভধারিণী স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন, তখন তিনি তাঁর গুরুদেবের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যাতে তাঁর একটি সন্তান সন্ন্যাসী হয়। শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ আমার মাকে ভালরূপেই জানতেন, কারণ মা মহাপুরুষজীকে দর্শন করেছিলেন দু-বার

মাদ্রাজ মঠে এবং পরে বেলুড় মঠে আমার ব্রহ্মচর্য দীক্ষার সময়ে। মহাপুরুষজীকে মার প্রতি খুবই স্নেহময় ও সহৃদয় দেখেছি।

ব্রহ্মচর্য দীক্ষার সময় যখন মহাপুরুষজীর শ্রীচরণপ্রান্তে উপস্থিত হই, তখনও তিনি অনেকটা সুস্থ ছিলেন এবং তাঁর প্রকোষ্ঠ থেকে নিচে নেমে একটু বেড়াতে পারতেন। সে বৎসর যাঁদের ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস দীক্ষা হয়, সেই অনুষ্ঠানে হোমের সময় তিনিও উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে আমার সন্ন্যাসের সময় মহাপুরুষজীর স্বাস্থ্য একেবারেই ভেঙে পড়েছিল। অনেক বছর যাবৎ তাঁর একটু হাঁপানি ছিল, কিন্তু এবার তার বাড়াবাড়ি দেখলাম এবং সে সঙ্গে রক্তের উচ্চ চাপ মিলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে দিয়ে তাঁকে প্রায় রোগী করে ফেলেছিল। কিন্তু তবু মঠের প্রচলিত রীতি অনুসারে সন্ন্যাসীদের প্রত্যুষে মঠাধীশের প্রকোষ্ঠে যেতে দেওয়া হতো তাঁকে প্রণাম করতে। শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ ও সাধারণ রোগীর মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ্য করেছি যে, তাঁর রোগশয্যার চারপাশে কোন বিষাদময় বা নিরানন্দ ভাব ছিল না। হাঁপানির আক্রমণে অথবা অস্বস্তিকর রক্তের চাপে বিনিদ্র রজনী কেটে গেলেও তাঁর মুখমণ্ডল সর্বদাই উজ্জ্বল ও আনন্দময় থাকত। কোন দৈহিক পীড়াই তাঁর মুখমণ্ডলকে মলিন ও বিষণ্ণ করতে পারত না। শুনেছি বিশেষ অসুস্থতার সময় ও আগাগোড়া দেহাবসানের পূর্ব পর্যন্ত তিনি আনন্দময় ভাবেই অবস্থান করতেন। সাধারণত দেখা যায়, অসুস্থ ব্যক্তির স্বার্থবুদ্ধি খুব প্রবল থাকে, রোগের চিন্তা ছাড়া তার অন্য চিন্তা থাকে না, যে কেউ তার কাছে যায় তাকেই অসুখের কথা খুলে বলে। সম্ভবত অন্যান্যের কাছে নিজের কষ্টের কথা জানানোই দুঃখলাঘবের একটা কৌশল। কিন্তু শ্রীমহাপুরুষজীর আচরণ ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রাতে যাঁরা তাঁকে দর্শন করতে যেতেন, দেখতেন তিনি সদা প্রফুল্ল; জিজ্ঞেস করলেও নিজের কষ্টের কথা কাউকে বলতেন না। পক্ষান্তরে তিনি দর্শনার্থীদের খোঁজ-খবরই নিতেন। বিশেষত যাঁরা দক্ষিণভারত থেকে তাঁকে দর্শন করতে আসতেন, তাঁরা যাতে তাঁদের রুচিকর খাদ্য পান সেদিকে তিনি লক্ষ্য রাখতেন এবং আহারের সময় তাঁরা রসম অথবা কড়ম্বু পেয়েছেন কিনা এবং ঐগুলি ভালভাবে প্রস্তুত হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করতেন। আমার বিশ্বাস, মহাপুরুষজীর আমলেই এবং সম্ভবত তাঁর নির্দেশেই অল্পসংখ্যক দক্ষিণ-ভারতের সাধুদের সুখ-সুবিধার জন্য মধ্যাহ্নকালীন আহারের সঙ্গে কড়ম্বুর ব্যবস্থা হয়েছে; এ বিষয়ে তাঁর আন্তরিক আগ্রহ নিতান্তই প্রাণস্পর্শী—প্রায় মাতৃসুলভ।

দৈহিক পীড়ার আক্রমণের সময়েই আধ্যাত্মিক-অনুভূতিসম্পন্ন মহাপুরুষ ও সংসারী মানুষের মধ্যে পার্থক্য ঠিক ঠিক বোঝা যায়। যখন কেউ সুস্থ থাকে, তখন

অন্যের কাছে আত্মার নির্লিপ্ততা এবং দেহের অনিত্যতা ও অকিঞ্চিৎকরত্ব সম্বন্ধে জোরগলায় বলা খুব সহজ। বাক্-বিভূতিসম্পন্ন যে কেউই এরূপ বলতে পারে। কিন্তু অসুখ ও বিপদে পড়লে শুধু জ্ঞানিগণই ধীর ও প্রশান্ত চিত্তে লোকব্যবহার করতে পারেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে আমরা এটা সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাই। দেহাবসানের সময় যন্ত্রণাদায়ক ও দীর্ঘদিনস্থায়ী রোগ তাঁর মনকে একটুও বিচলিত করতে পারেনি। ঐ সঙ্কটকালেই তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির সম্যক প্রকাশ হয়। যে সব ভক্ত তাঁর কাছে গিয়েছিলেন তাঁদের ভিতরেও তিনি ইচ্ছাশক্তি-সহায়ে আধ্যাত্মিক প্রেরণা ও অনুভূতি সঞ্চার করেছিলেন। তাঁর ভিতর থেকে যে আধ্যাত্মিক আনন্দ উৎসারিত হয়েছিল, তা তাঁর রোগশয্যাকে মুমুক্ষু সাধকদের প্রধান আশ্রয় বা আলম্বনে রূপায়িত করেছিল। প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণের আচরণের দ্বারা এটাই হৃদয়ঙ্গম হয়—জ্ঞানীর নিকট আত্মাই সারবস্তু আর দেহ অসার—ছায়ামাত্র।

রোগশয্যায় শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ সাধুভক্তগণকে তাঁর মহান গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথাই স্মরণ করিয়ে দিতেন। তিনি সর্বদাই গভীর ভক্তি ও উদ্দীপনার সঙ্গে গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করতেন। দেহাতীত উচ্চতর সত্যে যদি তাঁর মনের একান্ত অনুরাগ ও তন্ময়তা না থাকত, তা হলে হাঁপানীর আক্রমণ ও রক্তের চাপের দরুন কিছুমাত্র বিচলিত বা বিমর্ষ না হয়ে তাঁর মুখমণ্ডল কিরূপে এমন উজ্জ্বল ও প্রফুল্ল থাকতে পারত?

আমি সে বৎসর শ্রদ্ধেয় বন্ধু স্বামী ত্যাগীশানন্দ (কৃষ্ণ মেনন) ও স্বামী নিঃশ্রেয়সানন্দ (নাম্বিয়ার) এবং আরও অন্যান্যের সঙ্গে সন্ন্যাস গ্রহণ করি। সন্ন্যাসের পূর্বদিন আমরা নিজেদের ও পূর্বপুরুষগণের শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করি—এ অনুষ্ঠান দ্বারা এটাই প্রতিপন্ন হয় যে, সন্ন্যাসী দৈহিকভাবে মৃত, তাই তাঁর শ্রাদ্ধাদি শেষকৃত্য করা হয়ে থাকে। পরদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে পূজার্চনা, উৎসবাদি যথারীতি নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু আমাদের সারা দিনরাত উপবাসী থাকতে হয়েছিল, যদিও আমাদের মধ্যে যাঁরা দুর্বলশরীর ছিলেন তাঁরা মিছরির জল পান করতে অনুমতি পেয়েছিলেন। সারারাত কালীপূজা হয়, ভোর ৪টায় সন্ন্যাসের পূর্ববর্তী বৈদিক অনুষ্ঠান বিরজাহোম আরম্ভ হয়। স্বামী ওঙ্কারানন্দজী বিরজাহোম অনুষ্ঠান এবং সন্ন্যাসের আদর্শ ও মর্মার্থজ্ঞাপক মন্ত্রাদি আবৃত্তি করেন, আর সে সঙ্গে আমরাও মন্ত্রাদি আবৃত্তি করে হোমাগ্নিতে আহুতি দিই। শ্রীমহাপুরুষজী অসুস্থ থাকায় ঠাকুরঘরে স্বয়ং উপস্থিত হতে পারেননি, আমরা সন্ন্যাসপ্রার্থী বারজন ভোর সাড়ে পাঁচটায় তাঁর প্রকোষ্ঠে অনুষ্ঠানের শেষাংশ—সন্ন্যাসব্রতগ্রহণ ও সন্ন্যাসের চিহ্নধারণের জন্য যাই। স্বামী ওঙ্কারানন্দজী-উচ্চারিত প্রেষ ও মহাবাক্যমন্ত্র আবৃত্তি

করে আমরা শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের পাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করি। মহাপুরুষজী খাটে বসে হাত তুলে আমাদের প্রার্থনাপূর্ণ আশীর্বাদ করেন। আমরা শুভ্র পরিধেয় বস্ত্রাদি ও অন্যান্য চিহ্ন পরিত্যাগ করলাম—এতে অতীত জীবনের মৃত্যু এবং নতুন আধ্যাত্মিক জীবনের পুনর্জন্মই সূচিত হলো। আচার্য—গুরুদেবের কাছ থেকে আমরা নতুন নাম পেলাম এবং সন্ন্যাসের দুটি চিহ্ন—কাষায়বস্ত্র ও দণ্ড গ্রহণ করলাম। দুটি চিহ্নই জ্ঞানের প্রতীক ঃ গৈরিকবর্ণের কাষায়—অগ্নির মতো জ্যোতির্ময় ও পাবনীশক্তিসম্পন্ন; দণ্ড—ঐহিকতার বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ ও ব্রহ্মমার্গে বিচরণের প্রধান অবলম্বন।

ঐ সময় আমি প্রায় একমাস বেলুড় মঠে ছিলাম। দক্ষিণ ভারতে ফিরে যাওয়ার দিন শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীর কাছ থেকে বিদায় নিতে গেলাম। গুরুদেব তাঁর ঘরে শায়িত অবস্থায়—হাঁপানিতে কষ্ট পাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর মুখমণ্ডল ছিল সদানন্দপূর্ণ ও প্রশান্ত—যেমনটি তাঁকে দর্শন করেছিলাম প্রথম দর্শনের দিন। সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে যখন উঠলাম তিনি চোখ বুজে আশীর্বাদ করবার ভঙ্গিতে আমাকে বললেন, 'মা ভৈষীঃ—কোন ভয় নেই। সব সময়েই তোমার সাথে আছি।' গুরুদেবের ঐ বাণী আমার জীবনে অনমনীয় আলম্বনরূপে কাজ করছে।

শ্রীশ্রীগুরুদেবকে ঐ আমার শেষ দর্শন। ১৯৩৪ খ্রিঃ ২৪ ফেব্রুয়ারি তিনি মহাসমাধিতে শরীরত্যাগ করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ একবার বলেছিলেন—শ্রীরামকৃষ্ণকে যদি বৃক্ষের সহিত তুলনা করা যায়, তা হলে তাঁর শিষ্যগণকে ঐ বৃক্ষের প্রধান শাখা বলা যেতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যগণের ভিতর দিয়েই আমরা পরবর্তী বংশধরেরা আধ্যাত্মিক মহত্ত্ব, দিব্যজ্ঞান, প্রেম, অনাসক্তি, সর্বানুকম্পা ও পরমতসহিষ্ণুতার প্রতীক প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে পাই। কালে আমরা বুঝতে পেরেছি, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম প্রিয় সন্তান ও পার্ষদ শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ এই আধ্যাত্মিক আদর্শ ও ঐতিহ্যের প্রধান পতাকাবাহীদের মধ্যে ছিলেন একজন এবং সম্ভবত শ্রীরামকৃষ্ণের মহান ত্যাগী শিষ্যদের মধ্যে শ্রীমহাপুরুষজীই সবচেয়ে অধিকসংখ্যক সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তের হৃদয়ে আধ্যাত্মিক আলোক প্রজ্বালিত করার সুমহৎ কার্যে ব্রতী হবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

মহাপুরুষজীকে যেমন জেনেছি*

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

"শিবানন্দ-স্মৃতিসংগ্রহ" নামক পুস্তকে কিছু লিখতে রাজি হওয়ার জন্য সচরাচর যতখানি ভালবাসার চাপ দেওয়া দরকার তার চেয়ে কিছু বেশি চাপ আমার উপর প্রয়োগ করেছেন স্বামী অপূর্বানন্দজী। অপূর্বানন্দজীর বহু বছর মহাপুরুষজীর একনিষ্ঠ সেবা এবং তাঁর প্রচুর ভালবাসা লাভ করার অভূতপূর্ব সৌভাগ্য হওয়ায় তাঁর কাছে মহাপুরুষজীর স্মৃতিকথা অধিক পরিমাণে গচ্ছিত আছে। আমি কিছু লিখতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম এজন্য যে, দীর্ঘকাল মহাপুরুষজীর সঙ্গলাভ করার সুযোগ আমার হয়নি এবং সেজন্য তাঁর স্মৃতিকথা লিখবার খুব সামান্য উপকরণই আমার কাছে আছে। তবে এটা সত্য যে, আধ্যাত্মিক জীবনকে ধরে রাখার ও পুষ্টিবিধানের জন্য যা কিছু আবশ্যক তা আমি মহাপুরুষজীর কাছ থেকে পেয়েছি। মহাপুরুষজীর নিকট আমি মন্ত্র-দীক্ষা লাভ করেছি, তাঁর কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রহ্মচর্য, সন্ন্যাসদীক্ষা এবং সন্ন্যাস-নামও পেয়েছি।

মনঃসমীক্ষকদের (Psycho-analysts) কথা বাদ দিয়ে যদিও একথা বলা যায় যে, অধিকাংশ স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই, তথাপি কতকগুলি স্বপ্ন কারও জীবনে ও অদৃষ্টে ভাবী উন্নতির সূচনা ব্যক্ত করে। এ দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে মহাপুরুষজী—যাঁর সন্ন্যাস নাম 'শিবানন্দ' শুধু একটি নামের চেয়ে অধিক অর্থযুক্ত, যাঁর মধ্যে তাঁর গুরুভ্রাতৃগণ শিবের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের সাক্ষাৎ প্রকাশ দেখেছিলেন—আমার অন্তর্জীবনে অনুপ্রবিষ্ট হন, তাঁকে চর্মচক্ষে দর্শন করার পূর্বেই।

মধ্য-কেরল প্রদেশে নদীতীরস্থ আমার জন্মস্থান ত্রিচুর গ্রামের উঁচু পাহাড়ের উপর অবস্থিত মনোরম গুহামন্দিরে শিবের পূজায় আমি অনুরাগী ছিলাম ছেলেবেলা থেকেই। ৯।১০ বছর বয়সে আমি একটি স্পষ্ট স্বপ্ন দেখি ঃ আমার অনুভব হলো—আমি যেন সংসার-কোলাহলের বাইরে আকাশ-মার্গে বাহিত হয়ে পবিত্রতা ও শান্তির আবহাওয়ায় পরিপূর্ণ একটি বৃহৎ প্রকোষ্ঠে যোগাসনে উপবিষ্ট এক বর্ষীয়ান ঋষির সান্নিধ্যে উপনীত হয়েছি। দর্শনমাত্রই আমার হৃদয় স্বতই ঋষিকে 'শিব' বলে চিনতে পারল। তাঁর বামপার্শ্বে আসন গ্রহণ করবার জন্য ঋষি আমাকে প্রেমভরে ইঙ্গিত

---

* মূল ইংরেজি থেকে অনূদিত।

করলেন। ঋষির ইঙ্গিত শিরোধার্য করলাম। তারপর ঋষি আমাকে কিছু ধর্মোপদেশ দেন। আমি আনন্দে আত্মহারা হলাম। সেই পরমানন্দের ভাবেই স্বপ্ন থেকে জাগ্রত হই।...

চার-পাঁচ বছর পরে, আমার যখন বয়স হলো সাড়ে চৌদ্দ বছর, তখন আমি প্রথমে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' (Gospel of Sri Ramakrishna) নামক বিখ্যাত গ্রন্থখানা এবং পরে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদাদেবীর জীবনী এবং স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী পাঠ করি। এ কখানা গ্রন্থ আমার তরুণ মনে অবর্ণনীয় রেখাপাত করেছিল। ফলে এমন এক আধ্যাত্মিক প্রবাহের সৃষ্টি হলো, যাতে করে আমার বাল্যকালীন মন ও চিন্তায় যে সকল ধর্মীয় ভাব ও আকাঙ্ক্ষা সুপ্ত অবস্থায় থেকে আত্মপ্রকাশ করবার জন্য সচেষ্ট ছিল, সেগুলি রূপায়িত ও বিকশিত হবার একটা সুযোগ পেল। পরবর্তী তিন বছর এ প্রবাহ প্রেম ও আত্মোৎসর্গের বন্যায় পরিণত হয়ে আমাকে এক মহান ব্রতে নিয়োজিত করল, যে পবিত্র ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য পুণ্যশ্লোক ত্রয়ী—রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দ পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন, রামকৃষ্ণ সন্ন্যাসিসঙ্ঘ স্থাপন করেছেন এবং ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত যুবকবৃন্দকে তাতে যোগদান করবার জন্য আকর্ষণ করেছেন। সাড়ে-সতেরো বছর বয়সে আমি গৃহ ও পিতামাতার আশ্রয় ত্যাগ করে ১৯২৬ সনের ২৫ জুন, রামকৃষ্ণ মিশনের মহীশূরস্থ আশ্রমে যোগদান করি। তখন মহীশূর আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ। আমার গ্রাম থেকে ছয় মাইল দূরবর্তী ত্রিচুর শহর হতে রাত্রের ট্রেনে আমি সিদ্ধেশ্বরানন্দজীর সঙ্গে রওনা হয়ে পরদিন প্রাতে প্রায় সাত হাজার ফুট উঁচু উটি (উতকামণ্ড) শহরে পৌঁছই। এখানে স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎ-শিষ্য এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ মহাপুরুষ মহারাজ অর্থাৎ স্বামী শিবানন্দজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছা করেন। স্বামী শিবানন্দজী তখন সেই মনোরম পার্বত্য-নিবাস উটিতে কয়েকমাস অবস্থান করছিলেন। স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ আমাকে মহাপুরুষজীর নিকট নিয়ে গেলেন। আমি মহাপুরুষজীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলাম এবং শ্রীরামকৃষ্ণের একজন পার্ষদের পূত সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য লাভ করে নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ বোধ করলাম। উটিতে আমরা এক সপ্তাহ ছিলাম।

উটিতে থাকাকালে পঞ্চম-দিবসে মহাপুরুষজীর কাছ থেকে আমার মন্ত্রদীক্ষা-গ্রহণের সব বন্দোবস্ত করলেন স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ। মহাপুরুষজী একটি বড় প্রকোষ্ঠে একখানা কার্পেটে উপবিষ্ট ছিলেন। আমি সেখানে প্রবেশ করে মহাপুরুষজীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলাম। তিনি তাঁর বামপার্শ্বে একখানা আসনে বসতে আমাকে ইঙ্গিত করেন। আসনে বসে মহাপুরুষজীর নিকট আধ্যাত্মিক উপদেশ গ্রহণ করার

সময় আমার বাল্যকালীন একটি স্মৃতি অতি আশ্চর্যরূপে হুবহু মনে জাগল। আমি দেখলাম, আমার সেই বাল্যকালের স্বপ্নটি বাস্তব জগতে পুনরভিনীত হচ্ছে—আমি একটা পাহাড়ে উঠছি, সেখানে এক সৌম্যমূর্তি বর্ষীয়ান পুরুষের বেশধারী শিবের সান্নিধ্যে উপনীত হয়ে তাঁর বামপার্শে উপবেশন করেছি। এসব দেখে আমার হৃদয় পরমানন্দে ভরপুর হলো। মন্ত্রদীক্ষার পর মহাপুরুষজী আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "গুরুদক্ষিণা দেবার কিছু এনেছ?" আমি বললাম, "না, মহারাজ।" তখন তিনি আমার হাতে ২।৩টি আম দিলেন এবং বললেন, "দক্ষিণাস্বরূপ আমগুলি আমাকে দাও।" আমি তাই করলাম। দীক্ষার পর সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।...

স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ সকলের নিকট 'গোপাল' নামে পরিচিত ছিলেন এবং মহাপুরুষজী তাঁকে খুবই ভালবাসতেন। মহীশূরে রওনা হওয়ার প্রাক্কালে সিদ্ধেশ্বরানন্দ ও আমি মহাপুরুষজীর নিকট বিদায় ও আশীর্বাদ নিতে গেলাম। মহাপুরুষজী এ বলে আমাকে আশীর্বাদ করেন ঃ "গোপালকে সেবা কর।" পরবর্তী বার বছর—মিশনের মহীশূর কেন্দ্রে নয় বছর, বাঙ্গালোর কেন্দ্রে তিন বছর সিদ্ধেশ্বরানন্দজীকে ব্যক্তিগতভাবে ও আশ্রমের নেতৃরূপে সেবা করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এ সময়ের প্রথম সাত বছরের মধ্যে মহাপুরুষজীর নিকট আমার ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস-দীক্ষা হয়। ব্রহ্মচর্য হয় ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে মে মাসে ভগবান বুদ্ধের জন্মদিনে এবং সন্ন্যাস ১৯৩৩ খ্রিঃ জানুয়ারি মাসে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি-দিবসে। ব্রহ্মচর্য-দীক্ষার সময় মহাপুরুষজী স্বয়ং সর্বক্ষণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন—তখনকার দিনে পুরানো ঠাকুরঘরের পেছনের ঘরে তা অনুষ্ঠিত হতো। সৌম্য সহাস্যবদন মহাপুরুষজীর সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে ব্রহ্মচর্যানুষ্ঠানের আধ্যাত্মিক পরিবেশ সহস্রগুণ বর্ধিত হয়। শ্রীগুরু আমাকে যথারীতি 'যতিচৈতন্য'—এ নতুন নাম দেন। আমার সন্ন্যাসের সময় মহাপুরুষজী বার্ধক্যের জন্য সশরীরে হোমানুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি, কিন্তু বিরজাহোমাদির পর আমি এবং আরও অন্যান্য আটজন ব্রহ্মচারী গুরুদেবের ঘরে গিয়ে তাঁর কাছ থেকে সন্ন্যাসব্রত, আশীর্বাদ, গৈরিক ও নাম গ্রহণ করেছি।

আমার ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাসের সময় প্রতিবারই তিনমাসের অধিক কাল মহাপুরুষজীর উচ্চ আঁধ্যাত্মিক সান্নিধ্যে থাকবার এবং তাঁর সামান্য কিছু সেবা করবার সুযোগ হয়েছিল। দৈনিক তাঁর জন্য নিকটবর্তী লিলুয়া অঞ্চল থেকে টিউব-ওয়েলের জল এবং তাঁর প্রিয় বিশ্বস্ত কুকুরদের খাওয়ার জন্য এক খোরা দই আমাকে আনতে হতো।

এ সময়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয় অভিজ্ঞতা ছিল—প্রতিদিন প্রাতরাশের পর মহাপুরুষজীর ঘরে ঘণ্টা খানেকেরও অধিককাল ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে যোগদান। সন্ন্যাসিগণ এক এক দলে এসে মহাপুরুষজীকে ভক্তিবিনম্র প্রণাম করে একপাশে দাঁড়াতেন। তিনি অন্তর্মুখী অবস্থায় বিছানায় অথবা চেয়ারে উপবিষ্ট থাকতেন—কখনো সামনের হুঁকো থেকে মাঝে মাঝে নল দিয়ে একটান দিতেন, সর্বৈব উন্মনা হয়ে আবার কখনো উপস্থিত সাধু-ব্রহ্মচারীদের কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞেস করতেন। অন্তর্মুখী অবস্থা থেকে ব্যুত্থিত হয়ে তিনি উপস্থিত সকলের সঙ্গে নানা প্রসঙ্গ করতেন—প্রসঙ্গগুলি হাস্য কৌতুকে সরস হয়ে উঠত। শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর পার্ষদদের ঐটিই ছিল একটি বিশেষ চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। কখনো কথাবার্তা হতো গভীর আধ্যাত্মিক বিষয়ে। যাঁরা উপস্থিত থাকতেন, তাঁরা উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনতেন তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত বাণীগুলি। ধর্মপ্রসঙ্গগুলির ফাঁকে ফাঁকে শোনা যেত গভীরভক্তি-প্রেমাপ্লুত কণ্ঠে উচ্চারিত 'সচ্চিদানন্দ শিব', 'জয় জয় গুরুমহারাজ', 'জয় মা' প্রভৃতি।...

দূরবর্তী মহীশূর ও বাঙ্গালোরে থেকেও আমার সৌভাগ্য হতো মহাপুরুষজীর লিখিত চিঠিগুলির মাধ্যমে অতীব মূল্যবান ও উপাদেয় ধর্মোপদেশ লাভ করবার। বেশি সময় মহাপুরুষজীর সান্নিধ্যে থেকে তাঁর সেবা করবার অনুমতি প্রার্থনা করে চিঠি লিখলে তিনি নির্দেশ দিতেন ঃ গুরুর কাছে থেকে তাঁর সেবা করা সব সময় সম্ভব ও কার্যকর হয় না। সঙ্ঘের বহুমুখী সেবাকার্যে একনিষ্ঠভাবে আত্মোৎসর্গ কর, তা হলেই গুরুর সেবা হবে। মহাপুরুষজী সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদিগকে চরিত্রের বহুমুখী উৎকর্ষের দিকে মন দিতে উৎসাহিত করতেন এবং লৌকিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং কর্মদক্ষতা অর্জন করতে উপদেশ দিতেন। তিনি সর্বদাই ধ্যান-কর্ম-সমুচ্চয়ের প্রয়োজনীয়তার উপর খুব জোর দিতেন এবং সকল সন্ন্যাসীর পক্ষেই, বিশেষত আমার পক্ষে আধ্যাত্মিক শক্তি লাভের জন্য সাধুসঙ্গের উপযোগিতা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করতেন। ধর্মভাবের উচ্ছ্বাস নিষ্ক্রিয়তা এনে দেয়—এ বিষয়ে তিনি আমাকে খুব সাবধান করে দিতেন এবং বলতেন, ভাবোচ্ছ্বাসের দ্বারা যথার্থ ঈশ্বরানুরাগের পরিমাপ হয় না; চরিত্রের পবিত্রতা, আত্মোৎসর্গ ও সেবাভাবের দ্বারাই এর পরিমাপ হয়। আধ্যাত্মিকতা অর্জন করার জন্যই মহাপুরুষজী সাধু ও গৃহী ভক্তদের সর্বদা উপদেশ দিতেন এবং সব রকম লোকদেখানো ধার্মিকতা ও সস্তা ধর্মনিষ্ঠার বিরুদ্ধে সাবধান বাণী উচ্চারণ করতেন।

প্রত্যেক সন্ন্যাসী ও ভক্তের নিকট মহাপুরুষজী প্রেম ও আশীর্বাদের ঘনীভূত বিগ্রহ বলে প্রতিভাত হতেন। শত শত সাধু ও হাজার হাজার ভক্ত তাঁর ভালবাসা

ও আশীর্বাদ পেয়ে ধন্য হয়েছেন। আমাকে তিনি বুঝিয়েছেন যে, আমাকে অথবা অন্য কোন ধর্মার্থীকে দীক্ষা দিয়ে তিনি আমাদের প্রভুর শ্রীচরণেই সমর্পণ করেছেন। যে কেউ তাঁর আশীর্বাদপ্রার্থী হয়েছেন, তিনি তাঁকেই দিতেন এ স্বভাবসুলভ উত্তর ঃ "আশীর্বাদ ছাড়া আর আমাদের দেবার কি আছে, বাবা?" অতিশয় যুক্তিপরায়ণ মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি, অদ্ভুত লৌকিকতা, গভীর হৃদয়বত্তা, ঋষিত্ব ও পবিত্রতার উচ্চ অধিকারী মহাপুরুষজী এক আন্তর্জাতিক আধ্যাত্মিক ও লোকহিতকর আন্দোলনের অধিনায়করূপে সদা বিরাজমান ছিলেন।

আমার সন্ন্যাসের কয়েক সপ্তাহ পরে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্ষদ স্বামী অখণ্ডানন্দকে দর্শন ও তাঁর আশীর্বাদগ্রহণের বহুদিন-প্রতীক্ষিত আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবার জন্য মুর্শিদাবাদ জেলার সারগাছি আশ্রমে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করলাম শ্রীমহাপুরুষজীর কাছে। অখণ্ডানন্দজী মহারাজ ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তদানীন্তন সহাধ্যক্ষ। সারগাছি আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধানরূপে অখণ্ডানন্দজীই গুরুভ্রাতাদের মধ্যে সর্বপ্রথম বিবেকানন্দ-প্রচারিত শিবজ্ঞানে দরিদ্র-দুঃখীদের সেবার বাণী কার্যে রূপায়িত করার ব্রতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। মহাপুরুষজী জেনে সুখী হলেন যে, আমি অখণ্ডানন্দ মহারাজের আশীর্বাদলাভের জন্য সারগাছি যাচ্ছি। সারগাছিতে অখণ্ডানন্দজীর পূত সঙ্গে তিনদিন ছিলাম এবং তাঁর প্রচুর ভালবাসা ও আশীর্বাদ লাভ করি। কিন্তু কলকাতা ফিরেই এক দুঃখজনক সংবাদ পাই, কারণ মহাপুরুষজী সেদিনই (১৯৩৩ খ্রিঃ ২৫ এপ্রিল) পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে বেলুড় মঠে শয্যাশায়ী হন—তাঁর শরীরের ডানদিক অচল হয়ে যায়। কয়েক সপ্তাহের সযত্ন চিকিৎসা ও সেবায় সঙ্কট কেটে গেল বটে, কিন্তু শরীরের ডান দিক অচল হয়ে রইল এবং বাক্‌শক্তিহীনতা চলতে লাগল। অবশেষে দশ মাস পরে মহাপুরুষজী দেহরক্ষা করেন।

রোগাক্রমণের পর সঙ্কটাবস্থা কিছুটা কেটে গেলে আমি মহীশূর আশ্রমে ফিরে যাবার প্রাক্কালে মহাপুরুষজীকে শেষবার দর্শন করি। তিনি কয়েকটি উঁচু বালিশের উপর মাথা রেখে পৃষ্ঠে ভর করে শয্যায় শায়িত ছিলেন—তাঁর মুখমণ্ডল সৌম্য, প্রশান্ত ও নির্বিকার। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতেই সেবক স্বামী অপূর্বানন্দ মহাপুরুষজীকে জানান যে, আমি আশ্রমের কাজে মহীশূরে ফিরে যাচ্ছি। বাক্‌রোধ সত্ত্বেও তাঁর চোখ দুটি যেন কথা বলছিল এবং অন্তরের ভাব বহন করে আনছিল। মহাপুরুষজীর মুখখানি আশীর্বাদের হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আমার প্রতি তাঁর আশীর্বাদ আত্মপ্রকাশ করছিল তাঁর বামহস্তোত্তোলনে। তিনি অপূর্বানন্দজীকে ইঙ্গিতে জানালেন মহীশূরস্থ চামুণ্ডী পাহাড়ের মন্দিরে দেবী চামুণ্ডার এবং মহীশূর আশ্রমে

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজার জন্য আমার হাতে কিছু টাকা দিতে। আমি সে অর্থ পবিত্র ন্যাস হিসাবে গ্রহণ করলাম এবং মহীশূরে পৌঁছে মহাপুরুষজীর ইচ্ছানুযায়ী পূজার বন্দোবস্ত করলাম। মহাপুরুষজীর বিশেষ আরাধ্যা দেবী চামুণ্ডা এবং ইষ্টদেব শ্রীরামকৃষ্ণের পূজার প্রসাদ তাঁকে যথাসময়ে পাঠিয়ে দিলাম।

শ্রীমহাপুরুষজীর মতো একজন উচ্চ-আধ্যাত্মিকশক্তিসম্পন্ন আচার্যের আশ্রয় লাভ করে, তৎকর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণচরণে সমর্পিত হয়ে এবং আমার সামর্থ্যানুসারে তাঁর অফুরন্ত আশীর্বাদ গ্রহণ করার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ বোধ করছি।

শুভম্

মহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতিকথা

স্বামী সত্যাত্মানন্দ

১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষভাগে পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ দেহত্যাগ করেছিলেন। আর আজ ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ অতিক্রান্ত হতে চলেছে। আমার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধাঞ্জলি স্মৃতিকথার মাধ্যমে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে নিবেদন করছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর তিরোধানের পর তাঁদের ভাবধারা প্রবল বেগে প্রবাহিত হওয়ায় এবং আধ্যাত্মিক প্রভাব বিশেষভাবে সক্রিয় থাকায় বঙ্গদেশের ছাত্রদের মধ্যে প্রথমত দেশাত্মবোধ জাগ্রত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত জগন্মাতা শ্রীশ্রীসারদাদেবী এবং ঠাকুরের সন্ন্যাসি-সন্তানগণের সাহচর্য-লাভের আকাঙ্ক্ষাও অনেকের মনে জাগ্রত হয়েছিল। উচ্চ আধ্যাত্মিক উপলব্ধিরূপ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত উপরি-উক্ত মহাপুরুষগণের আকর্ষণে আমিও ১৯১০।১১ খ্রিস্টাব্দ থেকে দক্ষিণেশ্বর, উদ্বোধন কার্যালয়, শ্রীশ্রীমা'র বাড়ি ও বেলুড় মঠ—এই আধ্যাত্মিক তপোবনগুলিতে যাতায়াত করবার প্রেরণা পেয়েছিলাম। কয়েক বৎসর ধরে আমি কলকাতা আহিরীটোলা ঘাটে নৌকায় করে শালকিয়া বাঁধাঘাটে নেমে পদব্রজে বেলুড় মঠে যাতায়াত করতাম।

আজও বেশ মনে আছে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে বেলুড় মঠে গিয়ে আমি

প্রথমে মঠ-বাড়ির গঙ্গার ধারের নিচের তলায় বারান্দায় উপবিষ্ট পূজ্যপাদ স্বামী প্রেমানন্দকে প্রণাম করেছিলাম, পরে ঠাকুরের মন্দিরে ও স্বামীজীর ঘরে প্রণামাদি সেরে জ্ঞান মহারাজের ঘরের বারান্দায় বসে আছি, এমন সময় সৌম্যমূর্তি অন্তর্যামী পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ স্বামীজীর সমাধি-মন্দিরের দিক থেকে মঠ-বাড়ির প্রাঙ্গণে আসতেই আমি তাঁকে প্রণাম করলাম। তিনি আমার দিকে সস্নেহে তাকিয়ে বললেন—"হয়েছে, হয়েছে। মাঝে মাঝে এখানে আসবে।" এর কিছুদিন পূর্বে আমি উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমা-র বাড়িতে পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দকে দর্শন করতে গিয়ে জেনেছিলাম যে, পূজ্যপাদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও সিস্টার নিবেদিতার দেহত্যাগে মহাপুরুষ মহারাজের মন খুবই শোকাচ্ছন্ন, তা সত্ত্বেও তিনি আমার প্রতি সস্নেহ ব্যবহার করেছিলেন। অন্তর্যামী ও আশ্রিতবৎসল মহাপুরুষ মহারাজ সেদিন থেকেই যে আমাকে তাঁর শ্রীচরণে স্থান দিয়ে আপনার করে নিলেন, তা আমি প্রাণে প্রাণে বেশ বুঝতে পারলাম। অতঃপর তিনি বেলুড় মঠে এলেই আমি খবর নিয়ে তাঁর শ্রীচরণ দর্শন করে আসতাম। কলকাতায় থাকতে আমি ছাত্রজীবনে এভাবে তাঁর অশেষ স্নেহের পাত্র হয়ে নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করেছি।

১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের প্রথম ভাগে একদিন বেলুড় মঠে গিয়ে মহাপুরুষজীর দর্শনলাভ করে নিজ প্রাণের জ্বালা শান্ত করবার আশায় কেঁদে তাঁকে বললাম, "প্রাণের ইচ্ছা আমি শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করি, মহারাজ। আমার দাদা এলাহাবাদে থাকেন, মা হাঁপানি রোগী—দেশে থাকেন; দাদা খরচপত্র পাঠান বটে, কিন্তু মা-র সেবা শুশ্রূষাদি আমিই কোনরকমে চালিয়ে যাচ্ছি। অথচ প্রাণের ঐকান্তিক ইচ্ছা শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে আত্মনিবেদন করে আপনাদের কাছে থাকি।" মহাপুরুষ মহারাজ উত্তরে বললেন, "মার সেবা ঠিকমত করে যাও; তোমার সব হয়ে যাবে। শ্রীশ্রীঠাকুর তোমার মঙ্গলই করবেন।"

এর এক বৎসরের মধ্যে দৈব-প্রেরণায় তীর্থরাজ ৺প্রয়াগধামে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমের কাছে দাদার বাসায় অল্প দিনের মধ্যে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়ে গেল।

১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের প্রথম ভাগে বেলুড় মঠে গিয়ে মহাপুরুষ মহারাজের দর্শনলাভ করে বললাম, "মহারাজ, মাকে নিয়ে আমি শীঘ্রই এলাহাবাদ যাচ্ছি, মার দেখাশুনা এখন থেকে দাদাই করবেন জানিয়েছেন, আমাকেও কিন্তু এলাহাবাদে থাকতে হবে।" মহাপুরুষ মহারাজ প্রসন্ন হয়ে বললেন, "ভালই হয়েছে, প্রয়াগধামে মুঠিগঞ্জে আমাদের মঠ আছে, সেখানে হরিপ্রসন্ন মহারাজ থাকেন, মধ্যে মধ্যে তাঁর কাছে যাবে, তাহলে তোমার সব দিকেই ভাল হবে।"

এরপর ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে আলমোড়া থেকে আগত স্বামী তুরীয়ানন্দজীর দর্শনার্থে ৺কাশীধামে এসে শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের দর্শনলাভও করেছিলাম।

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি মাসের শেষভাগে যখন বেলুড় মঠ হতে মহাপুরুষ মহারাজ ৺প্রয়াগধামে আসেন তখন আমি কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন সেবাশ্রমের কর্মী। সেবাশ্রমের কর্তৃপক্ষের কাছে দুই দিনের ছুটি নিয়ে আমি ঐ সময় মহাপুরুষজীর ৺কাশীধামে আসবার ঠিক আগের দিন বৈকালে ৺প্রয়াগধামে পৌঁছে পুনরায় তাঁর দর্শনলাভ করি। অতঃপর ৺কাশীধামে এসে মহাপুরুষজী মহাবীরের প্রস্তরমূর্তি স্থাপন ও স্বামী অদ্ভুতানন্দের স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ দিন কেউ কেউ তাঁর কাছে থেকে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। কাশীতে অবস্থানকালে তাঁর দর্শন ও সঙ্গলাভ করে আশ্রমের সাধু-ব্রহ্মচারিগণ ও ভক্তমণ্ডলী বিশেষ উপকৃত হন। তিনি সকলেরই মন-প্রাণ দিব্যানন্দে ভরে দিতেন এবং উচ্চস্তরে তুলে নিতেন।

১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে ২৮ জানুয়ারি বেলুড় মঠে মহাপুরুষজী স্বামীজীর ওঁকারমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং আমাদের বারোজন প্রার্থীকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করেন। পরবর্তী ৭ ফেব্রুয়ারি ব্রহ্মানন্দ-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর থেকে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চ পর্যন্ত বেলুড় মঠে বাসকালে তিন-চার মাস আমি মহাপুরুষ মহারাজের পূত-সঙ্গ লাভ করেছিলাম। আমি তাঁর কোনরূপ সেবা করবার সুযোগ পাইনি, তবু তাঁর অহৈতুকী করুণার আকর্ষণ কাছে গেলেই বেশ বুঝতে পারতাম। আমাকে দেখলেই তিনি সস্নেহে কৌতুক করে বলতেন, "Sailen the tall man (লম্বা শৈলেন)।" এই দুটি কথার মাধ্যমেই তিনি যেন আমাকে আপনার করে নিয়েছিলেন।

১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে মার্চ মাসের মাঝামাঝি শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি দিবসে বেলুড় মঠে মহাপুরুষজীর কাছে আমাদের ৭ জন ব্রহ্মচারীর সন্ন্যাস হয়। জন্মোৎসব উপলক্ষে ভক্তের সমাগম তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে কথঞ্চিৎ হানিকর হলেও তাঁর শরীরের দ্বারা যে লোকের কল্যাণ হচ্ছে—এই ভাবই মহাপুরুষজীর মনকে আনন্দে ভরপুর করে রাখত। একথা তিনি নিজেই কতবার বলেছেন। ঐবারে কয়েকদিন মাত্র তাঁর সঙ্গলাভের সুযোগ আমার হয়েছিল। কেননা উৎসবের পরই আমাকে তাড়াতাড়ি কাশী সেবাশ্রমে ফিরে আসতে হয়।

২২ নভেম্বর, ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ কাশীধামে প্রায় তিনমাস ছিলেন। পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ কাশী অদ্বৈতাশ্রমে এসে দোতলার যে ঘরে থাকতেন, মহাপুরুষ মহারাজ সেই ঘরেই ছিলেন। সময় পেলেই

আমি তাঁকে দর্শন করতে যেতাম। সাধু ভক্ত যখন কম থাকত তখন তিনি সস্নেহে সেবাশ্রম সম্বন্ধে আমার সঙ্গে নানা কথা বলতেন এবং অনেক উপদেশও দিতেন—যা আমার জীবন গড়ে তোলবার পক্ষে খুবই সাহায্য করত। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি তিনি পাটনা হয়ে বেলুড় মঠে ফিরে যান। বেনারস স্টেশনে গাড়িতে উঠে মহাপুরুষজীকে প্রণাম করছি (প্রাণের ইচ্ছা তাঁর সঙ্গে পাটনা যাই, কিন্তু তা প্রকাশ করতে সাহস হয়নি)—এমন সময় তিনি বললেন, "তুমিও যাচ্ছ নাকি?" আমি উত্তরে বললাম, "আপনি আদেশ করেন তো যাই।" স্বামী বিশ্বানন্দ ও স্বামী ধ্যানেশানন্দ (সনৎ মহারাজ) তাঁর সঙ্গে পাটনা যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁদের বললেন, "শৈলেনের জন্য টিকিট কিনে নাও।" আমি সানন্দে পাটনা গেলাম। তাঁর কাছে যতক্ষণ থাকা যেত সেইটাই জীবনের একটা অক্ষয় সম্পদ।...

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে সেবাশ্রমের কোন কাজে কলকাতায় গিয়ে বেলুড় মঠে গেছি। সেবারে একদিন মহাপুরুষজী আমার বংশ-পরিচয় জিজ্ঞেস করেছিলেন। পরে জানতে পারলাম আমার পূর্বাশ্রমের আত্মীয়দের মধ্যে কেউ কেউ মহাপুরুষজীর কৃপা লাভ করে ধন্য হয়েছে।

কৈলাস মানস সরোবরাদি দুর্গমতীর্থ ভ্রমণের আগে এবং সেবাশ্রমের জন্য চাঁদা আদায় করার কাজে অপরিচিত সারা উত্তর-বিহার ও নেপাল যাবার পূর্বে যখনই আমি মহাপুরুষজীর আশীর্বাদ-প্রার্থী হয়ে পত্র লিখতাম, তখনই তিনি আশীর্বাদ ও অভয় দিয়ে লিখতেন, "তোমার কোন ভয় নাই ইত্যাদি।" তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে যে-যে কাজে গিয়েছি সবই নির্বিঘ্নে সম্পন্ন এবং অভাবনীয়রূপে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। টাকা কড়িও প্রচুর সংগ্রহ করতে পেরেছি।

১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের প্রথম ভাগে এলাহাবাদ আশ্রমের কাজে কলকাতায় গিয়ে বেলুড় মঠে গিয়েছি, মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে বিশেষভাবে বললেন, "হরিপ্রসন্ন মহারাজ (স্বামী বিজ্ঞানানন্দ) তোমাকে স্নেহ করেন, তুমি তাঁর কাছে থাকবে।" এলাহাবাদ আশ্রমে তাঁর কাছে কোনও সাধু থাকত না, তাতে তাঁর কষ্ট হতো।

১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে বিজ্ঞান মহারাজ বেলুড় মঠ হয়ে যখন সিংহল যাচ্ছিলেন, সে সময় মহাপুরুষ মহারাজের শরীর অসুস্থ, কথা কইতে পারেন না। আমি তাঁর খাটের কাছে দর্শনার্থে গিয়েছি, তিনি ইঙ্গিতে আমাকে বিজ্ঞান মহারাজের সঙ্গে যাবার নির্দেশ দিলেন। তাই আমি স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর সঙ্গে সিংহল-সফরে গিয়েছিলাম।

এই ভাবে আমার সাধুজীবনের প্রতি সমস্যার সমাধান শ্রীশ্রীমহাপুরুষজী করে

দিতেন এবং অকৃত্রিম করুণাধারা-সিঞ্চনে আমাকে সতত শুভ পথে চালিত করে আমার জীবন ধন্য করেছেন। তিনি ছিলেন আমার ধর্মজীবনের পথপ্রদর্শক এবং আধ্যাত্মিক জীবনের আনন্দ-উৎস-স্বরূপ। এখনো তাঁর চিন্তামাত্র মন এক অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে যায়।

শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের অনুধ্যানে

স্বামী হিতানন্দ

পরম পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের পূতসঙ্গ লাভ ও সামান্য সেবা করার সুযোগ আমার খুব অল্পদিনের জন্যই হয়েছিল। সেই সময় তাঁর শরীর খুবই অসুস্থ। বার্ধক্যজনিত নানাবিধ অসুখের জন্য তাঁর গতিবিধি গৃহেই সীমাবদ্ধ। আবার মধ্যে মধ্যে আনুষঙ্গিক অন্যান্য অসুখও হয়—যেমন, একবার খুব জোর রক্তামাশয় হলো, blood pressure (রক্তের চাপ)ও খুব বেড়ে গেল। অনেক বিচক্ষণ চিকিৎসকের সুচিকিৎসায় এবং সুপরিচর্যায় তিনি কিছু সুস্থ হলে ডাক্তাররা তাঁকে বায়ু-পরিবর্তনের উপদেশ দেন। প্রথমে বম্বে যাওয়ার কথা হয়, কিন্তু এতদূরের train journey (ট্রেনে যাতায়াত) হয়তো সহ্য হবে না বলে কাছাকাছি কোথাও স্টিমারযোগে যাওয়ার কথা হয়। গঙ্গাবক্ষে স্টিমারযোগে নবদ্বীপ পর্যন্ত গেলে মন্দ হয় না—এই রকম কথাবার্তা চলছে, এই সময় মহাপুরুষ মহারাজের প্রথম পরিব্রাজক জীবনের একটি ঘটনা মনে পড়াতে তাঁর যাওয়ার উৎসাহ খুবই বেড়ে যায়। ঘটনাটি হচ্ছে—পরিব্রাজক জীবনের প্রথম দিকে একবার মহাপুরুষজী ও হরি মহারাজ গঙ্গার ধার দিয়ে যেতে যেতে বাঁশবেড়ে নামক গ্রামে প্রসিদ্ধ হংসেশ্বরীর মন্দির দর্শন করেন। এই ত্রয়োদশচূড়াবিশিষ্ট বেশ প্রশস্ত মন্দিরে মূল বিগ্রহ দেবীমূর্তি কালী। কিন্তু বিশেষত্ব হচ্ছে—এই কালীমূর্তি দিগ্‌বসনা নন এবং শিবের বুকের উপর দণ্ডায়মানাও নন। এখানে দেবী শিবের নাভিকমলের উপর অধিষ্ঠিতা, আঁচলটি কোমরে জড়ানো—কর্মব্যাপৃতা মায়েদের যেমন থাকে। চার হাতে বর, অভয়, খড়্গ এবং নৃমুণ্ড। মুখখানি প্রশান্ত; করালবদনা বা ভয়ঙ্করাননা নন। মায়ের মূর্তিতে মাতৃভাব এমন সুপরিস্ফুট যে, দেখলে চোখ ফেরানো যায় না। এই দেবীমূর্তির কথা মনে পড়াতে এই শ্রীবিগ্রহ-দর্শনের ইচ্ছা মহাপুরুষজীর খুবই বলবতী হয়।

কিন্তু তাঁর পক্ষে কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়—দাঁড়ালে পা টলে, হাঁটতে গেলে মাথা ঘোরে। কিন্তু এই দেবীমূর্তির কথা তিনি কিছুতেই ভুলতে পারছেন না, তখন ঠিক হলো দেবীর ফটো তুলে আনা হবে এবং তদনুসারে চন্দননগরের জনৈক বিশিষ্ট ভক্তকে লেখা হলো শ্রীশ্রীহংসেশ্বরীদেবীর দু-খানা ফটো তুলে আনার জন্য। তিনিও আদেশমত দু-খানা ফটো তুলে নিয়ে এলেন। ঐ ফটো দেখে মহাপুরুষ মহারাজ খুবই খুশি। একখানা দীর্ঘাবয়ব রঙিন ফটো তৈরি করে দিতে বললেন। সেখানা তৈরি হয়ে এলে মহাপুরুষজীর ঘরে দেয়ালে টাঙানো হলো যাতে তিনি খাটে বসে সব সময় মাকে দেখতে পান, কিন্তু রাত্রিবেলা তো দেয়ালের ফটো ভাল দেখা যাবে না, সেজন্য একখানা ছোট ফটো বালিশের নিচে রাখতে বললেন। রাত্রিবেলা অনেকবার করে পার্শ্ববর্তী সেবকদের এই ছবিখানা তাঁকে দেখাতে হতো। তাঁর ঘুম রাত্রে বা দিনে খুবই কম ছিল। অনেকবার করে উঠতেন এবং যখনই উঠতেন তখনই মা হংসেশ্বরীকে একবার দেখা চাই। সে যে কী আগ্রহ, কী ব্যাকুলতা—অতি অবিশ্বাসীর মনও এতে বিচলিত না হয়ে যায় না! মাকে শুধু ছবিতে দেখেই তিনি নিশ্চিন্ত হননি। মা হংসেশ্বরীর মন্দিরে প্রায় প্রত্যেক অমাবস্যায় পূজা পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। মঠ থেকে ২।৩ জন সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারী ষোড়শোপচার-পূজার সমস্ত দ্রব্যসম্ভার বহন করে বেলুড় স্টেশনে গিয়ে গাড়ি ধরে বেলা ১০টা/১১টায় মন্দিরে পৌঁছে পূজার সমস্ত আয়োজন করে নিজেরাই দেবীর পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, ভোগ, আরতি ইত্যাদি সম্পন্ন করে প্রায়ই ৫টা/৫½টায় প্রসাদ ধারণ করে সন্ধ্যাবেলার গাড়িতে মঠে ফিরে আসতেন ৯টা/৯½টায়। এদিকে মহাপুরুষ মহারাজ পূজা পাঠিয়ে দিয়েই যে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতেন তা নয়; যে মুহূর্ত থেকে সাধু-ব্রহ্মচারীরা পূজার দ্রব্যসম্ভার নিয়ে মঠ থেকে রওনা হতেন, সেই মুহূর্ত থেকে আরম্ভ করে তাঁদের ফিরে না আসা পর্যন্ত সারাদিন ধরে কেবল হংসেশ্বরী মায়ের কথাই তিনি আলোচনা করতেন। পার্শ্ববর্তী সেবককে আগে থেকেই সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করে রাখতে হতো, কারণ কয়েক মিনিট পরে পরেই তিনি জানতে চাইতেন যারা পূজা নিয়ে গিয়েছে কতদূর গিয়েছে—এখন কোন্ স্টেশনে, এখন চন্দননগর পার হয়েছে কিনা, এতক্ষণে হয়তো মন্দিরে পৌঁছেছে, এখন হয়তো পূজায় বসেছে ইত্যাদি। তারপর রাত্রে ফিরে এলে তাদের কাছে সমস্ত সংবাদ শুনে, মায়ের প্রসাদ ধারণ করে নিশ্চিন্ত হতেন।

এই হংসেশ্বরীর পূজা ছাড়াও বিশেষ করে ঐ কালে সমস্ত পূজার্চনায় মহাপুরুষজীর আগ্রহ ও উৎসাহের অন্ত ছিল না। এই সময় একবার ঠিক হলো যে, মঠে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজায় কয়েক বছর থেকে ধার হচ্ছে, সুতরাং শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা বন্ধ করে দেয়া হোক। ঐ প্রস্তাব শুনেই তিনি বললেন—"মায়ের পূজা বন্ধ করা চলবে

না, টাকা যা লাগে আমি দেব।" এই সমস্ত বিশেষ বিশেষ পূজার দিনে তিনি আনন্দে বিভোর হয়ে থাকতেন। আনন্দময়ীর আবির্ভাব তিনি মনে প্রাণে অনুভব করতেন এবং অন্যকেও অনুপ্রাণিত করতেন।

এই সময়ে মহাপুরুষজী মঠে আর একটি বিষয় প্রবর্তন করেন—তা হচ্ছে শিবাবলি। তন্ত্রশাস্ত্রে এর বিধান পাওয়া যায়। দেবীপূজার রাত্রে দেবীর প্রীত্যর্থে এই বলি অর্থাৎ নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য গভীর রাত্রে শ্মশানে বা নির্জন প্রদেশে দিয়ে আসতে হয় এবং এই বলি যদি শিবারূপী দেবী এসে গ্রহণ করেন, তাহলে তা হয় সাধকের খুবই কল্যাণপ্রদ।

একদিন রাত তখন প্রায় ১২ টা। পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ সেবককে জিজ্ঞেস করলেন—"হ্যাঁ রে, বেলুড় বাজারে জিলিপি পাওয়া যায়?" সেবক বললেন—"দিনের বেলা তো দেখেছি। রাত্রিবেলা পাওয়া যাবে কিনা জানি না।" তিনি বললেন—"যেতে পারবি? দেখে আয় না, যদি পাওয়া যায় এক টাকার জিলিপি নিয়ে আসবি। একটা টাকা drawer (ড্রয়ার) থেকে নিয়ে যা।" সেই সময় আর একজন প্রবীণ সেবক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন—"ও গেলে তো আসতে অনেক দেরি হবে বরং আমি সাইকেল নিয়ে যাই, তাড়াতাড়ি চলে আসতে পারব।" তখন তিনি তাকেই টাকা দিয়ে পাঠালেন। তিনি বেলুড় বাজারে না পেয়ে বালিবাজারে গেলেন এবং সেখানেও না পেয়ে সালকিয়া বাজারে গেলেন এবং রাত প্রায় একটার সময় এক চাঙারি জিলিপি নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। মহাপুরুষ মহারাজ তখন এক সেবককে বললেন—"বেশ ভাল করে পরিষ্কার জায়গাতে গঙ্গাজল ছিটিয়ে রাখ, মায়ের ভোগে যাবে কিনা।" তারপর নিজেই বুঝিয়ে বললেন—"এই মা মন্দিরের মা নন, অরণ্যচারিণী শিবারূপী মায়ের ভোগ দিতে হবে। তুই দিয়ে আসতে পারবি? কোথায় দিবি বলত?" সেবকটি বললেন, "গঙ্গার ধারে শ্মশানের কাছে দিলে হয়।" তিনি তাই অনুমোদন করলেন এবং বললেন, "যখনই ডাক শুনবি তখনি দিয়ে আসবি।" তারপর থেকে এতটুকু শব্দ হলেই তিনি বলে উঠতেন—এই যে ডাক শোনা যাচ্ছে। এই রকম করে রাত ১টা / ১½টার সময় সত্যই ডাক শোনা গেল এবং সেবক সেই ভোগপাত্র হাতে করে অতি সন্তর্পণে গঙ্গার ধারে শ্মশানের কাছে রেখে এল এবং কিছুদূরে এসে অপেক্ষা করতে লাগল যদি শিবার দর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু কিছুই দৃষ্টিগোচর হলো না। তারপর ফিরে এসে মহাপুরুষ মহারাজকে বলল—"দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কিছুই দেখা গেল না।" তিনি বললেন, "ওঁরা ঠিক আসবেন এবং গ্রহণ করবেন।" তারপর থেকে কদিন জিলিপি ভোগই চলল। অতঃপর একদিন বললেন, "শিবাভোগে রোজ

জিলিপি দেওয়া হচ্ছে, সন্দেশ দিলে হয় না!" তার পরদিন থেকে সন্দেশ ভোগ আরম্ভ হলো। কিন্তু এতেও তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। তারপর একদিন বললেন—"শিবারা কি আর সন্দেশ জিলিপি পছন্দ করেন? ওঁদের আসল খাদ্য হচ্ছে মাংস। কাল থেকে মাংস এবং কয়েকখানা লুচি ভোগ দিতে হবে।" এবং তাই হলো। সেই শিবাভোগ তিনি যতদিন বেঁচেছিলেন নিত্য দেওয়া হয়েছে এবং এখনও শ্রীশ্রীকালীপূজা উপলক্ষে মঠে রাত্রে দেওয়া হয়।

তিনি যে কেবল বিধিবিহিত শিবাবলি দিয়েই নিশ্চিন্ত থাকতেন তা নয়, সমস্ত জীবের প্রতিই ছিল তাঁর অপার করুণা, কুকুরকে খাওয়ানোর জন্য পৃথক বিস্কুট এবং সন্দেশ আনিয়ে রাখতেন। মঠের গোশালার সংবাদ তিনি সব সময় রাখতেন এবং মধ্যে মধ্যে কলা ইত্যাদি আনিয়ে তাদের খাওয়াতেন। পাখিদের খাওয়াবার জন্য চালের ব্যবস্থা করেছিলেন। দোতলায় তাঁর দরজার সামনে ছাদের উপর চাল ছড়িয়ে দেওয়া হতো, তিনি দেখে আনন্দ করতেন।

তাঁর মনের অবস্থা আমাদের মতো সাধারণ লোকের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। তবে তাঁর আচরণ যা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি তারই সামান্য মাত্র ঘটনা এখানে দেওয়া হলো। এই প্রসঙ্গে আরও দু-একটি কথা বলে প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি করব।

রাত্রিবেলা শ্রীশ্রীহংসেশ্বরী মায়ের আলেখ্য নিয়ে তিনি কিরূপে জগন্মাতার ভাবে বিভোর হতেন—তা পূর্বে বলা হয়েছে। এই তন্ময়তার সঙ্গে ব্রাহ্মীস্থিতির কোন সম্পর্ক আছে কি না অথবা ইহাই ব্রাহ্মীস্থিতি কিনা—ইহা আমাদের পক্ষে বোঝা সুগম না হলেও তিনি কিন্তু প্রায়ই এই সময়ে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ-সমন্বিত শ্লোকগুলি শুনবার ইচ্ছা প্রকাশ করতেন এবং তাঁকে প্রায়ই তা পড়ে শোনাতে হতো। এর মধ্যে একটি শ্লোক তিনি অনেকবার করে শুনতে চাইতেন। শ্লোকটি এই—'যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী। যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥' শ্রীশ্রীচণ্ডীর একটি শ্লোকও তিনি শুনতে খুবই ভালবাসতেন এবং একই সঙ্গে দুটি শ্লোকই তাঁকে শোনাতে হতো। শ্রীশ্রীচণ্ডীর শ্লোকটি এই—'ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি। তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরি-সংক্ষয়ম্ ॥' (১১/৫৫)—এই শ্লোক দুটির মধ্যে কি সামঞ্জস্য এবং কি গভীর অর্থ নিহিত আছে, তা তিনিই জানতেন।

মহাপুরুষজীর স্মৃতি

স্বামী সদাত্মানন্দ

পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ একাধারে গুরু, শিক্ষক ও স্নেহময় পিতা ছিলেন। স্নেহময় পিতার ভাবটি তাঁর মধ্যে বিশেষভাবে প্রকাশিত বলে মনে হতো। বেলুড় মঠস্থ সাধু-ব্রহ্মচারীদের প্রতি তাঁর কি সতর্ক দৃষ্টি! অসুখ-বিসুখে চিন্তিত হতেন, সকলের খবরাদি সর্বদা রাখতেন। সাধু-ব্রহ্মচারীদের অসুখ হলে মঠে যে ব্রহ্মচারী চিকিৎসাদি কিছু জানত তাকেই দেখাশুনা করতে বলতেন। এভাবে ডাক্তার-ব্রহ্মচারী সকালে মহাপুরুষজীকে প্রণাম করতে গেলেই মঠে কে কে অসুস্থ আছে, কেমন আছে, এসব খবর তাঁকে দিতে হতো। তাছাড়া সকালে যখন সকলে তাঁকে প্রণাম করতে যেতেন, তিনি কে কেমন আছে জিজ্ঞেস করে প্রয়োজন মতো অসুস্থদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাও করতেন। ভক্তদের প্রতিও তাঁর সমান স্নেহ ছিল। বারুইপুরের একজন মহিলা ভক্তের (রাসবিহারীবাবুর মার) একটি মাত্র ছেলের টাইফয়েড হয়েছিল। তাকে দেখাশুনা করার জন্য মহাপুরুষ মহারাজ মঠ থেকে একজন ব্রহ্মচারী ডাক্তারকে পাঠালেন।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত অজিতবাবু মহাপুরুষ মহারাজের চিকিৎসা করতেন। অজিতবাবু মহাপুরুষ মহারাজের এক শিষ্যারও চিকিৎসক ছিলেন। একদিন অজিতবাবু এসেছে—মহাপুরুষজী একজন সেবককে বললেন, "ঐ মেয়েটির পত্রখানি পড়ে শোনা তো।" ভদ্রমহিলা লিখেছেন—"বাবা, আমার আপনি ছাড়া আর কেউ নাই! ...ইত্যাদি।" তা শুনে মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, "আমার কান্না পাচ্ছে এই কথা শুনে।" আরও অনেক কথা হলো। ভক্তের দুঃখে তিনি কতটা দুঃখবোধ করতেন এতে বুঝতে পারা যায়।...

একবার অসুস্থতার জন্য মহাপুরুষজীকে দর্শন করা সম্বন্ধে খুব কড়া নিয়ম হয়েছিল। মহাপুরুষ মহারাজের একটি দীক্ষিত শিষ্য তাঁকে দর্শন করবার জন্য ঐ সময়ে খুব জেদ করতে লাগলেন, কিন্তু তাঁকে যেতে দেওয়া হলো না। মহারাজ তা দেখতে পেলেন। যে সেবকসাধু ঐ ভক্তটিকে ভেতরে যেতে না দিয়ে নিচে যেতে বলেছিলেন, তিনি মহাপুরুষ মহারাজের কাছে যেতেই মহাপুরুষজী ব্যথিত কণ্ঠে বললেন, "তুমি কেন ওকে আসতে দিলে না!" এতে একটুও ভর্ৎসনার ভাব ছিল

না, কিন্তু তাঁর চোখের দৃষ্টি ও কণ্ঠস্বরে এমন একটা করুণভাব প্রকাশ পেয়েছিল যে, সেবক সাধু তখন কাঁদতে কাঁদতে ভক্তটিকে কেন আসতে দেননি, বলতে লাগলেন। ঐ সেবকসাধুকে মহাপুরুষ মহারাজ পুত্রাধিক স্নেহ করতেন এবং তিনিও মহাপুরুষজীকে পিতৃতুল্য ভালবাসতেন।...

সাধুরা যাতে সাধুভাবে থাকে তিনি সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতেন এবং প্রয়োজন হলে তাদের ডেকে দোষত্রুটি সংশোধন করে দিতেন। গঙ্গায় বিশেষত বর্ষাকালে জল ঘোলা হয়, তার উপর ছোট ছোট কাঁকড়াও অসংখ্য থাকে। তখন মঠে নূতন পুকুর কাটানো হয়েছে, বেশ পরিষ্কার জল। বাঁধানো ঘাট। সাধুরা অনেকে ঐ পুকুরে স্নান করতেন। একদিন মহাপুরুষ মহারাজ বলছেন—"এরা সব মোছলমান হয়েছে, গঙ্গায় চান করবে না।" আবার একদিন 'রামনাম-সংকীর্তনে' কেউ কেউ যায়নি দেখে বললেন—"ভূত সব রামনামের ভয়ে পালায়।"

শেষদিকে মহাপুরুষজীর ভিতর গুরুভাব ও আধ্যাত্মিকতার খুবই প্রকট হয়েছিল। কলকাতা থেকে কত লোকজন সব আসত! তাঁকে দর্শন করে, কথাবার্তা বলে মুগ্ধ হয়ে যেত, ফিরে যেত মনে শান্তি নিয়ে। সাধুদের ভিতরেও দেখেছি মহাপুরুষজীকে সকালে তো সবাই প্রণাম করতে যেতেনই আবার বিকেলেও অনেকে আসতেন। সামনে এলে হয়তো জিজ্ঞেস করতেন, "কি জন্য এসেছ?" তাই অনেকে পর্দার ফাঁক দিয়ে দর্শন করে যেতেন। দূর দূর দেশ থেকে সাধু-ভক্তরা দর্শন করতে আসতেন—শান্তি ও আনন্দ নিয়ে ফিরে যেতেন।

স্মৃতির কোঠায় মহাপুরুষজী

স্বামী বিশেষানন্দ

বাংলা ১৩২০ সাল, মেদিনীপুর জেলা বন্যায় প্লাবিত। বন্যার পরেই এল দুর্ভিক্ষ। সরকারি সাহায্য কিছু কিছু দেওয়া হচ্ছিল, কিন্তু তা পর্যাপ্ত ছিল না। এমন সময় দেখা গেল শান্ত সৌম্য সর্বত্যাগী একদল সন্ন্যাসীর অক্লান্ত পরিশ্রম আর অফুরন্ত ভালবাসা দিয়ে শিবরূপে জীবের সেবা। গ্রামে গ্রামে বন্যাত্রাণকার্য চলেছে—বুভুক্ষুদের অন্নদান, রোগীর চিকিৎসা প্রভৃতি কল্যাণ-কর্মে তাঁদের আত্মনিয়োগ। এই সেবাব্রতের ভার নিয়ে বেলুড় মঠ হতে অমূল্য মহারাজ (স্বামী শঙ্করানন্দজী) কয়েকজন সন্ন্যাসী সহ গিয়েছিলেন মেদিনীপুর জেলার চণ্ডীপুর গ্রামে

এবং যার ফলে বর্তমানে চণ্ডীপুরে একটি মঠ গড়ে উঠেছে। সে সময় আমি ছোট, তবুও আমার বেশ মনে পড়ে সন্ন্যাসীদের 'রিলিফ' কাজের সময় আমি মাঝে মাঝে আসতাম এবং একটু-আধটু কাজকর্ম করতাম; ঐ সূত্রে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়।

এর কয়েক বৎসর পর স্কুলের লেখাপড়া ছেড়ে ক্ষুদিরামের বিপ্লবী-দলে যোগদান করি, পরে ক্ষুদিরাম ধরা পড়াতে আমরা আত্মগোপন করেছিলাম। আমি সুন্দরবন পিলখানায় স্বামী নিগমানন্দ আশ্রম, কাশী প্রভৃতি স্থানে ঘুরে কাশী থেকে হাওড়া ফেরার সংকল্প করলাম এবং সেভাবে টিকিট কেটে ট্রেনে রওনা হলাম। ট্রেন যখন বেলুড় স্টেশনে পৌঁছল, হাওড়ার টিকিট থাকা সত্ত্বেও কেন জানি না ওখানে নেবে পড়লাম। তখন ফাল্গুন মাস, স্টেশনে নেবে সোজা বেলুড় মঠে প্রবেশ করলাম। বেলা তখন ১টা কি ১½ টা হবে। এর আগে কোনদিন চিন্তা করিনি যে, বেলুড় মঠ কখনো দেখব বা এই মঠজীবনের আদর্শে আমার জীবন উদ্বুদ্ধ হবে। ঢুকে প্রথমেই দেখলাম এক গৌরবর্ণ শান্ত ও সৌম্যমূর্তি মঠের মধ্যে কদমগাছ থেকে চন্দন গাছ পর্যন্ত পাদচারণ করছেন। মানুষের এমনরূপ আর তা থেকে যে এমন জ্যোতি বিচ্ছুরিত হতে পারে—এ আমার কল্পনারও অতীত! আমি আবিষ্ট হয়ে দেখছি। হঠাৎ তাঁর ডাকে সংবিৎ ফিরে পেলাম। "কি রে? তুই এতদিন কোথায় ছিলি? তুই তো আমাদের লোক। আয়, আয়, চলে আয়, বেলা যে গড়িয়ে গেল, খাওয়া-নাওয়া শেষ করবি কখন?" এই বলে তিনি আমাকে তেল দিয়ে গঙ্গার ঘাট দেখিয়ে দিলেন। আমি স্নান সেরে ফিরে দেখি সেই মহারাজ আলু, বেগুন ও ডাল সিদ্ধ করে ভাতরান্নার কাজ শেষ করে রেখেছেন। আমি আসতে আমায় খেতে দিয়ে নিজে পাশে বসলেন। খাচ্ছি—কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করলেন, "সাধু হবি?" আমি কোন দ্বিধা না করে উত্তর দিলাম—"হ্যাঁ।" এভাবে আরও কিছু প্রশ্ন করলেন; খাওয়া শেষ হলো। মুখ হাত ধুয়ে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করলাম। একটা থাকার ঘর নির্দিষ্ট করে দিয়ে বললেন, "বিশ্রাম করগে।" এতক্ষণে মহারাজের পরিচয় 'বাবুরাম মহারাজ' জেনে নিজেকে ধন্য মনে হলো। বিশ্রাম করছি—মন থেকে সমস্ত কালিমা যেন ধুয়ে মুছে সদ্যোস্নাত পূজারির রূপ ধারণ করেছে। আনন্দে মন একেবারে ভরপুর হয়ে উঠেছে। এভাবে কয়েকদিন মঠে থাকার পর পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ একদিন আদেশ করলেন, "পায়খানা পরিষ্কার করতে পারবি?" রাজি হলাম। কয়েকদিন ঐকাজ করার পর ঠাকুরের ফলমূল গুছিয়ে দেবার কাজ করার আদেশ পেলাম। এভাবে বেশ আনন্দে মঠের দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। সেই সময় দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ শেষ করে মঠের পূজ্যপাদ প্রেসিডেন্ট মহারাজ হঠাৎ ফিরে এলেন। সকলের সঙ্গে আমিও তাঁকে প্রণাম করতে গেলাম। তিনি সকলের কুশলাদি জিজ্ঞেস করে

আমাদের কল্যাণ কামনা করলেন। এর কিছুদিন পরে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ মঠে এলেন। মহাপুরুষজীকে দর্শন করলাম—মনের মাঝে যেন এক আনন্দের লহরী বয়ে গেল। মানুষ যে ত্যাগের মধ্যে এত আনন্দ, এত শান্তি, এত প্রেম-ভালবাসা পেতে পারে তা আগে কোনদিন উপলব্ধি করতে পারিনি এবং তা সম্ভব হয়েছিল সাধুসঙ্গ ও দর্শনের ফলে! এত অপার আনন্দ লাভ করেছিলাম যা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না! সঙ্গে সঙ্গে মনে জেগে উঠল দীক্ষাগ্রহণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা—দীক্ষালাভ করে আত্মশোধন করব। গেলাম স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের কাছে কৃপাপ্রার্থী হয়ে। গঙ্গার ধারে বারান্দায় স্বামী ব্রহ্মানন্দজী ও মহাপুরুষজী উভয়ে বসে তামাক খাচ্ছেন। প্রণাম করে আমার প্রার্থনা জানালাম। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ শ্রীমহাপুরুষজীকে দেখিয়ে বললেন, "উনি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, ওঁর কাছে প্রার্থনা কর।" কিন্তু মহাপুরুষজীও অনুরূপভাবে তাঁর মত ব্যক্ত করায় ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ বললেন, "আগামী কাল খুব ভোরে উদ্বোধনে চলে যাবে, সেখানে মা আছেন, তাঁর কাছে তোমার দীক্ষার প্রার্থনা জানাবে।" ঐ আদেশ শিরোধার্য করে পরদিন উদ্বোধনে গেলাম। শ্রীশ্রীমা-র শরীর সে সময় বিশেষ ভাল ছিল না। শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নির্দেশানুযায়ী সব বললাম। মা বললেন, "না, বাবা, আমার কাছে তোমার দীক্ষা নয়। আর একজনের কাছে তোমার দীক্ষা হবে।" মায়ের আদেশ শুনে ফিরে চলেছি মঠে, মনের মধ্যে অশান্ত ঝড় বয়ে চলেছে—ঠাকুরের এক কণা কৃপা কি লাভ করতে পারব না? কে আমার গুরু? কেন ঠাকুরের এত ছলনা? তবে কি আমার মুক্তি হবে না? হয়তো এ জন্মে শুধু প্রায়শ্চিত্ত—পরে গুরুর সন্ধান মিলবে। পরমুহূর্তে মনে জাগছে—না, না, এই জন্মে এক্ষুনি আমাকে দীক্ষা নিতেই হবে, সদ্‌গুরুর কৃপা ছাড়া মানবজন্ম বৃথা।

মঠ থেকে স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ বলরাম মন্দিরে গিয়েছেন, সেই সময় সন্ধ্যায় মহাপুরুষজীর পা দুখানি জড়িয়ে ধরলাম। কান্নাকাটি করলাম, "মহারাজ, আমাকে দীক্ষা দিন, আমি খুব ব্যগ্র হয়ে উঠেছি।" কিন্তু হায়! মহাপুরুষজীর কোমল হৃদয় কঠিন হলো। তিনি যেন রেগে বললেন—"যা, এখন তোর দীক্ষা হবে না, আমি কাউকে দীক্ষা দেই না।" ক্ষোভে ঘৃণায় অভিমানে সেখান থেকে সরে এলাম। অবশ্য পরে জেনেছিলাম তিনি তখন কাউকে দীক্ষা দেন না। অনাহারে অনিদ্রায় সে রাত্রি কাটিয়ে ভোরে মনে হলো মনের উপর যেন এক জগদ্দল পাথর চাপানো রয়েছে। কিছুতেই সরাতে পারছি না। মনকে সান্ত্বনা দিতে চেয়েছি—দীক্ষা না হয় ফিরে যাব বাড়িতে। শত শত মানুষ যেভাবে দিন কাটায়, আমিও কি পারবো না তাদের মতো একজন হয়ে বেঁচে থাকতে? না-ই বা হলো দীক্ষা, তার জন্য এত চিন্তা কেন? মনটা যেন একটু হাল্কা হলো। এমন সময় একজন সাধু এসে বললেন, "মহাপুরুষজী তোমায়

ডাকছেন।” শুনেই যেন দপ করে জ্বলে উঠলাম। আমি কিছুতেই যাব না—যিনি সাধু হবেন, তাঁর কত অপার স্নেহ, ভালবাসা, মমতা থাকবে, আর তা না হয়ে তিনি আমার সঙ্গে ঐরকম কঠিন ব্যবহার করলেন! আমি যাব না স্থির করলাম। কিছুক্ষণ পরে অন্য একজন সাধু এসে আবার মহাপুরুষজীর আদেশ শোনালেন। তখন মহাপুরুষজীকে গিয়ে প্রণাম করতেই তিনি বললেন, “কি রে, খুব রাগ করেছিস না? আচ্ছা বোস।” এই বলে ঠাকুরের প্রসাদি সন্দেশ আমায় একটি দিলেন। আমি কিছুতেই নেব না, তিনিও ছাড়বেন না। মহাপুরুষজী আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলছেন, “গুরুজনদের উপর এমন রাগ দেখাতে নেই। রাগ জিনিসটা মোটেই ভাল নয় রে! ওতে তুই আরও অন্ধ হয়ে যাবি।” সেদিনের শাসন যে আমার সাধন-জীবনের সহায় হয়েছে তা আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। তাঁর উপদেশ আজ অন্ধের যষ্টির মতো একান্ত নির্ভর। মনটা হঠাৎ আনন্দে ভরে উঠল, হাত বাড়িয়ে দিলাম প্রসাদের জন্য। তিনি একটি সন্দেশ আমায় দিলেন এবং পিঠে হাত বুলিয়ে একটু আদর করলেন—আমি সেই সুযোগে দীক্ষার কথা পুনরাবৃত্তি করতে গিয়ে নিজেই থেমে গেলাম। পরে ভাণ্ডারি মহারাজের কাছে মুড়ি খেয়ে মধ্যাহ্নে ঠাকুরের প্রসাদ পেয়ে বিশ্রাম করছি, হঠাৎ মনে হলো যদি দীক্ষা না হয় তবে এখানে থেকে লাভ কি? মুহূর্তে স্থির করলাম এখনই বাড়ি ফিরে যাব এবং কাজেও তাই করলাম। কিছুদিন বাড়িতে থাকার পর একদিন এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়েছি। জ্যৈষ্ঠমাস, সেদিন ১২ বা ১৩ তারিখ হবে। খাওয়ার পর রাতে ঘুমিয়েছি, হঠাৎ শুনতে পেলাম আমার প্রার্থিত দীক্ষামন্ত্র। ঘুম ভেঙে গেল, আনন্দে বিহ্বল হয়ে গেলাম। একি! এ যে ঠাকুরের মূর্তি! সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানালাম।

পরদিন শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজকে পত্র লিখে পাঠালাম, “আমার দীক্ষা হয়ে গিয়েছে।” অভিমানভরে আরও লিখলাম, “আপনি তো দীক্ষা দিলেন না, শ্রীশ্রীঠাকুরই কৃপা করে আমায় দীক্ষা দিয়েছেন।” পত্র পেয়েই মহাপুরুষজী আমাকে মঠে ডেকে পাঠালেন। মঠে পৌঁছে আমি মহাপুরুষজীর পত্রখানি তাঁর হাতে দিয়ে তাঁকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করলাম, তখন তিনি দাড়ি কামাচ্ছিলেন। মুখ তুলে বললেন, “কি রে, এত পরিশ্রম ঘোরাঘুরি করে দীক্ষা হলো না আর ঘরে বসেই গঙ্গালাভ করলি? এখন বুঝতে পারছিস তো কেন এতদিন দীক্ষা হয়নি।” আমি করজোড়ে পাশে দাঁড়িয়ে আছি। মহাপুরুষজী দাড়ি কামানো শেষ করে বললেন, “দেখি, তুই কি মন্ত্র পেয়েছিস? বল।” আমি ইতস্তত করছি; আমার মন্ত্র বলতে দ্বিধা দেখে শেষে তিনি বললেন যে, আমার মন্ত্রে ভুল আছে। তখন আমি মহাপুরুষজীর কাছে অকপটে আমার সমস্ত দীক্ষা-বৃত্তান্ত বর্ণনা করে ‘মন্ত্র’ উচ্চারণ করলাম। সত্যই আমার উচ্চারণে একটি অক্ষর ভুল ছিল, তিনি তা শোধন করে দিলেন এবং পরে

আমার পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, "তুই আমার কাছে মঠে থাক। তোর মঙ্গল হোক।" মন আনন্দে পূর্ণ হলো—এমন শীতল করস্পর্শ আর কোনদিন কোথাও পাইনি! সেই শীতলতায় আমার সমস্ত শরীর জুড়িয়ে গেল! এ স্নেহের কাছে পিতামাতার স্নেহ পরাভূত। আমি সন্ন্যাস-জীবন যাপন করার সংকল্প নিয়ে বেলুড় মঠেই থেকে গেলাম। মহাপুরুষজী আমাকে ফলফুলের বাগানে কাজ করতে বললেন। প্রচুর ফুল ফল হচ্ছে দেখে মহাপুরুষজী হাততালি দিয়ে বলতেন, "ওরে, এসব ঠাকুরের সেবা ও ভোগে লাগবে। দ্যাখ, শ্মশানেও একটু পরিশ্রম করলে কেমন সোনা ফলে! এ দেখেও বুঝতে পাচ্ছিস না যে, ধ্যান-জপ আন্তরিকভাবে করলে হৃদয়ে এমনি ফুলের বাগান হবে, তাতে কত ফুল ফুটবে আর সে ফুল দেবতার পায়ে নিবেদন করতে পারবি! তাই বলছি খুব ধ্যান-জপ করবি। জীবনের ফল পেতে হলে একটু কষ্ট করতে হবে, না খাটলে কিছুই হয় না রে। খাটবি মন প্রাণ দিয়ে, আত্মসমর্পণ করবি, তবেই ফল পাবি।" এরপর থেকে পূজ্যপাদ মহাপুরুষজী আমাকে এত ভালবাসতেন যে, তা অনুভব করে আমার মনুষ্যজন্মকে সার্থক বলে মনে হতো। তাঁর সেই ভালবাসায় কোন খাদ ছিল না।

মহাপুরুষজী আমাদের ধ্যান-জপের স্থান নির্দেশ করেছিলেন স্বামীজীর ঘরে এবং ঐ ঘরের যিনি সেবক ছিলেন তাঁকে বলে দিয়েছিলেন আমরা গেলে চাবি আমাদের দিতে। মহাপুরুষজী আমাদের বলতেন, "দেখ, নিশার জপ খুব ভাল, এতে আনন্দ পাবি। তোরা সব নিশাজপ করবি।" আমরাও তাই করতাম। রাত ১টা থেকে তিনটা পর্যন্ত মহাপুরুষজীর নির্দেশানুযায়ী জপ করতাম। তিনি বলতেন, "জপের মধ্যে যে এত আনন্দ আছে তা যদি নিয়মিত কিছুদিন নিষ্ঠার সঙ্গে করিস তবেই অনুভব করতে পারবি।" প্রতিদিন সকালে প্রণাম করতে গেলে সকলের কুশলাদি জিজ্ঞেস করে বলতেন, "আজ রাতে ধ্যানে বসেছিলি?" যেদিন ধ্যানে আনন্দে অধীর হয়ে উঠতাম সেদিন মহাপুরুষজীকে অসঙ্কোচে সব নিবেদন করতাম। তিনি আশীর্বাদ করে বলতেন, "সবই ঠাকুরের ইচ্ছা রে। তাঁর দয়া অসীম—তার এক কণা যদি কেউ পায়, সে তরে যায়। তাই বলছি—না খাটলে কিছু হয় না।"

এভাবে নিত্য ধ্যান-জপ করতাম। তিন বৎসর পরে মহাপুরুষজী আমায় ব্রহ্মচর্য দিলেন আর নাম রাখলেন কল্যাণচৈতন্য। একসঙ্গে আমাদের কয়েক জনকে ব্রহ্মচর্য দিয়েছিলেন। ব্রহ্মচর্য দেবার কিছুদিন পরে ভুবনেশ্বর মঠে যাবার আদেশ করলেন। যাবার সময় মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করছেন আর বলছেন, "মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) মঠ করে গিয়েছেন সাধন-ভজন করার জন্য, সেখানে গিয়ে খুব সাধন-ভজন করবি এবং কাজকর্ম মন প্রাণ দিয়ে করবি।"

আমি ভুবনেশ্বর মঠে গিয়ে খুব আনন্দে কাজকর্ম ও সাধন-ভজন করেছি; আর সেখানকার মোহন্ত মহারাজের সঙ্গ করে বেশ আনন্দেই ছিলাম। মহাপুরুষজীকে চিঠি লিখতাম আনন্দে আছি জানিয়ে। তিনি লিখতেন, "আরে, ভুবনেশ্বর হচ্ছে একেবারে বিশ্বনাথের স্থান, ওখানে যে থাকবে সেই আনন্দ পাবে।" আর আশীর্বাদ করতেন, "তোর মঙ্গল হবে এবং যে জন্য সংসার ছেড়ে এসেছিস তা লাভ হবে।" ভুবনেশ্বর মঠে পাঁচ বছর ছিলাম, সে সময় মহাপুরুষজীর অজস্র আশীর্বাদ পেয়েছি। একবার ঠাকুরের উৎসবের কদিন আগে মহাপুরুষজী ডেকে পাঠালেন মঠে। লিখেছিলেন, "পত্রপাঠ মঠে চলে আসবে, কারণ সন্ন্যাস দেওয়া হবে ঠাকুরের উৎসব উপলক্ষে।"

মঠে চলে এলাম। মহাপুরুষজীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে পাশে করজোড়ে বসে আছি। মহাপুরুষজী আমার দিকে তাকিয়ে একবার কি যেন দেখলেন! সেই দৃষ্টিতে কি ছিল জানি না, আমিও আবিষ্টের মতো তাকিয়ে রইলাম। পরে তাঁর শ্রীচরণে মাথা রাখলাম। তিনি বললেন, "ওঠ, আজ থেকে তুই সন্ন্যাসী।" আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম। দুচোখ বেয়ে দরদর ধারে জল পড়ছে, আর মনের মধ্যে এক শিহরণ জেগে উঠছে। মনে হলো আজ থেকে আমি সন্ন্যাসী। যথাসময়ে সন্ন্যাস হয়ে গেল। আমার বলতে যা কিছু ঠাকুরের পায়ে সমর্পণ করে আমি নবজন্ম লাভ করলাম।...

কিছুদিন পরে মহাপুরুষজীর আদেশে তমলুক আশ্রমে যাই। মহাপুরুষজী যেখানে পাঠাতেন আমি সানন্দে গিয়েছি, আর যেখানেই থাকি না কেন, মনে হয়েছে মহাপুরুষজীর হাতের লাটাই-এর সঙ্গে আমি বাঁধা। যখন ইচ্ছা তিনি নেন, যখন ইচ্ছা ছেড়ে দেন—তাই তো আমার ভয় নেই। এই যোগাযোগ যেন যুগ-যুগান্তে ছিন্ন না হয়, এ বাঁধন যেন না কাটে—ঠাকুরের কাছে এ-ই প্রার্থনা করি।...

পূজ্যপাদ মহাপুরুষজীর দূরদর্শিতার পরিচয় প্রতি কাজের মাঝেই পেতাম। আমাদের স্বাস্থ্যের প্রতিও তিনি বিশেষ দৃষ্টি দিতেন। দৈনিক ব্যায়াম করতাম তাঁর আদেশমতো এবং তিনি প্রত্যেকের জন্য একসের মিছরির ব্যবস্থা করে দিলেন সরবৎ খাবার জন্য। বলতেন, "ব্যায়াম আমাদের একান্ত প্রয়োজন, এতে শরীর সবল ও সুস্থ হবে; শরীর সবল হলে মনও সবল হবে। মন সবল না হলে, শক্তি সঞ্চয় না করলে শক্তির কাছে যাবি কেমন করে? দুর্বল মন নিয়ে গেলে পরাস্ত হবি। ওটা দরকার—বুঝলি, সাধু-জীবনের ওটা একটা বড় সম্পদ।"

এরপর মেদিনীপুরে কর্মিরূপে যাই। গান শেখার দিকে আমার বরাবরই ঝোঁক ছিল, মহাপুরুষজী তাতে উৎসাহ দিতেন, কিন্তু মেদিনীপুরে সঙ্গীত-সাধনার অসুবিধা হচ্ছে জানাতে তিনি বিষ্ণুপুরে সপ্তাহে একদিন গিয়ে সঙ্গীতচর্চার আদেশ দিলেন।

বিষ্ণুপুরে রামপ্রসন্নবাবুর কাছে ধ্রুপদ শিখতে যেতাম। ঐ সময়ে মহাপুরুষজীর চিঠিতে জানলাম যে, তিনি জ্ঞান গোস্বামী ও রামপ্রসন্নবাবুকে চিঠি দিয়েছেন—বিশেষানন্দ গান শিখতে যাচ্ছে, ওর সঙ্গীতচর্চায় যেন সাহায্য করা হয়। ৪ বছর সঙ্গীত-সাধনার পর রামপ্রসন্নবাবুর মৃত্যুতে আমার বিষ্ণুপুরে সঙ্গীত-শিক্ষা শেষ হলো, কিন্তু তখন গানে আমার পূর্ণ উদ্যম এসেছে। মঠে মহাপুরুষজীর শ্রীচরণে গিয়ে শরণ নিলাম। কেঁদে বললাম, "মহারাজ, আমি গান শিখতে চাই। এখন কোথায় গান শিখব? আপনি ব্যবস্থা করে দিন।" মহাপুরুষজী গোঁসাই মহারাজকে ডেকে পাঁচেট রাজগড়ে গান শেখার ব্যবস্থা করে দিলেন। আমার খুব আনন্দ হলো। সেখানে ৭ বৎসর সঙ্গীত-শিক্ষার পর মঠে ফিরে এলাম।...

এর কিছুদিন পরে মেদিনীপুর জেলার বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলের জন্য রামকৃষ্ণ মিশন নানা স্থানে ত্রাণকার্য আরম্ভ করেছেন। পথঘাট জলের তলায়, যানবাহন চলাচল বন্ধ। মহাপুরুষজী আদেশ করলেন টাকা নিয়ে রামজীবনপুর যেতে। তাঁর আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে হাওড়া থেকে গড়বেতা পর্যন্ত পায়ে হেঁটে গিয়েছিলাম আর টাকা যথাসময়ে পৌঁছাতে পেরেছিলাম। মহাপুরুষজীর আশীর্বাদ নিয়ে যিনি যেভাবে যে কাজে বেরিয়েছেন তিনি গৌরবের সঙ্গে তা সম্পন্ন করতে পেরেছেন—এ দৃষ্টান্ত শুধু আমার জীবনে নয়, বহু সাধুই নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ করেছেন।

সেবার বেলুড় মঠে কয়েকজন সাধুর বসন্ত দেখা দিল। মহাপুরষজী তাঁদের 'সোনার বাগানে' সরিয়ে দিলেন এবং আমার উপর তাঁদের সেবা-শুশ্রূষার ভার দিলেন। আমি যেতে ইতস্তত করায় তিনি বলেছিলেন—"আরে, আমি জানি তুই ছাড়া একাজ আর কেউ পারবে না। তোর সাহস আছে, সেবার একাগ্রতা রয়েছে। তুই পারবি না, কি বলছিস? যা ঠাকুর তোর মঙ্গল করবেন।" এই আশীর্বাদ পেয়ে আমি ঐ সেবাকার্যে লেগে গেলাম। প্রতিদিন মঠে এসে রোগীদের অবস্থা তাঁকে জানাতে আদেশ করেছিলেন। এভাবে সেবা-শুশ্রূষার পর রোগীদের সুস্থ করে মঠে ফিরে এলাম।

অসাবধানতাবশে একবার মঠের কাজ করার সময় আমার কোমরে ঝটকা-ব্যথা লাগল। ডাক্তারের পরামর্শমতো মালিশ নিচ্ছি, কিছুতেই যন্ত্রণার উপশম হচ্ছে না—অসহ্য যন্ত্রণায় ভুগছি। মহাপুরুষজী খোঁজ নিয়ে আমার কাছে এসে বললেন, "কিরে? তোর কি হয়েছে?" তাঁকে সব নিবেদন করতে তিনি পা দিয়ে আমার কোমর ঘষে দিলেন আর বললেন—"যা, ভাল হয়ে গেছে।" এই বলে মহাপুরুষজী চলে গেলেন। আশ্চর্য! পরদিন সত্যসত্যই আমার সমস্ত যন্ত্রণার উপশম হলো। মহাপুরুষজীর আশীর্বাদ অমোঘ, তাঁর বাণী দৈববাণী!

*　　*　　*

মহাপুরুষজী পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে প্রায় এক বৎসর শয্যাশায়ী ছিলেন। ডান হাত, ডান পা নাড়তে পারেন না, কিন্তু তাতে তাঁর কোনও ভাবান্তর দেখা গেল না। মুখমণ্ডল তেজোদীপ্ত ও আনন্দোজ্জ্বল—ভক্তেরা আসছে, প্রণাম করছে, তিনি ইশারায় সকলকে আশীর্বাদ জানাচ্ছেন। তাঁর কথা বলার শক্তি নেই, আমি পাশে বসে কাঁদছি; তিনি ইঙ্গিতে বুঝিয়ে আমার মাথা তাঁর বুকের কাছে রাখলেন, মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। আর ইঙ্গিতে বোঝালেন—কাঁদতে নেই, কাঁদিস না। তারপর কিছুদিন একটু সুস্থ ছিলেন; আমি তখন মঠ-চণ্ডীপুরে থাকি। হঠাৎ তারবার্তা পেলাম—"মহাপুরুষ মহারাজ দেহরক্ষা করেছেন।" ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ, ফেব্রুয়ারি মাস। মঠে এলাম, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য শেষকৃত্যটুকুও এসে দেখতে পেলাম না—এ বেদনা আজও ভুলতে পারিনি।

মহাপুরুষজীর সেই নশ্বরদেহ যদিও আজ নেই, কিন্তু মনে হয় সব সময় তিনি আমার অন্তর জুড়ে রয়েছেন।

শিবানন্দ-স্মরণে

স্বামী জ্ঞানদানন্দ

১৯২১ সালে সরস্বতীপূজার পরদিন বেলা প্রায় ১২ টার সময় বেলুড় মঠে প্রথম আসি। স্বামী নির্ভয়ানন্দ মহারাজের সঙ্গে প্রথম দেখা হতেই তিনি বললেন—"ওদিকে যাও।"

গিয়ে দেখি আমতলার দিকে বারান্দায় বেঞ্চিতে একজন বৃদ্ধ সাধু বসে আছেন, চারদিকে অনেক সাধু দাঁড়িয়ে তাঁর কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শুনছেন। ঐ বৃদ্ধ সাধুকে দর্শনমাত্রই প্রাণের ভিতর একটি আলোড়নের সৃষ্টি হলো, মনে হলো যেন একটা আধ্যাত্মিক শক্তি আমার ভিতর অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছে। মন এক দিব্যভাবে তন্ময় হয়ে গেল। ভাবলাম—তবে কি ইনিই আমার গুরুদেব? দৈবচালিত হয়ে তাঁর পাদপদ্মে প্রণত হলাম। মহাপুরুষ মহারাজ কে তখনও জানতাম না। পরে শুনলাম, ইনিই মহাপুরুষ মহারাজ—স্বামী শিবানন্দ, যিনি স্বামীজী-প্রদত্ত 'মহাপুরুষ' নামে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে সর্বত্র পরিচিত। প্রণাম করে দাঁড়াতেই মহাপুরুষ মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কোত্থেকে আসছ?"

আমি—"শিলচর হতে।"

মহাপুরুষজী—"তোমার তো অনেকদিন আগেই আসবার কথা ছিল।"

আমি—"গর্ভধারিণী-মার অসুস্থতা ও স্বর্গলাভের জন্য এতদিন আসতে পারিনি।"

যাই হোক, তাঁর আদেশে বেলুড় মঠে রয়েছি। নিয়মিত জপ-ধ্যান ও কিছু কাজকর্ম করি। এভাবে কয়েকমাস মঠ-বাসের পর একদিন তিনি আমায় বললেন—"নীলকণ্ঠ! বরাহনগর আশ্রম তোমাকে চায়। যাবে ওখানে?"

আমি বললাম, "না, মহারাজ! আপনার কাছ ছেড়ে কোথাও যেতে প্রাণ চাচ্ছে না। আপনাদের কাছে থেকে ভালভাবে জীবন-গঠন করব, এই আমার ইচ্ছা।" তিনি তাতে প্রসন্নই হলেন। আমার কোথাও আর যাওয়া হলো না। মঠেই বেশ আনন্দে থাকতে লাগলাম।

১৯২২ সালের প্রথমে শ্রীশ্রীরাজা মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দজী) বেলুড় মঠে এলেন। মহাপুরুষ মহারাজের ইচ্ছাতে রাজা মহারাজজী ঐ বৎসর আমাকে ব্রহ্মচর্য দেন। আমি কিছুকাল ধরে তাঁর কাছে দীক্ষাপ্রার্থী। একদিন তিনি আমার দিকে সস্নেহ দৃষ্টিপাত করে বললেন—"মহাপুরুষ তোমার গুরু। তিনি ঢাকা থেকে ফিরে এলে দীক্ষা হবে।"

তবু রাজা মহারাজের কাছে বলরাম-মন্দিরে ঘোরাঘুরি করি। একদিন রাত্রে স্বপ্নে দেখি, মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে মন্ত্র দিচ্ছেন। সে কথা শ্রীমহারাজকে বলায় তিনি মন্ত্রটি শুনে বললেন,—"বেশ, বেশ। আমি তো তোমায় আগেই বলেছিলুম, তিনি তোমায় দীক্ষা দেবেন। মহাপুরুষ ঢাকা থেকে এলে সব কথা তাঁকে বলবে।"

* * *

মহাপুরুষ মহারাজ মঠে এসেছেন। আমি একদিন মঠের আমতলার দিকে উঠান ঝাড়ু দিচ্ছি। ঝাড়ু দেবার পর মহাপুরুষ মহারাজ উঠানে নামলেন এবং উঠানের দিকে তাকিয়ে বললেন—"ওরে, ঠাকুর যে এখানে বেড়ান, এখানে ধুলো রয়েছে যে রে! তাঁর পায়ে লাগবে, আর ওদিকে দেশলাইয়ের কাঠিখোঁচা সব পড়ে রয়েছে। খুব সাবধানে সাফ করবি যেন ঠাকুর আনন্দে বেড়াতে পারেন, তাঁর পায়ে কিছু না লাগে।" তাঁর কথা শুনে আমার মনে হলো মঠে ঠাকুর সর্বত্র রয়েছেন, যদিও আমরা তাঁকে দেখতে পাই না। তিনি কিন্তু দেখতে পান।

* * *

থিয়েটারের অভিনেত্রীরা তখন প্রায়ই ঠাকুর-দর্শন করতে আসে। আমাকে তাদের ঠাকুরঘরে প্রণাম করিয়ে প্রসাদাদি দিতে হতো। ঐ কাজ আমার তত

ভাল লাগত না, কখনো বা মনে একটু ঘৃণার ভাবও আসত। একদিন মহাপুরুষ মহারাজের কাছে গিয়ে বললাম—"মহারাজ! আমি এদের নিয়ে ঠাকুর-দর্শন করাতে যাব না, প্রসাদও দেব না। আমার ভয় হয়, মনে কোন দাগ লাগতে পারে।" তা শুনে তিনি বললেন—"দ্যাখো, এরা পাপতাপে জর্জরিত হয়ে ঠাকুরের কাছে মঠে আসে জুড়াবার জন্য। এরাও ভক্ত, প্রসাদ খেলে এদের অন্তরের সব পাপ ধুয়ে যাবে, কল্যাণ হবে। তুমি এদের মায়ের মতো ভাববে আর সর্বদা পায়ের দিকে তাকাবে। কোন ভয় নেই, সবই জগজ্জননীর এক একটি রূপ মনে করবে।"

* * *

একদিন মহাপুরুষ মহারাজ আমায় জিজ্ঞেস করলেন—"নীলকণ্ঠ! আজ একটি গাই বিইয়েছে। কি বাচ্চা হয়েছে বলতো?"

আমি বললাম, "মহারাজ! ঠিক বলতে পাচ্ছি না।"

মহাপুরুষজী—"যাও, দেখে এসে সব খবর বলবে। এ মঠ ঠাকুরের, গরুবাছুর সব ঠাকুরের, তোমরা তাঁর সেবক। সব খোঁজখবর রাখবে, নানাভাবে তাঁর সেবা করবে।"

আর একদিন বর্ষাকালে খুব বৃষ্টি হতে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—"গোলপুকুরের ক-সিঁড়ি জল বেড়েছে আজ?" উত্তর ঠিক মতো দিতে না পারায় বেশ জোর দিয়ে বললেন—"ঠাকুরের মঠ, তোমরা তাঁর সন্তান। মঠের কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে খুঁটিনাটি সব খবর তোমরা না রাখলে কে রাখবে? সব খবর রাখা চাই।"

বাচ্চা মুলতানী গরুটিকে রাজা মহারাজ খুব ভালবাসতেন। মুলতানী এখন বড় হয়েছে, সে প্রায়ই ঠাকুরের ভাণ্ডারের সামনে এসে দাঁড়ায়। কিছু ফলটল না দিলে কিছুতেই সে নড়বে না। সবদিন বেশি ফল থাকত না, আমি তাকে কিছু না দিয়েই তাড়াতাম। একদিন হঠাৎ মহাপুরুষ মহারাজ মুলতানীকে দেখে সেখানে এলেন এবং আমায় বললেন—"ওকে রোজ কিছু দেবে, কিছু না দিয়ে এমনভাবে তাড়াবে না। জানো, ওকে মহারাজ কত ভালবাসতেন? মহারাজ তৃপ্ত হলে ঠাকুরও খুশি হবেন।"

আমি বললাম—"৪টি মাত্র কলা আছে, ঠাকুরের পূজার জন্য। কি করে দেব?"

মহাপুরুষ মহারাজ—"তা দুটো দাও, ওতে দোষ হবে না। মহারাজ সন্তুষ্ট হলে ঠাকুর তুষ্ট হবেন।"

গুরুভাইদের, বিশেষত মহারাজজীর প্রতি এঁদের কি ভালবাসা! কত গভীর শ্রদ্ধা-ভক্তি! আর মহারাজকে এঁরা শ্রীঠাকুরের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি বলেই জানতেন।

এদিকে আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, ঐ কলা দুটি দেবার খানিক পরেই একজন ঠাকুরের ভোগের জন্য কিছু কলা নিয়ে হাজির হলো।

* * *

১৯২২-২৩ সালে আমার দাদা আমাকে বাড়িতে নিয়ে যেতে আসেন। তখন আমি সবে এক-দেড়বছর বেলুড় মঠে আছি মহাপুরুষ মহারাজের শ্রীচরণপ্রান্তে। মঠে ঠাকুরের সন্তানদের দর্শন, সেবা ও তাঁদের জীবনাদর্শে জীবনগঠনের সঙ্কল্প—খুবই ভালো লাগছিল। দাদা মহাপুরুষ মহারাজের কাছে আমাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেবার অনুরোধ জানালেন। মহাপুরুষ মহারাজ আমায় ডেকে বললেন—"তোমার দাদা তোমাকে নিতে এসেছেন। বাড়ি যাবে?"

আমি বললাম—"না, মহারাজ! আমি এখানে বেশ আছি।"

মহাপুরুষজী—"ঠিক। বাড়ি যাবে কি? সেখানে কি আছে? মঠের মতো সুন্দর স্থান আর কোথায় পাবে? কত মহাপুরুষ সাধু-সন্ত এখানে রয়েছেন, এঁদের সঙ্গ দুর্লভ। সাধুর আবার বাড়িঘর কি? শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাকৃপায় এমন স্থানে থাকতে পেয়েছ। তিনি ভক্তি-বিশ্বাস ও মুক্তি দিয়ে তোমার জীবনকে ধন্য করবেন বলেই তোমায় এখানে এনেছেন। এসব স্মরণ করে পড়ে থাক, কল্যাণ হবে।"

* * *

তখন বেলুড় মঠে সাধুদের থাকার স্থানের বড্ড অভাব। কখনো কখনো সাধুর সংখ্যা বাড়লে আমরা যেখানে-সেখানে শুয়ে পড়তাম। একরাত্রি আমি ও উমেশ মহারাজ (ঈশানন্দ) স্বামীজীর ঘরের উত্তর দিকের ছোট গলিতে শুয়েছি। মহাপুরুষজী তা দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—"কে শুয়ে এখানে?" আমরা স্থানাভাবে ওখানে শুয়েছি বলাতে, তিনি বারণ করে বললেন—"সাক্ষাৎ স্বামীজী এখানে বেড়ান, তাঁর অসুবিধা হবে। খবরদার! স্বামীজী এখানে জীবন্ত রয়েছেন, তাঁর চলাফেরার পথরোধ কর না।"...

প্রভাকর ও তার ভাই গোপীনাথ মঠে অনেককাল থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগরাগ রান্না করে। মাঝে মাঝে ভাত ডাল বেশি হলে গামলা ভরে নিয়ে যায়। ঐ সব দেখে আমি একদিন তাদের বললাম—"তোমরা এত ডাল-ভাত-তরকারি নিয়ে কোথায় যাচ্ছ? এ তো ঠিক নয়। যা পার খাও, নিয়ে যাবার তো কথা নয়!" এই নিয়ে কথা কাটাকাটি ও শাসন চলছে শুনে মহাপুরুষ মহারাজ আমায় ডেকে বললেন—"এদের এভাবে গালাগালি দিও না। নিয়ে যাক, এরাও তো ঠাকুরের সেবক! আমরা ঠাকুরের সেবার যেসব কাজ করতে পারি না, তা ওরা করে। কেউ

চাকর বা পাচক নয়, আমরাও যেমন তাঁর সেবক, এখানে যারা কাজ করে তারাও তেমনি তাঁর সেবক।”...

আর একদিন একটি চাকরকে অন্যায়ের জন্য শাসন করছি দেখে উপর থেকে তিনি বলছেন—“নীলকণ্ঠ! তুমি দেখছি প্রভু হয়ে গেছ! আর সকলে চাকর—এ ভাব ত্যাগ কর। সকলেই সমান, প্রভুর সেবক।”

আমাদের অহংকার, অভিমান এভাবে তিনি নষ্ট করতেন, এমনিই সুন্দর ছিল তাঁর শিক্ষা!

* * *

মঠে বর্ষাকালে বাগানে জলে ভিজে ভিজে কাজ করছি। মহাপুরুষজী দেখতে পেয়ে বললেন—“জলে ভিজো না, অসুখ করবে।” আমি বললাম—“মহারাজ! আমরা ছেলে বয়সে কত কঠোরতা করেছি, কত জলে ভিজেছি, কিছু হবে না আমাদের।”

তিনি কিন্তু শুনলেন না, বললেন—“এ ম্যালেরিয়ার স্থান। অসুখ হলে সেবা ও পথ্য সব সময় মেলে না, সাবধানে থাকবে, জলে ভিজবে না।” মঠবাসীদের সর্ববিধ কল্যাণের জন্য তাঁর আন্তরিক চেষ্টা ছিল।

আর একবার বর্ষার পর ম্যালেরিয়া জ্বরে পড়েছি, শুধু সাগু বার্লি খেয়ে দুর্বল হয়ে গেছি। কুইনাইন খেয়ে খেয়ে মাথা ভোঁ ভোঁ করছে, বিছানায় পড়ে আছি। হঠাৎ দেখি মহাপুরুষজী আমার বিছানার পাশে বসে সস্নেহে মাথায় হাত দিয়ে বললেন—“কেমন আছ?” সব কথা শুনে তিনি নিজ-ঘর থেকে কিছু ফল পাঠিয়ে দিলেন। শরীর ও মন প্রাণ তৃপ্তিতে ভরে গেল। ধীরে ধীরে সেরে উঠলাম এঁদের যত্নে। মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীদের তিনি সন্তানের মতো স্নেহ করতেন। তাঁর ঐ স্নেহ কত গভীর ছিল—তা যারা তার কণামাত্রও পেয়েছে—তারা এখনো আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করে।

* * *

একদিন সন্ধ্যার পূর্বে দেশলাই নেই দেখে মঠের অনতিদূরে স্টিমার-ঘাটের কাছের দোকান থেকে দেশলাই কিনতে গেছি—এরই মধ্যে তিনি আমায় খুঁজেছেন। আসতেই বললেন—“কাকে বলে কোথায় গিয়েছিলে এমন সময়?” মাত্র ১০।১৫ মিনিট ঐ কাজে বাইরে ছিলাম। এসব শুনেও তিনি বললেন—“মঠের গেটের বাইরে যেতে হলেই অনুমতি নিয়ে তবে যাবে।”

পক্ষিমাতা যেমন পাখা দিয়ে শাবকদের ঢেকে রাখে, তিনিও তেমনি করে আমাদের সব বিপদ থেকে রক্ষা করতেন। কত সতর্ক দৃষ্টি ছিল তাঁর মঠবাসীদের উপর! তখন কাউকে বাইরে যেতে হলে অধ্যক্ষের অনুমতি নিয়ে যেতে হতো।

* * *

তিনি অন্তর্দ্রষ্টা পুরুষ ছিলেন। এক নজরেই ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সব জানতে পারতেন। আমরা বহু ঘটনায় তা দেখেছি।

একবার ডাক্তার হেম সিং ও মোক্তার বীরেনবাবু দিনাজপুর থেকে দীক্ষা নিতে মঠে এসেছেন। দীক্ষা প্রার্থনা করতেই হেমবাবুর দীক্ষা হয়ে গেল। বীরেনবাবু মহাপুরুষ মহারাজের কাছে যেতেই তিনি বললেন—"তোমার দীক্ষা এখানে নয়, অন্যত্র।" বীরেনবাবু ফিরে এলেন। আমি তাঁকে আবার তাঁর কাছে পাঠালাম! তাতেও তিনি বললেন—"না, তোমার ঘর আলাদা, তোমার দীক্ষা অন্যত্র হবে।" পরে বীরেনবাবু সন্তদাস বাবাজীর কাছে দীক্ষা নিয়ে পরিতৃপ্ত হন এবং আমাকে বলেন—"দেখুন, এঁরা অন্তর্যামী। আমার পুনঃপুনঃ প্রার্থনা সত্ত্বেও দীক্ষা তখন দিলেন না। কে কার গুরু হবেন এঁরা সব আগে থেকেই জানতে পারেন।"

* * *

একদিন বিকালে মহারাজের মন্দিরে প্রণাম করতে গেছি। দূর থেকে শুনছি সাধুদের হইচই! কাছে গিয়ে শুনলাম একটি যুবক (বোধ হয় উন্মাদ) দুপুরে মঠে এসে শ্রীশ্রীমার মন্দিরের দোরের উপরে খড়ি দিয়ে যা তা লিখে গেছে—সে কথা মহাপুরুষ মহারাজ শুনতেই অসময়ে মায়ের মন্দিরে ছুটে এলেন এবং আমাদের বকলেন, "তোমরা মঠে থেকে কি করছ? মঠের সব দিকে দৃষ্টি রাখবে। মা-র মন্দিরে এসে এভাবে কেউ যেন মন্দির কলুষিত বা নোংরা না করে। মা সাক্ষাৎ ভগবতী, এখানে তিনি নিত্য বিরাজ করছেন। বাবা, সাবধান! তাঁর সেবার ত্রুটি কর না।"

তাঁর কথাতে বুঝলাম যে, কত বড় অন্যায় কাজ আমাদের অবহেলার ফলে হয়েছে!

* * *

ভবানীপুরে গদাধর আশ্রমে ৺অন্নপূর্ণা পূজা হচ্ছে। সে উপলক্ষে মহাপুরুষ মহারাজ ওখানে কদিনের জন্য গিয়েছেন। ললিত মহারাজ মঠে এসে আমাদের সকলকে ৺পূজা দেখতে যাবার নিমন্ত্রণ করে গিয়েছিলেন। আমি তখন মঠে ঠাকুরের পূজার জোগাড় দিতাম—মঠে পূজার জোগাড় দিয়ে অন্নপূর্ণা পূজা দেখবার জন্য বেলা ১০।১১টার সময় গদাধর আশ্রমে গিয়েছি। মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে

দেখেই যেন অবাক হয়ে বললেন—“মঠের ঠাকুরসেবা ফেলে তুমি এখানে কেন এলে? যাও, এক্ষুনি মঠে ফিরে যাও। পুজো দেখা তো হলো, এখন শিগ্‌গির মঠে ফিরে যাও।”

ললিত মহারাজ মধ্যস্থ হয়ে আমায় দুপুরে অন্নপ্রসাদ খাইয়ে তাড়াতাড়ি মঠে পাঠিয়ে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবাপূজায় এতটা গুরুত্ব আরোপ করতেন তিনি।

* * *

রাজা মহারাজের মন্দির-প্রতিষ্ঠা-উৎসব। সারাদিন মঠ আনন্দমুখর, সাধু ব্রহ্মচারী সকলেই কর্মব্যস্ত। কত পূজাপাঠ যাগযজ্ঞ ভজনকীর্তন হলো, অনেক লোক প্রসাদ পেল। আমিও পরিশ্রান্ত হয়ে সন্ধ্যারতির পর মঠের আমতলার দিকে বারান্দায় বেঞ্চিতে শুয়ে পড়েছি। খুবই ক্লান্ত অবসন্ন দেহ।

এমন সময় রান্নাঘরের দিক থেকে মহাপুরুষ মহারাজ আমার কাছে এসে শুয়ে আছি দেখে খুব বকলেন। বললেন—“এ্যাঁ, রামনাম হচ্ছে আর তুমি এখানে শুয়ে? রামনামে ভূত পালাবে বুঝি?” আমি সারাদিন পরিশ্রমে খুব ক্লান্ত বলাতেও শুনলেন না। বললেন—“যা ব্যাটা, আগে রামনাম ভজন শোন গে এমন পুণ্যদিনে।” তাঁর সবদিকেই প্রখর দৃষ্টি ছিল।

রোজই রাত্রে ভোগের ঘণ্টার পর ‘ভিজিটারস্ রুমে’ সাধুরা ভজন করেন। মহাপুরুষজী তাঁর ঘর থেকেও শুনতে পান। খুব আগ্রহ করে শোনেন। একদিন সঙ্গতে তাল ঠিক হচ্ছিল না শুনে তিনি যেন অস্থির হয়ে উঠলেন। বললেন—“আঃ, বড্ড বেতালা করছে, বাজনার তাল কাটছে।” আমায় বললেন—“চল, আমি যাব।” নিচে নেমে আসরে গিয়ে বাঁয়া তবলা নিয়ে নিজেই সঙ্গত আরম্ভ করলেন, পরে নিজে গানও ধরলেন। মহারাজজীর আগমনে সেদিন ভজন খুব জমেছিল। সকলের মন খুব একাগ্র ও ভজনের ভাবে যেন ধ্যানমগ্ন—স্থির হয়ে গিয়েছিল সবাই!

* * *

১৯০২ বা ১৯০৩ সালের ঘটনা—শুনেছি একবার কাশী অদ্বৈতাশ্রমের ঠাকুরঘর হতে ঠাকুরের অস্থির কৌটাটি চুরি হয়। মহাপুরুষজী সবেমাত্র অদ্বৈতাশ্রম স্থাপনা করেছেন। একটি ছোট ঘরে বেদির উপর শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবি ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি বসিয়ে নিজেই পূজা করতেন। জার্মান সিলভারের একটি ছোট্ট কৌটাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের একটু অস্থি ছিল, তাও নিত্য পূজা করতেন।

একরাত্রে ঠাকুরঘরে চোর ঢুকে—ঠাকুরের কাপড়-চোপড় একটি ছোট্ট টিনের

বাক্সে ছিল—সে বাক্সটি এবং অস্থির কৌটাটি রূপার মনে করে নিয়ে যায়, পরদিন পুলিশে খবর দেয়া হলো। পুলিশ এসে চারদিকে খোঁজাখুঁজি করতে করতে বর্তমান অদ্বৈতাশ্রমের পশ্চিম পাশে যে নেবু-বাগান ছিল—সে বাগানে টিনের বাক্সটি ভাঙা অবস্থায় পেল এবং অস্থির কৌটাটিও খোলা অবস্থায় পড়েছিল। কিন্তু ঠাকুরের অস্থিটুকু আর পাওয়া গেল না—কোথায় পড়ে গেছে।

ঐ ঘটনায় মহাপুরুষজী বলেছিলেন, "ঠাকুরের অস্থি যখন ঐ জমিতে পড়েছে তখন ঐ জমি ঠাকুরের হবেই।"

তখন সেবাশ্রম শহরের রামাপুরা অঞ্চলে এক ভাড়া-বাড়িতে ছিল। ঐ ঘটনার অনেক পরে 'মিশন' বাগান সমেত ঐ জমিটির কিয়দংশ কিনে নেয় এবং ক্রমে সেখানে সেবাশ্রমের হাসপাতাল ইত্যাদি গড়ে ওঠে এবং ভাড়া বাড়ি থেকে সেবাশ্রম অদ্বৈতাশ্রমের পাশেই ঐ জমিতে স্থানান্তরিত হয়।

বর্তমানে কাশী সেবাশ্রম একটি বড় সেবাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে এবং স্বামীজীর আদর্শে 'নরনারায়ণ' সেবাকার্য পরিচালিত হয়ে সে স্থানটি এখন মহাতীর্থ! মহাপুরুষজী যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তাও হয়েছে সফল। ঐ স্থানটি ঠাকুরেরই হয়েছে, ঠাকুর বহুলোকের কল্যাণের জন্য সেখানে বিরাজ করছেন।

* * *

আমি তখন বেলুড় মঠে শ্রীমন্দিরে পূজা করি। একদিন ঠাকুরের ফল-মিষ্টি প্রসাদ মহাপুরুষ মহারাজকে দিতে তিনি হাতে করে দেখে বললেন—"ঠাকুরের কি সেবা কচ্ছিস? কলা ও কমলালেবুতে যে আঁশ রয়েছে! ভাল করে দেখে দিবি, ভুল না হয়। ঠাকুর যে জীবন্ত রয়েছেন, খুব সাবধানে পূজা করবি। তিনি যে পূজা গ্রহণ করেন তা আমি দেখতে পাই।" তিনি ঠাকুরের প্রসাদ একটু একটু সবই মুখে দিতেন। বলতেন—"লোভ করে খাচ্ছিনে, ঠাকুরের ভোগ-রাগ সব ঠিকমত হচ্ছে কিনা তাই দেখি।" সেজন্য ভোগের সব রকম প্রসাদই তাঁকে একটু একটু দিতে হতো এবং তিনি সামান্য একটু মুখে দিয়েই ভাল-মন্দ সব বুঝতে পারতেন।

একদিন গ্রীষ্মকালে খুব গরম পড়েছে। আমি তাঁর কাছে গিয়েছি। আমায় জিজ্ঞেস করলেন—"বড্ড গরম পড়েছে, ঠাকুরকে বাতাস করিস তো?"

আমি—হ্যাঁ মহারাজ, পাখা করি।

মহাপুরুষজী—কতক্ষণ করিস?

আমি—৪। ৫ মিনিট।

মহাপুরুষজী—না, বেশি করে করবি মন দিয়ে। ঠাকুরের গা টিপিস?

আমি—না তো।

মহাপুরুষ মহারাজ (হাতটেপার ভঙ্গিতে দেখিয়ে) বললেন, "মনে মনে এভাবে ঠাকুরের গা টিপবি, পদসেবা করবি।" এই বলে নিজের গা টিপে দেখাতে লাগলেন।...

আমেরিকা থেকে একখানি ভাল কম্বল এসেছে মহাপুরুষজীর জন্য। তিনি আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—"হ্যাঁরে, ঠাকুরের কম্বল আছে?"

আমি—না মহারাজ! লেপ আছে, কম্বল নেই।

মহাপুরুষ মহারাজ—এখানা নিয়ে যা—ভাল কম্বল, ঠাকুরের ব্যবহারে লাগাবি।

একজন ভক্ত একখানি অতি সুন্দর মাদুর তাঁর জন্য এনেছে। আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—"ঠাকুরের ভাল মাদুর আছে।"

আমি বললাম—"হ্যাঁ, আছে। তবে পুরানো।"

তখন মহাপুরুষ মহারাজ বললেন—"এখানা নিয়ে যাও ঠাকুরের জন্য।"

ভক্তটি পরে তাঁর জন্য আর একখানি মাদুর পাঠিয়েছিলেন। একজন একটি বেশ ভাল শীতলপাটি তাঁকে দিয়েছিলেন, তাও তিনি ঠাকুরের সেবায় দিলেন। ঠাকুরের সেবায় দিয়েই তাঁর বেশি আনন্দ। ভাল ফল মিষ্টি কিছু এলে তা ঠাকুরঘরে আগে পাঠিয়ে দিতেন।

* * *

একদিন দুপুরে ঠাকুরের অন্নপ্রসাদ থালায় সাজিয়ে মহাপুরুষজীর ঘরে নেয়া হয়েছে। আমিও ঠাকুরের ফল মিষ্টি প্রসাদ প্রত্যহ তাঁর জন্য যেমন নিয়ে যাই নিয়ে গেছি। গিয়ে দেখি মহাপুরুষজী সবেমাত্র খেতে বসেছেন। তাঁর ঘরের সামনে দিয়ে ঐ সময় খোকা মহারাজ স্নান করে নিজ ঘরে ফিরছিলেন। তা দেখে আমায় খোকা মহারাজকে ডাকতে বললেন। তিনি ঘরে আসতেই, মহারাজ নিজে খেতে খেতে ভাল ভাল প্রসাদ তুলে খোকা মহারাজের হাতে দিলেন। আর তিনিও হাঁটু গেড়ে পাঁচ বছরের বালকটির মতো আনন্দ করে তা বসে বসে খাচ্ছেন! এই দৃশ্য আমার মনে এক দিব্যানন্দের দোলা এনে দিয়েছিল—যেন দুটি দেব-বালক! নিজেদের বয়স ও মর্যাদা ভুলে সেই অতীতের দিনের শ্রীরামকৃষ্ণ-পদপ্রান্তে যেন বসেছে!

* * *

সুরেন ভট্টাচার্য—বেলুড় স্টিমার ঘাটের কাছে তাঁর বাড়ি, ঠাকুরের খুব ভক্ত

অথচ দরিদ্র। সালকেতে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে জমজমাট করে শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসব করতেন। মঠেও রোজ আসতেন ঠাকুর ও মহাপুরুষদের প্রণাম করতে। কাশীতে গিয়ে তিনি হঠাৎ মারা যান। ঠিক ঐ সময়ে বেলুড়ে তাঁদের বাড়িতে তাঁর স্ত্রী একটি সন্তান প্রসব করেন। বাড়ির দেখাশোনা করার বয়স্ক লোক কেউ নেই। বিধবা স্ত্রী ৩। ৪টি শিশু নিয়ে বিব্রত ও শোকসন্তপ্ত। বড় ছেলেটির বয়স মাত্র ৭। ৮ বছর। মহাপুরুষ মহারাজ সব শুনলেন। এদের মুখে ক্ষুধার সময় দুটি অন্ন দেবার লোক নেই। মা আঁতুড়ঘরে। মহারাজ আমাকে কদিন ৪। ৫ জনের প্রসাদসহ তাঁদের বাড়িতে দুপুরে পাঠাতেন। আমি স্ত্রীলোকের বাড়িতে যেতে সঙ্কোচ করাতে তিনি বললেন—"ঠাকুরের দরিদ্র ভক্ত পরিবার! ভয় নেই। ওরা বড় বিপদে পড়েছে, যাও সপ্তাহখানেক তাদের এভাবে সেবা কর, ভাল হবে, তোমার কল্যাণ হবে।" আমি তার আদেশ পালন করলাম।

* * *

ঠাকুরঘরের পাপোশ জীর্ণ হয়ে গিয়েছে। মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে অতিরিক্ত নতুন পাপোশ এসেছে দেখে আমি শঙ্কর মহারাজের কাছে সেটি ঠাকুরঘরের জন্য চাইলাম। তিনি মহাপুরুষ মহারাজকে বলতে বললেন। আমিও বলতে সাহস পাচ্ছি না, তিনিও বলছেন না। একদিন সাহস করে বলতেই তিনি বেশ ভাবের সঙ্গে বললেন—"আরে, সামান্য পাপোশ ঠাকুরঘরের জন্য নিয়ে যাবি, তা আর কি বলছিস—এই শরীরটাকেই ঠাকুরের পাপোশ করে দিই, ভক্তদের পদধূলি লাগবে।" এই বলে ঠাকুরের অহেতুক কৃপার কথা কত বললেন!

শেষের দিকে কয়েক বছর মহাপুরুষ মহারাজ রাত্রিতে প্রায় ঘুমোতেন না । শেষ রাত্রিটা তো জেগেই বসে থাকতেন রাত্রি ২টা-৩টা থেকে। সাধারণত ভোর ৪টায় ঠাকুরঘরের দরজা খোলা হতো। তিনি ৩টা থেকে বালকের মতো অধীর হয়ে থাকতেন মন্দির কখন খুলবে, মঙ্গলারতি হবে, ঠাকুরকে ভজন কখন শোনানো হবে—যেন এক দেবশিশু ভগবানের ভাবে তন্ময়! ঐ তাঁর ধ্যান জ্ঞান। পূজারি এসে মন্দির খুললে তবে শান্ত হতেন।

একবার শীতকালে খুব শীত পড়েছে। আমি তখন ঠাকুর-পূজা করি। আমাকে ডেকে বললেন—"রাত বড়, শীতও খুব, এ সময় ৪টার পরিবর্তে ভোর ৫টায় ঠাকুর তুলবি।" পরদিন আমি সেভাবে দেরি করেছি। লাইব্রেরিতে শুতাম, সন্তোষবাবু ভোরে ভজনের সময় তবলা বাজাতেন। সতীনাথ ভজন গাইত। ৫টার অনেক আগেই সন্তোষবাবুকে ডেকে আনার জন্য আমাকে পাঠাতেন। আমি আসতেই তিনি বললেন, "কই, ৪টা বেজে গেছে—এখনও ঠাকুরঘর খুলিসনি?"

আমি বললাম—“মহারাজ! আপনি তো ৫টায় ঠাকুর ওঠাতে বলেছেন, খুব শীত পড়েছে বলে।”

মহারাজ—হাঁ, হাঁ, আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে।

পরদিনও ঐ ব্যাপার—আবার আমাকে ডাকান এবং ঐভাবে জিজ্ঞেস করেন। আমার ঐরকম উত্তর শুনে বললেন—“হাঁ, বড় শীত, পাঁচটায় খুলবি।” ঠাকুরের সেবায় তাঁর বালকের মতো অধৈর্য!

কিরণ দত্ত রিসিভার থাকার সময় মঠের জনৈক ব্রহ্মচারী মহারাজ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের সেবা পূজাদির সব রকম ব্যবস্থাদি করতেন। সে সময় তিনি একদিন মহাপুরুষ মহারাজকে দক্ষিণেশ্বর যাবার আমন্ত্রণ করলেন। তিনি, মহাপুরুষ মহারাজ, শঙ্কর মহারাজ, দেবেনদা ও আমি—এ কজন দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে সারাদিন ছিলাম। খাজাঞ্চীর ঘরের পাশে একটি বড় ঘরে মহাপুরুষ মহারাজের বিশ্রামের ব্যবস্থা হয়েছিল। ৺মায়ের দর্শনাদির পরে প্রসাদ পেয়ে একসঙ্গে আমরা বিশ্রাম করলাম। বিকালে তিনি আমাদের শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘর, পঞ্চবটী, বেলতলা প্রভৃতি সব জায়গা ঘুরে ঘুরে দেখালেন। নিজেও যেন সেই শ্রীশ্রীঠাকুরের সময়ে রয়েছেন তেমন ভাব তাঁর চোখ-মুখ ও কথায় প্রকাশিত হলো। আমরাও খুব আনন্দ পেলাম।

* * *

একদিন বড় দাড়ি-সমেত তাঁর ঘরে গেছি। তখন ঠাকুরের পূজা করি। দাড়ি দেখেই বলে উঠলেন—“সেলাম।” পরে বললেন—“এত বড় দাড়ি রেখেছ কেন? এই নিয়ে ঠাকুরপূজা করছো?” পরদিন শুধু দাড়ি ফেলে গেছি—মাথার চুল ফেলিনি। তা দেখে তিনি বললেন—“বাবু হয়েছ, বাবু হয়েছ! সন্ন্যাসী একসঙ্গে চুল-দাড়ি সব কামাবে।” পরে তাই করলাম।

* * *

একদিন প্রায় দুপুরের দিকে একটি ছেলে এসে আমতলার দিকের বারান্দায় বেঞ্চিতে বসে আছে। তাকে আমি জিজ্ঞেস করে জানলাম যে, সে দীক্ষাপ্রার্থী।

কিছুপরে মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে গেছি। তিনি শঙ্কর মহারাজকে জিজ্ঞেস করলেন—“কই, আজ কেউ তো এল না? আজ একটিও ঠাকুরের পাদপদ্মে অর্পিত হলো না? দ্যাখ তো, প্রার্থী কেউ আছে কিনা।”

তখন আমি বললাম—“একটি ছেলে নিচের বেঞ্চিতে বসে আছে।”

একথা শুনে মহারাজ খুব আগ্রহ করে বললেন—“যা, নিয়ে আয়, ঠাকুরের পাদপদ্মে তাকে বলি দিয়ে দিই।” শেষের দিকে তিনি রোজই যেন কৃপা করার

জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতেন এবং অপেক্ষা করতেন আর আশ্চর্যের বিষয় রোজই অনেকতক দীক্ষাপ্রার্থী এসে হাজির হতো!

* * *

তখন রোজ ঠাকুর, মা, স্বামীজীর জন্য অন্তত তিনখানি বেলফুলের মালা গাঁথতাম। আর একটি মালা মহাপুরুষজীর জন্যও গেঁথে নিয়ে যেতাম। একদিন সময়াভাবে বেশি মালা গাঁথতে পারিনি, কেবল ঐ তিনটিই গেঁথেছি। আরতির পরে রোজকার মতো প্রণাম করতে তাঁর ঘরে গেছি। তিনি বলে উঠলেন—"কই, আজ তো আমায় মালা দিলে না?"

আমি তৎক্ষণাৎ গিয়ে ঠাকুরের প্রসাদী বড় মালাটি কেটে দুটি করে একটি তাঁকে দিলাম। প্রসাদী মালা শুনে তিনি খুব খুশি হলেন। এভাবে তিনি দয়া করে আমার সেবা গ্রহণ করতেন, কৃপা করতেন।

* * *

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী মঠের উত্তরদিকের বাগানবাড়িতে কখনো কখনো এসে থাকতেন। মায়ের স্মৃতিরূপে ঐ বাগানটি কিনবার ইচ্ছা হলো মহাপুরুষ মহারাজের। তিনি রজনীবাবুকে ঐ বাগানের মালিকদের কাছে পাঠালেন। তাঁরা শুনে রহস্যভরে বললেন, "বেলুড় মঠ যদি বিক্রি হয় তো আমরা কিনব, আমাদের আরো দরকার।" রজনীবাবু এসে মহারাজকে সে কথা জানালেন। মহারাজ তাঁদের ঐ রকম ঠাট্টা শুনে গম্ভীর হয়ে বললেন—"ঠাকুরের যা ইচ্ছা তাই হবে।"

কিছুদিন পরে তাঁদের বিষয়-আশয় নিয়ে শরিকদের মধ্যে পরস্পর গোলমাল ও ঝগড়া হয়ে ঐ বাড়িটি বিক্রি করাই সাব্যস্ত হয়। বেলুড় মঠ তখন তাঁদের দেওয়া দামেই তা কিনে নেয়। এভাবে মহাপুরুষজীর ইচ্ছাটি পূর্ণ হয়েছিল অনেক পরে।

* * *

মঠে তখন নূতন বড় পুকুর কাটানো হয়েছে, পরিস্কার জল—'কাকচক্ষুবৎ'। আর গভীরও বেশ। আমরা মাঝে মাঝে তাতে স্নান করতাম, সাঁতার কাটতাম। একদিন স্নান করে মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে গিয়েছি, তিনি জিজ্ঞেস করলেন—"কোথায় স্নান করলে?"

আমি বললাম—"নূতন পুকুরে"। তা শুনে তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন—"সামনে পতিতোদ্ধারিণী কলুষনাশিনী মা গঙ্গা থাকতে পুকুরে স্নান? ঠাকুর বলতেন—'গঙ্গাবারি ব্রহ্মবারি, ইষ্টদর্শনের সহায়ক।' ঠাকুরের কি গঙ্গাভক্তিই না

ছিল। মা জীব-জগৎকে পবিত্র ও কৃপাধন্য করার জন্য দ্রবময়ী হয়ে এ ধরায় এসেছেন। গঙ্গাস্নান করবে। গঙ্গাজলে দেহ-মন শুদ্ধ হয়।"

মহাপুরুষ মহারাজের অসাধারণ গঙ্গাভক্তি ছিল। তিনি গঙ্গাবারিকে মহাপবিত্র মনে করতেন। এ গঙ্গাভক্তি তিনি পেয়েছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছ থেকে।...

একজন সাধু কনখল থেকে আসার পথে মোক্ষ-ক্ষেত্র কাশীধামে না নেমে সোজা বেলুড় মঠে এসেছেন। মহাপুরুষ মহারাজ বললেন—"কাশীধামে না নেমে, ৺বিশ্বনাথ ও ৺অন্নপূর্ণা দর্শন না করে এলে? এ তো ঠিক করনি; কাশী ডিঙোতে নেই।" আর একবার এক সাধুকে বলেছিলেন—"যদি কোন কাজে বাধা পড়ে তো অন্তত একবার অল্প সময়ের জন্যও ৺বিশ্বনাথ-দর্শনে যাবে। মহিম্নঃ-স্তোত্র পাঠ করবে, কখনো বা সন্ধ্যারতি-দর্শন, গঙ্গাস্নান—এসব না করলে কি হয়? ক্ষেত্র-মাহাত্ম্য-পাঠে ও এসব আচরণে কাশীবাসের সুফল হয়।"

কাশী অ-বিমুক্ত পুরী—ঠাকুর দেখেছিলেন। মহাপুরুষ মহারাজও সেই দৃষ্টিতে কাশীকে দেখতেন। যুগযুগান্তর থেকে অগণিত জীবকে মুক্তি দেবার জন্য স্বয়ং বিশ্বনাথ সেখানে বিরাজ করছেন।

* * *

একবার দুর্গাপূজায় মহাপুরুষ মহারাজ, শরৎ মহারাজ প্রভৃতি ঠাকুরের সন্তান ও প্রাচীন সাধুগণ অষ্টমী-নবমীর সন্ধিক্ষণে সন্ধিপূজার সময় সকলে ধ্যানমগ্ন। অপরাপর নবীন সাধুরাও তদ্‌ভাবাপন্ন। সেদিন সান্ধ্য আরতির সময় ওঁকারানন্দ মহারাজ আমাদের বলেছিলেন—"তোরা তো পূর্ববঙ্গের ধুনুচি-নৃত্য জানিস। জানিস তো নাচ?" আমরা কয়েকজন ধুনুচি-নৃত্য আরম্ভ করতেই পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ ও শরৎ মহারাজ দাঁড়িয়ে নৃত্য শুরু করলেন। যেন মাতৃভাবে মাতোয়ারা দেব-বালকের নৃত্য। সঙ্গে অমূল্য মহারাজও নাচছিলেন। খুবই মনোহর দৃশ্য! আমি তখন বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। অমূল্য মহারাজের কাছে গিয়ে বললাম—"মহারাজ! এঁরা বৃদ্ধ হয়েছেন, ঠাকুরের সন্তান, ভাবে নৃত্য করছেন, যদি পড়ে যান।"

অমূল্য মহারাজ তাঁদের কাছে গিয়ে খুব সাবধানে ধীরে ধীরে ধরে তাঁদের বসিয়ে দিলেন।

* * *

পরম পূজনীয় রাজা মহারাজের শরীরত্যাগের পর আমরা রথযাত্রা-দর্শন ও তপস্যার জন্য পুরীধামে যাত্রা করি। প্রথমে উঠি শশীনিকেতনে। সেখানে পূজনীয় শরৎ মহারাজ তখন ছিলেন। দু-চার দিন থাকার পর স্থানাভাবের জন্য শরৎ মহারাজ

আমাদের অন্য ব্যবস্থা করতে বললেন। আমি তখন রাঁচী ব্রহ্মচর্য আশ্রমের শাখাকেন্দ্রে প্রায় দু-সপ্তাহ ছিলাম। পরে সেখানে তাঁদের সাধুরা আসাতে স্থানাভাবের জন্য সে স্থানও ছাড়তে হলো। তাই রথযাত্রা দেখেই মঠে ফিরে আসি। মহাপ্রসাদ নিয়ে আসছিলাম, কিন্তু গাড়িতে প্রসাদ নষ্ট হয়ে গেল। কেবল আম-প্রসাদ নিয়ে মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করতে তাঁর কাছে গেলাম। তিনি সে আম থেকে কিছুটা গ্রহণ করে বাকি আমাদের খেতে বললেন। পরে যেন আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—"তোমরা এত করে গেলে, পুরীধাম মহাতীর্থ। আরো কিছুদিন থাকলে না কেন? কি হলো, এত শীঘ্র ফিরে এলে যে?"

আমরা সব কারণ বললাম। তাঁর কথা শুনে ৺পুরী মহাতীর্থের মহিমা কতকটা বুঝতে পারলাম।

*　　*　　*

একদিন গ্রীষ্মকালে পূর্ণিমার রাত্রে সন্ধ্যা-আরতির পরে আমি আসনখানি নিয়ে বেলুড় মঠের গঙ্গার ধারে পোস্তায় বসে ধ্যান করছি। চারিদিক স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নালোকে উদ্ভাসিত। এমন সময় মঠবাড়ির দোতলা থেকে মহাপুরুষ মহারাজ আমায় ওখানে বসে ধ্যান করতে দেখে নিচে একজন সাধুকে বললেন—"সাধু-ব্রহ্মচারীর চন্দ্রালোকে বসে ধ্যান-জপ করা উচিত নয়। ওকে উঠে আসতে বলো।" তাঁর নির্দেশ শুনেই আমি তাড়াতাড়ি উঠে এলাম। আমাদের ধর্মজীবনকে সুরক্ষিত রাখার জন্য তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না।

*　　*　　*

একবার শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসবের জন্য বেশ কিছু টাকা দেনা হয়েছে। মঠের এসব কাজের তত্ত্বাবধায়ক ভরত মহারাজ উপরে গিয়ে মহাপুরুষ মহারাজকে সব জানালেন। আমি তাঁকে প্রণাম করতে গিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে আছি। মহাপুরুষ মহারাজ সব শুনে বললেন—"ভরত! কিছু ভেবো না। ও গৌরীসেন অর্থাৎ ঠাকুরই জোগাড় করে দেবেন।"

*　　*　　*

আসামে রিলিফের কাজে গেছি। কাজ শেষ হবার পর কিছুদিন নির্জনে থেকে সাধন-ভজন করার ইচ্ছা হলো। স্থানীয় ভক্তরা একটি আশ্রমের মতো করে আমায় সেখানে রাখলেন। ঐ ভাবে আছি—নির্জনে ভজন-সাধন করছি। এমন সময় বেলুড় মঠ থেকে ৺দুর্গাপূজার নিমন্ত্রণ-পত্র এল, কিন্তু আমি গেলাম না। তাই দেখে মহাপুরুষ মহারাজ নিজে আমায় লিখলেন—"আমার চিঠি পাওয়ামাত্রই চলে এসো।"

*　　*　　*

এসে তাঁকে প্রণাম করতে যেতেই তিনি বললেন—"দ্যাখ, 'গুরুকা দ্বারমে কুত্তাকা মাফিক পড়া রহো'—এই যে কেলো কুকুরটা আমার যেমন কুকুর, আমিও তেমনি ঠাকুরের কুকুর। ঠাকুরের দোরে পড়ে থাক। তাহলে তাঁর দয়া হবেই একদিন!"

* * *

পূজনীয় নীরদ মহারাজের বৃদ্ধা মা মঠে এসেছেন। ঠাকুরঘরে গিয়ে ধ্যান-প্রার্থনা করে শ্রীশ্রীঠাকুরের বেদি ছুঁয়ে প্রণাম করলেন, তারপর উপরের ছাদ দিয়ে এলেন মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে। আমিও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আছি—দেখব ইনি কে? কেউ তো ঠাকুরের বেদি ছুঁতে সাহস করেন না।

তাঁকে দেখেই মহারাজের কি আনন্দ! 'এসো মা, এসো'—বলে কত যত্ন! কাছে যেতে বললেন—"মা, আমার মাথায় একটু হাত দাও।"

তিনিও যেন বাৎসল্যভাবে নিজ শিশুসন্তানজ্ঞানে তাঁর মাথায় হাত রাখলেন। অপূর্ব দৃশ্য! অথচ তিনি সংসারে আছেন। পরে জানলাম—ইনি শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত নবগোপাল ঘোষের স্ত্রী। এঁকে ঠাকুর খুব উঁচু আধার বলতেন। তিনি ছিলেন শ্রীমায়ের লীলাসঙ্গিনী। শ্রীমা দেখেছিলেন—বৃন্দাবনে ৺শ্রীরাধারমণকে ইনি চামর করছেন। ইনি ঠাকুরকে নিজ হাতে খাইয়েছিলেন, এত শুদ্ধসত্ত্ব, উঁচু আধার! তাঁর কত অলৌকিক দর্শন ও কত ভাব-সমাধি হতো!

* * *

হরমোহন মিত্রের মা ঠাকুরের ভক্ত, ঠাকুরের সময়কার লোক। একদিন তিনি হন্ত-দন্ত হয়ে মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে যাচ্ছেন। সেবক বাধা দিতে তিনি হাত ঠেলে দিয়ে মহারাজের ঘরে ঢুকলেন। তাঁকে দেখেই—"এসো মা, এসো মা" বলে মহারাজ আপ্যায়ন করলেন। তাই দেখে সেবক তো অপ্রস্তুত! বৃদ্ধা নালিশ রুজু করলেন—"বাবা, তোমার কাছে এরা আমায় আসতে দিচ্ছিল না, আমি ওদের কথা শুনিনি। ঠাকুরের ছেলের কাছে আসব না? তাই হাত ঠেলে চলে এসেছি।" মহারাজ তাঁকে প্রসাদাদি দিয়ে সন্তুষ্ট করলেন। আর বললেন—"এরা ছেলেমানুষ, তোমায় তো চেনে না, মা!"

শ্রীশ্রীঠাকুরের সময়কার ভক্তদের সঙ্গে এঁদের বিশেষ অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ ছিল। ঠাকুরের ভালবাসা-সূত্রে এঁরা একত্রে বাঁধা!...

পরম পূজনীয় যোগানন্দ মহারাজের স্ত্রী সঙ্গে একটি ছোট মেয়ে নিয়ে মাঝে মাঝে মঠে আসতেন এবং মহাপুরুষ মহারাজের ঘরেও যেতেন। তিনি তাঁকে

কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞেস করে প্রচুর খাবার-দাবার, কাপড়-চোপড় ও টাকা-কড়ি দিয়ে পরিতুষ্ট করতেন, ঠাকুরের প্রসাদ পেয়ে যেতে বলতেন এবং খুব অন্তরঙ্গভাবে সব খবরাদি নিতেন। কোনরকম অভাব বা কষ্ট আছে কিনা জিজ্ঞেস করতেন এবং সেবকদের বলতেন পরিতৃপ্ত করে খাওয়াতে।...

মঠে এলে বিনোদিনী ও তারাসুন্দরীকেও মহাপুরুষ মহারাজ খুব যত্ন করতেন। তাঁর ঘরে গেলে কুশলপ্রশ্নাদি করে ফলমিষ্টি-প্রসাদাদি দিতেন। তাঁরাও বেলুড় মঠ ও মহাপুরুষ মহারাজ প্রভৃতি ঠাকুরের সন্তানদের খুব আপন মনে করতেন। এমন কি মঠের বাগান থেকে বিনোদিনী তরিতরকারি নিজের হাতে তুলে নিয়ে যেতেন, জিজ্ঞেস করায় আমায় একবার বললেন—বাবার বাড়ি মেয়ে এসেছে, বাবার বাগান থেকে মেয়ে এসব নিয়ে যাচ্ছে, রোজ অন্য তরকারির সঙ্গে একটু দিয়ে মহাপ্রসাদ মনে করে খাবে।" ধন্য এঁদের ভক্তি ও জ্ঞান!

এই বিনোদিনী স্টার থিয়েটারে চৈতন্যলীলায় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য সেজে ঠাকুরকে আনন্দ দান করেছিলেন। এঁরা তো সাধারণ মেয়ে নন!! এঁকে শ্রীঠাকুর "তোমার চৈতন্য হোক" বলে আশীর্বাদ করেছিলেন।

*　　　*　　　*

১৯২৯ সালের ঘটনা। প্রায় দু-বছর হৃষীকেশ, কনখল, স্বর্গাশ্রম ও পরে কিষণপুরে ভিক্ষান্নে জীবনযাত্রা নির্বাহ করি ও নির্জনে সাধন-ভজনে কাটাই। এমন সময় শুদ্ধানন্দ মহারাজের টেলিগ্রাম এলো—"কাছাড় বন্যা-সেবাকার্যে তোমাকে যেতে হবে, অবিলম্বে মঠে এসো।" অনিচ্ছাসত্ত্বেও মঠে এলাম। মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করতে গেছি, তিনি বললেন,—"কী, এর মধ্যে তপস্যা হয়ে গেল, চলে এলে যে?"

আমি বললাম—"কাছাড়ে বন্যা হয়েছে। সুধীর মহারাজ আমাকে সেখানে যাবার জন্য টেলিগ্রাম করেছেন। ওখানকার সাধুরাও বললেন—যাও। সকলের আদেশে চলে এলাম।" মহাপুরুষ মহারাজ—"বেশ, বেশ! স্বামীজী-প্রবর্তিত সেবাকাজ ও তপস্যা একই। যাও—।"

*　　　*　　　*

আমি একদিন গিয়ে বললাম—"মহারাজ! এতদিন এসেছি, কিন্তু মনের তো কিছুই পরিবর্তন বা উন্নতি দেখি না।"

তিনি বললেন—"ঠাকুর অবতার, ঠাকুর সত্য। আমরা তাঁর সন্তান, আমরাও সত্য। ঠাকুরের ছেলেরা যাদের কৃপা করেছেন, তাদের আর ভয় নেই। জাত সাপে

ছুঁয়েছে! ঠাকুরের ছেলেদের কাছে যারা এসেছে তাদের সব হবে। ঠাকুরই তোমাদের হাত ধরে রয়েছেন, সব ভার নিয়েছেন—বাবা! পড়ে থাক, সময়ে সব হবে।"

একবার মহাপুরুষ মহারাজের জন্মতিথি-উৎসবের দিনে পূজনীয় শরৎ মহারাজ ও অভেদানন্দ মহারাজ তাঁকে দর্শন করতে এসেছেন। তাঁরা খুব ভক্তিভরে নত হয়ে প্রণাম করছেন দেখে মহারাজ খুব ব্যস্তভাবে বললেন—"ভাই শরৎ, কালী! তোমরা এত কষ্ট করে এমন করে প্রণাম করছো কেন, ভাই?"

শরৎ মহারাজ বললেন—" 'গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু', তারপর আপনি 'জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম পিতা'।"

এঁদের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দেখবার জিনিস ছিল। ঠাকুরকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল ঐ শ্রদ্ধা ও ভালবাসা।

* * *

মহাপুরুষ মহারাজের শেষ অসুখ আরম্ভ হবার পূর্বে একদিন তাঁর মুখ দিয়ে অনবরত রক্ত পড়ছে শুনে আমরা খেতে খেতে তাড়াতাড়ি উঠে গেলাম। কাপড় মুখে ধরতে সব লাল হয়ে গেল।...ডাক্তার অজিতবাবু এলেন। প্রণাম করে মহারাজকে তিনি বললেন—"মহারাজ! আমি এসে গেছি, আর ভয় নেই!"

তাঁর কথা শুনে মহারাজ খুব হাসতে লাগলেন, অথচ তখনও জোরে রক্ত পড়ছিল। যেন মৃত্যুভয়কে উপহাস করে মৃত্যুঞ্জয়ী মহাপুরুষ সদানন্দে আছেন। শরীরের দিকে এতটুকু দৃকপাত নেই, তাই দেখে আমরা হতভম্ব হয়ে গেলাম। এত বড় বিপদের সময়ও কেমন হাসছেন!

তিনি বিদেহ অবস্থায় ছিলেন এবং জানতেন যে, তাঁর দেহ-ধারণ শ্রীঠাকুরের কাজের জন্যই এবং যতদিন সে প্রয়োজন সিদ্ধ না হবে ততদিন তাঁকে থাকতেই হবে, তাঁকে রাখবার মালিক শ্রীঠাকুর। শেষ অসুখের আগে বলতেন—"রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে?" ডাক্তার তাঁকে রাখার মালিক নন, তাই তিনি ডাক্তারের 'এসে গেছি আর ভয় নেই'—এ কথা শুনে হাসছিলেন।

* * *

পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের স্নেহ, ভালবাসা, শাসন, অভয় ও উপদেশ এখনো জীবন্তভাবে আমাদের জীবনে নানাভাবে প্রেরণা এনে দিচ্ছে। যখন তাঁর কথা মনে পড়ে এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করি তখন মনে হয় তিনি যেন কাছে থেকে সর্ববিষয়ে আমাদের রক্ষা করছেন। পিতা, মাতা, গুরু, ইষ্ট—একধারে সবই যেন তিনি। তাঁর সেই অতীতের স্মৃতি, অভয়দান, দর্শনে আনন্দলাভ, আবদার, অভিযোগ,

আশ্রয়-ভিক্ষা, সর্ববিষয়ে জিজ্ঞাসা ও উত্তর—এসব নিয়েই এখন জীবনপথে চলেছি! সবেতেই তিনি আমাদের জীবনতরীর কর্ণধার হয়ে পথের লক্ষ্যের ও বস্তুলাভের ইঙ্গিত করছেন খুবই জীবন্তভাবে।

যখন মঠে প্রতিদিন তাঁর শ্রীচরণে প্রণাম করতে যেতাম, মনে হতো যেন ঠাকুরের মন্দিরে যাচ্ছি। সত্যিই সাক্ষাৎ ঠাকুর তাঁর শরীর মন জুড়ে বিরাজ করতেন। এখনও সেসব স্মরণ করলে মনে হয় তিনি আমাদের, আমরাও তাঁরই অতি নিকটে নিরাপদে তাঁর অভয় পদাশ্রয়ে পড়ে আছি।

তাঁর কাছে যখন বসতাম তখন এমন সব ঈশ্বরীয় (ঠাকুরের, মায়ের, স্বামীজীর, রাজা মহারাজের) প্রসঙ্গ ও সাধন ভজন বা ঈশ্বরলাভ বিষয়ে উদ্দীপনাপূর্ণ আলোচনা হতো যে, সময়ের জ্ঞান থাকত না। অনেক সময় ভাণ্ডারি মহারাজ ডাকতে আসতেন, কিন্তু উঠতে ইচ্ছা হতো না।

ঠাকুরের অন্যান্য সন্তানদের কাছেও আমরা ঐভাবে আনন্দে কাটিয়েছি। তাঁদের সঙ্গ ছাড়তে ইচ্ছা হতো না। এখন তাঁদের স্মৃতিই সম্বল। এই সম্বল নিয়েই যেন জীবনের বাকি কটা দিন কেটে যায়।

ওঁ তৎ সৎ

গুরুদেবের পুণ্যস্মৃতিকথা

স্বামী অক্ষয়ানন্দ

১৯২০ সালের গোড়ারদিকে কোন সময়ে আমি বেলুড় মঠে যোগদান করি। পূর্বে আমি গভর্নমেণ্ট দাতব্য চিকিৎসালয়ে চাকরি করতাম। প্রথমেই পূজনীয় শরৎ মহারাজের আদেশে কাশী সেবাশ্রমে কর্মিরূপে চলে যাই এবং মিশনের ডাক্তারখানার কাজে নিযুক্ত হই। শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তান স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজের সঙ্গে রোজ বিকালে দেখা করতে যেতাম, তিনি খুব স্নেহ করতেন। তাঁর কাছে গিয়ে একদিন বললাম, "মহারাজ, আমায় দীক্ষা দিন।" তিনি খুব স্নেহের সঙ্গে বললেন, তুমি আমার কাছে বসে আমায় একটু পাখা কর।" একটু পরে বললেন, "তোমার দীক্ষা পরে হবে। এখন তুমি যে দেবতাকে ভালবাস তাঁর নামজপ ও ধ্যান কর এবং প্রত্যহ নিয়মিতভাবে করবে।" কি করে জপ করতে হয়, কিভাবে

ধ্যান করতে হয়, তা তিনি আমায় দেখিয়ে দিলেন। তাঁর কথামত আমি রোজ সেভাবে ধ্যান-জপ করতে লাগলাম। পাঁচ-সাত দিন অন্তর অন্তর তিনি আমায় জিজ্ঞেস করতেন, "কেমন লাগছে?" আমি বলতাম—"খুব ভাল।" তিনি আরও বললেন, "পাঁচশত জপ করছিলে, এখন আরও পাঁচশত বাড়িয়ে দাও।" আবার কিছুদিন পরে বললেন, "আরও এক হাজার বাড়িয়ে দাও।" এভাবে ত্রিশ হাজার পর্যন্ত জপ চলেছিল।

কাশীতে কয়েকমাস সেবাকার্যের পরে পূজনীয় শরৎ মহারাজের ব্যবস্থামত ও কাশী সেবাশ্রমের অধ্যক্ষের অনুমতিক্রমে আমি বিষয়াশয়ের একটা ব্যবস্থা করে দেবার জন্য দেশের দিকে রওনা হলাম। পথে গয়াধামে নেমে বাবা ও মার পিণ্ডদান করে আবার রওনা হলাম। বেলুড় স্টেশনে যখন গাড়ি এসে দাঁড়াল, তখন ভাবলাম বেলুড় মঠ খুব কাছে; পূর্বেই চন্দ্র মহারাজের কাছে শুনেছিলাম মহাপুরুষ মহারাজের কথা। কাজেই তাঁকে প্রণাম করে বাড়ি যাবার ইচ্ছা প্রবল হতে বেলুড় স্টেশনে নেমে মঠে যাই।

মহাপুরুষজীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে ঘরে ঢুকতেই তিনি যেন একটু বিরক্তির সুরেই বললেন, "কোত্থেকে এসেছ?" আমি বললাম, "কাশী থেকে আসছি।" তখন তিনি বললেন, "এটা কি হোটেল পেলে? এখানে এলেই হলো।" আমি বললাম, "মহারাজ, কাশীতে আপনার নাম শুনেছিলাম, বেলুড় স্টেশনে নেমে আপনাকে দর্শন করে বাড়ি চলে যাব। এই দেখুন আমার হাওড়া স্টেশনের রেলগাড়ির টিকিট। আমি থাকতে আসিনি।" তখন তিনি আমার দিকে তাকিয়ে খুব স্নেহের সঙ্গে বললেন, "আচ্ছা, তবে এখানেই থাক।" ওদিন রইলাম। পরদিন মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করে বললাম, "আমি বাড়ি যাচ্ছি।" তিনি বললেন, "কাল রাত্রে তোমার ঘুমটুম হয়েছিল? কোন কষ্ট হয়নি তো?" আমি বললাম, "না, মহারাজ, কোন কষ্ট হয়নি।" "আজ থাক।" সেদিন রইলাম। এভাবে তিন-চার দিন অতীত হবার পর তিনি বললেন, "তুমি আর কোথায় যাবে, এখানেই থেকে যাও। সে অবধি তাঁর কৃপায় ১০।১২ বছর মঠেই কেটে গিয়েছিল।...

দিন কয়েক মঠে থাকার পর দেখি যে, সাধুদের খুব আনন্দ ও কর্মব্যস্ততা। একজন সাধুকে জিজ্ঞেস করতে তিনি বললেন, "আগামী কাল স্বামীজীর তিথিপূজা। কাল আমাদের ব্রহ্মচর্য হবে।" আমি কিন্তু ব্রহ্মচর্য কাকে বলে জানতাম না। তবু একটা অজ্ঞাত ভাবে চালিত হয়ে সে মুহূর্তেই আমি মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে গিয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা জানালাম, "আপনি আমায় ব্রহ্মচর্য দেবেন?" তিনি বললেন, "রাজা মহারাজ এদের কয়েকজনকে কাল ব্রহ্মচর্য দেবেন। আমি তাঁকে

পলে দেব। তিনি তোমায়ও ব্রহ্মচর্য দেবেন। দুপুরবেলায় বলরাম-মন্দিরে মহারাজের কাছে অনুমতি নেবার জন্য এরা সকলে যাবে, তুমিও এদের সঙ্গে ওখানে যাবে এবং আমার নাম করে বলবে মহাপুরুষ মহারাজ বলেছেন আপনি আমাকেও ব্রহ্মচর্য দিন।" অন্যদের সঙ্গে বলরাম মন্দিরে গেলাম। মহারাজ সে সময় খাটের উপর বসে ছিলেন। এরা সকলে তাঁকে প্রণাম করল। আমিও প্রণাম করে বললাম, "মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে ব্রহ্মচর্য দেবার জন্য আপনার কাছে প্রার্থনা জানাতে বলেছেন।" তিনি বললেন—"সকাল থেকে আমার পেটটা খারাপ করেছে, আমি যেতে পারব না। মহাপুরুষ মহারাজই তোমাদের ব্রহ্মচর্য দেবেন।" মঠে এসে মহাপুরুষ মহারাজকে সব কথা জানাতে তিনি খুশি হয়ে বললেন, "ওরা সকলে উপোস থাকবে, তুমি ঠাকুরের প্রসাদ কিছু খেয়ে নিও। আর ওরা যেমন যেমন করবে তুমিও ওদের সঙ্গে সে রকম করবে।"

সেবারে আমাদের আটজনের ব্রহ্মচর্য হলো। তারপর মহাপুরুষজীর স্নেহ ও আদরে বেশ আনন্দে দিন কাটতে লাগল। পরে তিনি আমায় সাগর দ্বীপে মেলায় রিলিফের জন্য পাঠালেন। সেখান থেকে ফিরে এসে মহাপুরুষজীর অনুমতি নিয়ে আমায় পৈতৃক সম্পত্তি দাদাদের 'না-দাবী' লিখে দেবার জন্য আমাকে বাড়িতে যেতে হয়েছিল। বাড়িতে গিয়ে দু-দিন থাকার পর আমার ভীষণ জ্বর হয়। দু-দিন অজ্ঞান অবস্থায় ছিলাম। এলোপ্যাথিক ডাক্তার ডাকা হলো। পরে জ্ঞান হতে শুনলাম আমার ডবল নিউমোনিয়া হয়েছে, তার উপর তার পরদিন থেকে রক্ত আমাশয়—দুই-ই প্রবল আকার ধারণ করল। তেরোদিন চিকিৎসা করে ডাক্তার জবাব দিয়ে গেলেন। পরে একজন বড় কবিরাজকে দেখানো হলো। তিনি প্রায় ২৪ দিন চিকিৎসা করে বললেন, "আমার দ্বারা আর কিছু হবে না।" আমি সমস্ত বিষয় বিস্তারিত জানিয়ে মহাপুরুষজীকে একখানা পত্র লিখলাম। তার উত্তরে তিনি খুব আশীর্বাদ ও অভয়বাণী দিয়ে লিখলেন, "আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করছি তুমি নিশ্চয় ভাল হয়ে যাবে। আমি মেদিনীপুর আশ্রমে পত্র লিখে দিলুম, তুমি ওখানে গিয়ে থাকবে ও চিকিৎসা করাবে। ভাল হয়ে তারপর মঠে চলে আসবে।"

মেদিনীপুর সেবাশ্রমে প্রায় দু-মাস থেকে আরোগ্যলাভ করে বেলুড় মঠে ফিরে এলাম। মঠে কিছুদিন থাকার পর তিনি আমাকে বাঁকুড়া দুর্ভিক্ষ সেবাকার্যে পাঠালেন। সেখানে প্রায় আটমাস সেবাকার্য করে মঠে ফিরে আসি। পরে মহাপুরুষ মহারাজ ও শরৎ মহারাজ আমায় ডেকে বললেন, "কেশব, আমরা তোমায় বলছি তুমি মঠের ডাক্তারখানায় কাজ কর গিয়ে। এতে তোমার কল্যাণ হবে।" সে অবধি আমি ডাক্তারখানায় কাজ করতে থাকি।

তখনকার দিনে মঠে জলখাবার দেয়া হতো সিগারেট-কৌটায়—এক ডিবে মুড়ি বেলা আটটার সময়। কিন্তু আমি রোগীদের ছেড়ে তা খেতে আসতে পারতাম না। বেলা ১২টার সময় পঙ্গতে একেবারে খেতে যেতাম। এ কথা মহাপুরুষজী জানতে পেরে তাঁকে বাল্যভোগের যে দুটি প্রসাদী সন্দেশ দেয়া হতো, ভাঁড়ারিকে ডেকে তা থেকে একটি সন্দেশ রোজ আমাকে দিতে বললেন।

এভাবে কিছুদিন কেটে যায়। তারপর আমার ডবল নিউমোনিয়া ও হাঁপানি হয়। কলকাতা থেকে ডাক্তার এসে রোজ দেখে ঔষধ দিয়ে যেতেন। ক্রমশ রোগ প্রবল আকার ধারণ করে। রোগযন্ত্রণা ও হাঁপানিতে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছি। একদিন বিকালে ডাক্তার এসে বললেন, "এঁকে আর কোন ঔষধ দিয়ে ফল নেই, আজকের রাত্রি পেরুবে না।" এইভাবে ঘড়িতে ৮টা, ৯টা ও ১০টা যত পর পর বাজছে ততই মনে হচ্ছে ডাক্তার বলে গেলেন মৃত্যু হবে। কিন্তু এখনও তো মৃত্যু হচ্ছে না। পরেশ মহারাজ হ্যারিকেন জ্বেলে সারারাত বসে আছেন। শীতকাল, বাইরে খুব কুয়াশা। যখন রাত্রি তিনটা বাজল তখন যন্ত্রণায় খুব অধীর হয়ে পড়েছি এবং কাকুতি করছি এখনও মৃত্যু কেন হচ্ছে না। এমন সময় পরেশ মহারাজ বললেন, "কেশব, তুমি একটু একা থাকতে পারবে? আমি ততক্ষণে শৌচাদি সেরে আসছি।" পরেশ মহারাজ চলে যাবার পরে আমি বসে আছি। হঠাৎ ঘরের কপাট খুলে গেল এবং কেহ ডাকলেন, "কেশব"। দেখি মহাপুরুষজী নিজেই দাঁড়িয়ে। বললেন, "রাতটা তোমার খুব কষ্টে কেটেছে। ডাক্তার যে যা বলুক না কেন, আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেছি, তুমি ভাল হয়ে যাবে। তবে কি জান, বাবা, জন্ম-জন্মান্তরের কর্মফল তো ভুগতেই হবে। তাঁর কৃপায় ষোল-আনার জায়গায় চার-পয়সায় শেষ হয়ে গেল।" তখন তাঁর কথায় আমি বেশ সুস্থ বোধ করতে লাগলাম। আমি বললাম, "মহারাজ, বাইরে খুব কুয়াশা ও শীত, আপনার ঠাণ্ডা লেগে যাবে। আপনি চলে যান। আমি এখন বেশ ভাল বোধ করছি।" তিনি কপাটটি বন্ধ করে চলে গেলেন।

আশ্চর্য! তারপর হতে আমি ধীরে ধীরে ভাল হয়ে গেলাম এবং ডাক্তারখানায় কাজ করতে লাগলাম। তিনি পরেশ মহারাজকে বলে দিলেন, "আমার খরচ থেকে কেশবের জন্য দৈনিক ঘি ও দুধের ব্যবস্থা করবে।" আর আমায় বললেন, "আজ থেকে তুমি নিত্য নতুন হাঁড়িতে (মাটির) নিজে রেঁধে হবিষ্য করবে এবং রাত্রে ঠাকুরের প্রসাদী লুচি ও একপোয়া দুধ খাবে। আর বৈকালে তোমাকে কিছু ফল ও মিষ্টি দেবার জন্য ভাঁড়ারিকে বলে দেব।" এরূপে প্রায় এক বৎসরেরও বেশি চলল, হাঁপানি ভাল হলো, শরীরও ভাল হলো।

* * *

আমার ব্রহ্মচর্য আগে হয়ে গিয়েছিল। পূজনীয় রাজা মহারাজজীকে দীক্ষার কথা বলেছিলাম। তিনি বলেছিলেন যে, হবে। কিছুদিন পর তিনি একদিন বেলা প্রায় আটটার সময় গেস্টহাউস থেকে মঠের দিকে যাচ্ছিলেন। ডাক্তারখানার আমগাছের সামনে আমি তাঁকে প্রণাম করে দীক্ষার কথা জানাই। তিনি গঙ্গার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিলেন। একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। পরে আমায় বললেন, "তোমার দীক্ষা তারকদার কাছে হবে।" আমি বললাম—"আপনার কাছে দীক্ষা নেবার আমার ইচ্ছা।" তাতে তিনি বললেন, "তুমি কি আমাকে গুরু বলে স্বীকার কর?" "হাঁ করি।" তাতে তিনি বললেন, "গুরুবাক্য রক্ষা করছ না কেন? যাও, তারকদাকে বলো যে, মহারাজ বললেন—আপনি আমাকে দীক্ষা দিন।" মহাপুরুষ মহারাজজী তখন গেস্টহাউসে ছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, "মহারাজ আমাকে দীক্ষা দেবার জন্য আপনাকে বলতে বলেছেন।" তাতে তিনি বললেন, "মহারাজকে বলো, আমি তো কখনও কাউকে দীক্ষা দিইনি, তিনিই দিয়ে দেবেন।" পরে একটু থেমে বললেন, "তুমি এখন তোমার কাজ করগে, আমি মহারাজকে বলে দেব।" তার দিনকয়েক পরে একদিন সকালে গেস্টহাউসের নিচে শরৎ মহারাজ ও মহাপুরুষ মহারাজ বসে আছেন। আমি ওঁদের প্রণাম করতে গেলাম। প্রণাম করে দাঁড়াতে শরৎ মহারাজ মহাপুরুষ মহারাজকে বললেন, "আপনি ওকে দীক্ষা দিয়ে দিন না।" তাতে মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, "তুমিই দিয়ে দাও না।" তাঁরা পরস্পরে এভাবে বলাবলি করতে লাগলেন। তারপর মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে তামাক সাজতে বললেন। আমি বাইরে এসে তামাক সাজছি এমন সময় শুনতে পেলাম, মহাপুরুষ মহারাজ শরৎ মহারাজকে বলছেন, "ওর ইচ্ছা মহারাজের কাছে দীক্ষা নেয়।" শরৎ মহারাজ বলছেন, "ও তেমন ছেলে নয়।" তামাক সেজে নিয়ে ঘরের মধ্যে যেতেই শরৎ মহারাজ বললেন, "হাঁ হে কেশব, তুমি কার কাছে দীক্ষা নিতে ইচ্ছা কর।" আমি বললাম, "আপনারা তিনজনেই শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তান, আপনারা তিনজনেই আমার গুরু। যিনি দয়া করে কৃপা করবেন তাতেই আমার কল্যাণ হবে।" তাতে মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, "তুমি যাও তোমার কাজ করগে, তোমার দীক্ষা হয়ে যাবে।" আমি কাজে চলে গেলাম।...

(১৯২২ সালের গোড়ার দিকের ঘটনা) এর কিছুদিন পরে বিশেষ কাজের জন্য মহাপুরুষজীকে ঢাকায় যেতে হলো। তিনি মঠের ঘাটে নৌকায় বসে আছেন। আমাকে ডাকলেন, আমি নৌকায় যেতে তিনি আদর করে কাছে বসালেন এবং বললেন, "তুমি কিছু মনে কর না, তোমার দীক্ষা হয়ে যাবে। যেমন জপ-ধ্যান করছ সেভাবে করে যাও। আমি ঢাকা থেকে ফিরে আসি।" তাঁর আদর-ভালবাসাতে তখন আমার খুব আনন্দ হচ্ছিল। আমি প্রণাম করে চলে আসি। পরে খবর পেলাম

তিনি ঢাকাতে দীক্ষা দিতে আরম্ভ করেছেন। তা শুনে আমার খুব আনন্দ হয়েছিল। তারপর বলরাম-মন্দিরে মহারাজ অসুস্থ হলেন। মহাপুরুষ মহারাজ ঢাকা হতে চলে এলেন।...মহারাজের দেহত্যাগ হলো। ...মহাপুরুষ মহারাজ খুব শোক পেয়েছিলেন। সব সময় গম্ভীর হয়ে থাকতেন। এর কয়েক মাস পরে একদিন তিনি আমায় ডেকে বললেন, "কাল তোমার দীক্ষা হবে।" তিনি ঠাকুরঘরে নিয়ে গিয়ে আমায় দীক্ষাদান করেন।

* * *

প্রায় সাত-আট বছর একাদিক্রমে ডাক্তারখানায় কাজ করছি। ডাক্তারখানার কাজ আর ভাল না লাগায় তাঁর কাছে মনের অবস্থা জানাতে তিনি বললেন, "বেশ, তুমি আমার কাছে থাক।" সে অবধি তাঁর সেবায় রইলাম।

শেষের দিকে তিনি রাত্রে প্রায় ঘুমোতেন না—ধ্যানস্থ হয়ে থাকতেন। এক রাত্রে প্রায় একটার সময় বললেন, "অমুক শ্লোকটা বলতো।" আমি বললাম, "আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্‌বৎ। তদ্‌বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥" তিনি অতি সুন্দর করে মানে বুঝিয়ে দিলেন। "নদীসকলের জল সমুদ্রে পড়ে। কিন্তু সমুদ্রকে উদ্বেলিত করতে পারে না। দেখ, তেমনি আমাকেও কোনও কামনা-বাসনা একটুও উদ্বেলিত বা বিচলিত করতে পারে না। আমার কোনও কামনা-বাসনা নেই। মাইরি বলছি। আমার একটুও কামনা-বাসনা নেই—মা আমায় সব দিয়ে পূর্ণ করে দিয়েছেন। তাঁর অদেয় কিছুই নেই। আমার অপ্রাপ্যও কিছুই নেই।"...

আর একদিন রাত্রে আমায় বললেন, "যা নিশা... এই শ্লোকটি বলতো?" "যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী। যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥" আমি শ্লোকটি বলতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "এর মানে জানিস?" আমি বললাম, "না।" তখন বললেন, "যোগীরা রাত্রে একটুও ঘুমোয় না, দিনের বেলায় একটু বিশ্রাম করে। গৃহস্থরা দিনের বেলায় কাজকর্ম করে রাত্রে ঘুমোয়। মা আমাকে দয়া করে জানিয়ে দিয়েছেন আর ঘুম হবে না।" ইত্যাদি অনেক কথা নিজের সম্বন্ধে তখন বললেন।...

তাঁর একসময় খুব হাঁপানি হয়েছিল। তিনি দিন-রাত্র বসে কাটাচ্ছেন। গভীর রাত্রে আমায় বললেন, "আমাকে একটু শুইয়ে দিতে পারিস?" আমি আস্তে আস্তে শুইয়ে দিলাম এবং পাশে বসে রইলাম। একটু পরে দেখলাম, হাঁপানির টানের কোন শব্দ নেই। মাথাটি বালিশ থেকে গড়িয়ে পড়ল, সমস্ত শরীরটা যেন শিথিল

হয়ে গেল। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস একেবারে বন্ধ দেখে আমি ভেবে অস্থির। শরীর ছেড়ে চলে গেলেন নাকি? অথচ ভয়ে কাউকে ডাকতেও পারি না, চুপ করে বসে রইলাম। প্রায় একঘণ্টা পরে এই অবস্থা কাটে। তিনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে মাথা বালিশের উপর টেনে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাঁপও চলতে লাগল। আমাকে বললেন, "তাড়াতাড়ি আমাকে বসিয়ে দে।" তারপর বসে বলছেন, "দেখ, একটু জিরিয়ে নিলুম।" তিনি বলতেন যে, শরীরে যখন অসহ্য কষ্ট হয়, তখন মনকে সমাহিত করে দেই। তখন দেহের কষ্ট থাকে না—শরীরেরও একটু বিশ্রাম হয়।"...

একরাত্রে পাশের ঘরে সেবক শঙ্কর মহারাজ ঘুমোচ্ছেন। এমন সময় মহাপুরুষ মহারাজ খুব আবেগভরে আমায় বললেন, "দেখ, মা যদি দয়া করে ওকে না পাঠাতেন তো আমার কি যে অবস্থা হতো! মা ওকে উপযুক্ত শরীরটিও দিয়েছেন। গরমের সময় বড় হাত পাখা নিয়ে সারারাত একা পাখা করেছে। বারণ করলেও শুনত না—পাছে আমার কষ্ট হয়। রাত্রে নিচে খাটের কাছে বসে থাকত সারা রাত। আমি ডাকলুম—'একটু জল দাও তো, খাব।' অমনি উঠে জল দিল। আমার জল খাওয়ার পর গ্লাসটি টেবিলের উপর রেখে আবার ওখানে বসল। একবার ছাড়া দুবার ডাকতে হয় না।" এইভাবে—ঐ সেবককে—রাত্রে অনেকবার ডাকতেন। অন্য সময় বলেছিলেন ঐ সেবকের নাম করে, "ও এতকাল মার মতন আমার সেবা করছে। ও না হলে এ শরীর থাকত না।"...

* * *

শালকিয়ার একজন এটর্নি অনেকদিন ধরে মঠের মকদ্দমার কাজ চালাচ্ছিলেন। কাজকর্মের জন্য প্রায়ই মঠে আসতেন কিন্তু ঠাকুরঘরে যেতেন না, সাধুদের প্রণামও করতেন না। অথচ মঠের কাজকর্মের জন্য টাকাকড়িও নিতেন না।...কিন্তু পরে ভাগ্যবিপর্যয়ে তাঁর অনেক দেনা হয়ে গেল। বিষয়-সম্পত্তি সব নিলাম হয়ে গেল। বসতবাড়িটি ছিল, তাও নিলামে উঠবার আগের দিন তিনি মঠে এলেন। মন খুব খারাপ। মঠে এসে শ্রীমহাপুরুষজীর ঘরে ঢুকতেই তাঁকে দেখে তিনি বললেন, "কি গো, কেমন আছ? তোমায় এমন দেখাচ্ছে কেন?" ভদ্রলোক বললেন, "আমরা সংসারী লোক, প্রায়ই আমাদের বিপদ-আপদ লেগে আছে।" মহাপুরুষজী বললেন, "কি হয়েছে সব খুলে বল।" তিনি সব বললেন—"দেনার দায়ে সবই বিক্রি হয়ে গিয়েছে। বাকি আছে বসতবাটি। আগামী কাল তাও নিলাম হয়ে যাবে; বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে কোন সাহায্যই পাচ্ছিনে।" মহাপুরুষজী খুব দুঃখ করে বললেন—"তাহলে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে তুমি কোথায় যাবে? কত টাকায় নিলাম হবে?" তিনি বললেন—চার হাজার টাকায়।" তা শুনে মহাপুরুষজী খুবই আবেগভরে

বললেন—"এই টাকা নিয়ে যাও, বাড়ি খালাস করে নিও।" এটর্নি বললেন—"আমি আপনার টাকা কি করে শোধ করব?" খুব স্নেহের সঙ্গে তিনি বললেন, "তুমি যে আমার খুব আপনার জন, তার জন্য ভাবছ কেন?" তিনি টাকা নিয়ে নামতে নামতে বলতে লাগলেন—"বন্ধুবান্ধব কেউ কারো নয়। এতদিনে বুঝলুম এই একজনই আমার আপনার—আর আমার কেউ নেই।"...কিছুকাল পরেই ঐ এটর্নি মহাপুরুষজীকে ঐ টাকা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

* * *

আর একদিনের একটি ঘটনা মনে পড়ে। একজন ভক্তের মেয়ের বিয়ে হয়েছিল। পূজার আগে সে ভক্ত মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করল, নানা কথা হওয়ার পরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—"তোমার মেয়ে কেমন আছে?" "ভাল আছে। নতুন গেছে।" মহাপুরুষ মহারাজ বললেন—"পূজা আসছে, 'তত্ত্ব' পাঠাবে তো?" সে ভক্তটি বললে, "এ বছর তত্ত্ব পাঠাতে পারব না। আমার চাকরিও নেই।" তিনি বললেন, "সে কি গো—নতুন শ্বশুরবাড়ি গিয়েছে, তত্ত্ব না পাঠালে লোকে কি বলবে? শ্বশুরবাড়িতে মেয়েকে গঞ্জনা শুনতে হবে।" ভক্তটি বলল, 'টাকার সংস্থান তো নেই।" তাতে মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন, "খুব কমপক্ষে কত টাকা হলে তত্ত্ব পাঠানো চলবে? সে বললে, "যত কমই হোক না কেন, ষাট টাকা কমের পক্ষে দরকার।" মহারাজ বললেন, "ষাট টাকা নিয়ে যাও, তত্ত্বটি পাঠিয়ে দিও।" সে বললে, "আপনার টাকা কেমন করে নেব?" তিনি বললেন, "সে কি গো, তোমরা যে সব ঠাকুরের ভক্ত—আমাদের আপনার লোক।" ভক্তটি আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় কাঁদতে লাগল।...

একদিন রাত্রে অসুখে তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছিল। আমাকে বললেন, "দেখ, কত দূর দূর থেকে লোকজন দীক্ষা নিতে আসে। তাদের দুঃখ-কষ্ট দেখে মন্ত্র দিতে হয়, আর এ শরীরে সেসব পাপতাপ ভুগতে হচ্ছে; তাই এত কষ্ট। আবার এক একজন লোক আসে—তাদের মন্ত্র দিয়ে মনে বেশ আনন্দ হয়, তারা সব পবিত্র। —কে সেদিন দীক্ষা দিতে হলো, মন্ত্র বলবামাত্র তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।"

আর একদিন রাত্রে বললেন, "আজকে বলাঙ্গীরের রানী এসেছিল। একটা খুব কথা বলে গেল। কি বললে জানিস? যাওয়ার সময় সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে আমার পায়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'মহারাজ, আপনার তো আমার মতো অনেক আছে। কিন্তু আমার আপনার বলতে এক আপনি ছাড়া আর কেউ নেই।' এটা বড় মস্ত কথা রে! ব্রজগোপীদের ভাব শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ। শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে একথা বলেছিলেন।"

* * *

একটি বুড়ো জেলে নৌকা নিয়ে মঠের ঘাটে জাল ফেলত। তাকে মহাপুরুষজী অনেক সাহায্য করতেন। এক সময় কয়েকদিন সে নৌকা নিয়ে ঘাটে আসেনি। তাই তিনি আমাকে বললেন, "আহা! বুড়ো মানুষ! কি হলো, তুই গিয়ে তাঁর একটু খোঁজ নিয়ে আসিস।" আমি বললাম—"তার বাড়ি কোথায়?" তিনি বললেন, "বালিতেই তার বাড়ি, সেখানে খোঁজ নিলেই পাবে।" আমি তার পরদিন জেলেপাড়ায় গেলাম। তার খোঁজ নিতে প্রথমে তার বোনের সঙ্গে দেখা হলো। সে কেঁদে কেঁদে বললে, "দাদা মারা গিয়েছে, দুটি দুটি মাছ ধরে আনতো। আমি সেগুলি বেচতে যেতুম, তার বউ বাইরে যেতো না। মাছ বিক্রি করে অল্প যা হতো, তাতেই দুজনের কোন রকমে চলে যেত। বৌটা দিবারাত্র কাঁদছে। কি করে চলবে!" আমি মঠে ফিরে এসে সব কথা মহাপুরুষজীকে বললাম। তিনি আমাকে কয়েকটা টাকা দিয়ে বললেন, "তুই এখনই তাকে দিয়ে আয়। আর জিজ্ঞেস করে আসবি তার শ্রাদ্ধ কবে হবে।" মাঝে মাঝে তার বাড়িতে আমাকে টাকা দিয়ে আসতে হতো। শ্রাদ্ধের আগের দিন কয়েকখানি কাপড় ও কিছু টাকা আমাকে দিয়ে বললেন, "তাকে দিয়ে আসবি এবং বলে আসবি বুড়োর শ্রাদ্ধটি যেন ভাল করে করে।" সে অবধি মাঝে মাঝে আমাকে তাদের টাকা দিয়ে আসতে হতো।...

একদিন অনেক রাত্রে দুজনেই বসে আছি। আর কেউ নেই। সবুজ ইলেকট্রিক লাইটের আলোতে অল্প অল্প দেখা যায়। একটা সাদা বেড়াল দক্ষিণ দিকের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকলো। উনি বিড়ালকে নমস্কার করতে লাগলেন। বেড়ালটি মিউ মিউ করে ঘরের ভিতর দিয়ে উত্তরের দরজা দিয়ে ছাতে চলে গেল। তিনি কেবল তাকে প্রণামই করছিলেন। আমি ভাবছি, এ আবার কি হলো! একটু পরে তিনি আমাকে বলেছেন, "দেখ কেশব, ঠাকুর এমন একটা অবস্থায় আমাকে রেখেছেন—সব চৈতন্যময় দেখছি, চৈতন্য ছাড়া আর কিছুই নেই। (আমার গায়ে হাত দিয়ে বলছেন) তুই চৈতন্য, খাট চৈতন্য, বিছানা চৈতন্য ও দেয়াল সবই চৈতন্যময়। আমি নিজেকে কিছুতেই চাপতে পারছি না। ছেলেরা যখন ঘরে আসে, আমি আগে থাকতেই তাদের প্রণাম করি। তাতে তাদের মনে কষ্ট হয় বুঝতে পারি, কিন্তু কি করি, তিনি আমায় এখন এভাবেই রেখেছেন।"...

মহাপুরুষ মহারাজ সকলকে খাওয়াতে ভালবাসতেন। বিশেষ করে আমাদের বাইরের আশ্রম থেকে কোন সাধু এলেই তিনি তাঁকে ভাল করে খাওয়াতেন। একদিন সকালে আমাকে বলছেন, "এলাহাবাদ থেকে হরিপ্রসন্ন (বিজ্ঞানানন্দ) মহারাজ এসেছে। দেখ, ও খুব মাছ খেতে ভালবাসে। তুমি বাজার থেকে বড় ১৬। ১৭ সেরের রুই মাছের একসের মতো পেটি কেটে নিয়ে আসবে।" আবার একটু

পরে বললেন, "এক সের বড় গলদা চিংড়িও আনবে।" আবার খানিকক্ষণ চুপ থেকে বললেন—"যশোহরের বড় কইমাছও এক সের আনবে।"

আর একদিন সকালবেলা আমাকে বললেন, "জিতেন (স্বামী বিশুদ্ধানন্দ) রাঁচী থেকে এসেছে, ও সন্দেশ খেতে খুব ভালবাসে—কলকাতার ভীমনাগের খুব ভাল সন্দেশ নিয়ে আসবে।" এ রকম কে কখন কোথা থেকে আসতেন ও যেতেন, কে কোন জিনিস ভালবাসেন, সেসব তিনি খেয়াল রাখতেন। বেলুড় মঠে ট্রাস্টী মিটিং-এর দিন প্রবীণ সাধুরা অনেকে মঠে আসতেন। তিনি তাঁদের জন্য বিশেষ খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করতেন। আর সকলে আনন্দ করে খাচ্ছেন দেখে তিনি আনন্দ করতেন।...

তাঁর শেষ অসুখের সময় যখন তিনি কথা বলতে পারতেন না, পূজনীয় নির্মল মহারাজ আমাকে একদিন ডেকে বললেন, "তোমাকে বিশেষ কাজে মাদ্রাজ যেতে হবে। তুমি মহাপুরুষজীকে প্রণাম করে আজই মাদ্রাজ রওনা হয়ে যাও।" তখন আমার মনে কি দারুণ দুঃখ যে হয়েছিল, তা প্রকাশ করার নয়। তাঁর এই অবস্থায় তাঁকে ছেড়ে দূরে মাদ্রাজে যেতে আমার একেবারে ইচ্ছা হচ্ছিল না। আমি কাঁদতে কাঁদতে মহাপুরুষজীর চরণস্পর্শ করে মাদ্রাজ চলে গেলাম। মাদ্রাজে কয়েকমাস থাকার পর একদিন শেষ রাত্রে তন্দ্রাবস্থায় দেখলাম মহাপুরুষ মহারাজ আমার মশারি তুলে বিছানায় বসে আমায় খুব দুঃখের সঙ্গে বললেন, "কেশব, আমি বড় কষ্টভোগ করছি। আমাকে যেতে দে, আমি চলে যাই।" তাঁর এই দুঃখ দেখে আমিও কাঁদতে কাঁদতে বললাম, "হাঁ মহারাজ, আপনি যান।" পরে সকাল হতে উঠে কেবলই ভাবছি—কি ব্যাপার, এ কি দেখলাম! তারপরে খবর এলো ঐদিন বিকালে তিনি শরীর ত্যাগ করেছেন। এ সংবাদে মনে খুব কষ্ট হয়েছিল। পরে ভেবে দেখলাম, তাঁর অমন কষ্টভোগের চেয়ে দেহ ছেড়ে চলে যাওয়া ভাল হয়েছে। এরপর আমার মনে আর কোন কষ্ট হয়নি।

॥ শুভম্ ॥

স্বামী শিবানন্দ মহারাজের স্মৃতিকথা*

স্বামী অসঙ্গানন্দ

বাল্যকাল থেকেই আমার স্বাভাবিক ধর্মভাব ছিল। এই ধর্মভাবের প্রেরণাতেই আমি ধর্মপুস্তক-পাঠ, প্রবীণ ধর্মপ্রাণ-ব্যক্তিদের সন্ধান এবং দেবদেবীর মন্দিরাদি দর্শন করতাম। এইভাবে বেলুড় মঠে মহাপুরুষ মহারাজকে প্রথম দর্শন করে হৃদয়ের অন্তস্তলে অনুভব করলাম যে, মহাপুরুষজী এ জগতের লোক নন, ইনি নরদেহধারী দেবতা। যাঁরা মহাপুরুষ মহারাজের পদতলে বসে তাঁর আত্মোন্নতি-বিধায়ক উপদেশ শুনেছেন, তাঁদের কাছে ছিল তাঁর উপস্থিতি মহান আশীর্বাদস্বরূপ। আমরা প্রায়ই মঠে গিয়ে মহাপুরুষজীকে দর্শন করতাম এবং তাঁর অমৃতবাণী অন্তরভরে নিয়ে আসতাম। তাঁর ঐ সকল উপদেশ আমাদের কাছে চিরদিন অমূল্য সম্পদ হয়ে রয়েছে। মহাপুরুষজী ছিলেন আধ্যাত্মিক-শক্তিসম্পন্ন এক বিরাট পুরুষ। তিনি শিষ্যদের ভিতর ও বাহির দুই-ই দেখতে পেতেন এবং তাঁরা যে যেমন গ্রহণ করতে পারতেন, সেভাবেই তাঁদের উপদেশ ও নির্দেশ দিতেন। একবার একজন যুবক-ভক্ত এসে মঠে যোগদান করবার অনুমতি চাইল। পূজ্যপাদ মহাপুরুষজী তাকে বললেন, "মন্দিরে যাও এবং ঘন ঘন মঠে এসো। যদি ঠাকুর কৃপা করে তোমাকে তাঁর সঙ্ঘে গ্রহণ করেন, তবেই তুমি যোগদান করতে পারবে!" মহাপুরুষজী জানতেন যে যুবক ভক্তটি সঙ্ঘের নিয়মকানুন ঠিক ঠিক মেনে চলতে পারবে না। যুবকটি কিন্তু মঠে আর আসেনি। আবার কেউ যদি ঠিক ঠিক ত্যাগ ও বৈরাগ্যের ভাব নিয়ে সঙ্ঘে যোগদান করতে আসত, তিনি তাকে উপযোগী উপদেশ দিয়ে যথাসময়ে সঙ্ঘে যোগদান করার অনুমতি দিতেন।...

একবার ভবানীপুর (কলকাতা) গদাধর-আশ্রমে মহাপুরুষজী কয়েক দিন অবস্থান করেন। দক্ষিণ-কলকাতার অনেক ভক্ত তাঁকে দর্শন করবার জন্য আশ্রমে যেতেন। কতিপয় বন্ধুর সঙ্গে আমিও তিন-চার দিন সন্ধ্যায় গদাধর আশ্রমে গিয়ে তাঁকে দর্শন করেছি এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও ধর্মাচরণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মনোজ্ঞ কথা শুনেছি। তিনি অনেক সময় বলতেন, "যদি কেউ নিজ জীবনে ঠাকুর

---

* মূল ইংরাজি থেকে অনূদিত।

শ্রীরামকৃষ্ণের একটি উপদেশও ঠিক ঠিক ভাবে পালন করতে পারে, তা হলে সে বুঝতে পারবে যে, তার জীবনের ব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে এবং তার নিজের ও পরিবারবর্গের কল্যাণের সীমা থাকবে না।"...

একবার দক্ষিণ-কলকাতায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বার্ষিক জন্মোৎসবে আমি ও আমার কয়েকজন বন্ধু ও সহকর্মী যোগদান করি। মহাপুরুষ মহারাজও সে উৎসবে উপস্থিত হন। তিনি যখন মঠে রওনা হওয়ার উদ্যোগ করছিলেন, সে সময় গাড়ি থেকে আমার দিকে অতিশয় স্নেহদৃষ্টিতে চেয়ে কয়েকটি কথা বললেন। তাতে মহাপুরুষজীর সঙ্গী জনৈক প্রবীণ সাধু আমাকে বলেন, "সাবধান, মহাপুরুষ মহারাজ যখন তোমার দিকে কৃপাদৃষ্টি করেছেন, তখন তোমাকে শীঘ্রই ঘর-বাড়ি ছেড়ে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করতে হবে।" এই প্রবীণ সাধুর কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল। সে সময় আমি মানসিক অশান্তিতে কাল কাটাচ্ছিলাম এবং ত্যাগের জীবন অবলম্বন করবার বিষয় গভীরভাবে ভাবছিলাম। এর পরেই একদিন আমি মঠে আসি এবং ঠাকুরের বিশেষ পূজানুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছে পথনির্দেশের জন্য ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা জানাই। বলা বাহুল্য, পক্ষকালের মধ্যে অবস্থার পরিবর্তন হলো। আমি চিরদিনের মতো ঘরবাড়ি ত্যাগ করে গয়া কাশী হরিদ্বার ও কনখল হয়ে উত্তরাখণ্ডে (হৃষীকেশ) চলে গেলাম। কিছুদিন তপস্যায় কাটাবার পর হঠাৎ জল-বসন্তে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসার জন্য কনখল সেবাশ্রমের কর্মসচিব স্বামী কল্যাণানন্দজীর শরণাপন্ন হতে হলো এবং আরোগ্য লাভ করে কনখল সেবাশ্রমে কর্মিরূপে যোগদান করলাম।

কনখল সেবাশ্রমে থাকাকালে আমি পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের কাছে চিঠি লিখতাম। সন্ন্যাস নেবার ইচ্ছা মনে জাগতেই আমি তাঁর কাছে সন্ন্যাস প্রার্থনা করে চিঠি লিখলাম। তিনি কৃপা করে সন্ন্যাস দিতে রাজি হন এবং কাশীধামে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য আমাকে লেখেন। মহাপুরুষজী মাঘী পূর্ণিমা দিবসে কাশী অদ্বৈত-আশ্রমে স্বামী অদ্ভুতানন্দ স্মৃতি-ভবন উৎসর্গ করবার জন্য শুভাগমন করেছেন সংবাদ পেয়ে স্বামী কল্যাণানন্দজীর অনুমতি ও চিঠিসহ আমি কাশীধামে পৌঁছলাম। মহাপুরুষজী ১৯২৩ খ্রিঃ ১৩ জানুয়ারি অপরাহ্ণে সদলবলে কাশী অদ্বৈত-আশ্রমে শুভ পদার্পণ করেন। বিকালে যখন আমি মহাপুরুষজীর সঙ্গে দেখা করতে যাই তখন মহারাজ আমাকে বললেন, "কল্যাণানন্দ তোমার সন্ন্যাস সম্বন্ধে আমাকে লিখেছে, আর কনখলে একবার যাবার জন্যও নিমন্ত্রণ জানিয়েছে।" ১৯২৩ খ্রিঃ ৩১ জানুয়ারি প্রভাতে সুরেশ মহারাজ (স্বামী শাশ্বতানন্দ) নলিনী ডাক্তার (স্বামী অদ্বয়ানন্দ) ও আমার—এই তিনজনের ব্রহ্মচর্য এবং ১ ফেব্রুয়ারি ঊষাকালে সন্ন্যাস

হয়ে গেল। মহাপুরুষ মহারাজ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষপদে প্রতিষ্ঠিত হবার পর শিবপুরী বারাণসীতে এই প্রথম ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাসদীক্ষা প্রদান করেন।...

স্বামী কল্যাণানন্দজীর সাদর আহ্বানে চার-পাঁচ দিন পরে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ দেরাদুন এক্সপ্রেসে কনখল রওনা হন। স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ, স্বামী অপূর্বানন্দ ও আমি মহারাজের সঙ্গী হলাম। পরদিন প্রাতে হরিদ্বার স্টেশনে পৌঁছতে স্বামী কল্যাণানন্দজী ও স্বামী নিশ্চয়ানন্দজী মহাপুরুষ মহারাজকে সাদর সংবর্ধনাসহ সেবাশ্রমে নিয়ে গেলেন। সেবাশ্রমের সাধু ও ব্রহ্মচারীদের জীবনে সে দিনটি পরমানন্দ ও উৎসবের দিন বলে পরিগণিত হলো। রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের যেসব সাধু হৃষীকেশ ও নিকটবর্তী স্থানসমূহে তপস্যা করছিলেন এবং যাঁদের পূর্বেই মহাপুরুষজীর শুভাগমন-সংবাদ জানানো হয়েছিল, তাঁরা সকলেই মহারাজের দর্শন ও আশীর্বাদ-লাভের জন্য সেবাশ্রমে উপস্থিত হলেন। অন্যান্য সম্প্রদায়ের কতিপয় সন্ন্যাসীও মহাপুরুষজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও ধর্মপ্রসঙ্গ করেন। কনখলে মহাপুরুষজী স্বভাবত গভীর ধ্যান ও অন্তর্মুখী ভাবে থাকতেন। কিন্তু যখন তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছু বলতেন, তখন তাঁর মধ্যে ভাবান্তর লক্ষ্য করেছি, তখন তিনি যেন আর এক মানুষ। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের কথা গভীর ভাব ও অনুরাগের সঙ্গে বলতেন।

একদিন প্রাতে ৯টা নাগাদ মহাপুরুষজী পূর্বদিকে মুখ করে চেয়ারে বসে আছেন। জীবন মহারাজ ও আমি তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ তুলতেই মহাপুরুষজী ভাবে অভিভূত হয়ে বলছেন, "ঠাকুর একদিন তাঁর কতিপয় অন্তরঙ্গ শিষ্য ও ভক্তদের বলেন, 'রাম (রামচন্দ্র দত্ত) একে অবতার বলে প্রচার করে কি আর এমন করেছে? এই তো সবে সন্ধ্যা হলো। সামনে সারারাত রয়েছে। রাতভর অনেক নাটকের অভিনয় হবে।' এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ঠাকুর এবার ছদ্মবেশে পৃথিবীতে এসেছেন। মাত্র কয়েক জনের কাছে তিনি তাঁর ঐশ্বরিক স্বরূপ প্রকাশ করেছেন। কালে অনেকেই তাঁর ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে জানতে পারবে এবং তখনই তাদের জীবন ধন্য হয়ে যাবে। ঠাকুর শুধু বঙ্গদেশ বা ভারতের জন্য আসেন নি, সমগ্র জগতের কল্যাণের জন্য এসেছেন। ইতোমধ্যেই সব লক্ষণ দেখছি এবং যতই দিন, মাস, বৎসর চলে যাচ্ছে, ঠাকুরের মহত্ত্ব ও মহিমা মানবজাতি উপলব্ধি করছে। ঠাকুর জীবোদ্ধারের জন্য আবির্ভূত হয়েছেন, কালে সারা পৃথিবী শাশ্বত আনন্দ ও শ্রেয়লাভের স্থান হয়ে দাঁড়াবে।"

আমরা তাঁর উদ্দীপনাময়ী বাণী গভীর মনোনিবেশ ও শ্রদ্ধার সহিত শুনছিলাম। তিনি এই বাণী উচ্চারণ করেন ১৯২৩ খ্রিঃ ফেব্রুয়ারি মাসে, আর এখন ১৯৬৭

খ্রিস্টাব্দ। ৪৪ বৎসরের অধিককাল অতিক্রান্ত হলো এবং এ দীর্ঘকালের মধ্যে পৃথিবীতে অনেক আশ্চর্য পরিবর্তন দেখেছি। যুদ্ধ-বিগ্রহ ও দ্বন্দ্বের মধ্যে আমরা শান্তি, মিলন ও প্রেমের বাণী শুনেছি। পৃথিবীতে লোক কি অবতারবরিষ্ঠ ও ঋষিদের শান্তি, আনন্দ ও আশার বার্তা শ্রবণ এবং পালন করবে না? পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নরনারীর হৃদয় স্পর্শ করেছে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী। শ্রীরামকৃষ্ণের দুর্নিবার আকর্ষণী শক্তির প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে চারদিকে। কনখলে একসপ্তাহ অবস্থানের পর মহাপুরুষজী কাশীতে ফিরে আসেন।...

১৯২৫ খ্রিঃ আমি কনখল ছেড়ে তপস্যার জন্য স্বর্গাশ্রম ও হৃষীকেশে যাই। কিন্তু স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় কাশী চলে আসতে বাধ্য হই এবং সেখানে মাধুকরী-বৃত্তি অবলম্বন করে ১৯২৬ খ্রিঃ প্রথম ভাগ পর্যন্ত শাস্ত্রপাঠ ও ধ্যান-ধারণায় কাল কাটাই।...

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম সম্মেলন (convention) হয় বেলুড় মঠে ১৯২৬ খ্রিঃ এপ্রিল মাসে (১ এপ্রিল হতে ৭ এপ্রিল পর্যন্ত)। এই ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে যোগদান করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সম্মেলন শেষ হলে আমি পিতামাতার সঙ্গে দেখা করবার জন্য কলকাতা যাই। কাশীতে ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম, এমন সময় প্রভাস মহারাজ (স্বামী দেবেশানন্দ) আমার পূর্বাশ্রমের বাড়িতে এসে আমাকে বললেন, "তোমাকে মঠে ডেকে নেবার জন্য পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে পাঠিয়েছেন। তোমাকে মাদ্রাজ মঠে যেতে হবে।" আমি কাশীতে না গিয়ে মঠে চলে গেলাম এবং মহাপুরুষজীর ঘরে গিয়ে তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতেই তিনি আমাকে বললেন, "আমি তোমাকে মাদ্রাজ যেতে বলছি। সেখানে গেলে তোমার বিশেষ কল্যাণ হবে; তোমার ভেতরটা খুলে যাবে, ভেতরটা খুলে যাবে।" তারপর তিনি আবার আমাকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, "যদি তুমি মাদ্রাজ না গিয়ে কাশীতে ফিরে যাও, টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।" সুতরাং মহাপুরুষজীর দিব্য-আদেশ মেনে নেয়া ছাড়া আমার নিজস্ব কোন মতামত রইল না। ১৯২৬ খ্রিঃ ২৭ এপ্রিল, মঙ্গলবার স্বামী ঘনানন্দ, ব্রহ্মচারী মুথু (স্বামী রুদ্রানন্দ) ও আমি ভুবনেশ্বর ও পুরী হয়ে মাদ্রাজ পৌঁছই।...

পনেরো দিন পরে ১৯২৬ খ্রিঃ মে মাসে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ, স্বামী শর্বানন্দজী, স্বামী যতীশ্বরানন্দজী ও আরও অন্যান্য সাধুসহ মাদ্রাজে পৌঁছান। মহাপুরুষজী পথে তিন-চার দিন ভিজাগাপট্টম্ (ওয়াল্টেয়ার)-এ বিশ্রাম করেন। মাদ্রাজ মঠের সাধু-ব্রহ্মচারিগণ ও স্থানীয় ভক্ত ও শিষ্যেরা মহাপুরুষজীর পূতসঙ্গে পরম আনন্দ অনুভব করেন। আমরা সকলেই তার পদতলে বসে ঈশ্বরীয় কথা

এবং ঠাকুর, স্বামীজী ও মায়ের প্রসঙ্গ শুনতাম। একদিন মুথু মহারাজ (স্বামী ...দ্রানন্দ) মহাপুরুষজীকে জিজ্ঞেস করেন, "মহারাজ, আমরা পুস্তকে পড়েছি—স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ ও আপনি বুদ্ধগয়ায় গিয়ে বোধিবৃক্ষের নিচে ধ্যান করছিলেন। ধ্যান করতে করতে স্বামীজী (বিবেকানন্দ) হঠাৎ আপনাকে জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠলেন—'মহাপুরুষ, মহাপুরুষ' এ কি সত্য যে, ঐ দিন থেকেই আপনার 'মহাপুরুষ' নাম হয়?" উত্তরে মহাপুরুষজী বললেন, "গুরুমহারাজ (ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ) আমাকে একটি মন্ত্র দিয়েছিলেন, আমি ঐ মন্ত্রে শীঘ্রই সিদ্ধিলাভ করি। কয়েকজন গুরুভাই যখন আমার এই সিদ্ধিলাভের কথা আলোচনা করছিলেন, তখন স্বামীজী (বিবেকানন্দ) বলে উঠেন, 'তোমরা কি জান না তারকদা একজন মহাপুরুষ'? তাঁর পক্ষে অসাধারণ কিছুই নয়।"...

মাদ্রাজ মঠে কয়েকজন সাধুকে মহাপুরুষ মহারাজ সন্ন্যাস-দীক্ষা দেন। সেখানে কয়েক দিন অবস্থানের পর তিনি উতকামণ্ডে রওনা হন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্বামী শর্বানন্দজী ও স্বামী যতীশ্বরানন্দজী প্রভৃতি। উতকামণ্ডের শীতল ও মনোরম আবহাওয়ায় মহাপুরুষজী বেশ সুস্থ শরীরে কয়েক সপ্তাহ অতিবাহিত করেন। এখানে তিনি একটি নূতন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং শিবরাম মহারাজ (স্বামী অবিনাশানন্দ) ও চিন্নু মহারাজ (স্বামী চিদ্‌ভবানন্দ)-কে সন্ন্যাস-দীক্ষা প্রদান করেন। পরে মহাপুরুষজী ব্যাঙ্গালোর হয়ে মাদ্রাজে প্রত্যাবর্তন করেন এবং মাদ্রাজ মঠে আরও কয়েক দিন অবস্থান করেন। তারপর তিনি বোম্বাই রওনা হন। তাঁর সঙ্গী ছিলেন স্বামী যতীশ্বরানন্দজী ও কয়েকজন সাধু। মহাপুরুষজী মাদ্রাজ থেকে চলে গেলে মাদ্রাজ মঠের সাধু-ব্রহ্মচারিগণ খুবই বিষণ্ণ বোধ করেন। মাদ্রাজ মঠের পাচকও মহাপুরুষজীর কাছে মন্ত্রদীক্ষা পায়। মহাপুরুষজী চলে যেতে পাচক অত্যন্ত বিচলিত হয়ে অনেক পরে তার গুরুদেবের কাছে একখানা পত্র দেয়। পত্রখানার উত্তরে মহাপুরুষজী লিখেছিলেন ঃ "তোমার পত্র পাইয়া ও তুমি কুশলে আছ সংবাদ পাইয়া অতিশয় সুখী হইলাম। তুমি মঠে থাকিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের ও সাধুদের সেবা করিতেছ, ইহাতে আমি খুবই আনন্দিত—উহাতেই তোমার ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সবই লাভ হইবে জানিবে। যার যেমন অবস্থা, ঠাকুর তাঁকে দিয়া সেইরূপ কাজ ও নিজের সেবা করাইয়া মুক্তি দেন জানিবে। তুমি তাঁর উপর বিশ্বাস রাখিয়া তাঁর সেবা করিয়া যাও—কোনই চিন্তা করিতে হইবে না। তিনি তোমার কল্যাণ নিশ্চয়ই করিবেন জানিবে। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবে।" একজন পাচক-শিষ্যের কাছে লিখিত মহাপুরুষজীর এই উপদেশপূর্ণ সুন্দর পত্রখানি সকল শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তের হৃদয়েই আশা ও সান্ত্বনা সঞ্চার করবে।

১৯৩০ খ্রিঃ মে মাসে আমি মাদ্রাজ হতে একবার বেলুড় মঠে আসি। মঠে প্রতিদিন মহাপুরুষজীকে দর্শন ও প্রণাম করতাম এবং তাঁর সান্নিধ্যে বসে ঈশ্বরীয় কথা শুনতাম। একদিন বিকেলে একান্তে মহাপুরুষজীর কাছে আমার ব্যক্তিগত ধর্মজীবন সম্বন্ধে কথাবার্তা বলি এবং এ জীবনেই যাতে শ্রীভগবানকে দর্শন করতে পারি, সেজন্য তাঁর আশীর্বাদ ভিক্ষা করি। মহাপুরুষজী আমাকে আশীর্বাদ করে বললেন, "ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সন্তানদের দেখছেন এবং যথাসময়ে তাঁর নিকট নিয়ে তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমার পূর্ণ ও অশেষ আশীর্বাদ জেনো।" মহাপুরুষজীর এ সকল স্নেহমাখা উৎসাহপূর্ণ সদয়বাণী শুনে আমি এত অধিক আনন্দ, আশা ও সাহস পেলাম যে, যখন কয়েকজন সাধু আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আমি মাদ্রাজ মঠে ফিরে না গিয়ে কাশী চলে যাব কিনা, তখন তাঁদের স্পষ্টই বললাম, "কাশী যাবার কোন ইচ্ছাই বোধ করছি না, কারণ আমি এখানে মহাপুরুষজীর মধ্যেই শিবকে দর্শন করেছি।" বেলুড় মঠে কয়েকদিন থেকে জুলাই মাসে মাদ্রাজ ফিরে যাই।

মাদ্রাজ মঠে আমি প্রায় সাড়ে ছয় বৎসর বেশ আনন্দেই ছিলাম। স্বামী যতীশ্বরানন্দজী তখন মাদ্রাজ মঠের অধ্যক্ষ। অন্য কোন মঠ-মিশন-কেন্দ্রে যাবার আমার কোন ইচ্ছা ছিল না। স্বামী ঘনানন্দজী কলম্বো আশ্রম হতে বেলুড় মঠে ফিরে এসেছেন এবং তাঁর স্থলে সিংহলের কাজকর্মের ভার গ্রহণ করবার জন্য মঠকর্তৃপক্ষ আমার নাম প্রস্তাব করেন। আমি কর্তৃপক্ষের আদেশ পালন করলাম। ১৯৩২ খ্রিঃ ১৬ অক্টোবর কলম্বো পৌঁছই কয়েকটি স্থান দেখে।

সিংহল দ্বীপে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারা প্রচারের কাজ স্বামীজীর আদেশে প্রকৃতপক্ষে প্রথম শুরু করেন পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে। পাশ্চাত্যে হিন্দুধর্মের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করে স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭ খ্রিঃ ১৫ জানুয়ারি কলম্বোতে শুভ পদার্পণ করেন। কলম্বো ও সিংহলের কয়েকটি প্রসিদ্ধ শহরে বিবেকানন্দ বিপুলভাবে সংবর্ধিত হন এবং হিন্দুধর্মের মহিমা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। স্বামীজীর বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে কলম্বোর হিন্দু অধিবাসিগণ কলম্বোতে একটি আশ্রম স্থাপন করবার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানান। স্বামীজীও তাঁদের অনুরোধ রক্ষা করতে সম্মত হন এবং পরে মহাপুরুষ মহারাজকে কলম্বোতে হিন্দুধর্ম প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। এই সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ সিংহলের মিঃ টি. লোকনাথনকে যে পত্র লিখেছিলেন তা এখানে উল্লেখযোগ্য। স্বামীজী ১৮৯৭ খ্রিঃ ৩০ জুন আলমোড়া হতে মিঃ লোকনাথনকে লিখেছিলেন ঃ "প্রিয় বন্ধু, সিংহলে অবস্থানকালে তোমাদের কাছে আমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তদনুসারে এই পত্রের বাহক স্বামী শিবানন্দকে

সিংহলে পাঠাচ্ছি। তাঁকে যে কাজের ভার দেওয়া হয়েছে, সে কাজে তিনি সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত—অবশ্য তোমাদের সানুগ্রহ ও সাহায্য নিয়ে। আশা করি, তুমি সিংহলের অন্যান্য বন্ধুগণের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেবে।" ইংরেজি মূল চিঠিখানি কলম্বো বিবেকানন্দ সোসাইটিতে সংরক্ষিত আছে।

মহাপুরুষ মহারাজ ছ-মাসের অধিককাল কলম্বোর থামবাইয়া চৌলট্রি বা ছত্রম্-এ অবস্থান করেন। সেখানে তিনি কঠোর তপশ্চর্যায় দিন কাটাতেন। ধর্মালোচনা-সভায় তিনি যথার্থ ধর্মার্থীদের উপদেশ দিতেন। কলম্বোতে বিবেকানন্দ সোসাইটি সুপরিচালিত হবার পরই তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন।

শুভম্

মহাপুরুষ মহারাজের পুণ্য-স্মৃতি

স্বামী সর্বাত্মানন্দ

বর্তমান বাংলাদেশের কোন আশ্রমে প্রায় দু-বৎসর বাস করার পর ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ মাদ্রাজে থাকার সময় আমি প্রথম বেলুড় মঠে আসি। তিনি ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে মঠে ফিরে এলেন। তিনি সেদিন নিচের বারান্দায় বেঞ্চে বসলে আমিও সকলের সঙ্গে তাঁকে প্রণাম করি। শুদ্ধানন্দজী মহারাজ সাধারণভাবে আমার পরিচয় দেন। পরদিন সকালে পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে সাধু-ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে তাঁকে প্রণাম করতে যাই। তখন তিনি আমার নাম ধাম ইত্যাদি জিজ্ঞেস করেন।

ঐ বৎসরই শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথিতে আমার দীক্ষা হয় এবং ঐ বৎসরেই কয়েক মাস পরে তিনি আমাকে বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজার অধিকার দেন। তখনও আমার ব্রহ্মচর্য-দীক্ষা হয়নি। পূজা আরম্ভ করবার প্রথমদিন সকালে তাঁর ঘরে গিয়ে দেখি তিনি মেজেতে আসনে বসে আছেন। প্রণাম করে আশীর্বাদ প্রার্থনা করলে তিনি মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে অজস্র আশীর্বাদ করে বলেন—"বেশ যাও, পূজা করগে। পূজা আর কি করবে? মন্দিরে গিয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে

শান্তভাবে বসে তন্ময় হয়ে ধ্যান করবে, তারপর ঠাকুরকে পরিষ্কার করে মুছে (কারণ তখন পটে পূজা হতো) একটি অর্ঘ্য দেবে ও ভাল ভাল বাছা কয়েকটি ফুল দিয়ে ঠাকুরকে সাজাবে। তারপর ভোগ নিবেদন করে আবার ধ্যান করবে এবং সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। এই তো পূজা। আর তো কোনরকমের পূজা জানি না, বাবা। তোমাদের ভক্তি বড় কাঁচা, সেজন্য পূজার একটি সাধারণ সংক্ষিপ্ত বিধি শিখে নিয়ে সেইটি অনুসরণ করা ভাল।" পরে বলেছিলেন, "পূজা, জপ, প্রার্থনা, স্তব, স্তোত্রপাঠ ও অবসর সময়ে 'কথামৃত'-পাঠ এবং পূজার অন্যান্য কাজ যেমন—ফুলতোলা, মালাগাঁথা ইত্যাদি কাজ নিয়ে সময় কাটাতে চেষ্টা করো; এতেই তোমার সব হবে।"...

ঐ সময় শশধর মহারাজ মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজক। প্রয়োজনে আমিও মাঝে মাঝে পূজা করি। তখন অধিকাংশ সময় ঠাকুরভাণ্ডারের কাজ করি। ভোরে উঠতে অসুবিধা বোধ করায়, তখন পূজারি মহারাজের পরামর্শানুসারে একদিন ভোরে মঙ্গলারতির সময় উঠিনি। মহাপুরুষজী ভোরে মঙ্গলারতির সময়ই তা লক্ষ্য করেছিলেন, পরে সকালে যখন তাঁকে প্রণাম করতে যাই, তখন তিনি বললেন, "কি! আর ভোরে উঠতে বুঝি ভাল লাগছে না। রাত্রে খাবে একগাদা, আর ঘুমাবে ভোঁস ভোঁস করে—এইজন্য সাধু হয়েছ? রাত্রে খাবে সিকিপেট, একটু বিশ্রাম করে মশারি খাটিয়ে মালা নিয়ে বসে যাবে। যখন শরীর অবসন্ন বোধ করবে তখন বালিশে মাথা দেবে, হাতের মালা হাতেই চলতে থাকবে। পরে যদি ঘুমিয়ে পড় তো, হাতের মালা হাতেই থাকবে, পাশ ফেরার সময় আবার ২।১০ বার যা হয় জপ করবে। রাত তিনটার পর ঘুম ভেঙে গেলে আর ঘুমের প্রয়োজন থাকে না, তখন ঘুমোবার ইচ্ছা মনের বদমায়েসি মাত্র। তিনটার পরে ঘুম ভেঙে গেলে সাধু আর বিছানায় থাকবে না। যে ভোর ভোর উঠতে পারে না, সে ভাল ব্রহ্মচারী হতে পারে না।"

* * *

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজার দিন সকালে মহাপুরুষজীর ঘরে তাঁকে প্রণাম করে উঠতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আজ কে পূজা করবে?" উত্তরে বললাম, "আমি পূজক এবং শশধর মহারাজ তন্ত্রধারক।" বললেন, "বেশ, যখন আত্মারামের কৌটা বের করবে, তখন আমাকে খবর দেবে।" পরে যথাসময়ে ঠাকুরভাণ্ডারি ঠাকুরঘরে একটি আসন পেতে মহারাজকে সংবাদ দিতেই তিনি ঠাকুরঘরে এলেন। পূর্বদিকের দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করে তিনি নিজেই দরজাটি বন্ধ করে শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদুকার সামনে ঠাকুরের দিকে মুখ করে বসলেন। দক্ষিণের তিনটি দরজাই খোলা রহিল। পরে যখন আত্মারামের কৌটার উপর মহাস্নান আরম্ভ

হলো, তখন সারদানন্দ মহারাজ ঠাকুরের শয়নঘরের ভিতর দিয়ে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করলেন। জনৈক সাধু এসে ঠাকুরঘরের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে একটি আসন পেতে দিতে তিনি সেখানে বসলেন। মহাস্নানের পর মহাপুরুষজী আমার দিকে দুটি হাত বাড়ালেন। তখন আমি তাড়াতাড়ি গঙ্গাজলপূর্ণ মহাস্নানের অন্যান্য উপকরণ এবং চন্দনসহ একটি ছোট তামার ঘড়া তাঁর হাতে দিলাম। তিনি তা থেকে ধীরে ধীরে আত্মারামের কৌটার উপর জল ঢালতে লাগলেন। মন্ত্র একটিমাত্রই শুনতে পেলাম—"জয় শ্রীগুরু মহারাজ।" পরে আত্মারামের কৌটা আমি মোছবার জন্য নিতে তিনি আমার হাত থেকে নিয়ে নিজের কোলে বাম হাতের উপর তা সযত্নে রেখে মুছলেন। তারপর নিজেই তাতে চন্দন দিলেন এবং আমিও তাতে চন্দন দিলাম। তখন তিনি কৌটাটি নিজের মাথার উপর ধারণ করলেন। আমি তাড়াতাড়ি সহস্রদলপদ্মসহ একটি অর্ঘ্য সাজিয়ে তাঁর হাতে দিলাম। কারণ আমি জানতাম, রক্তকমল দিয়ে তিনি ঠাকুরের পূজা করতে ভালবাসতেন। পূর্বে দু-এক দিন রক্তপদ্ম দেখে বলেছিলেন, "আজ আমি পূজা করবো" এবং যথাসময়ে এসে পদ্ম দিয়ে অঞ্জলি অর্পণ করে আমাকে বলেছিলেন, "তুমিই পূজা কর।" অর্ঘ্যটি নিয়ে তিনি আত্মারামের কৌটার উপর দিলেন। দ্বিতীয় অর্ঘ্যটিও আমার হাত থেকে নিয়ে ঐভাবে দিলেন। কিন্তু তৃতীয় অর্ঘ্যটি আমি সাজাবার পূর্বেই পুষ্পপাত্রের সমস্ত ফুল, বেলপাতা, তুলসী, দূর্বা, চাল সব তিনি দু-হাতে নিয়ে নিজের মাথার উপর দিতেই হাত দুটি অবশের মতো নিচে কোলের উপর পড়ে গেল এবং ঐভাবে চোখবুজে স্থির নিস্পন্দভাবে বসে রইলেন। ইতোমধ্যে আমরা পূজা আরম্ভ করলাম। তখন পূজনীয় সারদানন্দ মহারাজ গায়ে একটি গেরুয়া-জামা-পরিহিত এবং একটি চাদর গলায় ঝোলানো অবস্থায় মহাপুরুষজীর ডানদিকে অথচ একটু পিছনে খানিকক্ষণ করজোড়ে দাঁড়িয়ে থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করলেন। আবার করজোড়ে দাঁড়িয়ে থেকে অন্যদিকে প্রণাম করে যুক্তকরে দাঁড়ালেন। এভাবে সামনে ও দু-পাশে বারবার প্রণাম করতে লাগলেন। তা দেখে আমার গীতোক্ত "নমঃ পুরস্তাদ্ অথ পৃষ্ঠতস্তে, নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্ব"—এ শ্লোকটি মনে পড়ল। এ বোধ হয় সেই ভাব! পরে তিনি শয়নঘরের ভিতর দিয়ে বাইরে চলে গেলেন। মহাপুরুষ মহারাজ তখনও ঐভাবে ধ্যানস্থ নিস্পন্দ হয়ে বসে আছেন। ততক্ষণ আমাদের পূজা অনেকটা অগ্রসর হয়েছে। প্রায় দু-ঘণ্টা পরে তিনি চোখ চাইলেন এবং করজোড়ে মস্তক অবনত করে "জয় শ্রীগুরু মহারাজ" বলে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করলেন। তারপর নিজেই দরজা খুলে বাইরে চলে গেলেন। বারান্দায় উপবিষ্ট ভক্তেরাও উঠে তাঁর পেছনে পেছনে চলে গেল।

* * *

একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে আরতির পূর্বে কলকাতার স্টার থিয়েটারের জনৈকা অভিনেত্রী শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য কিছু ফল-মিষ্টি নিয়ে মঠে এসেছে। সেসব ঠাকুরভাণ্ডারে যথাস্থানে রেখে আরতি করতে যাই। সন্ধ্যা-আরাত্রিকের পর মন্দিরের কাজ সেরে ঐ সব জিনিস সম্বন্ধে মহাপুরুষজীকে জিজ্ঞেস করতে যাব ভেবেছিলাম। কারণ তখন অভিনেত্রীরা শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য কিছু আনলে তাঁর নির্দেশানুযায়ী সে সবের ব্যবস্থা করতে হতো। তাঁর ঘরে গিয়ে তাঁকে ধ্যানস্থ দেখে ফিরে এলাম। কিছুক্ষণ পরে আবার গিয়ে দেখি তিনি একই ভাবে ধ্যানস্থ। একটু পরেই রাত্রের ভোগের ঘণ্টা পড়ল। তখন ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করে তাঁর বিছানার মশারি টাঙ্গাবার দণ্ডটি ধরে দাঁড়ালাম।

ভোগের ঘণ্টা পড়ায় বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়েছি, তাই 'মহারাজ' 'মহারাজ' বলে তিনবার পরপর উঁচু গলায় ডাকলাম। তাতেও কোন সাড়া না পেয়ে ভয়ে বুক দুর-দুর করতে লাগল। ভাবলাম আমি এ কি করছি? সুতরাং কি করব স্থির করতে না পেরে ঐ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরকে ডাকতে লাগলাম। একটু পরেই লক্ষ্য করলাম মহাপুরুষজীর শরীর একটু নড়ল। তখন সাহস করে ধীরে গলা খাঁকারি দিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কে?" উত্তরে বললাম—"বটুক।" বললেন, "কিছু বলছিলে?" তখন ফল-মিষ্টির সম্বন্ধে বলে তাঁর ব্যবস্থার নির্দেশ প্রার্থনা করতে তিনি বললেন, "ঠাকুরের ভোগের থালায় সাজিয়ে উপরে নিয়ে যাও। ভোগের জিনিস বেশি থাকলে যেখানে রেখে নিবেদন কর সেখানে রেখো। নিত্যকার ভোগ যেমন নিবেদন কর তেমনি করবে। তারপর দাঁড়িয়ে গলবস্ত্র হয়ে করজোড়ে বলবে, 'প্রভু, অমুক তোমার জন্য এগুলি এনেছে, কি করতে হবে তা তো আমি জানিনা; তাই তোমার কাছে এনেছি, গ্রহণ করতে হয় কর'।" "যে আজ্ঞা" বলে ফিরতেই বললেন, "শোন, প্রসাদটি নামিয়ে তা সাধু-ব্রহ্মচারীদের দিও না। বামুন-চাকরদের দিয়ে দিও।"

* * *

একদিন দুপুরবেলা ভোগ নাবার পরে প্রসাদ পেয়ে পূজনীয় নীরদ মহারাজকে (স্বামী অম্বিকানন্দ) একটি পান দিয়ে আসি। তখন তিনি মহাপুরুষ মহারাজজীর ঘরে বসে ছিলেন। ফিরে আসার একটু পরেই মহাপুরুষ মহারাজের সেবক এসে বললেন, "মহারাজ তোমাকে এখুনি ডেকেছেন।" তাঁর কাছে শুনলাম নীরদ মহারাজ পান খেতে খেতে বলেছেন "ছেলেরা ভয়ানক অসাবধান, পানের সঙ্গে পাথরকুচির মতো শক্ত কি একটা রয়েছে।" তখনকার দিনে নানাপ্রকার মশলা দেওয়া কালো একরকম খয়ের আসত। তাতে অন্য কিছু থাকলেও তা বোঝবার উপায় ছিল না।

তখন আমার মনে হলো—আজ নিশ্চয়ই মঠ থেকে বিতাড়িত হব। সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে মহারাজের ঘরে উপস্থিত হলাম। আমাকে দেখেই মহাপুরুষজী কেঁদে ফেললেন। বললেন, "ঠাকুর-সেবার অপরাধ, এ অপরাধ তো আমার। তোমরা ছেলেমানুষ, ঠাকুরসেবার কি জান? কে আর শেখাচ্ছে? ঠাকুরসেবা তো আমারই করা উচিত। আমি এখনও পারি। কাল থেকে আমিই তোমাদের সঙ্গে ঠাকুরভাণ্ডারে কাজ করব।"

ঠাকুরসেবার ত্রুটিতে তিনি প্রাণে যে কতটা আঘাত পেয়েছেন তা ভেবে আমার চোখে জল এল। মাথা নিচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। তখন শান্ত গম্ভীরভাবে বললেন, "যাও, তোমার কোন অপরাধ নেই। সমস্ত অপরাধ আমার। কাল থেকে ঠাকুরভাণ্ডারে আমিও কাজ করব।"

পরদিন সকালে তিনি ভাণ্ডারে এসে উপস্থিত হলেন। তখন আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য দাঁড়িয়ে টেবিলের উপর পান সাজছিলাম। তিনি এসে পিছন হতে ঝুঁকে দেখালেন কতটা চুন, খয়ের, সুপারি মশলা কিভাবে দিতে হয় এবং পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ ও পূজনীয় শশী মহারাজ কিভাবে ঠাকুরসেবা করতেন ইত্যাদি অনেক কথা বলতে লাগলেন। বললেন, "ঠাকুরের খুব fine taste (সূক্ষ্ম রুচিবোধ) ছিল। এতটুকু এদিক-ওদিক হলে তা সহ্য করতে পারতেন না।" পরে ভাণ্ডারের একটু এদিক-ওদিক ঘুরে দেখে তিনি চলে গেলেন। দ্বিপ্রহরে ভোগের ঘণ্টা হতে পুনরায় এলেন। ভোগ ওঠবার পর তখন আমি ঠাকুরের তামাক সাজছিলাম। তিনি নিজেই হুঁকোতে জল দিয়ে এমনভাবে তা সোজা করে দেখালেন যাতে হুঁকোয় কতটুকু জল থাকলে টানলে মুখে না আসে। পরে বললেন, "নল কই?" আমি তা তাঁর হাতে দিতে বললেন, "এ কাঠের নল কবে হলো?" "আমরা এসেই তো এই কাঠের নল দেখছি, আপনারা কিসের নল ব্যবহার করতেন?" বললেন—"আমপাতার। যাও দেখি, একটি আমপাতা নিয়ে এস।" তা এনে দিতে তিনি নিজেই পাতাটি ধুয়ে দুভাগ করে মাঝখানের শিষটি ফেলে নল তৈরি করে হুঁকার মুখে লাগালেন। কল্কেতে আগুন দেওয়া হলে আমার হাত থেকে নিয়ে নিজেই তালপাতার পাখা নিয়ে হাওয়া করতে লাগলেন এবং যখন কল্কের নিচে দিয়ে ধোঁয়া বের হতে লাগল তখন বললেন, "এই দেখ, এইবার তৈরি হয়েছে নিয়ে যাও—এস।" এভাবে পর পর কয়েকদিন যখন তখন ভাণ্ডারে এসে দেখাশুনা করতেন এবং নানাপ্রকার উপদেশ দিয়ে চলে যেতেন।

* * *

গ্রীষ্মের কোন এক বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য জুঁইফুলের একগাছা গোড়েমালা

গেঁথে বেলফুলের আর একটি মালা গাঁথছিলাম। এমন সময় মহাপুরুষজী নিচে নেমেই তা লক্ষ্য করে বললেন, "ব্যাটারা কেবল মালাই গাঁথছে, মালাই গাঁথছে; রাখ মালা, যাও ধ্যানঘরে—খানিকক্ষণ ধ্যান করে এস। গরমের দিনে বিকালে সুগন্ধি ফুলের single (একহারা) একছড়া মালা ঠাকুরকে দেবে, ব্যাস, আর কি। আর বাদ-বাকি সময়টা ধ্যান-জপ, শাস্ত্রালোচনাদি করবে।"...

তাঁর ঘরে একদিন প্রণাম করতে যেতেই জিজ্ঞেস করলেন, "পূজার পর কি কর? স্তবস্তোত্র পাঠ কর না?" "আজ্ঞে না।" "কেন?" "আমার কোন সুরবোধ নেই। পুজোর শেষে প্রাচীন সাধুরা প্রায়ই ঠাকুরঘরে উপস্থিত থাকেন, আমার লজ্জা হয়।" মহাপুরুষজী বললেন, "তুমি মানুষকে শোনাবে, না ঠাকুরকে শোনাবে?" পরদিন পূজার শেষে প্রসাদ নামাবার ঘণ্টা বাজতেই তিনি একটি 'স্তবকবচমালা' নিয়ে ঠাকুরঘরে উপস্থিত হলেন। এতক্ষণ পূজার শেষে আমি জপের মালা নিয়ে চোখ বুজে জপ করছিলাম। "মালা রাখ, এবার স্তবপাঠ কর—" বলে নিজেই স্তবকবচমালা থেকে 'অপরাধভঞ্জন' স্তোত্রটি বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, "পড়।" এবং আমার পাশে চোখ বুজে করজোড়ে বসে রইলেন। এ স্তোত্রটি পূর্বে বহুবার পাঠ করেছিলাম, কিন্তু তিনি কাছে বসেছিলেন বলে খুবই ভয় হচ্ছিল। তবু কোনপ্রকারে পাঠ আরম্ভ করলাম। তিনি মধ্যে মধ্যে "বা, বা, বেশ বেশ" বলে উৎসাহ দিতে লাগলেন। পরে কয়েকদিন পুজোর শেষে সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় জিজ্ঞেস করতেন—"পাঠ করেছিলে?" "আজ্ঞে হাঁ" বলাতে মহারাজ বলতেন—"বেশ, বেশ।"

একদিন গ্রীষ্মকালে ভোগের পর ঠাকুরকে শয়ন দিয়ে বাইরে যখন তালা দিচ্ছিলাম—তখন মহাপুরুষজী পেছন থেকে এসে বললেন, "দরজা খোল।" নিজে ঘরে ঢুকে আমাকেও নিঃশব্দে ভিতরে ডাকলেন এবং বললেন, "দরজা বন্ধ কর।" ঠাকুরের শয়নঘরে ঢুকে ইঙ্গিতে আমাকে ডাকলেন এবং একটি বড় তালপাতার পাখা বের করতে বললেন। আমি তা আনতে তিনি আমার হাত থেকে পাখাটি নিয়ে ঠাকুরকে নিজেই বাতাস করতে লাগলেন। একটু পরে পাখাটি আমার হাতে দিয়ে ইঙ্গিতে আমাকেও হাওয়া করতে বললেন। আমি খানিকক্ষণ হাওয়া করার পর আমার গায়ে হাত দিয়ে ইশারা করে থামতে বললেন এবং পাখাটি ধীরে যথাস্থানে রাখতে বললেন। তিনি ঠাকুরকে প্রণাম করে বাইরে এলেন। আমিও বাইরে এসে তালাবন্ধ করলে বললেন—"যতদিন গরম থাকবে নিত্যই হাওয়া করো। খাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ো না, দ্বিতীয় পঙক্তিতে খেয়ো।"

* * *

একদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন "তুমি সন্ধ্যাহ্নিক কর না?" বললাম, "আজ্ঞে না।" "শিখেছিলে? কখনো করতে?" "আজ্ঞে হ্যাঁ, উপনয়নের পর প্রায় চার বছর করেছিলাম।" "ছাড়লে কেন?" "একটু বড় হওয়ার পর শহরের স্কুলে যখন পড়তে যাই, তখন দেখলাম কেউ করে না। আমিও করতাম না।" জিজ্ঞেস করলেন, "এখন মনে আছে?" বললাম, "সব মনে নেই, কিছু কিছু ভুলে গেছি।" আবার জিজ্ঞেস করলেন, "গায়ত্রী জপ কর?" "আজ্ঞে হাঁ, তা কখনও বাদ দিইনি।" পরে বললেন, "সন্ধ্যাহ্নিক করা ভাল। লাইব্রেরিতে সন্ধ্যাবিধির একখানা বই আছে। সেটি দেখে নিয়ে আবার শুরু কর। তুমি ঠাকুরপূজা কর, তোমার তো বেশ সুযোগ আছে। তারপর যখন সন্ন্যাস হবে, তখন যা হবার হবে।"...

এক ভক্ত-বাড়িতে মঠের সাধুদের নিমন্ত্রণ ছিল। আমিও গিয়েছিলাম। ওখানকার খাওয়া-দাওয়ার সব খবর নিয়ে তিনি খুশি হলেন না। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমিও গিছিলে?" "আজ্ঞে হ্যাঁ।" "খেলে?" "আজ্ঞে হাঁ" তখন অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "বেটা! ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রহ্মচারী হয়েছ, মঠে ঠাকুরের পূজা কর, যার তার হাতে ওসব খেতে গেলে? জিভের এতটুকু সংযম নেই, যেখানে সেখানে যা তা খেতে যাওয়া! মঠে খেতে পাও না? কি খাবে?"

সাত্ত্বিক আহার ও শুদ্ধ অন্ন ভক্তিলাভের সাহায্য করে। তাই তিনি এতটা বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন।...

মহাপুরুষ মহারাজের জন্মতিথিপূজা উপলক্ষে সেবার ঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম, ভোগরাগের পর ঠাকুরের শয়ন দিয়ে একখানি প্রসাদী ফুলের মালা এবং হোমের ফোঁটা নিয়ে তাঁর ঘরে যাই। তখন তিনি প্রসাদ পেতে বসেছেন। আমাকে দেখেই গলা বাড়িয়ে দিলেন। আমিও গলায় ফুলের মালা ও কপালে হোমের ফোঁটা দিয়ে একটু দূরে সরে প্রণাম করলাম। প্রণাম করে উঠতেই বললেন, "প্রসাদ নিয়ে যাও।" সামনে একটি প্লেটে প্রায় দু-সের ওজনের ঠাকুরের প্রসাদী একটি বড় রসগোল্লা ছিল। তা সামান্য একটু মুখে দিয়ে আমার দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন, "যাও, নিয়ে যাও।" আমি মহানন্দে তাই নিয়ে ঘরের বাইরে আসতেই জনৈক সাধু বললেন, "উ, উনি, একাই মারবেন!" সঙ্গে সঙ্গে ৫।৭ জন সাধু কোত্থেকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাড়াকাড়ি করে আনন্দে সবটা খেয়ে ফেললেন। রসগোল্লার রসে আমার কাপড় চাদর সব ভিজে গেল। মহাপুরুষজী তা দেখে বালকের মতো হাসছেন। ছেলেরা আনন্দ করে খাচ্ছে, তাতেই তিনি খুশি। তিনি গোমড়া মুখ পছন্দ করতেন না, সাধুরা খুব জোরে হাসছে দেখলে আনন্দিত হতেন।...

১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে পূজনীয় সারদানন্দ মহারাজ যখন দেহত্যাগ করেন তখন আমি

মঠে রক্তামাশয়ে খুব ভুগছিলাম। একটু সুস্থ হতে মহাপুরুষজী আমাকে ৺কাশী সেবাশ্রমে পাঠিয়ে দিলেন। বলেছিলেন, "ঔষধ, পথ্য দুই-ই সেখানে পাবে এবং কাশীবাসও হবে।" তাঁর কথানুসারে এবং তাঁর চিঠি নিয়ে কাশীতে এলাম। মহাপুরুষজীও কিছুদিন পরে মধুপুর হয়ে কাশীতে আসেন। তখন আমার শরীর অনেকটা সুস্থ। একদিন মহাপুরুষজীর ঘরে অদ্বৈতাশ্রমে সন্ধ্যারতির পরে প্রণাম করে উঠতেই বললেন, "মঠ থেকে কৃষ্ণলাল (স্বামী ধীরানন্দ) লিখেছে—তোমাকে মায়ের তিথিপূজার আগে মঠে যেতে বলেছে।" আমি বললাম, "সামনে চন্দ্রগ্রহণ, গ্রহণের পর সাতদিন যাত্রা নেই। গাড়িতে ভিড়ও খুব বেশি হবে। তাহলে গ্রহণের আগে চলে যাই।" শুনে একটু অসন্তুষ্ট হলেন, পুনঃপুনঃ বলতে লাগলেন—"গ্রহণেষু কাশী, গ্রহণেষু কাশী"! তারপর বললেন, "ভটচাজ বামুনের মতো কেবল—'যাত্রার দিন নেই, যাত্রার দিন নেই'! এঘর থেকে তো ওঘরে যাওয়া, আবার এত দিন-দেখা কি? লোক যাবে বলে ভিড় তো হবেই। তুমি একটা জোয়ান বেটাছেলে যেতে পারবে না?" তখন বললাম, "তাহলে গ্রহণের পরেই যাব?" তিনি খুশি হয়ে বললেন, "হ্যাঁ।" স্থির হলো গ্রহণের শেষে পরদিন ভোরের ট্রেনে উঠে রওনা হব।

গ্রহণের দিন সন্ধ্যার পর মহাপুরুষজীর ঘরে যেতেই বললেন, "দেখ, তোমার শরীর তত ভাল নয়। তুমি গঙ্গায় যেও না। স্নান করার প্রয়োজন নেই। একটু জপ করে শুয়ে পড়গে। আবার ভোর ভোর যেতে হবে।" আমি কিছুক্ষণ জপ করে উঠতেই শঙ্কর মহারাজকে গঙ্গার দিকে যেতে দেখলাম। কেমন ভিড় হয়েছে দেখার জন্য আমারও যেতে ইচ্ছা হলো। আমিও তাঁর সঙ্গে ভিড় দেখতে দেখতে একেবারে দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়ে হাজির হলাম। তখন মহাপুরুষজীর নিষেধ সম্পূর্ণ ভুলে শঙ্কর মহারাজের কাছে কাপড়-চোপড় রেখে কৌপীন পরে গঙ্গাস্নান করলাম। তারপর আশ্রমে ফিরে এসে শুয়ে পড়লাম। ফিরবার পথে গোধুলিয়ার মোড়ে পুলিশের জনতা-নিয়ন্ত্রণের সময় তাদের লাঠির আঘাত থেকে কোনপ্রকারে রক্ষা পেয়েছিলাম। ভোরে ভোরে গাড়ি ধরলাম। গাড়িতে উঠে নাকে জল ঝরতে লাগল এবং মঠে পৌঁছবার পূর্বেই খুব সর্দি দেখা দিল। সর্দি ক্রমে কাশিতে পরিণত হয় এবং নানা উপসর্গসহ কঠিন আকার ধারণ করে। কখনও একটু ভাল, কখনও একটু মন্দ—এভাবে প্রায় একবৎসর কেটে যায়। পরে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ১ ফেব্রুয়ারি স্বামীজীর জন্মতিথিতে আমার সন্ন্যাস-দীক্ষা হয়। এর অল্প কয়েকদিন পরেই মহাপুরুষজী আমাকে বললেন, "বালিয়াটী আশ্রমে একজন সাধুর দরকার। সেখানে ঠাকুরের ছোটখাট একটু পূজা আছে। তুমি তাই করো; তোমারও তো জন্মস্থান পূর্ববঙ্গ। সুতরাং ঐ দেশের পল্লিগ্রামের মিঠে জলহাওয়ায় শরীর ভাল হয়ে যাবে।" তাঁর

কথামত কয়েকদিন পরে আমি বালিয়াটী চলে যাই। সেখানে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে প্রায় একবৎসর পরে মঠে ফিরে আসি। এইভাবে গুরুর আজ্ঞা-লঙ্ঘন এবং আজ্ঞা-পালন উভয়েরই ফল প্রত্যক্ষ অনুভব করলাম।...

*   *   *

খুব সম্ভবত ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে একদিন ভোর চারটার সময় মঙ্গলারতির জন্য ঠাকুরঘরের দরজা খুলে আলো জ্বালতেই দেখতে পেলাম ঠাকুরের শয়নঘরের জিনিসপত্র সব ওলট-পালট ও ইতস্তত ছড়ান রয়েছে। শয়নঘরের পূর্ব-উত্তর কোণে একটি আলমারি ছিল। তাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যবহৃত জিনিসপত্র থাকত। উত্তর-পশ্চিম কোণে আর একটি আলমারিতে ঠাকুরের নিত্যসেবার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও ছোট একটি রূপার সিংহাসনে শ্রীশ্রীঠাকুরের ইষ্টকবচ থাকত। শয়নঘরে ঢুকে দেখা গেল যে, ঐ দুটি আলমারিই খোলা রয়েছে। ঠাকুরের বিছানার উপর ৺লক্ষ্মীর হাঁড়ি (কোজাগরী পূর্ণিমাতে পূজা হয়) উলটানো রয়েছে। রূপার সিংহাসনটি পড়ে আছে, ইষ্টকবচটি নেই, ভীত হয়ে ঠাকুরঘরে ঢুকে দেখলাম, দক্ষিণের তিনটি দরজার মাঝের দরজাটি খোলা। ঐ দরজাটিতে অল্প কয়েকদিন মাত্র পূর্বে খড়খড়ি দেয়া হয়েছিল। সেজন্য বাইরে থেকে তালাবন্ধ করা হতো। দেখি—ঐ দরজার হুড়কাটিও ভাঙ্গা, তালাসমেত পড়ে আছে। তখন বুঝতে পারলাম যে চুরি হয়েছে। তাড়াতাড়ি উপরে ছুটে গিয়ে স্বামী গঙ্গেশানন্দজীকে ডেকে আনলাম। তিনি সব দেখে মঙ্গলারতি শেষ করতে বললেন। মঙ্গলারতির পর মঠের অনেক সাধু-ব্রহ্মচারী ঠাকুরঘরে সমবেত হলেন। এঁদের মধ্যে পুরানো পূজারি স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দজীও ছিলেন। তাঁর সঙ্গে খুঁজে খুঁজে দেখলাম কি কি চুরি হয়েছে। দেখা গেল ঠাকুরের ইষ্টকবচটি, লক্ষ্মীর হাঁড়ির দু-তিনটি মোহর ও কয়েকটি টাকা, দু-টি জার্মান-সিলভারের গোলাপ-দান, পূজার রূপার বাসনপত্র ও ঠাকুরের নিত্যপূজায় ব্যবহৃত বাসন্তী রঙ-এর একটি চাদর ইত্যাদি সব চুরি হয়েছে। নানা গোলমালের মধ্যে কিছু সময় কাটাবার পর আমি মহাপুরুষজীর ঘরে গেলাম। প্রণাম করে উঠতেই তিনি বললেন—"তোমার কোন দোষ নেই,...তুমি তো যথাসাধ্য ঠাকুরের সেবা করছিলে।" বিশেষত ইষ্টকবচটি চুরি যাওয়ায় তিনি খুব দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি আরও কি কি বলেছিলেন, কিন্তু আমার মনের অবস্থা তখন এত খারাপ যে, সেসব কথা কিছুই মনে নেই।

(১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ১২ মার্চ তারিখে ঐ ইষ্টকবচটি চুরি হয়।)...

এর কিছুদিন পরে আমি জামতাড়ায় বায়ুপরিবর্তনে মাসখানেকের জন্য যাই। সেখান থেকে স্বর্গাশ্রম ও উত্তর-কাশীতে কিছুকাল বাস করি এবং কেদার ও

বদরীনারায়ণ হয়ে দিল্লী-আশ্রমে কর্মিরূপে আসি। সেখানে থাকাকালে মহাপুরুষ মহারাজ ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে দেহরক্ষা করেন। আর তাঁর দর্শনের সৌভাগ্য হয়নি।

আমার পরম ভাগ্যক্রমে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার সুযোগ হয়েছিল। তিনি ছিলেন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, আবার যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদ। আমার কিন্তু তাঁকে দেখে ভয় হতো না; ঠিক পিতার মতো মনে হতো। তিনিও আমাকে সন্তানের মতো স্নেহ করতেন। আমার কল্যাণের জন্য কখনো শাসনও করেছেন। কিন্তু তাতে আমার মনে কোন দূরত্ববোধ কখনও আসেনি।

শুভম্

শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতিকথা

স্বামী গদাধরানন্দ

ছেলেবেলা থেকেই ধ্যান-জপ করতাম। বাড়িতে ৺দুর্গাদেবীর ঘট প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেখানে পূজাও করতাম। একটু বয়স বাড়ার সঙ্গেই শ্রীভগবান লাভের ইচ্ছা অন্তরে জাগে এবং সদ্‌গুরুলাভের জন্য মন ব্যাকুল হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে খুব কাতর প্রার্থনা করতাম। এইভাবে এক সময় গুরুলাভের সঙ্কল্প নিয়ে এক অন্ধকার রাত্রে এক মাইল দূরবর্তী নদীর ধারে শ্মশানে জপ করতে গেলাম। গভীর রাত্রে বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় বাড়ি ফিরতে বাধ্য হই। ঘরে এসে অস্থির প্রাণে শ্রীঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলাম। এই অবস্থায় কখন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছি জানি না, দেখি—সৌম্যদর্শন উজ্জ্বলকান্তি একজন প্রবীণ সন্ন্যাসী সেবকসঙ্গে সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমি তাঁকে ভক্তিভরে প্রণাম করে বললাম—"আমাকে কৃপা করতে হবে।" তিনি অতি প্রসন্নভাবে বললেন—"তোমাকে কৃপা করতেই তো এলুম।" তিনি আমার মাথায় হাত দিয়ে 'মহামন্ত্র' দিলেন। 'মহামন্ত্র' পাবার পরেই আমি সংজ্ঞাশূন্য হয়ে পড়ি। রোজ প্রত্যুষে নদীতে যেতাম কিন্তু সেদিন অনেক বেলাতে সেই আচ্ছন্নভাব কাটল। উঠে দেখি সেই মহাপুরুষের মূর্তি মনে আছে, কিন্তু 'মহামন্ত্র' কিছুতেই মনে পড়ছে না। প্রাণ ছটফট করতে লাগল; কি করি, কোথায় গেলে তাঁকে পাব এই একমাত্র চিন্তা অন্তর অধিকার করল।...

১৯২৬ সালে মালদহ আশ্রমে যাতায়াত করি। ছ-মাস পরে বেলুড় মঠে যাওয়া

স্থির করলাম। আশ্রমে নিয়মিতভাবে জপ-ধ্যান করতাম। একবার সাধন-ভজন সম্বন্ধে পূজনীয় মহাপুরুষজীকে একখানা পত্র লিখি। উত্তরে তিনি লেখেন—"তুমি যা করছ সব ঠিকই হচ্ছে। যথাসময়ে আমি তোমাকে দীক্ষা দেব।"

*　　　*　　　*

১৯২৬ সালে জুলাই মাসে আমি বেলুড় মঠে যাই এবং মঠে ঠাকুরভাঁড়ারে কাজে নিযুক্ত হই। মঠে সাধুদের স্নেহ-ভালবাসায় মুগ্ধ হলাম। কি সুন্দর পরিবেশ! অতি প্রত্যুষে সাধুরা ঠাকুরঘরে গিয়ে জপ-ধ্যান করেন। মঠের দৈনন্দিন যাবতীয় কাজ সব নিজেরাই করছেন।

মহাপুরুষ মহারাজ সে সময় মঠে ছিলেন না। দক্ষিণ ভারত সফরে গিয়েছিলেন। মঠে কিছুদিন থাকার পর একজন প্রাচীন সাধুর সঙ্গে আমরা দু-জন ব্রহ্মচারী পূজনীয় সারদানন্দ মহারাজকে দর্শন করতে যাই। তিনি উদ্বোধনের নিচের ঘরটিতে একাকী আপনমনে বসেছিলেন। আমরা উপরে গিয়ে ঠাকুর ও মাকে প্রণাম করে নিচে এসে তাঁকেও প্রণাম করলাম। খানিকক্ষণ কথাবার্তার পর আমাদের সঙ্গী প্রবীণ সাধু সারদানন্দ মহারাজকে বললেন—"এদের এখনও দীক্ষা হয়নি, আগামী কাল ভাল দিন। আপনি কৃপা করে এদের দীক্ষা দিলে ভাল হয়।" সারদানন্দ মহারাজ আমাদের দু-জনের দিকেই তাকিয়ে বললেন, "আগামী কাল একজনের দীক্ষা হবে।" আমার দিকে সস্নেহে তাকিয়ে বললেন—"মহাপুরুষ মহারাজ ফিরে এলে তাঁর কাছে তোমার দীক্ষা হবে।" আমি আগে থেকেই মহাপুরুষজীকে গুরুরূপে বরণ করেছিলাম, তিনিও দীক্ষা দেবেন বলে আমাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন। তাই পূজনীয় সারদানন্দ মহারাজের ঐ কথা শুনে আমার আনন্দ ও বিস্ময়ের আর অবধি ছিল না। প্রবীণ সন্ন্যাসী মহারাজকে বললাম—আপনি জানতেন না যে আমি মহাপুরুষজীকে গুরুরূপে বরণ করেছি। তিনিও আশ্বাস দিয়েছিলেন। মঠে ফিরে এলাম এবং ঠাকুরকে খুব ডাকতে লাগলাম।

আমি মনের আনন্দে ঠাকুরভাঁড়ারে কাজ করছি। দেখতে দেখতে ঠাকুরের তিথিপূজা এসে গেল। মহাপুরুষ মহারাজজী দক্ষিণ-ভারত-সফর শেষ করে মঠে ফিরলেন। তাঁকে দেখেই চিনলাম যে, ইনিই আমার সেই স্বপ্নদৃষ্ট গুরু। খুব আনন্দ হলো মনে। অবশ্য তাঁকে ঐ স্বপ্নের কথা কিছুই বলিনি। তিনি কিছু বলেননি। আমি মনে মনে প্রার্থনা করে দীক্ষার শুভদিনের জন্য অধীর হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

ঠাকুরের তিথিপূজার দিন দীক্ষা, ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস হবে। মহাপুরুষজীর শরীর

অসুস্থ বলে খুব কড়াকড়ি চলছে। স্থির হয়েছে বারোজনের মাত্র দীক্ষা হবে। দীক্ষার্থী উপস্থিত হয়েছে পনেরো-ষোলজন। কৃপা পাবার জন্য সকলেই উৎসুক। তখন এক একজনের আলাদাভাবে দীক্ষা হতো। এগারজনের দীক্ষা হয়ে গেল, মাত্র আর একজন বাকি। অথচ আরো অনেকে দীক্ষা পাবার জন্য বিশেষ উৎসুক। এই সময় দীক্ষা না পেলে অনেকদিন অপেক্ষা করতে হবে। আমার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল, মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা হতে লাগল এবং মনের আবেগে সমস্ত শরীর ঘেমে উঠল। চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলাম। হঠাৎ বেষ্টনীর ফাঁক দিয়ে যেন দৈবচালিত হয়ে অবশভাবে আমি মন্দিরের ভিতরে মহাপুরুষজী যেখানে বসে দীক্ষা দিচ্ছিলেন সেখানে তাঁর সামনে গিয়ে উপস্থিত হলাম ও হাঁপাতে লাগলাম। তিনি সস্নেহে আমায় বসতে বললেন এবং একটু সুস্থ হওয়ার পর আমায় বললেন—"তুমি তো পুজো জান, ঠাকুরকে পুজো কর।" আমি ফুল ও চন্দন দিয়ে ঠাকুরকে পুজো করলাম। তাঁকে দেখেই আমার মন আনন্দে ভরে গিয়েছিল, মনে হলো এই তো সেই স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষ! তিনি যথাসময়ে আমাকে 'মহামন্ত্র' দান করলেন এবং বললেন—'ঠিক হয়েছে তো?' স্বপ্নপ্রাপ্ত মন্ত্রই তিনি আমাকে দিলেন। মাথায় হাত দিয়ে আমায় আশীর্বাদ করলেন এবং পাশের ঘরে গিয়ে জপ করতে বললেন। আমি অপূর্ব শান্তি পেলাম।

* * *

১৯২৭ সালে ভবানীপুর গদাধর আশ্রমে পূজকের প্রয়োজন হলে মহাপুরুষজী আমাকে সেখানে গিয়ে পুজো করতে বলেন। তিনি বলেছিলেন, "তুমি সেখানে গিয়ে পুজো কর, আমি বলছি ওতে তোমার পরম কল্যাণ হবে।"

গদাধর আশ্রমে নিষ্ঠার সঙ্গে ঠাকুরের সেবাপূজা করতাম এবং মাঝে মাঝে কালীঘাটে মা-কালীকে দর্শন করতে যেতাম। মহাপুরুষজী একসময়ে বলেছিলেন যে, কাঁচের আলমারিতে বই সাজানো থাকলে যেমন বাইরে থেকে সব দেখা যায় তেমনি কোন মানুষকে দেখলেই তার ভিতর-বার সব তিনি দেখতে পান। সেই থেকে আমার ভিতরে সব সময়েই একটা সজাগ ভাব থাকত—যা করছি এবং ভাবছি মহাপুরুষজী তো সব জানতে পারছেন। গদাধর আশ্রম থেকে আমি মাঝে মাঝে প্রায়ই 'শ্রীম'কে দর্শন করতে যেতাম। আবার আশ্রমের কাজ সেরে অবসরমত ভীমনাগের দোকান থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগের জন্য ভাল সন্দেশ নিয়ে গঙ্গার ধারে ধারে হাঁটাপথে কাশীপুর ও দক্ষিণেশ্বর দর্শন করে বেলুড় মঠে মহাপুরুষজীর কাছে যেতাম। এভাবে মঠে কয়েকবার যাতায়াত করেছি। একবার মঠে গিয়ে মহাপুরুষজীকে প্রণাম করে উঠতেই তিনি বললেন, "তুই হেঁটে হেঁটে আসিস?"

আমি চুপ করে রইলাম। তিনি সেবক শঙ্কর মহারাজকে ডেকে বললেন—"গদাধরকে যাতায়াতের জন্যে এক টাকা এবং ঠাকুরের ভোগের জন্য দু-টাকা দাও।" তারপর থেকে বাসেই যাতায়াত করতাম।...

একদিন বিকালে মঠে গিয়েছি—কয়েকজন সাধু পরপর নানাভাবে মহাপুরুষজীর সেবাযত্ন ও কাজকর্ম করছিলেন। তা দেখে আমার মনে খুব দুঃখ হচ্ছিল যে, আমার তো জীবনে কখনও গুরুসেবার সুযোগ-সুবিধা হলো না। একটু পরেই পূজনীয় মহাপুরুষজী আমাকে ডাকলেন। কিছুক্ষণ পূর্বে খানিকটা বৃষ্টি হয়েছিল, ছাদে অল্প অল্প জল জমেছিল। তিনি আমাকে বললেন—"ছাদটা ভাল করে ঝাড়ু দাও এবং ইজিচেয়ারখানা সেখানে নিয়ে গিয়ে পাত।" পরে মহাপুরুষজী ছাদে গিয়ে চেয়ারে বসলেন এবং আমাকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—"তোমার কিছু জানবার আছে?" আমি বললাম, "মহারাজ, নানা জায়গায় গিয়ে থাকি, সাধুদের সঙ্গে আলোচনাদিও হয়। কখনো কখনো আলোচনাদির ফলে মনে নানা প্রশ্ন ও সন্দেহের উদয় হয়।" শুনে তিনি বললেন—"আমাতে বিশ্বাস আছে তো?" আমি বললাম—"হাঁ, মহারাজ।" তারপরই বললেন—"ব্যস, এতেই তোমার সব হবে।" তাঁর সে মহাবাক্য জীবনের সম্বল হয়ে রয়েছে।

* * *

গদাধর আশ্রমে থাকাকালে ১৯২৯ সালে আমার ব্রহ্মচর্য হয়। ১৯৩১ সালে শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজায় সন্ন্যাস হবে, ব্রতধারীরা প্রস্তুত হচ্ছে। তখন থেকে নিয়ম হয়েছিল যে, ব্রহ্মচর্যের পরে তিন বৎসর না গেলে সন্ন্যাস হবে না। মহাপুরুষজীর শরীর অসুস্থ। আমারও সন্ন্যাস নেবার খুব ইচ্ছা হলো। একদিন নিভৃতে তাঁকে নিজ মনোভাব নিবেদন করলাম। তিনি সন্ন্যাস দেবেন বলে আমাকে আশ্বাস দিলেন। প্রস্তুত হয়ে গদাধর আশ্রম থেকে সন্ন্যাসের পূর্বদিন মঠে উপস্থিত হলাম। গিয়ে শুনলাম যে, তিন বৎসর যাদের হয়নি তাদের সন্ন্যাস এ বৎসর হবে না। আমি নিরাশ হয়ে গদাধর আশ্রমে ফিরব বলে মহাপুরুষজীকে প্রণাম করতে গেলাম। প্রণাম করে দাঁড়াতেই তিনি বললেন—"তোর সন্ন্যাস হবে তো?" আমি বললাম—"না, মহারাজ, তিন বৎসর যাদের হয়নি তাদের এবার হবে না।" তিনি তখন জিজ্ঞেস করলেন, "তুই প্রস্তুত হয়ে এসেছিস?" আমি বললাম—"হাঁ, মহারাজ, আমি প্রস্তুত হয়ে এসেছি।" তিনি হাসতে হাসতে বললেন—"হাঁ, তোর হয়ে যাবে।"—সন্ন্যাস হয়ে গেল।

সন্ন্যাস নেবার কিছুদিন পর কাশীধামে গিয়ে তপস্যা করবার প্রবল ইচ্ছা হতে একদিন একান্তে তাঁকে মনের ভাব নিবেদন করলাম। তিনি সন্তুষ্টচিত্তে তপস্যার

অনুমতি দিলেন। তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে তপস্যায় আসি। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ ও তপস্যা—এ দুটিতেই তিনি খুব উৎসাহ দিতেন।

ইংরেজি ১৯৩২ সালে কাটিহার আশ্রমে কিছুদিন থাকার পর মহাপুরুষজীর অনুমতি নিয়ে আমিনগাঁ ও কামাখ্যা পাহাড়ে কিছুদিন সাধন-ভজন নিয়ে কাটাই। ১৯৩৩ সনে মঠ কর্তৃপক্ষের আদেশে সে সময় উড়িষ্যা-বন্যাসেবাকার্যে চিল্কাতে যেতে হয়। তারযোগে মহাপুরুষজীর অসুখের সংবাদ পেয়ে সেবাকেন্দ্র থেকে বেলুড় মঠে আসি। এই তাঁর শেষ দর্শন।

দিব্য স্মৃতি

স্বামী ধীরেশানন্দ

তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষের অলৌকিক স্থিতিবিষয়ে বশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রকে বলেছিলেন ঃ

অন্তর্বিকল্পশূন্যস্য বহিঃ স্বচ্ছন্দচারিণঃ।
ভ্রান্তস্যেব দশাস্তাস্তাস্তাদৃশা এব জানতে ॥

—অন্তরে নির্বিকল্প ব্রহ্মানুভূতি, কিন্তু বাইরে অজ্ঞ সাধারণের ন্যায় সর্বব্যবহার-সম্পাদন, তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদের এ রকম অলৌকিক স্থিতি একমাত্র তত্তুল্য জ্ঞানিগণই জেনে থাকেন।

শেষ জীবনে যখন সদাই অন্তর্মুখ অবস্থায় কত বিচিত্র অনুভূতি হতো তখন পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজও একদিন বশিষ্ঠদেবের পূর্বোক্ত কথারই যেন প্রতিধ্বনি করে বলেছিলেন—"এসব কথা কাকেই বা বলি, কেই বা বোঝে! আজ যদি থাকতেন 'মহারাজ' (স্বামী ব্রহ্মানন্দ), তাহলে দুটো কথা বলে ও শুনে আনন্দ করা যেত।"

জীবন্মুক্ত পুরুষের দিব্য স্থিতি আমরা কি বুঝব? তবে তাঁদের সদানন্দময়, নির্লিপ্ত অবস্থা-দর্শনে আমরা শাস্ত্রবাক্যের প্রামাণিকতা বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হই। উঠতে, বসতে, খেতে শুতে সর্বাবস্থাতেই এঁরা যেন এক অন্য জগতের লোক! যে নামরূপাত্মক জগৎকে সত্য ভেবে আমরা প্রতিদিনের ব্যবহারে কত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ি, এঁরা কিন্তু তাতে কিছুমাত্র লিপ্ত নন, বিচলিত নন, সবই যেন একটা বিচিত্র খেলা—এভাবে জগৎকে দেখে সর্বাবস্থায় স্বরূপানন্দেই ডুবে থাকেন। ব্যবহারে সব

কিছুতেই আছেন আবার কিছুতেই নেই। অহঙ্কারের লেশমাত্রও না থাকাতে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের সমস্ত ব্যবহারই অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত হয়ে সকলকে আনন্দ দান করত।

একবার পূর্ববঙ্গ থেকে আগতা আমার বৃদ্ধা মার সঙ্গে কলকাতায় দেখা করবার জন্য মহাপুরুষ মহারাজেরই টেলিগ্রাম পেয়ে আমি বৈদ্যনাথধাম থেকে মঠে আসি। কিন্তু এদিকে (আমি সঠিকভাবে না জানাবার দরুন) আমাকে দেখতে তাঁরা বৈদ্যনাথ চলে যান। মহারাজের কথিত ঠিকানায় তাঁদের না পেয়ে আমি মঠে ফিরে আসি। সব কথা শুনে তিনি আমাকে তিরস্কার করতে লাগলেন—"তুমি বোকা, মহাবোকা, তুমি একটি গাধা, কিছুমাত্র বুদ্ধি তোমার নেই। দ্যাখো দিকিন, বুড়ো মানুষ মিছিমিছি তাদের এত কষ্ট দিলে!" ইত্যাদি। তিরস্কার চলতেই থাকল। আমি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছি এবং গালাগাল শুনে যাচ্ছি আর ভাবছি যে, যা ভুল হবার তা তো হয়েই গেছে, এখন আমি তাঁর কথার মোড় ফিরাই কি করে। হঠাৎ মনে আসতেই বলে ফেললাম— "তা, মহারাজ, তাঁরা সেখানে বাবা বৈদ্যনাথের দর্শনাদি করে আসবেন।" ব্যস, এক মুহূর্তে যেন পট-পরিবর্তন হয়ে গেল! বাবা বৈদ্যনাথের পুণ্যস্মৃতির দিব্য প্রকাশে তাঁর মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। ভোলানাথ সব ভুলে গেলেন। দেশকালপাত্র সবই যেন বর্তমান দৃশ্যপট হতে বিলুপ্ত হলো। রইলেন মাত্র এক তিনি ও তাঁর বাবা বৈদ্যনাথ। আনন্দে গদগদ হয়ে করজোড়ে প্রণাম করতে করতে বলতে লাগলেন— "যা বলেছ, বাবা বৈদ্যনাথ, বৈদ্যনাথ, জয় বাবা বৈদ্যনাথ।" বৈদ্যনাথের চিন্তায় ভরপুর হয়ে গেলেন তিনি। একবার বৈদ্যনাথধামে বাসকালে তাঁর অপূর্ব আধ্যাত্মিক অনুভূতি হয়েছিল; তাই দেখেছি বৈদ্যনাথের প্রসাদ, নির্মাল্য, প্রসাদী মালা পেলে তিনি কত আনন্দিত হতেন এবং কত শ্রদ্ধার সঙ্গে তা ধারণ করতেন!

* * *

নিত্য প্রাতঃকালে জপধ্যানান্তে সব সাধুরা মঠে তাঁর ঘরে তাঁকে প্রণাম করতে যান। একদিন আমিও প্রণাম করে দাঁড়িয়ে আছি এবং তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী শুনছি। সে সময়ে কয়েক দিন যাবৎ বোম্বাই থেকে একটি দক্ষিণদেশবাসী ভক্ত স্ত্রীবিয়োগে কাতর হয়ে একমাত্র ছোট ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে প্রাণে একটু শান্তির আশায় মঠে বাস করছিল। ভক্তটি ঠাকুরঘরে জপধ্যান করে, মহারাজের সঙ্গ করে সাধুসঙ্গে নিজের ভাবে দিন কাটায়। কিন্তু তার আট-দশ বছর বয়সের ছোট ছেলেটি করে কি? কি করে তার দিন কাটে? খেলার সাথীও নেই। সে বাগানে ঢুকে ফুল ছেঁড়ে, গাছের ডালপালা ভাঙে। বাল-সুলভ চপলতায় তার দিন এরূপে নানাভাবে কাটে। সেদিন কেউ মহাপুরুষ মহারাজকে বলল যে, ঐ ছেলেটি বড় উপদ্রব করছে,

বাগানের গাছপালা নষ্ট করছে। ব্যস, এসব শুনে তিনি বিশেষ বিরক্তি প্রকাশ করে বলতে লাগলেন—"দ্যাখো দিকিন, ঠাকুরের বাগান নষ্ট করছে। স্বামীজী মঠ করেছেন—এখানে সাধু-ব্রহ্মচারীরা সাধনভজন করবে, পুজোপাঠ হবে, ঠাকুরের সেবা হবে।" এ জাতীয় তিরস্কার চলছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমরা দেখছি স্রোতের জল কোথায় দাঁড়ায়। অকস্মাৎ দৃশ্যের পটপরিবর্তন হলো। সে ভক্তটির কথা মনে পড়তেই করুণায় তাঁর চিত্ত বিগলিত হলো। মুখে যেন মূর্ত হয়ে উঠল করুণা। তিনি বলতে লাগলেন—"তা দ্যাখো, ঐ লোকটি খুব ভক্ত, ঠাকুরের উপর খুব ভক্তি আছে। ওর হবে। ও ঠাকুরকে ধরেছে। ওর হবে।...আহা! ও ঠাকুরের ভক্ত; ঠাকুরের কৃপায় নিশ্চয় ওর কল্যাণ হবে।" এভাবে ভক্তটিকে আশীর্বাদ করতে লাগলেন! পূর্ব মুহূর্তের গালাগাল যেন কোথায় ভেসে গেল! লোকটি ঠাকুরের ভক্ত—এ কথা বলতে বলতে তিনি ঠাকুরের চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেলেন। আমরা তো অবাক! ভাবলাম—এঁরা দেখছি কম্পাসের কাঁটা, টেনে যেদিকেই নাও না কেন, সে আবার ঠিক উত্তরমুখোই হয়ে যাবে।

* * *

মঠের পুরোনো ধ্যানঘরে ফলহারিণী ৺কালীপূজা হচ্ছে। দেবীকে বিবিধ ফল নিবেদন করা হয়েছে। ঘরের অর্ধেক স্থান জুড়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে নানাজাতীয় ফল। মহাপুরুষ মহারাজ ধীরে ধীরে উপরের ছাদ দিয়ে পূজার স্থানে এলেন। ৺দেবীকে কি কি ফল দেওয়া হয়েছে জিজ্ঞেস করলেন এবং তা দেখতে দেখতে হঠাৎ বললেন—'দেবীকে ডাব তো দেওয়া হয়নি? ঠিকই ঐ ফলটি দিতেই ভাঁড়ারি ভুল করেছে। তাড়াতাড়ি একজন ঠাকুরভাঁড়ারে গিয়ে ডাব নিয়ে এল। দেখলাম কি প্রখর দৃষ্টি! অথচ অন্য কারও নজরেই তা ধরা পড়েনি।

মহাপুরুষজীর কণ্ঠস্বর অতি মধুর ছিল। একদিন আমাকে দেখে সুমিষ্ট স্বরে 'কি, গিরিজা' বলে সম্বোধন করে সিঁড়ির উপরের বারান্দায় পায়চারি করতে করতে নিজের ভাবে 'আনন্দবন গিরিজাপত নগরী' গানটি কি সুন্দরই না গেয়েছিলেন!...

ঠাকুরের নিকট কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করতে বলতেন। করজোড়ে বলেছিলেন—"ঠাকুরকে বলবে, ঠাকুর! তুমিই আমার সব। আমি তোমার জন্য সব ছেড়েছুড়ে এসেছি, তুমি ভিন্ন আর আমার কেউ নেই। তুমি কৃপা করে আমার সব মলিনতা দূর করে দাও, তোমার দিকে আমার মন টেনে নাও, কামক্রোধাদি বৃত্তিগুলি যাতে শান্ত হয়ে যায়, তাই করে দাও।" বড়ই করুণস্বরে এই প্রার্থনাটি শিখিয়েছিলেন। প্রার্থনা-কালীন তাঁর সেই আর্তি ও কাতরভাব দেখে আমার হৃদয়ও অভিভূত হয়ে পড়েছিল।

* * *

একদিন ঘরে তিনি একা চেয়ারে বসে আছেন আপনভাবে। প্রায় নিমীলিত চোখ। খুবই অন্তর্মুখী অবস্থা। আমি ঘরে ঢুকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি এবং তাঁকে দেখছি। কিছুক্ষণ পরে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে "সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম" এই বাক্য স্বগতভাবে উচ্চারণ করে চোখ তুলে আমার দিকে তাকালেন। আহা! কি স্নিগ্ধ সে দৃষ্টি! মনে হলো এতক্ষণ তিনি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম-সমুদ্রে পরম আনন্দে নিমজ্জিত হয়ে ছিলেন। সেই আনন্দেরই দীপ্তি তাঁর শ্রীমুখমণ্ডলে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল এবং তাঁর পরমপাবনী দৃষ্টির ভিতর দিয়ে তা আমার অন্তরও প্লাবিত করে দিল।

সরল শিশুটির মতো যখন সামান্য জিনিস নিয়ে তিনি আনন্দ করতেন তখন কি সুন্দরই তাঁকে দেখাত! কত লোকেই তো হাসে, কিন্তু তাঁর মুখে যে হাসি দেখেছি, সে হাসি আর কোথাও দেখিনি। তাঁর হাসিতে প্রতি রোমকূপের ভিতর দিয়ে যেন দিব্য আনন্দের ঝলক চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত হতো এবং তার প্রভাবে উপস্থিত সকলেও সব দুঃখকষ্ট ভুলে যেত। রঙ্গরসপ্রিয়ও ছিলেন তিনি খুব। মধুপুরে থাকতে একদিন বলেছিলেন, "এখানকার ঘোড়াগুলি যেন ম্যালেরিয়ার রোগী। কি রকম জান? এই মুখটা সরু, পোঁদটা সরু আর পেটটা মোটা।" হাত নেড়ে নেড়ে বলছেন, আর সেই দিব্য হাসি! সে-হাসির প্রভাব উপস্থিত সকলের মধ্যেও সংক্রামিত হলো। সে আনন্দ ভোলবার নয়।

একবার কিছুদিন মঠবাসের পর আমরা বৈদ্যনাথধামে ফিরে যাব; তাঁর কাছে বিদায় নিতে গিয়েছি। তিনি আপনমনে অন্তর্মুখী অবস্থায় চেয়ারে বসেছিলেন। প্রণাম করে বিদায় নেবার সময় শান্তগম্ভীরস্বরে তিনি বললেন—"এখানেও যাঁর, সেখানেও তাঁর। সেখানে গিয়েও তাঁরই কাজ করে ধন্য হবে।" পরিপূর্ণ হৃদয়ে আমরা বিদায় নিলাম।

* * *

একবার বিশেষ অসুস্থ হওয়ায় মহাপুরুষ মহারাজ বায়ুপরিবর্তনের জন্য মধুপুর গিয়েছিলেন। তাঁকে দর্শন করতে আমরাও সেখানে গিয়েছি। দুপুরে আহারের পর তিনি শুয়ে বিশ্রাম করছিলেন। আমি তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। একজন দক্ষিণদেশবাসী ভক্ত বেলুড় মঠ হয়ে সেখানে মহারাজের কাছে দীক্ষাপ্রার্থী হয়ে এসেছে, কিন্তু তাঁর শরীর বিশেষ অসুস্থ, তাই দীক্ষা হবে না শুনে লোকটি মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বাইরের বারান্দায় বসে কাঁদছে। তখন বেলা প্রায় তিনটে। তিনি চোখ বুজে জেগেই ছিলেন। হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—"সে লোকটি কোথায়? তাকে ডেকে নিয়ে এস তো!" তাঁর সেবকদের বলে আমি লোকটিকে ডেকে আনলাম। তিনি আমাকে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বাইরে যেতে বললেন। কিছুক্ষণ পরে সে

লোকটি বাইরে আসতেই দেখলাম তার মুখে আনন্দ ও গভীর শান্তির প্রতিচ্ছায়া। বেচারা কতদূর থেকে এসেছে; আজ তার বাসনা পূর্ণ হলো। পরিপূর্ণ হৃদয়ে সে দেশে ফিরে গেল। ঠাকুর বলতেন, "সচ্চিদানন্দই গুরু।" সেই পরমপাবনী গুরুশক্তির কৃপা যে কখন কার উপর কিভাবে বর্ষিত হবে তা আমাদের বুদ্ধির অগোচর। কিন্তু এ ব্যাপারেও তিনি সত্যই একটি মাধ্যম মাত্র ছিলেন। বিন্দুমাত্র গুরু-অভিমানও তাঁতে ছিল না। শিষ্য বলে কেউ পরিচয় দিলে তিনি বলতেন—"আমি কারও গুরু নই। গুরু হচ্ছেন ঠাকুর। তাঁর দাস আমি, নাম শুনিয়ে দিই মাত্র। কেউ এলে তাকে ঠাকুরের পায়ে সঁপে দিই—এটুকুই আমার কাজ। আমি তাঁর দাস। এ শরীর এ জন্যেই রয়েছে। শরীর থাক আর যাক, আমি সকলকে তাঁর পরমপাবন নাম শুনিয়ে যাব।"

মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের হিন্দি 'সমন্বয়' পত্রিকার সম্পাদক পাটেশ্বরীপ্রসাদ মঠে এসে একদিন দীক্ষার কথা বলতে মহারাজ বলেছিলেন—"দীক্ষা আর কি? ঐ ঠাকুরজীর নাম। ঐ আমাদের দীক্ষা। তাঁর নাম জপ কর তো? তবে আর কি? আমাদের ঐ সম্বল। ঐ নামই আমরা করে থাকি এবং দিয়ে থাকি। তিনি অবতার যিনি রাম ও কৃষ্ণ, তিনিই রামকৃষ্ণ। দেহত্যাগের পূর্বে তিনি নিজেই এ কথা বলেছিলেন। তাঁর নাম করলেই সব হলো। আর দীক্ষা কি?" হৃষ্টচিত্তে পাটেশ্বরীপ্রসাদ ফিরে গেল।

মধুপুরে একদিন আমরা তাঁকে দর্শন করতে গিয়েছি। আমাদের একজন জিজ্ঞেস করলেন—"মহারাজ, জপ করবার সময় কি মন্ত্রের প্রত্যেক অক্ষরের দিকে মন রাখতে হবে, না একটামাত্র ভাব আশ্রয় করে জপ করতে হবে?" তিনি বললেন—"নিশ্চয় একটা ভাব আশ্রয় করে করতে হবে। তবে মন্ত্রের দিকে খেয়াল না রাখলে ভাবও আসে না, মনও বিক্ষিপ্ত হয়।" অন্য একজন জিজ্ঞেস করলেন—"কয়েকমাস পূর্বে আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, পূজনীয় শরৎ মহারাজের কাছে ব্রহ্মচর্য নিচ্ছি। তিনি তো দেহ রাখলেন, তা এখন কি করে আমার ব্রহ্মচর্য হবে?" মহারাজ বললেন—"স্বপ্নে দেখেছ, ভালই হয়েছে। তা তোমার ব্রহ্মচর্য হয়ে যাবে। আমরাই দেবো। তোমার ওজন্যে কোন চিন্তা করতে হবে না।"

কোন সাধু জিজ্ঞেস করলেন—"মহারাজ, কামভাবটা যায় কি করে?" মহাপুরুষ মহারাজ বললেন—"কাম কি একেবারে কারও যায় রে বাপু? তবে তাঁর নাম করতে করতে ধীরে ধীরে শান্ত হবে। যে সব জিনিস মনে কুভাব আনে তা থেকে দূরে থাকবে। যখন কুভাব মনে আসে তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে কড়জোড়ে প্রার্থনা করবে—'ঠাকুর, আমি তো ঘর-সংসার ছেড়ে এসেছি, আমার আবার এসব কেন?' এভাবে প্রার্থনা করতে করতেই যাবে।"

সাধু—ধীরে ধীরে কাম চলে যাবে তো?

মহারাজ—"নিশ্চয়ই যাবে। নিশ্চয়—ও যাবেই। তাঁর নাম কর, ধ্যান কর। খুব ধ্যান কর, তাহলেই যাবে। তাঁর নামে ওসব ঠিক হয়ে যাবে।"

অনুরূপ প্রশ্নের উত্তরে আর একদিন মহাপুরুষজী কোন সাধুকে বলেছিলেন—"মনে অশান্তির জন্য কিছু ভেবো না। তিনি ভের্তরে রয়েছেন। তিনিই শান্তি দেবেন। তোমার হবেও। তাঁর কাছে না হলে এখানে এলে কি করে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে? মনের কুভাবের কথা যা বলছো, ওসব চলে যাবে। খুব তাঁর নাম কর। জপ-ধ্যান কর। কেঁদে কেঁদে তাঁর কাছে প্রার্থনা কর। আপনা থেকেই সব যাবে। তোমার অন্তরে তিনি রয়েছেন। সুতরাং ওসব শরীরের ধর্ম যখন কিছু হয়, তখন ঠাকুরের কাছে ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করে বলবে—'ঠাকুর! এসব তো আমার নয়। আমি তোমার জন্য সব ছেড়ে এসেছি, তুমি আমায় রক্ষা কর।' যত প্রার্থনা করবে তত শান্তি পাবে। প্রার্থনা করলে তাঁর অস্তিত্ববোধটা খুব হয়। সহায়হীন হয়ে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করলে তাঁর অস্তিত্ববোধটা খুব হয়। তাঁর নামে সব হবে। কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করে বলবে—'ঠাকুর! সাধন-ভজন করে আমি তোমায় পাব সে আশা আমার নেই, তুমি কৃপা করে আমায় দেখা দাও। আমার মনের সব দুর্বলতা, মলিনতা দূর করে দাও। আমি শরণাগত। তুমি আমায় রক্ষা কর।' 'রামকৃষ্ণনাম'—এতে সমস্ত কামক্রোধাদি রিপু দূর হয়ে যাবে। এই যে ঠাকুর দেখছ, দেখতে চৌদ্দ পোয়া মানুষ বটে, কিন্তু এঁর ভেতরেই জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, কর্ম—যা কিছু বলো সব আছে। তোমরা তাঁর কাছে এসেছ। তিনি তোমাদের ভিতরে চৈতন্যরূপে রয়েছেন। চারদিকে সমস্ত জগৎ কাম-কাঞ্চনে মুগ্ধ হয়ে, জড় হয়ে রয়েছে। আর তোমরা সব ছেড়ে তাঁর কাছে এসেছ, তোমাদের হবে না? নিশ্চয়ই হবে। নিজের উপর বিশ্বাস রাখ। আত্মবিশ্বাস চাই। তিনি ভিতরে রয়েছেন—তিনি নিশ্চয়ই সব করে দেবেন।"

সাধু—শীঘ্রই হবে তো?

মহারাজ—হবে মানে কি? তাঁর নাম করতে আনন্দ হবে। তাঁর প্রতি অকপট ভালবাসা হবে। খুব তাঁর নাম কর। 'কথামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থ রোজ কিছু কিছু পড়বে, ওতে খুব সার সার কথা আছে।

'সকলের ভিতর চৈতন্যরূপে শ্রীঠাকুর রয়েছেন'—এ ভাবটা মহাপুরুষ মহারাজ খুব বলতেন। এভাবেই সর্বদা যেন তিনি অনুপ্রাণিত হয়ে থাকতেন। তাঁকে দেখলেই মনে হতো তিনি যেন এক সর্বব্যাপী চৈতন্যসত্তায় ডুবে রয়েছেন, আর জগৎটা

যেন তাঁর কাছে ছায়ার মতো ভাসছে। স্বভাবতই তাঁর চিত্ত ছিল সমাধিপ্রবণ। একটু একা থাকলেই তাঁর মন অন্তর্মুখ হয়ে যেত। কোন ধর্মগ্রন্থ পড়াও এজন্য তাঁর এগুতো না। কয়েক লাইন পড়লেই তাঁর চিত্ত সেভাবে তন্ময় হয়ে সত্তার অতলতলে ডুবে যেত। তখন কার বা বই, আর কেই বা পড়ে! নিজ মুখেও তিনি একথা স্বীকার করেছেন। সারা জীবন ধ্যান সমাধি ইত্যাদির অভ্যাসেই বহু বৎসর কাটিয়েছিলেন, তাই অন্তর্মুখিনতা যেন তাঁর স্বভাবে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। শেষ বয়সে রোগজীর্ণ শরীরেও রাত তিনটায় ধ্যানে বসার কথায় একদিন বলেছিলেন—"কি করি বল? ষাট বছরের অভ্যাস। ও কি যায়?" তাঁর এ সমাধিপ্রবণতা শেষ বয়সে আরও বেড়ে গিয়েছিল। স্পষ্টই মনে হতো, এ সময় তাঁর চিত্ত পঞ্চম ও ষষ্ঠ জ্ঞানভূমির মধ্যে পর্যায়ক্রমে বিচরণ করছে। তাঁর সান্নিধ্যমাত্রেই তখন সকলে প্রাণে এক অনির্বচনীয় দিব্যশান্তি, আনন্দ ও উৎসাহ অনুভব করতেন।

ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই তাঁর সমাধিপ্রিয় চিত্ত ক্রমশ ভক্তি, ভক্ত, সেবা-পূজাদির প্রতি একটা বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করতে থাকে। নইলে লোককল্যাণ সাধিত হবে কি করে? উচ্চ তত্ত্বভূমিতে আরূঢ় হয়েও এবং তাতে লীন হয়ে থাকবার যোগ্যতা ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও মহাপুরুষ মহারাজকে তখন তাঁর পরমপ্রিয় প্রভু রামকৃষ্ণ-কথিত 'বিজ্ঞানী' সাজতে হলো। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, "নারদাদি ব্রহ্মজ্ঞানের পর ভক্তি নিয়ে ছিলেন। এরই নাম 'বিজ্ঞান' (কথামৃত)। ঈশ্বর আছেন—এইটি বোধে বোধ, তার নাম 'জ্ঞান'। তাঁর সঙ্গে আলাপ, আনন্দ করা—বাৎসল্যভাবে, সখ্যভাবে, দাস্যভাবে, মধুরভাবে—এরই নাম 'বিজ্ঞান'। জীবজগৎ তিনি হয়েছেন—এইটি দর্শন করার নাম 'বিজ্ঞান' (কথামৃত)।"

জ্ঞানের পরও ভক্তি-ভক্ত আশ্রয় করে মহাপুরুষজী শেষ অবস্থায় কি মধুর লীলাই না করে গেলেন! যেন জগন্মাতার ছোট্ট শিশুটি। মার নামে আনন্দ, কীর্তনে আনন্দ, মার মূর্তিদর্শনে আনন্দ, মার সেবা-পূজার কথায় আনন্দ! আমরা তাঁরই নির্দেশে প্রাতে হংসেশ্বরীমাতার পুজো দিতে গিয়েছি! কি আকুল আগ্রহেই না তিনি সারাদিন কাটিয়েছেন! সন্ধ্যার পূর্ব হতেই বারবার তিনি সেবকদের জিজ্ঞেস করছেন, পুজো দিয়ে আমরা ফিরেছি কিনা। সন্ধ্যার পর আমরা ফিরতে মার প্রসাদী সিন্দূর, মালা, মিষ্টান্ন, নির্মাল্যাদি মস্তকে ধারণ করে তাঁর কি আনন্দ! অশীতিপর বৃদ্ধ শিশুটি যেন মার সাক্ষাৎ দর্শনে ও স্পর্শে পুলকিত! তাঁর ঐ অবস্থা যে দেখেছে সেই মুগ্ধ হয়েছে। ভাষায় তার বর্ণনা অসম্ভব।

তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের এ রকম লীলাদর্শন করেই বোধ হয় কোন রসিক বিদ্বান গেয়েছেন—

দ্বৈতং বন্ধায় নূনং প্রাক্ প্রাপ্তে বোধে মনীষয়া।
ভক্ত্যা যৎ কল্পিতং দ্বৈতমদ্বৈতাদপি সুন্দরম্ ॥

তত্ত্বজ্ঞানলাভের পূর্বে দ্বৈতজ্ঞান বন্ধনকারী বটে, কিন্তু শুদ্ধান্তঃকরণে সম্যক জ্ঞানোদয়ের পর ভক্তিপ্রণোদিত হয়ে তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের যে কল্পিত উপাস্য-উপাসকাত্মক দ্বৈত ব্যবহার তা অদ্বৈত অপেক্ষাও সুন্দর।

পরম সৌভাগ্যবশে প্রভুর প্রিয় সন্তান 'বিজ্ঞানী' শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের এ দিব্য মনোহর লীলা দর্শন করে আমরা ধন্য হয়েছি এবং পূর্বোক্ত শ্লোকের যাথার্থ্য বিষয়েও নিঃসন্দেহ হয়েছি। কিন্তু ঐ ভাবের গভীরতা আমরা পরিমাপ বা সাক্ষাৎ উপলব্ধি করতে পারি কি? না, তা পারি না। কারণ আমরা সেরূপ অধিকারী নই এবং এ অবস্থা সাধারণ সাধকের আয়ত্তেও নয়। তাই বশিষ্ঠদেব বলেছেন—তাদৃশা এব জানতে।

'যথাশ্রুত'—কয়েকটি ঘটনা ঃ বিভিন্ন সময়ে সাধুদের মুখে শোনা মহাপুরুষ মহারাজ সম্বন্ধে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ এখানে করা হচ্ছে। এ থেকে তাঁর দিব্য গুণরাজির কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস করি।

গোপাল মহারাজ (স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ)—আমরা রাজা মহারাজকে কি বুঝতাম? মাদ্রাজে দেখলাম তাঁরই গুরুভাই মহাপুরুষ মহারাজ তাঁকে কত শ্রদ্ধা করছেন। একদিন বলছেন—"মহারাজ, মঠে চল। গরুগুলোর কষ্ট হচ্ছে। সেখানে গোয়ালঘর করতে হবে। কোথায় হবে তা তুমি দেখিয়ে না দিলে তা হবে না। তুমি একেবারে ধ্যানরাজ্যে ডুবে থাকলে মঠ-মিশনের কাজ কি করে চলবে?" মহারাজের প্রতি এঁদের শ্রদ্ধা দেখে অবাক হতাম।...

কানাই মহারাজ (স্বামী অনন্তানন্দ)—আলমোড়ায় তপস্যাকালে হরি মহারাজ ও মহাপুরুষ মহারাজের সেবা করতাম। হরি মহারাজ 'জগন্মিথ্যাত্ব' খুব বলতেন। একদিন বলছেন—'সব অসৎ'। মহাপুরুষজী বললেন—"না না, তা কেন? সবই সৎ।" দুটি দৃষ্টিভঙ্গি।...

* * *

স্বামী যতীশ্বরানন্দ—মহাপুরুষ মহারাজ বলতেন—"আমি কি আর প্রেসিডেন্ট হবার উপযুক্ত? আমি প্রেসিডেন্ট নই। মহারাজই প্রেসিডেন্ট, আমি তাঁর দাস।" কি অদ্ভুত শ্রদ্ধাই না ছিল এঁদের মহারাজের প্রতি! নিজের শিষ্যদের চেয়েও তিনি (মহাপুরুষজী) আমাদের অধিক স্নেহ করতেন আমরা মহারাজের শিষ্য বলে।...

* * *

স্বামী অপর্ণানন্দ—আলমোড়ায় চিলকাপেটা হাউসে হরি মহারাজ ও মহাপুরুষ মহারাজ তপস্যা করেন। কানাই মহারাজও আছেন, তাঁদের সেবাটেবা করেন। হরি মহারাজ ৫।৭ দিন কোন কথাই বলেন না। নিজের ভাবেই মগ্ন হয়ে আছেন। কানাই মহারাজ খাবার দেন, তিনি খেয়ে চলে যান। কানাই মহারাজ মহাপুরুষজীকে বললেন—'মহারাজ! কি দোষ করেছি বুঝতে তো পারছি না, উনি তো আমার সঙ্গে কথাই বলেন না, গুম হয়ে থাকেন।' মহাপুরুষজী উত্তর দিলেন—"তাতে কি হয়েছে? সাধুর মৌজ। উনি কথা না বললে, তুমিও সাধু—তুমিও কথা বলবে না। উনি তো আমার সঙ্গেও কথা বলেন না, তখন আমিও বলি না। সাধুর মর্জি, তাতে কি হয়েছে? এক সময়ে আমরা দু-জন একই ঘরে থাকতাম; এমন হয়েছে যে, একমাস দু-জনের কোন কথা নেই, তাতে কি হয়েছে? দুজনেই ভগবদ্ভাবে তন্ময় হয়ে থাকতাম।"...

* * *

জনৈক প্রবীণ সন্ন্যাসি-কথিত—শ্রীমহারাজের দেহত্যাগের পরের কথা। সকলেরই মন তখন বিমর্ষ। সেদিন Governing Body-র meeting হবে। আগেই মহাপুরুষ মহারাজ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে গেছেন। Visitor's room-এ meeting-এর স্থান হয়েছে। শরৎ মহারাজ মঠে এসেই সোজা visitor's room-এ মিটিং-এ গেছেন। দুটি আসন পাতা হয়েছে—একটি ওঁর, আর একটি প্রেসিডেন্ট মহাপুরুষ মহারাজের জন্যে। মহাপুরুষজী আসছেন না, দেরি হচ্ছে। গান-টান হয়ে গেল। শরৎ মহারাজ আমায় পাঠালেন মহাপুরুষজীকে ডেকে আনতে তাঁর নাম করে। তিনি আপনভাবে নিজের ঘরে বসেই আছেন। আমি গিয়ে বলতে যেন চৈতন্য হলো। বললেন—"অ্যাঁ, মিটিং! হ্যাঁ, তা, প্রেসিডেন্ট তো আমি নই। মহারাজই প্রেসিডেন্ট। মহারাজের আসন করেছ? শঙ্কর! একখানা আসন একে দাও তো। যাও ফুলটুল দিয়ে সাজিয়ে মহারাজের আসন করগে। আমি যাচ্ছি।" আমি ফিরে গিয়ে আর একটি আসন করছি দেখে শরৎ মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন, "ও কি?" আমি মহাপুরুষ মহারাজের কথা বলায় শরৎ মহারাজ চুপ করে রইলেন। মহারাজের আসনের পাশে মহাপুরুষ মহারাজ যেন অনুগত সেবকের মতো এসে বসলেন।...

* * *

গদাই মহারাজ কথিত—শ্রীমহারাজ একজন ভক্তকে দীক্ষা দেবেন বলেছিলেন; কিন্তু তার আগেই তাঁর শরীর যায়। পরে সে স্বপ্নে মহারাজের কাছ থেকে দীক্ষা পায়। কিন্তু তাতে তার বিশ্বাস হলো না। গেল সে মহাপুরুষজীর কাছে। তিনি

বোঝানো সত্ত্বেও ভক্তটির বিশ্বাস হয় না। তখন এক নির্দিষ্ট দিনে মহাপুরুষজী রাজা মহারাজের ঘরে ধ্যানে বসলেন। ঘণ্টা দুই বাদে ভক্তটিকে ডেকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—"মহারাজ তোমায় এই মন্ত্র দিয়েছেন, এই তো তোমার ইষ্ট?" ভক্তটি অবাক হয়ে তা স্বীকার করলে। "তবে আর কেন বাবা অবিশ্বাস?" মহাপুরুষজী ভক্তটিকে বললেন।...

* * *

স্বামী হরানন্দ-কথিত—মঠে আমার খুব জ্বর আর মাথাধরা। মহাপুরুষজী এসে আমার মাথা টিপতে বসে গেলেন। আমি উঠে পড়লাম। মহাপুরুষ মহারাজ বললেন—"কেন, তাতে কি হয়েছে?"...

মহাপুরুষজী বলতেন, "প্রত্যহ দু-চার মিনিটের জন্যেও সুষুপ্তি না হলে মানুষ বাঁচতেই পারে না। এক পারেন সমাধিস্থ মহাপুরুষরা, কারণ তাঁরা স্ব-স্বরূপেই স্থিত থাকেন তখন। তাতেই তাঁদের সব অবসাদ কেটে যায়। অপর সকলের কিছু সময়ের জন্যেও সুষুপ্তি চাই-ই। যেখান থেকে এসেছ, সেখানে ফিরে যেতেই হবে Circuit complete করতেই হবে।"...

মহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতি

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

মহাপুরুষ মহারাজের প্রথম দর্শনলাভ করেছিলাম বেলুড় মঠে ১৯২৫ সালের শিবরাত্রির দিন বিকালবেলায়। প্রায় এগারো মাস তিনি দক্ষিণভারত ও বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে কাটিয়ে মাত্র কয়েক দিন আগে মঠে ফিরেছেন। বহু ভক্ত খুব ব্যাকুলতা নিয়ে ঐদিন তাঁকে দর্শন করতে এসেছিলেন। আমরা কয়েকজন কলেজের ছাত্র একসঙ্গে গিয়েছিলাম। একজন এম-এ ক্লাশের ছাত্র শ্রীমহাপুরুষজীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তাঁর কাছে মহাপুরুষ মহারাজের সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছিলাম। তিনি পরে বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী হয়েছিলেন।

সকলে গঙ্গার ধারের বারান্দায় বসে এবং দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন, কখন মহারাজ নিচে নামবেন। আমার তরুণ মনে খুব কৌতূহল ও আশা জেগে রয়েছে। এর আগে অনেক সাধুর দর্শন পেয়েছি, কিন্তু আজ একটু পরেই শ্রীশ্রীঠাকুরের

একজন অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ মহারাজকে সাক্ষাৎ দেখতে পাব। না জানি তিনি কেমন!

হঠাৎ বারান্দার ছোট ঘরটির পূর্বমুখী দরজা খুলে গেল। মহাপুরুষ মহারাজ হাসিমুখে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন, সকলকে দেখে আনন্দধ্বনি করলেন, পরে বারান্দার বড় বেঞ্চিতে গঙ্গার দিকে মুখ করে বসে ভক্তদের সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন। তাঁর দীর্ঘ আকৃতি, প্রশান্ত মূর্তি এবং আনন্দপূর্ণ কথাবার্তা আমার প্রাণকে বড় আকৃষ্ট করল। ভক্তেরা একে একে প্রণাম করছিলেন। পূর্বোক্ত বন্ধুর সঙ্গে আমিও প্রণাম করলাম। আমরা শিবরাত্রির উপবাস করেছি শুনে মহাপুরুষজী "বাঃ বাঃ" বলে প্রশংসা করলেন। পরে সকলকে বলতে লাগলেন, "আজ শিবরাত্রি, পুণ্যদিন। এখানে সারারাত পুজো হবে, ভজন নৃত্যাদি হবে, কত আনন্দ করবে সকলে।" শিবের ভাবে মাতোয়ারা হয়ে যেন কথাগুলি বলছিলেন। আমি ভাবলাম এইজন্যই তাঁর নাম শিবানন্দ। একটু পরে তাঁর সেবক তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন তাঁর কিছু খাবার সময় হয়েছে। অমনি মহাপুরুষজী হেসে বললেন, "ঠিক ঠিক, কিছু খেতে হবে তো।" সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমরা বসো একটু, আমি একটু কিছু খেয়ে আসছি।" তাঁর এই সঙ্কোচহীন বালকের মতো ব্যবহার আমাকে তখন খুব মুগ্ধ করেছিল, মনে পড়ে।...

ফাল্গুন ও চৈত্র গেল। বৈশাখ মাসে তিনি কৃপা করে আমাকে মন্ত্রদীক্ষা দিলেন। সেই সময়কার একটি উপদেশের তাৎপর্য যত দিন যাচ্ছে ততই হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে। বলেছিলেন, "বাবা, ঠাকুরের পায়ে সব সমর্পণ করে দাও—যা কিছু আছে সব।" মনে পড়ে খুব জোড় দিয়ে 'সব' কথাটি বলেছিলেন। ভগবানের চরণে নিজের বলতে যা কিছু সব একটির পর একটি সমর্পণ করে দেওয়াই তো উৎকৃষ্ট আধ্যাত্মিক সাধনা। নিজের বাসনা-কামনা, দেহ-মন-প্রাণ-বুদ্ধি-অহঙ্কার, নিজের স্বার্থানুসন্ধান, ভালবাসা, পাপ-পুণ্য, ভূত-ভবিষ্যৎ, এমনকি নিজের বন্ধন-মুক্তির ভাবনাও ভগবানকে সঁপে দিতে হবে। এক দিনে হবার নয়, সারাজীবন ধরে এই আত্মসমর্পণ চালিয়ে যেতে হবে।

আত্মসমর্পণ ও শরণাগতির প্রসঙ্গে পরে কয়েকবার মহাপুরুষ মহারাজকে খুব মাতোয়ারা ভাবে কথা বলতে শুনেছি। একদিন (সম্ভবত ১৯৩১-৩২ সালে) সকালবেলায় তাঁর ঘরে সাধুরা প্রণাম করতে এসেছেন। চণ্ডীর একাদশ অধ্যায়ের দেবীস্তুতির ২৯তম শ্লোকটির কথা উঠল। মহাপুরুষজী একজন সাধুকে শ্লোকটি পড়তে বললেন, তারপর তিনি বারবার বলতে লাগলেন, "দেখ, কী সুন্দর ভাব! 'ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং, ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি।' মায়ের চরণে যথার্থ

শরণ নিতে পারলে মানুষের আর কোনও বিপদ নেই। শুধু তাই নয়, সেই ভক্ত অপর লোকের আশ্রয়স্বরূপ হয়। মনের শক্তি, অভয় তার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়।"...

একদিন সন্ধ্যারতির পর মহাপুরুষ মহারাজকে কলকাতার একটি শাখাকেন্দ্রের জনৈক সন্ন্যাসী প্রণাম করে বিদায় নিতে এসেছেন। ঘরে ঢুকে তিনি দেখলেন মহাপুরুষজী স্থির হয়ে খাটের উপর বসে আছেন এবং করজোড়ে ঠাকুরের উদ্দেশে প্রণাম করতে করতে বলছেন, "শরণাগত, শরণাগত।" সাধুটি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। একটু পরে মহাপুরুষজী তাঁকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "কে?" তিনি এগিয়ে এসে প্রণাম করে কলকাতার জনৈক ভক্তের (নাম হরিবাবু) অসুখের সংবাদ মহাপুরুষজীকে বললেন। মহাপুরুষজীর ভাবের ঘোর তখনও কাটেনি। বললেন, "হরিবাবু? হরিবাবু শরণাগত তো?" সাধুটি উত্তর দিলেন, "হাঁ, মহারাজ, হরিবাবু শরণাগত।" মহাপুরুষজী তখন আবার ভাবস্থ হয়ে বললেন, "তবে আর কোনও ভয় নেই। শরণাগত হলে আর কোনও ভয় নেই।"

একদিন মঠের ঠাকুরঘরের পূজারি মহাপুরুষ মহারাজকে সকালে প্রণাম করতে এসেছেন। তাঁকে খুব আশীর্বাদ করলেন এবং হিন্দি ও বাংলা মিশিয়ে গাঢ় ভাবের সঙ্গে বললেন, "তেরা ডর নহী। না, তোর কোনও ভয় নেই। তুই যে তাঁর শরণাগত ভক্ত।"

* * *

১৯২৫ সালের ডিসেম্বরে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের জন্মদিনে তাঁর দুই গুরুভ্রাতা স্বামী সারদানন্দজী ও স্বামী অভেদানন্দজীর সঙ্গে তাঁকে একত্র দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল। স্বামী অভেদানন্দজী তাঁর একজন ব্রহ্মচারী শিষ্যকে মহাপুরুষজীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বললেন, "এর নাম—চৈতন্য।" মহাপুরুষজীর সেদিন খুব মাতোয়ারা ভাব। অমনি বলে উঠলেন, "এখন আর পৃথক চৈতন্য দেখি না, সব এক চৈতন্য।" মঠের ভিতর দিককার বেঞ্চে উঠানের দিকে মুখ করে তিন জনে বসলেন। মহাপুরুষজীকে একটি নূতন তুলার জামা পরানো হয়েছিল। শরৎ মহারাজের হাতে লাঠি ছিল। একজন ফটো নিয়েছিলেন। আশে-পাশে অনেক ভক্ত দাঁড়িয়ে। ঐ ফটোটি কোনও কোনও বইতে ছাপা হয়েছে।

যতদূর স্মরণে আসে, বোধ করি ঐ বৎসরই পূজ্যপাদ প্রেমানন্দ মহারাজের জন্মদিনে বিকালবেলায় মঠে গঙ্গার ধারের বারান্দায় মহাপুরুষ মহারাজের উপস্থিতিতে একটি আলোচনা-সভা হয়েছিল। মহাপুরুষজী বেঞ্চে উপবিষ্ট। সাধু ও ভক্তেরা বারান্দায় মাদুর পেতে তাঁর পদতলে ও পাশে বসেছিলেন। স্বামী

প্রেমানন্দজীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেছিলেন এমন কয়েক জন সাধু পরপর তাঁর কথা বলতে লাগলেন। মহাপুরুষজী স্থির হয়ে নিবিষ্ট মনে শুনছিলেন। ললিত মহারাজ (স্বামী কমলেশ্বরানন্দ) খুব ভাবের সঙ্গে যখন বাবুরাম মহারাজের ভালবাসার কথা বলছিলেন তখন মহাপুরুষজীকে বেশি ভাবাবিষ্ট মনে হলো। তারপর ললিত মহারাজ কোনও একটি উৎসবে বাবুরাম মহারাজের মাতোয়ারা ভাবের বর্ণনা করতে করতে বললেন, "বাবুরাম মহারাজ হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে মহাপুরুষ মহারাজকে আলিঙ্গন করে বললেন, 'এই আমাদের শিব, জীবন্ত শিব' এবং মহাপুরুষজীকে নিয়ে নাচতে লাগলেন।" নিজের সম্বন্ধে স্মৃতিকথা শুনে মহাপুরুষজী একটু হাসলেন। বাবুরাম মহারাজ সম্বন্ধে এইসকল আলোচনা যখন চলছে তখন একবার মহাপুরুষজী চারপাশে তাকিয়ে তাঁর জনৈক সন্ন্যাসী সেবককে দেখতে না পেয়ে বললেন, "—কোথায়? তাকে ডাক।" সেবক এলে মহাপুরুষ মহারাজ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় ছিলে? বাবুরাম মহারাজের সম্বন্ধে কত কথা হচ্ছে! কোথায় এসব শুনতে পাবে? বসে শোন।" আলোচনা হয়ে গেলে যে সব সাধু বাবুরাম মহারাজের স্মৃতিকথা বলেছিলেন তাঁদের সকলের দিকে মহাপুরুষজী খুব স্নেহভরে তাকাতে লাগলেন। ললিত মহারাজের পিঠ চাপড়ে খুব আশীর্বাদ করলেন।

ললিত মহারাজ যে আশ্রমে থাকতেন (ভবানীপুর গদাধর আশ্রম) একবার ওখানে প্রতিমায় অন্নপূর্ণাপূজা উপলক্ষ্যে কয়েক জন ছাত্রবন্ধুসহ স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করতে গিয়েছিলাম। মঠ থেকে মহাপুরুষজী এবং উদ্বোধন হতে পূজনীয় শরৎ মহারাজ এসেছিলেন। মহাপুরুষ মহারাজ আগেই পৌঁছেছিলেন এবং প্রতিমা-দর্শনাদির পর একটি ঘরে বসেছিলেন। অনেক ভক্ত সেখানে সমবেত। এমন সময় পূজনীয় শরৎ মহারাজ পৌঁছলেন। তিনি মহাপুরুষজীকে প্রণাম করলেন। মহাপুরুষজী চেয়ার থেকে উঠে সাদরে শরৎ মহারাজকে আলিঙ্গন করে বললেন, "এস, শরৎ মহারাজ, এস।" আহা, দুই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের সেই মিলন দৃশ্য কি মধুর!

ললিত মহারাজের কাছে পরে একবার শুনেছিলাম, কয়েক বৎসর আগে তিনি মঠে এসে একদিন মহাপুরুষজীকে প্রণাম করতে গেলে মহাপুরুষজী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "ললিত, এখন কি পড়ছ?" (ললিত মহারাজ বরাবরই শাস্ত্রাধ্যয়নে খুব উৎসাহী ছিলেন)। ললিত মহারাজ কোনও উপনিষদের নাম করলে মহাপুরুষজী ভাবস্থ হয়ে বলে উঠলেন, "আমাদের জীবনই তো উপনিষদ্। আমাদের জীবন পড়তে পার?"...

১৯২৭ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি মহাপুরুষ মহারাজ দক্ষিণভারত, বোম্বাই ও নাগপুর ভ্রমণ শেষ করে প্রায় দশমাস পরে মঠে ফিরেছেন। ২৬ ফেব্রুয়ারি কলেজের

ছুটি ছিল বলে আমরা তিনজন ছাত্রবন্ধু তাঁকে দর্শন করতে মঠে গিয়েছিলাম। তিনি দোতলার বারান্দায় চেয়ারে বসেছিলেন। একজন ভদ্রলোক কাছে উপবিষ্ট। ভদ্রলোকটি বললেন, "আপনার ১৯ তারিখে আসার কথা ছিল।"

মহাপুরুষজী—কি জানি বাপু, অত জানি না। ২২ তারিখে এসে পৌঁছেছি এই জানি।

উক্ত ভদ্রলোক মহাপুরুষ মহারাজের জন্মস্থান বারাসতের কথা তুললেন। মহাপুরুষজী বললেন, "কি জানি বাপু, আমার কিছু মনে নেই। অনেক বছর হয়ে গেছে।...ঐ বাড়ির একটি মেয়ে—বিধবা এসেছিল। বড় দুরবস্থা। একখানি কাপড় আর কটি টাকা দেওয়া গেল। তা সে অপর সবাই যেমন আসে তেমনই। মমত্ববুদ্ধি ঠাকুরের কৃপায় নেই। ঠাকুর আমাদের মন উদার করে দিয়েছেন। এখন বসুধৈব কুটুম্বকম্। আপন-পর-ভেদ নেই। সবাই সমান। গরিব দুঃখী যে কেউ আসে সাধ্যমত আমরা সাহায্য করি। যেখানে দুঃখ, যেখানে কষ্ট, সেখানেই আমরা যথাসাধ্য প্রতিকার করবার চেষ্টা করি। ভেদাভেদ নেই।...মানুষের কি সাধ্য আছে জগতের দুঃখ দূর করে? জগৎ তো দুঃখময়। চিরকাল দুঃখ থাকবে। মাঝে মাঝে এক একজন মহাপুরুষ আসেন, আর কতকটা দুঃখ কমে যায়, আবার আসে। আগমাপায়ী। আসছে যাচ্ছে। বুদ্ধদেব এলেন, মানুষের কতকটা দুঃখ দূর হলো। আবার কিছুকাল পরে পূর্বাবস্থা। যেমন পানাপুকুরের পানা—ঠেলে দাও, কতকটা জায়গা পরিষ্কার হয়ে যায়। আবার কিছুক্ষণ পরে পানায় ভরে ফেলে। এ যুগে ঠাকুর এসেছেন, পানা কেটে যাচ্ছে, কতকটা দুঃখ দূর হয়ে যাচ্ছে। আবার কালে পানা বুঁজে যাবে।"...

একদিন কলেজ থেকে (১৬।৩।২৭) মঠে গিয়ে মহাপুরুষ মহারাজের কাছে বসেছি। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বললেন, "দয়া কর, দয়া কর। প্রভু, দয়া কর।—এইটি সর্বদা বলতে হবে। এই-ই সাধন—এই-ই সব। 'দয়া কর।' তিনি যদি দয়া করে সব বুঝিয়ে দেন তবেই হয়।"

১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ দেহত্যাগ করলে মহাপুরুষজীর দেহ-মনে প্রবল ধাক্কা লাগে। তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়ে। ডাক্তারদের পরামর্শে তাঁকে বিশ্রাম ও বায়ুপরিবর্তনের জন্য মধুপুরে নিয়ে যাওয়া হয়। মধুপুর ও ৺কাশীতে কয়েক মাস কাটিয়ে তিনি ১৯ ফেব্রুয়ারি (১৯২৮) মঠে ফেরেন। মনে পড়ে হাওড়া স্টেশনে আমরা কয়েকজন বন্ধু ঐদিন গিয়েছিলাম। তাঁর সংবর্ধনার জন্য বহু সাধু ও ভক্তের সমাগম হয়েছিল। স্টেশন প্লাটফর্মে যেন আনন্দের হাট।

দুই দিন পরে (২১ ফেব্রুয়ারি) কলেজের পর সোজা মঠে গেলাম। প্রায় পাঁচ

মাস মহারাজ মঠে ছিলেন না। সেজন্য প্রত্যেক দিনই বহু ভক্ত ব্যাকুল প্রাণে তাঁকে দর্শন করতে মঠে আসছেন! অনেক দীক্ষার্থীও আছেন। মহাপুরুষজীর ঘরে তাঁকে প্রণাম করতে গিয়ে দেখি একটি ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন। তিনি বললেন, "কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছি, কিন্তু তাতে তৃপ্তি পাইনি। আপনার নিকট নিতে চাই।"

মহাপুরুষজী হেসে বললেন, "দীক্ষা তো দু-বার হয় না। দীক্ষা হয়েছে, বেশ তো। আবার কেন?"

ভক্তটি পীড়াপীড়ি করায় বললেন, 'ইষ্টের তো পরিবর্তন হবার জো নেই। ও তো ঠাকুরেরই এক রূপ। তবে মন্ত্রটা modify (ঈষৎ পরিবর্তন) করে দিতে পারব। তা বেশ, এস।"

একজন জিজ্ঞেস করলেন, "পাটনায় কি খুব দীক্ষার ভিড় হয়েছিল?"

মহাপুরুষজী—হাঁ। এইসব যতই দেখছি ততই ঠাকুরের মহিমা অনুভব করছি। আমাদের কে চেনে, কে জানে? তাঁরই তো মহিমা!

কথাপ্রসঙ্গে মহাপুরুষজী আরও বললেন, "অবতার তত্ত্ব বড় সূক্ষ্ম। পূর্ণব্রহ্ম ভগবান একটি মানুষ হয়ে আসেন। তাঁর তো কোনও কামনা নেই। 'নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি।'* শুধু লোককল্যাণকামী হয়ে তিনি আসেন। নইলে তাঁর কি দরকার?"

জনৈক ভক্ত মহাপুরুষজীর একটি শিষ্যার কঠিন পীড়ার সংবাদ দিলেন। বললেন, "বাঁচবার কোনও আশা নেই। তবে এ সময় আপনার আশীর্বাদ জানালে বড় সুখী হতো।" মহাপুরুষজী বললেন, "হাঁ হাঁ, আমার আশীর্বাদ জানাবে। সর্বদাই তো আশীর্বাদ করছি।"

একদিন বিকালে (৯।৩।২৮) মহাপুরুষজীকে প্রণাম করতে গিয়ে দেখি জনৈক বিধবা মহিলা তাঁকে বলছেন, "দীক্ষা নিতে এসেছি।" মহাপুরুষজী প্রথমে বললেন, "বৈশাখ মাসে চেষ্টা করো, এখন হবে না; শরীর বড় খারাপ।" পরে কিছু কথাবার্তার পর বললেন, "সামনের সপ্তাহে এস।"

মহিলাটি বললেন, "জীবনে বড় দুঃখ কষ্ট পেয়েছি।"

মহাপুরুষজী—সংসারে সুখ নেই, মা। যদি থাকে তো সে অতি সামান্য, যেমন মেঘের কোলে মাঝে মাঝে একটু বিদ্যুৎ চমকায় তেমনি।

---

* আমার অপ্রাপ্ত কিছু নেই, প্রাপ্তব্যও কিছু নেই—তবু কর্মে নিরত রয়েছি।—(গীতা, ৩।২২)

আমাদের দিকে চেয়ে বললেন, "এই উপমাটি বিদ্যাসাগর মশায়ের কাছ থেকে পেয়েছিলাম পঞ্চাশ বৎসর আগে।"

অনেক খঞ্জ ভদ্রলোক কিসের জন্য পীড়াপীড়ি করছিলেন। মহাপুরুষ মহারাজ তাকে বললেন, "ঠাকুরের ভাব নাও, আর মাকে ডাকো। তোমার মা কালীতে বিশ্বাস। তাঁকেই ডাকো। তাতেই হবে। তবে ঠাকুরের ভাবের সহায় নিতে হবে। তিনি যুগাবতার।"

ভদ্রলোকটি সুখী হলেন না। বললেন, "আরও যেন কিছু আছে। আপনি লুকাচ্ছেন।"

মহাপুরুষজী—সে কি! লুকাব কেন? মিথ্যাকথা বলা তো আমার অভ্যাস নয়। চোর জোচ্চুরি করব কেন? যা সত্য তোমার কল্যাণের জন্য বলছি। এক একজনের সংস্কারানুযায়ী তো বলতে হবে। যা প্রাণে উঠছে তাই তো বলছি।

পূর্বোক্ত বিধবা মহিলাটি দীক্ষার জন্য কি আয়োজন করতে হবে জিজ্ঞেস করায় মহাপুরুষজী বললেন, "কিছু না। কেবল চাই প্রাণ। প্রাণ আনতে পারবে, মা? আর দক্ষিণা? তা একটা হরীতকী আনলেই চলবে। ঠাকুরের দরবারে ও সব কিছু নেই।"...

১৯৩০ সালের বৈশাখী পূর্ণিমার দিন মঠে যোগ দিলাম। পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ আশীর্বাদ করলেন। প্রথম প্রথম যখনই মনে ভয় বা সংশয় এসেছে তিনি অভয় ও আশ্বাস দিয়ে মনকে সতেজ করে দিয়েছেন। মঠে যোগদান করবার কিছুদিন পরে মঠের সংস্কৃত বিদ্যালয়ে শাস্ত্রাদি পাঠ করবার সুযোগ হলো। উপনিষদে ওঙ্কারের মহিমার কথা পড়ে একদিন মহাপুরুষ মহারাজকে প্রশ্ন করে বসলাম, "জ্ঞানের ভাবে চিন্তা করবার সময় ইষ্টমন্ত্র জপ না করে শুধু ওঙ্কার জপ করা চলে কি?"

তিনি বললেন, "হাঁ, বেশ তো। সেই ওঙ্কারই তো ভগবান। ঠাকুরকে ওঙ্কারভাবে চিন্তা করবে। কোনও আপত্তি নেই।" কয়েক দিন পরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কি, ওঙ্কার জপ করছ?" বললাম, "হাঁ, মাঝে মাঝে করি।"

তিনি হেসে বললেন, "বেশ, বেশ, করো।"

আরও কয়েক দিন পরে তিনি একদিন ওঙ্কারের বিষয় জিজ্ঞেস করলে আমি বললাম, "মহারাজ, ওঙ্কার করতে করতে শরীর আড়ষ্ট হয়ে গিয়ে বড় ভয় হয়।"

মহাপুরুষজী—ঐ রকম যখন হয় তখন তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে—হে ঠাকুর, তুমিই ওঁকারস্বরূপ, আমি যাতে ঠিক পথে চলতে পারি তাই কর। যাতে ঠিক

বস্তু—যা সেই জ্ঞান বা ভক্তি (সেই একই বস্তু) লাভ করতে পারি তাই কর। এই রকম খুব প্রার্থনা করবে।

মঠে যোগ দেবার মাস দুই পরে কয়েকজন সাধুর পরামর্শে মহাপুরুষজীর নিকট ব্রহ্মচারীদের মতো পাঁচহাত কাপড় পরবার অনুমতি চাইলাম। তিনি অনুমতি দিলেন বটে, কিন্তু কয়েকদিন পরে যখন ঐ পাঁচহাত কাপড় পরে তাঁকে প্রণাম করতে গিয়েছি তখন তিনি বললেন, "কি হলো? দশহাত ছিল, এখন পাঁচহাত হলো। (দুই হাতে কলা দেখিয়ে) কি হবে? পাঁচহাতই পর, আর দশহাতই পর, আর বিশহাতই পর, ভিতর তৈরি না করতে পারলে কি হবে? ভিতর তৈরি কর দেখি, বাবা। জ্ঞান, ভক্তি, বিশ্বাস লাভ করতে পার? আত্মজ্ঞান লাভ কর।"...

সেই বৎসর (১৯৩০ সাল) মঠে ৺দুর্গাপূজা হবে কিনা সে সম্বন্ধে কোনও স্থিরতা ছিল না। মহাপুরুষজীর কিন্তু খুব ইচ্ছা পূজা হয়। একদিন (২৮ জুলাই) স্বামী ব্রজেশ্বরানন্দ (দেবেন মহারাজ) সকালে প্রণাম করতে এলে মহাপুরুষজী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "কি দেবেন, এবার পূজা হবে তো?" মঠে দুর্গোৎসব-সংক্রান্ত বহু কাজের ভার দেবেন মহারাজের উপর ন্যস্ত থাকত। দেবেন মহারাজ বললেন, "হাঁ মহারাজ, হবে বইকি। আপনি রয়েছেন, নিশ্চয়ই হবে।"

মহাপুরুষজী—তা আমি এই শরীরে নাই-ই রইলাম। ঠাকুর রয়েছেন, মা রয়েছেন। মহামায়ার পূজা হবে বইকি। হাঁ, নিশ্চয়ই।

১৯৩০ সালে পূজ্যপাদ শশী মহারাজের জন্মদিনে তাঁর সম্বন্ধে একটি আলোচনা-সভা হয়ে গেছে। একজন ঐ কথা তুললেন। মহাপুরুষজী বললেন, "আহা, শশী মহারাজের জীবন যারা আলোচনা করবে তাদের কল্যাণ হয়ে যাবে। কি জীবন! বড় খাঁটি জীবন—পরিষ্কার। আর একেবারে কর্মময় জীবন। অপর অপর সবাই তপস্যায় গিয়েছেন, বেড়িয়েছেন। এঁর তা নয়। কেবল একবার স্বামীজীর উপর রাগ করে তপস্যায় বেড়িয়েছিলেন। বর্ধমান পর্যন্ত গিয়ে জ্বর হয়ে পড়ে। তারপর নিরঞ্জন গিয়ে নিয়ে আসে। তিনি বলেছিলেন, ঠাকুরকে ১৪টি করে পান দিতে হবে। স্বামীজী রাজি হননি। শশী মহারাজ জোর করে বলেছিলেন, 'I want fourteen', (আমি ১৪টি চাই)—সেই বলার ভঙ্গি এখনও মনে আছে। তারপর নিরঞ্জন তাঁকে নিয়ে এলে স্বামীজী বললেন, 'থাক গে যা, তোর দেবার ইচ্ছে হয়েছে দিগে যা।' আহা, স্বামীজী শশী মহারাজ ও শরৎকে কি ভালবাসতেন!"...

১০ আগস্ট, ১৯৩০। পাটনার একটি ভক্ত কয়েক দিন মঠবাস করছেন। তিনি

আজ সকালে প্রণাম করতে এলে মহাপুরুষ মহারাজ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "ঘুম কেমন হয়েছে?"

তিনি উত্তর দিলেন, "খুব sound sleep (গাঢ় ঘুম), মহারাজ।"

মহাপুরুষজী—"আমার ও রকম হয় না। কাল সওয়া-দুটোর সময় বেশ ঘুম হলো; তারপর ৪–৩০টার সময় উঠলুম। তবে sound sleep (গাঢ় ঘুম) নয়। তা নাই-ই হলো। Actually (বাস্তবপক্ষে) ঘুম তো শরীরের, আমার নয়। সে রাজ্যে ঘুমটুম নেই। যোগে যাগে জেগে থাকা।"

এই বলে মহাপুরুষজী এই গানটি ভাবস্থ হয়ে গাইতে লাগলেন—

এবার আমি ভাল ভেবেছি
ঘুম ভেঙেছে আর কি ঘুমাই যোগে যাগে জেগে আছি।
যার ঘুম তারে দিয়ে ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি ॥ ইত্যাদি

তারপর বললেন, "আহা, রামপ্রসাদের বাংলাভাষা কী চমৎকার! আর স্বামীজী বলতেন, ঠাকুরেরও বাংলাভাষা ভারী চমৎকার। একেবারে pure (শুদ্ধ) খুব art (কলাগুণ) আছে।"

* * *

একদিন সন্ধ্যার পর (১৪ আগস্ট, ১৯৩০) স্বামী ওঙ্কারানন্দজী পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের কাছে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধব-সংবাদের প্রসঙ্গ করছিলেন। রাত্রে খাওয়ার পর গেস্ট হাউসে ভাগবতপাঠ হয়। মাঝে মাঝে ওঙ্কারানন্দজী সেইসব প্রসঙ্গ মহাপুরুষ মহারাজকে শুনান। মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, "আমি আর আজকাল বেশি পড়ি না। ওই 'কথামৃত' দেখি। আর স্বামীজীর 'বীরবাণী'—আহা, কি সব স্তব ও উপলব্ধির কথা ওতে আছে!"

ওঙ্কারানন্দজী। সমাধি ও ব্যুত্থান সম্বন্ধে দুটি গান চমৎকার!

মহাপুরুষজী—হাঁ। 'একরূপ অরূপনামবরণ, অতীত-আগামী-কালহীন।' চমৎকার! ৺কাশীর প্রমদাদাস মিত্র মহাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি ঐ গান শুনে চমৎকৃত হয়েছিলেন। বলেছিলেন, "এসব কী উচ্চ উপলব্ধির গান! প্রমদাবাবু ভারী ভক্ত ও পণ্ডিত ছিলেন। স্বামীজী তাঁর কাছে ছিলেন। রাত দুটোর সময় এসে স্বামীজীর ঘুম ভাঙিয়ে বলছেন, 'মশায়, এসব কি শুনালেন (ঠাকুরের কথা)? এ তো ঈশ্বরাবতারের লক্ষণ।' আমিও তাঁর কাছে কিছুকাল ছিলাম। মণিকর্ণিকার উপর একটি মন্দিরে খাওয়া-দাওয়ার পর দু-জনে বসা হতো। প্রমদাবাবু ধ্যান করতেন। কি চমৎকার ধ্যান! আর চোখ দিয়ে দরদর ধারা বেয়ে পড়ত।...

এই বৎসর (১৯৩০) জন্মাষ্টমীর দিন সকালে মহাপুরুষ মহারাজের উদ্দীপনাময় কথাপ্রসঙ্গের বিবরণ 'শিবানন্দ-বাণী' ১ম খণ্ডে (পৃঃ ১৫৪-৫৫) এবং ঐ গ্রন্থের ২য় খণ্ডে (পৃঃ ১২৩-২৪) প্রকাশিত হয়েছে। ওর পরের দিন (১৮ আগস্ট, ১৯৩০) নন্দোৎসবের দিন সকালে তাঁর কিছু কথোপকথন আমার ডায়েরি (দিনলিপি) থেকে নিচে লিপিবদ্ধ করলাম।

তিনি গতকালের ন্যায় এই দিনও সকালে বৃন্দাবনের ভাবে ভরপুর ছিলেন। মুখে 'জয় নন্দদুলাল', 'জয় বৃন্দাবনবিহারী', 'জয় ভূভারহারী', 'জয় ব্রজনাথ'— এইরূপ কত নাম উচ্চারণ করছিলেন। সাধুরা প্রণাম করতে এলে বললেন, "বড় ভুল হয়ে গেছে। ঠাকুরকে আজ সকালে মাখন, ছানা, মিছরি এসব দেওয়া উচিত ছিল। কারুরই খেয়াল হয়নি। আমারও মনে হলো না।"

মহাপুরুষ মহারাজ সুর করে একটি নন্দোৎসবের ছড়া বললেন ঃ

নন্দেরি আনন্দ আজ নন্দেরি আনন্দ।
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়ে গোবিন্দ ॥

তারপর বললেন, "বৃন্দাবনে খুব হয়। আমি একবার দেখেছিলাম। গর্ত করে দই ঢেলে তার ভিতরে চুবোচুবি করে। ভগবানের অনেক লীলাই দেখলাম মানবদেহ ধারণ করে। কতই দেখলাম।"

এই সময়ে একদিন মঠের পূজারি স্বামী সর্বাত্মানন্দ (ডাক নাম বটুক) সকালে প্রণাম করতেই মহাপুরুষ মহারাজ ভাবস্থ হয়ে 'জয় গুরু মহারাজ', 'জয় গুরু মহারাজ' উচ্চারণ করে পূজারিকে বললেন, "বটুক, তুমি বেশ ঠাকুরের পূজা করছ। খুব ভক্তি-বিশ্বাস হোক। পূজাশেষে এই বলে প্রার্থনা করবে, 'ঠাকুর, তোমার পূজা তুমি করিয়ে নাও। আমি তোমার পূজার কি জানি?' যারা যারা এখানে ঠাকুরের সেবার কাজ করছে সকলেরই মহা কল্যাণ হবে। অনেকে বলে ঠাকুর সব জায়গায় আছেন। হাঁ, সত্য। কিন্তু এখানে মঠে বিশেষ প্রকাশ। স্বামীজী তাঁকে এখানে বসিয়ে গেছেন, বাবা। সেই যে আত্মারামের কৌটা।"

কিছুক্ষণ পরে স্বামী আত্মারামানন্দ (ফণী মহারাজ) এসে প্রণাম করলে মহাপুরুষজী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "ফণী, তোমার সন্ন্যাসের কি নাম?"

ফণী মহারাজ—আত্মারামানন্দ।

মহাপুরুষজী—যে ফণী সেই আত্মারামানন্দ। নামে কি আছে? নাম রূপের পেছনে সেই সর্বভূতের অন্তরাত্মা রয়েছেন। নামরূপ বাইরের—মিথ্যা।

আর একদিন পূজারি সর্বাত্মানন্দ প্রণাম করতে এলে মহাপুরুষজী জিজ্ঞেস

বললেন, "বিকালে ঠাকুরঘর খুলে একটু জপটপ করো তো?" পূজারি বললেন, "হাঁ, মহারাজ।"

মহাপুরুষজী—হাঁ। সর্বদা ওখানে একটা ভাবধারা বজায় রাখতে হবে। ঠাকুরঘরে গেলে মনে হবে যেন সাক্ষাৎ ভগবানের কাছে এসেছি। তিনি ভক্তি ভক্ত ভালবাসেন। তা নইলে সগুণ ঈশ্বর কি? শুধু একটু ধ্যান করলাম, ওতে চিঁড়ে ভেজে না। ভক্তি চাই। দুই-ই চাই।

৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৩০। সকালে অনেক সাধু মহাপুরুষ মহারাজকে দর্শন ও প্রণাম করতে গেছেন। মালাজপের কথা উঠল। মহাপুরুষজী বললেন, "মোটা বুদ্ধি যাদের তারা বলে—যত বেশি সংখ্যা জপ করবে তত তাঁর বেশি দয়া হবে। কিন্তু তিনি কি সংখ্যা দেখেন? হৃদয় কতটা তাঁর দিকে গেল তাই দেখেন। ভাব যদি জমে যায় তো সংখ্যা নাই রাখলে।"

স্বামী ওঙ্কারানন্দজী বললেন, "হাঁ, মালাজপ করাটাও অনেক সময় distraction (বিক্ষেপ) মনে হয়।"

মহাপুরুষজী—হাঁ, তা বইকি। আমি মালা-টালা জপি না। তুলসীদাস বলেছেন, মালা জপে শালা। তবে একটা রাখতে হয়, দেখাতে হবে তো সাধু (হোঃ হোঃ হাস্য)। ওই একটা (ঘরের দেওয়ালে টাঙানো নিজের বাঁধানো ফটোর ফ্রেমে একছড়া মালা দেখিয়ে) রেখেছি জপাটপা হয় না। ওই (ছবিটা) জপে (হাস্য)। ঠাকুর বলতেন—প্রথমে জপ, তারপর ধ্যান, তারপর ভাব ইত্যাদি। বইতে সব রয়েছে। তা এখানে যারা যারা দীক্ষা-টিক্ষা নিতে আসে তারা তো সেই সব বই পড়বে না। ওই লৌকিক আচার যা সেই দিকে ঝোঁক। আমি তাদের বলে দিই, বাবা, এইসব তথ্য। তা তারা করে কিনা জানি না। আমার কথা না শুনুক, ঠাকুরের কথা শুনুক না। তিনি তো practical (হাতেনাতে) করেছেন সব।

ওঙ্কারানন্দজী—আপনার কথা শুনবে না কেন? আপনারাও তো practical (হাতেনাতে) সব করেছেন।

মহাপুরুষ মহারাজ মৃদু হাসলেন।

* * *

পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজকে সকালে তাঁর ঘরে যখন সাধু-ব্রহ্মচারীরা প্রণাম করতে যেতেন তখন তথায় একটি আনন্দের মেলা বসে যেত। কি প্রেম, সহানুভূতি ও স্নেহের সঙ্গে তিনি সকলকে অভ্যর্থনা ও আশীর্বাদ করতেন! কত না আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ, ত্যাগ-বৈরাগ্য জ্ঞান-ভক্তির উদ্দীপনাময় আলোচনা সকলে শুনতে পেতেন!

তাঁর শরীর তখন অত্যন্ত দুর্বল, প্রায় চলচ্ছক্তিহীন; একদিকে রক্তের চাপ, অপর দিকে হাঁপানি—কিন্তু তাঁর মুখে চোখে কী অপার্থিব দীপ্তি সর্বদা জ্বল জ্বল করত! মনে হতো তাঁর ঘরে সকল তীর্থ সমবেত। তাঁর মূর্তির মধ্যে ব্যাস বশিষ্ঠাদি তত্ত্বদ্রষ্টা ঋষিরা বাস করছেন, তাঁর কথার মধ্যে সনাতন ভারতবর্ষের প্রখ্যাত আচার্য ও সন্তমণ্ডলীর কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। তাঁকে প্রণাম করে, কিছুক্ষণ কাছে দাঁড়িয়ে, তাঁর মধুঝরা কণ্ঠস্বর শুনে হৃদয় ভরপুর হয়ে যেত। কত আশা, কত সাহস, কত উৎসাহ তিনি সকলকে দিতেন! সত্যই মনে হতো আমাদের কোনও ভয় নেই, আধ্যাত্মিক আদর্শ দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট।

নিজের সম্বন্ধে তাঁর নিরভিমান ভাব ছিল বাস্তবিকই দেখবার মতো। সর্বদা 'ঠাকুর, ঠাকুর, মা, মা' করতেন। সকল শক্তি তাঁদের, সকল কর্তৃত্ব তাঁদের। তিনি কেউ নন। আবার বলতেন, 'স্বামীজী, স্বামীজী, মহারাজ, মহারাজ।'

১৯৩০ সালে কয়েক মাস স্বামী অচলানন্দজী (কেদার বাবা) বেলুড় মঠে ছিলেন। একদিন তিনি প্রণাম করতে এসেছেন। মহাপুরুষজী জোড়হাত করে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। বললেন, "কেদার বাবা, কৃপা কর।" আবার বললেন, "কেদার বাবা, আশীর্বাদ কর যেন ঠাকুরের পায়ে শুদ্ধা ভক্তি হয়।" কেদার বাবা খুব বিনীতভাবে করজোড়ে বললেন, "এ কি বলছেন, মহারাজ?"

মহাপুরুষজী—আমিও তোমায় আশীর্বাদ করছি। তুমিও কর। আদানপ্রদান (হাস্য)।

কেদার বাবা—মহারাজ, আপনি তো পরিপূর্ণ হয়ে আছেন।

মহাপুরুষজী—কে বললে তোমায়? এ রাজ্যে কি পূর্ণতা আছে? পূর্ণতা সেইখানে (সমাধিতে)।...

সকালে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে সাধু-ব্রহ্মচারীদের জমায়েতে স্ফূর্তি এবং আমোদও বড় কম হতো না। কখনো কখনো সাধুদের সঙ্গে বালকের ন্যায় তিনি কত আনন্দ করতেন!...

১৯৩০ সালে দুর্গাপূজার কয়েক দিন আগে থেকেই প্রত্যূষে মহাপুরুষজী নিজে অতি মধুরস্বরে আগমনী গাইতেন—"যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী" ইত্যাদি। জনৈক সেবককে হারমোনিয়ম এনে তাঁর গানের সঙ্গে বাজাতে বললেন। একটু বেলায় পূজনীয় স্বামী নির্বাণানন্দজী ও চিদানন্দজী (গোসাঁই মহারাজ) প্রত্যহ তাঁর ঘরে বা তাঁর ঘরের সুমুখে অফিসঘরে বসে হারমোনিয়ম ও তবলাসঙ্গতে আগমনী গান করতেন। মহাপুরুষজী শুনে খুব খুশি হতেন। একদিন স্বামী নির্বাণানন্দজী প্রণাম করতে গেলে

বললেন, আহা, সূর্যি, কি বলব, তুমি কি চমৎকার গান শোনাচ্ছ! কত আনন্দ দিচ্ছ! মহারাজ তোমায় বলেছিলেন, "ব্রহ্মজ্ঞ হয়ে যাবি। ও সব হয়ে যাবে আলবত।"

পূজার সময় একদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ ইলেকট্রিক লাইট ফিউজ হয়ে যায়। আমি স্বামীজীর ঘরে সেবকের কাজ করতাম। ঐ ঘরে মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে আসতে আমার দেরি হয়। মহাপুরুষজী তা লক্ষ্য করেছিলেন। খুব ধমক দিয়ে আমাকে বললেন, "কোথায় ছিলে এতক্ষণ? এই discipline (নিয়মানুবর্তিতা) শেখা হয়েছে! Responsibility (দায়িত্ব)-জ্ঞান নেই। কখন থেকে স্বামীজীর ঘর অন্ধকার হয়ে আছে! স্বামীজী থাকলে কি বলতেন?" বড়ই লজ্জিত হলাম। পরের দিন সকালে প্রণাম করতে গেলে বললেন, "কালকে বকেছি, আরও বকব।"

আমি বললাম, "বড় অন্যায় হয়ে গেছে, মহারাজ!"

ভবিষ্যতে খুব হুঁশিয়ার হয়ে স্বামীজীর ঘরে সেবাকাজ করতে তিনি বললেন। তারপর হেসে সেবককে বললেন, "দাও ওকে ভাল করে সন্দেশ খাইয়ে। বকেছি।"

ঐ সময় একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কি পড়ছ আজকাল?"

আমি—ছান্দোগ্য উপনিষদ্, মুণ্ডক উপনিষদ্, বেদান্তসার।

মহাপুরুষজী—বেশ। ভক্তি বজায় থাকে তো? এইসব পড়তে পড়তে একেবারে শুষ্ক না হয়ে যায়।

আমি বললাম, "আজ্ঞে, চেষ্টা করি।"

ইহার কিছুকাল পরে শাস্ত্রের বাক্‌বিতণ্ডা নিয়ে তাঁকে কয়েকবার প্রশ্ন করায় তিনি বেশ বিরক্ত হন এবং কয়েক দিন আমাকে খুব বকেন। একদিন বললেন, "ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করিস? ভক্তি দাও, বিশ্বাস দাও বলে প্রার্থনা করবি। ভক্তিই আসল। ভক্তি হলে সব হয়—মুক্তি-টুক্তি সব। রামপ্রসাদের গান করবি—ভারি ভাবভক্তির কথা সব।"

এরপর প্রণাম করতে গেলে মাঝে মাঝে তিনি ঐ প্রসঙ্গ তুলতেন। নিজে হাতজোড় করে দেখিয়ে দিতেন কিভাবে ব্যাকুলতার সঙ্গে আত্মারাম ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতে হয়। একদিন জিজ্ঞেস করলেন, "খুব করছিস তো ঠাকুরঘরে ভক্তির জন্য প্রার্থনা?"

আমি—আজ্ঞে, হাঁ।

তিনি—হাঁ, ভক্তি পূর্ণ করে তবে অন্য সব। (নিজের বুকে হাত রেখে) Love (ভালবাসা), emotion (ভাব) না থাকলে কিছু হয় না। কেবল intellectuality (মানসিক প্রাখর্য)—ওর দ্বারা বড় বড় কথা বলতে পারবে মাত্র।

কয়েক মাস পরে একদিন মহাপুরুষজী জিজ্ঞেস করলেন, "ঠাকুরঘরে রোজ যাচ্ছ তো?" আমি হাঁ বললে তিনি বলতে লাগলেন, "হাঁ, খুব যাও। জ্ঞান হয়ে যাবে। ভয় নেই তোমার কিছু। ভক্তিসমেত জ্ঞান। তবেই জ্ঞান পাকা হবে। তিনি জ্ঞান দিলেই তবে পাকা জ্ঞান। তা না হলে টেকে না।"

* * *

মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসীরা মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করতে এলে তাঁদের তিনি বিশেষ সমাদর ও প্রীতির সঙ্গে অভ্যর্থনা করতেন এবং তাঁদের সঙ্গে নানা আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ এবং মঠ ও মিশনের আদর্শ ও কর্মপ্রণালী সম্বন্ধেও নানা কথা চলত। নিচে কয়েকটি ঘটনা ও কথোপকথন আমার ডায়েরি থেকে লিপিবদ্ধ করছি।

একদিন সকালে (১৪। ১০। ৩০) স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী প্রণাম করতে এসেছেন। তিনি মহাপুরুষজীর শরীরের কথা জিজ্ঞেস করলেন। মহাপুরুষজী বললেন, "এসব আছেই। রোগ ইত্যাদি আগমাপায়ী। আগম (উৎপত্তি) আছে, অপায় (বিনাশ) আছে। ও হোক। জ্ঞান ভক্তি ঠিক থাক। আর কেন? এ শরীরের দ্বারা যা হবার তা হয়েছে।"

বিশুদ্ধানন্দজী—মহারাজ , যতদিন আপনাদের শরীর থাকে ততদিনই আমাদের কল্যাণ। একটু কাছে এলে কত শান্তি হয়! আপনারা যেমন ঠাকুরকে যাতে তাঁর শরীর থাকে এই প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, আমরাও আপনার কাছে তা করতে পারি না কি?

মহাপুরুষজী—তোমরা বেঁচে থাকো। এ শরীরে আর কেন? তোমাদের দ্বারা ঠাকুরের কত কাজ হবে!

আর একদিন সকালে (২০। ১০। ৩০) স্বামী মাধবানন্দজীর সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের তন্ত্রসাধনা সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল। ক্রমে আরও অনেক সাধু উপস্থিত হলেন। নানা কথার পর মহাপুরুষজী সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "দেখ, তোমাদের সকলকে বলছি, ঠাকুরের ভাব অতি শুদ্ধ ভাব। Purity, Purity, Purity (পবিত্রতা, পবিত্রতা, পবিত্রতা)। এই আদর্শ হতে কখনো যেন স্খলন না হয়।"

একদিন সকালে (১০।১২।৩০) স্বামী মাধবানন্দজী মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করে শারীরিক কুশল জিজ্ঞেস করলে মহাপুরুষজী বললেন, হাঁ ভালই। একটু ভাল মনে হচ্ছে। মনে হয় আরও কিছুদিন শরীরটা থাকবে। তা আর কত দিনই বা? বছর তিনেক জোর। কি জানি তাঁর ইচ্ছা। এ দেহ-মন তো তাঁর হাতের যন্ত্র। তিনি

কাজ করাতে হলে রাখবেন। তিনি কখনো ভালবাসাচ্ছেন, আবার কখনো শাসন করাচ্ছেন। তাঁর সবই ভাল।"

আর কয়েক দিন পরে (১৩।১২।৩০) স্বামী মাধবানন্দজী ও স্বামী নির্বাণানন্দজীকে কথাপ্রসঙ্গে মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, "সঙ্ঘের জন্যই এখনও ঠাকুর রেখেছেন। সঙ্ঘকে পাকা করে দেবার জন্য। পাকা আছেই, তবে আরও দৃঢ় করে দেবার জন্য। এই সঙ্ঘ স্বামীজী করে গেছেন। যে এর বিরুদ্ধে যাবে তার মাথায় মুগুর পড়বে (নিজের মাথায় হাত দেখিয়ে)।"

একদিন সকালে (২৫।৭।৩২) স্বামী শুদ্ধানন্দজী (সুধীর মহারাজ) মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করতে এসেছেন। মহাপুরুষজী সেবককে একটি মোড়া আনতে বললেন। সুধীর মহারাজ মহাপুরুষ মহারাজের খাটের কাছে মোড়াটিতে বসলেন। অনেক সাধু-ব্রহ্মচারীও ঘরে আছেন। সুধীর মহারাজ তাঁর মাণ্ডূক্য উপনিষদ্ ও শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যাপনার কথা বললেন।

মহাপুরুষজী—আমিও সব উপনিষদ্ রেখেছি তোমাদের পড়া হয় বলে। তবে নিজে আর এখন দেখতে পারি না। পড়ার মধ্যে 'Asia' পত্রিকা, আর খবরের কাগজে weather report (আবহাওয়ার বিবরণ) দেখে থাকি। তুমি রাত্তিরে পড় নাকি?

শুদ্ধানন্দজী—না, তবে খবরের কাগজ দেখি।

মহাপুরুষজী—তাও কেরোসিনের আলোর গন্ধ। তোমার আচার্যগিরি বরাবর আছে, স্বামীজীর কৃপায়। তিনি তোমাকে বলেছিলেন—তুই পণ্ডিত হয়ে যাবি। তা ঠিক হয়েছে।

স্বামী জগদানন্দজী বহুকাল পরে মঠে এসেছেন। একদিন সকালে তিনি মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করতে গেছেন। তাঁকে দেখে মহাপুরুষজীর সারা মুখ আনন্দোদ্ভাসিত হয়ে উঠল। 'এস এস' বলে সাদরে জগদানন্দজীকে কাছে বসালেন। "তুমি মায়ের রমণীটি* আর আমাদের জগদানন্দ স্বামিন্।"

স্বামী প্রেমেশানন্দজীর সঙ্গে মহাপুরুষজীর অনুরূপ একদিনকার সাক্ষাতের ঘটনাও খুব মনে পড়ে। তিনি মঠে এসেছেন। তাঁর লিখিত শ্রীশ্রীঠাকুরের গানগুলি খুব জনপ্রিয়। বিশেষত তাঁর 'অরূপসায়রে লীলালহরী' গানটি মহাপুরুষজী খুব পছন্দ করেন। প্রায়ই সেবককে উহা গাইতে বলেন। একদিন সকালে প্রেমেশানন্দজী তাঁকে প্রণাম করতে গেলে মহাপুরুষজী খুব উৎফুল্ল হয়ে বললেন, "তোমার ঐ একটি গানের জন্য তুমি অমর হয়ে থাকবে।" গানটির খুব প্রশংসা করতে লাগলেন।

* জগদানন্দজী শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তাঁর পূর্বনাম ছিল রমণীকুমার ভট্টাচার্য।

৺কাশী অদ্বৈত আশ্রমের একজন প্রাচীন সন্ন্যাসী—'বুড়ো বাবা' (স্বামী শ্রীধরানন্দ) অনেক দিন পরে মঠে এসেছেন। তিনি মহাপুরুষ মহারাজেরই মন্ত্রশিষ্য। একদিন (৮।৬।৩২) তিনি বেলা ৯টায় মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে তাঁকে প্রণাম করতে এলেন। আরও কয়েকজন সাধু আছেন। মহাপুরুষ মহারাজ বুড়ো বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কত বয়স হলো?" তিনি বললেন, "এবার ৭৩ হলো।"

কি খাওয়া হয় জিজ্ঞেস করলে বুড়ো বাবা উত্তর দিলেন, "খেতে পারি না। রাত্রে দুখানি রুটি খাই।"

মহাপুরুষজী হেসে বললেন, "তা বেশ, অনেক তো খেয়েছ।" সকলে খুব হাসতে লাগলেন।

পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ বারবার বলতেন তাঁর গুরু-অভিমান নেই। এই সঙ্ঘে গুরু হলেন শ্রীশ্রীঠাকুর; তিনি তাঁর ভৃত্য ও সেবকমাত্র। তাঁর কাজ শুধু ধর্মপিপাসু ব্যক্তিকে ঠাকুরের নিকট সমর্পণ করা। একটি ঘটনা এখানে লিপিবদ্ধ করা যাচ্ছে। বর্তমান বাংলাদেশ হতে জনৈক ব্রহ্মচারী (ইনি ব্রাহ্মণসন্তান; মঠের আনুষ্ঠানিক ব্রহ্মচারী না হলেও ব্রহ্মচারীর ন্যায় জীবনযাপন করতেন এবং ফরিদপুর জেলায় একটি গ্রামে একটি আশ্রম স্থাপন করে সাধন-ভজন এবং জনসেবা করতেন।)—মহাপুরুষ মহারাজেরই মন্ত্রদীক্ষিত—মঠে এসে একবার আছেন। তিনি একদিন সকালে মহাপুরুষজীকে প্রণাম করতে এলে মহাপুরুষজী হঠাৎ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুই কার চেলা?"

ব্রহ্মচারীটি থতমত খেয়ে বললেন, "আজ্ঞে, আপনার কাছ থেকেই তো দীক্ষা নিয়েছি।"

মহাপুরুষজীর মুখ খুব ভাব-গম্ভীর হয়ে উঠল। উদ্দীপনার সঙ্গে নিজের বুক দেখিয়ে বলতে লাগলেন, "এখানকার? তা, আমি কিছু জানি না। আমি, বাবা, ঠাকুরের হাতে সব দিয়ে দিয়েছি। নিজে কিছু রাখি না। গুরু—এসব অভিমান আমাদের বিন্দুমাত্র নেই। মহারাজ, শরৎ মহারাজ, আমাদের সকলেরই এই রকম ভাব।...তোদের কিছু ভয় নেই। ঠাকুর রয়েছেন, সব দেখবেন। মুক্তি-ফুক্তি সব হয়ে যাবে। আমাদের একটু দরকার হয়—বলি দিয়ে দেওয়া—নামমাত্র। আমরা তো ঠাকুরের পাদপদ্ম ছুঁয়েছি। বলে দি—এঁকে ডাকো, ইনি ভগবান। যে মানবে তার হবে।"

আর একটি ঘটনা। কাশী সেবাশ্রমের একজন ব্রহ্মচারী মঠে এসেছে। মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করলে তিনি বললেন, "কিছুতেই তোকে মনে করতে পারছি

না।" ব্রহ্মচারীটি অনেক বুঝাবার চেষ্টা করল, কিন্তু মহাপুরুষজীর মনে পড়ল না। তখন তিনি বললেন, "যাক, তুই যেই হোস না কেন, তোর খুব ভক্তিবিশ্বাস হোক। Whoever you may be. (এই, যেই হোস না কেন)।"

* * *

একদিন (২৭।১।৩১) বিকালে দক্ষিণেশ্বর হতে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র পূজনীয় রামলালদাদা মঠে এসেছেন, ঠাকুর-দর্শন করে মহাপুরুষজীর ঘরে এসে বসেছেন। কিছুক্ষণ ধরে নানা কথাবার্তা চলতে লাগল। রামলালদাদা বিদায় নেবার সময় মহাপুরুষজী বললেন, "আহা! দাদা, মহারাজ আপনাকে নিয়ে কত আনন্দ করতেন। আমি তো সেসব পারি না। আছে সব, তবে সময়মত বেরোয়। আজ ধন্য হলাম। আপনার সঙ্গে কত কথাবার্তা হলো!" তারপর মহাপুরুষজী তাঁর একজন সন্ন্যাসী সেবককে দেখিয়ে বললেন, "দাদা, এইসব নতুন সন্ন্যাসী হয়েছে। বড় ভাল ছেলে, এম-এ পাশ, কলেজে পড়াত, পাঁচ শত টাকা মাইনে পেত। রত্ন সব আসছে ঠাকুরের ইচ্ছায়। দাদা, একে আপনি আশীর্বাদ করুন।" রামলালদাদা খুব খুশি হয়ে সন্ন্যাসীকে আশীর্বাদ করলেন।

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে ঠাকুরের জন্মতিথি পড়েছিল ১৭ ফেব্রুয়ারি। খুব সকাল সকাল শ্রীমহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করতে গিয়েছি। ঘরে আর কেউ ছিল না। তিনি চেয়ারে বসে 'নর্মদা হর হর, নর্মদা হর হর', নাম করছিলেন। আমি প্রণাম করলে তিনি যুক্ত কর দেখিয়ে ইঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলেন ঠাকুরঘরে গিয়েছি কি না। হাঁ, বললাম। তারপর কাতরভাবে প্রার্থনা করলাম, "মহারাজ, আজ তাঁর জন্মতিথি। আশীর্বাদ করুন যেন ভক্তিবিশ্বাস হয়।"

মহাপুরুষজী—হাঁ, খুব। আজ তাঁর জন্মতিথি। আজ যে তাঁকে ডাকবে তারই হবে, শুধু তোর কেন?

তারপর বললেন, "খুব নর্মদা হর হর নাম করবি। ওদেশে নর্মদার খুব মাহাত্ম্য বিশ্বাস করে। বলে গঙ্গার চেয়েও নাকি বেশি মাহাত্ম্য। আমরা অত বলি না। তবে সমান সমান বলি। আর খুব শুদ্ধ ভাব। শিব শক্তি এক সাথে।"

মহাপুরুষজী সারাদিন খুব চড়া ভাবে ছিলেন—আনন্দে মাতোয়ারা। যে এসেছিল তারই সঙ্গে দেখা করেছিলেন। যে চেয়েছিল তাকেই দীক্ষা দিয়েছিলেন। রাত্রে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েন। সেবক শরীরের কথা জিজ্ঞেস করলে বলেছিলেন, "তুই তো আচ্ছা বোকা। আজ ভগবানের জন্মদিন। আজ শরীর-টরীর?"

মহাপুরুষজীর স্মৃতিকথা

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ

ভগবান শঙ্করাচার্য বলেছেন, "দুর্লভং ত্রয়মেবৈতদ্দেবানুগ্রহহেতুকম্। মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ ॥" মনুষ্যদেহ লাভ করে জন্মেছিলাম! তাঁর পিছনে দেবতার অনুগ্রহ আছে কিনা জানি না। কিন্তু যেদিন স্বামীজীর জীবনী কিশোর বয়সে হাতে এসে পড়ল সেদিন যে দেবতার অনুগ্রহ লাভ করেছিলাম তা এখন বুঝতে পারি।...

কলেজ-জীবনে এলাম কলকাতায় ১৯২৭ সালে। বহুদিন থেকেই আকাঙ্ক্ষা দেখব দক্ষিণেশ্বর—দেখব বেলুড় মঠ। অপরিচিত কলকাতার সঙ্গে পরিচয় হতে কয়েক মাস গেল। ইতোমধ্যে খবর পেলাম পরমারাধ্য স্বামী সারদানন্দজীর দেহত্যাগের। তাঁর দর্শনের আকাঙ্ক্ষা মনে ছিল। কিন্তু তা পূর্ণ হলো না। এর কিছুদিনের মধ্যেই জনৈক বন্ধুর সঙ্গে বেলুড় মঠে গেলাম। মঠে শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শন হলো—স্বামীজীর প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর। শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির, স্বামীজীর মন্দির, মহারাজজীর মন্দিরও দর্শন করলাম। এ যেন এক জগৎ-ছাড়া ভাবময় স্বপ্নলোক। কলস্রোতা ভাগীরথী-বিধৌতপদ বৈকুণ্ঠ। খবর পেলাম পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ তখন বেলুড়ে অনুপস্থিত। পূজনীয় সারদানন্দজীর দেহত্যাগের পর তিনি বাইরে গেছেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে কলকাতায় ফেরবার স্টিমারে আলাপ হলো স্বামী পবিত্রানন্দের সঙ্গে। তিনি আমাকে আহ্বান করলেন মুক্তারামবাবু স্ট্রিটে অদ্বৈত আশ্রমে যাওয়ার জন্য। আশ্রমে আসি-যাই। পবিত্রানন্দজীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করি। স্বামীজীদের সহৃদয় ব্যবহার মুগ্ধ করে। ইতোমধ্যে খবর পেলাম পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ মঠে ফিরেছেন। একদিন সকালের দিকে মঠে গিয়ে পৌঁছলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করে মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে গেলাম। তিনি একটি চেয়ারে বসে আছেন। অনেক সাধুভক্তের সমাগম হয়েছে! মনে হলো উজ্জ্বল ভাস্বর-কান্তিতে সমস্ত পরিমণ্ডল যেন আলোকিত। এ যেন সাক্ষাৎ শিবের দর্শন হলো। মনে ভয়মিশ্রিত ভক্তি। সকলে একে একে প্রণাম করছেন। আমিও প্রণাম করলাম। তিনি বললেন, "হুঁ"। এই প্রথম পরিচয়।...

এই সময় স্বামী অশোকানন্দ কলকাতায় এসেছেন। তিনি তখন প্রবুদ্ধভারতের সম্পাদক, তীক্ষ্মধী ব্যক্তি, শক্তিশালী লেখক এবং যুবকদের প্রতি খুবই প্রীতিসম্পন্ন। স্বামী পবিত্রানন্দ তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। স্বামী অশোকানন্দের কাছে যাই-আসি। তিনি নানাভাবে আমার মনের খোরাক জোগান—নিবেদিতার পুস্তক পাঠ করতে বলেন। আর স্বামীজীর দিকে যাতে মন যায় তারই চেষ্টা করেন। একদিন বললেন—"fall in love with Swamiji"—এই কথাটিই আমার জীবনের একটি প্রধান অবলম্বন।

মনে কিন্তু তখন একটা অশান্ত ভাব এসেছে। স্বামী অশোকানন্দ তা লক্ষ্য করেছেন এবং বললেন, এইভাব অনেক সময় আসে—মনে হয় তোমার দীক্ষার প্রয়োজন। আমিও মনে মনে এই জিনিসটিই চাইছিলাম। তাই তাকে জিজ্ঞেস করলাম কি ভাবে দীক্ষা হবে। তিনি বললেন যে তিনি তার ব্যবস্থা করবেন। কিছুদিন পরে আমাকে স্বামী বিমুক্তানন্দের সঙ্গে মঠে পাঠিয়ে দিলেন।

মঠে গিয়ে স্বামী বিমুক্তানন্দ আমাকে স্বামী ওঙ্কারানন্দের কাছে নিয়ে গেলেন। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল অদ্বৈত আশ্রমেই। তিনি আমাকে পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, "মহারাজ, আমি এ ছেলেটিকে জানি। এ ছেলেটি ভাল। এ আপনার কৃপাপ্রার্থী।" পূজনীয় মহারাজ আমার দিকে তাঁর কৃপানিষ্যন্দী দীর্ঘায়ত নেত্রপাত করে বললেন, "হবে বাবা হবে, তবে আজ নয়। আজ আমার শরীর ভাল নেই। তুমি কয়দিন পরে এসো।" মনে একটু দুঃখ হলো। কিন্তু কি আর করা যাবে। কলকাতায় ফিরে এলাম।

এর দু-তিন দিন পর আবার মঠে এসে পূজনীয় মহারাজের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি বললেন সেইদিনই আমার দীক্ষা হবে। গঙ্গায় স্নান করে আমাকে প্রস্তুত হতে বললেন। আমি স্নানাদি করে প্রস্তুত হলাম। ঠাকুরঘর হতে ডাক এল, ঠাকুরঘরে প্রবেশ করে দেখলাম পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ আসনে বসে আছেন। কাছেই একটি আসন পাতা আছে। ঘর প্রায় অন্ধকার। প্রদীপের মৃদু-দীপশিখা সমস্ত ঘরটিকে একটি অপার্থিব দিব্যভাবে আলোকিত করেছে। পূজনীয় মহারাজ আমাকে আসনে বসতে বললেন। তারপরে আমার হাতে ফুল দিয়ে বললেন—"তোমার ভালমন্দ সবকিছু শ্রীশ্রীঠাকুরকে দাও।" এই বলে সম্মুখস্থিত শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদুকায় ফুল অর্পণ করতে বললেন। এর পরে ধ্যানের প্রক্রিয়া বলে আমাকে মন্ত্র উচ্চারণ করতে বলে বললেন—"মন্ত্র কাউকে বলো না।" তারপর উঠে দাঁড়ালেন। আমি তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলাম। তিনি আশীর্বাদ করে বললেন—"বাইরে বসে জপ কর।"

সমস্ত দেহে মনে একটা অপূর্ব প্রশান্তি—যা বেশ দিনকয়েক ছিল। কিছুক্ষণ

জপ করার পর নেমে এসে সব সাধুদের প্রণাম করলাম।...অপরাহ্নে মহারাজকে প্রণাম করে কলকাতায় ফিরে এলাম।

এর পর মাঝে মাঝে মঠে যাই-আসি। একদিন মহারাজকে প্রণাম করে উঠানে আম গাছের কাছে চলে এসেছি এমন সময় মহারাজের অন্যতম সেবক স্বামী কৈলাসানন্দ নেমে এসে আমাকে বললেন—"মহারাজ জিজ্ঞেস করছেন তোমার বাড়িতে কে কে আছেন, তোমাদের অবস্থা কেমন ইত্যাদি।" আমি তাঁকে যথাযথ উত্তর দিলাম। মহারাজ আমাকে আমার নাম-ধাম একদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন এবং আমার দেশ মালদায় জেনে আমাকে 'মালদা' বলে ডাকতেন। যাতায়াত করি আর মহারাজের স্বল্পস্থায়ী দর্শন জীবনের প্রধান উপজীব্য হয়ে দাঁড়ায়—'ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা'—বেশ বুঝতে পারি। মহারাজকে ভয়মিশ্রিত ভক্তি করতাম—তার মাঝে তাঁর প্রতি একটা অদ্ভুত আকর্ষণও অনুভব করতাম। একটু চোখের চাহনি, একটা মুখের কথা মনকে আনন্দরসে অভিসিঞ্চিত করে দিত।

একটি দিনের কথা মনে আছে। কলেজের পর মহাপুরুষ মহারাজকে দেখার একটা প্রবল বাসনা এসেছে। কলেজ থেকে ফিরেই মঠের অভিমুখে রওনা হয়েছি। যখন মঠে পৌঁছেছি তখন বেলা পড়ে এসেছে। আকাশে তখন মেঘ জমেছে। চারিদিক থমথমে—ঝড়ের উপক্রম। মহাপুরুষ মহারাজ দরজার কাছে চেয়ারে উপবিষ্ট। আমি গিয়ে প্রণাম করতেই বললেন—"এত ঝড়জল মাথায় করে কেন এলি বাবা!" এমন ভালবাসার সঙ্গে, এমন করুণাপূর্ণস্বরে বললেন যে আমার সমস্ত হৃদয়মন একটা অনির্বচনীয় ভাবমাধুর্যে সিক্ত হয়ে গেল।

একবার গ্রীষ্মাবকাশের জন্য প্রায় মাস ছয়েক পরে মঠে গেলাম। গিয়ে প্রণাম করতেই তাঁর সেই অপূর্ব জ্যোতির্ময় প্রশান্তোজ্জ্বল হাসি হেসে বললেন—"কিরে মালদা, কেমন আছিস?" এর পর যখনই তাঁর কাছে গিয়েছি পরিচয়ের স্বীকৃতিযুক্ত এই সম্ভাষণই তাঁর কাছে পেয়েছি—"কিরে মালদা, কেমন আছিস?" হাঁপানিতে শ্বাসকষ্ট নিয়ে বালিশের উপর ভর দিয়ে বসে আছেন তখনও প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই বলেছেন—"ভাল আছ তো বাবা।" তাঁর এই করুণাপূর্ণ দুটি কথাতেই মনপ্রাণ ভরে যেত।

অসুস্থতার ভিতরেও দেখেছি তিনি নিবিড় প্রশান্তিতে বসে আছেন। আর মাঝে মাঝে উচ্চারণ করছেন—"মা মা।" কিন্তু সে "মা" শারীরিক কষ্টজনিত মাকে ডাকা নয়। অপূর্ব মধুর মাতৃমন্ত্রের উচ্চারণ। শরীরের কথা জিজ্ঞেস করেছি—"কেমন আছেন, মহারাজ?" সেবক স্বামী শিবস্বরূপানন্দের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস

করেছেন—"কেমন আছি রে মতি?" তিনি বললেন—"এই ভালয় মন্দয় কেটে যাচ্ছে।" তিনিও আমার দিকে তাকিয়ে ঐ কথাই প্রত্যুচ্চারণ করলেন। মনে হলো তাঁর জামা কাপড় প্রভৃতি যেমন অন্যের তত্ত্বাবধানে—শরীরটাও তেমনি। তাঁর শরীরের সঙ্গে তাঁর যোগ ঐ দ্রব্যগুলির সঙ্গে তাঁর যোগের চাইতে বিশেষ বেশি নয়। অন্য সময় শরীরের সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে শুনেছি—"শরীরটা বুড়ো হয়ে ভাল নেই। আমি কিন্তু ভাল আছি!"...

বি. এ. পরীক্ষা পাশ করেছি। মঠে এসে মাঝে মাঝে রাত্রিবাস করি। মঠের কেউ কেউ জানেন আমার মঠে যোগদান করার ইচ্ছা আছে। তাঁরা বলেন—আর পড়ে কি করবে? এখনই চলে এস। স্বামী অশোকানন্দজী কিন্তু বলেন আরও দু-বছর পড়তে। তাই স্থির করেছি। এর মধ্যে একদিন মঠে ভোরবেলা পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করতে তাঁর ঘরে ঢুকেছি। প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই তিনি বললেন—"কিরে মালদা, সাধু হবি?" আমি বললাম—"আজ্ঞে হ্যাঁ, মহারাজ!" তিনি বললেন—"বেশ, বেশ, তুই ভাল সাধু হবি।" মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। কোন অহঙ্কার নয়—মনের যে সংশয়, দ্বিধা ছিল—সাধু হতে পারব না কি—তা কেটে গেল, মনে শ্রদ্ধার অভ্যুদয় হলো। খুব আনন্দ নিয়ে ঘরের বাইরে এলাম। স্বামী দেবানন্দজী ঐ সময় মহাপুরুষ মহারাজের সামনে ছিলেন। তিনি বেরিয়ে এসে বললেন—"আপনি যে গুরুর সামনে বললেন সাধু হবেন, যদি না হতে পারেন?" আমার তখন মনে খুব আনন্দ। বললাম—"আমার যা এখনকার মনের ভাব তা-ই জানিয়েছি।"

আমার তখন স্বামী গঙ্গেশানন্দজীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। তিনি মাঝে মাঝে বলেন—"মঠে চলে আয়।" আমি সম্মতি জানাই, কিন্তু সঠিক কিছু বলি না। একদিন তিনি বোধ হয় এটিকে পাকাপাকি করার জন্য মহাপুরুষ মহারাজের সামনে আমাকে দেখে তাঁকে বললেন—"মহারাজ, এই ছেলেটি সাধু হতে চায়।" পরম পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ আমার দিকে অপাঙ্গে দেখে বললেন—"হ্যাঁ, আমি জানি ও সাধু হবে।" স্বামী গঙ্গেশানন্দজী একটু অবাক হয়ে গেলেন বলে মনে হলো। কেননা তিনি তো আর পূর্বের ঘটনা জানতেন না!

একবার মালদা থেকে খুব বড় বড় ফজলি আম নিয়ে এসেছি পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজকে দেব। তাঁকে প্রণাম করে থলির ভেতর থেকে আম বার করতেই বলে উঠলেন—"বাঃ বাঃ, বেশ সুন্দর আম! যাও ঠাকুরভাণ্ডারে দাও ঠাকুরের জন্য।" আমারও শিক্ষা হয়ে গেল—'তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্'—শ্রীশ্রীঠাকুরই সব। আরেক দিনের কথা ঃ নিউ মার্কেট থেকে বাছাই করা গোলাপফুল নিয়ে এসেছি তাঁকে দেব

বলে। দেখেই বলে উঠলেন—"বাঃ, বেশ ফুল! স্বামীজীর টেবিলে দিয়ে এস—সুন্দর মানাবে। প্রতিটি কাজের মধ্য দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর দিকে মনকে অনুপ্রাণিত কতভাবেই না করতেন! অহং-বুদ্ধির লেশমাত্র ছিল না।

একদিন মঠে এসে দেখি স্বামীজীর ঘরের সামনের বারান্দায় একটি হুইল-লাগানো চেয়ারে তিনি বসে। মতি মহারাজ (স্বামী শিবস্বরূপানন্দজী) তাঁকে ঠেলে বারান্দার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছেন। আর তিনি শিশুর মতো আনন্দোচ্ছল।...কিন্তু যতবারই তাঁর মুখ স্বামীজীর ঘরের দিকে ফিরছে ততবারই হাত তুলে প্রণাম করছেন—"জয় স্বামীজী, জয় স্বামীজী মহারাজ।" সমস্ত বদনমণ্ডল ভক্তিতে উদ্ভাসিত। কি অপূর্ব দৃশ্য! ১৯৩৩ সালের এপ্রিল মাসে একদিন খবর পেলাম পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। পরদিনই মঠে গেলাম। বিছানায় তিনি বাহ্যসংজ্ঞাহীন হয়ে গেছেন। একটি প্রণাম করে ফিরে এলাম। ধীরে ধীরে কয়েক দিন পরে বাহ্যচেতনা ফিরে এল, কিন্তু কথা বন্ধ—শরীরের ডান ধার অবশ। কিন্তু তিনি তার মধ্যেই সকলের সম্বন্ধে সচেতন। কোন যন্ত্রণার প্রকাশ নেই।

১৯৩৩ সালের ১ সেপ্টেম্বর। সংসারত্যাগ করে মঠে এলাম। জনৈক সেবক মহারাজ আমাকে সঙ্গে করে পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন—"মহারাজ, বিজয়ানন্দ মঠে যোগদান করতে এসেছে।" পূজনীয় মহারাজ মাথা নেড়ে আমাকে প্রশ্ন করলেন। আমি হাতজোড় করে বললাম—"মহারাজ, আমি বাড়ি ছেড়ে মঠে চলে এসেছি।" সমস্ত মুখ দিব্য হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বাঁ হাতটি উঁচু করে আশীর্বাদ জানালেন। তারপর মুখ দিয়ে একটি শব্দ করলেন—"ম, ম, ম!" আমার মনে হলো বলতে চাইছেন—"মালদা।" কারণ সব সময় দেখা হলেই জিজ্ঞেস করেছেন—"কিরে মালদা, কেমন আছিস?" আজও সেই পরিচিতির বিজ্ঞপ্তি এল যখন কণ্ঠে ভাষা নেই তখনও। এ করুণার কী তুলনা আছে?

মঠে মাসখানেক থাকার পর যেতে হলো উড়িষ্যায় রিলিফের কাজে। রিলিফের শেষে ভুবনেশ্বর মঠে থাকতে হলো। ১৯৩৪ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে খবর এল পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ খুব অসুস্থ। দেখতে যাওয়ার খুব ইচ্ছা। স্বামী গঙ্গেশানন্দজী তার পাঠালেন—'Come immediately though condition sinking'. সেই রাত্রেই রওনা হলাম—সারারাত প্রার্থনা করেছি—যেন দেখা পাই। হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে ভক্তের কাছে খবর পেলাম পূজনীয় মহারাজের অবস্থা ভাল। বাসে করে মঠে এলাম। সকলের মুখ প্রফুল্ল। এর মধ্যে ডাক্তার অজিত রায়চৌধুরী এলেন এবং পূজনীয় মহারাজকে পরীক্ষা করলেন। বাইরে এসে বললেন—অবস্থা

খারাপ, কোন আশা নেই। নিমেষে আকাশ হতে বজ্রাঘাতের মতোই এ খবর। সকলে পূজনীয় মহারাজের ঘরে যেতে লাগলেন। ঘরে "হরি, ওঁ রামকৃষ্ণ" উচ্চারিত হতে লাগল। পরে গানও হলো। মৃত্যুশয্যার পাশে ক্রন্দনের রোল নয়—মহাসমাধির পথে অভিযাত্রায় গীতবাদ্যের সঙ্গে বিদায়াভিনন্দন।

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে মহাভিনিষ্ক্রমণ দর্শন করছি। অপরাহ্ন হয়ে এলো। শ্বাসপ্রশ্বাসের ছন্দোবদ্ধ গতি সহসা কুম্ভকে নিরুদ্ধ হলো। তারপরই প্রাণবায়ু শরীর পরিত্যাগ করল। এ কেমন মৃত্যু! জ্বালা নেই, যন্ত্রণা নেই! রামকৃষ্ণজীবন-নাট্যের একজন নট যবনিকার অন্তরালে চলে গেলেন। রেখে গেলেন দিব্যস্মৃতি।

তাঁর অনুস্মরণে এই কথাই মনে হয় ঃ ধর্ম সত্য, ধর্ম জীবন্ত, ধর্ম জাগ্রত—এই বোধই তাঁর নিকট লাভ করেছি। আর লাভ করেছি তাঁর সেই অপার্থিব করুণার স্পর্শ যা পাত্রাপাত্র বিচার না করে পাপী তাপী সকলের উপর সমভাবে প্রবহমান ছিল। তাঁর কথা স্মরণ করে গীতার ভাষায় 'হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ, হৃষ্যামি চ পুনঃপুনঃ।'

পুণ্যস্মৃতিকথা

স্বামী সুরেশ্বরানন্দ

১৯২৩ সালের প্রথমদিকে রেঙ্গুন আশ্রমের একজন প্রবীণ সন্ন্যাসীর কাছে প্রথম শ্রীশ্রীঠাকুর, স্বামীজী এবং ঠাকুরের অন্যান্য শিষ্য ও সন্তানদের জীবন সম্বন্ধে নানাপ্রকার সৎপ্রসঙ্গ শুনতে আরম্ভ করি। তখনকার দিনে আমাদের সমবয়স্কদের মধ্যে স্বামীজীর প্রসঙ্গই বিশেষভাবে আলোচিত হতো।

এই সময়ে ঠাকুরের অন্তরঙ্গ সন্ন্যাসি-সন্তানদের মধ্যে ছ-সাত জন স্থূলদেহে বর্তমান ছিলেন। আশ্রমের সন্ন্যাসীদের মুখে সকলেরই পুণ্যজীবন ও উপদেশ-শ্রবণের সৌভাগ্য হয়। দিনের পর দিন শ্রবণ ও বিচার করার পর শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের শ্রীচরণে জীবন সমর্পণ করার সিদ্ধান্ত করি।

এর এক বছর পর থেকে পত্রে আমার জীবনের নানা সমস্যার কথা মহাপুরুষজীকে জানাতে থাকি এবং তদুত্তরে তিনি অতি সরল ও সহজ ভাষায় অমূল্য উপদেশ দিয়ে সকল সমস্যার সমাধান করে দিতেন।

প্রায় তিন বছর পরে রেঙ্গুন সেবাশ্রমে যোগদান করলাম। দীর্ঘদিনের বাসনা

পূর্ণ হলো। শেষ পর্যন্ত ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বেলুড় মঠে এসে মহাপুরুষ মহারাজের শ্রীচরণদর্শন করবার সৌভাগ্য হয়। কয়েক দিন পরে দীক্ষাগ্রহণের ইচ্ছা জানালাম। তিনিও সানন্দে সম্মতি দিলেন এবং দীক্ষার দিন ধার্য হয়ে গেল।

মঠে ধ্যানঘরে দীক্ষা দিতে বসে মহাপুরুষজী আমায় বললেন, "তুমি তো পূর্বেই কুলগুরুর কাছ থেকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছ; যা হোক তোমাকে দীক্ষা দেব। এতে আমি স্তম্ভিত ও বিস্মিত হলাম। কি করে তিনি একথা জানতে পারলেন! দীক্ষা হয়ে গেল। তাঁর এই অন্তর্যামিত্বের পরিচয় পেয়ে ক্রমশ আমার দুর্দান্ত অবিশ্বাসী প্রকৃতি যে অনেকটা শান্ত হতে লাগল, তা বেশ অনুভব করতে লাগলাম। দীক্ষার পরে অনেক উপদেশ ও জপাদি করার নির্দেশও দিলেন এবং বললেন—"ঠাকুরের পায়ে তোমাকে অর্পণ করে দিলাম।" পরে পরে দেখা হলেই জিজ্ঞেস করতেন—"ঠিক চলছে তো সব? জপটপ করছ তো?" তাঁর মুখ থেকে দু-একটি কথা শুনেই মন আনন্দে ভরে যেত।

ঐ ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসেই মঠে তখন 'প্রেমানন্দ মেমোরিয়ালে' থাকি, একদিন সকালে একতলার বারান্দায় বসে দাঁতন করছি, এমন সময় আমার অজ্ঞাতসারে মহাপুরুষ মহারাজ আমার পিছনদিক দিয়ে পার্শ্ববর্তী ঘরে প্রবেশ করলেন। ঐ ঘরে একজন নূতন ব্রহ্মচারী ম্যালেরিয়া জ্বরে শয্যাশায়ী ছিল। ঐ ব্রহ্মচারীর মাথার কাছে বসে তিনি আস্তে আস্তে তার মাথা টিপে দিতে লাগলেন, তাতে ছেলেটি আরাম পেয়ে 'আঃ আঃ' শব্দ করতে লাগল। ঐ শব্দ শুনে আমি তার ঘরে গেলাম। দেখলাম ব্রহ্মচারীটি তখন চোখ মেলে মহাপুরুষজীকে দেখে চমকে উঠল এবং বলল—"আপনি এ কি করছেন?" মহারাজ একটু হেসে বললেন—"এদিকে তো আরামে 'আঃ আঃ' হচ্ছে, আবার বলছে 'এ কি করছেন'?" ব্রহ্মচারীটির তখন চোখে জল। এই করুণার দৃশ্য দেখে আমিও অশ্রুসংবরণ করতে পারলাম না। মনে হলো—কি গভীর স্নেহ-ভালবাসা এঁদের!

মহাপুরুষজী তখন আমাকেই ঐ ব্রহ্মচারীর সর্বপ্রকার সেবার ভার দিয়ে বললেন—"আহা! বাপমায়ের স্নেহবন্ধন কাটিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে আশ্রয় নিয়েছে, আমরা যদি একটু স্নেহ-ভালবাসা না দেখাই তবে কি করে টিকে থাকবে?" বলতে বলতে যেন ভাবস্থ হয়ে গেলেন। পরে বলতে লাগলেন—"ঠাকুরের কি অপূর্ব দিব্য ভালবাসা, তার তুলনা হয় না—যেন চুম্বকের আকর্ষণ!" সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীর অপূর্ব ভালবাসার কথাও কিছু বললেন। বলতে বলতে তাঁর চোখ মুখের ভাব বদলে গেল, যেন পঞ্চমবর্ষীয় বালক, যেন নিজ জননীর গুণগানে বিভোর। সেদিন তিয়াত্তরবর্ষীয় বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর মুখে যে স্বর্গীয় সরলতা, পবিত্রতা ও সহৃদয়তার

স্মিতহাসি দেখেছিলাম, তা আজও অন্তরে চির অঙ্কিত হয়ে আছে। আর অন্য কোথাও এ দৃশ্য দেখিনি।

আমার মন-পরীক্ষার জন্য যেন তিনি নিজ অন্তরের ভাব সংবরণ করে বলে উঠলেন—"তোমরা তো ঠাকুর ঠাকুর কর। ঠাকুরকে চোখে তো দেখনি! একটি পাগল—আর চেহারাও তেমনি! আবার স্বামীজীও তেমনিই যেন উন্মাদগ্রস্ত—এক কথায় বলতে গেলে আমরা (ঠাকুরের সন্তানরা) সবাই এক একটি পাগল ছাড়া আর কি!" এরপর পুনরায় সেই স্বর্গীয় হাসি! তারপর ধীরে ধীরে চলে গেলেন।

ঠাকুরের প্রতি গভীর প্রেমবশতই যে তিনি এই সব বলেছিলেন, সৌভাগ্যক্রমে তখন তা বুঝবার বয়স আমার হয়েছিল। ঐ অপূর্ব প্রেমের দৃশ্য আমার মনে অদ্যাবধি এত জীবন্ত জ্বলন্ত ভাবে অঙ্কিত হয়ে রয়েছে যে, মনে হয় ও ঘটনা যেন কাল-ই ঘটেছে।...

* * *

১৯৩২ সালে রেঙ্গুন সেবাশ্রমে দুরারোগ্য যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে মাদ্রাজে কোন স্যানাটোরিয়ামে চিকিৎসার জন্য যাই। চার সপ্তাহ হাসপাতালে থাকবার পর কিছুটা আরোগ্য লাভ করি এবং ৭ জুন বেলুড় মঠে আসি। কয়েক দিন পরে মঠের একজন কর্তৃপক্ষ স্থানীয় সন্ন্যাসী আমাকে জানালেন—"তুমি আর মঠে থাকতে পারবে না, বাড়ি ফিরে যাও—এই সিদ্ধান্ত আমরা করেছি।" আমি বললাম, "বেশ তো, তবে একবার পূজনীয় মহাপুরুষজীকে একান্তে শেষ দর্শন করে যাব।" তিনি তাতে সম্মত হলেন।

পরদিন মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করে আমার প্রতি যে আদেশ হয়েছে তা জানালাম। আমার সব কথা তিনি মনোযোগসহ শুনলেন এবং অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেলেন। একটু পরে বললেন, "আহা! ঠাকুরের আশ্রয় ছেড়ে ঘরে কেন ফিরে যাবে? আপাতত বর্ষার কয়েক মাস বাড়িতে গিয়ে থাক, পরে আমি টাকা পাঠালে আমার কাছে ফিরে আসবে। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে, অসুখ ভাল হয়ে যাবে। তোমাকে ঠাকুর-স্বামীজীর অনেক কাজ করতে হবে। আমরা বুড়ো-হাবলা, আমাদের কথা তো বিশ্বাস হচ্ছে না, কিন্তু জেনে রেখো আমরা যা বলি সবই ঠাকুরের কথা।"

সত্যিই বিশ্বাস হয়নি; মনে হয়েছিল—তিনি কি ডাক্তার? তিনি কিন্তু আমার অন্তরের অবিশ্বাস দেখতে পেয়ে ঐরূপ জোর দিয়ে কথাগুলি বলেছিলেন।

বাড়িতে ফিরে এলাম। মন বড় ভারাক্রান্ত। প্রায় চারমাস কেটে গেল, বর্ষাও শেষ। গুরুদেবকে একখানি পত্রও দিইনি। মনে দুর্জয় অভিমান। এক এক সময়

মনে হতো—দেহ-বিসর্জন দেব। তবে তার পূর্বে তাঁকে একবার দর্শন করব ও কয়েকটি কথা শুনাব। মনে মনে সর্বদা এই চিন্তা। সহসা সকল সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। অক্টোবরের মাঝামাঝি মহারাজের কাছ থেকে আমার নামে পাঁচ টাকা মনিঅর্ডার এসে গেল। কুপনে তিনি স্বহস্তে মঠে ফিরবার নির্দেশ দিয়েছেন। মঠে ফিরে তাঁর শ্রীচরণ দর্শন করলাম। তিনি অতি করুণকণ্ঠে বললেন, "দুই-তিন দিনের মধ্যে রেঙ্গুন ফিরে যা, তোর সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কিন্তু আমি তোকে রেঙ্গুন ফিরে যেতে বলছি, একথা কারু কাছে প্রকাশ করবি না।"

সাত-আট দিনের মধ্যে রেঙ্গুন সেবাশ্রমে পৌঁছলাম। দু-তিনদিন বিশ্রামের পর আশ্রমের অধ্যক্ষ বললেন, "মঠের নির্দেশ যে, তোমাকে এখানে যেন স্থান দেওয়া না হয়।" নির্দেশ মেনে আশ্রম ত্যাগ করে ম্যাণ্ডেলে গেলাম। ঐ সময় আমি যেন একটি অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে পড়লাম। মহাপুরুষ মহারাজ যে আমাকে রেঙ্গুনে ফিরে যেতে আদেশ দিয়েছেন তা কাউকেই বললাম না, কারণ তাঁরই এই নির্দেশ ছিল। এদিকে আমার বিশ্বাস ছিল যে, তিনি যখন আমার ভার নিয়েছেন তখন আমি কেন ভেবে মরি। প্রায় একমাস পরে রেঙ্গুন আশ্রমের অধ্যক্ষের কাছ থেকে আমার কাছে রেঙ্গুন সেবাশ্রমে ফেরবার নির্দেশ এল। ম্যাণ্ডেলে (মান্দালয়) হতে রেঙ্গুন সেবাশ্রমে ফিরলাম। শরীর মন খুবই অবসাদগ্রস্ত, সর্বদাই অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছে, আর যেন সামলাতে পারছি না। এরপর কোনরকমে দিন কাটতে লাগল। এক বছরের বেশি হয়ে গেল। ১৯৩৩-এর মার্চে আবার সেই রোগের পুনরাক্রমণ! এমন অবস্থা হলো যে, কয়েক দিনের মধ্যে শরীর যাবে। শেষ আশীর্বাদ প্রার্থনা করে মহাপুরুষ মহারাজকে তার করা হলো। তিনিও তারেই জানালেন—"Thakur will bless him" (ঠাকুর তার কল্যাণ করবেন)। তার-এর মর্ম শুনে আমার সব ভয় কেটে গেল। মৃত্যুভয়ও নেই। কোন দ্বিধাও নেই।

তখনকার দিনের রেঙ্গুনের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ডাঃ আর. ডি. মরিসন সাহেবকে ডাকা (call দেওয়া) হলো। তিনি বললেন, "গভর্নমেণ্ট হাসপাতালে আমার ওয়ার্ডে ভর্তি করে দিন, ভয়ের কোন কারণ নেই। কিন্তু পুষ্টিকর খাদ্যের দ্বারা শরীরের ওজন বাড়ানো দরকার।"

তাঁর কথামত হাসপাতালে ভর্তি হলাম। নানাপ্রকার চিকিৎসা চলতে লাগল, বিশেষ কোন ফল পাওয়া গেল না। চার সপ্তাহ পরে আশ্রমে ফিরলাম। বত্রিশ মাস যাবৎ নানাপ্রকার পুষ্টিকর খাদ্য খেয়েও ৮৩ পাউণ্ড হতে ওজন এক পাউণ্ড বাড়ল না বা কমল না।

* * *

১৯৩৬ সালের মার্চ মাস। তখন মহাপুরুষ মহারাজ স্থূলদেহে আর নেই। মন আমার যেন আশ্রয়হীন। আর বাঁচবার কোন ইচ্ছাও নেই। যা হয় হোক—এইরূপ ভাব। তখন রেঙ্গুনে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হচ্ছিল। হঠাৎ একদিন আশ্রমে ডাঃ মরিসনের সহকারী ডাঃ মেননের সঙ্গে দেখা। তিনি আমাকে তিন বৎসর পূর্বের মতো রোগা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন এবং আমি কি কি পথ্যাদি এতদিন খাচ্ছি সেসব খবর বিশেষভাবে জিজ্ঞেস করলেন।

সব শুনে বললেন—"তুমি special diet (পুষ্টিকর খাদ্য) আর খেও না। বৃষ্টিতে ও রৌদ্রে ছাতা ব্যবহার কোরো না। ধুতি ও জামা খুব পাতলা কাপড়ের ব্যবহার করবে, এভাবে এক বৎসর চলবার পর আমার সঙ্গে আবার দেখা করবে।"

যে কথা সেই কাজ। সব অক্ষরে অক্ষরে পালন করলাম। প্রায় ছ-মাস পরে আস্তে আস্তে আমার ওজন বাড়তে আরম্ভ করল। এক বছরের মধ্যেই ১৪০ পাউণ্ডে পৌঁছলাম। দৈনিক ষোলঘণ্টা পরিশ্রম করেও ক্লান্তিবোধ করতাম না। আশ্চর্য এই যে শ্রীগুরুদেবের দৈববাণী সদৃশ আশীর্বাদের কথা কিন্তু তখন আমার একবারও মনে আসেনি।...

১৯৩৮ সালের জানুয়ারি মাস। রেঙ্গুন থেকে বেলুড় মঠে এসেছি। পূজনীয় স্বামী মাধবানন্দ তাঁর ঘরে আমায় ডেকে পাঠালেন। গিয়ে দেখলাম তাঁর চারপাশে একঘর সাধু-ব্রহ্মচারী সমবেত। আমাকে দেখিয়ে তিনি বললেন—"দেখ, দেখ, যা অসম্ভব ছিল, মহাপুরুষের আশীর্বাদে তাও সম্ভব হয়েছে। একপ্রকার বিনা চিকিৎসায় কঠিন দুরারোগ্য রোগ থেকে এ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছে। আর একজন যুবক বা স্বাস্থ্যবান লোকের চেয়েও অধিক পরিশ্রম করে নিষ্কামভাবে ঠাকুর স্বামীজীর কাজও করতে সমর্থ হয়েছে।"

তখন লজ্জায় আমার মাথা হেঁট; কারণ যাঁর কৃপায় এই অসম্ভব সম্ভব হলো, তাঁর কথা একেবারে ভুলে গেছি। স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে যেন দ্বিতীয় গুরুর কাজ করলেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম—এই গুরু কৃপার কথা আর কোন দিন ভুলব না; ভুলতেও পারিনি। তাঁরই শ্রীচরণে প্রার্থনা যেন অজ্ঞানে আর কখনও ভুলে না যাই। এখন থেকে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে অনুভব হতে লাগল, মহাপুরুষজী ঠাকুর ছাড়া আর কেউ নন। তিনি প্রায় ছ-বৎসর পূর্বে রেঙ্গুনে যাবার সময় মঠে বসে অভয় দিয়ে বলেছিলেন—"তুই ভাল হয়ে যাবি। দেখ, আমাদের কথা এখন বিশ্বাস হচ্ছে না, কিন্তু আমাদের কথাই ঠাকুরের কথা।"

এখন ভাবি—তাঁর কাছে যা পেয়েছি তাতে জীবন ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হয়ে গেছে।

শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতিকথা

স্বামী ধর্মেশানন্দ

১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ। ঐ সময় কলকাতায় কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটস্থিত বিবেকানন্দ সোসাইটিতে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি। তখনও আমার দীক্ষা হয়নি। বেলুড় মঠে যাতায়াত করি, মাঝে মাঝে বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়িতেও যাই এবং পূজনীয় শরৎ মহারাজকে দর্শনও করি। একদিন ব্রহ্মচারী প্রবোধ আমায় বললেন, "শীঘ্র শীঘ্র শরৎ মহারাজের কাছে দীক্ষা নিন।" ব্রহ্মচারী প্রবোধ মাঝে মাঝে আমাকে কলকাতার পুঁটিয়া রাজভবনে পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজের (স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ) কাছেও নিয়ে যেতেন। তাঁর কাছে হিমালয়ভ্রমণের গল্প অবাক হয়ে শুনতাম। তিনি আমাকে তখন মুর্শিদাবাদের সারগাছি আশ্রমে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। আমার শরীর বরাবর দুর্বল, তাই নিতাই মহারাজ (স্বামী বলদেবানন্দ) আমাকে ওখানে ম্যালেরিয়া বলে যেতে দেননি। তখন সোসাইটিতে নিতাই মহারাজ একাদশীতে রামনাম সংকীর্তন করতেন এবং প্রায় প্রত্যহই রাত্রে দিনে অনেক সময় আমাদের সঙ্গে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী, রাজা মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দজী), মহাপুরুষ মহারাজের কৃপালাভের কথা এক সঙ্গে ২।৩ ঘণ্টা যাবৎ বলে যেতেন! আমরা অবাক বিস্ময়ে তন্ময় হয়ে শুনে বিহ্বল হয়ে যেতাম। ঐ সময়ে আমরা মাঝে মাঝে শ্রীম-র (মাস্টার মশাই-এর) কাছে এবং বেলুড় মঠে শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের দর্শনে যেতাম। মাস্টার মশাই আমাকে ঠাকুরপূজায় খুব উৎসাহ দিতেন, কারণ তখন আমি সোসাইটিতে ঠাকুরপূজা করতাম এবং আরাত্রিকের স্তোত্র পাঠ করতাম। আমরা কখনো কখনো পার্শিবাগান শ্রীরামকৃষ্ণ সোসাইটি, এন্টালীর শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত দেবেন্দ্র মজুমদার মহাশয়-প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ অর্চনালয় প্রভৃতি স্থানেও ঠাকুর-মা-স্বামীজীর উৎসবে যেতাম। এভাবে শ্রীঠাকুরের আত্মগোষ্ঠীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বাড়তে লাগল। কিন্তু ঠাকুরের সন্তানদের মধ্যে কে আমায় কৃপা করে দীক্ষা দিয়ে মুক্তির পথ দেখাবেন ঐ বিষয়ে তখনও কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারিনি। মনের ঐ রকম অবস্থায় একদিন স্বপ্নে মহাপুরুষ মহারাজকে পিতামাতা, আচার্য এবং জীবনের সর্বস্বরূপে দর্শন করি। পরে সুযোগমত একদিন বিকালবেলা বেলুড় মঠে গিয়ে মহাপুরুষ মহারাজের কৃপাপ্রার্থী হই। তিনি মঠের উঠানের আমতলায় বসেছিলেন, আমার কথা শুনে বললেন, "তুমি তো ঠাকুরের ধ্যান চিন্তা এবং একটি মন্ত্রের

জপ করছই।" আমি বললাম, "ঐটিতে আমায় দৃঢ় করে দিন যাতে আমি একনিষ্ঠভাবে ঠাকুরের হয়ে যেতে পারি। আমি শুনেছি আপনাদের কাছে ঠাকুরের কথা (মন্ত্র) শুনতে হয়। আপনি কৃপা করলে আমি অভয় ও নিঃসংশয় হয়ে যাব।" আমি কিন্তু আমার গোপন সাধন-ভজনের ও মন্ত্র-জপের কথা কারুর কাছে প্রকাশ করিনি। অন্তর্যামী গুরুদেব সব টের পেয়েছেন এবং আমার মনের দৃঢ়তা দেখবার জন্য যেন একটু পরীক্ষা করলেন। পরে কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, "আচ্ছা, অমুক দিন সকালে গঙ্গাস্নান করে প্রস্তুত হয়ে এসো।" ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে একদিন সকালে বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের পুরাতন মন্দিরে পরমপূজ্যপাদ মহাপুরুষজী আমায় কৃপা করলেন এবং পরে উপদেশ দিয়ে প্রসাদ দিতে সেবককে বললেন। ঐ সময় কি এক অব্যক্ত আকর্ষণে আমি ঘন ঘন মঠে যেতাম!...

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ১ ফেব্রুয়ারি যখন দেওঘর বিদ্যাপীঠে যোগদান করি তখন মহাপুরুষ মহারাজকে ঘনিষ্ঠভাবে পাবার সুযোগ হয়েছিল। তাঁরই উপদেশে স্বামী জগদানন্দের কাছে শাস্ত্রপাঠে মনোনিবেশ করি। তখন স্বামী জগদানন্দ প্রায়ই বিদ্যাপীঠে এসে থাকতেন এবং আমাদের সকলকে উপনিষদ্ ও ব্রহ্মসূত্রাদি আকর গ্রন্থ পড়াতেন।...

১৯২৪ বা ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের কোন এক সময়ে আমরা এক সন্ধ্যায় বৌবাজারের হালদার লেনে কলকাতা স্টুডেন্টস হোমের উৎসবে যোগদানের জন্য যাই। ঐ বৎসর উৎসব খুব জমজম করছিল। পরমপূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ, শরৎ মহারাজ ও মাস্টার মশাই ঐ উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে মহাপুরুষজী শ্রীমকে লক্ষ্য করে বললেন, "এই যে মাস্টার মশাই, ইনিই তো ঠাকুরের ভাগবতকার। আমরা তখন কি জানতাম কেন ঠাকুর ওঁকে কথাপৃষ্ঠে মাঝে মাঝে বলতেন, 'তখন কি কথা হলো বলতো?' কাছে বসাতেন যাতে শুনতে পান তাঁর অমৃতবাণীর সবটা, যা পরে সংসার তাপদগ্ধ জীবকে সংসারের দুঃখের মাঝে যথার্থ শান্তি দান করবে।" মহাপুরুষজীর কথায় শ্রীম কিন্তু একেবারে নীরব, কেবল ফিক ফিক করে হাসছেন। শরৎ মহারাজ বললেন, "হাঁ, ঠাকুর ওঁকে দিয়ে তাঁর অমৃতবাণী প্রকাশ করবেন বলে কতদিন কাছে কাছে রেখেছিলেন, আর খবর নিতেন যদি ওঁর ঠাকুরের কাছে যাওয়ার কিছু বিলম্ব কখনও হতো।" শ্রীম মৃদু মৃদু হাসছিলেন; শেষে বললেন, "সব ঠাকুরের ইচ্ছায় হয়েছে। না হলে এত স্মৃতিশক্তি কি আমাতে ছিল? তিনি আমাকে যন্ত্র করে নিজে লিখেছেন নিজের কথা। তিনি নিজে না জানালে কে তাঁকে জানতে পারবে?" এর পর থেকে আমি ঘন ঘন শ্রীম-র কাছে যাই। তখন থেকে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি ও বেলুড় মঠে যাওয়া বেড়ে গেল।...

মহাযোগী মহাপুরুষ মহারাজ যখন একা থাকতেন, তখন তার মন সদা ঈশ্বরভাবে মগ্ন থাকত, আবার সাধুভক্ত-সমাগমে বিজ্ঞানী ভক্তের অবস্থায় ব্রহ্ম জীব ও জগৎকে এক অখণ্ড সত্তায় দর্শন করে তাঁর অন্তর সমজ্ঞান ও করুণায় ভরে যেত। তখন যোগবিভূতিসম্পন্ন এই ঈশ্বর-প্রেমিকের মনের প্রীতি, সদালাপ, সৌজন্যাদি গুণ কি সরস ও সহজভাবে সকলকে পবিত্র আনন্দ দান করত! প্রত্যক্ষদর্শীর প্রাণে তা চিরতরে গ্রথিত হয়ে রয়েছে। খুব সম্ভব ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ হবে—দেওঘর বিদ্যাপীঠ থেকে মঠে এসে বাস করছি। গ্রীষ্মের শেষ, বর্ষা বেশ আরম্ভ হয়েছে। মঠ থেকে মাঝে মাঝে কলকাতায় বিবেকানন্দ সোসাইটিতেও যাই-আসি। একদিন জনৈক ভক্ত দুটি টাকা দেওয়ায় কলেজ স্ট্রিট মার্কেট থেকে দু-টাকার বেদানা মহাপুরুষ মহারাজের জন্য নিয়ে মঠে গেছি। বিকালবেলা, বর্ষা হয়ে গেছে। ভীত হয়ে গেছি যদি তিনি গ্রহণ না করেন। কখনও কিছু নিয়ে যেতে পারিনি। ব্রহ্মচারী অবস্থায় অর্থসামর্থ্য নেই। এই সামান্য জিনিস! মহাপুরুষজীর কাছে কত ধনী সজ্জন কত উপাদেয় বস্তু নিয়ে যায়! কিন্তু তিনি প্রসন্ন হয়ে বললেন, "কিরে, টাকা কোথায় পেলি? বেদানা? বেশ। তবে বর্ষার বেদানা জল জল। তা বেশ। ঠাকুরঘরে দিয়েছিস?" আমি না বলায় বললেন, "যা অর্ধেকগুলি ঠাকুরঘরে দিয়ে আয়। আগে ঠাকুরসেবা।" অর্ধেক ঘরে রাখলেন; হয়তো একটু গ্রহণ করে আমায় কৃতার্থ করবেন এই ভেবে; মনের ভয়টা চলে গেল। আজ শ্রীগুরুমুখে কি সুন্দর উপদেশ, কি সুশিক্ষা পেলাম!—সর্বাগ্রে ভগবানের পূজা দিয়ে তবে গ্রহণ ও বণ্টনাদি করতে হয়, তবেই শ্রীভগবান প্রসন্ন হন, কৃপা করে কিছু গ্রহণ করেন।...

১৯৩২-৩৩ খ্রিস্টাব্দের কথা। মঠ থেকে স্বামী কৈলাসানন্দজী শ্রীশ্রীমা-র বাড়ি উদ্বোধন কার্যালয়ে স্বামী আত্মবোধানন্দজীকে জানিয়েছেন যে, মহাপুরুষ মহারাজ একখানি 'যোগোপনিষদ্' চান। স্বামী আত্মবোধানন্দ আমাকে বসুমতী অফিস থেকে ঐ গ্রন্থটি কিনে মঠে দিয়ে আসতে বললেন। আমার তো সুবিধাই হলো, কারণ আমি তখন কোন না কোন সুযোগে প্রায়ই বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি থেকে মঠে যেতাম মহাপুরুষ মহারাজের পুণ্যদর্শনের জন্য। বৌবাজারে বসুমতী অফিসে গিয়ে একখানি 'যোগোপনিষদ্' কিনে নিয়ে মঠে গেলাম এবং মহাপুরুষজীর সামনেই স্বামী কৈলাসানন্দকে বইখানি দিলাম। প্রণাম করে দাঁড়াতে কৈলাসানন্দজী জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় বই পাওয়া গেল?" আমি বসুমতী অফিস থেকে কিনে এনেছি বলাতে মহাপুরুষ মহারাজ হাসতে হাসতে বললেন, "সতীশের কাছ থেকে কিনে আনলি? সে তো এখানকার চেলা, এমনি দিল না! যা, এবার গিয়ে আমার নাম করে একখানা চেয়ে নিয়ে আসবি।" আমি বললাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, মহারাজ,

আনবো।" ঐদিন বিকালবেলা জনৈক সন্ন্যাসী মহাপুরুষজীর ঘরে এলেন তাঁকে প্রণাম করতে। তাঁকে দেখে মহাপুরুষ মহারাজের এক অপূর্ব ভাবের স্ফুরণ হলো। যোগোপনিষদ্ হতে অপ্সরা রম্ভা এবং শুকদেবের ভোগ ও যোগমাহাত্ম্য উদ্ধৃত করে তিনি বিবেক-বৈরাগ্য ত্যাগ তপস্যা যে সাধুজীবনের অমূল্য সম্পদ তা তাঁর স্বভাব-সুলভ তেজোদীপ্ত কণ্ঠে দৃঢ়ভাবে কীর্তন করে উপস্থিত সাধুবৃন্দের মনে এক অত্যুচ্চ ত্যাগাদর্শ সজীব করে দিলেন। সেদিন সেই সন্ন্যাসীদের লক্ষ্য করে বললেন, "সাধুর পরমৈশ্বর্য" সম্বন্ধে শুকদেব কি বলেছেন শোন—

'পৈশুন্যহীনং বিজনেষু ভোজনম্,
তরুতলবাসং ফলমূলভক্ষণম্।
তপোবনং যো পুরুষঃ ন সেবতে,
বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনম্ ॥'

অর্থাৎ নির্জন স্থানে ঈর্ষাশূন্য হয়ে সামান্য বস্তুমাত্র ভোজন, তরুতলে বাস, ফলমূল ভক্ষণ করে যে পুরুষ এইরূপে তপোবনের সেবা না করে, তার জীবন-ধারণ বৃথা। পরপর আরও কয়েকটি এইরূপ বৈরাগ্যোদ্দীপক শুকদেবের বাণী উচ্চারণ করে সেদিন মহাপুরুষ মহারাজ সাধুদের অন্তরে যে ত্যাগ-তপস্যার দ্যুতি উজ্জ্বল করে তুলেছিলেন তা সাধু-ব্রহ্মচারীদের হৃদয়ে চির অঙ্কিত হয়ে আছে। অনেকক্ষণ এই পরমবৈরাগ্য ও ত্যাগপূত শুকদেবচরিত-শ্রবণে পরিশুদ্ধ-অন্তঃকরণ সাধুরা সন্ধ্যাসমাগমে শ্রীশ্রীঠাকুরের আরতিতে যোগদানে গমন করলেন। সে দিনের সেই অমর তেজোময় উপদেশ ভক্তহৃদয়ে চিরদিন গেঁথে থাকবে এবং সাধুদের জীবনে তা বিপথ থেকে সুপথের সন্ধান দেবে। সেদিন সদানন্দ সুপ্রসন্ন মহাপুরুষের সেই অগ্নিময়ী বাণী সকলের অন্তর স্পর্শ করে ত্যাগী জীবনের এক দিব্যভাব সৃজন করেছিল।

* * *

সম্ভবত ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা। মহাপুরুষ মহারাজের জন্মদিনে পূজনীয় অভেদানন্দ মহারাজ মঠে এসেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। এক আনন্দের পরিবেশ। উভয়ে পরস্পরকে পেয়ে যেন পরমানন্দময় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্যসান্নিধ্য অনুভব করতে লাগলেন। পরস্পর সৌহার্দ্যপূর্ণ আলাপের পর স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ মহাপুরুষজীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। তদুত্তরে শ্রীমহাপুরুষজী তাঁর শিব-স্বভাব-সুলভ প্রাণখোলা কথায় নিজ অন্তরের গভীর ভাব ও অনুভূতি প্রকাশ করলেন। বললেন, "শরীরটা বৃদ্ধ হয়েছে, নানা রোগ। কিন্তু আমি ভাল আছি। কোন দুঃখ-ক্ষোভ নাই। অনন্তকৃপাময় ঠাকুর একেবারে পরিপূর্ণ

করে দিয়েছেন—তাঁর জ্ঞান-ভক্তির অতুল ঐশ্বর্য দিয়ে, জানিয়ে দিয়েছেন যে, এর ভিতরকার সব তিনি, আমি নেই। সব তাঁর ইচ্ছা তিনি যতদিন খেলবেন এ খোলটা (দেহটা) নিয়ে। তিনি রাখলে থাকতে হবে, ডাকলে যেতে হবে। এ জীব-জগৎ তাঁর লীলা, আমরাও তাঁরই। তা ভাই কালী, তুমি কেমন আছ? তোমার শুনছি পায়ে আবার গরম জল পড়ে পুড়ে গিয়েছিল? তোমার অনেকবার পায়ের কষ্ট হয়েছে। একবার পরিব্রাজক অবস্থায় সৌরাষ্ট্রে খালি পায়ে চলে পায়ে রিং-ওয়ার্ম (পোকা) হয়েছিল। তারপর আমেরিকায় আর একবার পা পুড়ে গিয়েছিল। সব এসে পা ছোঁয়, তাই এইসব হয়। তা কিন্তু ঐ পা পর্যন্ত লাগে (পাপতাপ), ওর উপরে উঠতে পারে না।''—এই বলে উভয় গুরুভ্রাতা বেশ বালকের মতো উচ্চহাস্য করলেন। অভেদানন্দ মহারাজ মহাপুরুষ মহারাজকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন। এঁদের কথাবার্তায় পরস্পরের প্রতি কি গভীর ভ্রাতৃপ্রেম প্রকাশ পেল! গুরুভাইদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি কি শ্রদ্ধা, কি ভালবাসা, কি সরল সাবলীল ব্যবহার!

* * *

আমি একবার মহাপুরুষজীর কোন এক জন্মদিনে বাগবাজার শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি থেকে মঠে গেছি। বিকাল হয়েছে। মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে অনবরত ভক্তসমাগম হচ্ছে, তিনিও প্রসন্নচিত্তে কুশলপ্রশ্নাদি দ্বারা সকলকে সাদরে গ্রহণ করছেন। আর ভক্তেরা তাঁর জন্য যে বস্ত্র ফল ফুল মিষ্টান্নাদি এনেছেন তা স্তূপাকারে সামনে পড়ে আছে। এর মধ্যে পূজনীয় রামলালদাদা এলেন; তাঁর সঙ্গে ঠাকুরের আমলের অনেক পুরানো কথাবার্তা হলো। তাঁকে প্রচুর কাপড় ফলমিষ্টান্নাদি দেওয়ালেন। তারপর এলেন পূজনীয় শিবুদা। তিনি এসে অভিবাদনাদি করে চলে গেলেন। এমন সময় মহাপুরুষ মহারাজ হঠাৎ তাঁর সেবককে বললেন, ''কই, শিবুদাকে কিছু দেওয়া হলো না? ডাক ডাক, শিবুদাকে ডেকে আন!'' ততক্ষণ শিবুদা মঠবাড়ির সামনের ঘাটে (গঙ্গায়) নৌকায় উঠবার উপক্রম করছিলেন। এদিকে মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, ''শিবুদা চিরকাল আপনভোলা, লাভালাভে দৃষ্টি নেই, যেন অসংসারী, রামলালদার মতো গোছান সংসারী নন।'' ইতোমধ্যে সেবক শিবুদাকে মহাপুরুষজীর ঘরে ডেকে এনেছেন। মুক্তহস্ত মহাপুরুষজী সেদিন যেন সদাশিবের মতো সব দিতেই উন্মুখ! শিবুদাকে সেবক যতই কাপড় চাদর প্রভৃতি দিচ্ছেন, মহাপুরুষ মহারাজ ততই বলছেন, 'আরও দে, আরও দে।' যেন দিয়ে তাঁর আশ মিটছে না। এমন সুপ্রসন্নচিত্তে মুক্তহস্তে অযাচিত দান দেখে মহাপুরুষ মহারাজের অন্তরের গভীরে কত বড় বিশাল আত্মা বাস করছেন তা দর্শকমাত্রেরই অনুভব হলো! তাই বুঝি

ঠাকুর মহাপুরুষজীকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, "তারকের উঁচু শক্তির ঘর, যেখান থেকে নামরূপের প্রকাশ।"

*   *   *

মনে হয় ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকের কথা। পূজনীয় বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ মঠে এসেছেন। ঐ সময় একদিন মঠের দ্বিতলে গঙ্গার দিকে বারান্দায় গিয়ে দেখি দুই শ্রীরামকৃষ্ণসন্তান প্রায় সামনাসামনি ইজিচেয়ারে বসে আছেন। ২।৩ জন সেবক ছাড়া আর কেউ বড় ছিল না। মহাপুরুষ মহারাজ বলছেন, "দেখ, ভাই পেসন (হরিপ্রসন্ন মহারাজকে স্বামীজী পেসন বলে ডাকতেন), এ শরীর আর বেশিদিন থাকবে না। তোমার আর এলাহাবাদে যাওয়া হবে না। তুমি মঠে থাকলে সব জমজম করবে। সকলে ঠাকুরের ভাব পাবে। তুমি, ভাই, থেকে যাও।" হরিপ্রসন্ন মহারাজ (বিজ্ঞানানন্দজী) হাতজোড় করে পুনঃপুনঃ বলছেন, "না মহারাজ, আমি সেখানে বেশ আছি, সেখানে বেশ আছি।" কিন্তু মহাপুরুষজী ছাড়বেন না, বলছেন, "আমি দেখতে পাচ্ছি, ঠাকুর তোমাকে দিয়ে তাঁর অনেক কাজ করাবেন। তুমি, ভাই, থাক; এ শরীর অচল হয়ে আসছে, আর বেশিদিন থাকবে না।" তাতেও তিনি পুনঃপুনঃ 'না মহারাজ, না মহারাজ' করাতে মহাপুরুষজী অন্য প্রসঙ্গ পাড়লেন।

মহাপুরুষ মহারাজের মহাপ্রয়াণের কিছুদিন পরে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ হয়ে স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী বলেছিলেন, "মহাপুরুষ মহারাজের 'স্পিরিটটা' (ভাব) যেন আমার ভিতর ঢুকে গেছে। তাই যে আসছে তাকে ঠাকুরের নাম না দিয়ে থাকতে পারছি না। আগে আমার এ ভাবটা ছিল না। আমি একা থাকতে ভালবাসতাম।" সত্যই আবার ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে অধ্যক্ষ হয়ে এক বছরের উপর (দেহত্যাগ পর্যন্ত) বালক বৃদ্ধ যুবক স্ত্রী পুরুষ সমাজের সকল স্তরের লোক যখন যে প্রার্থী বা অপ্রার্থী হয়ে তাঁর কাছে এসেছে তাকে তিনি যেন দু-হাতে করে ঠাকুরের অভয় অনন্তশক্তিপূর্ণ নাম বিলিয়েছেন, কোন অধিকারিভেদ না করে সকলকে শ্রীশ্রীঠাকুরের পায়ে সমর্পণ করে তাদের জন্ম সার্থক করেছেন। সত্যই মহাপুরুষজীর অন্তর-দেবতা ঠাকুর যেন স্বামী বিজ্ঞানানন্দের ভিতর কৃপারূপে প্রকাশিত হয়ে অকাতরে তাঁর ভক্তি-মুক্তিপ্রদ 'নামব্রহ্ম' বিতরণ করেছেন।

দেওঘরে একদিন কথাপ্রসঙ্গে মহাপুরুষজী তাঁর পরিব্রাজক-জীবনের একটি ঘটনা বলেন। বললেন, "এই সাঁওতাল পরগনা দিয়ে একা এক কাপড়ে হেঁটে চলেছি। ভিক্ষায় সেদিন মাত্র তিনখানি রুটি পাওয়া গেল—তাঁর মধ্যে আধখানা পোড়া। (এই বলে হাসতে আরম্ভ করলেন) তখন এত খিদে যে, দু-ডজন রুটি হলে তবে

হয়! এ রুটি নিয়ে এক জায়গায় স্নান করলুম। ঐ কাপড়ই গায়ে শুকালো। তারপর ঐ পোড়া রুটি খেলুম। কিন্তু মনের এত আনন্দ যে, নিজের ভাবেই ভরপুর। তা ঐ সামান্য আহারে কোন কষ্টবোধ হলো না।”...

১৯৩৩ খ্রিঃ জানুয়ারি মাসে স্বামীজী মহারাজের উৎসবে মহাপুরুষজী আমাদের ১২।১৪ জন ব্রহ্মচারীকে সন্ন্যাস দান করেন। আমার শরীর দুর্বল থাকায় মঠের তৎকালীন সহ-সম্পাদক বলেছিলেন, ‘আমরা তোমাকে ডেকে নেব, এ বছর সন্ন্যাস থাক। এই তো দুর্বল শরীর।” তখন আমি বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়িতে থাকি এবং উদ্বোধন-সম্পাদনা-কার্যে স্বামী বাসুদেবানন্দজীর সহকর্মী। মহাপুরুষ মহারাজ তখন অতি বৃদ্ধ; ১৯২৭ খ্রিঃ—সারদানন্দ মহারাজের দেহত্যাগের পর থেকে তাঁর উপর মঠ-মিশনের সকল দায়িত্ব ও গুরুভার পড়েছিল। দিন দিন তাঁর শরীর জীর্ণ হতে থাকায় আমার দীক্ষা ও ব্রহ্মচর্যের মতো সন্ন্যাসব্রতও তাঁরই কাছে নেবার খুব আগ্রহ হয় এবং মহাপুরুষ মহারাজের কাছে অতি কাতরভাবে ‘সন্ন্যাস’ প্রার্থনা করি। প্রার্থনামাত্র সদাশিব আশুতোষ মহাপুরুষ মহারাজ অহেতুক কৃপায় আমাকে বললেন, “বাবা, আমার খুব আশীর্বাদ আছে, তোমার সন্ন্যাস হোক।” তাতে আশ্বস্ত হয়ে শান্তচিত্তে আমি শ্রীশ্রীমায়ের বাড়িতে আমার কর্মস্থলে ফিরে আসি। ভাবলাম শ্রীগুরুর এই অমোঘ আশীর্বাদেও যদি সন্ন্যাসলাভ না হয়, তার উপর আবার কি আছে? শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে কেবল প্রার্থনা জানাতে লাগলাম। সন্ন্যাসের ৩।৪ দিন পূর্বে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির অধ্যক্ষ স্বামী আত্মবোধানন্দ আমায় বললেন, “ধীরেন, তুমি প্রস্তুত হও, মঠ থেকে নির্দেশ এসেছে, তোমার সন্ন্যাস এবার হবে।” আমি অন্তরে অন্তরে অনুভব করলাম শ্রীগুরুর অমোঘ আশীর্বাদ। সকলের সহানুভূতিতে এবং শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীগুরুর কৃপায় মহাপুরুষ মহারাজের কাছ থেকেই সন্ন্যাসলাভ আমার সম্ভব হয়েছিল। সকল শুভকর্মের মূলে গুরুকৃপা—এ ধারণা তখন হতে আমার মনে দৃঢ়তর ও বদ্ধমূল হয়ে গেল। শ্রীশ্রীঠাকুরই কৃপাঘন গুরুমূর্তিতে মহাপুরুষ মহারাজকে যন্ত্র করে আমার দীক্ষা, ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস প্রদান করে আমার জীবন ধন্য করলেন। মনে পড়ে স্বামী শুদ্ধানন্দ মহারাজ সন্ন্যাসের পূর্বদিন আমতলায় বসে আমায় বলেছিলেন, “ধীরেন, সন্ন্যাস মানে জান? (আমগাছটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে) এই গাছতলা সার অর্থাৎ শ্রীভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর।” স্বামী ওঁকারানন্দ মহারাজ সন্ন্যাস-হোমাদি কার্যে আমাদের আচার্য ছিলেন। মহাপুরুষ মহারাজ নিজে হোমগৃহে যেতে পারেননি। ওঁকারানন্দ মহারাজই আচার্যের সব কাজ সম্পন্ন করেন। আচার্যকে প্রণাম করতে শ্রীগুরুদেব আমাকে ইঙ্গিত করে বললেন, “আচার্যকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে হয়।” শুদ্ধানন্দ মহারাজ, মাধবানন্দ মহারাজ, পরেশ মহারাজ, অম্বিকানন্দ মহারাজ, সূর্য মহারাজ প্রভৃতি সকল প্রাচীন

মহাপুরুষ উপস্থিত থাকায় মঠের পুরাতন ঠাকুরের মন্দিরের পেছনের ধ্যানঘরটিতে কোনো এক সময় অগ্নিদেবের স্বভাবোজ্জ্বল মূর্তিটি আমাদের অন্তরে 'জ্যোতিরহম্ বিরজা বিপাপ্মা' মন্ত্রবর্ণগুলি ত্যাগজ্যোতিতে উদ্ভাসিত করেছিল। ভোরে গঙ্গায় দণ্ড ভাসিয়ে পরে শ্রীগুরুদেব মহাপুরুষ মহারাজের কাছে তাঁর ঘরে প্রেষ-মন্ত্র প্রভৃতি সন্ন্যাসের শেষ ও সার উপদেশ শ্রবণের জন্য আমরা উপস্থিত, তখন প্রাচীন নবীন বহু সন্ন্যাসি পরিবৃত মহাপুরুষ মহারাজ কাষায়বস্ত্র ও কৌপীন-দানকালে শরণাগত, সাষ্টাঙ্গে প্রণত, দণ্ডবৎ-পতিত নবীন সন্ন্যাসিগণকে সম্বোধন করে যে তেজোময় সন্ন্যাসের মহাবাক্য শুনিয়েছিলেন তন্মধ্যে ৪।৫ টি শব্দ এখনও যেন শ্রবণপথে অনুরণিত হচ্ছে। মহাপুরুষজীর সামনে কৌপীন-পরিধানকালে তিনি ধীর গম্ভীর সহসা অতি উচ্চ স্বরে বলে উঠলেন, "সাবধান, সন্ন্যাসিগণ! সাবধান, সর্বস্বত্যাগি! সাবধান।" এবং মুখে দৃঢ়তাব্যঞ্জক এক অস্ফুট শব্দোচ্চারণে ব্রহ্মচর্য ধারণের মাহাত্ম্য ঘোষণা করলেন। ত্যাগীশ্বর শিবসদৃশ মহাপুরুষ মহারাজের অত্যুচ্চ গুরুগম্ভীর নিনাদে যেন গৃহটি কম্পিত হয়ে উঠল। উপস্থিত সকলের মন অত্যুজ্জ্বল সর্বস্বত্যাগরূপ জ্যোতিতে নির্ধূম নির্মল হলো এবং আত্মদ্যুতি-সমুজ্জ্বল ও ত্যাগব্রত তেজোময় রূপে প্রদীপ্ত হলো। শিবগুরুর কৃপায় ঐ দিনের ঐ ত্যাগ-সংস্কার জীবনের পথে পরম পাথেয়রূপে সকল বিঘ্নকে দূর করে সাহস দেয়, ঐ অভয়বাণীর প্রতিধ্বনি কর্ণগোচর হয়, দেহ মন পবিত্র ও নির্ভয় করে দেয়। পরে একে একে প্রাচীন সাধুবৃন্দকে প্রণামের সময় স্বামী মাধবানন্দজীর প্রসন্নমুখে হাসি দেখে আমার চিত্ত প্রফুল্ল হলো। তিনি যখন বললেন, "ওহ, ধীরেন ধর্মানন্দের উপরও এক ঈশ চড়িয়েছে।" তখন সকলে হাসতে লাগলেন। এভাবে পরিপূর্ণ আনন্দে সেদিনের সে সন্ন্যাসের মহাব্রত উদ্‌যাপিত হলো।

যদি বা আমি চতুর্থ আশ্রমী, ত্যাগী বলে এখন অভিমান করি, আমার সন্ন্যাস যে সম্পূর্ণ গুরুকৃপায় সম্ভব হয়েছে, তাতে প্রারব্ধ বা পুরুষকারের লেশমাত্র ছিল না, এই ঘটনায় তা-ই আবার মনে দৃঢ়তর হলো।

সমাধিরাজ্যের কত ঊর্ধ্বে মন বিলীন হলে করুণাময় মহাযোগীর এই শিশুবৎ 'রাগাদিদোষরহিতং স্বজনানুরাগম্' এবং 'মাধুর্যধৈর্যসুভগম্' সদাশিব চরিত্র প্রপন্ন ভক্তের জন্য প্রকটিত হয়—আশুতোষের এই দেবলীলা সম্ভব হয়, তা ভেবে যুগপৎ স্বীয় অযোগ্যতা ও শ্রীগুরুর অসীম কৃপা আজ স্মরণ হচ্ছে এবং প্রার্থনা করছি, "হে করুণাময়, দীনবন্ধো, প্রপন্ন ভক্তের শেষ প্রার্থনা পূরণ কর। তোমার কৃপায় এখন আমাদের মোক্ষদ্বার উন্মোচিত হোক।"

শুভম্

মহাপুরুষ শিবানন্দ-স্মৃতিকথা

স্বামী অটলানন্দ

পূজ্যপাদ আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ ভারত আমার কথা শুনবেই, কারণ আমি তার প্রাণ ধরে নাড়া দিচ্ছি। তাঁর এই বাণী যে কত সত্য তা আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে প্রত্যক্ষ দেখতে পাই।

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের প্রথম ভাগে আমি যখন স্কুলের ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি, তখন ঘরে খাটের উপর একখানা বই পড়ে আছে দেখলাম, বইখানা 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ'—পূর্বকাণ্ড। তা পড়ে স্বামীজীর ভাবধারায় এতই আকৃষ্ট হলাম যে, সর্বদা ভাবতাম—এই স্বামী বিবেকানন্দ কে? পরে আমাদের স্কুলের লাইব্রেরিতে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' ও অন্যান্য গ্রন্থ পেলাম। ঐ বইগুলি একে একে পড়লাম এবং আমার সহপাঠীদের সঙ্গে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করতাম। স্থানীয় স্কুলের বাংলার শিক্ষক মহাশয় প্রভৃতি কয়েকজন এক উকিলের বাসায় প্রতি রবিবারে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' পাঠ ও আলোচনা করতেন। ঐ পাঠ-আলোচনায় আমরাও যোগ দিতে লাগলাম।

এভাবে বৎসর দুই চলার পর ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের প্রথম ভাগেই বোধ হয় বেলুড় মঠের জনৈক ব্রহ্মচারী উদ্বোধন প্রকাশিত শ্রীশ্রীঠাকুর স্বামীজীর গ্রন্থাবলী ও ফটো ইত্যাদি নিয়ে শহরে এলেন। আমরা তাঁর কাছে শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর কথা বিশেষভাবে শুনতাম এবং শ্রীহট্ট শহরে যে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম স্থাপিত হয়েছে তাও জানলাম। ব্রহ্মচারী মহারাজ আমাদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেন তাঁর সুললিত কণ্ঠের ভজন-গান শুনিয়ে। প্রায় প্রতিদিনই আমাদের ভজন হতো এবং রাত্রি একটা-দেড়টা পর্যন্ত, আমরা সানন্দে তাঁর সঙ্গে অনেক ভজন-গান গাইতাম। কিন্তু অভিভাবকরা এজন্য আমাদের উপর বিশেষ খুশি ছিলেন না।...

ক্রমে আমার জীবনে প্রথম বেলুড় মঠ-দর্শনের সুযোগ উপস্থিত হয়। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের প্রথম সাধু-সম্মেলনের আয়োজন হয়েছিল। শ্রীহট্ট আশ্রম হতে সেখানকার সাধু-ভক্ত মিলে কয়েকজন সেই সম্মিলনে যোগ দিতে মঠে যাচ্ছেন সংবাদ পেয়ে আমারও বেলুড় মঠে যাবার বিশেষ ইচ্ছা

হলো। মঠে গিয়ে পূজ্যপাদ শ্রীমহাপুরুষ মহারাজকেও দর্শন করলাম। মঠেই আমাদের থাকার স্থান হলো।

এ সম্মিলনে বহু সাধু-সন্ন্যাসী বিভিন্ন কেন্দ্র হতে সমবেত হয়েছিলেন এবং ভারতের বহু স্থান হতে গৃহস্থ ভক্তরাও অনেকে এসেছিলেন। মঠে তখন খুব আনন্দোৎসব। শ্রীশ্রীঠাকুরের পার্ষদগণ যাঁরা তখনও জীবিত ছিলেন, সকলেই মঠে সমবেত। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ মহাপুরুষজী মহারাজ, সারদানন্দজী মহারাজ, গঙ্গাধর মহারাজ, বিজ্ঞান মহারাজ, খোকা মহারাজ প্রভৃতি শ্রীশ্রীঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের এবং গৃহস্থ ভক্ত শ্রীম প্রভৃতিকে দর্শন করে পরম আনন্দলাভ করলাম। মঠে আনন্দের মেলা—সারাদিনই ভজন পাঠ আলোচনা ও সভা।

ঐ সময় প্রেমেশ মহারাজ আমাদের কয়জনের দীক্ষার জন্য পূজ্যপাদ শ্রীমহাপুরুষজীকে ধরে বসলেন। মহাপুরুষজী কৃপা করে দীক্ষাদানে সম্মত হলেন। নির্দিষ্ট দিনে আমাদের দীক্ষা হয়ে গেল। সেদিন আমরা শ্রীহট্টের ১৩।১৪ জন মহাপুরুষ মহারাজের কৃপা পেয়ে ধন্য হলাম। দীক্ষার সময়ে শ্রীমহাপুরুষজীর যে করুণাময় মূর্তি দেখেছি, তা জীবনে ভুলতে পারব না—স্নেহ ও করুণা যেন মূর্তি ধরে সামনে বিরাজিত। ঐ মূর্তিতে আমি পরেও তাঁকে দর্শন করেছি এবং সে মূর্তিই আমার প্রাণে জাগরূক থেকে সর্বদা আনন্দ ও শান্তি প্রদান করছে। তাঁর এই করুণাময় মূর্তি আমার জীবনের সব ক্ষুদ্রতা ও দুর্বলতা দূর করে প্রাণে শান্তি ও অভয় এনে দেয়। পিতামাতার স্নেহভালবাসাই বড় জিনিস বলে পূর্বে ভাবতাম, কিন্তু সদ্‌গুরু যে তাঁদের চেয়েও শতগুণে স্নেহ-করুণায় বিগলিত, তা তো আর আগে জানতাম না! আমরা সর্বদা মহাপুরুষজীর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতাম, তিনি যেখানে বসতেন সেখানেই আমরা তাঁকে ঘিরে বসতাম; সভাতে উপস্থিত হলে পিছনে দাঁড়িয়ে তাঁকে পাখার বাতাস করে আনন্দ পেতাম। তিনিও মাঝে মাঝে আমাদের লক্ষ্য করে যে দু-একটি কথা বলতেন, তাতেই প্রাণ ভরে যেত। কথা তাঁর খুব কমই শুনেছি। কিন্তু তাঁকে দর্শন করলেই প্রাণে অপূর্ব আনন্দ পেতাম। সে আনন্দ জাগতিক অন্যান্য আনন্দ থেকে যে স্বতন্ত্র ও অপার্থিব তা কিছু কিছু বুঝতে পারতাম। আর একটি কথা মনে হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের জীবনে—বিশেষত বাহ্যিক চাল-চলনে ও হাবভাবে এমনি একটা অপার্থিব ভাব ছিল যা তাঁদের এই পৃথিবীর জনসাধারণ হতে পৃথক করে রাখত। তাঁদের দেখলেই আমার মনে হতো—এঁরা যেন এ পৃথিবীর সঙ্গে যুক্ত নন। এঁদের কাছে এ পৃথিবী আছে কি নেই। এভাবে এক বিমল আনন্দে সাতদিন মঠে কেটে গেল, এবার ফেরবার পালা।...দেশে ফিরবার পূর্বে পিতৃশ্রাদ্ধাদি করার জন্য ট্রেনে গয়ায় গেলাম। তারপর

৭। ৮ দিন ধরে পায়ে হেঁটে পৌঁছলাম ৺কাশীধামে। ঐ পুণ্যতীর্থে কিছুদিন পরমানন্দে বাস করে দেশে আসতে হলো। কিন্তু সংসারত্যাগের জন্য মন এতই ব্যাকুল হলো যে, শ্রীহট্টে এসে প্রেমেশানন্দজীর দুখানি পত্র নিয়ে মঠে রওনা হলাম, একখানা পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজকে এবং অন্যখানা স্বামী ওঙ্কারানন্দ মহারাজকে। স্বামী ওঙ্কারানন্দ আমাকে মহাপুরুষজীর কাছে নিয়ে গেলেন। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজার ২।১ দিন পূর্বে শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ কৃপা করে আমাকে বেলুড় মঠে আশ্রয় দিলেন।

মঠ-বাসের সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করলাম। ওখানে ধ্যানভজন করে নিত্য মহাপুরুষজীকে দর্শন ও শ্রীশ্রীঠাকুরের কিছু কাজকর্ম করে আনন্দে দিন কাটতে লাগল। তখন ভোরবেলায় শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজার বাসন মাজতাম। সব দিন ভোরে ঘুম ভাঙত না, তাই বাসনমাজার দেরি হতো। তা শুনে পূজনীয় খোকা মহারাজ বললেন, "দেখ, তোমাদের একটা কৌশল শিখিয়ে দি, তা করলে ঠিক সময়ে ঘুম ভেঙে যাবে। রোজ ঘুমোবার পূর্বে শেষ রাত্রে যে সময় ঘুম থেকে উঠতে চাও সেই সময়ের সংকল্প মনে করে নিজের নাম ডেকে বলবে—'হে অমুক, আমাকে এতটার সময় তুলে দিও।' এভাবে তিনবার বলে ঘুমিয়ে পড়বে। দেখবে ২।১ দিন পরে ঠিক সে সময় তোমার ঘুম ভেঙে গিয়েছে।" তাই করতে লাগলাম। এভাবে ঠিক চারটার সময় ঘুমভাঙার উপায় হলো। দেখতাম ঠিক চারটার সময়ই ঘুম ভেঙেছে। এখনও তাই হয়—চারটা বাজলেই ঘুম ভেঙে যায়।...

মঠে নানা কাজ করি—সবই শ্রীঠাকুরের কাজ। খুব আনন্দে ছিলাম। ভোর চারটার সময়ই ঘুম ভাঙত—জপধ্যানে বসে যেতাম। ৬টার পরেই মহাপুরুষজী ও খোকা মহারাজকে প্রণাম করতে যেতাম। প্রণাম করলেই মহাপুরুষজী আমাদের কুশল জিজ্ঞাসা করতেন। তখন দেখতাম তাঁর প্রতি কথায় স্নেহ ও করুণা যেন উথলে পড়ছে। তাতে প্রাণ আনন্দে ভরে যেত। যে সব দিন মহাপুরুষজীর শরীর বিশেষ অসুস্থ থাকত—হাঁপানির জন্য রাত্রে ভাল ঘুম হতো না, সেসব দিনেও দেখতাম কথা বলতে তাঁর কষ্ট হয় তবু হাত তুলে ইশারায় কুশল-প্রশ্ন করতেন, "ভাল আছ তো?" তাতেও প্রাণে বিমল আনন্দ পেতাম। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ যখন যেভাবে থাকেন তাতেই লোকের মনে আধ্যাত্মিকতা সঞ্চার করতে পারেন। প্রাচীন সাধুদের মধ্যে কেউ কুশল-প্রশ্ন করলে মহাপুরুষজী প্রায়ই বলতেন, "আমি ভাল আছি, কিন্তু শরীর ভাল নেই। আমি তো আর শরীর নই!"

খোকা মহারাজও আমাদেরই মতো নিত্য মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করতে যেতেন। তখন দুই গুরুভ্রাতার মধ্যে যে কিরূপ শ্রদ্ধা ও স্নেহ-প্রীতির ভাব দেখেছি

যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। খোকা মহারাজকে মহপুরুষজী ছোট ভায়ের মতোই দেখতেন। তাঁর খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতেন।

একবার পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজ মঠে এসেছেন। শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের ঘরে প্রবেশ করেই "দাদা, দাদা" বলে তাঁর কোলে মাথা রেখে প্রণাম করলেন। অমনি মহাপুরুষজী স্নেহ-ভালবাসায় গদগদ হয়ে দু-হাতে তাঁর মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে "গঙ্গাধর এসেছে—গঙ্গাধর এসেছে" বলে আনন্দ করতে লাগলেন। তারপর দু-ভাই মিলে পুরাতন সব কথা বলতে আরম্ভ করলেন।...

মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীদের সুখ-দুঃখের সঙ্গে মহাপুরুষজী নিজেকে বিশেষ জড়িত রাখতেন। একদিন মুড়ি খেতে খেতে উপরে গিয়েছি—তখন মঠের আর্থিক অবস্থা তত স্বচ্ছল ছিল না। মুড়িও খুব হিসেব করে খেতে হতো, একটি টিনে মুড়ি থাকত এবং তার উপরে একটি ছোট সিগারেটের কৌটা থাকত। এই কৌটার এক কৌটার বেশি কেউ মুড়ি নিতে পারত না। তাই নিয়ে আমি খেতে খেতে উপরে গিয়েছি। মহাপুরুষজী আমাকে দেখে কি খাচ্ছি জিজ্ঞেস করলেন। বললাম, "মুড়ি খাচ্ছি।" অমনি তিনি বললেন, "একটু ঘি ও চিনি মিশিয়ে খাও, বেশ লাগবে।" আমি তখন ভাবলাম—মুড়িই খেতে পাই না, তাতে আবার ঘি ও চিনি। যা হোক তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তখনই নিচে গিয়ে ভাঁড়ারি মহারাজের কাছে মহাপুরুষজীর কথা জানালাম। তিনি তৎক্ষণাৎ ঘি ও চিনি দিলেন।...

মহাপুরুষজীর হাঁপানি ছিল—গরমের দিনে হাঁপানির টান বেশি হতো এবং রাত্রে কিছুতেই ঘুম হতো না। কিন্তু যেদিন একেবারেই ঘুম হয়নি, সেদিনও সকালবেলা গিয়ে দেখেছি—শান্ত-সমাহিত-আনন্দ-মূর্তি! কথা বলতে কষ্ট হয়, হাত তুলে ইঙ্গিতে কুশলপ্রশ্ন করছেন—তাতেই প্রাণ আনন্দে ভরে যেত। তিনি কারও সেবা গ্রহণ করতে চাইতেন না, নিজের আশ্রিত সন্তানেরও না। রাত্রিতে গরমের জন্য মহাপুরুষজীকে বড় পাখা নিয়ে হাওয়া করতে হতো। তাঁর ইলেকট্রিকের পাখার হাওয়া সহ্য হতো না। কয়েকদিন আমার ঐরূপ হাওয়া করবার সৌভাগ্য হয়েছিল। কিন্তু বড়জোর ৩০।৪০ মিনিট হাওয়া করেছি, অমনি বলে উঠতেন, "বাবা, তুমি শোওগে। রাত্রে ঘুম না হলে তোমার কষ্ট হবে।" আমি তাতে বিশেষ আপত্তি করলেও শুনতেন না। কি করি অগত্যা পাখা রেখে চলে আসতে হতো। তাঁর জন্য কারও বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় তা তিনি চাইতেন না। বিদেহ অবস্থা যে কিরূপ তা মহাপুরুষজীকে না দেখলে বোঝা দুষ্কর। একদিনের কথা মনে পড়ে, তখন শরৎকাল। পূজার আর বেশি দেরি নেই। খুব সকালে মহাপুরুষজীকে প্রণাম করতে আমিই বোধহয় প্রথম সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছি। সেবক মহারাজ তখন উপর থেকে

নামছিলেন। আমাকে বললেন, "প্রণাম কর গিয়ে, কিন্তু এখন তাঁকে স্পর্শ করো না।" মহারাজের ঘরে গিয়ে তাঁর শ্রীমূর্তি দেখে তো অবাক! এরূপ আর কোনদিন দেখিনি। প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় বসে আছেন—কাপড়খানা কোনপ্রকারে কোমরে জড়ানো। খোলা শরীর—তাও অন্যদিনের তুলনায় যেন দেড়গুণ বেড়ে গিয়েছে! সোজা হয়ে বসে 'মা' 'মা' করছেন। আমি সেবক মহারাজের কথামত প্রণাম করে বাইরে দরজায় দাঁড়িয়ে দর্শন করছি। বোধ হয় ২।১ মিনিট পরেই টের পেয়ে ইশারায় বললেন, "এখন যাও।" আমি চলে এলাম। কনভেনসনের (সাধু-সম্মেলন) বৎসর—যে বছর আমার দীক্ষা হয়—একদিন তাঁকে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় দেখে বিস্মিত হয়েছি। পুরাতন মন্দিরের ভিতরে মহাপুরুষজী ও শরৎ মহারাজ দুই গুরুভ্রাতা পাশাপাশি বসে ধ্যান করছেন। সে কি দৃশ্য—যেন পাহাড় নিশ্চল ও নিস্পন্দ হয়ে বসে আছেন!...

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ। বোধহয় যেদিন শ্রীমৎ মহাপুরুষ মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করেন, সেদিন—শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজার দিন—'আত্মারামের কৌটার' পূজা যথারীতি ষোড়শোপচারে সম্পন্ন হয়েছে এবং তা মহাপুরুষজীর হাতে দেওয়া হয়েছে প্রণাম করবার জন্য। কৌটা হাতে নিয়ে তাঁর শরীর যেন স্ফীত হয়ে উঠল! আত্মারামকে মাথায় নিয়ে পরে বুকে স্পর্শ করালেন। সেদিন আমরাও যারা সেখানে উপস্থিত ছিলাম আত্মারামকে স্পর্শ ও প্রণাম করে ধন্য হলাম।...

কাশী অদ্বৈত আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরনির্মাণের পূর্বে পূজনীয় চন্দ্র মহারাজ (স্বামী নির্ভরানন্দজী) ভিত্তিস্থাপনের জন্য শ্রীমহাপুরুষজীর স্পর্শ-পূত 'ইষ্টক' চেয়ে পত্র দিতে আমাদের কয়েক জনের সমক্ষেই মহাপুরুষজী গঙ্গাজলে ধৌত ও পূজিত ইষ্টক স্পর্শ করে মুদিত নয়নে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা জানালেন—"ঠাকুর, ৺কাশীতে চন্দ্র তোমার মন্দির করবে, মন্দিরটি যেন সুসম্পন্ন হয়।"...

* * *

১৯২৯ খ্রিঃ আসামের কাছাড় ও শ্রীহট্ট জেলায় ভীষণ বন্যায় দেশবাসীর নিদারুণ কষ্ট হয়। তখন মঠের আদেশে কাছাড়ের শিলচর টাউন হতে সাহায্যদানের ব্যবস্থা হয়। তখনও শিলচর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমটি ভাল করে গড়ে ওঠেনি, কেবল আশ্রম-স্থাপনের প্রারম্ভিক কাজ শুরু হয়েছে। সুতরাং বেলুড় মঠ থেকেই সেবাকার্য-পরিচালনার্থ স্বামী নির্বাণানন্দ মহারাজের নেতৃত্বে অন্য কয়েকজন সাধু-ব্রহ্মচারীকেও শিলচর আসতে হয়। আমি তখন মঠে ব্রহ্মচারী, স্বামী ওঙ্কারানন্দ মহারাজের কাছে গীতাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করি। তাই বিশেষ ইচ্ছা সত্ত্বেও ঐ কাজে যোগ দিতে পারিনি।

একদিন মহাপুরুষজী হঠাৎ আমায় প্রশ্ন করলেন, "কি দেবেন, তোমাদের দেশে বন্যায় এত লোকের কষ্ট হচ্ছে, তুমি যে ঐ সেবাকার্যে যোগ দিলে না?" আমি বললাম, "মহারাজ, শাস্ত্র পড়ছি, তাই আর গেলাম না।" তাতে মহাপুরুষজী বেশ উত্তেজিত হয়ে বললেন, কি হবে এমন শাস্ত্র পড়ে—ঐসব সেবাকার্য করে যদি হৃদয়ের প্রসারই না হলো? "কি হবে তোর শাস্ত্র পড়ে?" তাঁর এই কথায় আমার শাস্ত্রপড়ার দিকে যে বিশেষ আগ্রহ ছিল তা একেবারেই কমে গেল এবং ঐসব কাজই যে ভগবদুপলব্ধির প্রধান সহায় তা কতকটা ধারণা হলো। মঠ থেকেই ঐ কাজে বিশেষ সাহায্য করতে চেষ্টা করলাম। স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দ তখন মঠে রিলিফের হিসাবপত্র রাখতেন এবং বন্যাসাহায্য-কেন্দ্রে টাকা-পয়সা যা প্রয়োজন তা জোগাড় করে পাঠাতেন। আমি ঐ কাজে তাঁকে বিশেষ সাহায্য করতে লাগলাম।

ঐ বৎসরের শেষদিকে—মনে হয় নভেম্বর কি ডিসেম্বর মাসেই আমার শরীর খুব অসুস্থ হয়। পেটের গোলমালই বেশি—এতে শরীর বেশ দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই শ্রীহট্ট আশ্রমে গিয়ে কিছু দিন থাকবার জন্য মঠ-কর্তৃপক্ষের অনুমতি চাইলাম। তাঁরা সানন্দে সম্মত হলেন এবং মহাপুরুষজীও অনুমতি দিলেন।

যেদিন রওনা হব সেদিন সকালবেলা মহাপুরুষজীকে একটি প্রশ্ন করেছিলাম—"মহারাজ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব যে ভগবান, লোককল্যাণার্থে শরীরধারণ করেছেন তা পুস্তকাদিতে পড়েছি এবং তাতে কতকটা বিশ্বাস হয়েছে, কিন্তু আপনার মুখে শুনলে বিশ্বাস আরও দৃঢ় হবে।" মহাপুরুষজী বললেন, "বাবা, ঠাকুরকে ভগবান জেনেই তো বাড়িঘর ছেড়ে এসেছ, তিনি তাই ছিলেন।" তারপর বললেন, "দেশে যাবে—আত্মীয়স্বজনকে দেখবার বুঝি একটু ইচ্ছা হয়েছে।" আমি জানি না এই বাসনাও মনে সুপ্ত ছিল কিনা। শরীর বিশেষ অসুস্থ হয়েছে বলেই যেতে ইচ্ছে হয়েছে—মহাপুরুষজীকে সে কথাই নিবেদন করলাম। এরপর ১৯৩০ খ্রিঃ সেপ্টেম্বরে আমি ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনে কর্মিরূপে চলে যাই। মহাপুরুষজীকে নিত্য দর্শন করা এবং তাঁর পূতবাণী শোনা আমার ভাগ্যে আর হয়নি।

ঢাকা থেকে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে পূজার সময় একবার পাঁচ-সাত দিনের জন্য বেলুড় মঠে এসেছিলাম। তখন মহাপুরুষজীকে দেখেছি তিনি যেন একটি শিশু, বিছানায় বসে আছেন, গলায় একটি সোনার মাদুলি—মাদুলিটি তিনি হাঁপানির জন্য ধারণ করতেন। ঐ সময়ে কথাবার্তা বড় একটা হয়নি—কিন্তু রোজই তাঁর অফুরন্ত আশীর্বাদ পেয়েছি।

পরে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে মহাপুরুষজীর মহাসমাধির পূর্বে ঢাকা থেকে জানতে পেলাম যে, তাঁর শরীর অত্যন্ত খারাপ, তিনি শীঘ্রই হয়তো দেহরক্ষা করবেন।

তখন ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী প্রেমেশানন্দজীর কাছে বেলুড় মঠে যাবার অনুমতি চাইলাম। কিন্তু আমার এমনই দুর্ভাগ্য যে, মঠে যেদিন সকালবেলা পৌঁছলাম, তাঁর পূর্বদিন বিকেলে গুরুদেব মহাপুরুষজী মহাসমাধিতে শরীরত্যাগ করেছেন। স্থূল শরীরে আর তাঁর দর্শন হলো না, সমাধিস্থানে প্রণাম করে কাঁদতে লাগলাম। চিন্ময়রূপে কি কখনও দর্শন হবে? তবে ভরসা এই যে, একবার মহাপুরুষজী খুব আশীর্বাদ করে বলেছিলেন—"চৈতন্য হোক, চৈতন্য হোক, চৈতন্য হোক।" তাঁর পূত আশীর্বাণী নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে, কিন্তু আমার জীবনে কোন যোগ্যতা দেখি না। অহেতুক কৃপাসিন্ধু সচ্চিদানন্দ গুরু কৃপা করে শ্রীচরণে স্থান দিয়েছেন—জীবন ধন্য মনে করছি। তাঁর পাদপদ্মে পূর্ণ শরণাগতি যেন আসে—এই প্রার্থনা সতত তাঁর কাছে। হরি ওঁ তৎ সৎ।

শুভম্

শ্রীমহাপুরুষজীর পুণ্যস্মৃতি

স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ

পূজ্যপাদ শ্রীমহাপুরুষজীকে প্রথম দর্শন করি হাওড়া স্টেশনে। তিনি বম্বে থেকে নাগপুর হয়ে ফিরছেন। স্টেশনে পৌঁছতে আমাদের কিছু দেরি হয়েছিল। ততক্ষণে গাড়ি এসে গেছে। দীর্ঘ গৌরকান্তি, মুখে অপূর্ব প্রসন্ন হাসি। 'ধবলকমলশোভঃ জ্ঞানপুঞ্জাট্টহাসঃ'। দেখে সামলাতে পারলাম না। প্রণাম করেই পাদুখানি জড়িয়ে ধরলাম। তিনি শুধু স্নেহভরে বললেন, "কেরে কেরে" আর পিঠও একটু চাপড়ে দিলেন।...

তার কমাস পরে কলেজের প্রথম বর্ষের পড়াশুনা আরম্ভ হবার পূর্বে আমাদের ছাত্রাবাস আশ্রমে এসে একরাত তিনি কাটিয়ে যান। সন্ধ্যারতির পরে সকলকে আশীর্বাদ করেছিলেন, "আমি প্রার্থনা করি—না, না, আমি আশীর্বাদ করি তোদের সকলের ঠাকুরের প্রতি ভক্তি-বিশ্বাস দৃঢ় হোক, দৃঢ় হোক, দৃঢ় হোক।"...

আরও কিছুদিন বাদে বেলুড় মঠে গিয়ে শ্রীচরণে প্রণতিপুরঃসর দীক্ষার প্রার্থনা জানাতেই মহাপুরুষজী বললেন, "দীক্ষা-ফিক্ষা ওসব আমরা দিই না। ওসব ভটচার্জিরা দেয়।" আমি তো হতবাক। যাই হোক, দু-একটা করুণামাখা কথাও বললেন। আরও বললেন, "ভগবান নর-শরীরে শ্রীরামকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত

হয়েছেন।" জিজ্ঞেস করলাম, "ভগবানকে মা বলে ডাকা যায় না?" তিনি বললেন, "কেন যাবে না? ঠাকুরের ঐটি খুব prominent (উজ্জ্বল) ছিল। তবে শুধু ঐটিই ঠিক, অন্যটা নয়, এমন ভাববে না।"...

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ৯ নভেম্বর। রাষ্ট্রনেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির জন্মদিন, রিপন কলেজ ছুটি। মঠে গিয়ে প্রণাম করতেই মহাপুরুষজী বললেন, "কোথায় থাক? কি কর?" বললাম, "স্টুডেন্টস হোমে থাকি আর কলেজে পড়ি।" আবার বললেন, "আজ কলেজ নেই?" বললাম, "রিপন কলেজে পড়ি, আজ সুরেন ব্যানার্জির জন্মদিন, তাই কলেজ ছুটি। স্বর্গত ব্যানার্জি কলেজের গরিব ছেলেদের জন্য অনেক টাকা দান করে গেছেন।" শুনে ভারী খুশি হলেন। আরও দু-একটি কথা জিজ্ঞেস করার পরে বললেন, "হবে।" তবুও বসেই আছি। আবার বললেন, "স্নান করে ঠাকুরঘরে যাও, আমি যাচ্ছি।"

আর কি? মহানন্দে নিচে গিয়ে মঠের একজন সাধুর কাছে গামছা চেয়ে গঙ্গায় ডুব মেরে ঠাকুরঘরে গিয়ে বসলাম। যথাকালে ডাক এল। মন্ত্রদীক্ষাও হয়ে গেল। বললেন, "দক্ষিণা দাও।" আমি বললাম, "আমার কাছে কিছুই নেই।" বললেন, "নিচে থেকে (ঠাকুরভাণ্ডার) হর্তুকী একটি এনে দাও।" দরজার কাছে সেবক দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁকে বলতেই এনে দিলেন হর্তুকী, গ্যাঁদাফুল আর একটা কি দুটা লেবু। ব্যস—হয়ে গেল।...

'নাম' তো করি। কিন্তু কোথায় ঠাকুর? এ যে মা, মা-ই হচ্ছে। হয়তো খুব তান্ত্রিক বংশে জন্মের জন্য, পিতৃ মাতৃ উভয় দিক থেকেই তাই এটি হতো। এমন কি উপনয়নের আগে থেকেই 'মা-মা' জপ করতাম। ভয়ে ভয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করতেই মহাপুরুষজী বললেন, "ঠিক আছে, ঠাকুর আর মা অভেদ জানবে।" সংশয় কেটে গেল।...

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মহাসম্মেলন। অনেক সাধু-সমাগমে মঠ লালে লাল। আমরা কজন স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করতে গেছি, কজন দীক্ষাপ্রার্থীকে মহাপুরুষজী বলছেন, শুনলাম, 'দীক্ষা-টিক্ষা আমরা দিই না, এই রামকৃষ্ণনাম বল, এখানে (নিজের ঘরে) বসেই বলি, নয়তো ঠাকুরঘরে গিয়ে বলি।" দীক্ষাপ্রার্থীদের নেতা ছিলেন স্বামী প্রেমেশানন্দজী (তখন ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য); তিনি বললেন, "মহারাজ, ঐ কথাই আপনি ঠাকুরঘরে গিয়ে বলবেন।" মহাপুরুষজী বললেন, "খুব ভাল, আজই হবে।" শ্রীশ্রীঠাকুরের নামের মহিমার কথায় বললেন, "ব্যাটারা বলে—কাম হয়; এই রামকৃষ্ণনাম করলে আর তাঁর ধ্যান করলে কাম হবে কেন? রামকৃষ্ণের ধ্যানে কামাদি সব পালিয়ে যায়।"

মহাসম্মেলনের পরেই মহাপুরুষ মহারাজ দক্ষিণ-ভারতে চলে যান এবং মঠে ফিরে আসেন ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারির প্রথমে। তার কদিন পরেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ, আই-এস-সি পরীক্ষা। আমরা কজন বন্ধু মিলে মঠে গিয়ে দর্শন প্রণাম করে আসি। মঠবাড়ির দোতলায় পূর্বের বারান্দায় মহাপুরুষজী বসেছিলেন। আমাদের দেখেই বললেন, "এই যে সব স্টুডেন্টস হোম।" আমরা প্রণামাদি করেই চলে আসব, কেননা পরীক্ষা সামনে। বললেন, "প্রসাদ পেয়ে যাবে না?" আমরা বললাম, "মহারাজ, আমাদের পরীক্ষা সামনে, খুব পড়তে হচ্ছে।" বললেন, "খুব পড়, খুব পড়, তবে হাতে করে একটু প্রসাদ নিয়ে যেও।" ইতোমধ্যে বাঁকুড়ার ভক্ত (বিভূতিবাবু) দু-একটি প্রসঙ্গের পরেই বারাসতের বাড়ি ইত্যাদি সম্বন্ধে কি একটা লিখে দিতে বলায় মহাপুরুষজী বললেন, "সে আমি পারব-টারব না। তারা সব আসে। এক-আধটা কাপড়-চোপড় দি—'উদারচরিতানাস্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্'। ঠাকুর উদার করে দিয়েছেন, এখন বসুধাই কুটুম্ব। জগতের দুঃখ-কষ্টও চিরকাল আছে, চিরকাল থাকবে। ঠাকুর বলতেন—পানাপুকুরের পানা, একটা ঢিল ছুঁড়ে দাও খনিকটা পানা সরে গেল, আবার যে কে সেই। অত বড় বুদ্ধদেব এলেন, জগতের তোলপাড় হয়ে গেল, আবার যে কে সেই। এবার ঠাকুর এসেছেন, এখন পানা সরছে, খুব সরছে, (চোখ বুজে দুটি হাত প্রসারিত করে) এখন পাঁচ-সাত-আটশো বছর খুব পানা সরবে।" আমরা প্রণাম করে চলে এলাম।...

তখনও মন্দির হয়নি। ছোট্ট ঠাকুরঘর, কিন্তু ঢুকতেই মহা আনন্দ। এ আনন্দ অন্যত্র নেই কেন?—জিজ্ঞেস করতেই মহাপুরুষজী বললেন, "কি জানিস, (ততদিনে ঘনিষ্ঠতার জন্য প্রায় আর তুমি না বলে তুই-ই বলতেন) স্বামীজী ঠাকুরকে মাথায় করে এনে বসিয়েছিলেন। আর মহারাজ, হরি মহারাজ, শরৎ মহারাজ, আমরা সব রয়েছি। এখানে একটা এটমোস্‌ফিয়ার (আধ্যাত্মিক আবহাওয়া) আছে। বুঝেছিস?" বললাম, "আজ্ঞে হাঁ, মহারাজ।"...

পূজা বা উৎসবের সময় স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করতে প্রায়ই বেলুড় মঠে যেতাম। কাজ যতই হোক, প্রত্যহ গঙ্গাস্নান, দর্শন, প্রণামে প্রবল আনন্দ। পূজার আগে মঠে ঢুকতেই মনে হতো 'আনন্দেরই সাগর হতে এসেছে আজ বান।' প্রণাম করে বললাম, "ভারী আনন্দ লাগছে।" মহাপুরুষজী বললেন, "আনন্দ হবে না? এ যে আনন্দের জায়গা, তায় আবার মার বিশেষ আবির্ভাব হবে।"

বরিশাল থেকে আগত একজন দীক্ষাপ্রার্থী ভক্তকে মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, "তোমার ইচ্ছা হলে কি হবে, আমার তো ইচ্ছা হওয়া চাই। I am not bound (আমি বাধ্য নই)। কি বলিস?" এ কথা বলে আমার দিকে তাকালেন। ভদ্রলোকের

মুখ তো চুন! কিন্তু যখন শুনলেন, তাঁর বাড়িতে নারায়ণের সিংহাসনের পাশে ঠাকুরের আসন আছে, নিত্য ফুল ফল ছাড়া অন্ন ভোগেরও ব্যবস্থা আছে, তখন ভারী খুশি হয়ে বললেন, "বলিস কিরে, নিত্য অন্নভোগ!" বললাম, "হ্যাঁ, মহারাজ, নারায়ণের ভোগ তো আছেই, ঐ সঙ্গে আমাদের ঠাকুরেরও।" মহাপুরুষজী বললেন, "আজই তোমার দীক্ষা হবে।" ইতোমধ্যে একজন সাধু (মধুসূদনানন্দজী) একটি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করেছেন, তাই দিয়ে নিত্য মহাপুরুষজীর উদ্দেশে প্রণাম করেন। তাঁর ভারী ইচ্ছে, যারা সব দীক্ষা পায়, তাদেরও শ্লোকটি শিখিয়ে দেন। তাই দীক্ষাপ্রাপ্ত ভক্তদের তাঁর কাছে পাঠাবার অনুরোধ জানাতেই মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, "সে আমি পারব না। আমার স্বপ্নেও গুরু-অভিমান হয় না। আমি কি জানি জান? সকলের ভিতরেই সেই ঠাকুর, তিনিই ভিতর থেকে প্রেরণা দেন। আমার কাছে আসে, আমার ভিতরেও সেই ঠাকুর। তিনি ভিতর থেকে প্রেরণা দেন, এই নাম দি, এই নাম করতে করতে তিনিই ভিতর থেকে revealed (প্রকাশিত) হবেন।" প্রণাম-মন্ত্র শেখানো আর হলো না বটে, ভক্তটি কৃপা পেয়ে ধন্য হয়ে গেল।...

একটি উচ্চাভিলাষী কলেজের ছেলে। মঠের সঙ্গে তার খুব হৃদ্যতা। মহাপুরুষজী প্রমুখ সকলেই তাকে খুব স্নেহ করতেন। কলেজ-জীবনের প্রথমেই দীক্ষাও পেয়েছিল। হঠাৎ এক সঙ্গতিপন্ন ভক্ত-পরিবারের একটি মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ের কথা প্রায় পাকা হয়ে যায়। সংবাদ শুনে সে তো হতভম্ব। নির্বেদানন্দজীও তাকে খুব স্নেহ করতেন, তাঁরই নির্দেশে মঠে গিয়ে প্রণতিপুরঃসর মহাপুরুষজীকে বিপদের কথা বলতেই মহাপুরুষজী খুব জোরের সঙ্গে বললেন, "কেউ তোর কিছু করতে পারবে না। তুই নিজে খুব firm থাক্‌বি। এখানে (মঠে) তো তোর বাড়ি রয়েইছে। যখন খুশি তখন এলেই হবে। আমি অমুককে বলে দেবো।" ব্যস। ভদ্রলোককে কিন্তু মহাপুরুষজী ঠিক বলেছিলেন, "ওর সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে কি? ও তো সাধু হবে।" ভদ্রলোকও সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "কারো সাধু হবার সংকল্প থাকলে তাতে আমি বাধা সৃষ্টি করব না।" বিপদ কেটে গেল। এই কথা কালে ফলেছিল। ছেলেটি উত্তরকালে শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘে যোগ দিয়েছে এবং আনন্দেই আছে।...

আর একদিন মঠে গিয়ে দেখি, সদ্যদীক্ষাপ্রাপ্ত একজন ভক্ত যুক্তকরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করছেন, "কবার জপ করব?" জবাবটি বেশ, "এই দশ-বারো বারের কম না হলেই হলো।" আবার প্রশ্ন, "কি খাব?" বললেন, "যা পাবে তাই খাবে, তবে শোওর-গরুটা খাবে না, অবিশ্যি শোওর-গরু যদি কেউ প্রসাদ বলে দেয় একটু জিবে ঠেকাবে।"...

শ্রীশ্রীস্বামীজীর পুণ্য জন্মতিথি। মঠে প্রচুর লোকসমাগম। তখনকার দিনে বেলা ১টার কাছাকাছি থেকে প্রায় সন্ধ্যা অবধি সকলকে বসিয়ে পেট ভরে প্রসাদ খাওয়ানো হতো। প্রসাদের ঘণ্টা হয় হয়। এমনি সময়ে আকাশ জুড়ে মেঘ। দু-এক ফোঁটা বর্ষণ হয়েই অবিশ্যি থেমে গেল। সন্ধ্যাবেলা ফেরার আগে প্রণাম করে যেই বলেছি, "আজ বৃষ্টি হলে সব মাটি হয়ে যেত।" আর যায় কোথায়? সিংহের মতো গর্জে মহাপুরুষজী বললেন, "কি বলছিস? আজকে কার দিন জানিস? অত বড় মহাপুরুষ, ভুবনবিজয়ী মহাপুরুষ! তাঁর জন্মদিন। 'নেচার-ফেচার' বুঝি না। তাঁর কৃপায় সব ঠিক হয়ে গেছে।" স্বামীজীকে এঁরা সব কি দৃষ্টিতেই দেখতেন!...

প্রীতি মহারাজের একবার খুব টাইফয়েড হয়েছিল। বেশ কিছুদিন ভুগেছিলেন। তাঁর সেবাদি তথা কলেজের পড়া ইত্যাদির জন্য অনেক দিন বাদে মঠে গিয়েছি। তার আগের দিন প্রীতি মহারাজ তেল-টেল মেখে আরোগ্য-স্নান করেছেন। সংবাদ শুনে মহাপুরুষজী ভারী খুশি। ফেরার সময় বললেন, "ক্ষুদিরাম তেল মেখে স্নান করেছে, বেশ শুভ সংবাদ। কি প্রসাদ দেওয়া যায় বল দেখি? লেবু?" বললাম, "ডাক্তাররা তো লেবু খেতে দিচ্ছেন না," তিনি বললেন, "বেদানা?" বললাম, "তা চলতে পারে।" সেবককে ডেকে একটা খুব বড় বেদানা আনালেন। প্রথমে নিজের মাথায় ও বুকে ঠেকালেন। পাশ দিয়ে স্বামী শুদ্ধানন্দজী যাচ্ছিলেন। বেদানাটি তাঁর হাতে দিয়ে বললেন, "তুমি হাতে করে দাও।" আর আমাকে বললেন, "তুই নিয়ে গিয়ে বলবি শিবানন্দ স্বামী, শুদ্ধানন্দ স্বামী দুজনে হাতে করে এই প্রসাদ দিয়েছেন, তোমাকে খেতে হবে।" হাতে করে নিয়ে বেদানাটি পকেটে রাখলাম। বললেন, "তুই যাবি কি করে?" তখন স্টিমার সারভিস ছিল, বললাম, "এই স্টিমারে।" আবার বললেন, "স্টিমারে কোথায় যাবি?" বললাম, "বাগবাজার।" বললেন, "সেখান থেকে কিসে যাবি?" বললাম, "বাসে।" আবার বললেন, "স্টিমারে কপয়সা ভাড়া?" বললাম, "চার পয়সা।" আবার বললেন, "সেখান থেকে?" বললাম, "ছ পয়সা।" বললেন, "ছ-চার দশ পয়সা।" সেবককে ডেকে বললেন, "ওকে দশটা পয়সা দিয়ে দে তো।" সেবক পয়সা নিয়ে আসতেই বললাম, "আমার কাছে পয়সা আছে, মহারাজ।" মহাপুরুষজী বললেন, "পয়সা আছে, তা বুঝি জানি না! স্টুডেন্টস হোমকে তো লাখ লাখ টাকা দিতে হয়। আমাদের নেই তো দেবো কোত্থেকে। জানি আমাদের আশীর্বাদেই সব হচ্ছে। ও সব ফাঁকা ফোঁকা আশীর্বাদ আমাদের কাছে নেই। ঠাকুর ওসব আমাদের শেখান নি। পয়সা নিয়ে যা।" কি আর করি, পয়সা নিয়ে প্রণাম করে চলে এলাম। উত্তরকালে স্টুডেন্টস হোম-এ যে লাখ লাখ টাকা এসেছে তা তো এই আশীর্বাদেরই ফল, এতে একবিন্দু সন্দেহেরও অবকাশ নেই।...

সব সময়েই জপাদিতে সমান মন বসে না, সমান আনন্দও হয় না। ভাবছি এ আবার কি আপদ! মঠে গিয়ে জিজ্ঞেস করতেই মহাপুরুষজী বললেন, "তোর কি একটা কাজ? স্টুডেন্টস হোমের কাজ আছে, পড়াশোনা আছে। কি পড়িস?" বললাম, "বই পড়ি।" আবার বললেন, "খুব পড়, খুব পড়।" ব্যস।...

নানা কারণে মনটা দমে গেলেই মঠে যাওয়া, ঠাকুর-প্রণাম, গঙ্গাস্নান—এসব করে এলেই সব আবার ঠিক। এ রকম একদিন গিয়ে ফেরার সময় গুরুদেবকে প্রণাম করে বললাম, "মহারাজ, একটু আশীর্বাদ করবেন যাতে ভক্তি বিশ্বাস হয়।" মহাপুরুষজী বললেন, "ভক্তি বিশ্বাস হবেই হবে, হবেই হবে, (সামনের টেবিলে কিল মেরে) আলবত হবে। ঠাকুরের নাম করেছিস, তাঁর নাম কখনও বিফলে যায় না, জানবি।" আমি বললাম, "মাঝে মাঝে বড় depression (বিষাদের ভাব) হয়।" তিনি বললেন, "ও কিছু নয়, মনটার wave-like motion—ঢেউখেলানো গতি, (হাত দুলিয়ে দেখিয়ে দিলেন) ও সব ঠিক হয়ে যাবে।"

পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দজী) নির্বেদানন্দজীকে বলেছিলেন, "মহাপুরুষ মহারাজের কথা দৈববাণী জানবি।" একথা শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ লীলাসহচরদের প্রত্যেকের বেলাতেই সত্য। এই অমোঘ দৈববাণীই জীবনের যাত্রাপথে পরম পাথেয়।

মহাপুরুষজীর সান্নিধ্যে

স্বামী নিখিলাত্মানন্দ

১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে চার-পাঁচ বছরের বেশি বেলুড় মঠে পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের পদপ্রান্তে বাস করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তাঁর করুণার অনেক ঘটনা আমার অন্তরের জিনিস।

একদিন আমরা কয়েকজন সকালে রোজ যেমন তাঁকে প্রণাম করতে যাই তেমনি গেছি। প্রণাম করবার পর তিনি যেন খুব ক্ষুণ্ণ হয়ে আবেগভরে বললেন—"তোরা সব কি করছিস? ঠাকুরকে প্রসন্ন করতে না পারলে কিছুই হলো না, বাবা। ঠাকুর ছিলেন ভক্তিপ্রিয়। তাঁর প্রীতি অর্জন করাই সাধুজীবনের লক্ষ্য। আজ ঠাকুরকে বড় বিরূপ দেখলাম। ভোরে ঠাকুরঘরে গিয়েছি, দেখি তিনি লাঠি নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন, এসে রোষায়িত নয়নে বলছেন, 'ছেলেরা জপ-ধ্যান করছে

কই? তুই এসব দেখছিস না?' অন্যদিন আমি মন্দিরে গেলে ঠাকুর আমার চিবুক ধরে আদর করে চুমু খেতেন, আমি তাঁর সন্তানের মতো কিনা তাই! আজকে তিনি যে রুষ্ট হয়েছেন তা তোদের জন্যে। লাঠি নিয়ে আমাকে মারতে এসেছিলেন! সকলকে বলে দে—আজ থেকে যেন নিয়মিতভাবে খুব জপধ্যান করে। ভোরে ও সন্ধ্যায় আরতির সময় সকলে যেন ঠাকুরঘরে যায় এবং ঠাকুরঘর যতক্ষণ খোলা থাকে ততক্ষণ কেউ না কেউ যেন ওখানে বসে জপ করে।" সেদিন থেকে আমরা সকলেই খুব জপ-ধ্যান করতে আরম্ভ করলাম। তিনিও তাতে খুব প্রসন্ন হলেন।

* * *

মঠে আমি তখন রোজ ঠাকুরঘর মুছতাম। বর্ষাকাল। ঠাকুরঘরের দক্ষিণদিকের বারান্দা বৃষ্টির জলে ভিজে যেত। একদিন আমি বৃষ্টির পর বারান্দাটা মুছিনি। মহাপুরুষ মহারাজ তা লক্ষ্য করে তাঁর ঘর থেকে আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁর ঘরে যেতেই বললেন—"হ্যাঁ হে, তুমি কিরকম ঠাকুরসেবা কর? ঠাকুর বৃষ্টির জলের জন্যে বারান্দায় বেড়াতে পারছেন না। তাঁর পা ভিজে যাচ্ছে। আর তোমরা কি করছ? আমি যে দেখি—ঠাকুর রোজ বৈকালে ঐ বারান্দায় বেড়ান। বাবা, ঠাকুরের যাতে কোন কষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখো। তিনি হচ্ছেন আমাদের প্রাণের প্রাণ, জগতের আত্মা। 'তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্'।"

* * *

আরতির সময় মহাপুরুষ মহারাজ তখন রোজই ঠাকুরঘরে গিয়ে বসতেন, কখনও কখনও ভজনগানেও যোগ দিতেন। একবার জন্মাষ্টমীর দিন আরতির পর ঠাকুরের ঘরের সামনের বারান্দায় "কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জকাননচারী"— এই গানটি গাইতে গাইতে আমরা খুব মেতে উঠেছি। তিনি তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে আমাদের ভজনের কোনও বিঘ্ন না করে অলক্ষিতে আস্তে আস্তে এসে আমাদের পেছনে বসে ঐ গান তন্ময় হয়ে শুনছেন। আমি খঞ্জনি বাজাচ্ছিলাম, তখন নতুন শিখেছি। একটু পাশ ফিরতেই দেখি, তিনি ঠিক আমারই পেছনে বসেছেন। ভয়ে ভয়ে আমার খঞ্জনি কখন দ্রুত, কখন ঢিলে হচ্ছে আর বুক কাঁপছে। যদি তাল-কাটে তাহলে আর রক্ষা নেই। পাছে তাঁর ধ্যানের বিঘ্ন হয়, এই ভেবে আমি খুব সন্ত্রস্ত হয়ে ঠাকুরকে ডেকে মন্দিরা বাজাতে লাগলাম। মহাপুরুষজী খুব ভাবস্থ হয়ে কীর্তন শুনলেন। তিনি কীর্তন খুব ভালবাসতেন।

* * *

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে আমার সন্ন্যাস হয়। তার পূর্বে বরাহনগর অনাথ আশ্রমে

দীর্ঘকাল সেবাকার্য করেছিলাম। পরে বেলুড় মঠে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরপূজার ভাঁড়ারের কাজে নিযুক্ত হই। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে আমার অন্তরে খুব বৈরাগ্যের ভাব জাগ্রত হয়। তাই ঐ সালে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথির দিন মহাপুরুষ মহারাজের কাছে সন্ন্যাস নেবার প্রার্থনা জানাই। তাঁকে প্রণাম করে করজোড়ে বললাম, "মহারাজ, আমায় সন্ন্যাস দিন।" "তোকে তো অনেক আগেই সন্ন্যাসী করে দিয়েছি।"—এই বলে মহাপুরুষ মহারাজ আমার মাথার উপর তাঁর শ্রীচরণ দুখানা তুলে দিয়ে বললেন—"তবে এখন আবার নে। তোর টিকি কেটে তোকে এবার ব্রহ্মাকাশে পাঠিয়ে দেব। যা, এবার স্বামীজীর উৎসবে বিরজাহোম করে সন্ন্যাস নিগে যা।" এই বলে বালকের মতো হাসতে লাগলেন। তাঁর শ্রীচরণ দুখানি আমার মাথার উপর অনেকক্ষণ রেখেছিলেন। আমার সমগ্র মন-প্রাণ এই পরিপূর্ণ আশ্রয় পেয়ে আনন্দে ভরে গেল। তখন প্রায়ই শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের শরীর-মন আশ্রয় করে জগজ্জননী মহাশক্তির অদ্ভুত করুণার প্রকাশ হতো। তাঁকে দেখে মনে হতো যেন তাঁর ভিতর সেই অহেতুক কৃপাসিন্ধু ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবই বাস করছেন। তিনি অন্তরে বাইরে শ্রীরামকৃষ্ণময় হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর ঐ আশীর্বাদে আমার মন এক অনির্বচনীয় দিব্যানন্দে ভরপুর হয়ে গিয়েছিল—কেমন যেন নেশার মতো! কয়েক দিন ছিল ঐ ভাব।

* * *

বোধ হয় ১৯৩১।৩২ খ্রিস্টাব্দের কথা। ঐ সময় বেলুড় মঠের পুরাতন মন্দির থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের ইষ্টকবচ চুরি হয়ে যাওয়ায় মহাপুরুষ মহারাজ খুবই চিন্তিত ও গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। ঠাকুরের মহাসমাধির পরে শ্রীশ্রীমা যখন বৃন্দাবনে যাচ্ছিলেন, সে সময় রেলগাড়িতে জানালা দিয়ে ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন—"কবচটি যে সঙ্গে রয়েছে, আর হাতটা জানালার ধারে রেখেছ, যদি কবচটা তোমার হাত থেকে কেউ ছিনিয়ে নেয়! ওটি সাবধানে রাখবে।" শ্রীশ্রীঠাকুর দেহত্যাগের পূর্বে তাঁর ইষ্টকবচটি শ্রীমাকে দিয়েছিলেন। শ্রীমা সেটি নিজের হাতে পরতেন এবং নিত্য পূজা করতেন। পরে তিনি ওটি বেলুড় মঠে দিয়েছিলেন। মহাপুরুষ মহারাজের সাধক পিতা রামকানাই ঘোষাল শ্রীশ্রীঠাকুরের সাধনকালে গাত্রদাহ নিবারণের জন্য দক্ষিণেশ্বরে তাঁকে ঐ ইষ্টকবচ ধারণ করতে বলেছিলেন। মহাপুরুষজীর পিতা তখন রানী রাসমণির মোক্তার। দক্ষিণেশ্বরে মাঝে মাঝে যেতেন এবং সাধনভজন করতেন। বেলুড় মঠে ঐ কবচটি কয়েকবার প্রসাদী ফুলবিল্বপত্রের সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে পড়ে যায়; আবার ভাঁটার সময়ে খুঁজতে খুঁজতে পাওয়া যায়। সেই কবচটি বেলুড় মঠে নিত্য পূজা হতো। ঐসময় এক গভীর রাত্রে ঝড়বৃষ্টির সময় ঐ কবচটি

চুরি যাওয়ায় মহাপুরুষ মহারাজ বিশেষ উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হয়ে হুকুম দিলেন যে, প্রতি রাত্রে দুতিন জন সাধু পর পর মন্দিরে সারারাত পাহারা দেবে। তখন 'আত্মারামের' কৌটাটি খুলে প্রায়ই পূজা ও স্নান করান হতো। সেটি চুরি গেলে মহা অপরাধ ও ক্ষতি হবে। ঠাকুরের আদেশ অনুসারে স্বামীজী মহারাজ নিজে কাঁধে করে এনে বেলুড় মঠে 'আত্মারামকে' প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ 'আত্মারামের' কৌটাটিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন্ত অধিষ্ঠান—সকলে মনে করত। ঐ রাত্রে আমার পাহারা দেবার পালা। রাত দুটো থেকে ঠাকুরঘর পাহারা দিচ্ছি। রাত্রিতে মহাপুরুষ মহারাজের ঘুম নেই বললেই চলে। ঠাকুরের ধ্যান-চিন্তায় ও ভগবৎ-প্রসঙ্গের আলাপ-আলোচনায় সারারাত কেটে যায়। ঠাকুরের সেবাপূজা এবং সাধুদের সেবাদির খুঁটিনাটিতেও তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল। ঐ রাত্রিতে মহাপুরুষ মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন—"আজ কে পাহারা দিচ্ছিস রে?" আমি আমার নাম বললাম। তিনি তাতে বললেন—"বেশ, ওখানে কি করছিস?"

আমি—মহারাজ, যাতে ঢুল না আসে তাই বসে 'কথামৃত' পাঠ করছি।

মহাপুরুষজী—বেশ ভাল। তোর শুভবুদ্ধি হয়েছে। এভাবে ঠাকুরের ধ্যান-চিন্তাও হচ্ছে আর পাহারার কাজও হচ্ছে। এই করে সর্বাবস্থায় তাঁর স্মরণ-মনন করতে থাক—তাতেই কল্যাণ হবে।

* * *

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে সন্ন্যাস নেবার পরে আমার মনে উত্তরাখণ্ডে গিয়ে তপস্যার ইচ্ছা খুব বলবতী হয়। কিছুদিন যাবৎ ঐ সঙ্কল্প বারবার উদিত হওয়ায় একদিন মহাপুরুষ মহারাজকে ঐ কথা নিবেদন করতে তাঁর ঘরে গেলাম। তখন আমি মঠে ঠাকুরভাণ্ডারে কাজ করি। ঐদিন তাঁকে একা পেয়ে ভয়ে ভয়ে মনোভাব নিবেদন করলাম। ভয়—কারণ আমি ঠাকুরভাঁড়ারের কাজে আছি আর মহাপুরুষ মহারাজের ঐদিকে সতর্ক দৃষ্টি যাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। তাই বিশেষ করে শ্রীঠাকুরসেবার কাজে যারা আছে তাদের তিনি কোথাও বড় একটা যেতে দেন না। কিন্তু সেদিন যেই আমি তপস্যায় যাবার কথা বললাম, তখন যেন তিনি অন্য মানুষ হয়ে গেলেন! যেন তাঁর পরিব্রাজক-জীবনের তপস্যা ও সাধনার কথা স্মৃতিপথে উদিত হয়ে সমগ্র চিন্তাধারা বদলে গেল! আমার প্রার্থনা শোনামাত্র বললেন—"যা, যা, তপস্যায় লেগে যা। হিমালয় বড় পবিত্র স্থান, তপোভূমি। কোথায় যাবি? যখন তোর তপস্যা করার ইচ্ছা হয়েছে, তখন পেছনের দিকে না তাকিয়ে মঠ, মৌড়ী, আশ্রম প্রভৃতির সব কর্তব্য ফেলে তাঁর চিন্তায় ডুবে যা। কিন্তু সাবধান, একই চিন্তা থাকবে—ভগবান লাভ করবই। অন্য সব চিন্তা ত্যাগ করবি।

উপনিষদে আছে—'যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ।' ঠাকুর তাই একান্ত নির্জনে ভগবানের নাম-ধ্যানে ডুবে যেতে বলতেন আর এ গানটি ভাবময় কণ্ঠে গাইতেন—'ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন। তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেমরত্নধন ॥' আর গাইতে গাইতে তিনি নিজেই ডুবে যেতেন সচ্চিদানন্দসাগরে।" সেদিন মহাপুরুষজী খুব আশীর্বাদ করে আমাকে তপস্যায় যাবার অনুমতি দিয়েছিলেন।

মহাপুরুষ মহারাজের পুণ্যস্মৃতি

স্বামী মৃত্যুঞ্জয়ানন্দ

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে আমি কলকাতা স্টুডেন্টস হোমে ভরতি হই। তার কয়েক মাস বাদেই পূজ্যপাদ শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ বেলুড় মঠে ফিরেছেন। সেদিন হাওড়া স্টেশনে খুব লোকের ভিড়। মঠের তখনকার দিনের বহু প্রাচীন সাধু তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তিনজন গোরা সৈনিক দাঁড়িয়ে দেখছিল—মহাপুরুষ মহারাজ তাদের হাতে তাঁর গলার মালাগুলি খুলে দিলেন। তারা আনন্দে চলে গেল। মহাপুরুষজীকে সেই আমার প্রথম দর্শন।

তখন আমি স্টুডেন্টস হোমে থাকি—৭নং হালদার লেনে, আর কখনও কখনও মঠে যাই, মহাপুরুষজীকেও দর্শন করি। ক্রমে ইচ্ছা হলো মন্ত্রদীক্ষা নেবার। মঠে গিয়ে মহাপুরুষজীকে প্রণাম করে দীক্ষার প্রার্থনা জানাতেই তিনি রাজি হলেন। যেদিন দীক্ষা হবার কথা ছিল সেদিন দীক্ষা হলো না। পরদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথির দিনে দীক্ষা হলো। পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ বললেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুরই যুগাবতার, দশমহাবিদ্যা, সর্বদেবদেবীস্বরূপ। এভাবে অনেক উপদেশ দিয়ে দীক্ষা দিলেন। আমারও অন্তর ভরে গেল—নিজেকে ধন্য মনে করলাম।

দীক্ষার চার-পাঁচ দিন পরেই সেবার আমার পরীক্ষা আরম্ভ হলো। পরীক্ষা ভালভাবেই হয়ে গেল এবং আই. এস-সি. ভাল পাশ করলাম। কিন্তু ক্রমে পড়া থেকে মন উঠে গেল। মনে হতে লাগলো—ভগবানের নাম করি, পড়াশুনা করে আর কি হবে? আর করতেও লাগলাম তাই। একবার ছাত্রাবাসের কর্মসচিব অনাদি মহারাজকে বললাম যে, আমি মঠে যোগদান করতে চাই। তিনি তো আর আমাদের

মতো ছেলেমানুষ ছিলেন না, তিনি আমাকে ধৈর্য ধরতে উপদেশ দিলেন। বি. এস-সি. পরীক্ষার জন্য ভাল প্রস্তুতি ছিল না, তাই কোনমতে পাশ করলাম।

তবে ছাত্রাবাসের পরিবেশ খুব ভাল লাগছিল, তখন প্রধানত তিনজন সাধু স্টুডেন্টস হোমে ছিলেন—অনাদি মহারাজ, অশেষ মহারাজ আর প্রীতি মহারাজ। অনাদি মহারাজ বড় ছিলেন—বেশ সুন্দর, স্বাস্থ্যবান, বিদ্বান, বুদ্ধিমান—এদিকে আবার এম. এ. পাশ। ক্রমে অনাদি মহারাজের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে অনেক কৃতবিদ্য ছেলে এসে সাধু হতে লাগল। অনাদি মহারাজই ছিলেন আশ্রমের প্রাণ-পুরুষ। তাঁর পরিকল্পনামত দমদমে ঝিলের ধারে স্টুডেন্টস হোম হলো। তারপরে যুদ্ধ এলো, তখন ছাত্রাবাস ওখান থেকে উঠে গেল। আবার বেলঘরিয়ায় সেই ঝিল-পুকুর সম্বলিত ছাত্রাবাস গড়ে উঠল এবং আজও সেখানে সেই আশ্রম বিদ্যমান।

আমি যখন সঙ্ঘে যোগদান করি পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ তখন খুব বৃদ্ধ হয়েছেন, অসুস্থ। ক্রমে তাঁর অর্ধাঙ্গ পড়ে গেল, শুধু বাঁ হাতখানি তুলতে পারেন, তাই তুলে সকলকে আশীর্বাদ করছেন। কথাটি পর্যন্ত বলতে পারছেন না, কিন্তু মঠ-মিশন তাঁর ইঙ্গিতে ঠিক চলছে।

একদিন সুযোগ বুঝে একাকী মহাপুরুষজীর ঘরে ঢুকেছি। তাঁকে প্রণাম করে জিজ্ঞেস করলাম, "কি করে ভগবান লাভ হবে?" প্রশ্নটি শুনেই তিনি এত খুশি হলেন যে, ভাবের আবেগে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। তিনি বললেন, "হবে বাবা, তোদের হবে না তো কার হবে?" এসব কথা বলতে বলতে অন্যান্য লোকজন এসে গেল আর সে প্রসঙ্গ চাপা পড়ে গেল। পরদিন প্রাতে আবার মহাপুরুষ মহারাজকে প্রশ্ন করলাম, "কি করে ভক্তিলাভ হবে?" তিনি বললেন, "ঠাকুরকে ডাকবি, তাঁর কাছে কাঁদবি।" ডেকে থাকি, রোজই, কিন্তু কাঁদতে পারি কই!

প্রায় এক বৎসর শয্যাগত থাকার পর মহাপুরুষজীর দেহত্যাগের সময় হলো। সতীনাথ মহারাজ পূজ্যপাদ মহারাজের শেখানো "কালীনামের গণ্ডি দিয়ে আমি আছিরে দাঁড়ায়ে" গানটি গাইতে লাগলেন। চারদিকে নীরব—সে এক শান্ত গম্ভীর পরিবেশ। তিনি যেন দু-তিন বার তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে চাইলেন, কিন্তু ত্যাগ করলেন না, যেন নিজেই ভেতরে সে নিঃশ্বাস রুদ্ধ করলেন। আমি কাছে শিয়রেই দাঁড়িয়েছিলাম। মনে হলো যেন দুতিন বার নিঃশ্বাস ভেতরেই কুম্ভক করলেন। তখন আমার উপনিষদের সেই কথাগুলি মনে পড়ে গেল—"ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ইহৈব প্রবিলীয়ন্তে।"...

মহাপুরুষজীর দেহ নিচে নামানো হলো, কিন্তু তাঁকে দেখাচ্ছিল আনন্দময়

পুরুষরূপে—যেন জীবন্ত। একটু পরে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ এলেন। তিনি অঞ্জলি ভরে ফুল নিয়ে "বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্" বলে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের চরণে কুসুমাঞ্জলি দিতে লাগলেন আর মহাপুরুষ মহারাজকে যে খাটে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তার অনুগমন করতে লাগলেন। মঠের অন্যান্য সন্ন্যাসিগণ মৌন-বিষণ্নভাবে শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীর শেষকৃত্য করবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন।...

আমি আমার ক্ষুদ্র জীবনে এমন একজন মহাপুরুষকে দেখেছি যিনি ভগবানকে দর্শন করেছেন আর যিনি ভগবান ছাড়া কিছুই জানতেন না। হাঁপানিতে কত কষ্ট পাচ্ছেন, কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই, সকলের যাতে কল্যাণ হয় শুধু তাই তিনি চিন্তা করতেন!

মহাপুরুষজীর পুণ্যস্মৃতি

স্বামী বীরেশানন্দ

৺কাশীধামে ও বেলুড় মঠে কয়েকবার পরমপূজনীয় শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের পুণ্যসঙ্গলাভে আমার জীবন ধন্য ও কৃতার্থ হয়েছে। তিনি সময় সময় রহস্য করে, আবার কখনো বা গম্ভীর হয়ে বহু উপদেশই দিয়েছেন। জানি না কেন তিনি আমাকে বরাবর একটু স্নেহের চোখেই দেখতেন। তাঁর ঐ স্নেহলাভ আমার পরম সৌভাগ্য। তাঁর আন্তরিক স্নেহ ও আশীর্বাদ প্রাণে শান্তি প্রদান করে আমাকে সুদীর্ঘ জীবনের দিনগুলি অতিক্রম করতে সাহায্য করেছে ও করছে। তাঁর অভয় বাণীই আমাকে সর্বদা সত্য পথ দেখিয়েছে। দেখা হলেই করুণাময় মহাপুরুষজী বলতেন, "কি নকুল, কেমন আছ? বেশ আনন্দে দিন কাটছে তো" বলতাম, "হ্যা মহারাজ, ভাল আছি, আনন্দেই আছি।" একবার তাঁর সঙ্গে দেখা হতে তিনি ঐ ভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন আছো?" আমি উত্তর দিলাম, "ভাল আছি, মহারাজ। কিন্তু এক এক সময় মনে হয় কি যেন পেলাম না, কিংবা কি যেন হারিয়ে ফেলেছি—এটা ভেবে কষ্ট হয়।" তিনি হেসে বললেন, "কি আর পাবে? যা পাবার কথা মনে ওঠে তা তো পেয়েই আছ। আর যা হয়ে আছ তা আর হারাবে কি? তবে মন যতক্ষণ আছে, ঐ সব সময় সময় মনে আসবেই। ঐ নিয়ে মোটেই ভেবো না, খুব আনন্দ কর, হেসেখেলে দিন কাটাও। সর্বদা শ্রীঠাকুর ও শ্রীমাকে চিন্তা কর। তোমরা শ্রীমহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর) কৃপা পেয়েছ—তোমাদের আবার ভাবনা কি?

শ্রীমহারাজ তোমাদের কত স্নেহ করতেন! তিনি তোমাদের কত আশীর্বাদ করেছেন! তোমাদের আর ভাবনা কি? আনন্দ কর, আনন্দ কর, আনন্দ কর। তাঁরা সর্বদাই তোমাদের সঙ্গে আছেন, এটা মনে রেখো।"

মনে পড়ে একবার মহাপুরুষজী আমাকে বিশেষ আশীর্বাদ করেছিলেন। শেষ যেবার তিনি ৺কাশীধামে এসেছিলেন সেই বারের ঘটনা। কাশী অদ্বৈত আশ্রমে তাঁর জন্মতিথি উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন হয়েছে। আমি তখন সেবাশ্রমে dressing room-এ কাজ করি। ইচ্ছা হলেও সর্বদা তাঁর কাছে যাওয়া সম্ভব হতো না। সেবাশ্রমের dressing room থেকে অদ্বৈত আশ্রামের যে ঘরটিতে মহাপুরুষজী থাকতেন তা স্পষ্ট দেখা যেত। সেদিন ভোরবেলা হতেই দেখতে পেলাম, উভয় আশ্রমের সাধু, ব্রহ্মচারী ও স্ত্রী-পুরুষ ভক্তেরা মহাপুরুষ মহারাজের শ্রীচরণে পূজা দিচ্ছেন। তাঁর কাছে যাবার জন্য আমার মন খুবই ছটফট করতে লাগল। তাড়াতাড়ি সব কাজ শেষ করে স্নান সেরে সেবাশ্রমের বাগান থেকে কয়েকটি ফুল হাতে করে তাঁর ঘরে উপস্থিত হলাম। গিয়ে দেখি সকলের পূজা প্রায় শেষ হয়েছে, ফুল ও মালার মধ্যে তিনি যেন ডুবে বসে আছেন। আমি ফুল হাতে ঘরে ঢুকতেই মহাপুরুষজী আমার দিকে চেয়ে অতি কোমলস্বরে বললেন, "এস বাবা, এস।" আমি তাঁর শ্রীচরণে ফুল দিয়ে প্রণাম করলাম। তিনি তাঁর দুহাত দিয়ে আমার মাথা চেপে ধরে বললেন, "নকুল, বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর, ভয় নেই। মায়া তোমাদের কিছু করতে পারবে না। মা নিজে তোমাদের মাথায় হাত দিয়ে আছেন। বল, সন্দেহ করবে না? বল, সন্দেহ করবে না? মায়ের কৃপায় তোমরা অভয় পেয়েছ। বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর তোমরা আনন্দময়ীর সন্তান। তোমরা কেবল আনন্দ করেই যাবে। আবার বলছি—বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর তোমরা মায়ের কোলের ছেলে।" তাঁর স্পর্শে আমার মনে খুব আনন্দ হতে লাগল। কিন্তু ভাবনা হলো, তাতে তাঁর কিছু কষ্ট হচ্ছে না তো? খানিক পরে তিনি পুনরায় বহু আশীর্বাদ করে হাত তুলে নিতেই আমি হাতজোড় করে তাঁর সামনে বসলাম। তখন তিনি বললেন, "যাও, স্বামীজীর কাজ করছ—তাঁদের প্রতি মন রেখে আনন্দ কর গিয়ে।" সেদিন এত আনন্দ পেয়েছিলাম যা সুখে-দুঃখে সকল সময়ে আমাকে যেন জীবনপথে আলো দেখাচ্ছে।

* * *

এক সময় বোধ হয় ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ ও শ্রীশরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দজী) ৺কাশীতে বাস করছিলেন। তখন সেবাশ্রমের মাঠে বিকালবেলা নানারকমের খেলা হতো। পূজনীয় মহারাজরা মাঝে মাঝে আমাদের

খেলা দেখতে মাঠে আসতেন এবং আমাদের খুব উৎসাহ দিতেন। একদিন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের মধ্যে ফুটবল ম্যাচ খেলা হয়। পূজনীয় মহারাজরা সকলেই মাঠে খেলা দেখতে এলেন। তাঁদের বসবার জন্য চেয়ার পাতা হয়েছিল। অন্যান্য সাধু, ব্রহ্মচারী ও ভক্তগণ মাঠের চারদিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিলেন। খুব উৎসাহে খেলা চলতে লাগল। মহাপুরুষ মহারাজ হাততালি দিয়ে খুব আনন্দ করতে লাগলেন। তিনি পরে বললেন, "ছেলেরা বেশ খেলে, বেশ আনন্দে আছে ওরা।"

খেলায় সেদিন কারও হারজিত হলো না, উপরন্তু ফুটবলটি পায়ের আঘাতে ওপরে ওঠে ফেটে যায়। "যা, বলটি ফেটেই গেল" বলে মহাপুরুষ মহারাজ খুব হাসতে লাগলেন। আমরা জানতাম না যে, তাঁরা অনেক জিলাপি আনিয়ে রেখেছিলেন। খেলা শেষ হতে জিলাপিগুলি বিতরণ করা হলো। ঘর্মাক্ত শরীরে ঐ প্রসাদ পেয়ে আমরা আনন্দ করতে করতে চলে গেলাম।...

যখনই মহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতি জাগে তখনই মনে পড়ে তিনি কি অদ্ভুতভাবে সকলকে হাসিয়ে খেলিয়ে আনন্দ দান করতেন। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে তিনি ছিলেন সর্বদা মুক্তহস্ত। সন্ধ্যায় আরাত্রিকের পরে তিনি সকলকে নিয়ে ভজন-কীর্তন করতেন, উপদেশাদি দিতেন এবং কখনো কখনো শ্রীঠাকুর বা স্বামীজীর নানাপ্রসঙ্গ করতেন। কথা বলতে বলতে হঠাৎ আদেশ করতেন, "নিয়ে এসো তো বাঁয়া-তবলাটা, কীর্তন করা যাক কিছু সময়।" সকলে মহানন্দে কীর্তন আরম্ভ করত। তিনি অল্প সময় বাঁয়া-তবলাতে সঙ্গত করে বলতেন, "নাও, এবার তোমরা বাজাও, গাও। আমার হাত আর চলে না।" একবার এরূপ কিছুক্ষণ কীর্তন চলবার পর তিনি হঠাৎ বাঁয়া-তবলাটা ঠেলে দিয়ে বললেন, "দূর, আর পারা যায় না। বুড়ো হাবড়া হয়ে গেছি, হাত যেন অবশ হয়ে আসছে। তোমরা গাও, বাজাও।" এই বলে তিনি হাসতেন। তাঁর উপস্থিতিতেই আমাদের মনপ্রাণ আনন্দে ভরে যেত।

আর একবারের ঘটনা—বেলুড় মঠে। সে সময় আমি কিষেণপুরে (দেরাদুনে) থাকি। কি কারণে মনে নেই, কয়েক দিনের জন্য মঠে গিয়েছিলাম। রোজ সকালে সব মন্দিরে প্রণাম করে আমি মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করতে যেতাম। এভাবে একদিন গিয়ে তাঁকে প্রণাম করতে তিনি বললেন, "কেমন আছ, নকুল?" আমি বললাম, "ভাল আছি, মহারাজ!" সে সময় মঠে পাচকের অভাবে রুটি কম করা হতো। তিনি বললেন, "তোমায় রাত্রে রুটি দেয় তো?" আমি বললাম—"না, মহারাজ, রুটি যাদের বিশেষ প্রয়োজন কেবল তাদেরই দেওয়া হয়। আমার বিশেষ প্রয়োজন হয় না।" "সে কি? তোমাদের রুটি খেয়ে অভ্যাস, তা না হলে অসুখ করবে যে।" তিনি নিকটে একজনকে ডেকে বললেন, "ওহে, বিকাশকে একবার

ডেকে দাও তো।" একটু পরেই বিকাশ মহারাজ এসে হাতজোড় করে দাঁড়ালেন। মহারাজ বললেন, "দেখ বিকাশ, এরা উত্তরাখণ্ডে থাকে। এদের রাত্রে রুটি খাওয়ার অভ্যাস। রাত্রে একে রুটি দিও। তা না হলে শরীর খারাপ করবে যে।" "আচ্ছা, মহারাজ" বলে বিকাশ মহারাজ চলে গেলেন। মহারাজ আবার আমাকে বললেন, "রাত্রে রুটি চেয়ে নিও।"

আর একবার কিছুদিনের জন্য বেলুড় মঠে গিয়েছিলাম। সকালে সব মন্দিরে প্রণাম সেরে শ্রীমহাপুরুষজীকে প্রণাম করতে গিয়েছি। দেখলাম দুজন স্ত্রী-পুরুষ ভক্ত মহাপুরুষজীর সঙ্গে নিম্নস্বরে কথা বলছেন। আমি সরে গিয়ে দরজার পাশে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে ভক্তেরা চলে গেলে আমি ঘরের ভিতর গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম। "এস, নকুল," একটু হেসে মহাপুরুষজী বললেন, "দেখ, আজ আমি খুব দাতা হয়েছি। অনেককে অনেক কিছু দিচ্ছি। আরও অনেক জিনিস আছে। তোমার কি চাই বল।" সঙ্গে সঙ্গে আমি উত্তর দিলাম, "মহারাজ, আমার যা প্রাপ্য তাই আমাকে দিন।" ঐ কথা শুনে তিনি একটু মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। আমার আশঙ্কা হলো কি জানি কিছু বেফাঁস বলেছি কিনা, মনে একটু ভয়ও হলো। তিনি একটু পরেই উচ্চৈঃস্বরে হো হো করে হেসে উঠে বলেলেন, "ও, ঐ কথা!—যা পাবার তা তো পেয়েছ, তাই হয়ে আছে, বেশ আছ আনন্দে আছ। মায়ের কৃপায় জীবনে সুখী হও—এই আশীর্বাদ করছি। আমি সে বিষয়ে বলছি না। আজ আমি অনেককে জামা কাপড় এসব দিয়েছি। তোমার কি চাই বল।" "আপনি যা ভাল মনে করেন তাই দিন, মহারাজ; আমি মাথায় করে নেবে।" "শঙ্কর, শঙ্কর" বলে তিনি ডাক দিলেন। সেবক শঙ্কর মহারাজ পাশের ঘরেই কিছু কাজ করছিলেন। তিনি এলে মহারাজ বললেন, "নকুলকে একখানা ভাল দেখে কাপড় দাও তো।" শঙ্কর মহারাজ একখানা ধুতি এনে মহারাজের হাতে দিতে তিনি তা আমার হাতে দিয়ে বললেন, "এই নাও, নকুল।" এই বলে তিনি মৃদু হাসলেন। আমি তা গ্রহণ করে মাথায় স্পর্শ করলাম এবং তাঁকে প্রণাম করে চলে এলাম।

বারংবার মনে পড়ে শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের আশীর্বাদ—"তোমরা রাজা মহারাজের কৃপা পেয়েছ। তিনি তোমাদের কত আশীর্বাদ করেছেন! শরৎ মহারাজ, হরি মহারাজ তোমাদের কত ভালবাসতেন, স্নেহ করতেন! শ্রীমাকে দর্শন করে তোমরা কৃতার্থ হয়েছ। মহামায়ীর কৃপায় তোমরা ধন্য।"

যেদিন বেলুড় মঠ থেকে দেরাদুন যাব স্থির হলো, সেদিন সকালে মহাপুরুষজীকে প্রণাম করে বললাম, "আজ আমি ৺কাশী যাব এবং দুচার দিন কাশীবাস করে

পরে দেরাদুন যাব।" তিনি হেসে বললেন, "মঠ ঠাকুরের স্থান। ৺কাশী বাবা বিশ্বনাথ ও মা অন্নপূর্ণার রাজত্ব, দেরাদুন উত্তরাখণ্ড—দেবভূমি, তা বেশ ভাল স্থানে আছ। শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর কাজ নিয়ে আনন্দে দিন কাটাও, তাঁদের ভাবে পূর্ণ হও, এই আশীর্বাদ করছি। এসো।" তাঁর অফুরন্ত আশীর্বাদ এবং স্নেহপূর্ণ হাসি মনে পড়লে জীবনটা যেন মধুময় হয়ে যায়।

মহাপুরুষজীর অস্ফুট স্মৃতিকথা

স্বামী তারকানন্দ

আমি পূর্বে বাঁকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ছিলাম। পরে পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের কৃপালাভ ও কাশীবাস—এ দু উদ্দেশ্য নিয়ে কাশী সেবাশ্রমে আসি এবং তখন থেকেই সেবাশ্রমে ঠাকুরের বাগিচায় কাজ করি। আমার একই ভাব ঃ "মৈনে চাকর রাখো জি। চাকর রহসুঁ বাগ লাগাসুঁ নিতি উঠি দরসন পাসুঁ।"—যদি এ সেবা দ্বারা তাঁর কৃপাকণা পাই।

কাশী আসবার কিছু পরেই কেউ কেউ বেলুড় মঠে মহাপুরুষজীর কাছে মন্ত্রদীক্ষা নিতে যাচ্ছে দেখে আমারও দীক্ষা নিতে মঠে যাবার ইচ্ছা হলো, কিন্তু তৎকালীন আশ্রমাধ্যক্ষ বললেন, "তুমি এই কেবল এসেছ, পরে যেও।" নিবৃত্ত হলাম, কিন্তু মনে গভীর দুঃখ থেকে গেল। মহাপুরুষের কৃপালাভ হলো না। সন্ধ্যায় ধ্যান করবার সময় খুব কাঁদতে লাগলাম। ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ শুনে কেউ কেউ এসে আমার চোখ-মুখ-বুক অশ্রুজলে ভরে গেছে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করায় কিছু বলতে পারলাম না। এর অল্পদিন পরে শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ কাশীধামে এলেন। আশ্চর্য! তাঁকে দর্শনমাত্রই আমার মনে অপূর্ব শান্তি এল, যেন সকল দুঃখের অবসান হলো।

মনে হলো এবার দীক্ষার কথা একদিন মুখ ফুটে মহাপুরুষজীকে বলি। কিন্তু কর্তৃপক্ষরা নিষেধ করলেন, বললেন, "এখন তিনি দীক্ষা দেওয়া বন্ধ করেছেন, আবার কাশীতে দীক্ষা দেবেন কিনা তারও ঠিক নেই। এখন তিনি 'না' বলবেন। একবার 'না' বললে ভবিষ্যতে আর 'হ্যাঁ' বলার আশা কম ইত্যাদি।" মনে দারুণ দুঃখ নিয়ে আমি চুপ করে রইলাম।

একদিন মহাপুরুষজীর কাছ দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ চোখাচোখি হলো; অমনি যেন দৈবপ্রেরণায় তিনি বললেন, "কাল বেলপাতা ও গঙ্গাজল নিয়ে আমার কাছে

অদ্বৈতাশ্রমে আসিস।" এভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের অশেষ করুণায় আমার বিনা প্রার্থনায়ই দীক্ষা হয়ে গেল। মহাপুরুষজী অন্তর্যামী; তিনি আমার প্রাণের প্রার্থনায় সাড়া দিয়েছেন—এ প্রমাণ পেয়ে জীবন ধন্য হলো, মন শান্ত হলো।

দীক্ষার সময় শ্রীগুরুদেব বললেন, "তুই আর কি দীক্ষা নিবি? তুই তো আশুতোষ।" এই কথা বলে আমার বুকে তিনবার মৃদু আঘাত দিয়ে বললেন, "এই দেখ 'আশুতোষ'।" আর বললেন, "এখন থেকে দেহ মন প্রাণ সব ঠাকুরকে সমর্পণ কর।" পরে মহামন্ত্র দিলেন।

দীক্ষার পর মহারাজ, অন্য সাধুদের বললেন আমার নাম (আশুতোষ) করে, "এর লেগে গেছে।" আরও বললেন, "কাশীতে আসবার কথা ছিল না, দীক্ষাও এখন বন্ধ করেছি, কিন্তু এই ছেলেটির দীক্ষার জন্য প্রাণ কেঁদেছিল, তাই ঠাকুরই আমায় যেন কাশীতে টেনে আনলেন।"

*   *   *

এর কয়েক বৎসর পরে শুনলাম, মহাপুরুষ মহারাজ দুই হাতে কৃপা বিতরণ করছেন—দীক্ষা, ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস। আমি সন্ন্যাস প্রার্থনা করে পত্র দিলাম এবং তাঁর অনুমতি-পত্র আসতে বেলুড় মঠে রওনা হলাম। কাশী সেবাশ্রম থেকে শচীনও আমাদের সঙ্গে মঠে চলল। সে পত্র লিখে অনুমতি নিয়ে যায়নি, অথচ সন্ন্যাস-প্রার্থী। বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষ শচীনের সন্ন্যাসব্যাপারে আপত্তি জানালেন। মফস্বলের মোহন্তগণ পূর্বে মঠের কর্তৃপক্ষদের না জানিয়েই সন্ন্যাস-প্রার্থীদের পাঠাতেন—এ প্রথা সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের আপত্তি ছিল। তাই স্থির হলো—শচীনের সন্ন্যাস হবে না। আমার হবে আর সঙ্গী শচীনের হবে না—তাতে আমার মনে খুব কষ্ট হলো। আমি গিয়ে সোজা পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজকে বললাম, "মহারাজ, শচীন ও আমি এক সঙ্গে এসেছি। আমি আনন্দে সন্ন্যাস নিয়ে ফিরব আর শচীন কাঁদতে কাঁদতে যাবে?" শুনেই তিনি বললেন, "ওরও সন্ন্যাস হবে।" তখনকার দিনে মহাপুরুষ মহারাজের আদেশের উপর আর কারো হাত ছিল না।

শচীন হতাশ হয়ে বসে আছে। তাকে গিয়ে ঐ সংবাদ দিলাম। সে বিশ্বাস করতে চায় না। আমি তাকে একরকম জোর করে মহারাজের কাছে নিয়ে গেলাম। মহাপুরুষজী শচীনকে বললেন, "যা, মাথা কামাগে যা।" অতঃপর দুজনেরই সন্ন্যাস হলো। আমার নাম দিলেন "তারকানন্দ।" আমি যেন তাঁরই চিরদিনের।

শিবানন্দ-স্মৃতি-অনুধ্যানে

স্বামী সত্যকামানন্দ

পূজ্যপাদ মহাপুরুষজীর শ্রীমুখের কথা প্রত্যক্ষভাবে শোনার সুযোগ ও সৌভাগ্য আমার জীবনে বেশি ঘটেনি। তবে তাঁর পুণ্যচরিতের মৌনপ্রভাব ছেলেবেলাতেই— যখন বয়স দশ বৎসর আন্দাজ, তখনই আমার উপর প্রথম পড়ে। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের প্রথমদিকে মহাপুরুষজী এবং স্বামী অভেদানন্দজী যখন পূর্ববাংলা ভ্রমণ করতে যান, তখন তাঁদের উভয়কেই একসঙ্গে ময়মনসিংহ শহরে দুর্গাবাড়িতে আয়োজিত এক জনসভায় দেখবার সুযোগ হয়। স্বামী অভেদানন্দজীর ইংরেজি ভাষণের কিছু কিছু এখনও আমার বেশ মনে পড়ে। শ্রীমহাপুরুষজী ঐ সভায় কিছু বলেছিলেন কিনা মনে করতে পারছি না, কিন্তু তাঁর প্রশান্ত সৌম্যমূর্তির প্রভা আমাদের কম আনন্দ দেয়নি। আমার জীবনে তো তাঁর আধ্যাত্মিক প্রভাব অজান্তে তখনই আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। ঐ ঘটনার আট বছর পরেই মহাপুরুষজীকে দীক্ষা-গুরুরূপে পেয়ে ধন্য হলাম।

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের এক শুভ প্রাতঃকালে, যতদূর মনে পড়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসবের কদিন পরেই দীক্ষার্থী হয়ে বেলুড় মঠে পূজ্যপাদ মহাপুরুষজীর শ্রীচরণপ্রান্তে উপস্থিত হই। পূর্বে এ সম্বন্ধে মঠে কোন সংবাদ না দিয়েই এসেছিলাম। দীক্ষা অতি সহজেই হয়ে গেল। মহাপুরুষ মহারাজ দীক্ষার সময় প্রাণস্পর্শী ভাষায় যে কয়টি কথা বলেন, তার ভাবগাম্ভীর্য ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। অমূল্য ঐ কথাগুলির ভাবার্থ এটুকু আমার মনে পড়ে—'শ্রীভগবানের প্রেম সারা প্রকৃতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে—আকাশে বাতাসে নদীর প্রবাহে, তাঁরই পরমবার্তা পেয়ে আমরা ধন্য হই।' সেই পরম শুভক্ষণের আনন্দময় স্মৃতিতে আমার অন্তর ভরে রয়েছে। ছেলেবেলা থেকেই আমার নিরাকারের দিকে ঝোঁক ছিল। মহাপুরুষজী দীক্ষার পর সেভাবেই আমায় উপদেশ দিয়েছিলেন।...

বেলুড় মঠে শ্রীমহাপুরুষজীর পুণ্যসান্নিধ্যলাভ করেছি ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ অবধি। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশন (কলকাতা) বিদ্যার্থিভবনে আমি ১ম বর্ষ শ্রেণীর ছাত্র হিসাবে আশ্রয় পাই। বিদ্যার্থিভবন থেকে ছাত্ররা প্রায়ই

দলবেঁধে বা দু-এক জন করে বেলুড় মঠে আসত। আমিও তেমনি আসতাম। মঠের মন্দিরাদি যেমন দর্শন ও প্রণাম করতাম, মঠের জীবন্ত দেবতা শ্রীমহাপুরুষজীকেও তেমনি দর্শন-প্রণাম করে যেতাম। তাঁর শান্ত, মৌনমূর্তি দেখেই প্রাণ ভরে যেত। উৎসবদিনে আমরা সাধারণত দল বেঁধেই বিদ্যার্থিভবন থেকে আসতাম, আর নানা কাজে লেগে যেতাম। আমার কিন্তু মহাপুরুষজীর ঘরটির প্রতি এক বিশেষ আকর্ষণ ছিল। মহাপুরুষজীর শুভাশিস ভরা দৃষ্টিলাভ ছাড়াও তাঁর সেবকদের স্নেহপূর্ণ হাতের প্রসাদলাভ ছিল অন্যতম কারণ।

এক উৎসবের দিনে মহাপুরুষজীর ঘরের প্রবেশপথের প্রহরী হবার সৌভাগ্য আমার হলো। কাজটি হয়তো আমিই খুঁজে-পেতে নিয়েছিলাম। অমনি আর এক উৎসব-দিনে মহাপুরুষজীকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে উঠেছি, অমনি তাঁর স্নেহভরা কণ্ঠে এই বাণী বেরিয়ে এল—"যাও বীর, যাও—খুব কাজ কর গিয়ে।" বলা বাহুল্য তাঁর শ্রীমুখের এই কথা কটি থেকে আত্মবিশ্বাস ও বিশেষ উদ্দীপনা পেয়েছিলাম।

মহাপুরুষজীর ঘরটি আমাদের কাছে পুণ্যস্মৃতিময় হয়ে রয়েছে। ঐ ঘরটি দেখলেই পুরনো কথা সব মনে পড়ে। আর একটি ঘটনা যতদূর মনে হয় ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে বেলুড় মঠে কদিন রয়েছি, একদিন মহাপুরুষজী তাঁর খাটে বসে আছেন। আমি হঠাৎ এসে তাঁকে প্রণাম করে মেজেতে বসে পড়লাম। আমার মনের মধ্যে 'আসন' সম্বন্ধে একটা দ্বন্দ্ব চলছিল। উদ্দেশ্য—আসন করাটা ঠিক হচ্ছে কিনা তাঁকে দেখিয়ে নেওয়া। পদ্মাসনে বসে চোখের দৃষ্টি নাকের উপরে রেখে আড়ষ্ট হয়ে রইলাম। মহাপুরুষজী সব দেখে বললেন, "এতটা stiff (শক্ত) হয়ে নয়, আরও সহজ ও কোমল ভাবে বসতে হয়। পেছনে না হেলে, সামনের দিকে সামান্য একটু ঝুঁকতে হয়। চোখ অর্ধনিমীলিত অবস্থায় নিচের দিকে (পায়ের সামনে) দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখাই ভাল।"...

বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দের প্রত্যেক গুরুভ্রাতাই এক একজন দিকপাল—'স্বে মহিম্নি প্রতিষ্ঠিতঃ'। গুরুভ্রাতাদের এক একজনের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিরাট ও গভীর ভাবের এক একটি দিক ফুটে উঠেছিল। তাঁদের প্রত্যেকেই আমাদের কাছে গুরুস্থানীয়—সমভাবে পূজনীয়। স্থূলদেহে তাঁদের যে কয়জনকে দেখার সৌভাগ্য ঘটেছে, প্রত্যেকের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ হয়েছি। পূজ্যপাদ মহাপুরুষজীর পুণ্যস্পর্শ গভীরভাবে পেয়েছি এবং তাঁকে দর্শন করার সুযোগও পেয়েছি অনেক। মহাপুরুষজীর 'শিবানন্দ' নাম খুবই সার্থক। আপনভোলা আশুতোষ শিবেরই এক মূর্ত-বিগ্রহ ছিলেন তিনি। সুস্থ বা অসুস্থ, যে অবস্থায়ই তাঁকে দেখতাম, মনে হতো—

এক বিদেহ ভাবে, আনন্দে তিনি বিরাজ করছেন। আজ মনশ্চক্ষে যখন তাঁর প্রশান্ত প্রতিচ্ছবি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তখন এই অভয়বাণীর ঝঙ্কারই শুনি—

"শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্।"
"চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥"

মহাপুরুষজীর স্মৃতিকথা

স্বামী রঘুবীরানন্দ

ঢাকা, ১৯১৫ সাল। পূজ্যপাদ রাখাল মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ), পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দ) প্রমুখ আরও কয়েকজন প্রবীণ সন্ন্যাসী বেলুড় হতে ঢাকায় এসেছেন এবং 'Agnes Villa' (অ্যাগনেস্ ভিলা) নামক বাড়িতে অবস্থান করছেন। ঢাকা মঠের নূতন ভিত্তিপ্রস্তর-স্থাপন উপলক্ষে স্থানীয় ভক্তদের আগ্রহাতিশয্যে তাঁদের শুভাগমন। প্রত্যহ ঐ বাড়িতে দুবেলা বহু ভক্ত ও লোকের সমাগম হতো এবং মহারাজদের পূত সঙ্গলাভ ও উপদেশাদি শ্রবণ করে সবাই কৃতার্থ হতেন। আমরাও অন্যান্য ছাত্রবন্ধু সহ যেতাম। তেজোদীপ্ত, শান্ত, সমাহিত, সৌম্যদর্শন মহারাজদের দেখে মুগ্ধ হই—যদিও তত্ত্ব-কথা আমরা সবিশেষ ধারণা করতে পারতাম না। কথাচ্ছলে পূজনীয় রাখাল মহারাজের কাছে দীক্ষার প্রার্থনা জানাই। জবাবে তিনি বলেছিলেন, "যথাসময়ে যথাস্থানে ঠিক লোকের কাছে কৃপা পাবে; ভেবো না, তাঁকে ধরে থাক। পড়াশোনা ভালভাবে কর, সময় করে ঠাকুরকে নিয়মিতভাবে ডাকবে।" বহু দিন প্রতীক্ষা চলল, যথাসময়ে পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত হলাম।

তারপর সুদূর ব্রহ্মদেশে যেতে হলো কার্যোপলক্ষে। কবছর পর ১৯২৯ সালে রেঙ্গুন সেবাশ্রমে। আমাদের সামনে সেবাকার্যের এক বিশেষ সুযোগ এসে উপস্থিত। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী শ্যামানন্দজী ঐ সময়ে আরাকানে Flood Relief (বন্যায় সেবাকার্য)-এর কাজে স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দ (অধিনায়ক), দু-একজন ব্রহ্মচারী, কয়েকজন কর্মী, একজন ডাক্তার, একজন কম্পাউণ্ডার প্রভৃতি আমাদের কজনকে পাঠালেন। দুর্গম জায়গা, খুনে ডাকাতের দেশ। প্রভুর নাম নিয়ে সেবার কাজ চলল, কিন্তু ভীষণ কালাজ্বরে প্রায় সবাইকে শয্যাগত হতে হয়েছিল অনেক দিন। ভয়, নৈরাশ্য, এক-ঘেঁয়েমি যুগপৎ উপস্থিত। পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজজীকে মনের

অবস্থা জানিয়ে পত্র লিখলাম। জবাবে তিনি লিখলেন মহাপুরুষোচিত, তেজোদীপ্ত ভাষায়—"ঘাবড়াচ্ছ কেন? সব ঠিক হয়ে যাবে। কার কাজ কচ্ছ? শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ। তিনি হাত ধরে রয়েছেন—দেখছেন সব সময়। অনেক কাজ করতে হবে—আমাদের শুভেচ্ছাও সতত রয়েছে জেনো। তাঁর উপর নির্ভর এনে নিজেকে তাঁর দাস-ক্রীড়নক জেনে কাজ করে যাও। চিকিৎসাদির ব্যবস্থাও করো, শরীরের দিকে নজর দিও যথাসম্ভব।..." পত্রখানা হাতে আসার পর প্রাণে বল ও আশার সঞ্চার হলো। শ্রীগুরুর কৃপা ও শুভ আশীর্বাদ মনে প্রাণে অনুভব করলাম। আকিয়াব শহরে কদিন বায়ুপরিবর্তন করে আসার পর শরীর পূর্ব্ববৎ সুস্থ ও সবল হলো।

বেলুড় মঠে ফিরে এসে দেখলাম শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীর শরীর রোগের প্রকোপে একেবারে ভেঙে পড়ছে। সেই তেজোময় উন্নত দেহ আর নাই—দুষ্ট ব্যাধি হাঁপানি, আনুষঙ্গিক অনিদ্রা ও ক্ষুধামান্দ্যের জন্য শরীর ক্রমশ জীর্ণ হতে চলেছে। দিবারাত্র সেবা চলছে। ঐ অবস্থায়ও ভক্তেরা আসছেন, সাধু-ব্রহ্মচারীরা প্রণামাদি করছেন। মহাপুরুষজী সকলের কুশলাদি জিজ্ঞেস করার পর সানন্দে সস্নেহে যাকে যেমনটি বলবার বলে দিচ্ছে। আশ্চর্যের বিষয়, ঐ বলার মধ্যে আমাদের মনের জিজ্ঞাস্য বিষয়গুলির জবাব পেতাম। অসুখে ভুগছেন, কিন্তু প্রফুল্লমুখ; শরীরের যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ আদৌ নেই।

প্রশ্ন হলো—আপনাদের এই সাধনপূত দেহ যদি এই রকম ব্যাধিতে নষ্ট হয়ে যায় তো সাধারণের তা হলে কি হবে? পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ হাত নেড়ে বললেন, "দেহ তো নষ্ট হবেই একদিন। অমন সোনার মানুষ শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহও তো গেল। যাবে সকলেরই, দেহের ভাবনা ছেড়ে দেহীকে ধরে থাকো, দেহ থাকতে দেহীর যে ক্রিয়াকলাপ বা লীলা সেটাই মানুষের অবলম্বন।" অপর একদিন কৃপার কথা তুলতে মহাপুরুষজী বললেন, "কৃপা তো আছে, থাকবে। গুরুর ধ্যান করে অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করবে।... শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তর্ধানের পর আমরা ঐ রকম করে spirit টা (ভাবটা) ধরে বেঁচে রয়েছি।"

১৯৩২ খ্রিঃ শীতকাল, সকাল ৯টা। পূজ্যপাদ মহাপুরুষজী পূর্বদিন রাত্রিতে একটু ভাল ছিলেন। কিছু ভক্তের সমাগম হয়েছে। কাজকর্ম, সেবা সম্বন্ধে কথাবার্তা চলছে। তিনি বললেন—"দেখ, কাজকর্ম করতে হবে, তবে ঐ সঙ্গে নিয়মিত ধ্যানজপ থাকলে কোন গোল হয় না। 'নারায়ণ-জ্ঞান' না হলে ঠিক ঠিক সেবা হয় না। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে কাজ করতে হয়। দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে করলে, দেহমন শুদ্ধ থাকলে ঐ নারায়ণ-জ্ঞান আসে এবং ঠিক ঠিক নারায়ণ সেবা হয়। ...চাই পবিত্রতা।"

"মন কি করে গুরুর কাজ করে, মহারাজ?"—এ প্রশ্নে মহাপুরুষজী বললেন, "সে কথা মন জানতে পারে। সংশয়-রহিত অবস্থা হয় মনের। তবে চাই সাধন, সাধনের পর ভগবানের কৃপা হয়, কৃপা না হলে কিছু হয় না। তিনি কৃপা করলে সব হয়। তাই ঠাকুর বলতেন, 'মা, কৃপা কর, আমি সাধন-ভজন কিছু জানি না, তুমি কৃপা কর।' "

হাঁপানিতে মাঝে মাঝে মহাপুরুষজী খুব কষ্ট পাচ্ছেন, কিন্তু দেহের প্রতি ভ্রূক্ষেপ নেই, রাত্রিতে নিদ্রা নেই, তথাপি ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ বাদ যায় না।

অসুখের পূর্বে দেখেছি শ্রীগুরুদেব মহাপুরুষজীর তপ্তকাঞ্চনের মতো গায়ের রং—দৃঢ়তা, শুচিতা ও করুণার বিগ্রহ। বয়সের ভারেও দেহ নুয়ে পড়েনি। নিজের ভাবে যখন বিভোর থাকতেন, কেউ তাঁর সঙ্গে কথা বলতে সাহস করত না, আবার অবসর সময়ে সেবক বা অন্যান্যদের সঙ্গে অল্প ফষ্টিনষ্টিও করতেন।

শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের পদপ্রান্তে

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাস। আমি ৯ম শ্রেণীতে পড়ি, দশম শ্রেণীতে উঠব। স্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষা দিয়ে বাড়িতে আছি। এমন সময় আমার এক কাকা কর্মস্থল থেকে ছুটি নিয়ে বাড়িতে এলেন। তাঁর যখন ফিরে যাবার সময় হলো তখনও আমার স্কুল বন্ধ। তিনি হঠাৎ একদিন আমাকে ডেকে বললেন—"কি রে, যাবি আমার সঙ্গে বেড়াতে? তোর তো স্কুল এখনও বন্ধ, চল না বেড়িয়ে আসবি।" এ প্রস্তাবে আমি একেবারে লাফিয়ে উঠলাম। চিরকাল আমার বেড়াবার শখ, তাই চললাম তাঁর সঙ্গে বেড়াতে তাঁর কর্মস্থলে। তিনি তখন কাজ করতেন রংপুর জেলার ছোট্ট একটি শহরে। লালমণিরহাটের কাছেই এই শহর।

কাকার কাছে আছি এমন সময় লালমণিরহাট স্কুল খুলে গেল। আমার ছোট ভাই অর্থাৎ কাকার বড় ছেলে হরিপদ (প্রেমরূপানন্দ) এই স্কুলে পড়তো। তার আহ্বানে চললাম তার স্কুল দেখতে একদিন। সেখানে প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র সান্ন্যালের সঙ্গে ঘটনাক্রমে আলাপ হয়ে গেল। তিনি দু-একটা প্রশ্ন করার পরেই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—"তুমি পড়বে আমাদের স্কুলে?" আমিও না ভেবেচিন্তে

বলে বসলাম, "তা পড়তে পারি, বাড়িতে জিজ্ঞাসা করে দেখব।" বাড়ি থেকেও সহজেই অনুমতি পেয়ে গেলাম। কাজেই লালমণিরহাট স্কুলে ভর্তি হয়ে গেলাম।

কেন জানি না প্রথম থেকেই প্রধান শিক্ষক আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। আমারও তাঁকে খুব ভালো লাগতো। নিত্য তিনি তাঁর বাসায় আমাকে ডেকে নিয়ে যেতেন। একবার বা একাধিকবার আমি যেতাম। কখনো কখনো স্কুলের ছুটির পর গিয়ে রাত ৯টা পর্যন্ত কাটিয়ে আসতাম। কেন যেতাম? কিসের আকর্ষণে যেতাম? প্রধান শিক্ষক ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্য। শুধু তিনি নন; তিনি, তাঁর মা, তাঁর স্ত্রীও। তাঁর দুই মামা বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী; তাঁর দুই জ্ঞাতিভাইও মঠের সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি আমাকে ঠাকুর-স্বামীজীর কথা শোনাতেন। শুনতে শুনতে আমি কোন এক জগতে চলে যেতাম, সময়ের খেয়াল থাকতো না! ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনে যাচ্ছি—তাঁর ক্লান্তি নেই, আমারও নেই। কখনো কখনো বই পড়তে দিতেন, তাও পড়তাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তাঁর মা শুনতে চাইতেন 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি'। সুর করে পড়ে শোনাতাম তাঁকে। প্রধান শিক্ষক ধ্যান-জপ করতে বলতেন। বাড়িতে ফিরে গিয়ে যতক্ষণ পারি ধ্যান-জপ করতাম। একটা আবেশে সময় কেটে যেতো, পড়াশুনা বিশেষ করতাম না। অন্য শিক্ষকেরা বলতেন, "বৃত্তি পেতে হবে, পরে জজ ম্যাজিস্ট্রেট হতে হবে।" প্রধান শিক্ষক বলতেন, "ওসব কথায় তুমি কান দিও না, তুমি ভাল সাধু হও—এই আমি চাই।" একদিন তাঁর এই কথা শুনে তাঁর স্ত্রী বিরক্ত হয়ে বললেন, "এ তোমার কি কথা? পরের ছেলেকে সাধু হতে বলছ; পার তুমি তোমার নিজের ছেলেকে সাধু হতে বলতে?" প্রধান শিক্ষক উত্তর দিলেন—"আমার ছেলে যদি সাধু হয়, তাহলে সেটা তার এবং আমাদের বংশের সৌভাগ্য বলে আমি মনে করব।" প্রধান শিক্ষক শ্রীশ্রীঠাকুরের যে সব সন্তানদের দেখেছেন, তাঁদের কথা বলতেন। শ্রীরাজা মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ), বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দ), শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ (স্বামী শিবানন্দ)—এঁদের সঙ্গ তিনি করেছিলেন। আমাকে বলতেন—"মহাপুরুষ মহারাজ মঠে বিরাজ করছেন। এই বেলা গিয়ে তাঁকে ধরো, তাঁর কৃপা ভিক্ষা কর, তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা নিতে চেষ্টা কর।" আমি মনে মনে তখন থেকেই শ্রীমহাপুরুষ মহারাজকে গুরুপদে বরণ করে নিলাম। ভাবলাম যেভাবে হোক মঠে গিয়ে তাঁর শ্রীচরণে শরণ নেব।

দেখতে দেখতে এক বছর কেটে গেল। প্রবেশিকা পরীক্ষা হয়ে গেল। প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি কলকাতায় এলাম। ইচ্ছা বেলুড় মঠে যাব, তারপর দেশে ফিরব। বিদায় নেবার সময় প্রধান শিক্ষক তাঁর মামা পূজনীয় সত্যেন মহারাজের (স্বামী আত্মবোধানন্দের) নামে এক পত্র

আমার হাতে দিলেন। তিনি জানতেন না যে, সত্যেন মহারাজ তখন মায়াবতীতে। তাতে কিন্তু আমার কোন অসুবিধা হয়নি। ট্রেনে আসতে এক সাপ্তাহিক পত্রিকা কিনলাম। যতদূর মনে পড়ে—'স্বাধীনতা'; সেইটাই তার প্রথম সংখ্যা। পাতা উল্টাতেই দেখি শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের ছবি। তিনি আশীর্বাদ করছেন পত্রিকাটিকে। বারবার তাঁকে প্রণাম করলাম। কলকাতায় খিদিরপুরে দাদার কাছে উঠলাম। সেখানে দু-এক দিন থাকার পর সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম মঠের উদ্দেশ্যে। কোন্ দিকে কোন ধারণাই ছিল না। সমস্ত পথ জিজ্ঞেস করতে করতে চললাম। কলকাতায় সাইকেল চড়বার কি নিয়ম-কানুন কিছুই জানতাম না। যেভাবেই হোক মঠে পৌছুতে হবে—এই ছিল সংকল্প। খুব সম্ভব সকাল দশটায় বেরিয়ে পড়েছিলাম। মঠে যখন পৌছলাম তখন বিকেল চারটে। ঠাকুরঘর খোলা হয়েছে। বেলুড় বাজারের মধ্যে দিয়েই বোধ হয় মঠে ঢুকেছিলাম। শ্রীমহারাজের মন্দিরের (ব্রহ্মানন্দ মন্দির) সামনে আসতে একজন মহারাজকে পেলাম। শ্রীমহারাজের মন্দিরে প্রণাম করে ঐ মহারাজের নির্দেশমত ঠাকুঘরের দিকে চললাম। তখনও মন্দির হয়নি, পুরাতন ঠাকুরঘরে ঠাকুর রয়েছেন। দোতলায় উঠবার সিঁড়ির কাছে পা দিতেই শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের ঘরের পশ্চিম দিককার জানালা খুলে গেল। কি দেখলাম ভাষায় তা বর্ণনা করতে পারব না! কি দিব্যকান্তি মূর্তি! মানুষের এমন রূপ হয় জানতাম না! আমাকে দেখে মহাপুরুষজী ভয়ানক খুশি। বললেন—"তুই কোথা থেকে এলি? আয়, আয়, আমার কাছে।" কয়েকবার বললেন একথা। আমি আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। কি বলব, কি করব বুঝতে পারছিলাম না। তখন শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ বললেন— "যা, ঠাকুরকে প্রণাম করে আয়।" স্বপ্নাবিষ্টের মতো আমি ঠাকুরঘরে গিয়ে প্রণাম করে নিচে নেমে এলাম। ততক্ষণে দু-জন সন্ন্যাসী আমাকে শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের ঘরে নিয়ে যাবার জন্য এসে গেছেন। তাঁদের সঙ্গে উপরে গেলাম পূজ্যপাদ শ্রীমহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করতে। তিনি আমার পরিচয় নিলেন। আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছি এবং সাইকেলে করে খিদিরপুর থেকে সমস্ত পথ এসেছি শুনে তিনি অবাক। এত ছোট ছেলে কি করে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিল, কি করে কলকাতার জনাকীর্ণ পথ দিয়ে সাইকেলে করে এলো—এ তিনি ভাবতেই পারেন না! সবাইকে ডেকে ডেকে তিনি বলতে লাগলেন—"দেখ, দেখ, এইটুকু ছেলে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছে আবার এতটা পথ সাইকেলে করে এসেছে!" আমি বাস্তবিক অতটা ছোট ছিলাম কিনা সন্দেহ। আমার বয়স তখন ষোল, তবে দেখতে হয়তো ছোট ছিলাম। তিনি অনেক কথা জিজ্ঞেস করলেন, আমি কোন কথারই উত্তর গুছিয়ে দিতে পারলাম না। চিরকাল আমি মুখচোরা, আর ঐ বিরাট ব্যক্তিত্বের সামনে এসে আমার জিহ্বা একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ভয়, ভক্তি মিশিয়ে আমি একেবারে

বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলাম! কিন্তু মহাপুরুষজী অন্তর্দ্রষ্টা, তাই আমি কথা বলতে না পারলেও আমার মনের কথা বুঝতে পারছিলেন। সেজন্যই এত ধৈর্য ধরে আমাকে বারবার প্রশ্ন করে আমাকে দিয়ে আমার কথা বলিয়ে নিচ্ছিলেন। বেশ কিছুক্ষণ এভাবে চলার পর একজন সেবককে বললেন, "একে জ্ঞান মহারাজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাও, আর কিছু প্রসাদ দিয়ে দাও।" আর আমাকে সাবধানে বাড়ি ফিরে যেতে বললেন। আমি জ্ঞান মহারাজ এবং অন্যান্য মহারাজদের প্রণাম করে পরিপূর্ণ হৃদয়ে বাড়ি ফিরে এলাম।

কিন্তু পূজ্যপাদ শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের প্রতি এমনই আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলাম যে, তার পরদিন আবার ঠিক সেই সময়ে মঠে গিয়ে উপস্থিত। আমাকে দেখেই মহাপুরুষজী বলে উঠলেন, "তুই আবার এসেছিস? তোর কি পড়াশুনা নেই?" আমি বললাম, "মহারাজ, আমার তো পরীক্ষা হয়ে গেছে। এখন আবার কি পড়াশুনা?" তিনি বললেন, "তা হোক, তুই এ রকম ঘন ঘন আসবি, তারপর তোর বাড়ির লোক আমাদের দোষ দিক—বলুক আমরা তোকে তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছি।" আমার বাড়ির লোক এ বিষয়ে খুবই উদার ছিলেন, কিন্তু আমি কিছুই বলতে পারলাম না। ভয়ে বুক কাঁপতে লাগল। আমি সেদিন জ্ঞান মহারাজ ও অন্যান্য মহারাজদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটিয়ে চলে এলাম।

তার দু-এক দিন পরে আবার মঠে গেলাম। খুব ভয়ে ভয়ে গেলাম, পাছে আবার ধমক খাই। এবার কিন্তু শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ বিশেষ কিছু বললেন না। একটু যেন ঔদাসীন্য দেখালেন। তাতে আরও ভয় পেয়ে গেলাম। আমি সেদিন হয়তো যেতাম না, কিন্তু দেশের বাড়িতে যাচ্ছি—তাই যাবার আগে বিদায় নিতে গিয়েছিলাম। সাহস করে সে কথা যদি বলতে পারতাম তাহলে হয়তো তিনি আমাকে ক্ষমা করতেন! কিন্তু বলতে পারলাম না।...

* * *

পরীক্ষার ফল বেরুলে কলকাতায় কলেজে পড়তে এলাম। কলেজে পড়বার সময় প্রায় প্রত্যেক রবিবার মঠে যেতাম। সকালে যেতাম আর সন্ধ্যায় ফিরে আসতাম। বিশেষ বিশেষ উৎসব-দিনেও যেতাম। কখনো কখনো রাত্রিবাসও করেছি। মঠে গিয়েই মহাপুরুষজীকে প্রণাম করতাম, আবার আসার সময় তাঁকে প্রণাম করে আসতাম। কোন কথা বলতে আমার সাহস হতো না, কিন্তু তিনি করুণাভরে আমার দিকে তাকাতেন। তাতেই আমি যথেষ্ট মনে করতাম। কখনো হয়তো তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কি রে, কেমন আছিস?" আমি কোনমতে উত্তর দিয়ে পালিয়ে আসতাম। ৩।৪ মাস এভাবে যাতায়াতের পর মঠের কয়েকজন

মহারাজ আমার অভিভাবক স্থানীয় হয়ে গেলেন। তাঁরা আমার ইহকাল-পরকালের চিন্তা করতেন। তাঁদের একজন একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—আমি দীক্ষার কথা ভেবেছি কিনা। আমি নিত্য নিজের খেয়ালমত ধ্যান-জপ করতাম, দীক্ষার কথাও ভাবতাম, কিন্তু মহাপুরুষ মহারাজকে বলতে সাহস হোত না। এই কথা শুনেই বললাম—"যদি ব্যবস্থা করে দেন, খুব ভালো হয়।" তিনি বোধ হয় সত্যেন মহারাজকে বলেছিলেন, কারণ কিছুক্ষণের মধ্যেই সত্যেন মহারাজ এসে আমাকে ডেকে বললেন—"আয়, আমার সঙ্গে।" সঙ্গে আরও দু-এক জন মহারাজ চললেন। আমি সত্যেন মহারাজের পিছনে চললাম জড়সড় হয়ে। বুক কাঁপতে লাগল, ভয়—যদি মহাপুরুষ মহারাজ অযোগ্য বলে ফিরিয়ে দেন। অযোগ্য তো নিশ্চয়ই, কিন্তু ফিরিয়ে দিলে আমার এত দিনের স্বপ্ন ও সাধ যে ব্যর্থ হয়ে যাবে! সত্যেন মহারাজ শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের কাছে গিয়ে বললেন, "মহারাজ, এই ছেলেটি বেশ ভালো, এ কি বলতে চায় আপনাকে।" আমাকে উনি ঠেলে দেবেন এভাবে, সেজন্য আমি আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না। এসব ক্ষেত্রে কি বলতে হয় তাও জানতাম না। কোন রকমে বলে ফেললাম—"মহারাজ, আমাকে কৃপা করুন।" বলেই কাঁদতে লাগলাম! একটু স্মিত হাসি হেসে করুণা-সাগর মহাপুরুষজী বললেন, "তুমি দীক্ষা চাচ্ছ? তা দেখ বাবা, আমরা তো আর পেশাদার গুরু নই। তুমি ঠাকুরের নাম করবে, সে তো খুব ভালো কথা। বল, আমার সঙ্গে সঙ্গে।" বলেই মহামন্ত্র বলতে লাগলেন। তাঁর চক্ষু মুদ্রিত, ধ্যানাসনে তাঁর বিছানায় বসেই মন্ত্র বলতে লাগলেন। ততক্ষণে দরজা বন্ধ করে মহারাজরা সবাই বেরিয়ে গেছেন। আমি মেজেতে মহাপুরুষজীর দিকে মুখ করে বসে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রোচ্চারণ করতে লাগলাম। কতক্ষণ এভাবে কাটল আমি বলতে পারি না। মহাপুরুষজীর কণ্ঠস্বর থামতেই আমার খেয়াল হলো। তিনি বললেন—"যাও, এবার ঠাকুরঘরে যাও।" আমি নিচে নামতেই একজন মহারাজ বললেন, "তুমি স্নান করে ঠাকুরঘরের বারান্দায় গিয়ে বসে থাক, মহাপুরুষ মহারাজ ঠাকুরঘরে তোমাকে আবার মন্ত্র দেবেন।" তাঁর কথায় আমি তাই করলাম বটে, কিন্তু মহাপুরুষজী আর আমাকে ডাকলেন না। আমি বিকেলে প্রণাম করতে গিয়ে সামান্য প্রণামী দিয়ে এলাম পরম পূজ্যপাদ গুরুদেবকে।

এর কিছুদিন পর একদিন গঙ্গার দিককার উপরের বারান্দার রেলিং ধরে মহাপুরুষজী দাঁড়িয়ে আছেন একা। এই সময় আমি গিয়ে তাঁকে জানালাম, "আমি যেখানে থাকি সেখানে ধ্যান-জপ করতে বসলে অন্যেরা ভয়ানক ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। আমি তাই রাস্তায় চলতে চলতে ঈশ্বরের নাম করি।" শুনে মহাপুরুষজী খুব খুশি হলেন, বললেন—"যেখানেই হোক, ঈশ্বরের নাম করলেই হলো। যত পার তাঁর নাম কর, নাম করে ধন্য হয়ে যাও।" তারপর একটু থেমে বললেন, "তবে দেখ,

বাবা, গাড়ি চাপা পড়ো না যেন।” বলে একটু হাসলেন। আমিও হাসলাম। মহাপুরুষজীর ধারণা আমি তখনও ছেলেমানুষ! এসব কথার পর হঠাৎ আমার বুকে হাত দিয়ে দু-একটা কথা বললেন। অদ্ভুত সেসব কথা! সেসব কথার তাৎপর্য তখন বুঝিনি, এখনও বুঝতে পারিনি। সবশেষে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক তাও বলে দিলেন। এই শুভ দিনের স্মৃতি মনে জাগলে আমি অবাক হয়ে যাই।...

প্রায়ই মঠে গেলেও সবদিন মহাপুরুষ মহারাজকে একা পেতাম না। প্রায়ই ঘরে ভক্ত বা সাধুরা থাকতেন। প্রণাম করে অনেকে দাঁড়িয়ে থাকতেন। আমিও থাকতাম। অনেকে অনেক প্রশ্ন করতেন মহাপুরুষ মহারাজকে। তিনি উত্তর দিতেন, শুনতাম। আমারও ইচ্ছা হতো প্রশ্ন করি, কিন্তু কখনও সাহস হয়নি প্রশ্ন করতে। আমার যে বিশেষ কোন প্রশ্ন ছিল তা নয়, তবে সবাই করছে দেখে আমারও করতে ইচ্ছা হতো। তবে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কখনও কোন প্রশ্ন যদি সত্যসত্যই মনে জাগতো তাহলে প্রায়ই দেখতাম সেই প্রশ্ন কেউ না কেউ করেছে আর মহাপুরুষজী তার উত্তর দিচ্ছেন। আরো দেখতাম ঐ প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় তিনি মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাচ্ছেন। যেন প্রশ্নটা আমিই করেছি! একটা কথা এখানে উল্লেখ করতে পারি। অনেক লোকের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকলেও প্রায়ই দেখতাম মহাপুরুষ মহারাজ আমার দিকে তাকিয়ে কি যেন ইশারা করে বলছেন! তাঁর ইশারার অর্থ অন্তত আমি যা করতাম তা হচ্ছে—‘খুব হবে, বাবা, খুব হবে।’ এ হয়তো আমার কল্পনা, কিন্তু এই কল্পনা করে আমি অনেক সাহস পেতাম। একবার কিন্তু তিনি মুখেও একথা বলেছিলেন। আমি কি একটা যেন বলেছিলাম, তার উত্তরেই একথা বলেছিলেন! তখন আমি সাধু হয়েছি এবং মঠে আছি। সেদিন তাঁকে একা পেয়েছিলাম। আর একদিনও আমাকে অভয় দিয়েছিলেন, আমি তখন দেওঘর বিদ্যাপীঠে থাকি, কোন এক ছুটিতে মঠে এসেছি। ছুটি শেষ হবার মুখে মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করে বিদায় নিতে গেলাম। বললাম—“মহারাজ, আমি বিদ্যাপীঠে ফিরে যাচ্ছি।” তিনি বেশ জোর গলায় বললেন, “যা না, বাবা বৈদ্যনাথ আছেন, তিনি দেখবেন। ভয় কি?” এই সময়ে মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে ‘দেওঘরের কানাই’ বা ‘লম্বা কানাই’ বলতেন। আমি ততদিনে বেশ লম্বা হয়ে গেছি।

একবার এক মজার ঘটনা হয়েছিল। আমি মঠে আছি, এমন সময় আমার কয়েক ক্লাশ নিচে পড়তো এমন একটি যুবক এসে বলল, ‘আমি দীক্ষা নেবো। আপনি ব্যবস্থা করে দিন।’ সেই ছেলেটিও আমাদের স্কুলের প্রধান শিক্ষকের

সংস্পর্শে এসে মঠের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। তার পীড়াপীড়িতে তাকে নিয়ে সোজা মহাপুরুষ মহারাজের কাছে গেলাম। সেদিন কোথা থেকে এত সাহস হলো বলতে পারি না। গিয়ে ছেলেটির পরিচয় দিয়ে বললাম, "মহারাজ, আপনি একে কৃপা করুন।" কী এক দিব্য হাসিতে মহাপুরুষজীর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল! বললেন, "বেশ, হবে। বোস তোরা দু-জন।" আমরা মেজেতে বসে পড়লাম। কেন বসতে বললেন বুঝতে পারছিলাম না। বসতে পারব কিছুক্ষণ তাঁর কাছে এই তো যথেষ্ট। আমরা বসলে আমার দিকে তাকিয়ে মহাপুরুষজী বললেন—"তোকে কি মন্ত্র দিয়েছিলাম বল।" আমি তো প্রমাদ গণলাম। অন্য লোকের সামনে মন্ত্র বলি কি করে? আমি ইতস্তত করছি দেখে তিনি বললেন, "আরে ছোঁড়া, আমাকে বলতেও তোর আপত্তি?" তখন আশ্বস্ত হয়ে বললাম। আশ্চর্যের বিষয়, আমার ঐ সঙ্গীটিকে মহাপুরুষজী আমার মন্ত্রই দিলেন! ঠিক যেভাবে আমাকে দিয়েছিলেন সেইভাবেই দিলেন। আমার ঐ সঙ্গীটি এত সহজে মহাপুরুষজীর কৃপা পাবে তা ভাবতেই পারিনি। সে বুদ্ধিমান—ফুল ফল সঙ্গে করে কিছু এনেছিল, সেগুলি গুরুদেব মহাপুরুষ মহারাজকে দিল আর তাঁকে প্রণাম করে মহাখুশি হয়ে বাড়ি চলে গেল।...

একবার গুরুদেব মহাপুরুষ মহারাজের শুভ জন্মদিন। সেবার খুব ঘটা করে উৎসব হচ্ছে। কী চোখঝলসানো রূপ তাঁর সেদিন দেখেছিলাম! কতবার যে লুকিয়ে গুরুদেবকে দেখে এসেছি তার ইয়ত্তা নেই! মাঝে মাঝে গিয়ে প্রণামও করছিলাম তাঁকে। প্রত্যেকবারই আমার প্রতি তাঁর প্রসন্ন দৃষ্টি এবং মৃদু হাসি। বারবার গিয়ে এভাবে প্রণাম করছি দেখে একজন সেবক বলে উঠলেন, "তুমি কতবার প্রণাম করবে?" আমি বেশ স্পর্ধা সহকারে বললাম—"আজ যতবার খুশি প্রণাম করব, কারো বাধা মানব না।" বলেই করুণাময় মহাপুরুষজীর দিকে তাকিয়ে দেখলাম—তিনি মৃদু হাসি দিয়ে আমার উক্তির সমর্থন করছেন।

এভাবের ছোটখাটো ঘটনা মনে পড়ে, কিন্তু তার তাৎপর্য আমার কাছে যতটা, ততটা অন্যের কাছে হবে তা আমি আশা করতে পারি না। এইসব ছোটখাটো ঘটনার ভেতর দিয়ে গুরুদেবের যে করুণা আমি লাভ করেছি, সেই মধুর স্মৃতি এখন আমার সহায় ও সম্বল। দুঃখ হয়, কেন তাঁর আরো কাছে যাবার চেষ্টা করিনি। এত সহজলভ্য তিনি ছিলেন অথচ দায়সারা প্রণাম করা ছাড়া তাঁর কাছে ঘেঁষবার আর কোনো চেষ্টাই করিনি। যতটুকু কৃপা মহাপুরুষজীর পেয়েছি, তা তিনি অহেতুক কৃপাসিন্ধু বলেই পেয়েছি—আমার যোগ্যতার জোরেও নয়, চেষ্টার ফলেও নয়।

ওঁ তৎসৎ

শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ—আমার গুরুদেব*

স্বামী প্রেমাত্মানন্দ

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের মার্চের শেষ সপ্তাহে এক উজ্জ্বল বিকেলে আউটরাম ঘাটে স্টিমার থেকে নেমে এক্কা করে বড়বাজার স্টিমার ঘাটে আমরা চারজন ব্রহ্মচারী এসে পৌঁছাই। আমরা কুয়ালালামপুর থেকে রওনা হয়ে পেনাং ও রেঙ্গুন হয়ে আসছিলাম। বড়বাজার স্টিমার ঘাটে বেলুড় মঠের সুহৃদ মহারাজের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়। তিনি আমাদের খুবই সাহায্য করেন, তাছাড়া শ্রীঠাকুরসেবার জন্য রেঙ্গুন সেবাশ্রম থেকে আনা ফলগুলোর ভার গ্রহণ করেন। আধ ঘণ্টার মধ্যেই বেলুড় স্টিমার ঘাটে পৌঁছে হেঁটেই মঠে যাই। সন্ধ্যা ছটা নাগাদ শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরের সামনে পরমপূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ স্বামী শিবানন্দজীকে আমরা দর্শন করি। তিনি তখন সান্ধ্যভ্রমণ করছিলেন। আমরা সবাই তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলাম। আমরা কোথা থেকে আসছি জিজ্ঞেস করতে আমাদের মধ্যে একজন ব্রহ্মচারী উত্তর দিলেন যে, আমরা কুয়ালালামপুর থেকে আসছি। মহাপুরুষজী আমাদের দেখে আনন্দ প্রকাশ করে বললেন—"বাঃ বেশ, ভাল।" মঠের বাসভবনে পৌঁছতে মহাপুরুষজীর সেবক স্বামী অপূর্বানন্দ আমাদের স্বাগত জানিয়ে গঙ্গার মুখোমুখি একটি ঘরে থাকবার নির্দেশ দিলেন। তিনি আমাদের স্নান করতে বললেন এবং পরে ফল ও কিছু মিষ্টি প্রসাদ খেতে দিলেন। সন্ধ্যারতি দেখে আমরা মহাপুরুষজীকে দর্শন করতে গেলাম। তিনি তখন গঙ্গার দিকে মুখ করে চুপচাপ বসেছিলেন। আমরা পূর্বেই স্থির করেছিলাম যে, আমাদের চারজনের মধ্যে একজনই কেবল সব প্রশ্নের উত্তর দেবে, অন্য সবাই চুপ করে থাকব। আমরা ভূলুণ্ঠিত হয়ে শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করলাম। তিনি আমাদের নাম জিজ্ঞেস করে কুয়ালালামপুরস্থ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বিদেহানন্দের দেওয়া চিঠি দেখতে চাইলেন। আমাদের মধ্যে ব্রহ্মচারী রামদাস উত্তর দিল যে, স্বামী বিদেহানন্দের অনুমতি না নিয়েই চলে আসাতে তাঁর কোনও চিঠি আমরা আনতে পারিনি। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তৎকালীন অধ্যক্ষ তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন—"তাহলে তোমাদের জন্য এখানে স্থান নেই; এখনই মঠের সীমানার বাইরে চলে যাও।" আমরা ঘর থেকে বাইরে এসে

* ইংরেজির অনুবাদ

বারান্দায় অপর প্রান্তে গিয়ে ভাগ্যে কি ঘটবে তাই ভাবতে লাগলাম। আমরা তখন হতাশা, ব্যর্থতা ও বেদনার প্রান্তসীমায় এসে দাঁড়িয়েছি। মনে হলো আমাদের সঙ্কটের চরম মুহূর্ত এগিয়ে আসছে। ...তাই যদি হয়, হোক। আমরা সঙ্কল্প করলাম যে, প্রয়োজন হলে সবাই হৃষীকেশ চলে যাব আর সেখানেই বাকি জীবন জপধ্যানে কাটিয়ে দেব।

ভোগের ঘণ্টা বাজল এবং কয়েক মুহূর্ত পরেই একজন স্বাস্থ্যবান সন্ন্যাসী (পরে জেনেছি তিনি স্বামী ওঙ্কারানন্দজী) এলেন। তিনি বেঞ্চে বসে আমরা কোথা থেকে এসেছি জানতে চাইলেন। ব্রহ্মচারী রামদাস আমাদের কুয়ালালামপুর থেকে চলে আসার কারণ এবং আমরা কিভাবে এসেছি ইত্যাদি সব কিছু আনুপূর্বিক বলল। এ ছাড়া মহাপুরুষজী যে আমাদের তখনই ঐ স্থান ত্যাগ করতে বলছেন—এও তাঁকে বলা হলো। আমরা স্বামী বিদেহানন্দকে ছেড়ে কুয়ালালামপুর থেকে কেন চলে এসেছি তার যথার্থ কারণ স্বামী ওঙ্কারানন্দজী বুঝতে পারলেন। আমাদের বিবৃতি শুনে অনুমানে তিনি বুঝলেন যে, অন্যদিকেও কিছু গলদ রয়েছে। তিনি তখনই পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে গিয়ে আমাদের সব কথা জানিয়ে বললেন, "আপনি ওদের এখনই মঠ থেকে চলে যেতে বলেছেন। এখন রাত প্রায় নটা; তার ওপর ওরা এখানে নতুন এসেছে। এখন এত রাতে ওরা কোথায় যাবে?" উত্তর হলো—"বেশ তো, রাতটুকু ওরা এখানেই থাক।" এই ঔদার্যের মধ্য দিয়ে মহাপুরুষজী যেন তাঁর স্বাভাবিক মহত্ত্বকেই প্রকাশ করলেন। এমন মহাপুরুষের করুণা পেয়ে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করলাম।... রাতের আহারান্তে অভ্যাগত-কক্ষে শোবার অনুমতি পেলাম। সেখানে একটি প্রকাণ্ড মশারির ভিতর আমাদের চারজনকে শুইয়ে চিনু মহারাজ মশারি ভালভাবে গুঁজে এবং সব কিছু দেখে শুনে চলে গেলেন।

পরদিন সকালে চায়ের ঘণ্টা বাজতে আমরা চা ও মুড়ি খেলাম। পরে মঠবাসী সবাই মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করে তাঁর আশীর্বাদলাভার্থে তাঁর ঘরে গেলেন। মঠের এই নিয়ম। আমরাও তাঁর ঘরে গেলাম এবং যখন তিনি একজন প্রবীণ সন্ন্যাসীর সঙ্গে কথা বলছিলেন, সেই সুযোগে আমরা তাঁকে প্রণাম করেই দ্রুত বেরিয়ে এলাম। সবজিবাগানের তত্ত্বাবধানকারী ব্রহ্মচারীজী আমাদের বাগানে নিয়ে গিয়ে চারাগাছগুলির গোড়ার চারপাশ খুঁড়ে জল দিতে বললেন। আমাদের কাজ দেখে তিনি খুব খুশি হলেন এবং মহাপুরুষ মহারাজকে জানালেন যে, কুয়ালালামপুর থেকে যে চারটি ব্রহ্মচারী এসেছে তার খুব আজ্ঞাবহ ও সুদক্ষ কর্মী। তা শুনে মহাপুরুষজীও খুশি হলেন।

পরদিন যখন আমরা মহাপুরুষজীকে প্রণাম করতে গেলাম তিনি স্বামী বিদেহানন্দের অনুমতি ব্যতীত চলে আসার জন্য তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে আমাদের বললেন। একটি চিঠিতে ক্ষমাভিক্ষা চেয়ে আমরা সবাই তার নিচে সই করলাম। দিন পনের পর স্বামী বিদেহানন্দ পূজ্যপাদ মহাপুরুষজীকে চিঠিতে জানালেন যে, আমরা সবাই কৃতকর্মের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছি বলে তিনি আমাদের ক্ষমা করলেন; অতএব আমরা বেলুড় মঠে থাকতে পারি।

'বড়দাকে' বাগানে তদারকিতে সাহায্য করবার জন্য আমি পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের কাছ থেকে আদেশ পেলাম। এছাড়া মঠের কাজকর্মের ব্যবস্থাপক মহারাজ আমাকে স্বামীজীর ঘরটি দেখাশুনা করার ভার দিলেন।

মঠে থাকাকালীন আমি রোজই রাত্রের আহারাদি সেরে শ্রীমহাপুরুষজীর ঘরে চলে যেতাম। তখন তাঁর কাছে বসে অনুভব হতো—এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক শক্তির তরঙ্গ আমার মধ্যে প্রবেশ করছে। এ যেন কোন জ্যোতিষ্কের চারদিকে বিচ্ছুরিত আলোকরাশি! প্রায় আধ ঘণ্টা পর তিনি আমাকে বলতেন, "পাদুক্কায়িকু পো।"—শুতে যাও। কখনও বা সৌভাগ্যক্রমে মহাপুরুষজীকে প্রায় ঘণ্টাকাল ধরে বাতাস করার সুযোগ পেয়েছি। তখনকার দিনে মহাপুরুষজী ডাক্তারের পরামর্শমত বিকেল বেলায় বেলুড় থেকে শিবতলা ঘাট পর্যন্ত স্টিমারে হাওয়া খেতে যেতেন। বেলুড় ঘাটে ফিরে আসতে সূর্যাস্ত হয়ে আঁধার নামতো। সেজন্য কেহ লণ্ঠন হাতে ঘাট থেকে তাঁকে মঠে পথ দেখিয়ে আনতে যেতেন। মহাপুরুষজীর সেবক শঙ্কর মহারাজের কৃপায় আমি কিছুদিনের জন্য এই সেবার কাজটি পেয়েছিলাম।

দক্ষিণ-ভারতীয় লোকদের আহারাদির বিষয়ে মহাপুরুষজী খুব যত্নশীল ছিলেন। তিনি মাদ্রাজী সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের সম্বন্ধে মঠের কার্য-ব্যবস্থাপক ও ভাণ্ডারি মহারাজকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে বলতেন। মহাপুরুষজী আদেশ দিয়েছিলেন আমাদের (দক্ষিণ-ভারতীয়দের) যেন প্রতিদিন দই এবং সপ্তাহে একবার রসম ও করম্ব দেওয়া হয়।

মহাপুরুষ মহারাজ নিয়মিত জপধ্যানকে খুবই প্রাধান্য দিতেন। তিনি প্রত্যহ সকালে মন্দিরে গিয়ে প্রায় দুঘণ্টারও বেশি সময় ধ্যান করতেন। এটি তিনি মঠের সকলের সামনে আদর্শ তুলে ধরবার জন্য করতেন। আমিও ওই সময় মন্দিরে গিয়ে ধ্যানে বসতাম। তিনি সামনে থাকলে মন সহজেই ইষ্টে স্থির হয়ে যেত।

মহাপুরুষজী আহারের বিষয়ে খুবই সংযমী ছিলেন। তাঁর সেবক শ্রীঠাকুরের প্রসাদী সব কিছু নিয়ে আসতেন—নিরামিষ তরকারি, ফল, মিষ্টি—আরও কতকিছু।

কিন্তু তিনি যেটুকু সহ্য হবে সেটুকুই খেতেন, বাকি পাত্রগুলো তিনি ছুঁতেনও না; আমরা মহানন্দে সেই প্রসাদ পেতাম।

রেভারেণ্ড পপ্‌লী সাহেব মহাপুরুষ মহারাজকে মাঝে মাঝে দর্শন করতে আসতেন। একদিন কলকাতা অদ্বৈত আশ্রমে কথোপকথনকালে তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন যে, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস শ্রীশ্রীমহাপুরুষজী ঈশ্বরদ্রষ্টা পুরুষ এবং সেজন্যই তিনি প্রেরণাকামী হয়ে তাঁর কাছে যান।

যখনই আমার আধ্যাত্মিক জীবনে কোনও দ্বন্দ্ব বা সমস্যা দেখা দিত আমি মহাপুরুষজীর কাছে সমাধানের আশায় যেতাম। কিন্তু তাঁর সামনে বসে মন একাগ্র করা মাত্র আপনিই সেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেত, প্রশ্ন করার কোন প্রয়োজন থাকত না।

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে পুণ্য বুদ্ধপূর্ণিমা তিথিতে স্বামী রুদ্রানন্দ, স্বামী বামদেবানন্দ এবং আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করি। মহাপুরুষজী সেই বছরই শেষবারের মতো মন্দিরে গিয়ে সন্ন্যাস প্রদান করেছিলেন। মহাপুরুষজী যখন শেষবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন আমি কলকাতা অদ্বৈত আশ্রমে রয়েছি। গুরুদেবের জন্য ডাক্তার নিয়ে যাবার কাজটি পেয়ে আমি ধন্য হয়েছিলাম। শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও মহাপুরুষজীর এ জ্ঞান ছিল যে, তিনি আত্মা—শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, অমর। বিকার, রোগ, মৃত্যু—এগুলি শুধু পার্থিব শরীরকেই কবলিত করে।

পূজ্যপাদ গুরুদেবের মহাসমাধি আমার মনে বিশেষ আঘাত দিয়েছিল। তিনি আমাকে পিতামাতার অপেক্ষাও অধিক স্নেহ করতেন। সবাইকে সত্য ও ধর্মের পথে পরিচালিত করার জন্য ব্রতী এমন মহাত্মা এ পৃথিবীতে খুবই বিরল।

শিবানন্দ-স্মৃতিকথা

স্বামী বলদেবানন্দ

পরম দয়াল ভগবান কাকে কি ভাবে পরিচালিত করেন তা অনুধাবন করা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগোচর। যুগ-প্রয়োজনে যুগে যুগে তাঁর আবির্ভাব হয় এবং লীলা সর্বাঙ্গসুন্দর করবার জন্য তাঁর সঙ্গে আসেন উচ্চকোটির সাঙ্গোপাঙ্গ—তাঁরাও জীবনকল্যাণব্রতী মহাপুরুষ। প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা, এ যেন একই নাটকের অভিনেতাদের মিলন।

মহাপুরুষ মহারাজ (স্বামী শিবানন্দ) ছিলেন অবতারবরিষ্ঠ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অন্যতম অন্তরঙ্গ পার্ষদ। শ্রীশ্রীমা ও ঠাকুরের কয়েকজন অন্তরঙ্গ সন্তানের সঙ্গলাভ করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। বিশেষ করে পূজনীয় রাজা মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজের কিছু কিছু সেবা করার সুযোগও লাভ করে নিজেকে মহা ভাগ্যবান মনে করি। তাঁদের অহেতুকী কৃপা এবং অযাচিত করুণার স্মৃতি আমার পরম পাথেয়।

অতীতের কথা প্রায় বিস্মৃতির অতল তলে। তথাপি মহাপুরুষজীর প্রসঙ্গ কিছু অনুধ্যান করার ইচ্ছা। যদিও আমার পক্ষে মহাপুরুষ মহারাজ সম্বন্ধে কিছু বলা বা লেখা বাতুলতা মাত্র, কারণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপন-প্রসঙ্গও ওতপ্রোতভাবে তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে।

যতদূর মনে আছে ছাত্রাবস্থায় প্রথম মহাপুরুষ মহারাজের দর্শন পাই বেলুড় মঠে। তিনি কাশীধাম থেকে এসেছেন। অতীব গম্ভীরপ্রকৃতি এবং স্বল্পভাষী। প্রণাম করলে সংক্ষেপে কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞেস করতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ভগবান এবং তাঁরই সন্তান মহাপুরুষ মহারাজ—এই বিশ্বাস আমার মনে অবশ্য ছিল; তবু সঙ্কীর্ণ মন পরক্ষণেই এসব ভাব ভুলে যেত। মঠে যাতায়াত করতাম এবং সুযোগ বুঝে এঁদের সেবাও করতাম। আমার বাবা শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করেছিলেন, তাঁর ভক্ত ছিলেন বলে আমাকে মহাপুরুষ মহারাজ সন্তানের মতো দেখতেন। তখনকার দিনে মহাপুরুষ মহারাজও নিচে সাধারণের পায়খানায় গিয়ে শৌচকার্য করে এসে সুরেন মহারাজের সেবায় হস্ত-পদ প্রক্ষালন করতেন। তাই দেখে আমারও সেবা করার ইচ্ছা হতো, কিন্তু প্রকাশ করতে পারতাম না।...

মহাপুরুষ মহারাজ সঙ্গীত এবং বাদ্যে উৎসাহী ছিলেন। দুর্গাপূজার সময় একদিন বিশ্রামালয়ে কালীকীর্তন এবং ভজন হচ্ছিল। মহাপুরুষ মহারাজ এবং শরৎ মহারাজ বারান্দায় বসেছিলেন। হঠাৎ মহাপুরুষ মহারাজ ঐ ঘরে গিয়ে বাঁয়া তবলা নিয়ে বসলেন। বাবুরাম মহারাজ নাচতে শুরু করলেন এবং শরৎ মহারাজ এসে তানপুরা ধরলেন। লক্ষ্মণ মহারাজ গান ধরেছিলেন, "ক্ষেপার হাটবাজার মা তোদের ক্ষেপার হাটবাজার।..." এই ভাবময় আবেশে উপস্থিত সকলেরই হৃদয়ে যেন ভাব-ভক্তির মেলা চলল। কিছুক্ষণ সকলেই বাহ্যজ্ঞানশূন্য।...

আমার পিতৃদেব পূজ্যপাদ স্বামীজীর (স্বামী বিবেকানন্দ) সহপাঠী, বন্ধু এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত ছিলেন।* তিনি আমরণ মঠের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা

* তাঁর নাম ছিল শ্রীগোপালচন্দ্র দাস। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে কয়েকবার দর্শন করেছিলেন এবং স্বামীজীর সহপাঠী ছিলেন বলে শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ সকলের সঙ্গেই তাঁর বিশেষ অন্তরঙ্গতা ছিল। তিনি কলকাতা

করেছিলেন। আমার সাধু হয়ে মঠে যোগদান করার আকাঙ্ক্ষা তিনি মঞ্জুর করলেন, যখন শুনলেন এতে পূজনীয় রাজা মহারাজের অনুমোদন আছে। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে তদানীন্তন বেলুড় মঠাধ্যক্ষ মহাপুরুষ মহারাজের কাছে আমি উক্ত প্রার্থনা জানাই। তিনি সানন্দে আমাকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষাদান করলেন। মহান এবং উদারহৃদয় মহাপুরুষ মহারাজ ব্রহ্মচর্যের সাধারণ নিয়ম থেকে আপাতত আমাকে মুক্ত রাখলেন। যথা—মাথা মুণ্ডন করতে হলো না, সাধারণভাবে ধুতি পরতে বললেন এবং আমার বৃদ্ধ পীড়িত পিতার সেবার জন্য মঠের তরফ থেকে আমাকে নিয়োজিত করলেন। আগেকার দিনে মাঝে মাঝে তিনি পিতৃদেবকে দেখতে আসতেন। বাবা যখন শয্যাশায়ী এবং খুব অসুস্থ তখন মহাপুরুষ মহারাজ তাঁর রোগমুক্তির জন্য 'আত্মারামের' স্নানজল এবং শ্রীঠাকুরের নির্মাল্য পাঠিয়েছিলেন। নির্মাল্য ও স্নানজল পিতৃদেবকে দেওয়া হলে তাতে তাঁর ব্যাধির সাময়িক উপশম হয়েছিল। পিতৃদেবের রোগমুক্তির জন্য মহাপুরুষ মহারাজের উদ্বেগ এবং সেবাযত্নের প্রতি সতর্ক দৃষ্টির কথা মনে হলে প্রশ্ন জাগে—এই কি 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা', অথবা বাবা শ্রীঠাকুরের সাক্ষাৎ ভক্ত ছিলেন বলেই কি তাঁর প্রতি তাঁদের এই প্রগাঢ় ভালবাসা ও একান্ত আত্মীয়তাবোধ? যদিও মহাপুরুষজী সন্ন্যাসী ছিলেন, আমার কিন্তু কোন ভয় হতো না। তাঁদের সঙ্গে অবাধে মিশতাম এবং তাঁরাও খুব ভালবাসতেন। তাঁদের দেখলেই মনপ্রাণ আনন্দে ভরে যেত, কোন অভাববোধ থাকত না। সেজন্য ধর্মপ্রসঙ্গ তাঁদের সঙ্গে কদাচিৎ করেছি।

একবার আমার চোখের গুরুতর ব্যাধির কথা জেনে মহাপুরুষ মহারাজ মঠের ভক্ত এবং কলকাতার এক বিখ্যাত ডাক্তারের দ্বারা চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন। আমার চোখের জন্য তিনি কি যত্নই না করেছিলেন। সেসব কথা মনে পড়লে এখনো শ্রদ্ধায় মন তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়ে। রোগমুক্ত হওয়ার পর তাঁর শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম করা মাত্রই মহাপুরুষজীর এক অনির্বচনীয় ভাব লক্ষ্য করে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। মনে হলো যেন তিনি স্বয়ং ব্যাধিমুক্ত হয়েছেন। এই কি বিশ্বপ্রেম!

মহাপুরুষ মহারাজের একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার মতো। মঠাশ্রিত কোন সাধু যদি অপটু বা অদূরদর্শী হতো তিনি পক্ষিমাতার মতো তাকে ঘিরে রাখতেন এবং নানা ভাবে উপদেশদানে তাঁর জীবনগঠনের চেষ্টা করতেন। কারো নামে কোন অভিযোগ শুনলে খুব সহৃদয়তার সঙ্গে তার কাছ থেকে সঠিক ঘটনা জেনে বিনা তিরস্কারে উপদেশ দিতেন।

হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার ছিলেন। সেই সূত্রেও মঠ ও মিশনের নানা কাজে ঠাকুরের সন্তানগণের সঙ্গে তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল।—সঙ্কলক

শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ভালবাসা ছিল অতুলনীয়। তাঁরা যেন "সূত্রে মণিগণা ইব।" একের যা প্রিয়, অপরেও তা ঠিক ঠিক প্রিয় বলে মনে করতেন।

মহাপুরুষ মহারাজকে প্রথমে যতটা গম্ভীর এবং কঠোর মনে হয়েছিল, তাঁর সান্নিধ্যে এসে ক্রমে ক্রমে সেই ধারণার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হলো। তাঁর অন্তর ছিল অতি কোমল এবং সকলের শারীরিক সুস্থতা এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তিনি সর্বদা আকুল হতেন। তিনি আমার জীবনে স্নেহময় পিতার মতো ছিলেন। এখনো তাঁর পবিত্র স্মৃতির কথা মনে হলে কেমন যেন এক ধরনের বিহ্বলতার আবেশ হয়।

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ।

গুরুদেবের স্মৃতি-অর্ঘ্য

স্বামী আপ্তকামানন্দ

গায়ের জোর আর বুদ্ধির দৌড়ের কাছে সব শক্তিই হার মানে—আমার তখন এই ধারণা। অবিশ্বাসের অঙ্কুর বারবার মাথা গজায়। এমনি একটি ক্ষণে তিন বন্ধু মিলে মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের দর্শনমানসে বেলুড় মঠে এলাম। তিনি তখন মঠবাড়ির সামনে আমগাছতলায় বসে। সেটা ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের হিন্দু-মুসলমান-দাঙ্গার পরে। বন্ধুদ্বয়ের দীক্ষা পূর্বেই হয়ে গিয়েছে, আমার হয়নি। প্রণাম করতেই ঠাকুরঘরের দিকে তাকিয়ে মহাপুরুষজী বললেন, "যাও, আগে ঠাকুরের কাছে যাও।" প্রণাম করে ফিরে আসতেই বললেন, "উনিই (শ্রীশ্রীঠাকুর) আমাদের চালক ও পালক। ওঁর হুকুম ছাড়া আমাদের এক পা-ও নড়বার জো নেই। আমরা যখন যা করি, ওঁর অনুমতি নিয়ে করি। জ্যান্ত ভগবান! একসঙ্গে বাস করেছি। কতভাবে তাঁকে দেখেছি, তাঁর সঙ্গলাভ করেছি—তাঁর সেবা করে ভরপুর হয়ে আছি।" ক্ষণিকের স্পর্শ পেয়ে আমার অন্তরের সব বেদনার অবসান হলো। মহাপুরুষজীর মাঝে যেন দেখতে পেলাম ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ রূপ।...

পড়াশুনা করি। সময় বয়ে যাচ্ছে, সহসা বাসনা জাগল মহাজনের কৃপালাভে ধন্য হবার। মহাপুরুষজীকে পত্র লিখলাম। উত্তর দিলেন, "শ্রীভগবানের নামের জন্য তোমার আগ্রহের তীব্রতা দেখিয়া মুগ্ধ। সুবিধামত যখনই আসিবে তখনই তোমার

দীক্ষা হইবে।" আশ্বাসবাণী সারাক্ষণ হৃদয়ের মধ্যে গুঞ্জনধ্বনি তুলে আমায় অভিভূত করে ফেলল। নানা বাধা অতিক্রম করে পাঁচ মাস পরে বেলুড় মঠে মহাপুরুষজীর চরণতলে উপস্থিত হলাম। দরজাটি ভেজানো, ফাঁক দিয়ে অল্প দেখা যাচ্ছে। সার্থক নয়ন! সার্থক প্রাণ!! পেছন থেকে কার যেন কণ্ঠস্বর শুনলাম—"এখানে কেন? কি চাও?" বিস্মিত নেত্রে চেয়ে রইলাম, উত্তর দিলাম—"দর্শন ও প্রণাম করতে চাই।" নির্দেশ এল—"এখন দেখা হবে না, ওঁর শরীর ভাল নয়। এখান থেকেই প্রণাম করতে চাও তো প্রণাম করে চলে যাও।" মনটা ভীষণ দমে গেল।

মনের ভিতর একটা জগদ্দল পাথর যেন চেপে রইল। কলকাতার বাসায় আমি নজরবন্দির মতো বাস করতাম। শত নিষেধের বেড়াজাল অতিক্রম করে দু-দিন পর আবার সেই পরিচিত বেলুড় মঠে উপস্থিত হলাম। প্রভাতের সূর্যকিরণে ঝলমল করে উঠেছে সাধুভবন, প্রাঙ্গণ ও মঠের মন্দিরগুলি। মহাপুরুষজীর ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াতেই জনৈক সন্ন্যাসী বললেন—"আবার এসেছ? সেদিন বলেছিলাম ওঁর শরীর এখন খারাপ, দেখা হবে না। আর এ সময়ে এলে দেখা হবে কি করে?" পকেট থেকে চিঠিটি বের করে দিলাম। পড়তে লাগলেন। উত্তর পেলাম—"চিঠি এখন রেখে দাও, এ সময়ে কিছু হবে না।" মনের দুঃখে মন্দিরে শ্রীঠাকুরদর্শন করে স্বস্থানে ফিরে গেলাম। সমস্ত কাজকর্মের মধ্যে ধ্যানসিদ্ধ মহাপুরুষজীর মুখখানি ভেসে উঠে।...

আর একদিন বেপরোয়া হয়ে বাড়ির সকলের অলক্ষ্যে বেরিয়ে পড়লাম। গঙ্গারঘাটে এসে দেখি যাত্রী উঠছে স্টিমারে। আমিও টিকেট কেটে উঠলাম। বেলুড় খেয়াঘাটে নেমে কি যেন এক অব্যক্ত আকর্ষণে মনের আনন্দে এগিয়ে চললাম! মহাপুরুষ মহারাজের দ্বারদেশে কেউ নেই। সিঁড়ির ঘড়িতে তখনও নটা বাজেনি। সুযোগ বুঝে সাহসে ভর করে দরজা খুলে ভিতরে গেলাম। সবেমাত্র দাঁড়িয়েছি, একজন সেবক এসে বললেন—"প্রণাম করে তাড়াতাড়ি চলে যাও।" প্রণাম করে নিঃশব্দে ভারাক্রান্ত প্রাণে ঘর থেকে বেরিয়ে আবিষ্টের মতো ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলাম। এমনি ভাগ্যের ছলনা যে, দীক্ষার প্রার্থনাও জানাতে পারলাম না। বুক চিরে কান্না বেরিয়ে এল। চমক ভাঙলো মহাপুরুষজীর আহ্বানে—বারান্দা থেকে তিনি হাত নেড়ে ডাকছেন। চোখমুখ ভাল করে মুছে উপরে উঠে গেলাম। ভীত, সন্ত্রস্ত; বুকের ভিতর অবিরত কম্পন, বাক্যস্ফুরণ হচ্ছে না। তাঁর কাছে যেতে তিনি সস্মিত গম্ভীর স্বরে বললেন—"কি চাস?" প্রণাম করে চিঠিখানা তাঁর হাতে দিয়ে বললাম—"কৃপাপ্রার্থী।" নিজের লেখা চিঠিখানা পড়ছেন—আমি অপলকনেত্রে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। একটু মুখ তুলে বললেন—"হ্যাঁ, এখুনি

হবে। গঙ্গায় হাত পা ধুয়ে আয়।" শরীর-মন পুলকে নেচে উঠল, গঙ্গাজলে পবিত্র হয়ে ফিরে এসে দেখি গৃহদ্বার উন্মুক্ত। সম্মুখে আসতেই জিজ্ঞেস করলেন—"কিছু এনেছিস?" "না, কিছু আনিনি তো!" "আচ্ছা, যা ভাণ্ডারে বিকাশের কাছ থেকে একটা ফল চেয়ে নিয়ে আয়। বলিস, তোর দীক্ষা হবে।" ফল নিয়ে এসে দেখলাম আয়োজনের আর কিছু বাকি নেই।

মহাপুরুষজীর গৃহের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে উচ্চকাষ্ঠাসনে পত্রপুষ্পে সজ্জিত শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটোখানি। মেঝেতে দু-খানি আসন পাতা। আসনের সামনে কোশাকুশি, পুষ্পপাত্রে ফুল বেলপাতা প্রভৃতি পূজোপকরণ। আর একটি আসন তাঁর বিপরীত দিকে। আমায় বসতে ইঙ্গিত করে পরমপূজ্যপাদ মহাপুরুষজী নিজে পূজার আসনে বসলেন। সে এক অপূর্ব পূজা! গদগদ ভাব, চোখ মুখ রক্তিম আভায় উদ্ভাসিত। তাঁর মুখের বাণী—"ঠাকুরই সব, ঠাকুরই মা, বাপ, ভাই, বন্ধু। আজ ঠাকুরের চরণে তোকে উৎসর্গ করলাম।" পরে মন্ত্র বারবার উচ্চারণ করতে লাগলেন। প্রশ্ন করলেন—"এই মন্ত্রই তো তুই জপতিস?" "কিছু না জেনে-বুঝে জপতাম।" দৃঢ়স্বরে বললেন—"জ্ঞাতবস্তু কি কখনও অজ্ঞাত হয় রে?" বারবার তিনবার হাত ধরে কি করে জপ করতে হয় গুরুদেব দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলেন। শ্রীচরণে মাথা রেখে প্রণাম করলাম। সেদিন যিশুখ্রিস্টের জন্মদিবস, ২৫ ডিসেম্বর, ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ। তিনি আদেশ করলেন—"ঐ আমাদের ঠাকুরঘর, কিছুক্ষণ জপ করে আয় ওখানে। ঠাকুর ওখানে বসে সব দেখছেন, সব শুনছেন।" ঠাকুরঘরে গিয়ে কিছুক্ষণ জপ করতে করতে অন্তর এক অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে গেল। গুরুদেবের কাছে ফিরে আসতে তিনি নিজহাতে প্রসাদ দিলেন।

* * *

দীক্ষার বিষয় গর্ভধারিণী মাকে ছাড়া আর কাকেও জানাইনি। মাকে বললাম—"গুরুদক্ষিণা দিতে হবে, দশটি টাকা দাও।" মা আমায় আরও বেশি দিলেন, দুধ কিনে চার রকমের মিষ্টি তৈরি করলেন, আর বিবিধ ফল ও প্রার্থিত অর্থ দিয়ে আমাকে গুরুর কাছে পাঠিয়ে দিলেন দু-দিন পরে। প্রভাতের ভৈরব রাগিণীর কোমল করুণ সুরে আকাশ-বাতাস ঝঙ্কৃত। শ্রীগুরুর চরণবন্দনার জন্য হাজির হলাম গঙ্গাতীরে। গঙ্গাবক্ষে যাত্রিবোঝাই স্টিমার। বেলুড় খেয়াঘাটে নেমে আমি সোজা মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে গেলাম। পরমপূজ্যপাদ গুরুদেবের পদপ্রান্তে নৈবেদ্য ও দক্ষিণা রেখে লুটিয়ে প্রণাম করলাম। ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আমার মাথায় হাত রেখে খুব আশীর্বাদ করলেন। পরে কাছে বসিয়ে স্নেহভরে কত উপদেশ দিলেন! সে সব অন্তরে অক্ষয় সঞ্চয়রূপে রয়েছে।...

কালেভদ্রে মঠে যাই। কখনো দেখা হয়, কখনো হয় না। বছর দেড়েক পরে একবার তাঁর কাছে যেতেই স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে বলতে লাগলেন—"তোদের যো সো করে ঠাকুরের পায়ে ফেলে দিতে পারলে আমি নিশ্চিন্ত। ঠাকুর আমাদের সব—পরমাগতি। তোদেরও। আমি তাঁরই নাম দিচ্ছি। তিনি আমার শরীর মন ব্যেপে আছেন।" কেন জানি না দীক্ষার অব্যবহিত পর থেকে গুরুদেবের প্রতি আমার আকর্ষণ বাড়তে থাকে। কথাবার্তা বা উপদেশের আকর্ষণ নয়—শুধু একটু স্পর্শ, একবার দর্শন, নিমেষের চাহনি। তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষ, তাঁর জীবনবেদের প্রত্যক্ষতাই ছিল আমার লক্ষ্য।...

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি মহাপুরুষজীর সান্নিধ্যলাভের এক সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হলো। দেখেই জিজ্ঞেস করলেন—"কিরে, এত দিন আসিসনি কেন?" বললাম—"দেশে গিছলাম, কলকাতায় অবশ্য এসেছি কখনো-সখনো, এখানে না আসতে পারার কারণ—বাবার ভয়।" "এখন এলি কি করে?" জানালাম—"বাবা নেই।" "কোথায় গেছে?" "মারা গিয়েছেন।" "বলিস কিরে? একেবারে শেষ! বাবার মৃত্যুতে তোর একটুও কষ্ট হলো না?" "কষ্ট খুব হয়েছিল, মাসাবধি মনের মধ্যে যেন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতো!" মহাপুরুষজী সমবেদনার সুরে বললেন—"হ্যাঁ, তা তো হবারই কথা! বাবা হেন বস্তু! হবে না? পিতা জন্মদাতা, জনক—ঈশ্বরতুল্য। পিতৃশরীরের এক অংশ পুত্র। পিতাই পুত্রের একমাত্র ভরসা। পিতা ছাড়া পুত্রের জীবনের অবলম্বন আর কি আছে? আহা! সংসারে আর কে তোকে স্নেহযত্ন করবে, কে তোর অভাব অভিযোগ মেটাবে?" গভীর শোক তাঁর মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠল আমার অসহায় অবস্থার কথা ভেবে। মনে হলো মহাপুরুষজীর নিজেরই যেন পিতৃবিয়োগ ঘটেছে! তাঁর বিহ্বলতা দেখে আমিও বিহ্বল হয়ে পড়লাম। সে আত্যন্তিক শোকাবেগের মধ্যে সেদিন যে মৃত্যুঞ্জয়ী স্নেহমমতা উপলব্ধি করেছি তার তুলনা হয় না। পুনরায় প্রশ্ন করলেন—"তোর মা আছে তো?" "হ্যাঁ।" "তবু রক্ষা।" পর মুহূর্তে চুপচাপ—অন্তর্মুখী ভাব। অর্ধনিমীলিত নেত্রে স্নেহদৃষ্টি আমার উপর। আমিও তাঁকে দেখছি। ধর্মালোচনা বক্তৃতা অনেক শুনেছি, ভজন-কীর্তনে ভাববিহ্বলতা বহু দেখেছি, কিন্তু এরকমটি আর কোথাও দেখিনি। মনপ্রাণ আমার সেখানেই পড়ে রইল! বাড়ির কথা ভুলে গেলাম। মা-ভাই-বোনের কথা মনেই হলো না। পরমাত্মীয়তাবোধ গুরুদেবকে ঘিরেই জেগে রইল। এ সম্পর্কটি যেন কত জন্ম-জন্মান্তরের! মঠেই রয়েছি—নিত্য সকলের সঙ্গে সকাল বিকাল মহাপুরুষজীকে দর্শন করতে যেতাম। কথাবার্তা হতো না। তাঁকে দেখেই অন্তর ভরে যেত। ভালবাসার এমনই মোহিনী শক্তি! বাড়ি ফেরার আর ইচ্ছাই হলো না। একদিন ভোরে মহাপুরুষজীর ঘরে আমি একা। দেখলাম তিনি ঠাকুরের ফটোর

দিকে চেয়ে কথা বলছেন, যেন ঠাকুরময়। সাষ্টাঙ্গপ্রণামান্তে মঠে থাকবার ইচ্ছা নিবেদন করলাম। "আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে এখন।" সাতদিন পার না হতেই আমার মেদিনীপুর সেবাশ্রমে যাবার ঠিকঠাক। নলিনী মহারাজ আমাকে সঙ্গে করে মহাপুরুষজীর কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন—"এই ছেলেটি আজ মেদিনীপুর আশ্রমে যাচ্ছে।" সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—"আরও কিছুদিন মঠে থাকলে ভাল হতো। সেখানে সাধুরা আছে। সেখানে থাকবে ভাল।" সেবককে ডেকে প্রসাদ দিতে বললেন। প্রসাদ খেয়ে প্রসাদ লাভ করলাম। আমার জীবন গ'ড়ে তোলার জন্য গুরুদেবের চেষ্টার অন্ত ছিল না।...

নানা প্রতিকূল অবস্থায় একবছর পাঁচমাস আশ্রমের সেবাকার্যে অতিবাহিত করলাম। যখনই আমার সামনে বিভ্রান্তিকর সমস্যা উপস্থিত হতো তখনই আমার অন্তরবাসী গুরুদেবের শরণ নিতাম। প্রায়ই অন্তরে তাঁর বাণী শুনতে পেতাম, শয়নে স্বপনে জাগরণে তাঁর আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করতাম। একদিকে শ্রীগুরুদেবের আত্মসমাহিত জীবনের ছবি, অন্যদিকে আশ্রমের পারিপার্শ্বিক অবস্থা—মনোরাজ্যে তুমুল সংগ্রামের সৃষ্টি করল। সংক্ষেপে আমার মনের অবস্থা জানিয়ে বেলুড় মঠে লিখলাম। উত্তর এল—"বাড়ি ফিরে যাও।" সমস্যা আরও জটিল হয়ে দেখা দিল। বৈরাগ্যহীনের প্রতি এ কি নির্দেশ! 'বাড়ি ফিরে যাও'—বাক্যটি সত্যই কি ফিরে যাবার আদেশ কিংবা পরীক্ষাসূচক? মুখটি বুজে প্রার্থনারত হয়ে আশ্রমের সেবাকার্য করে দিন কাটাতে লাগলাম। কিন্তু প্রারব্ধের গতি অবধারিত। কর্মের আবর্তে পড়ে শরীর মন ভেঙে পড়ল। রক্তামাশয়ে আক্রান্ত হলাম, চলচ্ছক্তিরহিত। বাড়ির লোকেরা সংবাদ পেয়ে নিয়ে গেল। শরীর সারতে বেশিদিন লাগল না। মন তখনও দমে রয়েছে। গুরুদেবের অনুশাসন বার বার আমায় সচেতন করে দিচ্ছে। পুনঃ আশ্রমজীবন লাভ করার আশায় প্রার্থনাপর হয়ে রইলাম। সহসা এক সুযোগ উপস্থিত হলো। এক শুভদিনে বেলুড় মঠে হাজির হলাম। মহাপুরুষজীর ঘরে গিয়ে দেখি তিনি ঘরে নেই। অনুসন্ধান করতে করতে গঙ্গার দিকে বারান্দায় তাঁকে দেখতে পেলাম, বেঞ্চে বসে একাকী গঙ্গাদর্শন করছেন। মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলাম। মুখ তুলতেই স্নেহমাখা সম্ভাষণ—"তুই এসেছিস, কেমন আছিস?" বললাম—"ভাল আছি।" সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "আমিও ভাল আছি। বুঝলি?" আমার বুক কাঁপছে। কেমন করে নিজের দুর্বলতার কথা প্রকাশ করব? শেষে বলে ফেললাম—"মেদিনীপুর সেবাশ্রম থেকে মাস তিনেক হলো চলে এসেছি।" "বেশ করেছিস।" মনে এক নূতন ধরনের অনুভূতি। চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। দ্বিধা ও অভিমান ধীরে ধীরে মন থেকে সরে গেল। কখনো ভাবতে লাগলাম নিজের

অযোগ্যতার কথা, কখনো দুষ্ট মনের অস্থিরতার কথা। আবার মনে ভেসে উঠল তাঁর স্নেহপ্রীতির কথা। পিতা হারিয়ে পিতা পেয়েছি। জন্মদাতা জনকের অন্তর্ধানে জন্মজন্মান্তরের জনকের আশ্রয় পেয়েছি। উত্তম মধ্যম প্রহারই এই কঠিন রোগের ঔষধ, কিন্তু তা না হয়ে গুরুদেবের স্নেহের আকর্ষণ আমাকে অভিভূত করল।...

মঠে বাস করছি। অনেকে অনেক প্রশ্ন করে, আমিও একদিন বোকার মতো তাঁকে জিজ্ঞেস করে বসলাম—"আপনার প্রতি যতটা টান আছে, তার সিকির সিকিও তো ঠাকুরের প্রতি নেই। যাঁকে দেখিনি, তাঁর প্রতি ভালবাসা আসবে কি করে?" "বেশ তো, আমার ভিতর দিয়ে ঠাকুরকে ধরবার চেষ্টা কর। আমার প্রতি টান থাকলে ঠাকুরের প্রতি টান আসতে কতক্ষণ! যাতে তোর প্রেম ভক্তি বিশ্বাস বাড়ে তার জন্য ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছি। যতটা শক্তি আছে তুই করে যা তারপর তো আমি আছি। আমারই দায়িত্ব।"

আশ্রম ত্যাগ করে আমার চলে আসাটা কোন সাধুই ভাল চোখে দেখতেন না। আমার যেন কেমন কেমন লাগত! নিজের অস্থিরতায় নিজেই ধরা পড়তাম। লজ্জা, ভয়, সংকোচে আধমরা হয়ে থাকতাম। একদিন অকপটে অশ্রুপূর্ণ লোচনে মহাপুরুষজীর কাছে অপরাধ স্বীকার করলাম। কেন এমন হয়? কিরূপে বিরুদ্ধ অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায়? আশ্রমে থাকার অনুমতি পেয়েও হেলায় সুযোগ হারালাম। মনস্তাপে মরি। আমার কি গতি হবে? আমার দিকে করুণার দৃষ্টিপাত করে গুরুদেব বললেন—"ধৈর্য ধরে থাক। তুই যেখানেই থাকিস না কেন, ঠাকুরকে ধরেই তো রয়েছিস। আমি সব দেখতে পাচ্ছি, তুই নির্ভয়ে থাক।" কিছুদিন পরে সাংসারিক দায়িত্বের মোহে বাড়িতে ফিরে আসতে হলো।

* * *

আর একবার গৃহত্যাগ করার বাসনা জাগল ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে। এবার আর কাছাকাছি নয়—দূরপাল্লা ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে। ছ-মাস থাকার পর অজীর্ণরোগে ধরল। ভুগতে ভুগতে অস্থিচর্মসার। শ্রীগুরুদেবের শরণাপন্ন হলাম। তিনি উৎসাহ ও উপদেশ-বাক্যে আমায় দৃঢ় হবার জন্য লিখলেন—"সাধুজীবনের গোড়ার দিকে শরীর-মনের উপর ঝড় বয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। নূতন জায়গায় নূতন লোক, জলবায়ুও নূতন। আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো কি এত সোজা? ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা কর, তিনি তোমার মনকে শান্ত করে দেবেন, শরীর ভাল রাখবেন। আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ সতত জানবে।" গুরুদেবের আশ্বাসবাণী পেয়েও মন স্থির হলো না।

এক গভীর রাত্রে স্বপ্নে দেখলাম আমি মরে যাচ্ছি! বিদায় নেবার পালা! ঠাকুর, মা, স্বামীজী ও মহারাজের মন্দিরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে অন্যান্য পূজনীয়দের দণ্ডবৎ করলাম। গঙ্গাঘাটে নৌকা প্রস্তুত। তার মধ্যে অর্ধশায়িত অবস্থায় শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ। তিনি ইশারা করে যেন হাত ধরে নৌকায় তুলে নিলেন। আমি তাঁর পদতলে নির্জীবের মতো পড়ে রইলাম। নৌকা তীরবেগে ছুটল, দেখতে দেখতে আনন্দময় নির্জন প্রদেশে প্রবেশ করল। আরও আরও এগিয়ে চলেছে। তিনি আমায় কোলে নিয়ে বসেছেন, পাঁচবছরের শিশুর মতো আমি তাঁর কোলে। বেশ আনন্দ! জমাটবাঁধা নিস্তব্ধতার মধ্যে ঘুম ভেঙে গেল। দেহ-মনে এক অব্যক্ত আনন্দ—শিহরণ। স্বপ্নের অর্থ পরিস্ফুট হলো—অন্তর জুড়ে আমি ব্যাকুল হলাম স্বপ্নের দেবতাকে দেখবার জন্যে।

ঢাকা থেকে বেলুড় মঠে চলে এলাম। মহাপুরুষজীর ঘরে ঢুকে দেখলাম তিনি বিছানায় শুয়ে আছেন, অসুস্থ দেহ। জিজ্ঞেস করলেন—"ঢাকা থেকে এসেছিস? বেশ, বেশ। শরীরটা ভেঙে গেছে দেখছি।" "এখন একটু ভাল আছি।" "আমিও শুয়ে বসে বেশ আছি।" তাঁর পদসেবার প্রার্থনা জানালাম। বললেন—"আচ্ছা, আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দে।" আপন মনে ধীরে ধীরে শ্রীচরণের উপর হাত বুলাচ্ছি। এত আনন্দ যে বলে বুঝাবার নয়, এক অব্যক্ত আনন্দে মন ভরে গেল। শরীরে রোমাঞ্চ হলো। কোথায় আছি, কি করছি ভুলেই গেলাম!...কিছুদিন পর স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য বাড়ি ফিরে যেতে হলো।

পিতৃবিয়োগের পর সাংসারিক অনেক দায়িত্ব এসে পড়ল আমার উপর। মহাপুরুষজী সবই জানতেন। তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে আমি বাড়িতেই ব্রহ্মচারীর জীবনযাপন করে মাঝে মাঝে মঠে যাতায়াত করতে লাগলাম। কখনো কখনো মঠে কয়েক দিন বাসও করতাম। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে যেদিন শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীর last stroke (শেষ পক্ষাঘাত-আক্রমণ) হয় সেদিন আমি মঠে। stroke হবার সঙ্গে সঙ্গে ডান অঙ্গ পড়ে গেল—কথা বন্ধ হয়ে গেল। তিনি কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। মুখমণ্ডলে স্বর্গীয় আনন্দের ছবি ফুটে উঠেছিল—তিনি যেন সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন।...

* * *

১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ মহাপুরুষজীর মর্তলীলার অন্তিম বৎসর। অবশ দেহে শয্যাশায়ী অবস্থায় তিনি প্রায় এক বৎসর ছিলেন। ঐ সময়ে তিনি যেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে একাত্ম ও সমাধিস্থ হয়ে থাকতেন। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে (১৫ ফেব্রুয়ারি) শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজার দিন তিনি অপেক্ষাকৃত সুস্থ ছিলেন। তিথিপূজার দিন শত শত ভক্ত

তাঁকে দর্শন করেছিল। তিনিও তাঁর বাঁ হাতটি একটু তুলে অস্ফুটস্বরে সকলকে আশীর্বাদ করলেন এবং শক্তিপূর্ণ দৃষ্টির ভিতর দিয়ে কত লোককে কৃপা করেছিলেন! সে এক অলৌকিক ব্যাপার!

তিথিপূজার পরদিন থেকে তাঁর শরীরের অবস্থা হঠাৎ পরিবর্তিত হয়—খুব জ্বর ও শ্বাসকষ্ট। ডাক্তারদের চিকিৎসা ও অক্লান্ত সেবা চলতে থাকে, কিন্তু কোন রকমের উন্নতি দেখা গেল না। মঠবাসী ও ভক্তদের প্রাণে দারুণ উৎকণ্ঠা। পরবর্তী ১৮ ফেব্রুয়ারি সাধারণ উৎসবের দিন মহাপুরুষজীর শারীরিক অবস্থা বিশেষ সঙ্কটপূর্ণ হয়েছিল। উৎসবান্তে বৈকালে অকস্মাৎ আধঘণ্টাব্যাপী দারুণ শিলাবৃষ্টি ও জলঝড়রূপ প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেন আশু বিপদের দুঃসংবাদটি জানিয়ে দিল। ঐ শিলাবৃষ্টিতে বহু লোক আহত হয়েছিল। সব চাইতে আশ্চর্য বিষয় এই যে, শুধু বেলুড় গ্রামটির উপরেই ঐ অতর্কিত শিলাবৃষ্টি!

* * *

মহাপুরুষজীর ঐরকম অবস্থা দেখে ভগ্নপ্রাণে মঠ থেকে বাড়িতে এসে দুদিন পরে এক অপূর্ব স্বপ্ন দেখলাম! শেষরাত্রে বিছানায় বসে বসে আবিষ্টের মতো দেখলাম শ্রীঠাকুর সামনে দাঁড়িয়ে। একটু দূরে মহাপুরুষ মহারাজ। শ্রীঠাকুর মহাপুরুষজীকে ইশারা করে বললেন—"চলে আয় আমার সঙ্গে।" আমি আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠলাম—বললাম, "আমার বাবাকে কোথায় নিয়ে যাবেন?" উত্তর দিলেন—"ভয় নেই, ওরে ভয় নেই, তোকেও নেব।" হঠাৎ যেন জেগে উঠলাম। ...পরদিন সকালে সংবাদপত্রে দেখলাম—"শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজীর মহাপ্রয়াণ।" এ অকিঞ্চনের প্রতি শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের আশ্বাসবাণী ঃ "ঠাকুর সব সময় হাত ধরে রয়েছেন, আমি তো আছি; তোর ভয় কি?"—সত্যে পরিণত হয়েছে। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিত্র সঙ্ঘে পুনরায় আশ্রয় পেয়েছি এবং প্রতীক্ষা করে আছি কবে শ্রীঠাকুর ডাক দেবেন। তিনি তো বলেছিলেন—"তোকেও নেব।" তাঁর বাণী সার্থক হোক।

শিবানন্দ-স্মৃতি

জনৈক অকিঞ্চন সন্ন্যাসী-কথিত

আমি খুব অল্প বয়সে মঠে আসি। তখন আমার বয়স প্রায় ১৬।১৭ হবে। পূজ্যপাদ মহাপুরুষজীই কৃপা করে আমার দীক্ষার ব্যবস্থা করে দেন। আমার পরিচিত ঢাকা মঠের ব্রহ্মচারী ক্ষেমচৈতন্যকে তিনি বলে দেন আমাকে জানিয়ে দিতে যে, শ্রীশ্রীমায়ের শরীর তখন ভাল আছে, এলে দীক্ষা হবে। মহাপুরুষজীর সঙ্গে পূর্ব থেকেই চিঠিপত্রে আমার যোগাযোগ হয়েছিল, সেই সূত্রেই তিনি আমাকে ঐরূপ নির্দেশ দেন। তাঁর কথামত আমি বেলুড় মঠে এসে তাঁর চরণবন্দনা করতে তিনি বলেন, মায়ের বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য কেষ্টলালকে বলো, সেই তোমাকে মায়ের কাছে নিয়ে যাবে।" পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজের দেহত্যাগের ১৫ দিন পরে পূর্বোক্ত ব্যবস্থামত আমি পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমার কৃপালাভ করি। আমার তখন বয়স খুব কম ছিল বলে শ্রীশ্রীমা যদিও আমার কাছে অবগুণ্ঠনবতী ছিলেন না, তবু যেন আমি কি এক ভয়ে তাঁর কাছে বেশি কথা বলতে পারতাম না; তাই পূজ্যপাদ মহাপুরুষজীকেই প্রাণখুলে সব কথা বলতাম। আর তিনিও আমাকে অশেষ স্নেহ কৃপা করতেন। তিনিই কৃপা করে দীক্ষার কয়েক বছর পরে স্বামীজীর তিথিপূজার দিন আমাদের তিন জনকে ব্রহ্মচর্য ও দু-জনকে সন্ন্যাস দেন। এরপর নানা ঘটনাপ্রবাহ অতিক্রম করে আমাকে একবার মহাপুরুষজীর নির্দেশে বৃন্দাবন সেবাশ্রমে কর্মী হয়ে যেতে হলো।

বৃন্দাবনে আমার খুব খারাপ রকমের জলবসন্ত হয়। প্রায় প্রাণ-সংশয়ের মতো অবস্থা। কিন্তু সেবাশ্রমের সাধুকর্মীদের অক্লান্ত সেবায় ও শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় এক অলৌকিক উপায়ে সেই নিদারুণ বসন্ত-রোগ থেকে আমি সেরে উঠি। ঠিক তার পরই হঠাৎ আমার মনের মধ্যে কি এক অদ্ভুত বিপ্লব শুরু হলো! মন এতই চঞ্চল হয়ে উঠে যে, সন্ন্যাসাশ্রম যাপন করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে। অথচ বৃন্দাবনে আসার পূর্বে আমারই প্রার্থনায় পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ অশেষ করুণাপরবশ হয়ে আমাকে গৈরিক-বস্ত্র দান করে সন্ন্যাসীর মতো ভেকধারণের অনুমতি দেন। আমার এই বিভ্রান্তিকর মানসিক অবস্থায় আমি নিজেকে নেহাত অসহায় মনে করে স্থির করি সংসার আশ্রমেই ফিরে যাব। স্থানীয় সাধুরা সকলেই

আমার এরূপ মানসিক পরিবর্তনে মর্মাহত হয়ে আমাকে বহু ভাবে বোঝালেন, কিন্তু আমি তাঁদের কথা না শুনে যাত্রার সব আয়োজন করে ফেলি। মনে মনে ঠিক করি যে, বাড়ি যাবার পথে মঠে শ্রীমহাপুরুষজীকে দর্শন করে সব জানিয়ে যাব।

আমার যাত্রার সময় একজন প্রবীণ সাধু বলেন, "এইবার বুঝবো মহাপুরুষ মহারাজের আধ্যাত্মিক শক্তি, যদি তিনি তোমায় রক্ষা করতে পারেন।" যা হোক, আমি মঠে এসে প্রথমেই শ্রীমহাপুরুষজীকে দর্শন ও প্রণাম করে সঙ্গে নিয়ে আসা বৃন্দাবনের তুলসী ও রজ নিবেদন করতে তিনি তা ধারণ করে বলে ওঠেন, "বৃন্দাবনের রজ ঠাকুরেরই রজ।" তারপর বিশ্রাম করে আবার মহাপুরুষজীর সঙ্গে দেখা করে বৃন্দাবনের সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ মহারাজের দেওয়া একটি পত্র তাঁর হাতে দিই। এই পত্রে তিনি আমার মানসিক চাঞ্চল্যের আনুপূর্বিক বিবরণ দিয়েছিলেন। এই চিঠি পাঠ করেই মহাপুরুষজী রহস্য করে ইঙ্গিতে পার্শ্ববর্তী সেবককে বললেন, "কি শৈলেশ, কে দেবে?" সঙ্গে সঙ্গে আমি বলে ফেললাম, "দিয়ে ভাগ্য মনে করবে।" মহাপুরুষজী আবার হাসতে হাসতে বললেন, "পাবে তো?" শৈলেশ মহারাজও হেসে হেসে মজা করে বললেন, "পাবে।" একথা শুনে মহাপুরুষজীর এক আশ্চর্য পরিবর্তন হলো, তিনি হঠাৎ একেবারে ঝেড়েঝুড়ে সোজা হয়ে উঠে বসলেন ঃ তখন তাঁর অদ্ভুত মূর্তি দেখলাম—চোখ-মুখ আরক্তিম, যেন দারুণ তেজোময় হয়ে উঠলো, তিনি খুব জোরের সঙ্গে বলে উঠলেন, "দেখ্ লালু, তুই এখানেই কুকুরের মতো পড়ে থাক। এতে (অর্থাৎ সংসারে ফিরে গেলে) তোর মঙ্গল হবে না।" মহাপুরুষজীর শরীরের সেই অপূর্ব কান্তি দর্শন করে আর সেই গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনামাত্রই চকিতে এক অদ্ভুত ব্যাপার হয়ে গেল! আমার মনের সব কুচিন্তা নিমেষে কেমন যেন দমে গেল। আমিও বলে উঠলাম, "আপনি আশীর্বাদ করুন যেন আমার ঐসব কুভাব নষ্ট হয়ে যায়।" সঙ্গে সঙ্গে কৃপাময় মহাপুরুষজী আমার কপালে ও মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলতে লাগলেন, "সব শুকিয়ে যাবে, সব শুকিয়ে যাবে।" সেই দিব্য স্পর্শে আমার মনের সব কুভাবও ধীরে ধীরে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। মনে তখন এক অনির্বচনীয় আনন্দ। আমি তাঁর শ্রীচরণে সব নিবেদন করে নিশ্চিন্ত হলাম।

এর পরে আবার একবার আমার সাংসারিক বিপর্যয় দেখা দেয়। সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হঠাৎ অত্যন্ত পীড়িত হয়ে পড়ায়, আমার বৃদ্ধা অসহায়া মায়ের কথা মনে পড়ে, তাতে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠি এবং মনের অস্থিরতা চেপে না রেখে মহাপুরুষজীকে সব নিবেদন করি। তিনিও দুই হাত তুলে আশীর্বাদ করে

বলেন, "কোন ভয় নেই। কোন ভয় নেই, ঠাকুরের কৃপায় সে ভাল হয়ে উঠবে। তুই নিশ্চিন্ত থাক।"

সে যাত্রাও পূজ্যপাদ মহাপুরুষজীই অশেষ কৃপা করে এক বিচিত্র উপায়ে সেই ব্যক্তির রোগ নিরাময় করে আমায় সব দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করেন।...পরবর্তী জীবনে কতকটা আবদার করেই মহাপুরুষজীর কাছে আমার সন্ন্যাসের প্রার্থনা জানিয়েছিলাম, তিনিও নির্বোধ সন্তানজ্ঞানে আমার সে প্রার্থনা পূর্ণ করেছিলেন, অবশ্য তখন আমার বয়স ৩২। ৩৩ বৎসর। আমার সমস্ত জীবনে শ্রীমহাপুরুষজীর অযাচিত করুণাধারা আমাকে ধন্য করেছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের এই পার্ষদের স্নেহের কথা, কৃপার কথা এই বৃদ্ধ বয়সেও মনে করে আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হই। তিনিই কৃপা করে শ্রীচরণে আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং জাগতিক সর্ব দায় থেকে মুক্ত করে আমায় সন্ন্যাসী করেছিলেন। তাঁরই কৃপায় নেহাত অযোগ্য হয়েও পবিত্র ও মোক্ষপ্রদ সন্ন্যাস-জীবন যাপন করে নিজেকে পরম কৃতার্থ মনে করছি। শিবাবতার শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীর শ্রীচরণে অসংখ্য কোটি প্রণাম।

মহাপুরুষজীর অযাচিত কৃপাস্মরণে

(আদি-পর্ব)

স্বামী অপূর্বানন্দ

পূর্বাভাষ

১৯১৬ সালে স্বামীজীর নাম শুনে এবং তাঁর দু-খানি বই পড়ে দেশ-সেবায় আত্মনিয়োগ করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগে এবং বিপ্লবী দলে নাম লেখাই—তখন আমার বয়স ষোল বৎসর। কিন্তু ১৯১৭ সালে গোড়ার দিকে অভাবনীয় রূপে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একজন পুরানো ভক্তের মুখে শ্রীশ্রীঠাকুর এবং তাঁর একজন প্রধান অন্তরঙ্গ পার্ষদ মহাপুরুষ মহারাজের বিষয় জানতে পেরে আমার মনোগতির পরিবর্তন ঘটলো। বুঝলাম আমার জীবনের উদ্দেশ্য বিপ্লবাত্মক স্বাধীনতা-সংগ্রাম নয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, স্বামীজী এবং তাঁদের সঙ্ঘের আদর্শ বিশেষভাবে হৃদয়কে আকৃষ্ট করতে লাগল এবং মহাপুরুষ মহারাজের উপর একটা অজানা আকর্ষণ হৃদয়কে মথিত করল। তাঁকে দেখিনি; তবুও ঐ ভক্ত প্রবরের কাছে যতটা শুনেছিলাম তাতেই যেন মনে হলো তিনি আমার বড় আপনার ও পরম

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। তাঁকে চিঠি দিলাম। তাঁর স্নেহমাখা আশীর্বাদপূর্ণ উত্তর পেলাম, হৃদয় অভিভূত হলো। আবার তাঁকে লিখলাম। আবার তাঁর উৎসাহ ও উদ্দীপনাপূর্ণ উত্তর এলো। হৃদয় আশা ও আনন্দে ভরে গেল। এভাবে প্রায় দেড় বৎসর তাঁর সঙ্গে পত্রে যোগাযোগ চলেছিল।

অতঃপর নবযুগের পুণ্যপীঠ বেলুড় মঠে তাঁর দর্শন ঘটলো। মনে তাঁর যে ছবি এঁকেছিলাম দেখলাম তিনি সে ছবির চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল। এখন যত দিন যাচ্ছে ততই তাঁকে আরো বেশি মহান ও প্রেমময় মনে হচ্ছে। এইভাবে ১৯১৭ সালের গোড়ার দিক থেকে ১৯৩৪ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি দেহত্যাগের দিন পর্যন্ত এই ১৬।১৭ বৎসরের অধিককাল বিভিন্ন সময়ে বিচিত্র পরিবেশে ও ভারতের নানাস্থানে তাঁকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে পাবার সুযোগ হয়েছিল এবং ঐ সময় মহাপুরুষজীর পুণ্য সাহচর্যের মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুরের ৮ জন সন্ন্যাসী পার্ষদ ও কয়েক জন সাক্ষাৎ ভক্তপার্ষদের সঙ্গ এবং শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের দ্যুতিমান জ্যোতিষ্ক মণ্ডলের মধ্যে বাস করার সৌভাগ্য হলেও পূজ্যপাদ শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের একান্ত সেবক-সঙ্গী রূপে সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর দিনে রাত্রে বেলুড় মঠে ও বিভিন্ন স্থানে একত্র বাসের মাধ্যমে তাঁর যে স্নেহ ভালবাসা ও কৃপা পেয়েছি তা আমার জীবনে অক্ষয় সম্পদ হয়ে রয়েছে। এখন আমার মনে হয় পূর্ব পূর্ব জন্মার্জিত বহু সুকৃতির ফলে আমি ঐ দুর্লভ সুযোগের অধিকারী হয়েছিলাম এবং আমার এ ক্ষুদ্র জীবনকে নিজের হাতে গড়েপিটে সুন্দর ও নির্মল করবেন বলেই তিনি আমাকে কাছে কাছে রেখেছিলেন।

সর্বত্রই পেয়েছি তাঁকে অহৈতুকী কৃপা, স্নেহ আদর ও মমতার মূর্তবিগ্রহরূপে। কত ত্রুটি বিচ্যুতি হয়েছে, কিন্তু তিনি কখনো কোন অপরাধ নেন নি, তাঁর কাছে সব সময় পেয়েছি মায়ের স্নেহ। মহাপুরুষ মহারাজের দয়ায় শ্রীশ্রীমার নিকট মন্ত্রদীক্ষালাভ ঘটেছিল। তিনিই চিঠি লিখে আমাকে মায়ের কাছে পাঠিয়েছিলেন। তিনি নিজে আমাকে ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস ব্রতে দীক্ষিত করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণময়-জীবন মহাপুরুষ মহারাজের জ্ঞান-বৈরাগ্য-প্রেম-ভক্তিময় সমুন্নত ব্যক্তিত্বের স্মৃতি আমার ধ্যানলোকে চিরসমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। যত দিন যাচ্ছে ততই তিনি অন্তরতম হয়ে যাচ্ছেন। তাঁর স্মৃতি ভাষায় বর্ণনা করা আমার মতো ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে সম্ভবপর নয়; তবুও শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের ভক্তমণ্ডলীর জন্য ঠাকুরের এই পরমপ্রিয় অন্তরঙ্গ পার্ষদের সামান্য দু-চারটি স্মৃতিকথা যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ করে নিজে ধন্য হতে চাই।

মহাপুরুষের ক্ষণিক সঙ্গও ভক্তের জীবনে পরম সম্পদ। এই স্মৃতিচারণের

মাধ্যমে আমরা অনেক ক্ষেত্রেই মহাপুরুষজীকে এককরূপে পাই না; তাঁকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পরিকরদের সঙ্গেই পাই। তাই স্মৃতি-সংলাপের সঙ্গে মন চলে যায় একটা জ্যোতির্মণ্ডলে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর পার্ষদ-মণ্ডলীর চরণ তলে। এই স্মৃতি-চারণের মাধ্যমে শ্রীমহাপুরুষজীর স্পর্শ যতটা পাই তেমনি আরো নিবিড়ভাবে পেয়ে ধন্য হই শ্রীশ্রীঠাকুর ও তাঁর পরিকরদের দিব্যজীবনের জ্যোতির্ময় স্পর্শ। তখন মনে হয় আমি ঐ পরিমণ্ডলের মধ্যেই বাস করছি—ঐ জ্যোতির্মণ্ডলেরই একাংশ।...শেষের দিকে মহাপুরুষজীকে একাধিকবার বলতে শুনেছি—"আমরা দেহত্যাগ করে রামকৃষ্ণলোকে যাব। সেখানে ঠাকুর মা স্বামীজী মহারাজ বাবুরাম মহারাজ প্রভৃতির সঙ্গে থাকব।...ঠাকুর রামকৃষ্ণলোক সৃষ্টি করেছেন।... আমরা ঠাকুরের মধ্যেই থাকব—তাঁকে ডাকলেই আমাদের ডাকা হবে।"

* * *

১৯১৮ সনটি আমার জীবনে এক মহাপুণ্যক্ষণ বহন করে এনেছিল। ঐ বৎসরই আমি প্রথম, বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ পুণ্যপীঠ বেলুড় মঠ দর্শন করি এবং মহাপুরুষ মহারাজ, খোকা মহারাজ প্রভৃতির সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হয়। পরে বাগবাজারে মায়ের বাড়িতে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন ও তাঁর স্নেহাশীর্বাদ লাভ, স্বামী সারদানন্দ মহারাজের দর্শন এবং বলরাম-মন্দিরে শ্রীরাজা মহারাজ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজের পদধূলি ও আশীর্বাদ পেয়ে ধন্য হই। শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনাপূত সিদ্ধপীঠ দক্ষিণেশ্বরের পুণ্যধূলির স্পর্শলাভের সৌভাগ্যও ঐ বৎসরই হয়েছিল।

কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার কয়েকদিন পরে প্রথম বেলুড় মঠে যাই এবং ঐ মহাতীর্থে সাধু-মহাপুরুষদের পবিত্র সঙ্গে ৮। ১০ দিন বাসের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-আত্মগোষ্ঠীর অফুরন্ত কৃপালাভ আমার জীবনে অক্ষয় আধ্যাত্মিক সম্পদ ও স্মৃতি এবং সমগ্র জীবনের একমাত্র ধৃতি হয়ে রয়েছে। বেলুড়মঠ-দর্শনেরও একটু ইতিহাস আছে। আমি একবার স্বপ্নে বেলুড় মঠ ও মহাপুরুষ মহারাজকে দেখি। ঐ স্বপ্নের কথা পত্রে মহাপুরুষজীকে জানিয়ে বেলুড় মঠ-দর্শনের অনুমতি প্রার্থনা করি। তা তিনি দিয়েছিলেন। ঐ আদেশ-পত্রখানি সম্বল করে বেলুড় মঠাভিমুখে যাত্রা করেছিলাম।*

---

* পরবর্তী কালে মহাপুরুষজীর মুখে একাধিকবার শুনেছি—যে দেবস্বপ্ন সত্য এবং তার ফল কৈবল্য মুক্তি। আমার ধর্ম জীবনের প্রথমেই তার সত্যতা প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ দৈব ইচ্ছায় হয়েছিল। শ্রীশ্রীসারদাদেবী আমার অন্তর জীবনে প্রবিষ্ট হন তাঁকে চর্মচক্ষে বা পটমূর্তিতে দর্শন করার পূর্বেই। —সংকলক

সকাল প্রায় ৭টা নাগাদ বাগবাজার থেকে চলতি নৌকায় বেলুড় মঠে পৌঁছে সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলায় শ্রীঠাকুর ঘরে প্রণাম করতেই সমগ্র মন-প্রাণ আনন্দে ভরে গেল। মন্দিরের শান্ত পরিবেশ, দিব্য পবিত্র গন্ধ—পটমূর্তিরূপে শ্রীঠাকুর যেন জীবন্ত বসে আছেন কৃপামূর্তিতে—এসবের প্রভাবে মুগ্ধ হয়ে অবশের মতো বসে রইলাম। করুণাবতার শ্রীঠাকুরকে দেখেই অভিভূত। তিনি যেন জগতের সকল গাম্ভীর্য পরিপূর্ণতা ও আনন্দ নিয়ে বসে আছেন। তখনো মন্দিরের পূজাদি আরম্ভ হয়নি। পূজার আয়োজন চলছিল।

খানিক পরে উঠানে নেমে এসে জনৈক সন্ন্যাসীকে মহাপুরুষজীর দর্শনের প্রার্থনা জানাতে তিনি আমায় নিয়ে গেলেন মহাপুরুষজীর ঘরে। মঠবাড়ির সিঁড়ি দিয়ে উপরে যেতেই এক দিব্যকান্তি শান্তদর্শন প্রবীণ সন্ন্যাসীকে দেখেই মন বলে দিল ইনিই তো আমার স্বপ্নদৃষ্ট দীর্ঘকালবাঞ্ছিত মহাপুরুষ মহারাজ! সন্ন্যাসী আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি চেয়ারে বসেছিলেন তাঁর তক্তপোশের উত্তরদিকে স্বল্পপরিসর স্থানে। সস্নেহে আমার দিকে তাকালেন—কৃপা ও করুণা যেন ঝরে পড়ছে ঐ চাহনিতে। আমি অভিভূতের মতো তাঁর চরণে প্রণত হলাম। কাপড়ের চটিসমেত তাঁর পায়ে মাথা রেখে চিরতরে আত্মনিবেদন করলাম। এবং মাথা তুলে করজোড়ে তাঁর কাছে দীক্ষা-কৃপা প্রার্থনা করে আশীর্বাদ করতে বললাম। তাঁর পাশের টুলের উপর রক্ষিত ছোট রেকাবি থেকে একটি ছোট্ট সন্দেশ আমার হাতে দিয়ে তিনি আমায় শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ খেতে বললেন, এবং তাঁর দুটি হাত আমার মাথায় রেখে চোখবুজে খুব আশীর্বাদ করলেন। তাঁর শক্তিপূর্ণ স্পর্শে আমার অন্তর এক অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে গেল! সব শরীর কাঁপতে লাগল—আমি যেন আবিষ্টের মতো হয়ে গেলাম—নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কান্না পেল! আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলাম তিনি সকরুণ স্নেহপূর্ণ স্বরে আমায় সান্ত্বনা দিতে দিতে বললেন, "কেঁদো না, বাবা—তোমার উপর শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপা হয়েছে। খুব কল্যাণ হবে। আমি বলছি তোমার কল্যাণ হবে।...শ্রীশ্রীঠাকুরই হলেন জগদ্‌গুরু—তিনিই তোমার গুরু। আমি তো কাউকে দীক্ষা দেইনে।"...

তাঁর কণ্ঠস্বর এমন মমতা ও স্নেহকরুণার্দ্র ছিল, এবং তিনি এমন তন্ময়তার সঙ্গে কথা কটি বলছিলেন যে, তা শুনে আমার মন শান্ত হলো। মনে হলো—তিনি ঠিকই বলেছেন, তাঁর কথা আমি বিশ্বাস করে নিলাম এবং বললাম—"খুব আশা করে এসেছিলাম, আপনার কাছে দীক্ষা নেবার জন্য। অনেক ভেবেচিন্তে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে আপনাকে মনে মনে গুরু করেছি।"

তিনি বললেন, "ঠাকুরই তোমার গুরু, তুমি পতিতপাবন রামকৃষ্ণ-নাম জপ

কর, এতেই তোমার কল্যাণ হবে। পরে যদি দীক্ষার প্রয়োজন হয়, সে ব্যবস্থাও তিনিই করে দেবেন।”...

মহাপুরুষজী ঐ সময় ঠাকুরঘর থেকে সবেমাত্র এসে বসেছিলেন। বাল্যভোগের প্রসাদ তাঁর সামনে ছিল, তা থেকে আমাকে আগেই প্রসাদ দিয়েছিলেন। এখন তিনি ঐ প্রসাদী সন্দেশটুকু খেয়ে একটু জল খেলেন এবং তামাক খেতে লাগলেন। ততক্ষণে মঠের অন্যান্য সাধু-ব্রহ্মচারীরা একে একে তাঁকে প্রণাম করতে এলেন। নানা কথাবার্তা হতে লাগল। আমি এক পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখছিলাম—খুবই আপনার জন বলে মনে হচ্ছিল। তিনিও আমায় এক একবার দেখছিলেন।...

ঐবার মঠে ৮।১০ দিন ছিলাম। রোজই সকাল-সন্ধ্যায় তাঁকে দর্শন ও প্রণাম করতাম। তিনিও প্রণাম গ্রহণ করতেন, চোখবুজে আশীর্বাদ করতেন। দুপুরে সাধারণ পঙ্গতেই বসে খেতেন—সান্ধ্য-আরাত্রিকের সময় তিনিও মন্দিরে ভিতরকার দরজার কাছে বসতেন, সকলের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাত্রিক ও স্তবাদি গাইতেন। রাত্রে খাবার পূর্বে অভ্যাগত-কক্ষে সাধুরা ভজন গান করতেন—কোন কোন দিন তিনিও এসে বসতেন। এভাবে রোজই বহু বার তাঁর দর্শন পেতাম এবং তাঁর মুখে অনেক উপদেশও শুনেছি; কিন্তু সেসব ধারণা করার মতো আমার শক্তি ছিল না।

অনেক সময় মহাপুরুষজী নিচে নেমে মঠের নানা কাজকর্ম দেখাশুনা করতেন—তখন দূর থেকে তাঁকে দর্শন করার সুযোগ হতো। তিনি যেন মঠের সর্বত্র। মঠের পবিত্র পরিবেশে গঙ্গার পশ্চিমতীরে মহাজনদের সঙ্গে বাস খুবই আনন্দের হয়েছিল। মনে হতো এই ঠিক ঠিক সাধুসঙ্গে তীর্থবাস। সাধুদের মুখে ধর্মপ্রসঙ্গ শুনেও খুব আনন্দ হতো।...

দু-তিন দিন মঠে থাকার পরে একদিন সকালে অন্যান্য সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে যথারীতি মহাপুরুষজীকে প্রণাম করতে গিয়েছি, তিনি নিজেই শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর কথা তুলে বললেন, “তুমি তো মাকে দেখনি। তোমার মহাভাগ্য যে এ সময় শ্রীশ্রীমা বাগবাজারে উদ্বোধনে আছেন—তাঁকে দর্শন করতে যেও। সেখানে শরৎ মহারাজও আছেন, তাঁকেও প্রণাম কর। বলরাম-মন্দিরে মহারাজ, হরি মহারাজ রয়েছেন, তাঁদের দর্শন করবে।” এই বলে পরদিন সকালে যাবার নির্দেশ দিলেন। তিনি আরো বললেন, “উদ্বোধনে গিয়ে শরৎ মহারাজকে, আর বলরাম-মন্দিরে মহারাজ ও হরি মহারাজকে দর্শন করে বলবে যে, আমি তোমাকে মঠ থেকে পাঠিয়েছি।”...

পরদিন সকালবেলা একখানি চলতি নৌকায় বাগবাজারের দিকে রওনা হলাম।

বাগবাজারে নৌকা থেকে নেমে জিজ্ঞেস করে যখন উদ্বোধনের মায়ের বাড়ির সামনে পৌঁছলাম, তখন দেখি যে একখানি ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আমি পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘোড়ার গাড়িটি চলে গেল। উদ্বোধন বাড়িতে প্রবেশ করে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনের কথা জানাতেই একজন সাধু বললেন, "শ্রীমা এইমাত্র ঘোড়ার গাড়িতে বেরিয়ে গেলেন। তিনি বলরাম-মন্দিরে গিয়েছেন। এ বেলা তাঁর দর্শন হবে না। বিকালে মহিলা-ভক্তদের দর্শনের সময়। অতএব আগামী কাল সকালে ছাড়া মায়ের দর্শন অসম্ভব।"

মায়ের দর্শন হবে না শুনে মনটা খুব দমে গেল। পূজনীয় সারদানন্দ স্বামীর দর্শনের কথা জিজ্ঞেস করতে ঐ সাধুজী বললেন যে, তিনি গঙ্গাস্নানে গিয়েছেন, ফিরে এলে দর্শন হবে। সাধুজীর সঙ্গে অফিসের দক্ষিণ দিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা বলছি, ঠিক তখনই একজন স্থূলকায় প্রবীণ সাধু ভিজা গামছা পরা—কাঁধে পাটকরা ভিজা কাপড় ও হাতে গঙ্গাজলের ঘটি—উদ্বোধনের ভিতরে এলেন। সাধুজী ইঙ্গিতে জানালেন যে, ইনিই সারদানন্দ মহারাজ! আমি প্রণাম করতে যাচ্ছি—তখন তিনি গম্ভীরস্বরে বললেন—"দাঁড়াও, আগে পা-টা ধুয়ে নিই।" এই বলে তিনি উঠানের কলে পা ধুয়ে বারান্দায় দাঁড়াতেই তাঁকে প্রণাম করলাম ও শ্রীমায়ের দর্শনের ইচ্ছা জানালাম। তিনি সব শুনে ঐ কথাই বললেন যে, শ্রীমায়ের দর্শন সেদিন সম্ভব নয়। পরদিন সকালে তাঁর দর্শন হতে পারে—এ ভরসাও তিনি দিলেন।...তখন উদ্বোধনে আরো দু একজন সাধুকে প্রণাম করে বলরাম-মন্দিরে রাজা মহারাজ ও হরি মহারাজকে দর্শন করতে রওনা হলাম। বলরাম-মন্দিরে প্রবেশ করে একজনকে জিজ্ঞেস করতেই জানা গেল যে, স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ থাকেন উপরে এবং স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজ নিচের তলায় ঢুকতেই পাশের ঘরে। সিঁড়ি দিয়ে উপরে যেতেই দেখা গেল বারান্দায় একখানি বেঞ্চিতে তিনজন ভক্ত বসে আছেন—মহারাজের দর্শনপ্রার্থী হয়ে। ডানদিকের একটি ঘরে মহারাজ থাকেন, আমিও ভক্তদের সঙ্গে বসে মহারাজের দর্শনের প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। আধঘণ্টার মধ্যেই সামনের হলঘরের ভিতর থেকে শ্রীরাজামহারাজ বারান্দায় এসে পায়চারি করতে লাগলেন, মহারাজকে দেখেই ভক্তি ও শ্রদ্ধায় অন্তর ভরে গেল—মনে মনে তাঁকে প্রণাম করলাম। কি সৌম্যদর্শন! সুন্দর, উজ্জ্বল হেমবর্ণ; পরিধানের গৈরিকের সঙ্গে তাঁর শরীরের রঙ মিলে গিয়েছিল। কমনীয় উন্নত বলিষ্ঠ দেহ—দিব্যকান্তি—যেন কোন দেবতা। তিনি বেড়াচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁর ঊর্ধ্বদৃষ্টি ও অন্তর্মুখভাব দেখে মনে হচ্ছিল যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন। আমরা যে বেঞ্চিতে বসেছিলাম তার সামনে দিয়েও তিনি কয়েকবার ঘুরে গেলেন, কিন্তু ঐ গাম্ভীর্য ভঙ্গ করে সে সময় কেউই তাঁকে প্রণাম করল না। আমরা জড়সড়

হয়ে হাতজোড় করে দাঁড়িয়েছিলাম। এভাবে খানিকক্ষণ বেড়িয়ে দক্ষিণদিকের বারান্দায় তিনি দাঁড়ালেন, আমাদের দিকে মুখ করে। তখন ভক্তেরা একে একে প্রণাম করতে এগিয়ে গেলেন—তিনি স্থিরভাবে সকলের প্রণাম গ্রহণ করলেন, কিন্তু কারো সঙ্গে কোন কথা বললেন না—তাঁর মৌন অবস্থিতিই পরম আশীর্বাদ মনে হলো। শেষটায় আমি নত হয়ে ভূমিতে প্রণাম করে তাঁর পাদস্পর্শ করলাম। (অবশ্য তাঁর পায়ে চটিজুতা ছিল) এবং দাঁড়িয়ে বললাম, "বেলুড় মঠ থেকে এসেছি, মহাপুরুষ মহারাজ আমায় পাঠিয়েছেন আপনাকে প্রণাম করতে।" তিনি খুশি হয়ে বললেন—"ও! তারকদা পাঠিয়েছেন? তিনি কেমন আছেন? মঠের আর সব ভাল তো?" ইত্যাদি।

মহাপুরুষ মহারাজ ভাল আছেন এবং মঠের কুশল বললাম। ঐটুকুই মাত্র কথা। তাঁর কণ্ঠস্বর এমন মধুর ও মমতামাখা যে, ঐ দুটি কথাতেই আমার প্রাণ ভরে গেল! শ্রীঠাকুরের দর্শন তো ভাগ্যে ঘটেনি—কিন্তু তাঁর মানসপুত্রকে স্থূলশরীরে প্রসন্নমূর্তিতে দেখে মনে এক অব্যক্ত আনন্দের দোলা এসেছিল। একটু পরেই তিনি হলঘরে ঢুকে পড়লেন—তাকিয়ে রইলাম মুগ্ধনেত্রে ঐ দেবমানবের দিকে।...

নিচে নেমে পূজনীয় হরি মহারাজের দর্শনের খোঁজ করতে তাঁর সেবক মহারাজ বললেন যে, সন্ধ্যার পরে তাঁর দর্শন হবে—এবেলা নয়। শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন পাইনি তাতে মনটি বেদনাভারাক্রান্ত ছিল—হরি মহারাজের দর্শনও পেলাম না। অশান্ত প্রাণে বাগবাজারে এক ভক্তগৃহে ফিরে এলাম এবং ব্যাকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম সন্ধ্যাগমনের।...

সন্ধ্যার পরে বলরাম-মন্দিরে ঢুকেই ডানপাশে হরি মহারাজ যে ঘরে ছিলেন তার সামনেই সেবক মহারাজের সঙ্গে দেখা হলো। যদিও আমি তখনও সাধুদের দেখলেই প্রণাম করতে হয়—ঐ শিষ্টাচার বা শ্রদ্ধা অর্জন করিনি এবং সেবক মহারাজকে প্রণামও করিনি, তবু তিনি কিন্তু একটু পরেই দর্শনের ব্যবস্থা করে দিলেন। যতক্ষণ দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিলাম, শুনতে পেলাম পূজনীয় হরি মহারাজ নিম্নস্বরে বিপ্লবীদের সম্বন্ধে কথাবার্তা বলছেন এবং যাদের সঙ্গে কথা হচ্ছিল তারাও যেন গুপ্ত বিপ্লবী। সেবক মহারাজ যখন আমাকে ঘরের ভিতর নিয়ে গেলেন তখন পূজনীয় হরি মহারাজ দেয়ালের পাশে একখানি চেয়ারে উপবিষ্ট ছিলেন এবং মেজেতে তাঁর পায়ের কাছে ভদ্রবেশী দুজন যুবক—কলেজের উচ্চবর্গের ছাত্র বলে মনে হলো। আমাকে দেখেই যুবকরা বললেন, "তবে আমরা আজ আসি—পরে কোনদিন এসে আপনার সঙ্গে কথা বলব।" এই বলে প্রণাম করে তাঁরা চলে গেলেন। আমি তখন ভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে পূজনীয় হরি মহারাজকে প্রণাম

করলাম—তাঁর পা দুখানি একটু ফুলুফুলু গোলাপী রঙ-এর একটি রবারের বয়ার মতো কুশনের উপর। আমি তাঁর পাদস্পর্শ করে প্রণাম করলাম। তিনি আমায় পাশের ছোট বেঞ্চিতে বসতে বললেন এবং প্রথমেই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কোন secret anarchist partyতে (গুপ্ত রাজদ্রোহী দলে) আছ কি?" এ প্রশ্নের জন্য আমি আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না। আমার মনের উপর দিয়ে বিদ্যুতের মতো এক চিন্তাতরঙ্গ খেলে গেল। সত্য কথা বলব কি মিথ্যা বলব! সঙ্গে সঙ্গেই মনে হলো—ইনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একজন অন্তরঙ্গ পার্ষদ-সন্ন্যাসী—ইনি নিশ্চয়ই আমার জীবনের কোন ক্ষতি করবেন না। এ চিন্তা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমি মাথা নিচু করে বললাম—"হাঁ মহারাজ, আমি রাজদ্রোহী গুপ্ত সমিতির একজন সভ্য।" তিনি আমার জবাবে খুশি হলেন মনে হলো এবং স্মিতমুখে তখনই জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের সমিতির নিয়মানুসারে সমিতির সভ্য ছাড়া অন্যের কাছে নিজেদের গুপ্ত পরিচয় প্রকাশ করা তো নিষেধ আছে! তা তুমি আমার কাছে স্বীকৃতি প্রকাশ কেন করলে?" আমি বললাম, "সমিতির এই নিয়ম আত্মরক্ষার জন্য। গুপ্ত সমিতির ঐ প্রতিজ্ঞা—সমিতির কার্যকলাপ ও সভ্যদের গোপন রাখার জন্য এবং ঐ প্রতিজ্ঞা সভ্যরা প্রাণের বিনিময়েও পালন করে। কিন্তু আমি এমন একজনের কাছে ঐ প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করেছি, যিনি ঐ সমিতি বা আমার জীবমের কোন ক্ষতি করবেন না। তাছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একজন সন্ন্যাসী পার্ষদের কাছে মিথ্যাকথা বলতে আমার ইচ্ছা হলো না। তাতে ফল যাই হোক।" তিনি আমার কথায় খুব আনন্দিত হয়ে পাশের বেঞ্চিতে বসিয়ে সস্নেহে নানাকথা বলতে লাগলেন। শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন পাইনি, তাতে মনটা খুবই খারাপ ছিল। সে কথার উত্তরে তিনি মমতাভরা স্বরে বললেন—"মায়ের দর্শন কি সোজা কথা? তিনি তোমার অন্তরে ব্যাকুলতা বাড়াবার জন্য আজ দর্শন দেননি। পরে তাঁর দর্শন পাবে। সেজন্য দুঃখ করো না। তোমার মনে তাঁর অভাববোধ আরো বাড়লে ঠিক সময়ে তিনি দর্শন দেবেন। খুব কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা কর। তিনি প্রসন্না হয়ে অবশ্যই দর্শন দেবেন।" এভাবে অনেক সান্ত্বনা দিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনের পেছনে যে এত কথা আছে, এত প্রস্তুতির প্রয়োজন—তা আমার ধারণা ছিল না। তাঁর কথায় মনটা শান্ত হলো।

আমি তাঁর খুব কাছেই বেঞ্চিতে বসেছিলাম। তিনি একথা-সেকথার পরে আমায় বললেন, "দেখি, তোমার হাত দেখি।" আমি মনে করেছিলাম তিনি জ্যোতিষীদের মতো আমার হাতের রেখা ইত্যাদি দেখবেন—তাই তাঁর সামনে হাত বাড়িয়ে দিলাম। তিনি কিন্তু আমার হাতটি আরো টেনে নিয়ে নিজের ডানহাতের উপর রেখে "তোমার হাতের ওজন দেখছি" বলে আমার ডানহাতটি বারবার যেন ওজন

করতে লাগলেন। তাঁর স্পর্শে আমার মনে একটা বিশেষ ভাবান্তর এল এবং আনন্দও হচ্ছিল। তিনি খানিকক্ষণ আমার হাত বারবার তুলে ওজন দেখতে লাগলেন এবং বললেন, "তোমার হবে। হাত ভারী নয়। আমরা হাতের ওজন দেখে বুঝতে পারি কে কেমন লোক—ঠাকুর আমাদের এসব শিখিয়ে দিয়েছেন।"

আমি কি আর জবাব দেব কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। শুধু অবাক হয়ে তাঁর সহানুভূতিপূর্ণ মিষ্টিকথাগুলি শুনছিলাম। ঠিক এমন সময় সেবক মহারাজ ঘরে ঢুকে একটি সবুজ বাতি জ্বেলে দিয়ে উজ্জ্বল আলোটি নিবিয়ে দিলেন। তিনিও সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঠোঁটে একটি আঙ্গুল রেখে বললেন—"আমায় আর কথা বলতে বারণ কচ্ছে, তুমি এখন এসো।" আমি তাঁকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

* * *

পরদিন সকালবেলা শ্রীমায়ের দর্শনে গেলাম, কিন্তু দর্শন হলো না। সাধু মহারাজরা বললেন যে, সেদিন সকালে বিশেষ কারণে পুরুষ ভক্তদের দর্শন হবে না। আগামী দিন সকালে আসতে বললেন। তখন বলরাম-মন্দিরে গেলাম, পূজনীয় মহারাজ ও হরি মহারাজের দর্শনে, তাও হলো না। সন্ধ্যায় পুনরায় ভগ্ন প্রাণটি নিয়ে এলাম বলরাম-মন্দিরে, হরি মহারাজের দর্শনে। তিনি সস্নেহে গ্রহণ করলেন, অনেক সহানুভূতি দেখালেন। তাঁর স্নেহমমতায় প্রাণ দ্রবীভূত হলো—অশ্রুরূপে প্রকাশ পেল প্রাণের আবেগ। তিনি খুব প্রার্থনা করতে বললেন। মনের ব্যাকুলতা বাড়ার কথা বলতে বলতে আমার মুখে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন—স্নেহময়ী মায়ের স্পর্শ ছিল তাতে। তিনি এত করুণা দেখালেন যে, তাঁর মুখের দিকে তাকাতেই আমার কান্না পেত। আহা! তিনি কত দরদী! আমার প্রাণের বেদনা-ভার তিনি নিজের মধ্যে টেনে নিয়ে তা লঘু করে দিলেন। অনেকক্ষণ তাঁর কাছে বসে তাঁর স্নেহে আপ্লুতপ্রাণে তাঁর চরণে মাথা রেখে প্রণাম করে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিদায় নিলাম। রাত্রে প্রাণের অস্থিরতায় ঘুম হলো না।...

ভোরবেলা গঙ্গাস্নান করে ভক্তটির ঠাকুরঘরে একটু বসেছি ধ্যান প্রার্থনা করার জন্য। অল্পক্ষণের মধ্যেই ধ্যানে এক অলৌকিক দর্শন লাভ হয়ে গেল।...আনন্দ ও বিস্ময়ে বাহ্যজ্ঞানহারা হয়ে অনেকক্ষণ আসনে বসেছিলাম। আসন থেকে যখন উঠলাম তখন ৬-৩০ বেজে গিয়েছে—আমিও ঐ দর্শনের কথা ভাবতে ভাবতে আশাভরা প্রাণে মায়ের বাড়ির দিকে রওনা হলাম।...

উদ্বোধন বাড়িতে পৌঁছে দেখি ততক্ষণে পনেরো-বিশ জন ভক্ত শ্রীশ্রীমায়ের

দর্শনপ্রার্থী হয়ে অপেক্ষা করছেন। জানা গেল যে, মায়ের দর্শন হবে। আনন্দে অধীর হয়ে গেলাম। সাড়ে সাতটার পরে একজন মহারাজ একটি বড় রেকাবিতে শালপাতায় সাজানো প্রসাদ নিয়ে এসে সকলের হাতে হাতে দিয়ে বললেন, "মা প্রসাদ পাঠিয়েছেন; প্রসাদ খেয়ে অপেক্ষা করুন। মায়ের দর্শনের জন্য ডাকা হলে সকলে দর্শন করতে যাবেন।" তিনি আরো বললেন যে, মা নিজের হাতে প্রসাদ সাজিয়ে ভক্তদের জন্য পাঠিয়েছেন। ঐ প্রসাদ খেতে খেতে খুব আনন্দ হলো। মা প্রসন্ন হয়ে নিজের হাতে প্রসাদ পাঠিয়েছেন! এর চাইতে বড় প্রাপ্তি আর কি হতে পারে? ঐ প্রসাদে ছিল শ্রীমায়ের আশীর্বাদ, পুণ্যস্পর্শ—তাঁর স্নেহ, মমতা।...

আমার সঙ্গে কোন ভক্তেরই পরিচয় ছিল না—তাই নীরবে অধীর-প্রাণে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ভক্তরা বলাবলি করতে লাগলেন—মা পুরুষভক্তদের সঙ্গে কথা বলেন না ইত্যাদি। আমি নতুন গিয়েছি, এসব কিছুই জানিনে। তাই সব শুনে যাচ্ছি। মনে একমাত্র আকাঙ্ক্ষা—আহা! মা যদি আমার সঙ্গে একটু কথা বলেন! আমি তো মা বলে ডাকব, তিনি কি সাড়া দেবেন না! একটা কথাও বলবেন না! মন এ চিন্তায় যেন শতধা বিখণ্ডিত হচ্ছিল। এমন সময় দেখলাম ভক্তদের মধ্যে সাড়া পড়ে গিয়েছে। উপরে উঠবার সিঁড়ি দিয়ে চলেছেন সবাই সারিবদ্ধ হয়ে। সিঁড়ি পর্যন্ত সকলে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি সকলের পেছনে পড়ে গেলাম। সকলের শেষে আমি প্রণাম করব। শেষটায় আবার ভয় হলো—মা যদি ততক্ষণে চলে যান, যদি প্রণাম করতে না পাই! কিন্তু তখন আর এগিয়ে গিয়ে অন্যরকম কিছু করার উপায় ছিল না। ঐ লাইনে সকলের পেছনে চুপচাপ প্রার্থনারত হয়ে দাঁড়িয়ে মার কথা চিন্তা করতে লাগলাম। ভোরবেলার ধ্যানের চিত্রটি অন্তরে আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।...

ভক্তগণ সিঁড়ি দিয়ে এগিয়ে চলেছেন শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করতে, আমিও অনুসরণ করে চলেছি। ক্রমে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে দেখা গেল একটি ঘরের দরজার সামনে এক একজন ভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করছেন এবং অন্য দিক দিয়ে নেমে যাচ্ছেন। এগিয়ে চলেছি—আমার পেছনে আর কেউ নেই। ঘরের দরজার সামনে প্রণামের স্থানে এসে দেখি শ্রীমা আপাদমস্তক একখানি গরদের সাদা চাদর মুড়ি দিয়ে অবগুণ্ঠিতা হয়ে বসে আছেন—মায়ের পা-ও দেখা যায় না—সবই ঢাকা। মনটা দমে গেল—অপেক্ষা করার সময় ছিল না। আমিও নতজানু হয়ে ভূমিতে ঐ বস্ত্রাবৃতা মায়ের সামনে মাথা রেখে প্রণাম করলাম—হয়তো ৩০।৪০ সেকেণ্ড বা এক মিনিট মাথা নিচু করে ছিলাম—চোখ জল-ভরা। মাথা তুলেই দেখি মা চাদরটি সরিয়ে দিয়েছেন, মুখেও অবগুণ্ঠন নেই। সস্নেহে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে।

আনন্দে বিহ্বল হয়ে গেলাম। তাঁর পাদস্পর্শ করবার জন্য হাত বাড়াতেই মা স্মিতমুখে আমার মুখে হাত বুলিয়ে চোখের জল মুছে দিলেন এবং আমার চিবুক ধরে চুমু খেলেন। আর মধুরস্বরে জিজ্ঞেস করলেন—"বাবা! প্রসাদ খেয়েছ?" আমি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু বললাম—"হাঁ মা, খেয়েছি।" ব্যস, এই দুটি মাত্র কথা! মায়ের স্নেহস্পর্শে, মধুর বচনে অন্তর ভরে গিয়েছিল—আমি অবাক হয়ে শুধু দেখছিলাম মাকে—ভোরবেলায় ধ্যানের সময় এঁকেই তো দর্শন করেছিলাম, সেই সরু লালপেড়ে কাপড়খানি পরা মাতৃমূর্তি আমাকে কোলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে সর্বাঙ্গে চুম্বন ও স্পর্শ দিয়ে হাত বুলিয়ে কত ভাবে আদর করছিলেন! সবই স্বপ্নবৎ মনে হচ্ছিল। ইচ্ছা হলো মাকে জিজ্ঞেস করি—কিন্তু তা করিনি। ঐ জিজ্ঞাসাটিই আমার জীবনে গত পঞ্চাশ বছর ধরে নানাভাবে নানা দিব্য-অনুভূতিতে রূপায়িত হচ্ছে। ধ্যানে যিনি ধরা দিয়েছিলেন, তিনি এখন আর শুধু ধ্যানের বস্তু নন—সকল ব্যাপ্তিতে, সকল প্রাপ্তিতে তিনি আমার অন্তর-বাইরে জুড়ে রয়েছেন। সকল আনন্দের মূল উৎসরূপে, সকল শুভ প্রচেষ্টার প্রেরণারূপে, প্রত্যেকটি শ্বাসপ্রশ্বাসে অযাচিতভাবে পাশে পাশে থেকে আমার হাত ধরে নিয়ে চলেছেন চিরসাথীরূপে। "মা-ই" যে ধ্যানে দর্শন দিয়েছিলেন তা এখন আর প্রশ্ন করে জানবার প্রয়োজন নেই। মাকে আর একবার প্রণাম করে বিদায় নিলাম। তাঁর মধুর সেই স্বরটি প্রাণে ধ্বনিত হচ্ছিল—"বাবা, প্রসাদ খেয়েছ?" আর কেবলই মনে হচ্ছিল, "সদানন্দ সুখে ভাসে, শ্যামা যদি ফিরে চায়।" তিনি শুধু সস্নেহে আমার দিকে তাকিয়ে—তাঁর স্নেহস্পর্শ দিয়ে আমার কাঙাল প্রাণকে পূর্ণ করেছেন।...

সেখানে তখন আর কেউ ছিল না, মা আর আমি। মাকে এত কাছে পেয়েছিলাম, মনে হচ্ছিল তাঁর কোলেই যেন বসে আছি। একটু এগিয়ে গিয়ে ফিরে চেয়ে দেখি মা তখনও বসে আছেন—আমার দিকে সস্নেহে তাকিয়ে। তিনি দৃষ্টির ভিতর দিয়ে আমায় অনুসরণ করছেন। আমার সঙ্গে সঙ্গে চলেছেন। আমিই দূরে সরে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তিনি অনুসরণ করছিলেন আমাকে। আমি কি তাঁর দৃষ্টির বাইরে যেতে পারি? এত বৎসর পরে এখন ঠিক জেনেছি, বুঝেছি—আমি যত দূরেই যাই না কেন, তাঁর দৃষ্টিরেখার বাইরে যেতে পারিনে। তিনি তাঁর কৃপাদৃষ্টির গণ্ডির মধ্যে আমাকে সযত্নে রক্ষা করছেন।...

নেমে এসে প্রথমেই মনে হলো, আমার ঐ সৌভাগ্যের সমাচারটি ছুটে গিয়ে আগে পূজনীয় হরি মহারাজকে দেব। তখন বেলা ৮-৩০মিঃ। তাঁর সঙ্গে দেখা হবে কিনা সে এক কথা। তা ছাড়া সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হলো—মঠ থেকে তিন দিন এসেছি, একদিনের জন্য এসেছিলাম, দর্শনাদি সেরে সেইদিনই মঠে ফিরে যাবার

কথা ছিল, বিশেষ করে অনিশ্চিততার জন্য কোন খবরও মঠে পাঠাতে পারিনি। তাই তখনই মঠে ফিরে যাওয়া স্থির করলাম এবং সাধুমহারাজদের জিজ্ঞেস করতে তাঁরা বললেন যে, তখন চলতি নৌকা পাওয়া যাবে না—বরাহনগরে গিয়ে খেয়া নৌকায় পেরিয়ে বেলুড়ে যেতে হবে। জিজ্ঞেস করে করে বরাহনগরের দিকে রওনা হলাম।...

বরাহনগর খেয়াঘাটে এসে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি। সামনেই বেলুড় মঠ—গৈরিকধারী সাধুদের দেখা যাচ্ছিল।...বেলুড় মঠের ঘাটেই আমায় নামিয়ে দিল। গঙ্গায় হাত-মুখ ধুয়ে শ্রীঠাকুর প্রণাম করতে গেলাম। একজন সাধু মহারাজ সস্নেহে জিজ্ঞেস করলেন—"এতদিন কোথায় ছিলে?" সংক্ষেপে তাঁকে জবাব দিয়ে মন্দিরে গেলাম। তখন ভোগ-নিবেদন হচ্ছিল—দরজা বন্ধ। প্রণাম করে চরণামৃত খেয়ে নেমে মহাপুরুষজীকে দর্শন করতে গেলাম। তিনি তাঁর ঘরে বসে চিঠিপত্র লিখছিলেন। প্রণাম করে সব নিবেদন করলাম। তিনি খুশি হয়ে বললেন—"তোমার ভাগ্য ভাল, নইলে এমন সব যোগাযোগ হওয়া! শ্রীমাকে দর্শন করেছ—তিনি তোমার সঙ্গে কথা বলেছেন—আশীর্বাদ করেছেন—এ কি সাধারণ কথা! তোমার মঙ্গল হবে—আমি বলছি—খুব মঙ্গল হবে। ঠাকুর তোমায় কৃপা করেছেন। যাও, এখন সকলের সঙ্গে দেখাশুনা কর—প্রসাদ পাবার কথা বল।"...

প্রসাদ পাবার পর মহাপুরুষ মহারাজ বসেছিলেন নিচের পশ্চিমের উঠানের দিকের বারান্দায় বেঞ্চিতে। তিনি তামাক খাচ্ছিলেন, মঠের সাধু-মহারাজগণ অনেকেই তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। দু-এক কথার পরে তিনি রাজা মহারাজের সংবাদ জিজ্ঞেস করলেন। আমি প্রথম দিন তাঁর দর্শন পেয়েছিলাম। দ্বিতীয় দিনে শরীর তত ভাল ছিল না বলে তাঁর দর্শন পাইনি জানাতে তিনি বললেন, "আমিও শুনেছি তাঁর পেটটা একটু খারাপ হয়েছে।" একজন সাধুকে লক্ষ্য করে বললেন, "তুমি মহারাজ কেমন আছেন খবর নিয়ে এসো তো।"

মহারাজের জন্য মহাপুরুষজীর উৎকণ্ঠা আমার অন্তর স্পর্শ করল। তাঁদের পরস্পরের প্রতি কি গভীর ভালবাসা ও টান!...

বিকালে মহাপুরুষজীকে দেখলাম—সবজি বাগানে কর্মরত সাধুদের কাছে দাঁড়িয়ে কাজকর্মের নির্দেশ দিচ্ছেন। আবার নিজের হাতে কিছু সবজি তুলে তা নিয়ে এলেন মঠে। সন্ধ্যায় আরাত্রিকের ঘণ্টা পড়তেই সব সাধুরা গঙ্গায় হাত-মুখ ধুয়ে সমবেত হলেন মন্দিরে। পূজনীয় খোকা মহারাজও সকলের সঙ্গে ছিলেন। মহাপুরুষজী বসলেন ভিতরে দরজার পাশে মাথাটি ঝুঁকিয়ে। সাধুরা দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে আরাত্রিক দর্শন করছিলেন। আরাত্রিক শেষ হতে জয়ধ্বনি দিয়ে

ঠাকুরকে প্রণাম করে পূজনীয় খোকা মহারাজ 'খণ্ডন ভব-বন্ধন' ধরলেন। সকলেই সঙ্গে গাইতে লাগলেন। 'খণ্ডন' এবং 'ওঁ হ্রীং ঋতং' গেয়ে সকলে প্রণাম করলেন। পরে কেউ কেউ উঠে গিয়ে বারান্দাতে বা পেছনের ধ্যানঘরে ধ্যান করতে লাগলেন। আমিও অনেকক্ষণ বসেছিলাম বারান্দায়।...

তখনও জপধ্যান কিভাবে করতে হয় তা জানিনে। তাই পরের দিন সকালে মহাপুরুষজীকে প্রণাম করে ধ্যানজপ কিভাবে করব তা জিজ্ঞেস করতে তিনি সস্নেহে বললেন—"প্রীতির সঙ্গে বারংবার ভগবানের নাম করাই জপ, খুব প্রেমের সঙ্গে তাঁর নাম করবে। শ্রীশ্রীঠাকুরই জীবন্ত জাগ্রত ভগবান—এযুগে রামকৃষ্ণ-নামই মহামন্ত্র। তা-ই মনে মনে জপ করবে। আর খুব ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করবে। বলবে—'প্রভু, তুমি জগতের উদ্ধারের জন্য নরদেহ ধারণ করে কত কষ্ট সহ্য করেছ; আমি অতি দীন হীন, ভজনহীন, পূজনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন, বিশ্বাসহীন, প্রেমহীন; দয়া করে হৃদয়ে আমার জ্ঞান ভক্তি বিশ্বাস প্রেম প্রীতি পবিত্রতা দাও। দয়া করে হৃদয়ে প্রকাশিত হও—আমার মানবজীবন সার্থক হোক। তোমারই একজন সন্তান তোমার কাছে এভাবে প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন। তুমি আমায় কৃপা কর।' এমনি করে প্রার্থনা করতে করতে তাঁর কৃপা হবে। ক্রমে মনস্থির হয়ে আসবে। জপধ্যানে মন বসবে, অন্তরে প্রেম ও আনন্দ অনুভব করবে, প্রাণে আশার সঞ্চার হবে। খুব প্রার্থনা করে, পরে যেমন যেমন বলেছি তেমনি ভাবে জপ করবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিত্র নাম জপ করতে করতে ধ্যান আপনি হবে ক্রমে। জপের সময় খুব একাগ্রচিত্তে ভাববে যে, তিনি প্রসন্ন-দৃষ্টিতে তোমার দিকে চেয়ে আছেন। এ ভাবনা দীর্ঘ সময় স্থায়ী হওয়াও এক রকমের ধ্যান। তুমি তাঁর নাম জপ করতে করতে প্রার্থনা কর—'প্রভু, আমার ধ্যান যাতে হয় তাই করে দাও।' তিনি তাই করে দেবেন নিশ্চয় জেনো। তিনিই সকলের গুরু পথপ্রদর্শক প্রভু পিতা মাতা সখা—ত্রাতা। যে কোন রকম প্রেমের সঙ্গে তাঁর শ্রীমূর্তি বা তাঁর গুণ চিন্তা করাই ধ্যান। ধ্যানের অনেক অবস্থা আছে, বহু রকমের ধ্যান আছে। এখন এভাবেই করে যাও পরে প্রয়োজনমত তিনি অন্তরেই সব জানিয়ে দেবেন। খুব ব্যাকুল হয়ে ডাক—খুব কাঁদ। কাঁদতে কাঁদতে হৃদয়ের ময়লা সব ধুয়ে যাবে—আর তিনি প্রকটিত হবেন। এসব একদিনে হয় না। করে যাও, ডেকে যাও—নিশ্চয়ই সাড়া পাবে—আনন্দ পাবে। এযুগে 'রামকৃষ্ণ' নামই মহামন্ত্র। শুধু রামকৃষ্ণ নাম—তাতে ওঁ-কার বা অন্য কোন বীজমন্ত্র যোগ করারও প্রয়োজন হয় না।"...

এভাবে ধ্যানজপ সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন সেদিন। খানিক পরে একদল ভক্ত মহাপুরুষজীর কাছে এলেন, তাঁরা নৌকা করে দক্ষিণেশ্বর যাচ্ছিলেন।

মহাপুরুষ মহারাজ আমাকেও তাঁদের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে যেতে বললেন। আমিও তাঁদের নৌকায় উঠে পড়লাম। ...মহাপুরুষজীর দয়ার কথাই মনকে বিশেষভাবে আলোড়িত করছিল। আহা! তাঁর কত স্নেহ, দয়া! আমার ধর্মপথের সব ব্যবস্থা তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে করে দিচ্ছেন।...

বেলুড় মঠে ফিরে দুপুরে প্রসাদ পেয়ে পশ্চিমদিকের বারান্দায় মহাপুরুষজীকে প্রণাম করতেই তিনি আনন্দে দক্ষিণেশ্বর তীর্থ-দর্শনের কথা সব শুনলেন। দক্ষিণেশ্বরের চিন্তা তাঁর অন্তর অধিকার করেছিল। তিনি খুব ভাবের সঙ্গে বললেন—"দক্ষিণেশ্বর কি কম স্থান গা? ঠাকুরের বিশেষ তপস্যার স্থান। তিনি দীর্ঘকাল কত কঠোর সাধনা ও তপস্যা করে শ্রীভগবানকে নানাভাবে দর্শন ও সম্ভোগ করেছেন! অবশ্য তিনি সবই করেছেন লোকশিক্ষার জন্য। তীর্থরাজ দক্ষিণেশ্বরের মাহাত্ম্য ঠিক ঠিক বুঝতে হলে ওখানে কিছুদিন থেকে সাধন-ভজন করতে হয়। মা কালী—ভবতারিণী খুবই জাগ্রতা দেবী।" ইত্যাদি অনেক কথা তিনি বললেন। দক্ষিণেশ্বর একটি পার্থিব স্থানমাত্র নয়—শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারা ও আদর্শের সুষমাময় দিব্য প্রতীক।...

দুপুরে মহাপুরুষজী বিশ্রাম করছিলেন—সাধু মহারাজরাও। আমি চুপচাপ বসেছিলাম মহাপুরুষজী যে বারন্দাটিতে বসেছিলেন সেখানে, শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরের দিকে মুখ করে। বেশ ভাল লাগছিল। আড়াইটার পরে পূজনীয় খোকা মহারাজ উপর থেকে নেমে এলেন, হাতে একটি ছোট ঝুড়ি ও দড়ি। একা বসে আছি দেখে তিনি একগাল হেসে বললেন—"তুমি এখানে বসে আছ? এসো তো একটু আমার সঙ্গে। বাগানে কিছু কলম বাঁধব—তুমিও শিখে নিতে পারবে।" তাঁর হাত থেকে ঐ ঝুড়িটি নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চললাম। তিনি পাশের বাগানে ঢুকে জামরুল, আম, বাতাবিলেবু প্রভৃতি গাছের সরু সরু ডালে কলম বাঁধতে লাগলেন। নানা কথার মাধ্যমে তিনি ঐ কাজটি শেখাচ্ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একজন অন্তরঙ্গ পার্ষদের এত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও অন্তরঙ্গ-সঙ্গ আমার ক্ষুদ্র জীবনে বিশেষ প্রেরণার উৎসস্বরূপ হয়েছিল। কাজমাত্রকেই বড় করে দেখা এটি শিখেছিলাম—পূজনীয় খোকা মহারাজকে সব কাজ শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে করতে দেখে। তিনি এমন সরল ও সহজভাবে কথাবার্তা বলছিলেন যে, তাঁর সেই বালকোচিত সারল্য আমার অন্তরকে মুগ্ধ ও দ্রবীভূত করে। তাঁর নিরভিমান সাদাসিধে অনাড়ম্বর জীবন দেখে কিছুতেই বোঝা যেত না যে, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একজন সন্ন্যাসী পার্ষদ। তাঁর দাঁত ছিল না। কৃত্রিম দাঁতও তিনি ব্যবহার করতেন না—মুখখানি ছেলেমানুষের মতো সুন্দর ও পবিত্রতাপূর্ণ। তিনি খুব হাসতেন। ঐ সরল দিব্য হাসি তাঁর অন্তরের আনন্দ

প্রকাশ করত। তিনি বয়স্ক প্রবীণ এবং বহু সম্মানিতপদে অধিষ্ঠিত অথচ নিজের হাতে ওসব কাজ করছিলেন আনন্দে ও স্বেচ্ছায়—এটি আমার বিশেষ বিস্ময়ের কারণ হয়েছিল। প্রায় দেড়-দু-ঘণ্টা তিনি বাগানে কাজ করলেন—অনেকগুলি কলম বাঁধলেন—আরো আরো কাজ পর্যবেক্ষণ করলেন।...

* * *

পরদিন সকালবেলা মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে সাধু-মহারাজরা অনেকেই সমবেত হয়েছেন—আমিও তাঁকে প্রণাম করতে গিয়েছি। প্রণাম করে একপাশে দাঁড়াতেই তিনি আমায় লক্ষ্য করে বললেন—"দেখো, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে, উমেশ (মঠের জনৈক ব্রহ্মচারী) পালটে পালটে কেবলই জ্বরে পড়ছে, কিছুতেই তার জ্বর সারছে না। তাই আমরা মনে করেছি তাকে কিছুদিনের জন্য বাড়িতে পাঠাব। দেশের জল-হাওয়াতে সে সেরে উঠতে পারে। তুমি সঙ্গে করে তাকে বাড়িতে পৌঁছে দেবে। বেচারি এত দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, তাকে একা অতদূরে ছেড়ে দিতে আমাদের ভরসা হয় না। ভুগে ভুগে রক্তহীন ও ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। আজই সে যাবে—তুমিও তার সঙ্গে যাও।" উমেশ মহারাজও কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, "তুমি তাহলে আজই যাবার জন্য প্রস্তুত হও, ক্ষিতীন্দ্র তোমায় বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেবে।" তারপরে তিনি উমেশ মহারাজকে বাড়িতে পৌঁছে খবর দিতে বললেন—সাবধানে থাকার নানা উপদেশ দিলেন। তাঁর প্রত্যেকটি কথা স্নেহ-ভালবাসা ও আন্তরিকতাপূর্ণ। তাঁর কণ্ঠস্বরে প্রকাশিত হচ্ছিল গভীর উৎকণ্ঠা ও কল্যাণাকাঙ্ক্ষা। আমি মাথা নিচু করে তাঁর নির্দেশের প্রতি সম্মতি জানালাম। বললাম—"তা বেশ তো, আমি তাঁকে সযত্নে বাড়িতে পৌঁছে দেব। পথে যাতে কোন অসুবিধা না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকব।"...

দশদিন বেলুড় মঠ-বাসের শেষ হলো। মঠ এত ভাল লাগছিল—মহাপুরুষ মহারাজের এত স্নেহ-ভালবাসা পেয়েছিলাম! বিশেষ করে ঐ সময়ে এক সঙ্গে শ্রীশ্রীমা, স্বামী সারদানন্দ মহারাজ, শ্রীরাজা মহারাজ, হরি মহারাজ প্রভৃতির দর্শন আমার ক্ষুদ্র জীবনে দুর্লভ ও পরম অক্ষয় আধ্যাত্মিক সম্পদ। সাধু-মহারাজগণ ছোট ভাই-এর মতো আমায় এত আদর-যত্ন করেছিলেন যে, মঠ ছেড়ে যেতে হচ্ছে—এ চিন্তা সারাদিন সমগ্র মনকে উদাস ও ভারাক্রান্ত করে রেখেছিল। সন্ধ্যার পূর্বে যাত্রার সময় যত ঘনিয়ে আসছিল, ততই একটা বিরাট শূন্যতার অনুভূতি পীড়িত করছিল সমগ্র মন-প্রাণকে। মহাপুরুষজীকে ছেড়ে যেতে হবে—তাই হলো দারুণ বেদনার কারণ। কাল তো তাঁকে আর দেখতে পাব না! এই চিন্তা মনকে উদাস করে দিয়েছিল, অবাধ অশ্রুজল হয়েছিল একমাত্র সম্বল।...

সন্ধ্যার পূর্বে আমরা শ্রীশ্রীঠাকুর ও মহাপুরুষজীকে প্রণাম করে তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে রওনা হলাম। মহাপুরুষজীর বিদায়কালীন স্নেহ-সম্ভাষণ, আবেগভরা কণ্ঠস্বর ও সকরুণ দৃষ্টি তাঁর মাতৃপ্রাণের স্পর্শ দিয়েছিল সমগ্র মনপ্রাণে। নিজেকে মঠে রেখে শুধু দেহটি নিয়ে রওনা হলাম।

* * *

তৃতীয় দিনে উমেশ মহারাজকে তাঁর বাড়িতে পৌছে দিয়ে চতুর্থ দিনে বাড়িতে এলাম। কিন্তু কিছুতেই মন টিকছিল না—সর্বক্ষণ বেলুড় মঠ, দক্ষিণেশ্বর, মহাপুরুষ মহারাজ, খোকা মহারাজ, শ্রীশ্রীমা, শরৎ মহারাজ, রাজা মহারাজ, হরি মহারাজ প্রভৃতির চিন্তাই মনকে আলোড়িত করছিল।

পৌছ-খবর সহ মানসিক অবস্থা জানিয়ে মহাপুরুষজীকে একখানি চিঠি লিখি এবং জবাবের অপেক্ষা না করেই স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে চলে আসি। ঐ আশ্রমটি বেলুড় মঠের শাখা নয়—মহাপুরুষজীর আশীর্বাদ নিয়ে স্থানীয় ভক্তগণ ঐ আশ্রম স্থাপন করেন এবং নিত্য শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবাপূজা, পাঠ, আলোচনা, ভজন-কীর্তন, প্রবচন ও দাতব্য ঔষধ-বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবধারা প্রচার করে আশ্রমটি সংসার-তাপক্লিষ্ট বহু লোকের জুড়াবার স্থান হয়েছিল। আশ্রম-কর্মসচিব সপ্রেমে আমায় গ্রহণ করলেন এবং আশ্রমের কর্মিরূপে থাকতে দিলেন। আমার কাজ হলো শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবাপূজার আয়োজন ও সাহায্য করা। ধ্যান-জপ, পাঠ, ভজন-কীর্তনেরও প্রচুর সময় পাওয়া যেত। সুন্দর ফুলবাগান থেকে ফুল তুলে শ্রীশ্রীঠাকুরকে সাজাতাম, মন্দিরে বসে 'কথামৃত' পাঠ করতাম—সন্ধ্যার পরে অনেক ভক্তের সমাগম হতো। অনেক রাত পর্যন্ত হতো খুবই কীর্তনানন্দ।

মহাপুরুষজীকে চিঠি লেখার সাত দিন পরেই জবাব পেলাম। তিনি খুব আশীর্বাদ ও উৎসাহ দিয়ে চিঠিখানি লিখেছিলেন—"প্রিয় ক্ষি..., আমি সর্বান্তঃকরণে তোমার ঐ আশ্রমে থাকা অনুমোদন করি। তুমি ওখানেই এখন থাক এবং ওরা যেমন বলে তেমন কাজকর্ম কর—এতে তোমার কল্যাণ হইবে। যদুনাথ শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহ ও প্রীতি জানিবে এবং ওখানকার ভক্তদের জানাইবে।

ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

তাঁর পত্রখানি প্রাণে শান্তি ও বল এনে দিল—জীবন-পথের সন্ধানও পেলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্ন্যাসী পার্ষদদের মধ্যে তিনিই প্রথম তাঁর মহান গুরুদেব ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে পুরোবর্তী করে আমার জীবন-মরুতে আবির্ভূত হয়েছিলেন অমিয়-নির্ঝরিণীরূপে, যার ফলে শ্রীশ্রীঠাকুর আমার জীবনাকাশে মঙ্গল-আনন্দ-জ্যোতিরূপে উদ্ভাসিত হয়েছিলেন। মহাপুরুষজীর মতো আমার শুভাকাঙ্ক্ষী আর কেউ ছিল না। তাঁর ভালবাসা অমোঘ!...

* * *

আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবাপূজাদি করার সময় নিত্যই আমার মনে এ প্রশ্ন জাগতো যে, এ ছবিতে কি ঠাকুর আছেন? ছবি তো ছবিমাত্র। এ ছবি পূজা করে, সাজিয়ে লাভ কি? ভগবান তো ছবি নন—তিনি তো সচ্চিদানন্দস্বরূপ, ইত্যাদি নানাপ্রশ্ন মনকে আন্দোলিত করে পটমূর্তি শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবাপূজাতে মন তত বসত না। আমি মানসিক অবস্থা জানিয়ে শ্রীমহাপুরুষজীকে পত্র লিখলাম। তিনিও সে পত্রের জবাবে জানালেন, "প্রিয় ক্ষি..., তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম।... তিনি তোমায় কৃপা করিয়াছেন। তাহা না হইলে তাঁহার উপর তোমার ভক্তি কেমন করিয়া হইল? তিনি যুগাবতার ভগবান—মঙ্গলময় ও ভক্তহৃদয়বাসী। শ্রীঠাকুরের ছবি—শুধু ছবিমাত্র নয়। ঠাকুর নিজের ছবি পূজা করিয়াছেন, অতএব তিনি ছবিতেও রহিয়াছেন। ভক্ত যেভাবে তাঁহাকে দর্শন করিতে চায়, সেভাবেই তিনি তাহাকে দর্শন দেন। ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করিও না। সন্দেহই অশান্তির কারণ। বিশ্বাসই প্রাণে শান্তি দিবে। শ্রীঠাকুর ছবিতেও আছেন—এই বিশ্বাস করিয়া তুমি খুব ভক্তিভাবে সেবাপূজাদি কর, তাহাতে তোমার কল্যাণ হইবে। তাঁহার কাছে খুব প্রার্থনা করিবে, তিনি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন। আমি বলিতেছি, তিনি তোমায় দয়া করিয়াছেন—তোমার মানব-জীবন ধন্য হইবে। ঠাকুর যে ছবিতেও আছেন, তাহাও তিনি তোমাকে সময়ে জানাইয়া দিবেন, তখন আনন্দে প্রাণ ভরিয়া যাইবে।...

আমার শারীরিক অবস্থা তত ভাল নয়, তবে এক রকম চলিতেছে। তুমি ভাল আছ জানিয়া সুখী হইলাম। তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

ঐ চিঠিখানি যেদিন পেলাম তার পরের দিন ভোরবেলায় শ্রীশ্রীঠাকুর-তুলে ধূপবাতি জ্বালিয়ে যখন ঠাকুরঘরে একটু ধ্যান-জপ করতে বসেছি—তখন চকিতে এক অঘটনীয় অলৌকিক ব্যাপার হয়ে গেল। শ্রীশ্রীঠাকুরের পটমূর্তি ঝলমল করে নড়ে উঠল—আর ঐ ছবির মধ্যে শায়িত 'ব্রহ্মগোপাল-মূর্তি' হাত-পা নেড়ে খেলা

করছিলেন এবং সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন আমার দিকে! কি করুণামাখা চাহনি! জ্যোতির্ময় মূর্তি নয়, কিন্তু তবু যেন বাল-গোপালের শ্রীঅঙ্গের আভায় পটটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। ছ-সাত মাসের ছোট্ট ঐ ব্রহ্মগোপালের দৃষ্টির মধ্যে ছিল অসীম করুণা ও আনন্দ! তা দেখে আনন্দে অধীর হয়ে গেলাম। মনে হলো মহাপুরুষজীর আশীর্বাদেই আমার এ সৌভাগ্যলাভ! তিনি সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁর বাক্য সত্য—আশীর্বাদ অমোঘ।...

ঐ দর্শন আমার তরুণ মনে এমন গভীর রেখাপাত করেছিল যে, ৬০ বছর পরে এখনো শ্রীশ্রীঠাকুরের যে কোন ছবির দিকে তাকালেই তার মধ্যে ফুটে ওঠে ঐ ব্রহ্মগোপাল মূর্তি। শ্রীশ্রীঠাকুরের অপার করুণা অনুভব করে হৃদয়-মন অবশ হয়ে যায়।...

ঐ খবর দিয়ে মহাপুরুষজীকে চিঠি লিখি এবং তাঁর আশীর্বাদেই যে তা সম্ভব হয়েছে তাও জানাই। তিনি জবাবে লিখেছিলেন—"প্রিয় ক্ষি..., তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। শ্রীঠাকুর কৃপা করিয়া ব্রহ্মগোপাল-মূর্তিতে তোমাকে দর্শন দিয়াছেন জানিয়া আনন্দ হইল। তিনি তোমায় কৃপা করিয়াছেন। কালে আরো নানাভাবে তাঁর কৃপা অনুভব করিয়া ধন্য হইবে। শ্রীঠাকুর জীবন্ত জাগ্রত দেবতা। তিনি তোমার উপর প্রসন্ন হইয়াছেন। এখন প্রাণ ভরিয়া তাঁর নামগুণগান কর—মানবজীবন ধন্য হইয়া যাইবে। তাঁকে ধরিয়া থাক। তিনিই তোমার সব অভিলাষ পূর্ণ করিবেন। ভক্তদের কৃপা করিবার জন্যই প্রভুর মানবদেহে আগমন। তিনি ঐ আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বহু ভক্তকে কৃপা করিতেছেন।...

তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

* * *

প্রথম বেলুড় মঠ-দর্শনে যাবার পূর্বে কয়েকমাস যাবৎ মানসিক নানা অশান্তিতে ক্লিষ্ট হয়ে বিভিন্ন সময়ে তাঁকে চিঠি লিখেছিলাম। তিনিও কৃপা করে চিঠির জবাব দিতেন। চিঠি পেলেই মনে নূতন বল পেতাম—আশা ও আনন্দে মন ভরে যেত। ঐ সময়ে বৈদ্যনাথধাম হতে (৪।৭।১৮ তারিখে) এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন—

শ্রীমান ক্ষি...,

তোমার পত্র আমি এখানে পাইয়াছি, কোন বিশেষ কার্যোপলক্ষে আমি এক মাসের অধিক হইল এখানে আসিয়াছি। শীঘ্রই এখান হইতে যাইব।... তুমি যখন

ঈশ্বরাবতার,পতিতপাবন, কলিকল্মষহারী, যুগাচার্য, পরমকারুণিক, ভক্তবৎসল শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ, তখন তোমার পরম মঙ্গল হইবে—আমি নিশ্চয় বলিতে পারি। কেবল প্রাণ ভরে তাঁকে ডাক, তাঁর কাছে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর। দেখিবে হৃদয় প্রেমে ভরে যাবে। বালক যেমন মা-বাপের কাছে আবদার করে কাঁদে, ঠিক সেই রকম করে তাঁর কাছে বিশ্বাস, ভক্তি, প্রেম চাও—নিশ্চয় পাবে। অধিক আর কি লিখিব? আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

তাঁর বাক্য সত্য। তাঁর আশীর্বাদ অমোঘ। তিনি প্রাণের অন্তস্তল থেকে আশীর্বাদ করতেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে এক হয়ে গিয়েছিলেন—তাঁর পৃথক অস্তিত্ব আদৌ ছিল না। কৃষ্ণপ্রেমে গরবিনি শ্রীরাধার মতো তাঁর অহং শ্রীরামকৃষ্ণে মিলিয়ে গিয়েছিল। তাই তাঁর আশীর্বাদ ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ—তিনি তার বাহক মাত্র ছিলেন। তাঁর বাণী ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যেই বেঁচেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিল তাঁর পরমাত্মা।...

আরো মাসাধিক কাল পরে আমার চিঠির জবাবে আমাকে উপদেশ দিয়ে বেলুড় মঠ হতে একখানি চিঠি লিখেছিলেন—

শ্রীমান ক্ষি...,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। আমি যাহা পূর্বে লিখিয়াছি তাহা ব্যতীত আমার আর কিছু বলিবার নাই এবং জানিও না। প্রভুকে যে চায় সেই পায়। প্রভু বলিতেন, ভগবান যেন চাঁদামামা—সকলেরই মামা, যে চায় সেই পায়। প্রভুর বিরহ, তাঁকে না পেয়ে কাঁদিতে কেহ কাহাকেও শিখাইতে পারে না। উহা আপনা আপনিই সময়ে আসে। ঠাকুর বলিতেন যে, একটি ছোট ছেলে ঘুমাইতে যাইবার আগে তার মাকে বলেছিল—'মা, আমি এখন ঘুমাতে যাচ্ছি, আমার হাগা পেলে আমাকে ডেকে দিও।' মা বলিল, 'বাবা, তোমার হাগা পেলে তোমার ঘুম আপনিই ভাঙ্গবে, ডাকতে হবে না।' সেইরূপ তাঁকে লাভ করবার জন্য কাঁদতে শেখাতে হয় না। আপনিই কান্না আসিবে, তুমি আপনিই কাঁদিবে। অবশ্য সে সময় কখন আসিবে তাহা কেহই জানে না। তুমি হৃদয়েই তাহা জানিতে পারিবে।

প্রেমানন্দ স্বামী প্রায় ১৪।১৫ মাস যাবৎ কঠিন Malaria ও প্লীহা-যকৃৎ ইত্যাদিতে ভুগিতেছিলেন। হঠাৎ সেদিন তাঁর জ্বর বৃদ্ধি হয় এবং Pneumonia (নিউমোনিয়া) হয়। একে অত্যন্ত দুর্বল শরীর তার উপর এই কঠিন পীড়া, দেহ

সহ্য করিতে পারিল না; সুতরাং তিনি তাহা ত্যাগ করিয়া গত মঙ্গলবার ১৪ শ্রাবণ, ৩০ জুলাই প্রভুতে লীন হইয়া গেলেন। প্রভুরই ইচ্ছা সব।

চিন্ময়ানন্দ (শচীন) নামে এক young (যুবক) সন্ন্যাসীও এইরূপে দেহত্যাগ করিয়াছে। সেও অনেক দিন উদরাময় রোগে ভুগিতেছিল, হঠাৎ সর্দি ও Pneumonia (নিউমোনিয়া) হইয়া দেহত্যাগ করিয়া প্রভুর লোকে চলিয়া গেল প্রায় একমাসের অধিক হইল। সব প্রভুর ইচ্ছা।

প্রভুর নাম, প্রভুর ধ্যানই কামজয় করিবার একমাত্র উপায় আমি জানি। ইহা ছাড়া আমি আর কোন উপায় জানি না। আর উপায়, সাধারণ উপায়—কামিনীর দিকে কখনো চোখাচোখি চাহিবে না, কাম-সম্বন্ধীয় কথোপকথন করিবে না—কোন পুস্তকও পড়িবে না।

আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানিবে। প্রভু তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

* * *

আশ্রমে থাকাটা বাড়ির লোকেরা ভাল চোখে দেখে না। তাই মাঝে মাঝে ২।৫ দিনের জন্য বাড়িতে যাই। আবার আশ্রমে আসি। এই ভাবে কয়েক মাস কাটাবার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের আর্তত্রাণ-সেবাকার্যে কিছুটা সাহায্য করার সুযোগ হয়। ঐ অঞ্চলে প্রথমটায় কলেরা ও পরে নিউমোনিয়ার আক্রমণে অনেক লোক মারা যাচ্ছিল। ঠিক ঐ সময়ে রামকৃষ্ণ মিশনের ব্রহ্মচারী ক্ষেমচৈতন্য মহারাজ সেবাকার্যের জন্য ঐ অঞ্চলে আসেন। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের মতো আমিও কিছুকাল ঐ ব্রহ্মচারী মহারাজের সঙ্গে সেবাকার্য করেছিলাম। তাতে প্রচুর আনন্দ পেতাম এবং শিক্ষালাভ হয়েছিল যথেষ্ট। ব্রহ্মচারী মহারাজ প্রাণের মমতা ত্যাগ করে অক্লান্তভাবে রাতের পর রাত জেগে কলেরা রোগীদের সেবা করতেন। তা আমাদের কাছে খুবই শিক্ষার বিষয় ছিল এবং তাতে করে স্বামীজী-প্রচারিত 'নরনারায়ণ-সেবার' গুহ্যমর্মটির উদ্ঘাটন করাও হয়েছিল সম্ভব। যারা আত্মীয়-স্বজন নয় তাদের জন্য ব্রহ্মচারী মহারাজের অক্লান্ত সেবা সকলকারই শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল। তিনি মুসলমান বা নিম্নজাতিদেরও সমানভাবে সেবা করতেন। জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে ঐ সেবাকার্য অবলম্বন করে ও অঞ্চলে রামকৃষ্ণ মিশনের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। আমি বেলুড় মঠে গিয়েছিলাম এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানদের কয়েকজনকে দর্শন করেছি—জানতে পেরে ব্রহ্মচারী মহারাজ আমাকে খুবই স্নেহ করতেন এবং অনেক দায়িত্বপূর্ণ

কাজে নিযুক্ত করতেন। 'নরনারায়ণ-সেবাকার্যে' আমার প্রথম হাতেখড়ি ঐ ভাবে হয়, যা ক্রমে আমার জীবনে বেলুড় মঠে যোগদানের অন্যতম কারণ হয়েছিল।...

সেবাকার্য শেষ করে ব্রহ্মচারী মহারাজ চলে যাবার পরে আমার পক্ষে বাড়িতে থাকাও সম্ভব হচ্ছিল না। ঐ অবস্থায় মহাপুরুষজীকে লিখতে তিনি আমায় দুর্ভিক্ষ-সেবাকার্যের সুযোগ দিয়েছিলেন। বেলুড় মঠ থেকে (১৯।৪।১৯) তারিখে লেখেন—

প্রিয় ক্ষি...,

তোমার পত্র পাইয়াছি। শীঘ্রই চিদানন্দ নামক মঠের একজন সন্ন্যাসী কুমিল্লায় মহেশবাবুর ওখানে যাইবেন এবং সেখান হইতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অন্তর্গত বিটঘর গ্রামে সেবাকার্য আরম্ভ করিবেন। মঠের আর একজন সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আছেন, তাঁর বাড়ি সেখানে। তিনি বহুকাল পরে তাঁর মাতাঠাকুরানীকে দেখিতে গিয়াছেন। তিনিও সেবাকার্যে চিদানন্দের সহিত যোগ দিবেন। চিদানন্দ তোমায় সময়মত পত্র লিখিবেন। তিনি মঠ হইতে এই প্রকার আদিষ্ট হইয়াছেন। তুমি প্রস্তুত থাকিবে।

তাঁর নাম জপ করিতে করিতে আপনা আপনিই ধ্যান হইয়া আসিবে। প্রেমের সহিত তাঁর নাম জপ কর, ক্রমে একরূপ আনন্দ অনুভব করিবে, সেই আনন্দটা স্থায়ী হওয়াই ধ্যান। অথবা প্রেমের সহিত প্রভুর শ্রীমূর্তি হৃদয়ে ধারণ করিতে করিতে এক অপূর্ব আনন্দ অনুভব করিবে, ক্রমে ক্রমে মূর্তিও লয় হইয়া যাইবে, একপ্রকার কেবল চৈতন্যময় আনন্দ অনুভূত হইবে—তাহাও ধ্যান। ধ্যানের বহু প্রকার (রকম) আছে, একটা অবলম্বন করিয়া যাওয়া চাই। তুমি তাঁর নাম করিতে করিতে প্রার্থনা কর যে, প্রভু, আমার ধ্যান যাহাতে হয় এমন করিয়া দিন। তিনি তাহাই করিয়া দিবেন—নিশ্চয় জানিও। তিনি সকলের হৃদয়ের গুরু, পথপ্রদর্শক, প্রভু—পিতা মাতা সখা এবং জীবের তিনিই সর্বস্ব, ইহা নিশ্চয় জানিবে। অধিক আর কি লিখিব! আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহপ্রীতি জানিবে। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

তাঁর আশীর্বাদপূর্ণ চিঠি পেয়ে খুবই আনন্দ হয়েছিল এবং অধীর আগ্রহে সেবাকার্যে যোগদানের জন্য প্রতীক্ষা করে তাঁকেও চিঠি লিখলাম এবং তার কয়েকদিন পরেই (৫।৫।১৯) তাঁর চিঠি পেলাম—

প্রিয় ক্ষি...,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুর্ভিক্ষ-সেবাকার্য

৪।৫ দিন হইল আরম্ভ হইয়াছে। খুব অল্প পরিমাণে কার্য হইতেছে। সেইজন্য বোধ হয় তোমাকে ডাকিবার প্রয়োজন হয় নাই; হইলেই তোমাকে তাঁরা সংবাদ দিবেন।...

প্রীতির সহিত বারংবার নাম করা—ইহাই জপ, তাহাই করিবে। করিতে করিতে আনন্দ পাইবে, রিপু ইত্যাদি সব দমিত হইয়া যাইবে। তাঁর নাম করা, প্রাণের সহিত তাঁর কাছে প্রার্থনা করা—রিপু আদি জয় করিবার একমাত্র উপায়। তাঁর কৃপাই সম্বল। ডাকিতে ডাকিতে, নাম করিতে করিতে, প্রার্থনা করিতে করিতে তাঁর কৃপা হয়। কৃপা হইলেই ভক্তের আর কোন চিন্তা নাই। ধ্যান-জপ নিশ্চয় করিতে হইবে, করিতে করিতে ফল প্রত্যক্ষ করিবে—তার আর সন্দেহ নাই।

আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানিবে। প্রভু তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন, তোমার বিশ্বাস ভক্তি প্রীতি দিন দিন বৃদ্ধি হউক, ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে প্রতীক্ষা ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। কিন্তু আমাকে ঐ অনিশ্চিত অবস্থায় বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। দশ-বার দিন পরেই পুনরায় তাঁর চিঠি পেলাম। তাতে তিনি লিখছেন—

প্রিয় ক্ষি...,

বাঁকুড়া জিলায় ইন্দপুর অঞ্চলে আমাদের মঠ হইতে দুইজন সাধু দুর্ভিক্ষসেবাকার্য আরম্ভ করিয়াছে। ওখানে একজন কর্মীর প্রয়োজন, অতএব তুমি পত্রপাঠ মঠে চলিয়া আসিবে। আমরা তোমাকে বাঁকুড়ার সেবাকার্যে পাঠাইব। ...ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

ঐ চিঠিখানি পাবার ২।৩ ঘণ্টার মধ্যেই আমি একবস্ত্রে গৃহত্যাগ করে বেলুড় মঠের দিকে যাত্রা করলাম এবং তৃতীয় দিন মঠে পৌঁছে শ্রীমহাপুরুষজীকে প্রণাম করতেই তিনি আনন্দে বললেন—"এসেছ? বেশ করেছ। আজ রাত্রেই বাঁকুড়া যেতে হবে।..."

* * *

কয়েক মাস পর বেলুড় মঠে এসে পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ ও অন্যান্য সাধুদের দর্শন করে খুবই আনন্দ হলো। মহাপুরুষজী যেন আরো প্রেমময় হয়ে গিয়েছেন। বিকালে তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন তাঁর ঘরে। তারপর কাছে বসিয়ে কত কথা, কত উপদেশ, কত অন্তরঙ্গতা, কত আদর-যত্ন! তিনি বৈকালিক প্রসাদ

খাচ্ছিলেন—রেকাব থেকে তুলে তুলে এত প্রসাদ দিলেন যে, দুহাত ভরে গেল। আমি প্রসাদ হাতে উঠে আসছি—তাঁর সামনে খেতে সংকোচ হচ্ছিল দেখে তিনি একগাল হেসে বললেন, "কোথায় যাচ্ছ? খাও খাও—আমার সামনেই খাও, প্রসাদ পেলেই খেতে হয়।" অগত্যা ওখানে বসেই প্রসাদ খেলাম। হাত মুখ ধুয়ে বসতেই দুর্ভিক্ষ-সেবাকার্য সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন। এবং ঐ রাত্রেই দুজন ভক্তকে বলে—আমাকে বাঁকুড়ার গাড়িতে বসিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন।

পরদিন ভোরবেলা গাড়ি বাঁকুড়া পৌঁছতেই একজন কুলি নিয়ে স্টেশন থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরে স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গিয়ে হাজির হলাম। এবং ঐ দিন রাত্রে সেখানে বিশ্রাম করে পরদিন একজন কুলি বা পথপ্রদর্শক নিয়ে প্রায় ১৪ মাইল দূরে—রামকৃষ্ণ মিশনের দুর্ভিক্ষ-সেবাকেন্দ্র ইন্দপুরের দিকে রওনা হলাম। শহর ছেড়ে যত এগুচ্ছি—রাস্তার দুদিকে খাঁ খাঁ-করা অনুর্বর মাঠ। গ্রামবাসীদের জীর্ণ কুটির ও দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত কঙ্কালসার অর্ধনগ্ন নরনারীদের দেখে বেদনায় প্রাণ ভরে গেল। গত বৎসর বর্ষার অভাবে ওই অঞ্চলে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ হয়েছে, তারই চিহ্ন ছড়িয়ে আছে চারদিকে। দুর্ভিক্ষের আঁচড় কতটা গভীর হয়েছে, তাই দেখতে দেখতে বেলা প্রায় ১১টায় ইন্দপুরে দুর্ভিক্ষ-সেবাকেন্দ্রে উপস্থিত হলাম। ব্রহ্মচারী মহারাজদের দুজনের মধ্যে একজন আমার পূর্বপরিচিত, তাঁর সঙ্গে কয়েক মাস পূর্বে কলেরা ও ইনফ্লুয়েঞ্জা-সেবাকার্য করেছিলাম। মহাপুরুষ মহারাজের চিঠি পেয়ে তাঁরা খুশি হলেন, মঠের খবরাদি জিজ্ঞেস করলেন।...

পরদিন থেকে সেবাকার্য আরম্ভ করি। সপ্তাহে ছয় দিন গ্রামে গ্রামে গিয়ে গ্রামবাসীদের অভাব জেনে নিয়ে প্রতি পরিবারে টিকিট বিতরণ করে আসতে হয়। জনপিছু প্রতিদিন একপোয়া করে চাল—কোন রকমে অনাহারে নিশ্চিতমৃত্যু থেকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা, তাও আবার নির্ভর করে সেবাকার্যের জন্য টাকাকড়ি কেমন আসে তার উপর।

সপ্তাহে একদিন চাল বিতরণ হয়। যাদের টিকিট দেওয়া হয়েছে তারা ঐ টিকিট দেখিয়ে নিজেদের চাল নিয়ে যায়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কেবল মেয়েদের নূতন কাপড়ও দেওয়া হয়। বিকালে অফিসের কাজ—হিসাবপত্র রাখা প্রভৃতিতে কেটে যায়। সন্ধ্যার পর সাধু-ব্রহ্মচারীরা ধ্যান-জপ করেন, আমিও তাই করি। এভাবে সেবাকার্য করছি মনের আনন্দে। কিছুদিন পর এক আকস্মিক বিপদ আমাকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে ফেলল। কলকাতায় কলেজে ভরতি হবার জন্য অভিভাবকদের টাকা এসে হাজির। আমি ইতিকর্তব্যতা স্থির করতে না পেরে আমার পরমহিতৈষী মহাপুরুষজীর স্মরণ নিলাম।

পর পর আমার দু-খানি চিঠি পেয়ে মহাপুরুষ মহারাজ লিখলেন* ঃ

শ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণম্

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
পোঃ—বেলুড়, হাওড়া
২৩।৬।১৯

শ্রীমান ক্ষি...,

ক্রমে ক্রমে তোমার দুইখানি পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। যদি দাদার টাকায় লেখাপড়া করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে ইহা নিশ্চয় জানিও যে, তাঁহারা ভবিষ্যতে ঐ টাকার বিনিময়ে তোমায় চাকরি বা এমন কোন কাজ করিতে বলিবেন, যাহার দ্বারা তাঁহাদের সংসারের উপকার হয় এবং ইহা যে যুক্তিযুক্ত তার কোন সন্দেহ নাই। পিতামাতা ভ্রাতা—যে কোন আত্মীয় কাহাকেও বিনা প্রয়োজনে লেখাপড়া শিখাইতে বা অন্য কোন কাজের জন্য অর্থব্যয় করে না। স্বার্থ আর কিছুই নয়—পরিজনবর্গের উন্নতি-সাধন। তোমার যদি গার্হস্থ্য-জীবন যাপন করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তাঁদের টাকাকড়ি লইয়া পড় এবং শীঘ্রই আসিয়া কলেজে ভরতি হইবার চেষ্টা কর। আর যদি সংসার ত্যাগ করিয়া সমস্ত জীবন প্রভুর পদে অর্পণ করিতে চাও তবে সেজন্য যে লেখাপড়ার প্রয়োজন তাহার আমরা বন্দোবস্ত করিতে পারি। ইহা যদি তোমার অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে যে কার্যে তোমায় ওখানে পাঠানো হইয়াছে, তাহা সম্পন্ন করিয়া মঠে আসিলে পর লেখাপড়ার বন্দোবস্ত করা যাইবে।

আর অধিক কি লিখিব। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহপ্রীতি তুমি জানিবে। ...এখানেও বৃষ্টি হইতেছে। এখনও বৃষ্টির বিরাম নাই। মঠের আর সব সংবাদ একরূপ কুশল। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

মহাপুরুষজীর ঐ চিঠিখানি যেন আমার জীবনে পরম আশীর্বাদরূপে এসেছিল। আমি দু-দিন প্রার্থনা ও চিন্তা করে অভিভাবকদের টাকা ফেরত পাঠালাম। আমার জীবনের গতিপথও বাধাশূন্য উজ্জ্বল উন্মুক্ত হয়ে গেল।

মহাপুরুষজীর আশীর্বাদেই আমি ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছিলাম—তা

---

* এই প্রবন্ধে মহাপুরুষজীর যে সকল চিঠি উদ্ধৃত করা হয়েছে সব চিঠিই তাঁর নিজের হাতের লেখা। —সংকলক

জানিয়ে তাঁকে আন্তরিক ভক্তি ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ চিঠি লিখলাম। জবাবও তিনি সঙ্গে সঙ্গে দিলেন ঃ

শ্রীমান—,

তোমার চিঠি পাইয়া সুখী হলাম। তুমি টাকা ফেরত পাঠাইয়া দিয়াছ—উত্তম কাজ করিয়াছ। শ্রীঠাকুর তোমাকে তাঁর পবিত্র সঙ্ঘে স্থান দিবেন বলিয়াই এইভাবে কৃপা করিয়াছেন। তোমার মানব-জীবন ধন্য হইবে। মঠে আসিলে আমরা তোমাকে এমন বিদ্যা শিখাইব, যাহাতে তোমার ভগবানলাভ হয়। এখন খুব প্রাণ ভরিয়া শ্রীশ্রীপ্রভুকে ডাক, খুব প্রার্থনা কর। তিনি অন্তর্যামী, তোমার হৃদয়েই রহিয়াছেন, তোমার প্রার্থনা শোনেন—তাহা তুমি পরে পরে অন্তরে অনুভব করিবে।

আর অধিক কি লিখিব। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানিবে। প্রভু তোমার কল্যাণ করুন, ইহাই সতত প্রার্থনা। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

পুনঃ—ওখানে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে জানিয়া আনন্দিত হইলাম। এখানেও প্রায়ই বৃষ্টি হইতেছে।

শি—

তাঁর চিঠিখানি পেয়ে প্রাণ শীতল হলো, আনন্দ ও আশাতে ভরে গেল প্রাণ। বুঝতে পারলাম তিনিই আশীর্বাদ দিয়ে আমার জীবনকে শ্রেয়ঃ-প্রাপ্তির পথে চালিত করছেন, হাত ধরে নিয়ে চলেছেন কল্যাণের পথে।...

* * *

দুর্ভিক্ষ সেবাকার্যের বিবরণ জানিয়ে মহাপুরুষজীকে চিঠি লিখতেই জবাবে তিনি লিখলেন ঃ

শ্রীমান—,

তোমার পত্র পাইয়াছি। ওখানে বেশ বৃষ্টি হইতেছে এবং transplantation (ধান্যরোপণ) আরম্ভ হইয়াছে এবং শ্রমজীবীরা ক্ষেত্রে কাজ পাইতেছে, সুতরাং তোমাদের recipients (সাহায্যপ্রার্থীরাও) কমিয়া যাইতেছে শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। প্রভু দয়া করিয়া তাঁর সৃষ্টি রক্ষা করেন তো রক্ষা, নতুবা এইপ্রকার বারংবার দুর্ভিক্ষ ও কঠিন কঠিন সংক্রামক পীড়ায় দেহ রুগ্ণ ও শীর্ণ হইয়া সকলে কার্যে অক্ষম হইয়া পড়িবে ও ধীরে ধীরে slow death (ক্রমমৃত্যু) অবশ্যম্ভাবী। সবই

তাঁহার ইচ্ছা। আমরা প্রভুর দাস, আমাদের দ্বারা যতটুকু সেবা করাইয়া লইবেন, আমরা ততটুকুই করিয়া ধন্য হইব।

পত্র লিখিয়া তখনই উত্তর পাইবার আশা আমার নিকট করিও না। পত্র লিখিতে আমার বিলম্ব হয়। অবশ্য বিশেষ দরকারী পত্র হইলে সে স্বতন্ত্র কথা। আমাকে অনেকে পত্র লেখে, সময়মত উত্তর দিতে আমি সক্ষম নই। সব সময় শরীর ভাল থাকে না। যতদূর সম্ভব প্রভুর স্মরণ-মনন কর এবং তাঁহার ইচ্ছায় তাঁহার যে সেবাকার্য করিতেছ প্রাণমন দিয়া সেইটি করিবে। নিশ্চয় জানিবে যে, ইহা জপধ্যান অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়। এ কার্য নিষ্কামভাবে করিলে প্রভুর কৃপা শীঘ্র হয়। সাক্ষাৎ প্রভুরই সেবা করিতেছ। দরিদ্র-ক্ষুধিতরূপে স্বয়ং প্রভুই তোমাদের দ্বারে উপস্থিত—এই জ্ঞানে সেবা করিবে এবং এই জ্ঞানের জন্য প্রার্থনা করিবে, দেখিবে পরম শান্তি পাইবে। আমরা লোককে প্রতারণা করিতে আসি নাই, জীবের যাহাতে পরম কল্যাণ হয়, তাহাই আমরা শিক্ষা দিয়া থাকি এবং সেই শিক্ষামত যে কাজ করিবে তাহার মঙ্গল হইবেই হইবে।

আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানিবে। প্রভুর স্মরণ-মনন সর্বদা করিবে এবং আনন্দে কার্য করিবে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী শিবানন্দ

মহাপুরুষজীর চিঠিখানি স্বামীজীর "শিবজ্ঞানে জীবসেবা" কথাটির জীবিতভাষ্যরূপে এসেছিল। এই দুর্গতদের হাহাকার ও আর্তনাদ তাঁর মহৎ হৃদয়ে কিভাবে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল, তারই চিত্র ফুটে উঠেছিল ঐ চিঠিতে।

আমি বাঁকুড়া জেলায়ই সেবাকার্য করছিলাম আর ঐ জেলাতেই জয়রামবাটী গ্রাম। শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করার এবং তাঁর কৃপালাভের এটাই প্রশস্ত সুযোগ মনে করে মহাপুরুষজীকে মনের ইচ্ছা জানিয়ে চিঠি লিখলাম—তিনি যদি দয়া করে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে আমার দীক্ষা সম্বন্ধে একটু লিখে দেন, তবেই শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা পাওয়া সম্ভব।

আমার চিঠি পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে মহাপুরুষজী জবাব দিলেন ঃ

প্রিয়—,

তোমার পত্র পাইলাম। শ্রীশ্রীমার শ্রীচরণদর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, অতি উত্তম। তুমি যাইয়া তাঁহাকে বলিও, "শিবানন্দ স্বামী (তারক মহারাজ) আপনার

শ্রীচরণদর্শন করিতে আমায় আপনার শ্রীচরণসমীপে পাঠাইয়াছেন। বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সেবা করিতে তিনি আমায় পাঠাইয়াছিলেন, সেখান হইতে আপনার শ্রীচরণদর্শন ও কৃপালাভের জন্য আসিয়াছি। আপনি কৃপা করুন।"—এই কথা বলিলেই তিনি তোমায় দয়া করিবেন। তিনি দয়ার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, যে যায় কাহাকেও বিমুখ করেন না। অতএব আমার স্বতন্ত্র পত্র দিবার প্রয়োজন নাই। এই পত্রখানি তাঁর শ্রীচরণ সমীপে পাঠ করিও, তাহা হইলেই হইবে।

প্রভুর কৃপায় সময়মত বৃষ্টি হইয়া শস্যের উপকার হইয়াছে জানিয়া বড়ই আনন্দ হইল। বৃষ্টি আরো হইবে—প্রভুর ইচ্ছায়। তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহপ্রীতি জানিবে এবং রোহিণী ও শচীনকেও (দু-জন ব্রহ্মচারী মহারাজ) জানাবে। মঠের স্বাস্থ্য এখনও তত খারাপ হয় নাই, তবে অল্প অল্প Malaria (ম্যালেরিয়া) দেখা দিয়াছে, প্রভুর ইচ্ছায় এখনও অধিক হয় নাই। আমার শরীর একরূপ মাঝামাঝি চলিয়া যাইতেছে। এখানেও কয়দিন খুব ঝড় ও সঙ্গে সঙ্গে অল্প অল্প বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, এখন আর কিছু নাই।

সন্ধান করিয়া দেখিও, ওখানে বা নিকটে স্থানীয় মজবুত গামছা পাওয়া যায় কিনা। যদি পাওয়া যায়, তবে ৩ বা ৪-হাতি একজোড়া গামছা ডাকে আমায় যত শীঘ্র সম্ভব পাঠাও, পরে দাম পাঠাইব। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

মহাপুরুষজীর চিঠিখানি পেয়ে খুবই আনন্দ হলো—আনন্দে ও আশায় ভরে গেল অন্তর। শ্রীশ্রীমাতৃদর্শনের সুযোগের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

মহাপুরুষজী যে গামছা চেয়েছিলেন, স্থানীয় হাট থেকে তা কিনে রেজিস্ট্রি ডাকে তাঁর কাছে শীঘ্র পাঠিয়ে দিলাম। তিনি তা পেয়ে খুশি হয়ে চিঠি লিখেছিলেন। আমার মতো নগণ্য একটি ছেলের কাছে যে গামছা চেয়ে চিঠি লিখেছিলেন, এতে তাঁর স্নেহ ও কৃপার স্পর্শ আমাকে অভিভূত করেছিল।

* * *

গামছা দুখানি পেয়ে মহাপুরুষজী লিখলেন ঃ

শ্রীমান—,

তোমার প্রেরিত গামছা দুইখানি আজ পাইলাম। শ্রীশ্রীমার কৃপালাভ বড় ভাগ্যে ঘটে। তুমি যাইয়া তাঁহার শ্রীচরণে প্রণিপাত করিয়া বলিবে, 'মা, আমাকে কৃপা

করুন।' তারপর তিনি দয়া করিয়া যাহা বলিবেন, তাহাই শিরোধার্য করিবে। যদি তিনি কৃপা করিয়া তোমাকে মন্ত্রদান করেন, জানিবে তুমি ভাগ্যবান। তিনি আমাদের সকলের মা। তাঁহার প্রদত্ত মন্ত্র পাইলে তোমার জন্ম সার্থক হইবে। ইহাতে আমারও পরম আনন্দ হইবে, জানিবে। তিনি প্রভুরই নাম তোমায় দিবেন—সকলকেই তিনি তাহাই দেন।...

আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহপ্রীতি জানিবে। ওদিকে সু-বৃষ্টি হইয়া চাষের উপকার হইতেছে শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। প্রভু কৃপা করুন। ইতি—

সতত শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

তাঁর চিঠিখানি পেয়ে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনের জন্য মন খুবই ব্যাকুল হলো। সেবাকার্য থেকে মহারাজগণ আমাকে কয়েক দিনের ছুটি দিলেন। প্রার্থনাপূত মন নিয়ে যাত্রা করলাম এক শুভ দিনে মায়ের দর্শনে।

হেঁটে বাঁকুড়া আশ্রমে, ওখান থেকে ট্রেনে গড়বেতা। স্থানীয় আশ্রমে একরাত্রি কাটিয়ে 'ভাদরের' প্রথম দিকে এক ভোরে রওনা হলাম পুণ্যপীঠ জয়রামবাটীর দিকে। আশ্রমাধ্যক্ষ বলেছিলেন—বিশ মাইল পথ। গ্রাম্য পথ, দুপুরে এক দোকানে চার পয়সার মুড়ি-মুড়কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেয়ে এগিয়ে চললাম। খালি পা, জলকাদা ও পিচ্ছিল পথ, ছোট্ট একপশলা বৃষ্টিও হয়ে গেল। কোথাও আশ্রয় নেই, তাই চাষিদের মতো ভিজতে ভিজতেই চলেছি—ভিজা কাপড় গায়ে শুকাল। শেষের দিকে একরকম দৌড়তে দৌড়তে বিকাল প্রায় ৫টার সময় জয়রামবাটী গ্রামে প্রবেশ করে প্রথমে জয়রামবাটীর ভূমি স্পর্শ করে প্রণাম করলাম এবং বিভূতির মতো ঐ পবিত্র মাটি কপালে একটু মাখলাম। মনে মনে শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের জয়ধ্বনি দিয়ে জয়রামবাটীর গ্রামের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছি। পথের দু-ধারেই ছোট ছোট মেটে ঘরগুলি অতিক্রম করে উপনীত হলাম শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির দরজায়। যদিও আমি কোন চিঠিপত্র দিইনি, তবু মা যেন জানতে পেরেছিলেন। সেবক মহারাজদের পরিচয় দিয়ে মাকে দর্শন করার প্রার্থনা জানাতেই তাঁরা আমায় বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেলেন। শ্রীশ্রীমা তখন ভিতরের দরজা ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রণাম করে মাথা তুলতেই মা আবেগ ভরে বললেন, "আহা! বাছার মুখখানি শুকিয়ে গিয়েছে—সারাদিন খাওয়া হয়নি! ওকে কিছু খেতে দাও।" আমি পকেট থেকে মহাপুরুষজীর লেখা চিঠিখানি বের করে পড়তে যাচ্ছি, তখন মা বললেন, "চিঠি পরে শুনব। এখন, বাবা, হাত-মুখ ধুয়ে একটু জল খেয়ে নাও।"

হাত-মুখ ধোয়ার পর সেবক মহারাজ আমায় পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন। আসন পাতা, গ্লাসে জলে, একথালা মুড়ি ও তালক্ষীর। আমি মাথা নিচু করে মায়ের কথা ভাবতে ভাবতে সব খেয়ে ফেললাম। সে কি অমৃত! মুড়ি তালক্ষীর তো কত খেয়েছি জীবনে, কিন্তু এমন মধুর তো কখনো লাগেনি!...

প্রায় দশমাস পূর্বে বাগবাজারে 'মায়ের বাড়িতে' মাকে যখন প্রথম দর্শন করি, তিনি বসেছিলেন—কাপড় জড়ানো, এখন মাকে দেখলাম ঠিক মায়ের মতোই, একরকম খালি গায়ে—মলিন বস্ত্রে দাঁড়িয়েছিলেন, আমার আগমন-প্রতীক্ষায় স্নেহ ও করুণামূর্তিতে!...

একটু পরেই আমি পুনরায় মায়ের কাছে গেলাম। তিনি তখন পা ছড়িয়ে বসেছিলেন তাঁর মাটির ঘরটির বারান্দায় এবং কুটনো কুটছিলেন। মাকে প্রণাম করে পাশে বসে মহাপুরুষজীর চিঠিখানি পড়ে শোনালাম। তিনি "তারকের" খবর জিজ্ঞেস করলেন, সস্নেহে দুর্ভিক্ষ সেবাকার্যের সব খবর নিলেন। পরে দীক্ষা সম্বন্ধে বললেন, "তা, বাবা, কাল বেশ ভাল দিন (বোধ হয় জন্মাষ্টমী ছিল), কালই তোমায় মন্ত্র দেব। সকালে কিছু খেয়ো না, স্নান করে অপেক্ষা করো। আমি সময়মতো ডেকে নেব।" তারপর পাশের ঘরে তাঁর ঠাকুরঘরে প্রণাম করতে বললেন।

আমি শ্রীশ্রীমায়ের জন্য ঔষধ নিয়ে গিয়েছিলাম—বাঁকুড়ার ডাক্তার স্বামী বৈকুণ্ঠ মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের 'আমবাতের' জন্য হোমিওপ্যাথিক ঔষধ পাঠিয়েছিলেন আমার হাতে। মাকে তা দিতেই তিনি করুণস্বরে বললেন, "বৈকুণ্ঠ ঔষধ পাঠিয়েছে? দাও, বাবা, দাও। বৈকুণ্ঠের ঔষধে অসুখ সেরে যায়। দেখ সারা গায়ে কি হয়েছে—আমবাতের যন্ত্রণায় মরে গেলুম।" এই বলতে বলতে গায়ের কাপড় সরিয়ে সারা বুকে পিঠে আমবাত দেখাতে লাগলেন। মায়ের কষ্ট দেখে চোখে জল এল।

মা ঔষধটি নিয়ে একপাশে রেখে দিলেন এবং খুব আন্তরিকতা ও অন্তরঙ্গতার সঙ্গে বাঁকুড়ার বৈকুণ্ঠ মহারাজ প্রভৃতির সব খবর জিজ্ঞেস করলেন। আরো কত কথা!...

* * *

ঐদিন জয়রামবাটীতে অন্য কোন ভক্ত উপস্থিত ছিল না। রাত্রে মা একটু দূরে দাঁড়িয়ে, আমার সারাদিন খাওয়া হয়নি বলে কত যত্ন করে আমাকে খাওয়ালেন। শুভ প্রভাতের প্রতীক্ষায় অধীর আগ্রহে একপ্রকার বিনিদ্র অবস্থায় রাতটি কেটে গেল। সকালে পুকুরে স্নান করে বসে আছি মায়ের ডাকের প্রতীক্ষায়। দীক্ষার জন্য কি প্রস্তুতির প্রয়োজন—তা জানিও না, জিজ্ঞেসও করিনি, টাকাকড়িও কিছু ছিল না। আন্দাজ আটটায় সেবক মহারাজ আমায় ডেকে শ্রীশ্রীমায়ের ঠাকুরঘরে নিয়ে

গিয়ে দরজা বন্ধ করে চলে গেলেন। মা পূজার আসনে বসে পূজা করছিলেন—পাশে আর একখানি আসন। মা আমায় শ্রীশ্রীঠাকুর প্রণাম করে ঐ আসনে বসতে বললেন। বসতেই আমার হাতে একটু গঙ্গাজল দিলেন, সর্বাঙ্গে গঙ্গাজল ছিটিয়ে আমার মাথায় ও গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। মায়ের স্পর্শে রোমাঞ্চ হতে লাগল, এক অব্যক্ত অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে গেল অন্তর। মা খানিকক্ষণ চোখ বুজে বসে থেকে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "ঠাকুরকে তোমার ভাল লাগে?" আমি সম্মতি জানাতেই তিনবার একটি মন্ত্র উচ্চারণ করে পরে আমাকেও সঙ্গে সঙ্গে তা উচ্চারণ করতে বললেন। এবং হঠাৎ পাশের দেওয়ালের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, "এই, এই তোমার ইষ্ট।" সঙ্গে সঙ্গে ওদিকটা চোখ-ঝলসানো উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল এবং তাতে ভেসে উঠল একটি দেবীমূর্তি জীবন্ত ও জ্যোতির্ময়ী—আমার দিকে সস্নেহে চেয়ে আছেন।...চকিতে কি যেন হয়ে গেল! আমি আত্মবিস্মৃত ও বিহ্বল হয়ে গেলাম।...কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। মায়ের মূর্তিও তখন অন্য রকম।...একটু পরেই মা সস্নেহে বললেন, "বাবা, ভয় হয়েছিল কি?" আমি চুপ করে রইলাম মাথা নিচু করে—জবাব দেবার শক্তি ছিল না। তারপর মা আমার ডানহাতটি ধরে প্রত্যেকটি 'কর' স্পর্শ করে জপের পদ্ধতি দেখিয়ে দিলেন। মা কথা বলছিলেন, কিন্তু আমি যেন কেমন হয়ে গিয়েছিলাম! মা বার বার 'কর' স্পর্শ করে মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে জপ করা দেখাতে লাগলেন, আমাকেও সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র উচ্চারণ করতে বললেন। তাই করলাম। তারপর মা ঠাকুরের পটমূর্তি দেখিয়ে বললেন, "ঠাকুরকে প্রণাম কর, ইনিই তোমার ইষ্ট, ইনিই গুরু—তোমার ইহকাল পরকাল সর্বস্ব। ঠাকুরই সর্বদেবদেবীস্বরূপ।" আমি ঠাকুরকে প্রণাম করে মাকেও প্রণাম করলাম। তারপর তিনি কত জপ করতে হবে তা বললেন এবং ধ্যান সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিলেন।...মা যে কি বা কে তা তখন বুঝতে পারিনি, এখনও কিছুই বুঝি না। কিন্তু তখন মনে হয়েছিল—তিনি ইচ্ছামাত্র ঈশ্বর দর্শন করিয়ে দিতে পারেন।...

মায়ের পূজার আসনের পাশেই দুটি ফল ছিল, তা হাতে নিয়ে তিনি বললেন, "ফলগুলি আমার হাতে দাও।" আমি তাই করলাম। ঐ বোধ হয় গুরুদক্ষিণা। আমি কিছুই সঙ্গে নিয়ে যাইনি—টাকাকড়ি বা ফল-ফুল কিছুই না। আমার সব শরীর কাঁপছিল।...

মাকে পুনরায় প্রণাম করলাম। তাঁকে এত কাছে পেয়ে খুব আনন্দ হচ্ছিল, খুব ভাল লাগছিল। মা সস্নেহে বললেন, "এখন ঘরে গিয়ে বসে যেমনটি দেখিয়ে দিলুম তেমনি ভাবে একটু জপ কর। তারপর জল খাবে।"...

*　　*　　*

বিকালে আবার মায়ের কাছে গিয়েছি—তিনি বারান্দায় মাটির রোয়াকে পা ছড়িয়ে বসে কুটনো কুটছিলেন। বাঁকুড়ার বৈকুণ্ঠ মহারাজের ঔষধে উপকার হয়েছে, আমবাত একটু কমেছে বললেন। একথা-সেকথার পর দুর্ভিক্ষ-সেবাকার্য কিভাবে করা হয় তা জিজ্ঞেস করলেন। কথাবার্তায় বোঝা গেল তাঁর প্রাণ দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের জন্য খুবই কাতর হয়েছে। কিভাবে ঘরে ঘরে গিয়ে গরিবদের টিকিট দিয়ে আসি, কিভাবে তাদের অভাব ও দারিদ্র্যের খোঁজ নিই, টিকিট নিয়ে তারা কিভাবে চাল নিয়ে যায়, মেয়েদের কিছু কিছু কাপড়ও দেওয়া হয়—এসব প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বললাম যা মার অন্তর খুব স্পর্শ করেছিল। বললাম যে, একদিন সকালের দিকে এক গ্রামে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখা গেল যারা চাল নিচ্ছিল, তারা কেউ বাড়িতে নেই। বুঝলাম কোথাও কাজ করতে গিয়েছে। কাজ পেলে আর চাল দেওয়া হয় না, তাই তাদের খোঁজ করতে বের হলাম। গ্রামের বাইরে একটি ধানক্ষেতে হাঁটু সমান জল-কাদার মধ্যে অনেকে ধানরোপা করছে দেখা গেল। সেদিকে এগিয়ে যেতেই দূর থেকে দেখলাম একটি মেয়ে মুনিশ ক্ষেত থেকে উঠে গিয়ে একধারে রোপা করার জন্য যে ধানের চারার বোঝা রয়েছে তার পেছনে আত্মগোপন করল। জিজ্ঞেস করে জানা গেল—গতরাত্রে ঐ মেয়েছেলের একটি সন্তান হয়েছে, তা নিয়েই সে ক্ষেতে কাজ করতে এসেছে। সদ্যপ্রসূত সন্তানটিকে নেকড়া জড়িয়ে ক্ষেতের ধারে রেখে সে ক্ষেতে ধানরোপা করছে পেটের দায়ে। ক্ষেতে কাজ করছে তা ধরা পড়লে আমাদের কাছে চাল আর পাবে না, তাই আমাকে দূর থেকে দেখেই লুকোবার চেষ্টা করেছিল। ঘটনাটি শুনে মনের মধ্যে একটা আলোড়নের সৃষ্টি হলো, কি অবস্থায় পড়লে পূর্বরাত্রে সদ্যপ্রসূত সন্তানটিকে নিয়ে প্রসূতি মাঠে কাজ করতে আসতে পারে! দারুণ আঘাত পেলাম প্রাণে। আমি শুধু ঐ কামিন-এর কাছে গিয়ে রুদ্ধকণ্ঠে বললাম, "না, মা, তোমার চাল কাটব না।" তাতেই সে একটু সাহস করে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে বলল, "বাবু বড্ড কষ্টে পড়েছি। তাই ক্ষেতে কাজ করতে এসেছি।" ক্ষেতে কাজ করলে দু-সের ধান পাবে একদিনে।

শ্রীশ্রীমা ঐ ঘটনাটি শুনে আতঙ্কে শিউরে উঠলেন, কাঁদ কাঁদ হয়ে বললেন, "বল কি গো! অমন পোয়াতি মাঠে কাজ করতে এসেছে! এমন অবস্থায় চাল কাটতে আছে! বেশ করেছ, বাবা। ঠাকুর তোমার কল্যাণ করবেন।" তারপর ঠাকুরের কাছে যেন অভিমান করে মা প্রার্থনা করলেন, "ঠাকুর! তুমি এসব দেখতে পারছ না?—লোকের এত দুঃখ-দুর্দশা! এভাবে মানুষ কি করে! এর একটা বিধান কর।" মায়ের কণ্ঠে কাতর উৎকণ্ঠা—এখনো যেন তা কানে ঝঙ্কৃত হচ্ছে। মা মূর্তিমতী করুণা—আবেগময়ী প্রার্থনা।...

কথায় কথায় পরদিন কামারপুকুর দর্শনে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করতে মা তাতে অনুমতি দিলেন না। বললেন, "না, বাবা, এখন কামারপুকুরে গিয়ে কাজ নেই, পরে কখনো যেও। এখানে কোন রকমে তেরাত্র কাটিয়ে ফিরে যাও। এ ঘোর ম্যালেরিয়ার সময়—ঘরে ঘরে জ্বর। এ সময় কাউকে এখানে আসতে বলি না। তা তারক তোমায় পাঠিয়েছে।"

মায়ের নির্দেশ মেনে নিলাম।...এবং অনেক পরে ১৯৩৭ সালে কামারপুকুর দর্শন করি, জয়রামবাটীতেও আসি। মা যে ঘরটিতে থাকতেন, যেখানে বসতেন, যে ঠাকুরঘরে দীক্ষা দিয়েছিলেন—সেসব স্থান দর্শন ও প্রণাম করি।

* * *

আমার সঙ্গে টাকাকড়ি কিছু ছিল না, গুরুদক্ষিণাও দিতে পারিনি, গুরু সেবার কোন সুযোগই পাইনি—সেজন্য মনের ভিতর খুবই অশান্তি। পরের দিন যখন শুনলাম যে মায়ের সেবক বরদা মহারাজ যাচ্ছেন কোতলপুরের হাটে, আমিও মাকে প্রণাম করে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে হাটে গেলাম। মেঠো রাস্তা—জলকাদা—তিন মাইল পথ অতিক্রম করে যেতে হয়। বরদা মহারাজ ঐ হাটে একঝুড়ি আনাজপত্র ও অন্যান্য জিনিস কিনলেন। আমি একথালা মিছরি কিনলাম মায়ের জন্য এবং দুপুরে কোয়ালপাড়া আশ্রমে খাওয়া-দাওয়া করে বিকালে ঐ ঝুড়িটি মাথায় করে জয়রামবাটীতে ফিরে এলাম। ঐ ঝুড়িতে মায়ের ব্যবহারের জন্য জিনিসপত্র ছিল—তা বয়ে আনাও তো মায়েরই সেবা! জয়রামবাটীতে পৌঁছে আমি যে থালা মিছরিটুকু এনেছিলাম, মাকে দিতেই তিনি দুহাত বাড়িয়ে তা নিলেন এবং খুশি হয়ে বললেন, "বেশ করেছ, বাবা! আমি রোজ একটু একটু মিছরির পানা করে খাব।" আমার চোখে জল এল। মাত্র পাঁচ-আনার মিছরি—তা মা এমন আদর করে গ্রহণ করলেন! মায়ের কোন সেবাই তো করতে পারিনি!

এইভাবে 'তেরাত্র' কেটে গেল। চতুর্থ দিন বিকালের দিকে মাকে প্রণাম করে বিদায় নিতে গেলাম। আমি প্রণাম করতেই তিনি চিবুক ধরে চুমু খেলেন। আমি বালক বুদ্ধিতে তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে হাতজোড় করে কাঁদতে কাঁদতে বললাম, "মা, আপনি আমায় মনে রাখবেন।" তিনিও করুণা করে বললেন, "হাঁ, বাবা, তোমাকে মনে রাখব।" আমি ঐ ভাবে তিনবার প্রার্থনা জানালাম, তিনিও প্রত্যেক বারই বললেন, "হাঁ, বাবা, তোমাকে মনে রাখব।" তিনি আমায় মনে রাখবেন—এই ভেবে আমার অন্তর আনন্দে ভরে গেল আর বাক্যস্ফূর্তি হচ্ছিল না। পুনরায় মাকে প্রণাম করে তাঁর দিকে মুখ করে পেছন হটতে হটতে সদর দরজা পর্যন্ত

এলাম—মা ততক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। শেষবার মাকে দেখে দরজার বাইরে এলাম এবং মায়ের করুণ মুখখানি ও তাঁর কথা ভাবতে ভাবতে প্রায় তিন মাইল অতিক্রম করে এলাম কোয়ালপাড়া আশ্রমে। আমি মার কাছে ভক্তি মুক্তি প্রার্থনা করিনি—মনেও আসেনি।

মাকে পেলেই তো সব পাওয়া হলো—তাঁর করুণা থাকলেই তো সব কিছু হলো। আমি ভুলে যেতে পারি মাকে সংসারের পেষণে মর্দিত হয়ে, ধুলিকাদায় মলিন-দৃষ্টি হয়ে, কিন্তু মা যদি আমায় স্মরণে রাখেন তা হলেই তো সুপথে চলতে পারব, মা যদি স্মরণ করে কোলে তুলে নেন—কোলে কোলে রাখেন, সংসারের মৃত্তিকা গায়ে মাখতে না দেন, তবেই তো আমি হব নির্মল সুন্দর। এই ভেবে মার কাছে শুধু একটি প্রার্থনা জানিয়েছিলাম, "মা, আপনি আমায় মনে রাখবেন।" তিনবার এই প্রার্থনা জানাই, তিনবারই তিনি অভয় দিয়ে বলেছিলেন, "হাঁ, বাবা, তোমাকে মনে রাখব।"...পরে সেবক বরদা মহারাজের মুখে শুনেছিলাম—আমি চলে আসার পর মা তাঁকে ডেকে বলেছিলেন, "দেখ গো, ছেলেটি তিন সত্যি করিয়ে নিলে!" মার মুখ থেকে যে কথা বেরুবে তাই সত্য। তা তিনি ত্রিসত্য করে বলেছিলেন—আমায় ভুলবেন না। এই আমার জীবনে পরম প্রাপ্তি, পরম আশীর্বাদ, পরম অভয় বল-ভরসা ও সান্ত্বনা।

* * *

কোয়ালপাড়া আশ্রমে রাত কাটিয়ে পরদিন ভোরে অল্প অল্প বৃষ্টির মধ্যে রওনা হলাম কোতলপুর হয়ে বিষ্ণুপুর এবং ট্রেনে রাত্রে বাঁকুড়া আশ্রমে; পরদিন মধ্যাহ্নে ইন্দপুর সেবাকেন্দ্রে পৌঁছে ব্রহ্মচারী মহারাজদের প্রণাম করতেই তাঁরা খুব খুশি হলেন। আমি জয়রামবাটী থেকে মায়ের প্রসাদ একটু এনেছিলাম—তাঁরা দুজনেই শ্রীশ্রীমায়ের দীক্ষিত সন্তান, প্রসাদ পেয়ে আনন্দে যেন অধীর হয়ে নাচতে লাগলেন।...

শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা পাবার পরেই জয়রামবাটী থেকে মহাপুরুষজীকে আমার সৌভাগ্যের সংবাদ দিয়ে চিঠি লিখেছিলাম। আবার বাঁকুড়ায় ফিরেও তাঁকে চিঠি লিখি। চিঠি পেয়ে মহাপুরুষজী অসুস্থ শরীরে জবাব দিয়েছিলেন ঃ

শ্রীমান—,

তোমার পত্র পাইলাম। যে পত্র জয়রামবাটী হইতে লিখিয়াছিলে তাহাও পাইয়াছিলাম এবং খুব আনন্দ হইয়াছে যে শ্রীশ্রীমা তোমায় কৃপা করিয়াছেন। আমার শরীর খুব খারাপ হইয়াছিল, এখন কিছু ভাল প্রভুর ইচ্ছায়। খোকা মহারাজ

এখানেই আছেন এবং কিছুকাল আরো থাকিবেন। তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহ প্রীতি জানিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

* * *

দুর্ভিক্ষ-সেবাকার্য শেষ করে আমরা যেদিন বেলুড় মঠে পৌঁছই, সেদিন ৺দেবীপক্ষ পঞ্চমী। মঠে প্রতিমায় ৺দশভুজার পূজার আয়োজন হয়েছে। পুরাতন ঠাকুরমন্দির ও মঠবাড়ির মাঝে চালা বেঁধে গড়ে উঠেছে পূজামণ্ডপ আর সারা উঠান জুড়ে মেরাপ বাঁধা হয়েছে। ৺দুর্গাদেবী মণ্ডপ আলো করে রয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরপ্রণাম করে মহাপুরুষজীর কাছে যেতেই তিনি আনন্দে বলে উঠলেন, "তোমরা এসেছ, বেশ করেছ। মা এসেছেন, এবার মাকে নিয়ে আনন্দ কর।" আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, "তুমি কাল থেকে মাখনের সঙ্গে ভাঁড়ারে কাজ করবে। এখন যাও, থাকবার স্থান খুঁজে নাও, মঠে তো বড্ড ভিড়—তা হয়ে যাবে।" মহাপুরুষজী যেন আনন্দে ফেটে পড়ছেন—কয়েক মাস পরে তাঁকে দেখে খুব আনন্দ হলো।...

পূজার কদিন কেটে গেল। অভাবনীয় লোকসমাগম। মঠে পূজার আনন্দ, সমারোহ—আমার জীবনে এই প্রথম। আনন্দ যেন শতগুণ বেড়ে গেল মহাষ্টমী পূজার দিন—যখন রাজা মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) মঠে এলেন। তিনি দ্বাদশীর দিন বিকালে কলকাতায় ফিরে গেলেন। স্বামী সারদানন্দ মহারাজ শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও দুদিন মঠে ছিলেন।

মহানবমীর দিন রাত্রে এক অভাবনীয় কাণ্ড! কালী-কীর্তনের আসর বসেছে মণ্ডপের পাশের বারান্দায়। রাজা মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) সকলেই কীর্তনে যোগ দিলেন। "সমরে নাচেরে কার এ রমণী" ইত্যাদি গানটি যখন সমস্বরে গাওয়া হচ্ছিল, তখন ভাবের আতিশয্যে প্রথমে রাজা মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) দাঁড়িয়ে পড়লেন নৃত্য করতে করতে, সঙ্গে সঙ্গে মহাপুরুষজী, শরৎ মহারাজ এবং অন্যান্য সাধুরাও গাইতে গাইতে দাঁড়িয়ে নাচতে লাগলেন—কেউ তানপুরা, কেউ বা করতাল বা অন্য বাদ্যযন্ত্র হাতে নাচছেন। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য—অনির্বচনীয় আনন্দের স্রোতে সকলে ভেসে চলছেন! তাঁদের ঐ ভাবময় নৃত্য ও মাতৃনামগানে মাতোয়ারা ভাব স্বর্গীয় পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল।

পূজার কদিন মহাপুরুষজীকে মণ্ডপে অনেক সময় দেখে আনন্দ হতো—তিনি

ধ্যানমগ্ন। আবার আরাত্রিকের সময়ও দীন ভক্তের মতো করজোড়ে দাঁড়িয়ে আরাত্রিক দর্শন করতেন। সব কাজের মধ্যেও তাঁকে দেখা যেত ভাঁড়ারে এসে কাজকর্মের দেখাশুনা করছেন, নির্দেশ দিচ্ছেন। তাঁকে দেখলেই সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠত। লোকজনের প্রসাদগ্রহণ করার সময়ও দেখা যেত মহাপুরুষজী তত্ত্বাবধানরত। সকালে একবার তাঁকে প্রণাম করতে যেতাম, তিনি এত ব্যস্ত থাকতেন যে, কে এল গেল সেদিকে তাঁর মোটেই দৃষ্টি থাকত না।...

দ্বাদশীর দিন বিকালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ কলকাতায় ফিরে যাবেন। সকালবেলা মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীরা সকলেই তাঁকে প্রণাম করতে গিয়েছেন, আমিও সে সঙ্গে গিয়েছি। তিনি বসেছিলেন আরাম-কেদারায় তাঁর ঘরের পাশে গঙ্গার ধারের বারান্দায়।

সাধুরা একে একে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই রাজা মহারাজ কাউকে কাউকে দুটি-একটি কথা জিজ্ঞেস করলেন। তখন মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীরাই গিয়েছিলেন। আমি প্রণাম করে দাঁড়াতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন—"তুই কে? তুই কি মঠের ব্রহ্মচারী?" আমি চুপ করে আছি। মহারাজের পাশেই অমূল্য মহারাজ (স্বামী শঙ্করানন্দ) দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি বললেন, "মহাপুরুষ মহারাজ একে বাঁকুড়ার রিলিফ ওয়ার্ক করতে পাঠিয়েছিলেন, ব্রহ্মচারী হবে।" তা শুনে মহারাজ বলেন, "যা তারকদাকে জিজ্ঞেস করে আয়।" আমি মহারাজের ঘরের ভিতর দিয়েই মহাপুরুষজীর ঘরে গেলাম। তিনি তাঁর তক্তপোশের উত্তরদিকে চেয়ারে বসে চিঠি-পত্র লিখছিলেন। আমি তাঁকে প্রণাম করে বললাম, "আমি মঠের ব্রহ্মচারী কিনা তা রাজা মহারাজ আপনাকে জিজ্ঞেস করতে বলেছেন।" প্রশ্ন শুনে মহাপুরুষজী খানিকক্ষণ চোখ বুজে রইলেন। পরে বললেন, "যাও, মহারাজকে গিয়ে বল যে, তুমি মঠের ব্রহ্মচারী।" মহারাজকে তা বলতেই তিনি খুশি হয়ে বললেন—"তা বেশ বেশ।" ঐদিন আমার নবজীবন লাভ হলো। ঐ দিন থেকে আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিত্র সঙ্ঘভুক্ত হলাম। রাজা মহারাজ ও মহাপুরুষজী আমায় এ দুর্লভ জীবনলাভের অধিকারী করেছিলেন। আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্ঘে স্থান পেয়েছি ভেবে নিজেকে ধন্য মনে করলাম।

মহাপুরুষজী বলতেন—"শ্রীশ্রীঠাকুরের এ পবিত্র সঙ্ঘে স্থান পাওয়া কি চারটি-খানি কথা! বহুজন্মের সুকৃতি না থাকলে তা হয় না। আর শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপাতেই তা সম্ভব। যাকে তিনি তাঁর পবিত্র সঙ্ঘে স্থান দিয়েছেন, তার উপর তাঁর কৃপা হয়েছে বুঝতে হবে। শ্রীশ্রীঠাকুর তার ইহকাল ও পরকালের সব ভার নিয়েছেন। পড়ে থাক, বাবা, জো সো করে পড়ে থাক। তিনি কৃপা করবেনই। Loyalty to

Sangha is loyalty to Thakur (সঙ্ঘের প্রতি আনুগত্য শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিই আনুগত্য)।"

* * *

৺দুর্গাপূজার পরেই ম্যালেরিয়া! সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীরা এক এক করে বিছানা নিচ্ছেন। একে তো লোকজন কম, তার উপর অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়ায় দৈনন্দিন কাজকর্ম চলাই ভার। রোগীদের মুখে একটু জল দেবার লোকও নেই! তখনকার দিনে বেলুড় মঠে ডাক্তার-বৈদ্য বা চিকিৎসাদির ব্যবস্থা খুব সাধারণই ছিল। সাত-আট জন একসঙ্গে জ্বরে পড়েছে। মহাপুরুষ মহারাজই মঠের কাজকর্ম দেখাশুনা করতেন! আমি তখন ঠাকুরের রান্নার ভাণ্ডারের কাজে ভাণ্ডারি মহারাজকে সাহায্য করি—ভাঁড়ার বের করা, কুটনো কোটা, বালীবাজার থেকে তরিতরকারি কিনে তা মাথায় করে বয়ে নিয়ে আসা, খাবার জায়গা করা ইত্যাদি কাজ।

একদিন মহাপুরুষজী আমাকে ডেকে বললেন—"দেখ, ৭।৮ জন জ্বরে পড়েছে। বেচারিরা সময়মত একটু জলও পায় না। তুমি কাল থেকে এদের সেবা করবে। কি কি করতে হবে আমি সব বলে দেব—সব দেখিয়ে দেব।" আমি চুপ করে আছি দেখে তিনি বললেন, "ভোরবেলায় উঠে হাত-মুখ ধোয়ার আগেই তোলা উনুনটিতে গুঁড়ো কয়লা দিয়ে আঁচ ধরিয়ে দিও। তারপর হাতমুখ ধুয়ে এসে কেটলিতে করে একটু জল বসিয়ে দেবে। শালপাতায় একটু নুন-তেল ও বাঁশের চেঁচারির জিভছোলা করে—জগে করে গরম জল নিয়ে সকলের মুখ ধুইয়ে দেবে এবং একটু আদা-মিছরি ও গরম জল সকলকে খেতে দেবে। তারপর আমি সাগু বার্লি ইত্যাদি কি করে করতে হয় দেখিয়ে দেব।" পরদিন তাই করলাম। মহাপুরুষজীও যথাসময়ে নেমে এসে সাগু বার্লি শঠি ইত্যাদি কি করে করতে হয় দাঁড়িয়ে থেকে সব দেখিয়ে দিলেন। দুধ তখন দুর্লভ বস্তু ছিল বেলুড় মঠে, তাই জল সাগু বা জল বার্লিই খেতে হতো সকলকে। এভাবে মহাপুরুষজীর নির্দেশমত দুপুরে, বৈকালে ও রাত্রে রোগীদের পথ্যাদি দিয়ে সেবা করতে লাগলাম।

কুইনাইন খেয়ে খেয়ে ম্যালেরিয়ার রোগীদের মুখ বিস্বাদ হয়ে গিয়েছে, মাথা ঘোরে—বারবার বমি হয়। ফল তো দুরাকাঙ্ক্ষার বস্তু। মঠের তখন আর্থিক অবস্থা এমন নয় যে, রোগীদের জন্য ফলের ব্যবস্থা হতে পারে। তাই মহাপুরুষজী বাগান থেকে ডাঁশা পেয়ারা পেড়ে আনতে বলতেন আর তাঁকে ঠাকুরের প্রসাদী ফল যা দেওয়া হতো তা তিনি না খেয়ে রেকাবি থালা নিয়ে এসে নিজের হাতে রোগীদের বেঁটে দিতেন; কখনো বা আমাদের হাত দিয়েও পাঠিয়ে দিতেন। আবার দেখা যেত—তিনি নিজেই রোগীদের মাথা টিপে দিচ্ছেন বা ঠাণ্ডাজলের পটি দিচ্ছেন

কপালে, গাও টিপে দিতেন। মহাপুরুষজী ছিলেন যেন স্নেহময় পিতা। রোগীরা যেদিন অন্নপথ্য করবে সেদিন মহাপুরুষজী নিজেই মাছের ঝোল রান্না করে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগ উঠে গেলে রোগীদের জন্য রান্নাঘর থেকে ভাত নিয়ে পথ্য খাওয়াতেন। আমি এত হাবা ছিলাম যে, রান্নাবান্না কিছুই জানতাম না, কিন্তু মহাপুরুষজী তাতে আমাকে তিরস্কার না করে অসীম ধৈর্য সহকারে পর পর কয়েকদিন মাছের ঝোল বা নিরামিষ ঝোল রান্না শিখিয়েছিলেন। রোগীদের জন্য তিনি নিজেই আলাদা করে বালীবাজার থেকে কই বা মাগুর মাছ আনিয়ে জিইয়ে রাখার ব্যবস্থা করতেন। এবং একজন ভক্তকে দিয়ে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের ঘানির খাঁটি সরষের তেল আনাতেন। ঐ তেল তাঁর ঘরেই একটি চিনেমাটির জারে করে রেখে দিতেন। মঠবাসীদের অসুখ-বিসুখে তাঁর কত উৎকণ্ঠা!

একদিন দেখি তিনি নিজেই বাগান থেকে একটি নারকেলের বেলো টেনে আনছেন। দূর থেকে দেখতে পেয়ে আমি তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম এবং তাঁর হাত থেকে সেটি নিয়ে টেনে মঠে নিয়ে এলাম। তিনি হাসতে হাসতে বললেন, "তা আমিই নিয়ে যেতে পারব। এটি জ্বালিয়ে আজ মাছের ঝোল রাঁধব।" তা তিনি প্রায় রোজই বাগান থেকে তরিতরকারি তুলে আনতেন এবং বিশেষ বিশেষ ফুল তুলে এনে ভাঁড়ারে দিতেন। কোন কোন দিন পাঁচ-ছয় জন রোগী একসঙ্গে পথ্য করত। তরকারি দেওয়া মাছের ঝোল বাটিতে করে সকলকে দেওয়া হতো। মহাপুরুষজী মায়ের মতো দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে সকলের খাওয়া দেখতেন। আবার সলজ্জভাবে জিজ্ঞেস করতেন—"মাছের ঝোল কেমন হয়েছে?" সকলেই বলে উঠত—"খুব ভাল হয়েছে, মহারাজ!" তা শুনে আনন্দে ও তৃপ্তিতে তাঁর মুখটি প্রফুল্ল হয়ে উঠত।

মঠের বামুন-চাকরদের সুখ-দুঃখের সঙ্গেও মহাপুরুষজী নিজেকে বিশেষ জড়িত রাখতেন। তারা ঠাকুরের সেবা করছে—ঠাকুরের সংসারেরই লোক, এই ছিল তাঁর ভাব। সাধু-ব্রহ্মচারীদের অসুখ হলে যেমন সেবাযত্নের ব্যবস্থা করতেন, তাদের জন্যও তেমনি। মঠের চাকর নিধিয়াও জ্বরে পড়েছে। সে গোয়ালের কাজ করত। তখনকার দিনে বামুন ও চাকররা সকলেই মঠের ঠিক লাগোয়া উত্তর পাশের বাগান-বাটিতেই থাকত। বাগানের মালির নাম সোনা—উড়িষ্যাদেশবাসী। সেজন্য মালির নামে ঐ বাগান-বাটির নাম ছিল—'সোনার বাগান'। বামুন-চাকর সকলেই উড়িয়া, তাই সকলে একসঙ্গে থাকত সেই বাগান-বাটিতে। মঠ থেকে ঐ বাগানে প্রবেশের দরজা ছিল। বামুন-চাকরদের অসুখ হলে সাগু বার্লি ঐ বাগানে দিয়ে আসতে হতো।...

কিছুদিন পরে কার্তিকমাসের শেষে আমি জ্বরে পড়লাম। মঠের আর সকলেই তখন সেরে উঠেছে, কাজকর্মে লেগেছে—তাই আমার সেবাযত্ন সকলে মিলে খুব করতেন; মহাপুরুষজীও দিনে দুবার এসে খবর করতেন—কখনো নিজের হাতে ফল দিয়ে যেতেন।...

ক্রমে স্বামীজীর তিথিপূজার আয়োজন হতে লাগল। রোজ সকালে মহাপুরুষজীর ঘরে সকলে সমবেত হলে তিনি উৎসবের আয়োজন-প্রসঙ্গে কথাবার্তা বলেন আবার কোন কোন দিন খুব মত্ত হয়ে স্বামীজীর প্রসঙ্গ করতেন।

ক্রমে স্বামীজীর উৎসবও এসে গেল। তখনকার দিনে স্বামীজীর উৎসব বেশ ঘটা করে দু-দিন হতো। তিথিপূজার দিন বিশেষ পূজানুষ্ঠান ছাড়া খুব ভোগরাগ হতো এবং অনেক ভক্ত বসে প্রসাদ পেতেন। সাধারণ উৎসবের দিন ৬।৭ হাজার দরিদ্রনারায়ণ বসে খেত। স্বামীজীর তিথিপূজার দিনই হতো ব্রহ্মচারীদের ব্রহ্মচর্য এবং রাজা মহারাজই সঙ্ঘাধ্যক্ষ ছিলেন—তিনিই ব্রহ্মচর্য দিতেন। সেবারও স্বামীজীর উৎসবে আমরা ১০।১২ জন (যতদূর মনে পড়ে ঐ বৎসর মঠে বার জনের ব্রহ্মচর্য হয়েছিল) ব্রহ্মচর্যের জন্য মহাপুরুষজীর কাছে প্রার্থনা জানালাম। রাজা মহারাজ তখন ভুবনেশ্বর মঠে ছিলেন। মহাপুরুষজী তাঁকে স্বামীজীর উৎসবে মঠে আসার আহ্বান জানিয়ে ব্রহ্মচর্যের বিষয় লিখলেন। মহারাজ জবাবে জানালেন যে, তাঁর শরীর তত ভাল নয়, মঠে যেতে পারবেন না, ভুবনেশ্বরেই ব্রহ্মচর্য দেবেন। কিন্তু সমূহ সমস্যা দাঁড়াল যে মঠ থেকে একসঙ্গে ১০।১২ জন কর্মী-ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরে ব্রহ্মচর্য নিতে গেলে স্বামীজীর উৎসবের কাজকর্ম চলবে কি করে এবং এত জনের ভুবনেশ্বর যাতায়াতের খরচের টাকাই বা আসবে কোত্থেকে! তাই মহারাজ যদি মঠে না আসেন তো সে বৎসর ব্রহ্মচর্য বন্ধ রাখা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। এ পরিস্থিতিতে ব্রহ্মচর্য-প্রার্থীরা সকলেই খুব মুষড়ে পড়ল। মহাপুরুষজীর কাছে ক্রমাগত আবদার করতে লাগল যাতে সকলের ব্রহ্মচর্য হয়, সে সম্বন্ধে ব্যবস্থা করার জন্য। মহাপুরুষজী সব অবস্থা জানিয়ে মহারাজকে লিখতে জবাবে মহারাজ তাঁর প্রতিনিধিরূপে মহাপুরুষজীকেই ব্রহ্মচর্য দেবার অনুমতি দিলেন। এ সংবাদে ব্রহ্মচর্য পাবার আশায় আমাদের সকলেরই খুব আনন্দ হলো। সে বৎসরই সঙ্ঘের তরফ থেকে মহাপুরুষজী বেলুড় মঠে আমাদের প্রথম ব্রহ্মচর্য দিলেন—স্বামী শুদ্ধানন্দ মহারাজ ছিলেন আচার্য! আবার মহারাজও মাদ্রাজে কর্মিরূপে প্রেরিত দু-জন বা তিন জন ব্রহ্মচারীকে ভুবনেশ্বরে ব্রহ্মচর্য দিয়েছিলেন। খুব সম্ভব সে বৎসরই প্রথম রাজা মহারাজের আদেশে মহাপুরুষজী মঠে ব্রহ্মচর্য দিলেন এবং অব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীদেরও শিখা সূত্র ও গায়ত্রী দিয়েছিলেন। মহারাজকে উৎসব ও ব্রহ্মচর্যের

সব বিবরণ জানিয়ে মহাপুরুষজী চিঠি লিখলেন; মহারাজজীও নবীন ব্রহ্মচারীদের তাঁর আশীর্বাদ পাঠিয়েছিলেন। আমার ব্রহ্মচর্যের 'শঙ্কর-চৈতন্য' নাম মহাপুরুষজীই দিয়েছিলেন এবং তারপর থেকে তিনি ব্রহ্মচর্য-ব্রতের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে চিঠিপত্রে আমাকে ঐ নামেই সম্বোধন করতেন।...

* * *

আমার ম্যালেরিয়া জ্বর কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না। প্রায়ই জ্বর হয়—প্লীহা যকৃতও বেড়ে গিয়েছিল, শরীর রক্তহীন ও কৃশ। মহাপুরুষজী বিশেষ চিন্তিত হলেন। তখনকার দিনে বেলুড়মঠে চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাও ছিল না—বায়ু-পরিবর্তনের উপযুক্ত স্থানও নেই, তাই তিনি মানভূম জিলার বাগদা গ্রামে স্থানীয় ভক্তদের দ্বারা স্থাপিত যে আশ্রম ছিল সে আশ্রমে আমাকে বায়ু-পরিবর্তনের জন্য পাঠালেন। মঠের ব্রহ্মচারী বিজ্ঞানচৈতন্য মহারাজ ওখানে থেকে মুখ্যত সাধন-ভজন করতেন। স্থানটি স্বাস্থ্যকর এবং আশ্রমে দুধ মাছ প্রভৃতির ব্যবস্থাও ছিল।

মঠ ছেড়ে বাগদায় যাবার সময় খুব কেঁদেছিলাম। মহাপুরুষজীকে ছেড়ে যেতে কিছুতেই ইচ্ছা হচ্ছিল না। তিনি সস্নেহে চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, "ওখানে তোমার কোন কষ্ট হবে না, আমি বিজ্ঞানচৈতন্যকে সব লিখে দিয়েছি—সে তোমার খুব যত্ন করবে। মাঝে মাঝে চিঠি লিখো" ইত্যাদি।

মাস দুই থাকার পরও জ্বরের কোন প্রকার উপশম হচ্ছিল না। জ্বর বরং বিকটাকার ধারণ করল। এত বেশি জ্বর হতো যে, একদিন মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম।

বাড়াবাড়ি জ্বরে এত ভুগছিলাম যে, আমি জীবন সম্বন্ধে হতাশ হয়ে—এ অবস্থায় শরীর গেলে মানবজীবনের উদ্দেশ্য যে ভগবানলাভ তা থেকে বঞ্চিত থাকব—এই ভেবে ভয়ে মহাপুরুষজীর আশীর্বাদ ভিক্ষা করে চিঠি লিখেছিলাম। তিনি জবাবে বেলুড় মঠ থেকে ৬।৪।২০ তারিখে লিখেন—"তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত জ্ঞাত হইলাম। বিজ্ঞানচৈতন্য পত্রে তোমার অসুখের কথা জানিয়েছিল এবং তার উত্তরও দিয়াছি—বোধহয় তাহা তুমি শুনিয়াছ। আরো কিছুকাল ওখানে থাকিলে তবে তুমি সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিবে নিশ্চয়ই। Spleen ও Liver-এর Complain যখন অনেকটা সারিয়াছে তখন ইহা নিশ্চয় যে, অধিকদিন আর তোমায় ভুগিতে হইবে না।

ধ্যান-জপের জন্য প্রভুর কৃপায় ও শ্রীশ্রীমার আশীর্বাদে তোমায় কিছু ভাবিতে হইবে না। তাঁরা যখন তোমায় ঘোর সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া আনিয়াছেন,

কাম-কাঞ্চনরূপ চির-করাল রাক্ষসের গ্রাস হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন, তখন আর তোমার ধ্যান-জপের জন্য ভাবনা নাই। কিছুদিন শারীরিক অসুস্থতার জন্য যদি উহা কম হয় তাহাতে তোমার কোন ক্ষতি হইবে না। আবার যখন শরীর বেশ সুস্থ হইবে তখন করিবে, কোন চিন্তা নাই। গরমটা ভাল করিয়া পড়িলে শরীরে যখন খুব ঘাম হইতে আরম্ভ হইবে, তখন শরীর ক্রমে নীরোগ হইবে—মনও সুস্থ হইবে এবং সাধন-ভজন পাঠ ও প্রভুর কাজ উত্তমরূপে করিতে পারিবে, কোন ভয় নাই।...

মহারাজ এখন ভুবনেশ্বরে। তাঁর শরীর ভালই আছে।...তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহ-প্রীতি জানিবে এবং কৃষ্ণানন্দকে ও ওখানকার ভক্তদের সকলকে জানাবে। কেমন থাক মধ্যে মধ্যে লিখিবে।"

মহাপুরুষজীর ঐ চিঠিগুলি আমার জীবনে মন্ত্রশক্তির মতো কাজ করত এবং তাঁর আশীর্বাদ যে অমোঘ তা বহু ঘটনার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করে অন্তর 'অভী' হয়ে যেত। তাঁর বাক্য সত্য, আশীর্বাদ সত্য, ভবিষ্যদ্‌বাণী সত্য—নানাভাবে তা দেখে ধন্য হয়েছি। সে সময়ে আমি বাগদা আশ্রমে ঠাকুরপূজা করতাম। মহাপুরুষজীর ঐ আশীর্বাদ পাবার পরেই পূজা করার সময় এমন কয়েকটি অলৌকিক ঘটনা হয়ে গেল যাতে করে মহাপুরুষজী ইচ্ছা করলেই মানুষের মন ভগবন্মুখী ও সমাধিস্থ করে দিতে পারেন—সে বিষয়ে দৃঢ়বিশ্বাসী হলাম।

তিনি আমার মতো অল্পবিশ্বাসীদের মনে বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য কখনো কখনো বলেছেন, "আমরা লোক ঠকাতে আসিনি, বাবা, যা হোক—তাই বলে দেই। ...লোকের কল্যাণ-কামনা ছাড়া আমাদের অন্য কোন কামনা-বাসনা নেই। ...শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে যারা আশ্রয় নিয়েছে—তাদের আধ্যাত্মিক কল্যাণ-অকল্যাণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমাদের," ইত্যাদি।

তা তিনি সে দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। সকলের আধ্যাত্মিক কল্যাণসাধনই ছিল তাঁর একমাত্র জীবনব্রত।

মহাপুরুষজীর আশীর্বাদ ঠিকই ফলেছিল। গরম পড়তে জ্বরের প্রকোপটা একটু কম হলো। তাঁর উৎকণ্ঠা-নিরসনের জন্য আমি সে সংবাদ দিয়ে তাঁকে চিঠি লিখি। জবাবে ৮।৫।২০ তারিখে বেলুড় মঠ থেকে তিনি লিখেছিলেন—"তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। প্রভুর কৃপায় তুমি এখন একটু ভাল আছ জানিয়া সুখী হইলাম। প্রভুর কৃপায় তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হও—প্রার্থনা করি এবং যথাসম্ভব তাঁর স্মরণ ধ্যানজপ করিতে থাক। এখন খুব গরম পড়িয়াছে—অধিক ধ্যানজপ করিতে চেষ্টা করা ভাল নয়। বিজ্ঞানচৈতন্য চলিয়া গিয়াছে, কোন চিন্তা নাই। প্রভুই

তোমাকে দেখিতেছেন, ভক্তেরা সব আছেন—কৃষ্ণানন্দ নিকটেই আছে। সকলেরই সহিত বেশ প্রীতির সহিত ব্যবহার করিবে। প্রভুকে ভালবাসিলে জগতে সকলেই ভালবাসিবে। তাঁর কৃপাই মূল—কোন চিন্তা নাই।

শ্রীশ্রীমার শরীর ভাল নয়। জ্বর প্রত্যহই হয়। চিকিৎসা যতদূর ভাল হইতে পারে তাহা হইতেছে। খুব দুর্বল, ডাক্তার অন্ন বন্ধ করিয়াছেন। দুধ, সাগু ও ফলাদি যথা—বেদানা, কমলালেবু, আঙ্গুর এইসব পথ্য দিতেছেন। এখন প্রভুর যা ইচ্ছা। মধ্যে অসুখ খুব বৃদ্ধি পাইয়াছিল, আজকাল একটু কম।

মঠের Climate (জলবায়ু) এখন মন্দ নয়—তবে আশেপাশে কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি কিছু কিছু হইতেছে। স্বামীজীর মন্দির নির্মাণকার্য চলিতেছে, খানিকটা হইয়াছে। তবে এখন সম্পূর্ণ হইবে না বোধ হয়। Materials-এর মূল্য ভয়ানক বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাঁর ইচ্ছায় যাহা হয় হইবে।

এই জন্মেই তোমার পূর্ণ বিশ্বাস ভক্তি হইবে—সেজন্য কোন চিন্তা নাই। বেশ সাবধানে আহারাদি করিবে। প্রভু তোমায় দেখিতেছেন—কোন চিন্তা নাই। আবশ্যক বোধকর তো মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণানন্দকে আসিতে বলিও, বা তুমিও ইচ্ছা হইলে এবং শরীরে যথেষ্ট সামর্থ্য থাকিলে কখনো কখনো পুঞ্চাতে যেতেও পার। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহ-প্রীতি জানিবে। মধ্যে মধ্যে কেমন থাক লিখিবে। এখানেও গরম বেশ। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী—শিবানন্দ

* * *

মহাপুরুষজীর চিঠিতে শ্রীশ্রীমায়ের কঠিন অসুখের সংবাদ পেয়ে অবধি মাকে দেখবার জন্য মনটা ছটফট করতে লাগল। মঠে ফিরবার অনুমতি প্রার্থনা করে মহাপুরুষজীকে চিঠি লিখলাম। তিনি জবাবে অনুমতি দিয়ে ভাড়ার টাকা পাঠিয়ে জানালেন যে, আরো কিছুদিন ওখানে থাকলে স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল হতো। কিন্তু শ্রীশ্রীমাকে দেখবার খুব ইচ্ছা যখন হয়েছে তখন মঠে ফিরে আসতে পার।

কিছুদিন পরেই মঠে ফিরে এসে তার পরদিনই শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে মায়ের বাড়িতে গেলাম। কিন্তু মায়ের শরীর খুব খারাপ বলে দর্শনাদি সব বন্ধ ছিল। তবু মঠ থেকে গিয়েছি বলে পূজনীয় শরৎ মহারাজের বিশেষ অনুমতিক্রমে শুধু দূর থেকে দর্শন ও প্রণাম করে মায়ের শারীরিক অবস্থার খবর সব জেনে অগত্যা মঠে ফিরে এলাম। মায়ের চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করা হলো না—মায়ের সঙ্গে দুটি কথাও বলতে পারলাম না—খুবই কষ্ট হলো মনে! তখন জয়রামবাটীতে মাকে যে

দেখেছিলাম, তাঁর কাছে বসে কথাবার্তা বলেছিলাম, তাঁর পাদস্পর্শ করে প্রণাম করেছিলাম—সেসব কথা খুব মনে পড়তে লাগল।

শ্রীশ্রীমায়ের শরীর খারাপ বলে মহাপুরুষজী রোজ মঠ থেকে একজনকে মায়ের খবর জানবার জন্য উদ্বোধনে পাঠাতেন। (মঠে টেলিফোন বা বৈদ্যুতিক আলো তখনও হয়নি)। আমি মায়ের বাড়ি থেকে ফিরে মহাপুরুষজীকে প্রণাম করতেই তিনি মায়ের খবর জিজ্ঞেস করলেন। মায়ের হাতে পায়ে শোথ দেখা দিয়েছিল, দু-পা-ই ফুলে গিয়েছিল এবং খুব অরুচি। পূজনীয় শরৎ মহারাজ বলেছিলেন যে, কবিরাজ 'শ্বেতপুনর্নবার' শাক পথ্য দিয়েছেন আর অরুচির জন্য 'আমরুল শাকের' চাটনির মতো করে খেতে বলেছেন। তা শুনেই মহাপুরুষজী বললেন, "মঠের বাগানে তো প্রচুর পুনর্নবা হয়েছে, আমরুল শাকও খুব আছে। তুমি রোজ সকালে মায়ের জন্য কিছু পুনর্নবা ও আমরুল শাক নিয়ে যেও এবং মায়ের খবরও নিয়ে এসো।" তিনি তখনই 'বড়দা'কে ডেকে কিছু ভাল আমরুল শাক ও পুনর্নবা রোজ তুলে দিতে বললেন। পরদিন থেকে বড়দা শাক তুলে কলাপাতায় বেঁধে দিতেন, আমি ভোরবেলায় খেয়া-নৌকায় গঙ্গা পেরিয়ে কুটিঘাট থেকে হেঁটে ৮টার মধ্যেই উদ্বোধনে পৌঁছে ঐ শাক সেবক মহারাজের হাতে দিতাম এবং দূর থেকে শ্রীমাকে প্রণাম করে মায়ের খবর নিয়ে মঠে এসে মহাপুরুষজীকে মায়ের খবর দিতাম। মহাপুরুষজী খুব ব্যগ্র হয়ে সব শুনতেন—মঠের আর সব সাধুরাও। এই সুযোগে প্রায় দেড়মাস রোজ মায়ের দর্শন করার সৌভাগ্য হয়েছিল। মহাপুরুষজীই দয়া করে আমাকে এভাবে শ্রীশ্রীমায়ের সামান্য সেবা করার সুযোগ দিয়েছিলেন, সেজন্য আজও আমার অন্তর তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে আছে। সব চাইতে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঐ দেড়মাস মাকে দূর থেকে প্রণাম করার সময় রোজই দেখেছি যে, মা শীর্ণ শরীরে বারান্দায় দরজার দিকে মুখ করে মেজেতে শুয়ে আছেন এবং আমি যখন প্রণাম করতাম তিনি সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে সস্নেহে আমাকে দেখতেন। আহা! সে চাহনিতে কত স্নেহ, মমতা ও করুণা! তিনি কথা বলেননি, কিন্তু দৃষ্টির ভিতর দিয়ে করুণা বর্ষণ করেছেন—স্নেহ-মমতার স্পর্শ দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ঐ দৃষ্টির মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে মিলন হতো—তিনি আমার অন্তর স্নেহস্নাত করতেন, এক অনির্বচনীয় দিব্যানন্দে হৃদয় ভরে যেত। প্রণাম করে হাঁটু গেড়ে করজোড়ে মৌনপ্রার্থনা জানিয়ে যখন চলে আসতাম, তখন শ্রীশ্রীমায়ের স্নিগ্ধ সজল চোখ দুটি থেকে যেন করুণা বর্ষিত হতো আর যতদূর থেকে দেখা যেত দেখতাম মা অপলক নেত্রে আমাকেই দেখছেন। আহা! সে দৃষ্টি এখনো আমার অন্তর প্রেমজ্যোতিতে আলোকিত করে দিচ্ছে, দিব্যানন্দে ভরে দিচ্ছে আর বর ও অভয়ে হৃদয়-মন পরিপূর্ণ করে দিচ্ছে। তাঁর সেই শুভদৃষ্টি জীবনাকাশে উদীয়মান

ধ্রুবতারারূপে বিরাজিত আর তাঁর সেই অনিমেষ নেত্র সদাজাগ্রত প্রসন্নময় অচঞ্চল প্রহরিরূপে আমার জীবননিশীথে রয়েছে প্রতিষ্ঠিত হয়ে। যত দিন যাচ্ছে—শ্রীশ্রীমায়ের সেই সস্নেহ দৃষ্টি আমার অন্তরকে করছে প্রেমানন্দে অভিসিঞ্চিত।

সামান্য সেবা করার সূত্রে ঐভাবে প্রায় দেড়মাস প্রতিদিন সকালে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন পেয়েছি, পেয়েছি তাঁর অযাচিত অফুরন্ত করুণা যা আমার সমগ্র জীবনকে সার্থক ও আনন্দমধুর করে রেখেছে। মায়ের করুণ অনিমেষ দৃষ্টি যখন আমার এ ক্ষুদ্র জীবনকে ঘিরে রয়েছে, তখন আর ভয় কি? "সদানন্দসুখে ভাসে শ্যামা যদি ফিরে চায়।"

ঐ সময়ে একদিন মায়ের বাড়ি থেকে ফিরে মহাপুরুষজীকে প্রণাম করতেই তিনি মায়ের কুশল-সংবাদ জিজ্ঞেস করলেন। আমি চিকিৎসা ও পথ্যাদি বিষয় নিবেদন করে যখন বললাম যে, রাত্রে তাঁর এতটুকুও ঘুম হয়নি, সর্বাঙ্গে অসহ্য জ্বালা, ছটফট করেছেন—শুনতে শুনতে মহাপুরুষজীর চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে গেল, তিনি কম্পিত কণ্ঠে বললেন, "আহা! সকলের পাপ গ্রহণ করেই তো মায়ের এত অসুখ। তাইতো সর্বাঙ্গে তাঁর ঐ বিষের জ্বালা। তিনি শত শত সন্তানের পাপতাপ নিজের ভিতর আকর্ষণ করে নিয়ে সন্তানদের নিষ্পাপ করে দিচ্ছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপা ও মায়ের কৃপা একই। ঠাকুর নরদেহ ত্যাগ করে এখন শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে বাস করছেন। যারা মায়ের কৃপা পেয়েছে তাদের এই শেষ জন্ম। মা, মা, তুমি ভক্তদের জন্য কত কষ্টই না সহ্য করছ!

"একদিন ঠাকুর আমায় বলেছিলেন—'ঐ যে নহবতে আছে সে আর মন্দিরের ভবতারিণী একই।' আমি তখন কি এত সব বুঝতাম! তিনি বলেছিলেন—শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। যে মাকে দর্শন করেছে—সে মুক্ত হয়ে যাবে। মায়ের দর্শন কি কম ভাগ্যের কথা!" বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

আমি তখন কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলাম—"মাকে রোজ তো দর্শন করছি, কিন্তু মায়ের মুখের একটি কথাও তো শুনতে পাই নি। আমার কেবলই মনে হয়—আহা! মা যদি একটি কথাও বলতেন!"

মহাপুরুষজী খুব আবেগভরা কণ্ঠে বললেন—"ঐ যে মা তোমার দিকে চেয়ে থাকেন, ঐ তো তাঁর আশীর্বাদ। তিনি কৃপাদৃষ্টিতে তোমায় দেখেছেন। তোমার জীবন ধন্য হয়ে গিয়েছে। মায়ের কৃপা পেয়েছ—তোমার এ জীবনের পক্ষে তাই যথেষ্ট। এখন তাঁর শরীর এত খারাপ, কি করে তোমার সঙ্গে কথা বলবেন? তিনি এত দুর্বল যে, কথা বলার শক্তিই তো নেই! তিনি সুস্থ হয়ে উঠলে তাঁর মুখের কথা শুনতে পাবে।"

মহাপুরুষজীর সে শুভ-ইচ্ছা এক অলৌকিক উপায়ে আক্ষরিকভাবে সত্য হয়েছিল। দেহত্যাগের রাত্রিতে শ্রীমা দিব্যদেহে জ্যোতির্ময়ীরূপে দর্শন দিয়ে আমায় শেষ আশীর্বাদ করেছিলেন।

* * *

কয়েকমাস পর জামসেদপুর বিবেকানন্দ সোসাইটির সেক্রেটারি বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষের কাছে বেলুড় মঠ থেকে একজন কর্মী পাবার প্রার্থনা জানান। আমাকে সেখানে পাঠাবার কথা হয়। মহাপুরুষজীর কাছে আমার জামসেদপুর যাবার কথা পরেশ মহারাজ তুলতেই তিনি একটু গম্ভীর হয়ে বললেন—"না, ও মঠের ছেলে, মঠেই থাকবে।" পরেশ মহারাজ দ্বিরুক্তি না করে চলে এলেন। আমার সঙ্গে দেখা হতে তিনি হাসতে হাসতে বললেন—"আপনার ফাঁড়া কেটে গেল।" আমি তো আড়াল থেকে সবই শুনেছিলাম।

এর কয়েক মাস পর ১৯২১ সালের গোড়ার দিকে আমাকে কর্মিরূপে Kuala Lampur (F. M. S.) কুয়ালালামপুর (মালয় উপদ্বীপ) আশ্রমে পাঠাবার কথা হয়েছিল। তার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন স্বামী শুদ্ধানন্দ মহারাজ এবং ব্যবস্থাও অনেকটা এগিয়েছিল, কিন্তু মহাপুরুষজীর কাছে এ প্রস্তাব তুলতেই তিনি শুধু বললেন, "না, ও এখনো ছেলেমানুষ; অত দূরে কোথায় যাবে?" আমি মঠেই রয়ে গেলাম।

তৃতীয় বারও আমার বেলুড় মঠ থেকে অন্যত্র যাবার কথা হয়েছিল, কিন্তু মহাপুরুষজী তাও নাকচ করে দিলেন। এবার অবশ্য তাতে আমার মনে খুব কষ্ট হয়েছিল। ১৯২২ সালের গোড়ার দিকে যখন আমাকে কাশীতে পূজনীয় হরি মহারাজের সেবার জন্য পাঠাবার প্রস্তাব হলো, তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের একজন অন্তরঙ্গ সন্ন্যাসী পার্ষদ ও ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের সেবা করার সুযোগ পাব ভেবে আমার মনে খুবই আনন্দ হয়েছিল। বিশেষ করে পূজনীয় হরি মহারাজ প্রথম দর্শনেই আমার অন্তর জয় করেছিলেন এবং আমার প্রতি অফুরন্ত স্নেহ, করুণা ও কৃপা দেখিয়েছিলেন। সেবারও মঠের ম্যানেজার মহারাজ যখন মহাপুরুষজীর কাছে আমায় হরি মহারাজের সেবার জন্য কাশী পাঠাবার প্রস্তাব তুললেন, তখন তিনি কিন্তু আমার নাম করে বললেন, "না, ও মঠের ছেলে, মঠেই থাকবে।" তখন অবশ্য এর পেছনে যে শ্রীশ্রীঠাকুরের একটা বিশেষ শুভ ইচ্ছা ছিল তা বোঝবার মতো বুদ্ধি আমার হয়নি। আজ এত বৎসর পরে সব কিছুই দিবালোকের মতো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। মহাপুরুষজী এভাবে আমাকে মঠে রেখেছিলেন বলেই আমি ঐ যাত্রায় একটানা ১৮ বৎসর বেলুড় মঠে থাকার সুযোগ পেয়েছিলাম এবং সে

সূত্রে প্রায় ১৬/১৭ বৎসর মহাপুরুষজীর সঙ্গলাভ ও সাথে সাথে স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ, স্বামী সারদানন্দ মহারাজ, স্বামী সুবোধানন্দ মহারাজ, স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ, স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ প্রভৃতি তৎকালে স্থূলদেহে বর্তমান শ্রীশ্রীঠাকুরের সাতজন সন্ন্যাসী পার্ষদ এবং শ্রীমাস্টারমশাই প্রভৃতি সাত-আটজন গৃহি-পার্ষদ ভক্ত, গৌরী-মা, যোগীন-মা প্রভৃতি আট-নয়জন স্ত্রী-পার্ষদ ভক্তের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়ে তাঁদের আশীর্বাদলাভের দুর্লভ সৌভাগ্যলাভ হয়েছিল। অত জন মহাপুরুষের আশীর্বাদলাভ, তাঁদের সঙ্গ ও উপদেশাদিলাভ এবং ঘনিষ্ঠ পরিচয় সবই আমার সন্ন্যাসজীবনের অমূল্য আধ্যাত্মিক সম্পদ এবং মহাপুরুষজীর কৃপাতেই তা লাভ করা সম্ভব হয়েছিল। সর্বোপরি তিনি যে আমাকে সঙ্ঘভুক্ত করার সময় লিখেছিলেন—"...মঠে আসিলে আমরা তোমাকে এমন বিদ্যা শিখাইব যাহাতে তোমার ভগবান লাভ হয়।" ইত্যাদি—তাঁর সেই কথাকে সত্যে পরিণত করার জন্যই যেন আমাকে শেষের দ্বাদশ বৎসর কাল গুরুসেবারূপ তাঁর সেবার দুর্লভ অধিকার দিয়ে আমার আধ্যাত্মিক জীবনের শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ ও সার্থক করেছিলেন।...

* * *

মহাপুরুষজীর কাছে সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী ও ভক্ত নর-নারী সকলেরই অবারিত দ্বার। সকালবেলা তিনি ধ্যান করে ঠাকুরমন্দির থেকে তাঁর ঘরে আসার পর হতে খাবার ঘণ্টা পড়া পর্যন্ত, আবার বিকাল অড়াইটা তিনটার পর থেকে রাত্রে শোবার আগে পর্যন্ত সব সময় সকলেই মহাপুরুষজীর দর্শন, উপদেশ-শ্রবণ এবং স্নেহ-ভালবাসা আদর-আপ্যায়ন ও আশীর্বাদলাভে নিজেদের পরিপূর্ণ-অন্তঃকরণ মনে করত। আমাদেরও বিশেষ করে মনে পড়ে সকালবেলা মন্দিরে প্রণাম করে যখন মহাপুরুষজীর ঘরে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করতাম তখন মনে হতো যে, সমগ্র জীবনের বিশেষ করে ঐদিনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁর শ্রীচরণে অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হয়েছি। ব্রহ্মজ্ঞানে দীপ্তিপূর্ণ তাঁর সহাস্য বদন, সস্নেহ সম্বোধন, আন্তরিকতাপূর্ণ কুশল-প্রশ্নাদি—সবকিছু মনকে সে সময়ের জন্য এক অতীন্দ্রিয় লোকে নিয়ে যেত এবং অন্তর ভরে যেত এক অপার্থিব দিব্যানন্দে। সকালবেলার ঐ মজলিসে কোন কোন দিন খুব উচ্চাঙ্গের আলোচনা হতো এবং প্রায় প্রতিদিনই শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও স্বামীজী এবং সন্ন্যাসজীবন বা সঙ্ঘের আদর্শাদি সম্বন্ধে তিনি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ করতেন। বেলুড় মঠ তাঁর খুবই প্রিয় স্থান ছিল। একদিন সকালে বেলুড় মঠের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সকলকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"বেলুড় মঠ কি কম স্থান গা! স্বয়ং শিবাবতার স্বামীজী এখানে বাস করতেন—

এখানেই তিনি সমাধিযোগে দেহত্যাগ করেন। কিন্তু এখনো তিনি সূক্ষ্মদেহে এ মঠে রয়েছেন। তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়। আমি তো তাঁর ঘরের পাশ দিয়ে যেতে কখনো কখনো দেখি তিনি ঘরে রয়েছেন। এ স্থানটি তাঁর খুব প্রিয় ছিল। ঠাকুর বলেছিলেন স্বামীজীকে, 'তুই কাঁধে করে আমায় যেখানে নিয়ে যাবি, আমি সেখানেই (দীর্ঘকাল) থাকব।' তাই তো স্বামীজী নীলাম্বরবাবুর বাড়ি থেকে 'আত্মারামের কৌটাটি নিজে কাঁধে করে এনে এ মঠে স্থাপন করেছিলেন। তখন থেকে ঠাকুরকে কেন্দ্র করে এ মঠে কত ধ্যান-জপ, সাধন-ভজন, ত্যাগ-তপস্যা, শাস্ত্রাদিপাঠ-আলোচনা ও ভজন-কীর্তন হয়েছে—এখনো হচ্ছে। এ বেলুড় মঠ সমগ্র সঙ্ঘের মাথা। এখানে ঠাকুরের সেবাপূজাদি ঠিক ঠিক হলে, বেলুড় মঠটি ভালভাবে চললে—সমগ্র সঙ্ঘই ঠিক চলবে। তাইতো ঠাকুরের সেবায় এতটুকু ত্রুটি হলেও তোমাদের এত বকি, এত শাসন করি। এ মঠ কি কম স্থান গা!—এ যুগের মহাতীর্থ।

"শ্রীশ্রীমা-ই তো প্রথম নিজের হাতে ঠাকুরকে পূজা করে এখানে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। স্বামীজী এ মঠের জমি কেনার অনেক আগে শ্রীশ্রীমা একবার ঘুসুড়ি থেকে নৌকায় মাঝগঙ্গা দিয়ে দক্ষিণেশ্বর যাবার সময় দেখেন যে, ঠাকুর আদুড় গায়ে ঐ জমিতে বেড়াচ্ছেন। তখন ঐ জমির একপাশে কয়েকটি কলাগাছ ছিল। ঠাকুরকে ঐভাবে ওখানে বেড়াতে দেখে মা অবাক হয়ে ভাবছিলেন—তাইতো ঠাকুর এখানে কেন এলেন! তিনি ও কথা তখন কাউকে বলেননি, পরে স্বামীজী ঐ জমিটি মঠের জন্য কেনার পর মা যোগীন-মা প্রভৃতি স্ত্রীভক্তদের কাছে তাঁর ঐ দর্শনের কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন—'ঠাকুরের ইচ্ছাতেই ঐ জমিটি হলো। তিনিই মঠের জন্য ঐ স্থানটি নির্বাচন করেছিলেন ইত্যাদি'।"

এসব কথা বলতে বলতে মহাপুরুষজীর স্বর গাঢ় হয়ে গেল, চোখমুখ লাল হয়ে উঠল। তারপর তিনি ধীরে ধীরে বললেন, "তবেই বোঝ—এ মঠ ঠাকুরই করেছেন। তাঁরই ইচ্ছাতে এ মঠ হয়েছে। তিনি যুগাবতার—এ মঠকে কেন্দ্র করে তিনি তাঁর ভাব জগতে প্রচার করবেন। এ মঠে থাকার যাদের সৌভাগ্য হয় তারাও মহাভাগ্যবান। এটি ঠাকুরের মঠ—শ্রীভগবানরূপে তিনি সর্বত্র থাকলেও এ মঠে তিনি বিশেষ করে রয়েছেন। কত ভাগ্যে এ মঠে বাস হয়! তোমরা, বাবারা, খুব সাবধানে থাকবে। মঠের যাবতীয় কাজই তাঁর কাজ—তাঁর সেবাজ্ঞানে করবে। জীবন্ত ঠাকুরের সেবা, বাবা! তোমাদেরও জীবন ধন্য হয়ে যাবে—আমরাও ধন্য হয়ে যাব।"

মহাপুরুষজী এমন তন্ময়তার সঙ্গে এসব কথা বললেন যে, শুনতে শুনতে সকলেরই মনে হলো—এ মঠ দেবভূমি, আমরাও সেই দেবলোকের অধিবাসী!...

মহাপুরুষজীর শিক্ষার ধারাই ছিল অভিনব ও অনুপম। তিনি সকলকেই অধিকারী বিচার করে মঠের যাবতীয় কাজের শিক্ষা দিতেন এবং উচ্চশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত সব স্তরের ব্রহ্মচারীদের সমান দৃষ্টিতে দেখতেন। তখন বেলুড় মঠে ভোগ রান্না করার জন্য একজন মাত্র পাচক ব্রাহ্মণ, ভোগের ঘরের বাসনপত্রাদি মাজার জন্য একজন চাকর এবং গোশালার কাজ করার জন্য একজন মাত্র চাকর ছিল। মঠের আর সব কাজই সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীদের করতে হতো। তখনো বেলুড় মঠে কলের জল আসেনি। শ্রীশ্রীঠাকুরপূজা, বিভিন্ন মন্দিরে পূজা, মন্দিরমার্জন, পূজার ভাঁড়ার, রান্নার ভাঁড়ার, হাটবাজার এবং মঠপ্রাঙ্গণ ও সব বাড়িঘর ঝাড়ু দেওয়া, সবজিবাগান ও ফুলফলের বাগানে কাজ করা, গরুদের জন্য জাবকাটা, খাবার আসন, পরিবেশন, ভোগের ও খাবারের ব্যবস্থা করা, ভোগরান্নার জল, খাবার জল, পাইখানার জল—সব জল গঙ্গা থেকে তোলা, ডিসপেনসারিতে ঔষধ দেওয়া, গরমের দিনে মাঠে জল দেওয়া, অফিসের কাজ করা ও সন্ধ্যা দেওয়া ইত্যাদি যাবতীয় কাজ সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীরাই করতেন; তাই ঘড়ি-ঘণ্টা ধরে কাজ করার কোন প্রথা ছিল না। ভোর থেকে রাত্রি পর্যন্ত কাজের প্রয়োজনে সকলেই আনন্দের সঙ্গে সব কাজ করত। মহাপুরুষজী নিজে সব কাজে যোগ দিতেন—তাতে প্রত্যেকটি কাজই যে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ, ঠাকুরের সেবা, তাই মনে হতো এবং তাতে উচ্চ-নিম্নস্তরের কাজের কোন প্রশ্নই কারো মনে অত উঠত না। উচ্চশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও নিম্নশিক্ষিত নবাগত ব্রহ্মচারীদের প্রত্যেককেই প্রথম দেড় দুই বৎসর সব কাজই পালাক্রমে করে তাতে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হতো। স্বামীজী যেমন বলেছিলেন—"জুতোসেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ" পর্যন্ত সব কাজই সমান দৃষ্টিতে করা একটা বিশেষ সাধনা। ঐ সাধনায় মহাপুরুষজী সকলকেই ব্রতী করতেন। তাতে একদিকে যেমন ছোটবড় সব কাজের সমান মর্যাদা দেবার শিক্ষালাভ হতো আবার অন্যদিকে কর্মক্ষেত্রে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে যে ব্যবধান তা দূর করে সকলকেই করত সাম্যে প্রতিষ্ঠিত। "আপনি আচরি ধর্ম জীবকে শিখায়"—শ্রীমহাপ্রভুর এই বাণীটি মহাপুরুষজী নিজে আক্ষরিকভাবে অনুষ্ঠান করে মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীদের জীবনকে সর্বাঙ্গসুন্দর ও পরিপূর্ণ করে তুলতেন। এত কাজকর্ম থাকা সত্ত্বেও তিনি কিন্তু সকলকার আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতিও সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন এবং সকলের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতেন কল্যাণের পথে। প্রত্যেকেই নিয়মিত ধ্যানজপ করছে কিনা—কে কখন ঘুম থেকে ওঠে, কতক্ষণ জপধ্যান করে—সেসব প্রায় প্রতিদিন তিনি জিজ্ঞেস করতেন। তখন ব্রাহ্মমুহূর্তে, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নে জপধ্যান করা সাধুজীবনে বাধ্যতামূলক ছিল। সান্ধ্য আরতিতে সকলকে যোগদান করতে হতো—মহাপুরুষজী, খোকা মহারাজ প্রভৃতি

সকলেও নিয়মিত আরতিতে যোগদান করতেন এবং স্তবাদি গাইতেন। কেউ বিশেষ কারণে উপস্থিত না হলে তার জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হতো। বিনা অনুমতিতে মঠের ফটকের বাইরে কেউ যেত না।

মহাপুরুষজীর দৈনন্দিন জীবন সকলের আদর্শস্থানীয় ছিল। তিনি রাত তিনটার পরই উঠতেন—মন্দির খোলার সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরে বসে সকাল পর্যন্ত ধ্যান করতেন। পরে সকলের সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গাদি করা এবং ভক্তদের ধর্মজীবন গঠনে উপদেশাদি দেওয়া তাঁর নিত্যকর্ম ছিল। উপনিষদ্ বলছেন—'আত্মানং বৈ বিজানথ অন্যা বাচা বিমুঞ্চথ', শ্রীশ্রীমহাপ্রভুও বলেছিলেন, 'গ্রাম্যকথা না কহিবে, গ্রাম্যবার্তা না শুনিবে' ইত্যাদি।

মহাপুরুষজীর তৎকালীন মঠ-জীবন ছিল এ সব নীতিকথার জীবন্ত ভাষ্যস্বরূপ। তিনি স্বভাবত খুব গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন! মঠজীবনে জপধ্যান, ত্যাগ, তপস্যা ও সেবারূপ কর্মের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধ্যায়ের উপরও তিনি খুব জোর দিতেন। শাস্ত্রপাঠ, শাস্ত্রালোচনা ইত্যাদিও মঠবাসীদের নিত্যকর্মের অংশবিশেষ ছিল। শাস্ত্রাদি পড়াবার জন্য একজন পণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর কাছে সকলকেই গীতা উপনিষদ্ ইত্যাদি পড়তে হতো এবং পরীক্ষাও দিতে হতো। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর কিছুক্ষণ 'কথামৃত' বা ঠাকুর-স্বামীজীর অন্য কোন গ্রন্থ পাঠ হতো, তাতে প্রবীণ সব সাধুরাও যোগদান করতেন। মহাপুরুষ মহারাজ প্রভৃতিও পাঠ শুনতে বসতেন এবং কখনো আলোচনাদিতে যোগ দিতেন।

মঠে তখনো বৈদ্যুতিক আলো হয়নি। আটটি মাত্র হারিকেন লণ্ঠন সারা মঠের জন্য সাজানো হতো। ঘরে ঘরে আলোর কোন ব্যবস্থা ছিল না। একটিমাত্র হারিকেন সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য থাকত। রাত্রে সাধুরা পড়ত ঘড়ির পাশে যে আলোটি থাকত তারই নিচে বসে। মহাপুরুষজী কখনো এসে জিজ্ঞেস করতেন—"কি হচ্ছে তোমাদের? কি পড়ছ?" আমরা ভয়ে জড়সড় হয়ে জবাব দিতাম। তিনি বলতেন—"বেশ, ভাল করে পড়। স্বামীজীর মঠে মুখ্যু সাধুর স্থান নেই।" সন্ধ্যা-সমাগমে ঐ আটটি হারিকেন সাজানো এবং শাঁখ বাজিয়ে আলো ও ধুনো দেওয়া—এসব কাজ মহাপুরুষ মহারাজ নিজের হাতে আমায় শিখিয়েছিলেন বলে এখনো অন্তরে গর্ব অনুভব করি এবং ঐ সব কাজকে খুবই পবিত্র মনে করি। তিনি বলতেন—"শ্রীমন্দিরে এবং ঘরে ঘরে আলো ও ধুনো দেবার সময় 'হরি ওঁ' 'হরি ওঁ' বা ভগবানের নাম গান করবে। তাতে সর্বত্র একটা পবিত্র পরিবেশের সৃষ্টি হয় এবং মন ভগবন্মুখী হয়। ঐ মন্ত্রোচ্চারণের শব্দ যতদূর যাবে সব স্থান পবিত্র হয়ে যায়।" সে ভাবেই সব করতাম, তাতে সন্ধ্যা দেওয়াটা আমার পক্ষে মহাকল্যাণকর কর্মে পরিণত হয়েছিল।

মহাপুরুষজী খুবই ব্যবহারকুশল ছিলেন এবং প্রত্যেকটি কাজই নিখুঁতভাবে ও সুন্দররূপে করতেন এবং সেভাবে অন্যকে করতে শিক্ষা দিতেন। তাঁর সব কাজের মধ্যেই পরিচ্ছন্নতা একটা প্রধান অঙ্গ ছিল। তিনি বলতেন, "ঠাকুর পরিচ্ছন্নতা খুবই পছন্দ করতেন। এলোমেলো অগোছালো ভাব তিনি আদৌ পছন্দ করতেন না। ছোট-বড় সব কাজেই নিয়মানুবর্তিতা ও সময়ানুবর্তিতার দিকে তিনি খুব দৃষ্টি রাখতেন। ঠাকুর বলতেন যে, প্রত্যেকটি জিনিস যথাস্থানে এমনভাবে রাখবে যেন অন্ধকারেও হাত দিলে তা পাওয়া যায়। আমাদের মধ্যে বুড়ো গোপালদা খুবই গোছালো ছিলেন, তাই ঠাকুর তাঁর কাজ খুব পছন্দ করতেন।" মহাপুরুষজীর বিশ্বাস ছিল যে, ঠাকুর মঠের সর্বত্র পাদচারণ করেন, তাই মঠের কোথাও এতটুকু আবর্জনা বা অপরিচ্ছন্নতা তিনি দেখতে পারতেন না!

আমি তখন মঠবাড়ি ঝাড়ু দিতাম। অবশ্য ঐ আমার একমাত্র কাজ ছিল না। সকালে রান্নার ভাঁড়ারের কুটনো কোটার ব্যবস্থা করা—ভাঁড়ার বের করা ইত্যাদি কাজের পরে গোটা মঠবাড়ি, প্রকাণ্ড অঙ্গন, নিচের তলার সব ঘরগুলি, বারান্দা, গঙ্গার ধারে চাতাল, রোয়াক এবং পাইখানা-রাস্তা পর্যন্ত সব ঝাড়ু লাগিয়ে বালীবাজারে যেতাম। ১৫।২০ সের তরি-তরকারি সব কিনে মাথায় করে নিয়ে আসতে হতো। তারপর খাবার আসন ইত্যাদি করা, কখনো কখনো পরিবেশনও করা—এসব ছিল পূর্বাহ্নের কাজ। একদিন ঝাড়ু লাগাতে লাগাতে দেখলাম যে বেলা অনেক হয়ে গিয়েছে, রোদও উঠেছে—তাই গঙ্গার ধারের রোয়াক ইত্যাদি ঝাড়ু না লাগিয়েই তাড়াতাড়ি বাজারে চলে গেলাম। ঠিক সেদিনই মহাপুরুষজী বিকালবেলা নিচে নেমে এদিক সেদিক ঘুরে গঙ্গার ধারে এসে দেখেন যে, রোয়াকের উপরটা অপরিষ্কার। চিল বা শকুনি রোয়াকের উপর বসে কিছু খেয়েছে—তাতে ঐ স্থানটি খুব অপরিষ্কার হয়েছিল। তিনি তখনই আমায় ডাকলেন। আমি আসতেই খুব বিরক্তি প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করলেন, "আজ রোয়াক ঝাড়ু দিয়েছ?" আমি বললাম, "আজ ঝাড়ু লাগাতে লাগাতে খুব রোদ উঠে গিয়েছিল, তাই রোয়াক ঝাড়ু না দিয়েই বালীবাজারে গিয়েছিলাম।" তিনি তা শুনে খুব গম্ভীর হয়ে বললেন—"এমনটি আর কোরো না, বাবা। ঠাকুর রোজ গঙ্গার ধারে বেড়াতে আসেন। অপরিষ্কার থাকলে তার বেড়াতে কষ্ট হয়। এ ঠাকুরের মঠ। তিনি সব জায়গায় বেড়ান।" 'শ্রীশ্রীঠাকুরের বেড়াতে কষ্ট হয়'—এ কথা শুনেই আমার অন্তর দারুণ অনুশোচনায় ভরে গেল, বুক ফেটে কান্না এল। অমনি হাতজোড় করে কাঁদতে কাঁদতে বললাম, "মহারাজ, অমনটি আর করব না।" আমার ভিতর থেকে এত কান্না আসছিল যে, কিছুতেই চাপতে পারছিলাম না—ফুকরে কাঁদছিলাম।

তখন মহাপুরুষজী স্নেহভরে আমার অবাধ অশ্রুজল মুছিয়ে দিতে দিতে বললেন—"সকালের দিকে যেদিন সময় হবে না, সেদিন বিকালে ঝাড়ু লাগিয়ে দিও। ঠাকুর বিকালেই বেড়াতে বের হন।"

ঐ ঘটনাটি অবলম্বনে আমার জীবনে এক মহাশিক্ষা হয়ে গেল। 'ঠাকুরের চলতে কষ্ট হবে'—এ কথা কটি ঐজাতীয় কাজে খুব অনুপ্রেরণা দিত। তিনি যেন সেদিন আমায় দিব্যচক্ষু দিয়েছিলেন। 'ঠাকুর মঠের সব জায়গায় বেড়ান'—এ দৃষ্টি আমার মঠ-জীবনকে আনন্দময় করেছিল। অনেক সময়ই মনে হতো—ঐ তো ঠাকুর বেড়াচ্ছেন! এবং মহাপুরুষজীর দিব্যস্পর্শ আমার অন্তর 'রামকৃষ্ণময়' করে দিয়েছিল—যা আমার জীবনের পক্ষে পরম প্রাপ্তি।...

মহাপুরুষজীর অন্তর প্রেমে পূর্ণ ছিল এবং মানুষের অন্তরে নিহিত বিন্দুপরিমাণ সদ্‌গুণকে সিন্ধুবৎ বিশাল করে তুলবার শক্তিও ছিল তাঁর। সর্বোপরি তিনি ছিলেন পরোপকারব্রতী। হিমালয়ে তপস্যাকালে জনৈক ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে তিনি লিখেছিলেন, "জগতের কল্যাণ-কামনা ছাড়া আমাদের আর কোন কামনা নেই।" মঠের সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীদের কাছে তিনি মায়ের মতো ছিলেন। মায়ের কাছে যেমন সব সন্তানই ভাল, তেমনি মহাপুরুষজীও সাধু-ব্রহ্মচারীদের কারো কোন দোষ দেখতে পেতেন না। একদিন জনৈক প্রবীণ সন্ন্যাসী এক ব্রহ্মচারীর নানা দোষ দেখিয়ে মহাপুরুষজীর কাছে নালিশ করে বললেন, "ওকে মঠ থেকে বের করে দিন, ও মঠে থাকার যোগ্য নয়।" তা শুনে মহাপুরুষজী ব্রহ্মচারীর পক্ষ নিয়ে বললেন, "কেন? ও তো ভাল ছেলে। অমন একটু-আধটু দোষ ক্রমে শুধরে যাবে। তা আমি ওকে ডেকে বলে দেব।" তারপরই খুব গম্ভীর হয়ে বললেন, "দেখ, অনেক জন্মের সুকৃতির ফলে এ মঠে স্থান হয়। ভাল ভাব না থাকলে ঠাকুর টানবেন কেন? তিনিই তো অন্তরে শুভ-প্রেরণা দিয়ে তাঁর আশ্রয়ে টেনে আনেন বাবা, সব জাত সাপের বাচ্চা। সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারী কেউই সাধারণ নয়—অনেক সুকৃতির ফলে ঠাকুরের আশ্রয়ে আসে। অমন অল্পবিস্তর দোষ কার না আছে? ঠাকুরের কৃপায় সব শুধরে যাবে।" পরে আরও গম্ভীরভাবে বললেন, "পার তো ঠাকুরের কাছে ওর জন্য প্রার্থনা কর।"...

পাঁচটাকা দিয়ে বাগ্‌দিদের কাছ থেকে একটি ছোট্ট হারমোনিয়ম কেনা হয়েছে। অবসর সময়ে কলাবাগানে গিয়ে ভাব মহারাজ গান অভ্যাস করেন। আমিও "রাজরাজেশ্বর, দেখা দাও। করুণাভিখারি আমি, করুণা-নয়নে চাও ॥" ইত্যাদি গানটি ভাব মহারাজের কাছে হারমোনিয়ম বাজিয়ে গাইতে শিখেছি। একদিন সান্ধ্য আরাত্রিকের পর জপধ্যান করে এসে অভ্যাগত-কক্ষে (visitors' room) অন্ধকারে

ধীরে ধীরে হারমোনিয়ম বাজিয়ে ঐ গানটি একা একা গাইছিলাম। মহাপুরুষজী যে গঙ্গার ধারে বসেছিলেন তা জানতে পারিনি। এমন সময় তিনি পূর্বদিকের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কে গান গাইছে?" তাঁর গলার শব্দ শুনতেই আমি হারমোনিয়ম বন্ধ করে ভয়ে ভয়ে বললাম, "আমি গাইছি, মহারাজ!" "ও, তুমি গাইছ? হারমোনিয়ম বাজিয়ে গাইতে পার?" আমি বললাম, "এই একটি মাত্র গান বাজিয়ে গাইতে শিখেছি।" তিনি তাতে খুশি হয়ে বললেন, "বেশ, বেশ, শেখ; আরো শেখ। ঠাকুর খুব ভজনপ্রিয় ছিলেন। গান গাইবার সময় মনে করবে ঠাকুরকে শোনাচ্ছ।" আমায় গাইতে বললেন। "রাজরাজেশ্বর, দেখা দাও" গানটি শুনে বললেন, "ওটি স্বামীজীর প্রিয় গান, ব্রাহ্মসমাজের গান, আমরাও খুব গাইতাম" ইত্যাদি বলে খুব উৎসাহ দিলেন। মহাপুরুষজীর ঐ আশীর্বাদই আমার জীবনে ভজন-সঙ্গীত শিখবার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে এবং ভজন-গান উচ্চাঙ্গের সাধনায় পরিণত হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর ভজন শুনতে ভালবাসতেন। সেজন্য মহাপুরুষজীও অনেক সময় ভজন-গান গাইতেন। তিনি খুবই সুকণ্ঠ ছিলেন। আমরা শুনেছি যে, কাশী অদ্বৈতাশ্রমের কার্যভার দেবার সময় তিনি চন্দ্র মহারাজকে এও বলেছিলেন, "চন্দ্র, রোজ আরতির পর ঠাকুরকে একটি ভজন-গান শুনিও। ঠাকুর ভজন-গান শুনতে ভালবাসেন।" চন্দ্র মহারাজ ঐ আদেশ স্মরণ করে যতদিন জীবিত ছিলেন, প্রতি রাত্রে ঠাকুরকে অন্তত একটি করে ভজন শোনাতেন।...

মঠে একজন পণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন—আমাদের সমসাময়িক ব্রহ্মচারীদের মধ্যে ব্রঃ অখণ্ডচৈতন্য (অনঙ্গ মহারাজ—স্বামী ওঁকারানন্দ) সবচাইতে কৃতবিদ্য ছিলেন। তিনি শাস্ত্রাদি পড়াশুনা খুব করতেন এবং সেসব ধারণা করার শক্তিও তাঁর ছিল। মহাপুরুষজীও তাঁকে খুব উৎসাহ দিতেন। অখণ্ডচৈতন্যের বুদ্ধিমত্তা ও কর্মশক্তির উপর মহাপুরুষজীর খুব শ্রদ্ধা ছিল। তিনি মঠের অনেক কাজ তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে করতেন এবং তাঁর উপর সব দায়িত্বপূর্ণ বড় বড় কাজের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতেন। মহাপুরুষজী গুণগ্রাহী ছিলেন, তাই ব্রঃ অখণ্ডচৈতন্যকে তিনি এত অধিক স্নেহ করতেন, যা আমাদের বিশেষ ঈর্ষার কারণ হয়েছিল। ব্রহ্মচারী থাকা অবস্থায়ই তিনি এত পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতাশক্তি অর্জন করেছিলেন যে সালকিয়ায় এক প্রতিষ্ঠানে গীতাব্যাখ্যার জন্য তিনি নিমন্ত্রিত হন। আমার যতদূর স্মরণ হয়, তিনি গীতার প্রত্যেক অধ্যায় অবলম্বনে একটি করে বক্তৃতা দিয়ে পর পর আঠারটি বক্তৃতায় গীতাব্যাখ্যা সমাপ্ত করেন। মহাপুরুষজীর উৎসাহে ব্রঃ অখণ্ডচৈতন্য ঐ দুরূহ কার্যে ব্রতী হয়েছিলেন এবং খুব দক্ষতার সঙ্গে বহুশ্রুত প্রবীণদের মতো ঐ কাজটি

সুসম্পন্ন করেছিলেন। মহাপুরুষজী তাঁকে উৎসাহিত করার জন্য ঐ বক্তৃতা শুনতে আমাদেরও পাঠাতেন।

ক্রমে ১৯২১ সাল এসে গেল। শ্রীশ্রীরাজা মহারাজ দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্র-পরিদর্শনে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন—সঙ্গিরূপে মহাপুরুষজীকে তিনি ঐ সফরে দক্ষিণ ভারতে নিয়ে গেলেন।

দক্ষিণ ভারতে যাবার জন্য মহাপুরুষজী প্রথমে ভুবনেশ্বরে শ্রীরাজা মহারাজের সঙ্গে মিলিত হলেন। আরো অনেকে যাচ্ছিলেন রাজা মহারাজের সঙ্গে।

ভুবনেশ্বর মঠ থেকে ৮।৪।২১ তারিখে আমাকে মহাপুরুষজী যে পত্র লেখেন তাতে মঠবাসীদের উপর তাঁর কত গভীর ভালবাসা ছিল তার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। ...“তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। আমরা যেখানেই থাকি তোমাদের উপর আমাদের দৃষ্টি সর্বদাই থাকে, কারণ তোমরা দেহ মন প্রাণ সমস্তই প্রভুর পাদপদ্মে অর্পণ করিয়াছ। মূলে জলসিঞ্চন করিলে বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা নিশ্চয়ই পুষ্ট হয়। শ্রীশ্রীমার কৃপা পাওয়া ও শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপা পাওয়া একই কথা। অনেক জন্মের সুকৃতির ফলে তাঁহাদের কৃপালাভ হয়। তোমার তাহা হইয়াছে এবং প্রভুর সঙ্ঘের ভিতর বাস করিতে সক্ষম হইয়াছ—ইহা বহু বহু ভাগ্যে ঘটে, জানিবে। মঠে প্রভুর সেবায় নিযুক্ত আছ, আনন্দে থাক এবং সব ভাইদের নিজের পরম আত্মীয় বলিয়া জানিবে, একপ্রাণ বলিয়া জানিবে। সাধন-ভজন পাঠ ও মঠের সব কাজ প্রাণের সহিত করিবে। তোমাদের নিজের কাজ কিছুই নয়, সব প্রভুর। প্রভুর মঠ, প্রভুর কাজ, আমরা তাঁর দাসমাত্র—এই জ্ঞান পাকা হওয়া চাই। মনপ্রাণ যত তাঁতে গত হইবে, এ বোধ আপনা হইতেই আসিবে।

অধিক আর কি লিখিব। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহপ্রীতি তুমি ও তোমরা সকলে জানিবে। এখানে প্রভুর কৃপায় মহারাজ প্রমুখ আমরা সকলে একপ্রকার ভাল আছি। খুব সম্ভব ১৮ এপ্রিল এখান হইতে মাদ্রাজ যাত্রা করা হইবে। এখন মঠে লোকজন কম; বেশ সাধন-ভজনে ও অধ্যয়নে মন দিবে। প্রভু তোমাদের সর্বদা দেখিতেছেন।

ইতি
শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

পুঃ—দেবেন, মাখন, ধর্মানন্দ, জ্যোতির্ময়ানন্দ, পরেশ প্রভৃতি সকলকে আমার কথা বলিবে।”

মঠ তাঁর অতি প্রিয় স্থান—মঠবাসীরাও তাঁর প্রিয়জন, তাই মঠের বিস্তারিত

খবর দিয়ে তাঁর শারীরিক অবস্থা জানবার জন্য কয়েকদিন পরে তাঁকে চিঠি লিখলাম। জবাবে মাদ্রাজ মঠ থেকে ১৩।৫।২১ তারিখে তিনি লিখলেন, "তোমার পত্র পাইয়া মঠের সমস্ত সংবাদ বিস্তারিতরূপে অবগত হইলাম। আমার influenza (ইনফ্লুয়েঞ্জা) সারিয়াছে, তবে দুর্বলতা এখনও কিছু আছে, তাহাও প্রভুর কৃপায় শীঘ্র যাইবে। তোমরা সকলে প্রভুর কৃপায় শারীরিক ও মানসিক বেশ ভাল আছ জানিয়া বড়ই আনন্দ হইল। আন্তরিক প্রার্থনা করি—তোমরা তাঁর রাজ্যে খুব অগ্রসর হও। প্রেম ভক্তি জ্ঞান বিবেক বৈরাগ্য সেবাপরায়ণতা স্বাধ্যায় প্রভৃতিতে তোমরা পরিপূর্ণ হইয়া থাক। শরৎ মহারাজ মধ্যে মধ্যে আসেন জানিয়া সুখী হইলাম। শ্রীশ্রীমার মন্দিরের কার্য ও শ্রীশ্রীঠাকুরঘরের সিঁড়ির কার্য আরম্ভ হইয়াছে জানিয়া আমরা বড়ই সুখী হইয়াছি। এ সংবাদ আমরা মধ্যে মধ্যে পাইয়া থাকি।

তুমি ও শক্তিচৈতন্য প্রভুর পূজার ভাণ্ডারে কার্য করিতেছ এবং প্রভুকে প্রাণ ভরিয়া বেল ও বকুলফুলের মালা দিয়া নিত্য সেবা করিতেছ, পদ্মফুলও খুব আসিতেছে জানিয়া আমরা যে কত আনন্দ অনুভব করিলাম তাহা পত্রে লিখিয়া কি বলিব! প্রভু নিজের সেবা নিজেই জোগাড় করিয়া লন, আমরা কেবল দেখিয়া চরিতার্থ হই, আর তাঁর মহিমা অনুভব করি ও ধন্য হই। জ্যোতির্ময়ানন্দের পত্রে সেদিন অনেক সংবাদ পাইয়াছি। কালিকাচৈতন্য হরি মহারাজের সেবায় যাইতেছে শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। অনেক সৌভাগ্যের ফলে প্রভুর ভক্তদের সেবার অধিকার পাওয়া যায়। প্রভু তার কল্যাণ করুন। সে যেন স্থির হইয়া তাঁর সেবা করিতে পারে। ওখানে মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি ও ঝড় হইতেছে জানিয়া সুখী হইলাম। এখানে বৃষ্টির নামগন্ধ নাই। গরম বেশ, তবে সমুদ্রের হাওয়াটা এখনও পর্যন্ত বেশ পাওয়া যায়। শুনিতেছি এই মাসের (মে) শেষে এই সমুদ্রের হাওয়াটা বন্ধ হইয়া যাইবে এবং সে সময় এখানে ভয়ঙ্কর গরম হইবে। আমরা সম্ভবত তখন Bangalore-এ যাইব।...এখানকার R. K. Mission Students' Home-এর ছাত্রাবাস ১০ মে, মঙ্গলবার open হইয়া গেল। একখানি 'Hindu' (হিন্দু পত্রিকা) কাগজ শীঘ্রই মঠে পাঠাইয়া দিব, তাতে সব reported হইয়াছে, সকলে পড়িয়া দেখিও। আমাদের আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহপ্রীতি তুমি ও তোমরা সকলে জানিও।

ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

আমার আর একখানি চিঠির জবাবে তিনি মাদ্রাজ মঠ থেকে ১।৬।২১ তারিখে লেখেন—"তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। তুমি শারীরিক ভাল আছ জানিয়া

সুখী হইলাম। শ্রীশ্রীমার কৃপায় তুমি ভালই থাকিবে—কোন ভয় নাই। তিনি যেমন রাখিবেন তেমনি থাকিবে। 'ভক্তের স্বভাব বিড়ালছানার ন্যায়।' মা যেখানে রাখে সেখানেই থাকে। ভাল না লাগিলে 'ম্যাঁও, ম্যাঁও' করিয়া কেবল ডাকে, কোথাও যায় না। মা-ও খানিক পরে আসিয়া দুধ খাওয়ায় বা আবার মুখে করিয়া যদি বুঝে তো অন্য স্থানে রাখিয়া দেয়। সেখানেই সে আবার চুপ করিয়া থাকে, আবার ক্ষুধা পাইলে বা কোনরূপ কষ্ট হইলে 'ম্যাঁও ম্যাঁও' করিয়া ডাকে, আবার মা আসে। ভক্তের এই স্বভাব—মা যা করেন, যেখানে যে অবস্থায় রাখেন, তাই ভাল। কষ্ট হইলে কেবল মা মা করিয়া ডাকা ছাড়া সে আর কিছুই করিবে না। তারপর মা যা করেন তাই ভাল। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ তুমি জানিবে। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

পুনঃ—আমার শরীর তত মন্দ নয়। ভয়ানক গরম। বোধহয় শীঘ্র Bangalore (ব্যাঙ্গালোর) যাওয়া হইতে পারে।"

এই পত্র পেয়েই মঠের খবরাদি দিয়ে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করে পুনরায় পত্র লিখি। ব্যাঙ্গালোর থেকে ২৫।৬।২১ তারিখে তার জবাবে তিনি যে আশীর্বাদ পাঠিয়েছিলেন তা আমার ধর্মজীবনের ভিত্তি সুদৃঢ় করেছিল। মহাপুরুষজী লেখেন—"তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। মঠে ৺গঙ্গাপূজা ও স্নানযাত্রা অতি সুচারুরূপে হইয়া গিয়াছে জানিয়া আমরা বড়ই আনন্দিত হইলাম। এই প্রকারই আমরা তোমাদের নিকট হইতে আশা করি। প্রভুর কৃপায় তোমরা দিন দিন খুব তাঁর পথে অগ্রসর হও; বিশ্বাস ভক্তি জ্ঞান প্রীতি পবিত্রতা, কর্মপরায়ণতা, বিদ্যাবুদ্ধি ধর্মভাবাদি দিয়া প্রভু তোমাদের পূর্ণ করিয়া দিন—ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা তাঁর শ্রীচরণে। প্রভুর মূল মঠে যাঁরা আসিবেন তাঁরাও বিশেষ উপকৃত হইবেন এবং সমগ্র দেশের কল্যাণ হইবে। প্রভু এই সকল অনুষ্ঠানে ও ধ্যান-জপ-ভজনাদিতে তুষ্ট থাকেন। অতি উত্তম হইতেছে। ললিত পূজা করিতেছে জানিয়া খুব আনন্দ হইল। সে বেশ নিষ্ঠা-ভক্তির সহিত পূজা করে, আমি জানি। আন্তরিক আশীর্বাদ করি—তোমরা পূর্ণ ভক্ত ও পূর্ণ জ্ঞানী হও।

"মঠের আর সব সংবাদ পাইলাম তোমার পত্রে। শ্রীমান অমৃতেশ্বরানন্দের পত্রেও সব সংবাদ পাইলাম। বেশ বৃষ্টি হইতেছে শুনিয়া আনন্দ হইল। এখানে আমাদের আসিবার পূর্বেই বেশ বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এখন বৃষ্টি নাই, বেশ ঠাণ্ডা; কারণ এ স্থান sea-level (সমুদ্রপৃষ্ঠ) হইতে প্রায় 3000 ft. (তিন হাজার ফুট) উপরে স্থিত, সুতরাং কখনই গরম অধিক হয় না।

শরীর আমাদের প্রভুর ইচ্ছায় তত মন্দ নাই।...খুলনায় আবার দুর্ভিক্ষ হইয়াছে শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। মার কি ইচ্ছা, তিনিই জানেন। যা হোক আমরা যথাসাধ্য সেবা করিব, তার সন্দেহ নাই। প্রভু শক্তি দিন।... তোমরা আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহপ্রীতি জানিবে। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

পুঃ—সঙ্গের পত্রখানি অনঙ্গকে দিও।"

এর কিছুদিন পরেই মঠের খবর দিয়ে আবার চিঠি লিখি। জানি তিনি শত কাজের মধ্যেও জবাব দেবেন। তাঁর চিঠি কয়েক দিন না পেলেই মনটা কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত ও ধৃতিহারা হয়ে যায়! ব্যাঙ্গালোর থেকে ১৪।৭।২১ তারিখে তিনি খুব লম্বা আশীর্বাদপত্র লিখলেন ঃ "তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। নূতন আর অধিক কিছু লিখিবার নাই। তোমরা সকলে শারীরিক ভাল আছ ও যথাসাধ্য প্রভুর নাম জপ ধ্যানাদি ও তাঁর সেবাদি করিতেছ জানিয়া বড়ই সুখী হইলাম। প্রার্থনা করি—প্রভুর পথে দিন দিন খুব অগ্রসর হও, শান্তি ও পরম প্রীতিলাভ কর এবং প্রভু ও তাঁর ভক্তদের উপরে তোমার খুব প্রীতি হউক।

আজ নগেন এখানে আসিয়া পৌঁছিল। সে ভাল আছে। মঠের অনেক সংবাদ তার কাছে শুনিলাম।...

রথযাত্রার দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ ভোগ ও পূজাদি হইয়াছিল জানিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। মঠে এইরূপ হওয়া প্রার্থনীয়। গীতাদি-পাঠ নিয়মিত হইতেছে, অতি উত্তম।

এখানে ৩।৪ দিন হইতে বেশ বৃষ্টি হইতেছে, ঠাণ্ডাও খুব, শরীর সব মন্দ নয়—প্রভুর ইচ্ছায়। আমরা কতদিনে মঠে ফিরিব এখনো তার কোন ঠিক নাই। যদি মাদ্রাজ মঠে ৺দুর্গোৎসব হয় (শর্বানন্দের খুব ইচ্ছা) তাহা হইলে শীঘ্র এখন যাওয়া হইবে না, যেরূপ হয় পরে জানিতে পারিবে। আমাদের আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহপ্রীতি তুমি ও তোমরা সকলে জানিবে। শ্রীযুত তারাসার পণ্ডিত মহাশয়কেও জানাইবে।

ইতি
তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

পুনঃ—বসন্ত তার ভাইয়ের পীড়ার সংবাদ তারে পাইয়া তাকে দেখিতে গিয়াছে, ভালই হইয়াছে। মাখন এখনও আসছে না কেন? সঙ্গের পত্রখানি নিকুঞ্জকে দিও, আর একখানি অভয়চৈতন্যকে দিও। সু—কেমন আছে?"

সত্যই মহাপুরুষজী আমাদের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তাঁর চিঠি যে আশীর্বাদ বহন করে আনত, তা আমাদের অন্তরকে সঞ্জীবিত করত, অভিসিঞ্চিত করত, আমরা নিজেদের মহাভাগ্যবান ও দেবরক্ষিত বলে মনে করতাম। তাঁর অমোঘ আশীর্বাদ রক্ষাকবচের মতো আমাদের রক্ষা করত সকল আপদ-বিপদ থেকে।...

ঐ সময় থেকে আমার ম্যালেরিয়া জ্বর হতে থাকে। জ্বরের সময় তাঁর অভাব বিশেষ করে অনুভব করতাম। তিনি থাকলে দুবেলা কাছে এসে খোঁজখবর নিতেন, কত সান্ত্বনা দিতেন! জ্বরের সময় সেসব কথা খুব স্মরণ হতো। জ্বরে পড়ার আগেই তাঁকে একখানি চিঠি লিখেছিলাম। তার উত্তর তিনি লিখেছিলেন ব্যাঙ্গালোর থেকে ১৪।৮।২১ তারিখে।

"তোমার একখানি পত্র অনেকদিন হইল পাইয়াছিলাম, তাহার উত্তর দেওয়া হয় নাই। তারপর শুনিয়াছিলাম তোমার জ্বর হইয়াছিল। এখন কেমন আছ? অন্নপথ্য করিয়াছ কি? এই সময়টা মঠে জ্বর-জার খুব হয়। যতদূর সম্ভব খুব সাবধানে থাকিবার চেষ্টা করিবে। এখন কয়জনের অসুখ আছে? মঠের আর আর সংবাদ সব লিখিও। শরীরের সুখ-অসুখ তো যতদিন শরীর থাকিবে ততদিনই থাকিবে। প্রভুপদে বিশ্বাস ভক্তি ও তাঁর ভক্তদের উপর বিশ্বাস ভক্তি প্রীতি সর্বদাই সকল অবস্থায়ই তোমার ও তোমাদের থাকে, ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা তাঁর শ্রীচরণে।...

...প্রার্থনা করি—তোমরা সকলে শারীরিক ও মানসিক সুস্থ থাক এবং খুব সাধন-ভজনে ডুবে যাও। আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি এই জীবনেই তোমরা বিশ্বাস ভক্তি জ্ঞান প্রেম বিবেক বৈরাগ্য ও পবিত্রতায় পূর্ণ হইয়া যাইবে। আমরা প্রভুর ইচ্ছায় শারীরিক একপ্রকার ভালই আছি। তোমাদের কুশল প্রার্থনীয়!

মঠের সব খবর দিবে। শুনিলাম দেবেন ৺কাশী গিয়াছে হরি মহারাজের সেবার জন্য, রামানন্দও গিয়াছে। হরি মহারাজের শরীর খুবই খারাপ, শরৎ মহারাজ, ভূমানন্দ, ডাঃ দুর্গাপদ সব গিয়াছে। প্রভুর ইচ্ছায় তিনি এ যাত্রা রক্ষা পাইলে সকলের আনন্দ। প্রভুর যা ইচ্ছা তাহাই হইবে। তুমি ও তোমরা আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহপ্রীতি জানিবে। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ"

* * *

ক্রমে দুর্গাপূজা এসে গেল। মাদ্রাজ মঠেও ঐ বৎসর প্রতিমায় ৺দুর্গাপূজা

হয়েছিল। মঠের পূজায় মহাপুরুষজীর অভাব আমরা সকলেই নিবিড়ভাবে অনুভব করেছিলাম। পূজার পরই মহাপুরুষজীকে ৺বিজয়ার প্রণামের সঙ্গে মঠের পূজার সব খবর দিয়ে চিঠি লিখি। তিনি জবাবে—শুধু তাঁর নয় রাজা মহারাজেরও আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন। মাদ্রাজ মঠ থেকে ১৫।১০।২১ তারিখে তিনি চিঠি লেখেন—"তোমার পত্র পাইলাম। মঠের পূজার কথা জানিয়া বড়ই আনন্দ হইল—সবই প্রভুর মহিমা। আমরা স্থূল শরীরে মঠে উপস্থিত থাকি বা না থাকি, তিনি তাঁর প্রধান কেন্দ্র ও মূল স্থানের সমস্ত কার্যকলাপ আমাদের উত্তরাধিকারী ছেলেদের দ্বারায় করাইয়া লইতেছেন ও লইবেন—ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তিনি যুগাবতার, যুগধর্মসংস্থাপনের জন্যই তাঁর মানবদেহ ধারণ করা এবং বেলুড় মঠই তাঁর মূল ও প্রধান কেন্দ্র। যা হোক তোমরা তাঁর কৃপায় আনন্দলাভ করিয়াছ জানিয়া আমি বড়ই আনন্দ পাইয়াছি। প্রভু তোমাদের ভক্তি বিশ্বাস দিয়া পূর্ণ করুন। তুমি শারীরিক আজকাল কেমন আছ লেখ নাই। অমৃতেশ্বরানন্দ কেমন আছে তাহাও কিছু লেখ নাই—লিখিবে।

পুনরায় আমার আশীর্বাদ। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

পুঃ—আমাদের ৺বিজয়ার শুভাশীর্বাদ জানিবে।"

তাঁর চিঠি পেয়েই মঠের যা যা খবর তিনি জানতে চেয়েছিলেন এবং অন্যান্য যাবতীয় খবর দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চিঠি লিখি। জবাবে মাদ্রাজ মঠ থেকে ২৩।১০।২১ তারিখে মহাপুরুষজী লেখেন—"তোমার পত্রে মঠের অনেক খবর পাইলাম। ছেলেদের অনেকের জ্বর জানিয়া মনে বড়ই কষ্ট হইল।...

আজকাল প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের মঙ্গল-আরতি হয় ও একটু কীর্তন হয় জানিয়া বড়ই আনন্দ হইল। ইহা খুব ভাল—ইহা ভক্তি-সাধনার প্রধান অঙ্গ। ঠাকুর বড়ই কীর্তনপ্রিয় ছিলেন এবং এখনও তাহাই আছেন—নিশ্চয় জানিবে।

কুকুর আরও একটি আসিয়াছে, খুব ভাল হইয়াছে। কে আনিয়াছে, কোথা হইতে এবং কি রকম সব লিখিও।

তুমি প্রায়ই লেখ—'যেন এ জন্মেই আমার ভক্তি-বিশ্বাস লাভ হয়।' যাহাতে পূর্ণ বিশ্বাস ভক্তি প্রেম হয় তাহাই ঠাকুরের কাছে চাহিও। এ জন্মে, সে জন্মে কথা বলিও না। তুমি প্রত্যেক পত্রেই এইরূপ লেখ বলিয়া আমার মনে যেন কিরূপ লাগে অর্থাৎ ভাল লাগে না। বিশ্বাস ভক্তি প্রেমে ভরপুর হইয়া যাও! এ জন্ম, সে

জন্মের কথায় দরকার কি? তিনিই জানেন ভক্তকে কখন কি দিতে হবে। জন্ম-টন্ম কি আবার? উহা অতি নিচু কথা।

আমার আশীর্বাদ ও স্নেহপ্রীতি জানিবে। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

* * *

পূজার পর থেকে প্রায়ই জ্বরে পড়তে লাগলাম। মহাপুরুষজী রাজা মহারাজের সঙ্গে দক্ষিণ ভারত সফর শেষ করে নভেম্বরের শেষের দিকে ভুবনেশ্বর এলেন এবং সেখানে মাসাধিক কাল বাস করে ১২ জানুয়ারি, ১৯২২ বেলুড় মঠে শুভাগমন করলেন। প্রায় দশমাস পর তিনি মঠে আসাতে আমাদের বিশেষ আনন্দ হয়েছিল। কয়েকদিন ধরে সাধু-ভক্তের সমাগমে মঠ আনন্দ-মুখরিত ছিল। মহাপুরুষজীও সকলের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতে বিশেষ আনন্দিত হলেন।...

আমার শরীরের অবস্থা দেখে মহাপুরুষজী খুবই দুঃখ করতে লাগলেন। আমার জ্বর কিছুতেই বন্ধ হচ্ছিল না, তাই তিনি আমাকে চিকিৎসা ও বায়ুপরিবর্তনের জন্য মঠের একজন প্রবীণ ভক্তের কাছে বোকারো পাঠালেন। ভক্তটি বোকারোতে রেলওয়েতে কাজ করতেন। তাঁরই কোয়ার্টারস-এ থেকে রেলওয়ে হাসপাতাল ও ডিস্পেন্সারিতে চিকিৎসাদির ব্যবস্থা হলো। ঐ সময়ে মহাপুরুষজী প্রায়ই চিঠিপত্র লিখে খোঁজখবর নিতেন এবং আশীর্বাদ পাঠাতেন।

ওখানে প্রায় আড়াই মাস থাকার ফলে স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি হচ্ছিল, কিন্তু ১০ এপ্রিল (১৯২২) শ্রীশ্রীরাজা মহারাজের আকস্মিক দেহত্যাগের সংবাদ পেয়েই আমি অবিলম্বে বেলুড় মঠে ফিরে এলাম। মহাপুরুষজীর অনুমতির অপেক্ষা না করেই আমি মঠে চলে আসি। তখন মহারাজের অদর্শনে তিনি বিশেষ ম্রিয়মাণ। প্রণাম করতেই তিনি অতি করুণস্বরে বলেছিলেন—"আমাদের মহারাজ চলে গেছেন।"

ওঁ শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু

হরি ওঁ তৎ সৎ

মহাপুরুষজীর অযাচিত কৃপাস্মরণে

(অন্ত্য-পর্ব)

স্বামী অপূর্বানন্দ

রাজা মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দজী) দেহত্যাগ মহাপুরুষজীর প্রাণে দারুণ আঘাত দিয়েছিল। তিনি খুবই বিহ্বল হয়ে পড়লেন, কাজকর্ম থেকে মন উঠে গেল, বেশির ভাগ চুপচাপ থাকতেন।

২৪ মার্চ (১৯২২) অকস্মাৎ বলরাম মন্দিরে রাজা মহারাজ বিসূচিকারোগে আক্রান্ত হন। মহাপুরুষজী তখন পূর্ববঙ্গ (বর্তমান বাংলাদেশ) সফরে ঢাকাতে ছিলেন। তারযোগে মহারাজের কঠিন অসুখের খবর পেয়েই তিনি অবিলম্বে কলকাতায় বলরাম বসুর বাসভবনে মহারাজের রোগশয্যাপার্শ্বে উপনীত হন। রাজা মহারাজ তাঁকে দেখেই বললেন—"শিবানন্দ দাদা, এসেছ?" মহাপুরুষজী রোরুদ্যমান কণ্ঠে আবেগভরে বললেন, "মহারাজ, তুমি চলে গেলে আমরা কি করে থাকব? তুমি ইচ্ছা করলেই সেরে উঠবে।"...

মহাপুরুষজী কলকাতায় পৌঁছে বলরাম মন্দির হতে মহারাজের খবর দিয়ে ঢাকার জনৈক ভক্তকে ৩।৪।২২ তারিখে পত্র লিখেছিলেন—"...মহারাজ এখনো সারিতে পারেন নাই। আবার প্রস্রাবে sugar (চিনি) দেখা দিয়েছে। এই দুর্বলতার উপর (sugar) চিনি বাহির হওয়াটা বড়ই খারাপ।...আজ ১১ দিন। কাল রাত্রেও দু-বার বমি হয়েছিল। (আমি) এখনো এখানেই আছি এবং মহারাজ যতদিন না উঠিয়া বসিতে পারেন ততদিন এখানেই থাকিব। তবে মঠে মধ্যে মধ্যে যাইব ও আসিব। স্টিমার-ঘাট খোলায় মঠে যাতায়াতের খুব সুবিধা হইয়াছে।"

এই চিঠিতে মহাপুরুষজীর মানস-চিত্রের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি মহারাজের আরোগ্য-কামনা করে বলরাম মন্দিরেই ছিলেন। দিন দিন নতুন উপসর্গ দেখা দিয়ে ডাঃ নীলরতন সরকার ও ডাঃ বিজয় সিংহ প্রভৃতি চিকিৎসকদেরও বিভ্রান্ত করেছিল। মহারাজের দুর্বলতা এত বেড়ে চলেছিল যে, কোন কোন ডাক্তার blood (রক্ত) দেবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের পরম ভক্ত প্রসিদ্ধ ডাক্তার বিপিনবিহারী ঘোষ তাতে রাজি হলেন না। তিনি বললেন, "শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুত্র রাজার অমন শুদ্ধ পবিত্র দেহে কারো রক্ত দেওয়া চলে না।" তা শুনে স্বামী সারদানন্দ এসে বললেন, "আমি রক্ত দেব।" কিন্তু ডাঃ বিপিনবাবু তাতেও রাজি

হলেন না। বললেন—"না, তোমার রক্তও মহারাজের শরীরে দেওয়া চলে না।" রক্ত দেওয়া হলো না। মহারাজ দিন দিন দুর্বল ও অন্তর্মুখ হতে লাগলেন।

মহাপুরুষ মহারাজ দৈব প্রতিকারের উপর বেশি বিশ্বাসী ছিলেন, তাই তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে মহারাজের রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা করতে লাগলেন। রাজা মহারাজের দেহত্যাগের চার দিন পূর্বে তিনি সারারাত ধ্যান করে কাটালেন। গভীর রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শন দিলেন, কিন্তু মহারাজের রোগমুক্তির প্রার্থনা জানাতেই তিনি মুখ ঘুরিয়ে নীরবে অন্তর্ধান করলেন। এভাবে সে রাত্রে মহাপুরুষজীর প্রার্থনায় শ্রীশ্রীঠাকুর তিন-তিনবার দর্শন দিয়েছিলেন, কিন্তু "মহারাজকে ভাল করে দিন"— এই প্রার্থনা জানাতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বিষণ্ণবদনে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব ও নির্বাক অন্তর্ধানে মহাপুরুষজী বুঝলেন যে, ঠাকুর তাঁর মানসপুত্রকে আর রাখবেন না।

ভোরবেলা জনৈক সেবক দরজা খুলে ভিতরে ঢুকতেই মহাপুরুষজী কাঁদতে কাঁদতে তাকে বললেন—"ওহে, আমাদের মহারাজ আর বাঁচবেন না। এবার ঠাকুর তাঁকে নিয়ে যাবেন। কাল রাত্রে তিনবার ঠাকুর দর্শন দিয়েছিলেন, কিন্তু 'মহারাজকে ভাল করে দিন'—এ প্রার্থনা জানাতেই তিনি কিছু না বলে অপ্রসন্নভাবে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেলেন। মহারাজ এবার আর থাকবেন না।"...

মহাপুরুষজীর কান্না আর থামে না। সেবকও সঙ্গে সঙ্গে কাঁদতে লাগল। খানিক পরে তিনি সেবককে বললেন—"তুমি কিন্তু এসব কথা কাউকে এখন বলো না। শুনলে সকলেরই মন খারাপ হয়ে যাবে।"

রাজা মহারাজের দেহত্যাগের পূর্বে সেবক কাউকেই ওকথা বলেনি; দেহত্যাগের পরে বেলুড় মঠে এসে কাউকে কাউকে বলেছিল।

মহাপুরুষজীর ঐ দর্শনের পরের দিন অর্থাৎ ৮ এপ্রিল শনিবার রাত্রি ৯টার পরে বিমর্ষ সেবক ও সাধু-ব্রহ্মচারীদের দেখে মহারাজ স্নেহবিগলিতকণ্ঠে আশীর্বাদ করে বললেন—"ভয় পেও না, বাবারা। যে যেখানে আছ, তোমাদের সকলের কল্যাণ হোক।" পার্শ্বস্থ জনৈক সেবককে আশীর্বাদ করে বললেন, "ভয় কি, বাবা! আমার সেবা করেছিস, আমি আশীর্বাদ করছি—ভগবানে ডুবে যা। তোর ব্রহ্মজ্ঞান হবে, আমি বলছি।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্রের রোগশয্যা যেন ব্রহ্মবাদী ঋষির তপোবনে পরিণত হলো। বৈদিক মহাবাক্য-উচ্চারণ, আর আশীর্বাণী—সর্বজীবে অভয়দান! স্বামী ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মানন্দরসে ডুবে আছেন, আর সকলকে বিতরণ করছেন সেই

অমৃতরস। আনন্দে ব্রহ্মানুভূতির কথা বলছেন মহারাজ, ভাবাবেশে আশীর্বাদ করছেন সকলকে, "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা।... তোরা ভগবানকে ভুলিসনি, তোদের কল্যাণ হবে।" এই স্বামী ব্রহ্মানন্দের শেষ আশীর্বাদ।

আত্মস্থ ব্রহ্মানন্দ অস্ফুট কোমলস্বরে বলছেন তাঁর অনুভূতি—"...ব্রহ্মসমুদ্রে বিশ্বাসের বটপত্রে ভেসে চলেছি।...আহা-হা! ব্রহ্মসমুদ্র! ওঁ পরব্রহ্মণে নমঃ, পরমাত্মনে নমঃ।...আমি ব্রজের রাখাল—কৃষ্ণ এসেছ! কৃষ্ণ কৃষ্ণ।...এবার খেলা শেষ হলো।"

মহারাজ নীরব হলেন। পরদিনও ঐ সমাধি-অবস্থায় কেটে গেল। তারপর দিন ১০ এপ্রিল সোমবার রাত্রি নটার পূর্বে ঐ সমাধি পরিণত হলো মহাসমাধিতে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর মানসপুত্রকে কোলে তুলে নিলেন।...পরের দিন বেলুড় মঠের পুণ্যতীর্থে গঙ্গাতীরে ঐ অপ্রাকৃত দেহ আহুতি দেওয়া হলো পবিত্র হোমানলে। মহারাজ দিব্যলীলায় প্রবেশ করলেন।...

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, "কেউ আম খেয়ে মুখটি মুছে বসে থাকে,...আবার কেউ কেউ একটা ভাল আম পেলে কেটে একটু একটু সকলকে দেয়, আর আপনিও খায়।" শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর সন্ন্যাসী শিষ্যগণ যারা 'আমটি খেয়ে মুখ মুছে ফেলে' সে শ্রেণীর লোক ছিলেন না। তাঁরা নিজেরা অমৃতত্ব লাভ করে অন্যদেরও ঐ অমৃত পরিবেশন করে অমর করেছেন। এ অংশেই সাধারণ সিদ্ধযোগী বা মুনিঋষি এবং আধিকারিক পুরুষের মধ্যে পার্থক্য।

বাহাদুরী কাঠ, রেলের ইঞ্জিন ও বড় জাহাজের দৃষ্টান্তে শ্রীঠাকুর অবতারপুরুষের স্বরূপ বুঝিয়েছেন। বাহাদুরী কাঠ যেমন বহু লোককে নিয়েও ভেসে যায়, রেলের ইঞ্জিন যেমন টেনে নিয়ে যায় কত মাল-বোঝাই গাড়ি, জাহাজ যেমন কত 'গাদাবোট' টেনে নিয়ে যেতে পারে—তেমনি অবতারও অগণিত লোককে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে নিয়ে যান।

এ সব দৃষ্টান্তের সার্থক রূপায়ণ দেখতে পাই শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর পার্ষদদের জীবনে।

আলমোড়ায় তপস্যাকালে জনৈক ভক্তের প্রশ্নে মহাপুরুষজী লিখেছিলেন—"হিমালয়ের এই নিভৃত প্রান্তে বসে হৃদয়েশ্বর শ্রীঠাকুরের কাছে শুধু প্রার্থনা করি, 'প্রভু জীব-জগতের কল্যাণ কর।' এই আমাদের ধ্যান, এই আমাদের তপস্যা। জগতের দুঃখে প্রাণে যে কি কষ্টের অনুভব হয় তা একমাত্র প্রাণেশ্বরই জানেন।..."

* * *

মহাপুরুষজী এক সময়ে কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন—"স্বামীজীর দেহত্যাগে আমরা দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম, চারিদিক যেন অন্ধকার মনে হয়েছিল। স্বামীজীর সেই অভাববোধ মহারাজ পূর্ণ করেছিলেন। আমরা যেন একটা বড় গাছের আড়ালে ছিলাম। ঝড়-ঝাপটা যা কিছু সব মহারাজের উপর দিয়েই যেত। 'মহারাজ আছেন'—এই ভেবে আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম। কিন্তু মহারাজের অভাব পূর্ণ করার মতো আর কেউ নেই।"

মহাপুরুষজী রাজা মহারাজকে সাক্ষাৎ শ্রীঠাকুরের প্রতিনিধি মনে করতেন এবং সকল ব্যাপারে মহারাজের নির্দেশই ছিল তাঁর কাছে ঠাকুরের নির্দেশ; তাই মহারাজের দেহত্যাগে তিনি নিজেকে নিতান্ত অসহায় মনে করেন। তিনি যেন সব ধৃতি হারিয়ে ফেলেছিলেন। দীক্ষা-প্রার্থীদের উদাসভাবে বলতেন—"মহারাজ চলে গিয়েছেন। আমার মন খুব খারাপ। দীক্ষার জন্য সকলকে অপেক্ষা করতে হবে।"...

রাজা মহারাজের দেহত্যাগের পর ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ২ মে তারিখে সঙ্ঘের প্রবীণ সন্ন্যাসিগণ মহাপুরুষজীকে সঙ্ঘাধ্যক্ষ নির্বাচিত করলেন। তিনি কিন্তু বললেন—"আমাদের প্রেসিডেন্ট তো মহারাজই। স্বামীজীই তাঁকে প্রেসিডেন্ট করে গিয়েছেন, আমি তো মহারাজের চাকর। তিনি যেমন চালাবেন, তেমনি চলব—তিনি যেমন বুদ্ধি দেবেন, তেমনি কাজ করব।" সেই মনোভাব নিয়ে মহাপুরুষজী প্রধান সেবকরূপে সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের সেবা করে গিয়েছেন।

সঙ্ঘাধ্যক্ষ হবার পরেই তাঁর সামনে প্রধান কর্তব্যরূপে দেখা দিল সমগ্র সঙ্ঘের সাধু-ভক্তমণ্ডলীর, বিশেষ করে রাজা মহারাজের আশ্রিত সন্তানদের শোকসন্তপ্ত প্রাণে সান্ত্বনা দেওয়া। তিনি স্নেহ, ভালবাসা, আদর, আপ্যায়ন ও ধর্মোপদেশ দ্বারা সকলের প্রাণে শান্তি ও আনন্দ দিয়ে মহারাজের অভাববোধ দূর করতে লাগলেন। মহারাজের শিষ্যদের প্রতি তাঁর যেন বিশেষ পক্ষপাতিত্ব ছিল। তিনি তাঁদের সঙ্গে নিজ সন্তানের মতো সপ্রেম ব্যবহার করতেন এবং নানা ধর্মোপদেশ দ্বারা তাঁদের ধর্মজীবন-গঠনে সক্রিয় হয়েছিলেন।

পরবর্তী কালে মহারাজের আশ্রিত জনৈক প্রবীণ ও আচার্যস্থানীয় সন্ন্যাসিশিষ্য বলেছিলেন—"যদিও মহারাজ আমার দীক্ষাগুরু ছিলেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গ তো বেশি দিন পাইনি। সে হিসাবে মহাপুরুষজীই ছিলেন আমার শিক্ষাগুরু। মহারাজের দেহত্যাগের পরে মহাপুরুষজীর মধ্যেই আমরা মহারাজকে সর্বতোভাবে পেয়েছিলাম। আমাদের ধর্মজীবন-গঠনের সমস্ত দায়িত্ব তিনিই নিয়েছিলেন। তাঁর স্নেহ-ভালবাসার তুলনা হয় না। আমাদের যাতে ভাল হয় তাই করতেন। সাধন-ভজন সম্বন্ধে কত উপদেশ দিতেন! তাঁর তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি ছিল। আমার আধ্যাত্মিক

জীবন-বিকাশের জন্য তিনি কত ভাবে সাহায্য করেছেন! তাঁর কাছে আমি চিরঋণী। মহারাজের অভাব তিনি পূর্ণ করেছিলেন।"

এ কথাগুলি আক্ষরিকভাবে প্রযোজ্য।...

কয়েক বৎসরের মধ্যে পরপর স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী তুরীয়ানন্দের দেহত্যাগে সঙ্ঘের সাধু-ব্রহ্মচারী ও অগণিত ভক্ত-নরনারী নিজেদের একান্ত নিরাশ্রয় মনে করছিলেন। মহাপুরুষজীর মধ্যে তখন সকলে পেয়েছিল সেই জুড়াবার স্থানটি। তিনি কোমল হস্তে সর্ববিধ বেদনা মুছে দিয়ে সকলের অন্তর করেছিলেন সুস্থ। সন্তানপ্রতিম সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের ধর্মজীবন গঠনে সতর্ক দৃষ্টি ও আপ্রাণ চেষ্টা, সপ্রেম ব্যবহার ও সেবা-যত্নাদির মাধ্যমে সাধু-ভক্তদের শোকসন্তপ্ত প্রাণে সান্ত্বনাদান এবং নূতন ধর্মপিপাসুদের ধর্মপথে চালিত করার কাজে তাঁকে নিত্য অনেক সময় দিতে হতো।

মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীদের অসুখ-বিসুখ হলে তিনি মায়ের মতো তাঁদের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হতেন। তখন বেলুড় মঠের আর্থিক অবস্থা আদৌ সচ্ছল ছিল না। স্বামী প্রেমানন্দ ও রাজা মহারাজের দেহত্যাগে মঠের দৈনন্দিন খরচপত্র চলাই কঠিন হয়ে পড়েছিল। মহাপুরুষজী ওরই মধ্যে অসুস্থদের সেবা-যত্নের ব্যবস্থা করতেন—নিজের হাতে বিশেষ পথ্যাদি রেঁধে সযত্নে রোগীদের খাওয়াতেন।...

স্বামী সদ্ভাবানন্দ (হেমেন্দ্র মহারাজ) কঠিন যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁকে মঠের ডিস্‌পেনসারির দক্ষিণদিকের একটি ঘরে স্বতন্ত্রভাবে রাখা হয়েছিল। চিকিৎসাদি ও সেবাযত্নের বিশেষ ব্যবস্থা সত্ত্বেও ঐ দারুণ রোগের উপশম না হয়ে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হচ্ছিল। মহাপুরুষজী রোজ স্বামী সদ্ভাবানন্দকে দেখতে যেতেন। তাঁকে দেখলেই রোগী কেঁদে কেঁদে বলত—"মহারাজ, আমি আর বাঁচব না।" মহাপুরুষজী ঐ যক্ষ্মারোগীর মাথায় গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে গাঢ়স্বরে বলতেন—"হেমেন্দ্র কেঁদো না। আমি বলছি, তুমি সেরে যাবে। আমার কথা বিশ্বাস কর।" এই ভাবে তিনি ঐ মুমূর্ষু রোগীকে গায়ে-মুখে হাত বুলিয়ে দিনের পর দিন আশীর্বাদ করতেন, সাহস দিতেন। পরে স্বামী সদ্ভাবানন্দকে মহীশূর টি. বি. স্যানাটোরিয়ামে পাঠানো হয়। সেখান থেকে সেরে এসে তিনি জোর গলায় বলতেন, "আমাকে মহীশূর স্যানাটোরিয়াম সারায়নি। মহাপুরুষজীর আশীর্বাদেই আমি সেরে গেছি।"...

* * *

মহাপুরুষজী যখন সঙ্ঘাধ্যক্ষ হন তখন তাঁর বয়স ৬৮ বৎসর। ঐ বৃদ্ধ বয়স

পর্যন্ত তিনি সর্ব বিষয়েই স্বাবলম্বী ছিলেন, তাঁর কোন সেবক ছিল না। কি হিমালয়ে, কি বেলুড় মঠে সর্বত্রই তিনি অনাড়ম্বর ও কঠোর জীবন যাপন করতেন। তাঁর পোশাক পরিচ্ছদে কোন বাহুল্য ছিল না—খুব সাদাসিধে, তিনি অতি অল্পে তুষ্ট থাকতেন। বরাবরই তিনি মিতাহারী ছিলেন এবং সকলের সঙ্গে পঙ্গতে বসেই প্রসাদ পেতেন। ঐ বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত তিনি শৌচাদির জন্য মঠে সর্বসাধারণের জন্য যে খাটা পায়খানা ছিল তাই ব্যবহার করতেন।...

১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে রাজা মহারাজের নির্দেশে আলমোড়া থেকে এসে বেলুড় মঠের দ্বিতলে বাবুরাম মহারাজের সঙ্গে একঘরেই তিনি থাকতেন এবং তাঁর দেহত্যাগও ঐ ঘরেই হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঐ দু-জন বিশিষ্ট পার্ষদকে নবীন সাধুদের মতো একই ঘরে একত্র বাস করতে যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই জেনেছেন তাঁদের পরস্পরের প্রতি কত গভীর ভালবাসা ছিল! যদিও দ্বিতলেই ঐ ঘরের সংলগ্ন স্বামীজীর বাথরুমটি (স্নানাগার) ছিল, কিন্তু স্বামীজীর প্রতি মহাপুরুষজীর এত অলৌকিক শ্রদ্ধা ছিল যে, তিনি কখনো ঐ বাথরুমটি স্নান করা ছাড়া অন্য কাজে ব্যবহার করেননি। তাঁর আচরণ দেখে মনে হতো স্বামীজী স্থূলদেহ ত্যাগ করলেও সূক্ষ্মদেহে বেলুড় মঠে তাঁর ঘরেই বাস করছেন এবং তাঁর বাথরুমও ব্যবহার করেন।

মহাপুরুষজীকে স্বামীজীর ঘরের পাশ দিয়ে করজোড়ে অতি সন্তর্পণে যেতে দেখা যেত। স্বামীজীর প্রতি তাঁর এহেন গভীর শ্রদ্ধা অন্যের বিস্ময়ের কারণ ছিল। অবশ্য কখনো কখনো তাঁর মুখে শুনেছি যে, স্বামীজীকে তাঁর ঘরে গভীর ধ্যানস্থ অবস্থায় তিনি দেখেছেন। আবার কখনো এও বলেছেন—"আজ স্বামীজীর সঙ্গে 'good morning'(গুড মর্নিং) করে এলুম, তিনি সবে বেড়িয়ে ঘরে ফিরেছেন।"

প্রেসিডেন্ট হবার পরে মঠ মিশনের কাজকর্ম, ভক্ত সমাগম, দীক্ষাপ্রার্থী এবং অন্যান্য লোকজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতে তাঁকে এত অধিক সময় দিতে হতো যে, যথাসময়ে স্নানাদি সেরে পঙ্গতে যোগদান তাঁর পক্ষে ক্রমেই অসম্ভব হয়ে উঠল। সেজন্য তখন থেকে দুবেলাই তাঁর খাবার ঘরে পৌঁছানোর প্রয়োজন হলো। আরো এমন অনেক কাজ ছিল যার জন্য তাঁর একজন সেবকের বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হয়। সব দিক বিচার করে মঠের ম্যানেজার ও প্রবীণ সাধুগণ মহাপুরুষজীর সেবক নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি প্রেসিডেন্ট (মঠাধ্যক্ষ) হবার ১৫।২০ দিনের মধ্যেই একদিন সকালে সূর্য মহারাজ (স্বামী নির্বাণানন্দজী) আমাকে সঙ্গে নিয়ে মহাপুরুষজীকে বললেন, "মহারাজ, একে আপনার সেবায় রাখুন।" মহাপুরুষজী তো প্রথমটায় একটু বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, "আমার এমন কি

কাজ! এই তামাক সাজা, তা তো আমি নিজেই করে নিতে পারি। তার জন্য একজন সেবকের কি দরকার? তা ছাড়া মঠেরও তো কাজকর্ম আছে, ও তো মঠের অনেক কাজ করে।" কিন্তু সূর্য মহারাজ ছাড়লেন না। তিনি অনেক বুঝিয়ে মহাপুরুষজীকে রাজি করালেন এবং বললেন, "ও আপনার কাছে থাকবে। কি কাজ করতে হবে না হবে তা আমি সব বলে দেব। আমি তো আপনাদের সেবা সম্বন্ধে কিছুটা জানি! মহাপুরুষজী সূর্য মহারাজকে খুবই স্নেহ করতেন, তাই তাঁর অনুরোধ এড়াতে পারেননি। তবু তিনি বললেন, "আমার আবার সেবা কি? ঠাকুরের কাজকর্ম যেন রোজ কিছু কিছু করে।" এই প্রথম সেবক নিযুক্ত হলো। সূর্য মহারাজ সব কাজকর্মের কথা বলে দিলেন এবং মাঝে মাঝে এসে খোঁজখবর নিতেন।

মহাপুরুষজী ভোর তিনটায় উঠে হাত মুখ ধুয়ে খানিকক্ষণ বিছানায় বসতেন, পরে ঠাকুরঘর খোলার সঙ্গে সঙ্গে মৃগচর্মের আসনখানি বগলে করে মন্দিরে যেতেন, ফিরে আসতেন ৬-৩০। ৭টায়। সেবক এই সময়ের মধ্যে ঘরদোর ঝেড়ে, বিছানাপত্র গুছিয়ে রেখে, গড়গড়ার জল বদলিয়ে কয়েক ছিলিম তামাক সেজে এক কলকেতে টিকায় একটু আগুন ধরিয়ে রেখে দিত। মহাপুরুষজী মন্দির থেকে ফিরে এসে চুপচাপ তামাক খেতেন—তখন তিনি এতটা অন্তর্মুখ থাকতেন যে, সে গাম্ভীর্য ভেদ করে তাঁর সঙ্গে কেউ কোন কথা বলতে সাহস করত না। কিছুক্ষণ পরে সে ভাবটা কেটে যেত, তখন মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরা প্রণাম করতে এলে তিনি তাঁদের কুশল-প্রশ্নাদি করতেন এবং মঠের কাজকর্মের কথাবার্তা বা ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গাদি হতো। তিনি অনেককেই সাধন-ভজন কেমন হচ্ছে—তা জিজ্ঞেস করতেন এবং কেউ আশীর্বাদ চাইলে প্রাণ খুলে, কখনো মাথায় হাত দিয়ে প্রার্থীকে আশীর্বাদ করতেন; ঐ স্পর্শে সকলেরই অন্তরে একটা অনির্বচনীয় আনন্দ ও শান্তির অনুভব হতো। তখনকার দিনে সকলেই মহাপুরুষজীকে প্রণাম করতে আসত, তাঁর কাছে সকলেরই ছিল অবারিত দ্বার। রাজা মহারাজ যখন মঠে থাকতেন তখন তাঁকেও সকলে রোজ প্রণাম করত।

মহাপুরুষজী সকালে বাল্যভোগের একটি প্রসাদী সন্দেশ খেয়ে একটু জল খেতেন। তখনকার দিনে ঠাকুরের মিষ্টান্নাদি ভোগ অতি অল্প পরিমাণেই হতো। বালীর ললিত ময়রার দোকান থেকে রোজ একপোয়া কাঁচাগোল্লা সন্দেশ পাঁচ আনা দিয়ে আনা হতো—এবং ঐ সন্দেশটুকুই ছোট মারবেলের মতো কুড়িটি সন্দেশ পাকিয়ে সারা দিনরাতে ঠাকুরকে পাঁচ বার ভোগ দেওয়া হতো। ওরই দুটি বাল্যভোগের সন্দেশ আনা হতো মহাপুরুষজীর জন্য। সকালে একটি সন্দেশ খেয়ে তিনি জল খেতেন—আর একটি সন্দেশ উপস্থিত সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীদের হাতে হাতে

বেঁটে দিতেন। সে দৃশ্যটি খুবই হৃদয়স্পর্শী। সকলেই হাত বাড়িয়ে একটু প্রসাদ নিচ্ছে—মহাপুরুষজীর হাত থেকে! আড়চোখে দেখছে—কে বেশি পেল! সকলের মুখেই হাসি, আনন্দ। মহাপুরুষজীর হাত থেকে ঐ প্রসাদটুকু নেবার জন্য সাধুদের মধ্যে রীতিমত প্রতিযোগিতা চলত! মহাপুরুষজী বলতেন, "ছেলেদের একটু না দিয়ে কি খাওয়া যায়!" তাঁর হৃদয়তন্ত্রীতে সর্বক্ষণ বাজত একটি মাত্র সুর—স্নেহ-ভালবাসা; প্রতিটি কাজে, প্রতিটি ব্যবহারে তা হতো অভিব্যক্ত। অবশ্য তার মধ্যেও একটু পক্ষপাতিত্ব ছিল বই কি! সে পক্ষপাতিত্ব ছিল শ্রীরামকৃষ্ণচরণে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ সাধুদের প্রতি। তারা যে সব ছেড়ে শ্রীঠাকুরের আশ্রয়ে এসেছে। তাই মহাপুরুষজী তাদের সন্তানের মতো ভালবাসতেন এবং তারা যাতে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের যোগ্য হতে পারে সেদিকে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল। সকলের দেহমন শ্রীভগবানলাভের উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য তাঁর যত্নের অন্ত ছিল না। "শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্।" শরীর সুস্থ না থাকলে সাধন-ভজন যে অসম্ভব! সেকালে বেলুড় মঠ ম্যালেরিয়াবিধ্বস্ত, খুবই অস্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। বিশেষ করে বর্ষার ৪।৫ মাস জ্বর-জারি এত বেশি হতো যে, রোগীদের মুখে সময় মতো একটু পথ্য দেবার লোকেরও অভাব ছিল। তা ছাড়া মঠের আর্থিক অসঙ্গতির জন্য কোন পুষ্টিকর পথ্যও রোগীদের কখনো জুটত না। মহাপুরুষজীর অন্তরে এ বেদনা কত গভীর ছিল একদিনের সামান্য একটি ঘটনায় তার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। রাজা মহারাজের দেহত্যাগের কিছু পরের ঘটনা। সেকালে মঠের সাধুদের নিত্য দুধ খাবার কোন ব্যবস্থা ছিল না। ঠাকুরের ভোগের পায়েস ও দই প্রসাদ একটু একটু সকলেই পেত। মহাপুরুষজী রাত্রে একপোয়া দুধ খেতেন। সেই দুধে ৫।৭ টি মনাক্কা এবং তাঁর সর্দির ধাত ছিল বলে সামান্য তালমিছরি দেওয়া হতো। আবার কোষ্ঠকাঠিন্যের প্রতিকারের জন্য ২টি শুকনো প্রুণ (prune) দিয়ে ঐ দুধটুকু তিনি চামচে করে একটু একটু করে খেতেন। একদিন রাত্রে শ্রীঠাকুরের ভোগ নামার পরে সেবক প্রসাদসহ তাঁর খাবার নিয়ে গিয়েছে—তিনিও খেতে বসেছেন। নানা কথাবার্তা বলতে বলতে তিনি খাচ্ছিলেন। খাবার শেষে দুধের বাটি থালায় উপর দিতেই তিনি হঠাৎ চুপ হয়ে গেলেন। খানিকক্ষণ চামচে দিয়ে দুধ নাড়াচাড়া করে নিজের মনেই গদগদ স্বরে বললেন, "ছ্যা ছ্যা ছ্যা—লজ্জা হচ্ছে না, বুড়ো মানুষ দুধ খাচ্ছে, ছেলেরা এক ফোঁটা দুধ খেতে পায় না! ছ্যা, ছ্যা!" একথা বলেই দুধের বাটি থেকে হাত তুলে নিয়ে গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন। তাঁকে এ অবস্থায় দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় সেবক কাঁদ কাঁদ স্বরে বলল—"মহারাজ, দুধটুকু ঠাণ্ডা হয়ে যাবে যে, খান।" কোন সাড়া নেই। সেবক আরো বলল, "আমরা তো ভাত ডাল ও কত রকমের প্রসাদ পেট ভরে খাই, আপনি তো অন্য কিছুই খেতে পারেন না।

আমাদের বয়স কম, আপনার বৃদ্ধ শরীর। আমাদের দুধের কি দরকার? বঙ্গদেশে কজন লোক রোজ দুধ খেতে পায়? আপনি এই দুধটুকু খান, নইলে আমাদের মনে খুবই কষ্ট হবে। আপনি সুস্থ থাকলে আমাদের কত আনন্দ! আমরা তো আপনার মুখ চেয়েই আছি।" বলতে বলতে সেবক দুধের বাটিটি তাঁর সামনে দিল। তখন তিনি ধীরে ধীরে দুধটুকু খেলেন। কিন্তু তাঁর গাম্ভীর্যের কোন পরিবর্তন হলো না। সে রাত্রে তিনি আর কোন কথাবার্তা বলেননি। পরের দিন থেকেই রোগীদের দুধের ব্যবস্থা করলেন।

কিছুদিন পরে তিনি মঠের ম্যানেজার স্বামীকে ৮।১০ সের দুধ দেয় এমন একটি দুধালো গাই এলাহাবাদ থেকে আনার নির্দেশ দিয়ে বললেন, "গাইটি যেন পহেলা বিয়ানের হয়। সাদা হলেই ভাল।" মাসখানেক পরেই একটি সাদা রং-এর হরিয়ানা গাই আনা হলো। নাম রাখা হলো 'গঙ্গা'। পাঁচশত টাকার মতো খরচ পড়েছিল। গাইটি যেদিন এল সেটি মঠের খুব আনন্দের দিন। মহাপুরুষজী নিজের হাতে গাইটিকে কচি ঘাস ও পাকা কলা খাওয়ালেন, গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করলেন। মঠে ঐ প্রথম ভাল জাতের গরু এল। এতদিন মঠের গোয়ালে সব দেশী গাই-ই ছিল ১২।২ সের করে দুধ দিত। নূতন গাইটি আসার পর থেকে মঠের সাধুরা একটু করে দুধ খেতে পেতেন। তাতে সকলেরই খুব আনন্দ। মহাপুরুষজী গাইটি কেনার সব খরচ বহন করেছিলেন এবং তখন থেকে তিনি শুধু 'গঙ্গার' নয়, গোয়ালের সব গরুরই খোল, ভুষি, খড় ইত্যাদির সব খরচ দিতেন এবং সেবাযত্নের ব্যবস্থাও করতেন। প্রায়ই পাকা কলার কাঁদি কিনিয়ে এনে গরুদের খাওয়াতেন। গরুরা মহাপুরুষজীকে এত ভালবাসত যে, তিনি নিচে নেমে মাঠের দিকে এলেই গরুগুলি তাঁকে ঘিরে দাঁড়াত, তখন তাঁকে বাধ্য হয়ে তাদের কিছু খেতে দিতে হতো। আবার কেউ কেউ তাঁর নামবার দেরি সইতে না পেরে তাঁর ঘরের পাশে উঠানে এসে হাম্বা হাম্বা করে ডেকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করত। গঙ্গার বাচ্চাটি তো এত নেওটা হয়ে পড়েছিল যে সকালে গোয়াল থেকে ছাড়া পেলেই সোজা মঠের উঠানে এসে ডাকতে আরম্ভ করত। মহাপুরুষজীও তার ডাকে সাড়া দিয়ে উপর থেকে কলা বা অন্য কিছু পাঠিয়ে দিতেন।...

মঠের সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারী, বামুন চাকর, গরু বাছুর, কুকুর বিড়াল, গাছপালা, বাগ-বাগিচা সব কিছুর উপরই তাঁর ছিল সস্নেহ ও সতর্ক দৃষ্টি। বেলুড় মঠ ঠাকুরের সংসার—ঠাকুরকে কেন্দ্র করেই মঠ সক্রিয় ও গতিশীল ছিল। মহাপুরুষজী শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিনিধি, সে দায়িত্ব সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তাই তিনি নিজেকে সর্বাংশে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবের ধারক ও বাহকরূপে গড়ে তুলেছিলেন, যাতে

তাঁর ভিতর দিয়ে সকলে ঠাকুরকে ধরতে পারে ও বুঝতে পারে। একদিন সকালে তাঁর ঘরে সমবেত সাধুদের লক্ষ্য করে সাধুজীবনের আদর্শ সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন—"দেখ, আমাদের ঠাকুর গোমড়া মুখ আদৌ পছন্দ করতেন না, সাধু গোমড়ামুখ হয়ে থাকবে কেন? খুব আনন্দে থাকবে। বেলুড় মঠে যারা বাস করে, তাদের আদর্শসাধু হতে হবে। বেলুড় মঠই হলো সমগ্র সঙ্ঘের মাথা। মাথাটি ঠিক থাকলে যেমন শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব ঠিক চলে, তেমনি বেলুড় মঠের সাধুরা যদি ঠিক ঠিক ঠাকুরের ঘরের সাধু হয় তো সঙ্ঘটি ঠিক চলবে। বেলুড় মঠে যারা আছে তাদের উপর এ বড় দায়িত্ব স্বামীজীই দিয়ে গিয়েছেন। এখানে যেমন শিক্ষা পাবে তেমনি ভাবেই সঙ্ঘের সব সাধুদের জীবন গঠিত হবে। সাবধান, বাবা! বেলুড় মঠে বাস করা মহাভাগ্য। এখানে আমাদের কাছে থেকে তোমরা আদর্শ সাধু হও—এই আমার আন্তরিক ইচ্ছা। সমগ্র বিশ্ব যে বেলুড় মঠের দিকে তাকিয়ে আছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুরাও আদর্শ এবং অনুপ্রেরণার জন্য এদিকে চেয়ে আছে। এই বেলুড় মঠই যুগধর্মপ্রচারের প্রধান কেন্দ্র। তোমাদের উপর কত বড় দায়িত্ব! তোমাদের ভিতর দিয়েই লোক ঠাকুর স্বামীজীকে বুঝবে। আমরা আর কয়দিন!"...

মহাপুরুষজী বিলাসিতা পছন্দ করতেন না, কিন্তু পরিচ্ছন্নতার সুব্যবস্থা ও নিয়মানুবর্তিতার উপর তাঁর খুব দৃষ্টি ছিল এবং তিনি নিজেও সেভাবে চলতেন। সঙ্ঘাধ্যক্ষ হবার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর দুখানি পাঁচহাতি থান-কাপড় ও একখানি পোশাকি কাপড় মাত্র ছিল। জামা-জুতাও অতি সাধারণ এবং সামান্য একটি গেঞ্জি, একটি ফতুয়া ও জামা, একজোড়া চটিজুতা ও একজোড়া সাধারণ পাম্পশু। কিন্তু সব কিছুই পরিষ্কার ও বেশ গুছিয়ে রাখা হতো। কাপড়চোপড় ধোপাবাড়িতে দেওয়া তিনি তত ভালবাসতেন না, বলতেন, "ধোপাবাড়িতে দিলে কাপড় তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে যায়।" তাঁর সব কাপড় ঘরেই কাচা হতো, এমনকি বিছানার চাদর বা মশারিও।

একদিন সকালবেলা মঠের সাধুরা মহাপুরুষজীকে প্রণাম করতে এসেছেন। তিনিও হাসিমুখে সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। একজন সাধুর পরনে ছেঁড়া-ময়লা কাপড়, মহাপুরুষজীকে প্রণাম করে সাধুটি পিছন ফিরে চলে যাচ্ছেন—তখন তাঁর দৃষ্টি পড়ল ঐ ছেঁড়া কাপড়ের উপর। তিনি বললেন, "হীরেন, তোমার কাপড় ছিঁড়ে গিয়েছে, আর বড্ড ময়লাও হয়েছে। আর কাপড় আছে তো?" সাধু মাথা নিচু করে বললেন, "আছে, মহারাজ।" মহাপুরুষজী নিকটস্থ সেবককে লক্ষ্য করে বললেন, "হীরেনকে কাপড় দাও।" পরে সাধুদের বললেন, "ঠাকুর ছেঁড়া, তালিদেওয়া বা সেলাই করা কাপড় পরা পছন্দ করতেন না।" এবং সেবককে একটু দৃঢ়স্বরে বললেন, "সাধুদের কাপড়চোপড় আছে কিনা সেসব খোঁজ খবর তোমরা

করতে পার না? এখন থেকে কার কি প্রয়োজন তা জেনে নিও।" সেবক একখানি কাপড় দিচ্ছিল। তিনি বললেন, "না, দু-খানা কাপড় দাও।" সাধুটি নূতন কাপড় পেয়ে খুশি হয়ে চলে গেলেন। তখন অন্য একজন সাধু হাসতে হাসতে বললেন, "কাপড় আদায় করবেন বলেই হীরেন মহারাজ ছেঁড়া কাপড় পরে এসেছেন।" হাসির রোল পড়ে গেল। মহাপুরুষজীও হাসতে লাগলেন। মহাপুরুষজী দীক্ষা দিতে আরম্ভ করার পর থেকে মঠের দারিদ্র্য পরিবর্তিত হয়ে কিছুটা সচ্ছলতার রূপ নিয়েছিল—খাওয়া দাওয়া, কাপড়চোপড় সব বিষয়েই। দীক্ষার যা প্রণামী তা সবই মহাপুরুষজী মঠে জমা করে দিতেন, তাতে করেই ঠাকুরসেবা সাধুসেবা চলত। গুরুদক্ষিণারূপে একটি হরীতকী দিয়ে অনেক ভক্ত তাঁর কাছে দীক্ষা পেয়েছে, ভক্তিই ছিল অবশ্য অর্পণীয় বস্তু। যারা শ্রীরামকৃষ্ণ চরণে প্রাণের ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করেছে, তারাই মহাপুরুষজীর অফুরন্ত কৃপা পেয়েছে।

* * *

তখনো মহাপুরুষজীর সেবার কাজ তেমন বেশি ছিল না, তাই তিনি সেবককে মঠের অন্যান্য কাজেও লাগাতেন। একদিন সেবককে বললেন, "দেখ, আজকাল মঠের উঠান ভাল করে ঝাড়ু দেওয়া হচ্ছে না। তুমি কাল থেকে সময় করে উঠান ঝাড়ু দিও তো।" তাঁর আদেশমত সেবক কিছুদিন স্নানের পূর্বে উঠানে ঝাড়ু দিয়েছিল। আবার কখনো সেবককে বিকালের দিকে বাগানের কাজে বা মাঠে জল দিতেও পাঠাতেন। মঠের শিক্ষাই হচ্ছে—সব ঠাকুরের কাজ।

সেবকের আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য তাঁর যত্নের অন্ত ছিল না। সেবক অনেক সময়ই মহাপুরুষজীর কোন নির্দেশের প্রতীক্ষায় তাঁর ঘরের দরজার বাইরে বসে থাকত। একদিন সেবককে সস্নেহে বললেন, "তুমি তো ওখানে বসে বসে জপ করতে পার, সব সময় তো কাজ থাকে না। অথবা 'কথামৃত' পাঠ করতে পার।" সেবক তদবধি যখনই সময় পায় দরজার বাইরে বসে জপ করে এবং লাইব্রেরি থেকে কিছু বই এনে কখনো 'কথামৃত', কখনো বা স্বামীজীর বই পড়ে। মহাপুরুষজী সেবককে ঐ নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত ছিলেন না। তিনি প্রায়ই হঠাৎ দরজা খুলে দেখতেন সেবক কি করছে এবং জিজ্ঞেস করতেন, "কি পড়ছ?" সেবক যখন যে বই পড়ত তার নাম বলত। তিনি শুধু "বেশ, বেশ" বলে চলে যেতেন। এভাবে কয়েক মাস যাবার পরে একদিন হঠাৎ দরজা খুলেই জিজ্ঞেস করলেন, "কি পড়ছ?" সেবক বলল, "স্বামীজীর কর্মযোগ।" তাতে তিনি বললেন, "সেদিন তো 'কথামৃত' পড়ছিলে। আজ স্বামীজীর 'কর্মযোগ' পড়ছ। অবশ্য সব গ্রন্থই ভাল, কিন্তু এ রকম desultory reading (এলোমেলোভাবে পড়া) ভাল নয়। যখন যে বিষয় পড়বে তা গভীর অভিনিবেশ

সহকারে পড়তে হয়, এ বই সে বই পড়লে—তাতে কোন বিষয়েই ব্যুৎপত্তি হয় না, চিন্তার গভীরতাও জন্মায় না। আর এতে করে তুমি যে একটা বিষয়ে মন নিবিষ্ট করতে পারছ না, তাই বোঝা যায়। খুব মনোযোগের সঙ্গে দিনের পর দিন একই বিষয় পড়বে এবং সে বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করবে, আলোচনা করবে, তবে তো তা মনে গেঁথে যাবে। আমরা যখন গীতা-উপনিষদ্ পড়তাম, তখন গীতার এক একটি শ্লোক দিনের পর দিন ধ্যান করতাম। খুব মন দিয়ে পড়ো, আর সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের কাছে ঐ বিষয় যাতে ধারণা করতে পার তার জন্য প্রার্থনা করো।"...

* * *

গ্রীষ্মকাল, বেলুড় মঠে আলো বা পাখা তখনো হয়নি। মহাপুরুষজীর সর্দির ধাত। তিনি বাইরে শুতে পারতেন না। এদিকে বেলুড় মঠের কুখ্যাত মশা, তাই তিনি মশারি খাটিয়ে ঘরেই শুতেন। তাঁর ঘরটির পূর্ব ও দক্ষিণ দিক বন্ধ, ঘরে তেমন হাওয়া খেলত না। তিনি কারো সেবা নিতে চাইতেন না—সেবক খানিকক্ষণ হাতপাখা দিয়ে বাতাস করে মশারি ফেলে চলে আসত। একদিন সেবক মাঝরাতে জল খেতে উঠে দেখে—মহাপুরুষজী নিজে পাখা করছেন। সেবক তাঁর ঘরে গিয়ে ধীরে ধীরে বলল, "মহারাজ, আমি একটু পাখা করি।" তিনি বললেন, "না, তুমি শোওগে। তোমাকে দিনেরবেলা খাটাখাটি করতে হয়। এখন একটু ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে, আমি ঘুমিয়ে পড়ব।" সেবক বাইরে এসে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখল—তিনি পাখা করছেন আর এপাশ ওপাশ করছেন। পরদিন সেবক মঠের ম্যানেজার-স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করে ঠাকুরের প্রসাদী একখানি তালপাতার বড় পাখা নিয়ে রাত্রে মহাপুরুষজীকে মশারির বাইরে থেকে দু-হাতে পাখা করতে লাগল। তিনিও বেশ ঘুমোতে লাগলেন। কোন কারণে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যেতে তিনি সেবককে বললেন, "তুমি এখনো হাওয়া করছ, যাও যাও শোওগে। এখন ঠাণ্ডা হয়েছে।" সেবক অগত্যা পাখা রেখে বাইরে এসে অপেক্ষা করে দেখত তিনি হাতপাখা চালাচ্ছেন। সেবক চুপি চুপি ঘরে গিয়ে আবার পাখা করত, তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন। কোন রাত্রে ২। ২-৩০টায় মহাপুরুষজীর ঘুম ভেঙে গেলে তিনি সেবককে তখনো পাখা করতে দেখে একটু বিরক্তির সুরেই বলতেন, "তুমি এখনো শোওনি! যাও যাও, শোওগে। এভাবে রাত জেগে জেগে অসুখ করলে তোমাকে কে দেখবে?" অগত্যা সেবক পাখা বন্ধ করে শুতে যেত, কিন্তু গরমে তিনি আর ঘুমোতে পারতেন না। এভাবে সে গ্রীষ্মকালটা কেটে গেল।

মহাপুরুষজীর ঘরের পশ্চিমদিকটা খোলা ছিল বলে দিনের বেলাও তাঁর ঘরটি বেশ গরম হতো। কিন্তু দিনের বেলায় তিনি সেবককে আদৌ পাখা করতে দিতেন

না—বলতেন, "না, তুমি একটু শোওগে; রাত জেগেছ।" সেবক জিদ করতে সাহস করত না। তাছাড়া সেবকের মহাপুরুষজীকে খাইয়ে, তামাক ইত্যাদি দিয়ে, নিজে খেয়ে তাঁর কাছে আসতে দেরিও হয়ে যেত। সেজন্য সেবক তাঁকে শুইয়ে অল্পক্ষণ হাওয়া করে খেতে যেত—তখন মঠের অন্য সাধুরা পালা করে মহাপুরুষজীকে দুপুরে হাওয়া করতেন। কয়েক বৎসর পরে মহাপুরুষজীর ঘরের পশ্চিমদিকে একটি অ্যাসব্যাস্টাসের ছাদ-ঝুলানো বারান্দা করা হতে ঘরটিতে গরম ঠাণ্ডা দুই-ই কম হতো।...

দীক্ষাপ্রার্থীর সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ৫। ৭ জনের প্রায় রোজই দীক্ষা হয়, কোন কোনদিন ১০। ১২ জনেরও। তাতে মহাপুরুষজীর দৈহিক ক্লান্তি খুবই হতো এবং মনও এমন একটা উচ্চস্তরে থাকত যে, দীক্ষাদির পরে ঠাকুরঘর থেকে এসে অনেকক্ষণ তিনি কথাবার্তা বলতেন না, গম্ভীরভাবে বসে থাকতেন। কোন প্রার্থীকেই তিনি বড় একটা ফেরাতেন না, বড়জোর বলতেন, "এখন নয়, পরে হবে। ঠাকুরের কাছে কাতরভাবে প্রার্থনা কর, তাঁকে ডাক। দীক্ষা তো আমি দেবো না। তিনিই হলেন জগদ্‌গুরু, তিনিই দীক্ষা দেন। আমি যন্ত্রমাত্র।"

এই দীক্ষাদির ব্যাপারে বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় এই ছিল যে, দীক্ষাপ্রার্থীরা অনেকেই আগে থেকে কথাবার্তা বলে দিনক্ষণ স্থির করে আসত না, তাঁরা যেন দৈব-প্রেরিত হয়ে একটা অজ্ঞাত আকর্ষণে তাঁর কাছে দীক্ষার জন্য আসত। তাই প্রায় রোজ সকালেই দেখা যেত বিভিন্ন স্থান থেকে এসে কয়েকজন দীক্ষাপ্রার্থী গঙ্গাস্নান সেরে পূজোপকরণ নিয়ে অপেক্ষা করছে। তিনিও যেন সব জানতে পারতেন, তাই প্রায় প্রতিদিন সকালের দিকে সেবককে বলতেন, "নিচে গিয়ে দেখে এসো তো কোন খদ্দের আছে কিনা।" (তিনি দীক্ষাপ্রার্থীদের রহস্য করে বলতেন 'খদ্দের') আশ্চর্যের বিষয়, রোজই দেখা যেত ৫। ৭ জন দীক্ষাপ্রার্থী অপেক্ষা করছে, তারা অনেকেই পূর্বপরিচিত নয়—দূর দূর স্থান থেকে এসেছে। তিনি সব শুনে গম্ভীর হয়ে যেতেন, তাঁর অদ্ভুত ভাবান্তর হতো। তিনি বলতেন, "সকলকে ঠাকুরপ্রণাম করে মন্দিরে বসতে বল।" এদিকে তিনিও কাপড়চোপড় ছেড়ে গঙ্গাজলে হাত-মুখ ধুয়ে আচমন করে মন্দিরের পূজাশেষ হলেই মন্দিরে যেতেন। পূজারি মহারাজ পূজার সব ব্যবস্থা করে দিতেন। মহাপুরুষজী ঠাকুরপূজা করে, শ্রীঠাকুরের পাদুকায় অঞ্জলি দিয়ে দীক্ষার্থীদের একে একে ডাকতে বলতেন। ভক্তদের স্বামী-স্ত্রীকে একসঙ্গে দীক্ষা দেওয়া ছাড়া প্রায় প্রত্যেককেই তিনি পৃথক পৃথক ভাবে দীক্ষা দিতেন। পরে যখন মন্দিরে যেতে পারতেন না, ঘরে বসেই দীক্ষা দিতেন, তখনও এ নিয়মের ব্যতিক্রম বড় একটা হতো না। কদাচিৎ নেহাত এক পরিবারের

হলে ৩।৪ জনকে একসঙ্গে দীক্ষা দিয়েছেন। এক একজনকে দীক্ষা দিতে তাঁর অনেক সময় লেগে যেত। দীক্ষা দিয়ে তিনি প্রত্যেককেই শ্রীঠাকুরপ্রণাম করে খানিকক্ষণ জপ করতে বলতেন। জপের সংখ্যার উপর তিনি বেশি জোর দিতেন না। বলতেন, "খুব প্রাণের সঙ্গে জপ করবে। ভগবান দেখেন প্রাণ। যদি আন্তরিকভাবে ১০৮ বার জপ কর, তাতে হাজার জপের কাজ হবে।"

দীক্ষা দেবার সময় কার কি ভাব, কোন্ দেবতাকে তার ভাল লাগে—এসব তিনি জিজ্ঞেস করতেন এবং সব জেনে সেভাবে দীক্ষা দিতেন। ওভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে দীক্ষার্থী কেউবা বলত—শ্রীঠাকুরের আদেশ পেয়েছে, কেউবা বলত—মায়ের আদেশ পেয়েছে, আবার কেউবা বলত—স্বপ্নে মহাপুরুষজীর কাছেই দীক্ষা পেয়েছে ইত্যাদি। আমরা শুনেছি যে, দীক্ষার সময় শ্রীঠাকুরই মহাপুরুষজীকে মন্ত্র বলে দিতেন এবং তিনি ঠাকুরের মুখ থেকে শুনে সে মন্ত্রই প্রার্থীকে দিতেন। সেজন্য কোন কোন ভক্তকে দীক্ষা দিতে বেশ অনেকটা সময় লেগে যেত। পূজারি মহারাজ দরজা ফাঁক করে দেখতেন—তিনি ধ্যানস্থ, শিষ্যও। ঐ ধ্যানাবস্থায় তিনি যে মন্ত্র পেতেন তাই শিষ্যকে শোনাতেন। এমনও হয়েছে—কোনও ভক্ত পূর্বে মহাপুরুষজীর কাছে স্বপ্নে মন্ত্র পেয়েছে, তিনি সে মন্ত্রই দীক্ষার সময় দিয়ে জিজ্ঞেস করতেন, "কেমন ঠিক হয়েছে তো?" শিষ্যও বলত, "হ্যাঁ, মহারাজ, এ মন্ত্রই আপনি স্বপ্নে দিয়েছিলেন।" আবার এমনও হতো যে, তিনি দীক্ষার্থীদের কিছু জিজ্ঞেস না করেই মন্ত্র দিতেন—অথচ সকলেই বংশানুগত ও প্রকৃতিগত মন্ত্র পেত। (অবশ্য পরে এ সব নিয়মের ব্যতিক্রম হতে দেখা গিয়েছে। দেশ কাল ও পাত্রের বিচার না করে তিনি সর্বাবস্থায়ই দীক্ষা দিয়েছেন—এমন কি বিকালেও—নিজের ঘরে বসেই)।

মহাপুরুষজীর শক্তিসঞ্চারের ফলে দীক্ষার সময় কোন কোন শিষ্যের গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতি হতো। মন্ত্র পাবার সঙ্গে সঙ্গেই ভাবাবেশে অশ্রু পুলক কম্পন হয়ে শিষ্য ধ্যানস্থ হয়ে পড়ত! শিষ্য যতক্ষণ ধ্যানমগ্ন থাকত তিনিও ততক্ষণ দীক্ষার আসনে বসে থাকতেন। শিষ্যের ধ্যানভঙ্গ হলে তিনি তাকে মন্দির হতে সঙ্গে করে নিজের ঘরে নিয়ে আসতেন এবং সস্নেহে প্রসাদ খেতে দিতেন, আদর-যত্ন ও আশীর্বাদ করতেন। এ প্রকার বিশিষ্ট ভক্তকে দীক্ষা দেবার সময় তাঁর এত আনন্দ হতো যে, সে আনন্দ চাপতে পারতেন না। একদিন মালাবারের একটি বালক-ভক্তকে দীক্ষা দিয়ে ঘরে এনে তিনি সেবককে বললেন, "দেখ, ছেলেটি খুব ভাল। এর খুব উচ্চ আধার, মন্ত্র পাবার জন্য এর অন্তরটি যেন উন্মুখ হয়েছিল। তিনবার মন্ত্র উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই তার রোমাঞ্চ অশ্রু পুলক হতে লাগল এবং ক্রমে ধ্যানস্থ হয়ে পড়ল। তা দেখে আমারও খুব আনন্দ হলো। জয় প্রভু! তিনি

যুগাবতার—কত লোককে কতভাবে তিনি কৃপা করছেন! তিনিই তো কৃপা করবেন বলে তাঁর ভক্তদের আকর্ষণ করে নিয়ে আসছেন। ধন্য প্রভু! আমিও মাঝখান থেকে ধন্য হয়ে যাচ্ছি।" বলতে বলতে তাঁর অদ্ভুত ভাবান্তর হলো—সমগ্র মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে উঠল, তিনি নীরব হয়ে গেলেন।

মহাপুরুষজীর কাছ থেকে দীক্ষা পেয়ে ভক্তদের নানা আধ্যাত্মিক অনুভূতি হতো। কেউ শ্রীঠাকুরের দর্শন পেত, কেউ বালগোপালমূর্তি দর্শন করত, অনেকের গভীর ধ্যান হতো, জপ-ধ্যানে খুব আনন্দ পেত। তিনি দীক্ষিত ভক্তদের খোঁজখবর রাখতেন, সাধন-ভজন কেমন হচ্ছে তা জিজ্ঞেস করতেন এবং সাধু-ভক্তদের আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য নিত্য ঠাকুরের কাছে খুব আবেগভরে প্রার্থনা করতেন। তাঁর ভিতর ঐশী শক্তির এতটা বিকাশ হয়েছিল যে, তাঁর আশীর্বাদ সর্বক্ষেত্রেই সফল হতো—মুমূর্ষু সুস্থ সবল হয়ে উঠত, পুত্রহারা পুত্র পেত, দুঃস্থ সুদিনের মুখ দেখতে পেত, জীবিকাশূন্য জীবিকার সন্ধান পেত। তাঁর মুখ দিয়ে যে আশীর্বাদ বের হতো তা সর্বাংশে সত্যে পরিণত হতো। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! ঐ সময়ে তাঁর ভিতর নানা যোগশক্তির বিকাশও হয়েছিল। একদিন বিকালবেলা তিনি আপন মনে চুপচাপ বসে আছেন—সেবক ঘরে ঢুকতেই তিনি মাথা তুলে বললেন, "দেখ, তোমরা কে কি করছ আমি সব দেখতে পাই। মঠে কে কি করছে, বিভিন্ন আশ্রমে সাধুরা কে কি করছে, না করছে—সব দেখতে পাই, জানতে পারি। এমনকি আমেরিকায় সাধুরা কে কি করছে তাও এখানে বসেই দেখতে পাই। ঠাকুর তাঁর সঙ্ঘ চালাবার জন্য এসব শক্তি দিয়েছেন। আমি, বাবা কিছুই জানিনে।" অন্য সময় বলেছিলেন, "ভক্তরা সাধন-ভজন কে কি করছে, না করছে—সব জানতে পারি। তাদের জন্য ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি যাতে সকলের কল্যাণ হয়।" আমরা কয়েকজন ভক্তের মুখে শুনেছি—রাত ১।১-৩০টার সময় মহাপুরুষজী স্বপ্নে তাঁদের দর্শন দিয়েছেন, আবার কাউকে ধ্যানের সময় সূক্ষ্মদেহে দর্শন দিয়ে অভয় দিয়েছেন, আশীর্বাদ করেছেন, কোথাও সাংসারিক অশান্তি বা বিপদ সম্বন্ধে ঠাকুরের আশীর্বাদ জানিয়ে বলেছেন, "কিছু ভেব না। ঠাকুরের ইচ্ছায় সব ঠিক হয়ে যাবে।"

এ প্রসঙ্গে একটি আশ্চর্য ঘটনার কথা মনে পড়ে। হৃষীকেশবাবু স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কিন্তু তিনি মহাপুরুষ মহারাজকে গুরুর মতো শ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁর খুবই স্নেহের পাত্র ছিলেন। মহাপুরুষজীও যেন তাঁর আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক সর্ববিধ কল্যাণের ভার নিয়েছিলেন। তিনি বিলাত থেকে পাশ করে দেশে ফিরে এসেও অনেকদিন বেকার ছিলেন, পরে মহাপুরুষজীর আশীর্বাদ নিয়ে ইন্টারভিউ দিতে (চাকরির জন্য দেখা করতে) গেলেন এবং সেখানে

তাঁর চাকরিও হয়ে গেল। পরে টাকার অভাবে বাড়ি করতে পারেন না এবং সাংসারিক নানা সমস্যার জন্য হৃষীবাবুর মন খুব খারাপ। তিনি মঠে মাঝে মাঝে আসেন। কিন্তু লজ্জায় মহাপুরুষজীকে কিছু বলতে পারতেন না। রাত ১-৩০। ২টায় ঘুম ভেঙ্গে গেলেই মহাপুরুষজীর কথা ভাবতেন। এক রাত্রে ঐভাবে তিনি মহাপুরুষজীর কথা ভাবছেন, এমন সময় দেখেন তাঁর অন্ধকার ঘরের এককোণে মহাপুরুষজী জ্যোতির্ময় দেহে দাঁড়িয়ে আছেন। হৃষীবাবুর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই প্রসন্ন দৃষ্টিতে হাত তুলে আশীর্বাদ করে চকিতে অন্তর্ধান করলেন। হৃষীবাবু পরদিনই মঠে গিয়ে মহাপুরুষজীকে প্রণাম করে অবাকদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন, তাতে মহাপুরুষজী হাসতে হাসতে বললেন, "অমন করে কি দেখছ! আমারও রাত ১-৩০। ২টায় ঘুম ভেঙে যায়, তখন ভক্তদের কথাই মনে পড়ে।... তা অত ভাবছ কেন? তোমার বাড়ি হয়ে যাবে। আমি কাউকে তোমায় কিছু টাকা ধার দিতে বলে দেব।...ঠাকুরে বিশ্বাস রাখ, তিনি তাঁর ভক্তদের সর্বাবস্থায় রক্ষা করেন।" হৃষীবাবুর বাক্যস্ফূর্তি হলো না। তিনি মাথা নিচু করে কাঁদতে লাগলেন।

* * *

একদিন সকালে স্বামী শুদ্ধানন্দ মহারাজ মহাপুরুষজীকে প্রণাম করে বললেন, "আপনার কাছে তো রোজই অনেক ভক্ত দীক্ষা নিতে আসে, ঐ ভক্তদের নাম-ঠিকানা জানলে আমরা মঠ থেকে তাদের উৎসবাদির নিমন্ত্রণপত্র পাঠাতে পারি; তাতে করে উৎসবাদিও ভালভাবে হয়ে যেতে পারে এবং ভক্তদের সঙ্গে মঠের একটা যোগাযোগও থাকে।"

শুনে মহাপুরুষজী বললেন, "যারা দীক্ষা নিতে আসে, তাদের নাম-ধাম আমি তো কখনো জিজ্ঞেস করিনে। আমি জানি ঠাকুরই ভক্তদের নিয়ে আসেন। তা তুমি যখন বলছ—ভক্তদের নাম-ঠিকানা রাখার ব্যবস্থা করছি।" এবং সেবকের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কাল থেকে যারা দীক্ষা নিতে আসবে তাদের নাম-ঠিকানা তুমি লিখে সুধীরকে দিও।" সেবক সেদিনই অফিস থেকে রুল-করা একটি খাতা এনে পরের দিন থেকে যারা দীক্ষা নিতে আসতো তাদের নাম-ধাম লিখে রাখতে লাগল। কিন্তু ঐ কাজটি ক্রমেই অসম্ভব হয়ে উঠল, কারণ যারা দীক্ষা নিত তারা সকলে অন্নপ্রসাদ পেত না, দীক্ষার পরেই একটু প্রসাদ নিয়ে চলে যেত; যারা প্রসাদ পেত তাদের মধ্যেও অনেকেই গঙ্গায় হাতমুখ ধুয়েই বাড়ি চলে যেত। তাছাড়া আগে থেকে বলা-কওয়া নেই, হঠাৎ নাম ধাম লিখে নেওয়া—তাও সব ভক্তরা তত পছন্দ করত না। সেজন্য তিন মাস চেষ্টা করে সেবক শতাধিক নাম-ঠিকানা লিখে মহাপুরুষজীকে জানাতেই তিনি বললেন—"যতটা পেরেছ তাই সুধীরকে দিয়ে দাও।

সুধীরই চেয়েছিল।" তাই করা হলো। তারপর মহাপুরুষজীর দীক্ষিত ভক্তদের নাম ঠিকানা রাখার কোন চেষ্টা করা হয়নি।

* * *

বারাণসীধামে শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে স্বামী অদ্ভুতানন্দ মহারাজের স্মৃতিতে ৺মহাবীরের মন্দির ও স্মৃতিভবন-প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ অনুরুদ্ধ হয়ে মহাপুরুষজী ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারির শেষভাগে কাশী গিয়েছিলেন। এলাহাবাদ থেকে মহাপুরুষজীর কাশী যাবার কথা জানতে পেরেই স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ বেলুড় মঠে উপস্থিত হয়ে মহাপুরুষজীকে কাশীর পথে এলাহাবাদ আশ্রমে যাবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। মহাপুরুষজীও তাতে রাজি হন। সেই অনুসারে পূজনীয় বিজ্ঞান মহারাজ এক শুভদিনে মহাপুরুষজীকে নিয়ে এলাহাবাদ যাত্রা করেন। মহাপুরুষজী ঐ সময়ে আমাকেও সঙ্গে নিয়েছিলেন।

এলাহাবাদে শ্রীমহাপুরুষজী ৩। ৪ দিন মাত্র ছিলেন। ঐ কয়দিন বহু ভক্ত তাঁকে দর্শনাদি করেছিলেন এবং ১০। ১২ জন ভক্তকে তিনি মন্ত্রদীক্ষাও দিয়েছিলেন। ঐ সময়ে পূজনীয় বিজ্ঞান মহারাজ মহাপুরুষজীর অক্লান্ত সেবা করেছিলেন এবং সেবার মাধ্যমে মহাপুরুষজীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও আনুগত্য কতটা গভীর তাই প্রকটিত হয়েছিল! তিনি দীন সেবকের মতো সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত সর্বক্ষণ মহাপুরুষজীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যবিধানে তৎপর থাকতেন। তিনি মহাপুরুষজীকে খাইয়ে তবে নিজে খেতেন। মহাপুরুষজী যত বলতেন, "পেসন তুমিও খেতে বসো।" তাতে হরিপ্রসন্ন মহারাজ বলতেন, "না, মহারাজ, আপনার খাওয়া হোক।" মহাপুরুষজী বিশ্রাম করতে গেলে তবে তিনি বিশ্রাম করতে যেতেন। মসলা দেওয়া কোন রান্না মহাপুরুষজীর পেটে সইত না, তাই বিজ্ঞান মহারাজ তাঁর জন্য সেভাবে রান্নাদির ব্যবস্থা করেছিলেন। ভক্তরা অসময়ে যাতে মহাপুরুষজীকে বিরক্ত না করে, সেজন্য তিনি নিজেই সতর্ক প্রহরীর মতো থাকতেন।

একদিন পূর্বাহ্ণে বিজ্ঞান মহারাজ মহাপুরুষজী ও তাঁর সঙ্গীদের নৌকা করে ত্রিবেণী-সঙ্গমে নিয়ে যান। সকলে সঙ্গমে পূজা করেন; তরঙ্গরূপে ত্রিবেণীমাঈ তাঁদের পূজা-অর্ঘ্য গ্রহণ করলেন। আমরা শুনেছিলাম যে, বিজ্ঞান মহারাজ একদিন শেষরাত্রে সঙ্গমে স্নান করতে এসে তিন-বেণী-যুক্ত বালিকামূর্তিতে ত্রিবেণীমাঈর দর্শন পেয়েছিলেন। ঐ বিষয় জিজ্ঞেস করতে তিনি কিছুতেই ধরা দিলেন না, হেসে বললেন, "আরে, দাদা, মাথা গরম হলে কত কিছু দেখে! ওসব বিশ্বাস করো না।" (তিনি সাধু ব্রহ্মচারী, এমনকি ভক্তদেরও 'দাদা' বলে সম্বোধন করতেন)।

প্রয়াগতীর্থ মহাপুরুষজীর বহু দিনের তপস্যার স্থান—একদিন তিনি প্রসঙ্গক্রমে

ঝুসিতে তপস্যার কাহিনীও বলেছিলেন। এলাহাবাদে সাধু-ভক্তদের নানাভাবে আনন্দ দিয়ে মহাপুরুষজী এলেন কাশীধামে। ঐ উপলক্ষে পাটনা, কনখল প্রভৃতি কেন্দ্র হতেও সাধু-ভক্তগণ এসে ঐ আনন্দ-উৎসব সাফল্যমণ্ডিত করেছিলেন। স্বামী সারদানন্দ মহারাজও ঐ সময় কাশীতে উপস্থিত ছিলেন।

মাঘীপূর্ণিমার দিন এক পুণ্য মুহূর্তে বিশেষ পূজা ও হোমাদিসহ মহাপুরুষজী নবনির্মিত মন্দিরে ৺মহাবীরের প্রতিষ্ঠা ও স্বামী অদ্ভুতানন্দ-স্মৃতিভবনের দ্বারোদ্ঘাটনের পরে একটি বড় ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে এবং অন্য ঘরে লাটু মহারাজের ব্যবহৃত খাটিয়া বিছানাপত্র ও তাঁর পূজিত বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি ও প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা করে আনুষ্ঠানিক ভাবে লাটু মহারাজের নিত্য সেবাপূজাদির প্রবর্তন করেন। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে স্বামীজীর বিশেষ ইচ্ছায় মহাপুরুষজী অদ্বৈত আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং সে সময় হতেই নিচের মণ্ডপের পাশে একটি ছোট্ট ঘরেই শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজী, পরে শ্রীমা, বাণলিঙ্গ, ৺মা কালী ও মহাবীরের পট পূজিত হতো। ঐদিন শঙ্খধ্বনি ঘণ্টাবাদ্য ও শ্রীগুরু মহারাজজীর জয়ধ্বনির মধ্যে মহাপুরুষজী নিচের ঠাকুরঘর হতে শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবি বুকে করে উপরে নিয়ে এলেন; অপর প্রবীণ সাধুরা অন্যান্য প্রতিকৃতি বয়ে এনেছিলেন। মহাপুরুষজী শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীমা, স্বামীজী ও অন্যান্য দেবদেবীর পূজা করলেন। সে সময় বহুসাধুভক্তপরিপূর্ণ সমগ্র অদ্বৈত আশ্রমটি এক গম্ভীর আধ্যাত্মিক ভাবে আপ্লুত হয়েছিল এবং সমাগত সকলেই প্রাণে সে দিব্যভাবতরঙ্গের স্পন্দন অনুভব করেন।

কাশী অদ্বৈত আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীমা ও স্বামীজীর পূজাপ্রবর্তনের একটি পুণ্য ঐতিহ্য আছে। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে স্বামীজী কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে বেদান্তপ্রচারের জন্য মহাপুরুষজী কাশীতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতি স্থাপন এবং পূজার প্রবর্তন করেন। কিছুদিন পরে স্বামীজীর দেহরক্ষার সংবাদ পেয়ে প্রাণের আবেগে শ্রীশ্রীঠাকুরের পাশে স্বামীজীর ছবি বসিয়ে স্বামীজীর পূজাও আরম্ভ করেন। এটি বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় যে, স্বামীজীর একজন গুরুভ্রাতাই স্বামীজীকে দেবতার আসনে বসিয়ে কাশী অদ্বৈত আশ্রমে প্রথম তাঁর পূজার প্রবর্তন করেছিলেন। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে সহস্র সহস্র মন্দিরে ও ভক্তগৃহে স্বামীজী পূজিত হচ্ছেন। স্বামীজীর প্রতিকৃতি স্থাপন প্রসঙ্গে মহাপুরুষজী বলেছিলেন—"স্বামীজীর দেহত্যাগের খবর তারযোগে পেয়ে প্রথমটায় মনে হয়েছিল যে, কেউ রগড় করে বা আমার সঙ্গে মজা করার জন্য ঐ তার করেছে। কারণ এর ৮।১০ দিন পূর্বেই স্বামীজী নিজের হাতে তাঁর জন্য চৌখাম্বা থেকে কিছু সংস্কৃত বই পাঠাবার জন্য আমায় লিখেছিলেন এবং সে চিঠিতে তাঁর শরীর ভাল আছে তাও জানিয়েছিলেন। তবু ঐ

তার পেয়ে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। সে রাত্রে কিছু খেলাম না—সারারাত কেঁদে কেঁদে কাটালাম। পরের দিন খবরের কাগজে তাঁর দেহত্যাগের খবর বেরুতে আর অবিশ্বাস করার জো ছিল না। মন একেবারে ভেঙে গেল। ভাবলাম এখন মঠে গিয়ে তাঁকে তো আর দেখতে পাব না। স্বামীজী-শূন্য মঠে তখন না যাওয়াই স্থির করে তাঁর শেষ আদেশ পালনের জন্য কাশীতেই থেকে গেলাম এবং দু-একদিন পরেই স্বামীজীর একখানি ছবি জোগাড় করে তা ঠাকুরের পাশে বসিয়ে তাঁর পূজা করতে লাগলাম। স্বামীজী আমাকে বেদান্তপ্রচারের জন্য কাশী পাঠিয়েছিলেন। ঠাকুরই আমাদের বেদান্ত, ঠাকুরই আমাদের অদ্বৈত। তাই তো ঐ আশ্রমের নাম রেখেছি শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম। স্বামীজী যে কি ছিলেন, কে ছিলেন তা জগৎ এখনো বুঝতে পারেনি, ক্রমে বুঝবে। ঠাকুর আর স্বামীজী যে অভিন্ন—ঠাকুর হলেন সূত্র আর স্বামীজী হলেন তার ভাষ্য।" অন্য সময়ে ঠাকুর, মা, স্বামীজী যে অভিন্ন সে সম্বন্ধে মহাপুরুষজী বলেছিলেন, "বৌদ্ধদের Trinity (ত্রিত্ববাদ)—'একেই তিন, তিনেই এক'—বুদ্ধ, ধর্ম, সঙ্ঘ এবং খ্রিস্টধর্মের Trinity (ত্রিত্ববাদ)—ত্রয়াত্মক অবস্থা—ঈশ্বরে পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা—এই তিন ভাবের মিলন—তাঁরা খুব বিশ্বাস করেন। আমাদেরও তেমনি ঠাকুর, মা ও স্বামীজী—এই ত্রিমূর্তি একই। বৌদ্ধরা যেমন 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি' বলে Trinity-র পূজা করে, আমরাও তেমনি 'রামকৃষ্ণ শরণং গচ্ছামি, সারদাদেবীং শরণং গচ্ছামি, বিবেকানন্দং শরণং গচ্ছামি' বলে প্রণাম করে ঐ ত্রিমূতির শরণ প্রার্থনা করি। একে তিন, তিনেই এক। আমি তো, বাবা, এই বুঝি। আমাদের ঠাকুর—মা—স্বামীজী একই। বাহ্যত তিনটি প্রকাশ হলেও আসলে তাঁরা এক।"

মহাপুরুষ মহারাজ কাশী অদ্বৈত আশ্রমে ঠাকুর ও স্বামীজীকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তখন তিনি নিজেই পূজা করতেন। পরে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে শ্রীশ্রীমা যখন শেষবার কাশীতে আসেন, তখন তিনি কাশীবাসী সাধু-ভক্তদের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে এই অবিমুক্তপুরী বারাণসীক্ষেত্রে নিজের প্রতিকৃতি নিজেই পূজা করে (মাথায় ও বুকে ঠেকিয়ে) কাশী অদ্বৈত আশ্রমের ঠাকুর ঘরে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।[১] এটি শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের ইতিহাসে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।...

যদিও শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহরক্ষার পরদিনই 'ঠাকুরের অন্ত্যলীলাস্থান' কাশীপুর উদ্যানেই শ্রীমা ঠাকুরের প্রতিকৃতি বসিয়ে নিজের হাতেই শ্রীপ্রভুর পূজার প্রবর্তন করেছিলেন, কিন্তু তিনি তখন 'নারায়ণের সঙ্গে লক্ষ্মীর' পূজার মতো নিজের পূজা প্রবর্তন করেননি। কাশী অদ্বৈত আশ্রমেই শ্রীমা প্রথম শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে তাঁর

১ এই প্রসঙ্গে মতান্তর আছে।

পূজারও প্রবর্তন করেছিলেন। তার পূর্বে কোন মন্দিরে, এমনকি বেলুড় মঠেও প্রকাশ্যভাবে শ্রীমায়ের প্রতিকৃতি-পূজা হতো না। সেদিক থেকে শ্রীমা যে কাশী অদ্বৈত আশ্রমে নিজেই নিজের ছবির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে মন্দিরে স্থাপনা করেছিলেন তা খুবই বড় ঘটনা এবং আজ যে দেশ বিদেশে শ্রীমায়ের ছবি পূজিত হচ্ছে তারই শুভ সূচনা। তাতে করে শুধু কাশীবাসী এবং তীর্থযাত্রীদের প্রতিই তাঁর অশেষ করুণা প্রকাশিত হয়নি, তিনি যে দেবীরূপে সারা বিশ্বে পূজিতা হবেন তারও শুভ উদ্বোধন করে গেলেন এবং তার ফল হয়েছে সুদূরপ্রসারী।

শারীরিক অসুস্থতার জন্য স্বামী সারদানন্দ মহারাজ কাশী অদ্বৈত আশ্রমে ঐ প্রতিষ্ঠাদি কার্যে যোগদান করতে পারেননি। তিনি পূর্বব্যবস্থামত আশ্রমের কাছেই জনৈক ভক্তের দ্বিতলভবনে সঙ্গীদের নিয়ে অবস্থান করছিলেন। ঐ প্রতিষ্ঠাদি কার্যের পরেও মহাপুরুষজী কয়েক দিন কাশীতে ছিলেন এবং ৺বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা দর্শন, আশ্রমে ভজন কীর্তন ও ভগবৎ প্রসঙ্গাদিতে যোগদান করে সকলকে বিশেষ আনন্দ দিয়েছিলেন। একদিন ভজন হচ্ছিল—তিনি তাতে যোগ দিয়ে নিজেই তবলা বাজাতে লাগলেন; পরে যখন কীর্তন আরম্ভ হলো তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে আখর দিয়ে গাইতে লাগলেন। মহাপুরুষজী অতি সুকণ্ঠ ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর গান শুনতে ভালবাসতেন।

ঐ প্রতিষ্ঠাদি কার্য উপলক্ষে তিনি তিনজন ব্রহ্মচারীকে সন্ন্যাস দিয়েছিলেন। তাঁদের নাম হয়েছিল স্বামী শাশ্বতানন্দ, স্বামী অসঙ্গানন্দ ও স্বামী অদ্বয়ানন্দ। সঙ্ঘাধ্যক্ষ হয়ে মহাপুরুষজী এই প্রথম সন্ন্যাস দেন।

মহাপুরুষজীর কাশীতে আসার খবর পেয়ে কনখল থেকে স্বামী কল্যাণানন্দজী তাঁকে কনখলে যাবার জন্য সানুনয় আমন্ত্রণপত্র ও গাড়িভাড়ার টাকাকড়ি সহ জনৈক ব্রহ্মচারীকে কাশীতে পাঠিয়েছিলেন, সুতরাং মহাপুরুষজীর কনখল যাবার কথাবার্তা হতে লাগল। এদিকে ঐ চিঠি দু-আশ্রমের প্রবীণ সন্ন্যাসীদের বিশেষ আলোচনার বিষয় হলো। অনেকেই বললেন সঙ্ঘাধ্যক্ষকে নিয়ে যাবার জন্য স্বামী কল্যাণানন্দের নিজেরই আসা উচিত ছিল। তাই তাঁরা মহাপুরুষজীকে বললেন, আপনি আমাদের সঙ্ঘগুরু, এভাবে নিমন্ত্রিত হয়ে আপনার কনখলে যাওয়া ঠিক হবে না; তা ছাড়া এখন শীতকাল, হরিদ্বারে দারুণ ঠাণ্ডা—কনখলে আপনার খুবই কষ্ট হবে, শরীরও খারাপ হতে পারে। আপনি যাবেন না, মহারাজ। কল্যাণ মহারাজকে আসতে লিখুন, তিনি তো বহু বৎসর কাশীতে নামেননি। তিনি এলে আমাদের সকলের সঙ্গেও তাঁর দেখাশুনা হতে পারে।" ইত্যাদি নানা কথা বলে প্রবীণরা জনে জনে এসে কনখল যাওয়া সম্বন্ধে মহাপুরুষজীকে নিবৃত্ত করতে লাগলেন। মহাপুরুষজী সব

শুনছেন, কিন্তু নিজের মতামত কিছুই দিচ্ছেন না, শুধু বলছেন, "কল্যাণ এলে তো ভালই হতো, তোমাদের সকলের সঙ্গেও দেখাশুনা হতো।" শেষে একদিন কেদার বাবা এসে মহাপুরুষজীকে বললেন, "আপনি যাবেন না, মহারাজ। কল্যাণ মহারাজকেই আসতে লিখে দিন।" তখন মহাপুরুষজী ধীরভাবে বললেন, "তোমরা সকলে যা বলছ সবই ঠিক। কল্যাণের আসাই উচিত ছিল, কিন্তু কল্যাণ যে আমাকে খুব কাতরভাবে যাবার জন্য লিখেছে। ওখানে গেলে সকলের সঙ্গে দেখাও হবে। যাতায়াতে কষ্টও যে হবে তাও বুঝি, তবু মনে হচ্ছে ঠাকুরের কাজের জন্য আমার যাওয়াই উচিত। দেখ, কেদার বাবা, স্নেহ নিম্নগামী। কল্যাণ আমাকে দেখতে চেয়েছে, তাই মনে করছি—যাব। অবশ্য সবই ঠাকুরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। ঠাকুরের ইচ্ছা হয় তো আমি যাওয়াই স্থির করেছি।" কেদার বাবা এরপর আর কিছু বলতে পারলেন না। তিনিই ছিলেন সাধুদের মধ্যে সব চেয়ে প্রবীণ। তিনি বলতে লাগলেন, "মহাপুরুষ মহারাজ কনখল যাওয়া সম্বন্ধে যেভাবে বললেন তাতে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি। ঠাকুরের কাজের উপর তাঁর কতটা টান আর কল্যাণ মহারাজের প্রতি তাঁর কি গভীর স্নেহ! এই শীতে তিনি কনখল যাবেন স্থির করেছেন।"

মহাপুরুষজীর মধ্যে ঐশ্বরিক স্নেহের পূর্ণবিকাশ হয়েছিল বলেই তিনি সকলের অন্তর জয় করেছিলেন। ঐ ঐশী স্নেহ মানুষকে দেবতা করে, দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত করে।

* * *

মহাপুরুষজী কনখল যাত্রা করলেন। ঐ সময় সেবক ছাড়া প্রিয় মহারাজকেও (স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ) তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন, কনখলের সাধুটি তো ছিলেনই। হরিদ্বার স্টেশনে গাড়ি পৌঁছতেই দেখা গেল স্বামী কল্যাণানন্দজী ও স্বামী নিশ্চয়ানন্দজী প্রভৃতি অনেক সাধু মহাপুরুষজীর সংবর্ধনার জন্য এসেছেন। ...কনখলে এসে মহাপুরুষজী খুব আনন্দিত হলেন। ঐ সময় বৃষ্টি হয়ে সামনের ৺চণ্ডী পাহাড় প্রভৃতি উঁচু পাহাড়ে বরফ পড়ে হিমালয় অনুপম শুভ্ররূপ ধারণ করেছিল। বরফ দেখে মহাপুরুষজীর কি আনন্দ! তিনি খুশি হয়ে বলেছিলেন, "অনেক বৎসর বরফ দেখিনি, তাই তো গিরিরাজ শুভ্ররূপ ধারণ করেছেন, হৈমবতী ভূষিতা হয়েছেন শুভ্র আভরণে। বরফ না হলে কি হিমালয় মানায়?"

মহাপুরুষজীর আগমন-সংবাদে হরিদ্বার ভীমগোড়া হৃষীকেশ প্রভৃতি স্থানে তপস্যারত সাধুরাও কনখল আশ্রমে সমবেত হয়েছিলেন। সকলকে দেখে তিনিও খুবই আনন্দিত হন। ঐ সাধুদের মধ্যে দক্ষিণ কলকাতা চেতলা অঞ্চলের জনৈক ব্রাহ্মণ প্রাক্তন হেডপণ্ডিত মহাশয়ও ছিলেন। তাঁকে সকলে পণ্ডিতজী বলে ডাকতেন।

মহাপুরুষজী এঁকে খুবই স্নেহ করতেন এবং মহাপুরুষজীর বিশেষ আশীর্বাদ নিয়ে পণ্ডিতজী চতুর্থাশ্রমীর মতো হৃষীকেশে তপস্যা করতে এসেছিলেন। মহাপুরুষজী কনখলে পৌঁছবার দ্বিতীয় দিন বিকালে পণ্ডিতজী সন্ন্যাসপ্রার্থী হয়ে কনখলে আসেন। মহাপুরুষজী নিচের বড় ঘরটিতে তখনও লেপ গায়ে নিদ্রিত ছিলেন। তাঁর পা দুখানি খানিকটা খোলা ছিল। সেবক ঘরের দরজায় বসে তাঁর উঠবার প্রতীক্ষা করছিল। মহাপুরুষজীর উঠবার দেরি দেখে পণ্ডিতজী ক্রমেই অধীর হয়ে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে সেবককে বললেন, "আমি ঘরের ভিতর গিয়ে মহাপুরুষজীর পায়ের তলায় একটু বসতে চাই।" সেবক বলল—"তার পা স্পর্শ করবেন না, তা করলে ঘুম ভেঙে যাবে।" তিনি নতশিরে সম্মতি জানিয়ে আস্তে আস্তে মহাপুরুষজীর পায়ের তলায় গিয়ে বসলেন এবং তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি ও পায়ের তলা খুবই নিবিষ্টচিত্তে দেখতে লাগলেন। তাঁর পর্যবেক্ষণ থেকে মনে হচ্ছিল তিনি যেন কিছু পরীক্ষা করছেন। মহাপুরুষজীর মুখ খোলা ছিল। কয়েক মিনিট এভাবে মহাপুরুষজীকে দেখে পণ্ডিতজী নিঃশব্দে বাইরে এসে সেবককে ইশারা করে এক পাশে ডেকে নিম্নস্বরে বললেন—"দেখুন, মহাপুরুষ মহারাজ আশি বৎসর বাঁচবেন, বড়জোর এক আধ বৎসর এদিক সেদিক হতে পারে।" সেবক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি করে জানলেন? এখন তো তাঁর বয়স সত্তরও হয়নি।" তিনি খুব গম্ভীরভাবে বললেন, আমি জ্যোতিষ-চর্চা করেছি, ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধেও আমার বেশ জ্ঞান আছে, হাত-পায়ের রেখা ও চক্রাদির বিচারও আমি করেছি, আয়ুর্বেদও পড়া আছে। আমি মহাপুরুষজীকে প্রথম যখন দর্শন করি তখনই তাঁর শরীরের গঠন ও লক্ষণাদি থেকে আমার মনে হয়েছিল যে, তিনি দীর্ঘায়ু হবেন। আজ তাঁর পায়ের তলায় চক্র দেখে বুঝেছি যে, তাঁর বুদ্ধের অংশে জন্ম এবং তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি দেখে তাঁর দীর্ঘায়ু সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছি। বুদ্ধদেবের পায়ের তলায় যে চক্র ছিল, এঁর পায়ের তলায়ও সে রকম গোল চক্র রয়েছে, তবে একটু অস্পষ্ট। তাতেই আমার ধারণা হয়েছে যে, তিনি বুদ্ধদেবের পরমায়ু পাবেন।" তারপরে একটু থেমে বললেন, "দেখুন, একটা বিশেষ অনুরোধ এই যে, আপনি এসব কথা এখন কাউকে বলবেন না। আমার কথা সত্য হয় কিনা তাই শুধু লক্ষ্য করে যাবেন। আমি হয়তো ততদিন বাঁচব না, কারণ আগামী বৎসরই আমার মৃত্যুযোগ আছে।* সেজন্যই এঁর কাছে

---

* মহাপুরুষজী ঐ বৎসর পণ্ডিতজীকে সন্ন্যাস দিয়েছিলেন—নাম হয়েছিল স্বামী সর্বেশানন্দ। সন্ন্যাসের পরে তিনি মহাপুরুষজীর আশীর্বাদ নিয়ে পুনরায় হৃষীকেশে তপস্যা করতে যান এবং ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে হৃষীকেশের বন্যায় অনুমান ২৫০ জন সাধুর সঙ্গে তাঁরও মৃত্যু হয়। নিজের মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁর গণনা সত্যে পরিণত হয়েছিল দেখে তারপর থেকে মহাপুরুষজীর পরমায়ু সম্বন্ধে তিনি যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তার ফলাফল সম্বন্ধে সেবক বিশেষ কৌতূহলী হয়েছিল।

সন্ন্যাসের প্রার্থনা জানাতে এসেছি।" সেবক অবাক হয়ে তাঁর কথা শুনছিল এবং সবই যেন অপার্থিব বলে তার মনে হচ্ছিল।

একটু পরেই মহাপুরুষজী উঠে বসলেন। সেবক তাঁকে তামাক দিল, পণ্ডিতজীও ভিতরে গিয়ে মহাপুরুষজীকে প্রণাম করে তাঁর কাছে বসলেন। মহাপুরুষজী পণ্ডিতজীকে দেখে খুব খুশি হলেন। সাধন-ভজন কেমন হচ্ছে তা জিজ্ঞেস করলেন। পণ্ডিতজী তাঁর পা দুটি জড়িয়ে ধরে আশীর্বাদ ভিক্ষা করে সন্ন্যাসের প্রার্থনা জানাতে তিনি তাঁকে আশ্বাস দিলেন।

মহাপুরুষজীর শুভাগমনে কল্যাণ মহারাজ একদিন বেশ জোর ভাণ্ডারা দিলেন। অন্যান্য মিষ্টান্নাদি ছাড়া থালার মতো বড় বড় খাস্তা মালপোয়া হয়েছিল। মহাপুরুষজী ঘুরে ঘুরে সাধু-ভোজন দেখছিলেন। কনখলের স্বামী নিশ্চয়ানন্দজী (স্বামীজীর শিষ্য) খুব খেতে পারতেন। তিনি ঐ বড় বড় ১৮ খানি মালপোয়া অন্যান্য মিষ্টান্নাদি উপকরণ সহ খেলেন। তা দেখে মহাপুরুষজী খুব আনন্দ করতে লাগলেন। সাধুভোজনের সময় সুললিত সুরে শ্লোক-আবৃত্তিতে বেশ আনন্দের পরিবেশ সৃষ্ট হয়েছিল।

মহাপুরুষজীর উপস্থিতির সময় আমেরিকার স্যানফ্রান্সিসকো কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত স্বামী প্রকাশানন্দজী (স্বামীজীর শিষ্য) বেলুড় মঠ হতে স্বামী শঙ্করানন্দজী সহ বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমণ করে কনখলে এলেন। তাঁদের দেখে মহাপুরুষজী খুব আনন্দিত হন। সেদিন উপরের পাহাড়ে বরফ পড়ে খুব ঠাণ্ডা হয়েছিল। মহাপুরুষজী সেবককে ডেকে বললেন, "দেখ, সুশীল আর অমূল্য এই শীতের মধ্যে এসেছে। তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধোবার গরম জল করে দাও আর খুব গরম চা করে খাওয়াও।"

মহাপুরুষজী প্রায় প্রতিদিনই আশ্রমের সাধুদের সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর প্রসঙ্গ করতেন। একদিন ঠাকুরের আবির্ভাব প্রসঙ্গে বললেন, "ঠাকুর এবার ছদ্মবেশে এসেছেন। কয়েকজন মাত্র তাঁকে চিনতে পেরেছিল। কালে তাঁর ভাব জগৎ নেবে। তিনি কোন দেশবিশেষ বা জাতিবিশেষের জন্য আসেননি, তিনি এসেছিলেন সারা বিশ্বের জন্য—সমগ্র মানবজাতির জন্য। যিনি রাম, যিনি কৃষ্ণ, যিনি বুদ্ধ, যিশু ও গৌরাঙ্গরূপে এসেছিলেন, তিনিই ইদানীং রামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। কালে জগৎ জানতে পারবে—এই তো সবে সন্ধ্যা হলো, সামনে সারারাত পড়ে আছে। কালে সারা বিশ্ব শ্রীঠাকুরকে অবতার বলে গ্রহণ করবে, পূজা করবে। আমরা তাঁর নাম জগদ্‌বাসীকে শোনাব বলে এখনো বেঁচে আছি।"

জনৈক সাধু জিজ্ঞেস করলেন, "ঠাকুর যে বলেছেন, 'যার শেষ জন্ম তার এখানে

আসতে হবে'—এ কথাটার অর্থ কি?" মহাপুরুষজী গম্ভীরভাবে বললেন, "ঠাকুরের একথার অর্থ আমি এই বুঝেছি—যে কায়মনোবাক্যে অন্তরের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্বে বিশ্বাসী হয়ে তাঁকে শ্রীভগবানের পূর্ণ বিকাশ বলে গ্রহণ করে, সেই তাঁর ঘরে আসে এবং এই তার শেষ জন্ম। ঠাকুরকে কেউ শ্রেষ্ঠ সাধক বলে মানছে—কেউবা বলছে যে, তিনি একজন সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন, আবার কেউবা বলছে তিনি কালীভক্ত ছিলেন, কেউবা বলছে তিনি শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন; এরা কেউই ঠাকুরকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। তিনি যে অবতারবরিষ্ঠ ছিলেন, মুক্তিদাতা কৃপাময় ভগবান ছিলেন—তা জানা চাই, সে জ্ঞান হওয়া চাই। তবে এও সত্য যে, বিচারবুদ্ধি বা সাধনভজনের দ্বারা কেউ তাঁকে জানতে পারে না। তিনি কৃপা করে জানালেই তাঁকে জানতে পারে। যাকে তিনি কৃপা করেছেন সেই ধন্য, তারই শেষ জন্ম। এযুগে শ্রীরামকৃষ্ণই জগদ্‌গুরু—শ্রীরামকৃষ্ণনামই মুক্তিমন্ত্র। যে তাঁর চরণে অনন্য শরণ নিয়ে তাঁর নাম করবে সেই মুক্ত হয়ে যাবে, অতএব এই তার শেষ জন্ম।" ঠাকুরও এক সময় বলেছিলেন—'যে হেলায় শ্রদ্ধায়ও এখানকার নাম করবে, শেষ সময় তাকে দর্শন দিয়ে হাত ধরে নিয়ে যাব।' শেষ সময় ঠাকুরের দর্শন হলেই তো মুক্তি—এতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর কথা কখনও মিথ্যা হয় না।"

একদিন পূর্বাহ্ণে আশ্রমের দু-একজন সাধু সহ মহাপুরুষজী ব্রহ্মকুণ্ডে যান। কুণ্ডের তীরে দাঁড়িয়ে খুব ভক্তিভরে কুণ্ডকে প্রণাম ও স্তব করে, কুণ্ডের জলস্পর্শ করে পূজাদি করলেন এবং সঙ্গী সকলকেই পূজা করতে বললেন। জলনাড়া পড়তেই মানুষপ্রমাণ বড় বড় মহাসোল মাছ জড়ো হয়ে গেল। আমরা আটার গুলি ও খই সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। তাই ছড়িয়ে দেওয়া হলো, তারা নির্ভয়ে আনন্দে খেতে লাগল। শেষে আমাদের হাত থেকেই মুখবাড়িয়ে আটার গুলি খেতে লাগল। মহাপুরুষজী তা দেখে খুব আনন্দ করতে লাগলেন। বললেন, "দেখ, কেউ এদের হিংসা করে না কিনা, তাই ওরাও মানুষকে ভয় করে না, কেমন হাত থেকে খাচ্ছে!" পরে বললেন, "আমরা যখন এসব অঞ্চলে তপস্যা করতাম, তখন এদিকটা ঘোর জঙ্গল ও কত নির্জন ছিল! এখন চারদিকে লোকজনের বসবাস হয়ে সে নির্জন তপস্যার স্থান আর নেই।" তখনও কিন্তু ব্রহ্মকুণ্ডের চারদিকে বড় বড় গাছ প্রচুর ছিল এবং স্থানের গাম্ভীর্যও কম ছিল না।

মহাপুরুষজী কনখলে দু-জনকে আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাস ও একজনকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করেছিলেন। ঐ সন্ন্যাসের বিষয় আলোচনা হতে কনখলের কয়েকজন প্রবীণ সাধু সেবককে বললেন, "মহাপুরুষজী সন্ন্যাস দিচ্ছেন, তুমিও এ

সময়ে পবিত্র হিমালয়ে, সতীক্ষেত্রে সন্ন্যাস নাও না! ওঁকে বল।" এঁদের কথা শুনে সেবকের মনেও সন্ন্যাস নেবার ইচ্ছা হলো। তাই একরাত্রে মহাপুরুষজীর শয়নের ব্যবস্থা করতে গিয়ে সেবক একান্তে তাঁকে বলল—"মহারাজ, আমাকেও এঁদের সঙ্গে সন্ন্যাস দিন।" তিনি সেবকের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—"তোমার এখানে সন্ন্যাস নেওয়া কেন? তুমি মঠের ছেলে, মঠেই তোমাকে সন্ন্যাস দেব।" সেবক আর দ্বিরুক্তি না করে, তাঁকে প্রণাম করল।

মহাপুরুষজী ৫। ৬ দিন মাত্র কনখলে ছিলেন। এই সময়ে তিনি বিবিধ ধর্মপ্রসঙ্গ করে ও সপ্রেম ব্যবহারে আশ্রমের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী এবং বাইরের অনেক স্থবির সন্ন্যাসীকে খুব আনন্দ দিয়েছিলেন। অনেকেই তাঁর পুণ্যস্মৃতি হৃদয়ে বহন করে এখনও আনন্দ পাচ্ছে এবং 'ক্ষণমিহসজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।'—এই আচার্য-বাক্যের সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করছে।

মহাপুরুষজী সঙ্গীদের নিয়ে কাশীতে এলেন এবং শিবক্ষেত্রে শিবরাত্রি উদ্‌যাপন করে মোগলসরাই থেকে গাড়ি ধরে বেলুড় যাত্রা করলেন। তাঁর সঙ্গে একমাত্র সেবকই ছিল। পরদিন সকালে গাড়ি লিলুয়া স্টেশনে থামতেই মুণ্ডিতমস্তক অনঙ্গ মহারাজ ও পশুপতি মহারাজ গাড়িতে ঢুকেই মহাপুরুষজীকে প্রণাম করলেন। তাঁদের দেখে তিনি আনন্দিত হয়ে বললেন—"এই যে অনঙ্গ, পশুপতি, সব ভাল তো? কি, সন্ন্যাস নেবে?" তাঁরা দুজনেও খুশি হয়ে হাসতে লাগলেন এবং মঠের কুশলবার্তা দিলেন। গাড়ি হাওড়া স্টেশনে পৌঁছতেই দেখা গেল অনেক সাধু এসেছেন মহাপুরুষজীকে নিয়ে যেতে। শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথিপূজার দিন আনন্দপূর্ণ পরিবেশে সমবেত জয়ধ্বনির মধ্যে তিনি মঠে পৌঁছলেন। ততক্ষণে শ্রীমন্দিরে বিশেষ পূজানুষ্ঠান আরম্ভ হয়েছিল। মহাপুরুষজী মন্দিরে ঠাকুরপ্রণাম করে নিজের ঘরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই স্বামী শুদ্ধানন্দ, ধীরানন্দ, প্রকাশানন্দ, শঙ্করানন্দ ও অম্বিকানন্দ প্রভৃতি প্রবীণ সন্ন্যাসিগণ সন্ন্যাস-ব্রহ্মচর্য প্রার্থীদের সঙ্গে করে তাঁর ঘরে উপস্থিত হলেন এবং কাকে কাকে সন্ন্যাস-ব্রহ্মচর্য দেওয়া হবে, সে বিষয়ে আলোচনা চলতে লাগল। প্রার্থীরা একে একে প্রণাম করে প্রার্থনা জানাতে তিনি তাদের প্রার্থনা পূর্ণ করে আশীর্বাদ দিতে লাগলেন। সেবক প্রণাম করে সন্ন্যাসের প্রার্থনা জানাতে মহাপুরুষজী প্রসন্ন হয়ে বললেন, "তোমাকেও সন্ন্যাস দেব, কনখলেই তো তোমাকে সম্মতি দিয়েছিলাম।" সেবক পুনরায় প্রণাম করে আশীর্বাদ নিল। এভাবে সেদিন মহাপুরুষজী ১২ জনের সন্ন্যাস ও কয়েকজনের ব্রহ্মচর্যের অনুমতি দিলেন। মধ্যাহ্ন-আহারের পর তিনি যখন বিশ্রাম করতে গেলেন, সেই অবসরে সেবক তাড়াতাড়ি মস্তকমুণ্ডন শ্রাদ্ধাদি কর্ম সম্পন্ন করে এল।

সারাদিন আনন্দ, সমারোহ, শত শত ভক্ত সমাগম। মুহুর্মুহু শ্রীগুরু মহারাজের জয়ধ্বনিতে মঠপ্রাঙ্গণ মুখরিত। সারারাত কালীপূজা হলো। ব্রাহ্মমুহূর্তে শ্রীমহাপুরুষজী মঠের প্রবীণ সন্ন্যাসীদের উপস্থিতিতে স্বামী শুদ্ধানন্দজীর পৌরোহিত্যে বিরজাহোমের পর বারো জনকে পবিত্র সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত করেন এবং কয়েক জনকে ব্রহ্মচর্য দিয়েছিলেন। সকলের নামও তিনি দিয়েছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের একজন প্রধান পার্ষদের কাছে সন্ন্যাস পেয়ে সকলেই নিজেদের ধন্য মনে করেছিল।

অনেক প্রবীণ সাধুই বলেছিলেন—মঠে একটা প্রথা আছে যে, নবীন সন্ন্যাসীদের অন্তত তিন দিন অগ্নিস্পর্শ করতে নেই। সেজন্য সেদিন সকালে মহাপুরুষজী মন্দির থেকে ফিরে আসার পরে তাঁকে তামাক দিতে সেবক একটু ইতস্তত করছিল। তা লক্ষ্য করে তিনি সেবকের নাম ধরে ডেকে তামাক দিতে বললেন। সেবক সঙ্গে সঙ্গে মোমবাতি জ্বেলে টিকে ধরিয়ে তাঁকে তামাক দিল। মহাপুরুষজী তামাক দিতে বিলম্বের কারণ বুঝতে পেরেছিলেন, তাই হাসতে হাসতে বললেন, "সন্ন্যাসীর তিনদিন অগ্নিস্পর্শ করতে নেই—ওসব নিয়ম তোমাকে মানতে হবে না, বিশেষ দেবকার্য বা গুরুসেবার জন্য। তাছাড়া যারা গৃহস্থাশ্রম কে সন্ন্যাসী হয়েছে তাদের উপরই ঐসব বিধি প্রযোজ্য। গৃহস্থাশ্রমে ত্রৈবর্ণিকের পক্ষে অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকর্মের বিধান আছে, কিন্তু সন্ন্যাসী হলে আর ওসবে অধিকার থাকে না। অগ্নি বলতে যজ্ঞাগ্নিই বুঝায়। অগ্নিস্পর্শ করবে না—তার অর্থ হলো যাগযজ্ঞাদি করবে না। তুমি যেমন কাজকর্ম করছিলে তেমনি করবে।" সেবক নতশিরে সম্মতি জানাল।

নূতন সন্ন্যাসীরা অন্তত তিনদিন মাধুকরী ভিক্ষা করে। সন্ন্যাসীরা সকলেই মাধুকরীতে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। সেবকও মহাপুরুষজীর অনুমতির জন্য ভিক্ষাপাত্র হাতে করে তাঁর সামনে উপস্থিত হলো। তিনি ভিক্ষার সাজ দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন, তাই সেবককে বললেন, "তোমাকে মাধুকরী করতে যেতে হবে না। তুমি এখানেই ঠাকুরের প্রসাদ মাধুকরী করবে, আমি প্রভাকরকে (পাচক ব্রাহ্মণ) বলে দেব।" সেবক তাই করল। মহাপুরুষজীকে খাবার দিয়ে সেবক ঠাকুরের প্রসাদ মাধুকরী করে তাঁর সামনে নিয়ে এল। মহাপুরুষজী সেবকের ভিক্ষাপাত্রে হাত দিয়ে তিনবার মুখে দিলেন এবং তাঁর থালা থেকে একটু প্রসাদ ভিক্ষান্নের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে বললেন, "এবার তুমি খাওগে।"

এতে সেবকের খুবই আনন্দ হলো এবং তাঁর কৃপাস্পর্শে অভিভূত চিত্তে তখনই তাঁর ঘরের পাশের ছাদে বসে ঐ ভিক্ষান্ন-প্রসাদ পরম তৃপ্তির সঙ্গে খেল। আর অন্যান্য সাধুরাও ভিক্ষা করে এসে ভিক্ষান্ন তাঁর সামনে ধরতেই মহাপুরুষজী তা স্পর্শ করে একটু মুখে ঠেকিয়ে বললেন, "ভিক্ষান্ন খুব পবিত্র। আমরাও প্রথম

ভিক্ষা করে ঠাকুরের সামনে ঐ ভিক্ষান্ন রাখতেই তিনি একটু একটু মুখে ঠেকিয়েছেন। অমনি তো ঠাকুর যার তার রান্না খেতেন না, কিন্তু ভিক্ষান্ন পবিত্র বলে তিনি এক কণা মুখে দিয়েছিলেন।...রাত্রে সকলে মঠেই মাধুকরী করো।"

পরবর্তী রবিবার সাধারণ উৎসব। তখনকার দিনে ঐ উৎসবে ২৫।৩০ হাজার লোক বসে প্রসাদ পেত। লুচি-বোঁদে দই খিচুড়ি তরকারি চাটনি ইত্যাদি প্রায় ২৫০ মণ জিনিস রান্না হতো। বিরাট ব্যাপার। ভিয়েন বসত দুই দিন আগে থেকে। সেবারও সেভাবে সব আয়োজন চলছিল, কিন্তু শনিবার মধ্যরাত্রি থেকে এমন মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হলো যেন বরুণদেব বিশেষ রুষ্ট হয়ে ঐ উৎসব হতে দেবেন না। লোকজন খাওয়াবার মাঠে কোথাও কোথাও এক ফুট জল দাঁড়িয়েছে, রান্নার চালায়ও জল ঢুকছে। চালার চার দিকে উঁচু আল বেঁধে উনুন রক্ষা করা হচ্ছে। আকাশ ঘোরমেঘাচ্ছন্ন—চলেছে অবিরাম বৃষ্টি। মহাপুরুষজীও সারারাত ঘুমোননি—বারবার খবর নিচ্ছেন। সর্বত্র আতঙ্ক ও মহাচাঞ্চল্য—মঠবাসী সকলেই মহা উদ্বিগ্ন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রবিবার বেলা ৮টার পরে কৃষ্ণলাল মহারাজ প্রভৃতি মঠের প্রবীণ সাধুগণ মহাপুরুষজীর ঘরে সমবেত হয়ে আর্তস্বরে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—"তাই তো, কি হবে মহারাজ? এখনো তো বৃষ্টির বিরাম নেই, কি করে উৎসব হবে? রান্না কোন প্রকারে এগিয়েছে, কিন্তু এতে তো লোকজন আসতে পারবে না। শত শত মণ খাবার যে নষ্ট হবে!" মহাপুরুষজী সব শুনে একটু মৌন থেকে বললেন, "তোমরা একটু বসো, আমি এক্ষুনি আসছি।" এই বলে জপমালাটি হাতে নিয়ে ছাতা মাথায় দিয়ে ছাদের উপর দিয়ে ঠাকুরঘরে গেলেন। সকলেই বিষণ্নমুখে বসে আছেন। কেউবা বলছেন—"সব খিচুড়ি গঙ্গায় ফেলতে হবে।" প্রায় আধঘণ্টা পরে মহাপুরুষজী মধুর কণ্ঠে—

"বিষজলাপ্যয়াদ্ব্যালরাক্ষসাদ্বর্ষমারুতাদ্বৈদ্যুতানলাৎ।
বৃষময়াত্মজাদ্বিশ্বতো ভয়াদৃষভ তে বয়ং রক্ষিতা মুহুঃ ॥"* ইত্যাদি

ভাগবতের শ্লোকটি গান করতে করতে ঠাকুরঘর হতে ফিরে এসে গাঢ়স্বরে বললেন, "উৎসবের আয়োজন যেমন করছ করে যাও। ঠাকুরের ইচ্ছায় সব ঠিক হয়ে যাবে। তাঁরই তো উৎসব!" শ্রীঠাকুরের জয়ধ্বনি দিয়ে বেরিয়ে এলেন সকলে। তড়িৎ-বেগে মহাপুরুষজীর নির্দেশ মঠের সর্বত্র প্রচারিত হলো এবং চারদিক মুখরিত হয়ে উঠল গুরু মহারাজের জয়ধ্বনিতে। সকলে আশ্চর্য হয়ে গেল যে, কালমেঘের বুক চিরে শিবের ত্রিনয়নের ছটার মতো একফালি রোদ বেরিয়ে এসেছে এবং দেখতে

* হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি বিষময় কালীয়-হ্রদের জল হতে ব্রজবাসীদের রক্ষা করেছ এবং ব্যালরাক্ষস, ইন্দ্রপ্রেরিত মেঘবর্ষণ, ঝঞ্ঝাবাত ও বজ্রাগ্নি হতে আমাদের বাঁচিয়েছ। হে দয়িত! তুমি সমস্ত ভয় হতে বারংবার আমাদের উদ্ধার করেছ, এখন এ আসন্ন বিপদ হতেও আমাদের ত্রাণ কর। (১০।৩১।৩)

দেখতে আধঘণ্টার মধ্যে দুর্যোগ কেটে গিয়ে আকাশ নির্মল ও রৌদ্রোজ্জ্বল হয়ে উঠল।...

উৎসব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে গেল; সেবার লোক-সমাগমও হয়েছিল খুব। উৎসবান্তে রাত্রে মহাপুরুষজী বলেছিলেন—"ঠাকুর আজ যে বিভীষিকা দেখিয়েছিলেন, তাতে আমারই প্রথমটায় খুব ভয় হয়েছিল।...বৃষ্টিটা হয়ে একদিকে ভালই হয়েছে—গরমে লোকের কষ্ট হয়নি।"

উৎসবক্ষেত্রে এবং মঠের সর্বত্র ঐ একমাত্র কথা—"মহাপুরুষজী বৃষ্টি বন্ধ করে দিয়েছেন।" বাস্তবিকই ঐ সময়ে মহাপুরুষজীর ভিতর এমন একটা অলৌকিক শক্তির বিকাশ হয়েছিল যা সকলকেই স্তম্ভিত করে। তিনি বাক্‌সিদ্ধ ছিলেন, তাঁর মুখ দিয়ে যা বের হতো তা সত্যে পরিণত হতো। ডাক্তার বৈদ্যের জবাব দেওয়া মুমূর্ষু রোগীর জন্য আত্মীয়-স্বজনের আর্তিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের একটু চরণামৃত দিয়ে বললেন, "আমাদের আর কি আছে, এই ঠাকুরের চরণামৃত নিয়ে যাও, খাইও। তাঁর কৃপায় সেরে যাবে।" ঐ চরণামৃত খাওয়াবার সঙ্গে সঙ্গেই রোগীর অবস্থা বদলে গেল এবং ক্রমে রোগী সুস্থ হয়ে উঠল।...

চাকরি নেই, ছা-পোষা ভক্তের আর্তিতে বিচলিত হয়ে তাকে একমুঠো টাকা দিয়ে কম্পিতকণ্ঠে বললেন—"যা, চাল ডাল কিনে নিয়ে যা। ছেলে-পিলেদের উপোসি রাখিসনি।...চাকরি হয়ে যাবে" পরের সপ্তাহে ভক্তটি এসে বলল—"মহারাজ, আপনার আশীর্বাদে চাকরি হয়েছে। সেই পুরানো চাকরিতেই লেগেছি।" মহাপুরুষজী নির্বাক—একবার সামনের দেয়ালে লম্বিত শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবির দিকে তাকিয়েই চোখ বুজে রইলেন অনেকক্ষণ।...

বয়স্থা কন্যার বিবাহ দিতে পারছে না—কন্যা অরক্ষণীয়া হয়েছে, ভক্ত কেঁদে বলছে—"মেয়েটা বড় হয়েছে, আর তো রাখা যায় না। সম্বন্ধ তো আসে, কিন্তু এত টাকা কোথায় পাব! মেয়েটা কেঁদে কেটে সারা হয়ে গেল। খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে—বলছে, "বাবা, আমিই তোমাদের এত দুঃখের কারণ। আমি আত্মহত্যা করে তোমাদের নিষ্কৃতি দেব।" মহাপুরুষজীর চোখ ছলছল করছে, তিনি গাঢ়স্বরে বললেন, "ভোলানাথ, ভেবো না। শীঘ্রই তোমার মেয়ের বে হয়ে যাবে।" এই বলে সেবককে তাঁর চামড়ার ছোট্ট হ্যাণ্ডব্যাগটি আনতে বললেন এবং একমুঠো টাকা ভক্তের হাতে দিয়ে বললেন—"একখানি ভাল শাড়ি কিনে নিয়ে যাও। মেয়ের বিয়েতে দেবে।" ভক্ত অবাক-বিস্ময়ে স্বপ্নোত্থিতের মতো মহাপুরুষজীকে প্রণাম করে চোখের জল মুছতে মুছতে বিদায় নিল। কিছুদিন পরেই মঠে এসে লুটিয়ে পড়ে মহাপুরুষজীকে প্রণাম করে বলল, "বাবা, মেয়েটার বিয়ের দিন স্থির হয়েছে। ঘর-

বর সবই ভাল—এক পয়সাও দাবি নেই। আপনার আশীর্বাদেই এটি হলো। আমার তো মেয়েটাকে একটু নোয়া দেবার সামর্থ্যও নেই।" মহাপুরুষজী তখন দু-তিন মুঠো টাকা দিয়ে বললেন—"নে, সোনার বালা গড়িয়ে দিস। শ্রীমা হোগলাপাকের বালা পছন্দ করতেন।" ভক্ত তখন অবাক হয়ে বলল, "এক অভাবনীয় উপায়ে সব যোগাযোগ হয়ে গেল। যারা এক সময়ে মোটা টাকা দাবি করেছিল, তারাই এসে বলল, "আমরা শুধু মেয়েটিকে চাই। আর কোন দাবি আমাদের নেই।"

এভাবে চলেছিল মহাপুরুষজীর 'আর্ত-কল্যাণ-ব্রতের উদ্‌যাপন'। আরো কত রকমের ঘটনা দেখা যেত সে সময়। মহাপুরুষজী যেন 'করুণাদ্রবা জাহ্নবী' হয়ে গিয়েছিলেন।

"চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥"*

গীতার এ শ্লোকটি সার্থক হয়েছিল মহাপুরুষজীর জীবনে। তিনি শুধু গুরুরূপে মুক্তিদানের ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত ছিলেন না—তিনি আর্ত-ত্রাতাও ছিলেন। তাঁর বিশাল হৃদয়ে আর্তদের হাহাকার স্পন্দিত হতো। তিনি কাউকেই 'ছোট' বলে অবহেলা করতেন না।...

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একজন আচার্যস্থানীয় অতি প্রবীণ সন্ন্যাসী বলেছিলেন, "আমি তো ১৯০২ সাল থেকে মহাপুরুষজীর সঙ্গ করছি—সেই কাশীর অদ্বৈত আশ্রমে যখন তিনি ধ্যান-ভজন নিয়ে কঠোর তপশ্চর্যা করতেন, তখন থেকেই আমি তাঁর বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলাম। তিনিই আমায় সাধু করেছেন। তাঁর দয়ার কথা আর কি বলব! সাধু হবার পরে তাঁর সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি। কিন্তু এখন যা দেখছি, প্রেসিডেন্ট হবার পরে তিনি যেন অন্য লোক হয়ে গিয়েছেন! ঠাকুরের বিশেষ শক্তি তাঁর ভিতর এখন খেলা করছে। তিনি সারা জীবন তপস্যা করে যে শক্তি অর্জন করেছেন এখন তার বিকাশ হচ্ছে। তিনি এত শক্তিমান হয়েছেন যে, এখন তাঁর কাছে যেতে আমাদেরই ভয় হয়। তিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সব দেখতে পাচ্ছেন। যে যা চাইছে সব দিতে পারেন। দৃষ্টি দ্বারা মানুষের মন ঘুরিয়ে দেন—যাকে ইচ্ছা তাকে আকর্ষণ করতে পারেন—এসব শক্তি যেন তাঁর মুঠোর ভিতর।"...

* * *

---

* হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ অর্জুন! আর্ত, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী—এই চার প্রকার পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণ আমাকে ভজনা করে।...'উদারা সর্ব এবৈতে'—এরা সকলেই উৎকৃষ্ট! ভগবান যিশুরূপেও বলেছেন—'দীন আর্তেরাই ধন্য। তাঁরা ভগবানের কৃপালাভ করবে।'

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে ভুবনেশ্বর মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির-প্রতিষ্ঠা ও ৺বাসন্তীপূজা শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের বিশেষ ইচ্ছা ছিল যে, ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে ভুবনেশ্বরে ৺বাসন্তীপূজা করেন। কিন্তু সে বৎসর মার্চ মাসে তাঁর কঠিন অসুখ হয় এবং এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে তিনি দেহত্যাগ করলেন। ফলে ঐ বৎসর ভুবনেশ্বরে ৺বাসন্তীপূজা করা সম্ভব হয়নি। তাই শ্রীশ্রীমহারাজের অন্তিম ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য মহাপুরুষজীর অনুমতিক্রমে প্রবীণগণ ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে ভুবনেশ্বরে ৺বাসন্তীপূজা এবং এই উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির-প্রতিষ্ঠারও আয়োজন করেন। ঐ অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য মহাপুরুষজী বেলুড় মঠ হতে প্রায় ত্রিশজন প্রবীণ-নবীন সাধু-ব্রহ্মচারী সহ ভুবনেশ্বরে শুভাগমন করেন। কলকাতার বিভিন্ন কেন্দ্র ও অন্যান্য স্থানের অনেক সাধু ও ভক্তের যোগদানের ফলে ঐ উৎসবে খুবই জমজমাট পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। স্বামী ব্রহ্মানন্দের প্রিয় স্থান, পবিত্র শিবক্ষেত্র ভুবনেশ্বর মঠ যেন ধর্মমেলাভূমিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। কয়েকদিনব্যাপী পূজা-পাঠ, ভজন-কীর্তন, ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণ-সেবাদিতে জনস্রোতের মতো দূর দূর স্থান হতে গরুর গাড়িতে বা পদব্রজে শত শত উৎকলবাসী এ উৎসবে যোগদান করে প্রভূত আনন্দলাভ করেছিল। মহাষ্টমীর দিন বিশেষ পূজানুষ্ঠানের পর মহাপুরুষজী শুভক্ষণে মন্দিরপ্রতিষ্ঠা করে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি বুকে ধরে নিয়ে নূতন মন্দিরে স্থাপন করেন। সারাদিন পূজানুষ্ঠান চলেছিল।

নবমীর দিন শ্রীমন্দিরে একাসনে বসে মহাপুরুষজী কটক ও অন্যান্য স্থান হতে আগত বাইশজন দীক্ষাপ্রার্থী নরনারীকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়েছিলেন। আড়াই ঘণ্টার পর দীক্ষান্তে তিনি যখন ঠাকুরমন্দির থেকে বাইরে এলেন তখনও দিব্যভাবের ঘোরে তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিমাভ, চক্ষু নিমীলিত। নিজের ঘরে আসার পরেও সে ভাবাবেশ অনেকক্ষণ ছিল। তিনি প্রত্যেক দীক্ষার্থীকেই পৃথক পৃথক ভাবে মন্ত্রদীক্ষা ও উপদেশ দিয়েছিলেন।

মন্দির-প্রতিষ্ঠাদির পরিশ্রম ও অনিয়মের ফলে তাঁর শরীর খারাপ হয়। ঐ উৎসবের দিন প্রায় ৭।৮ হাজার লোক প্রসাদ পেয়েছিল। নবমীর দিন এক করুণ দৃশ্য মহাপুরুষজীর অন্তর খুবই ব্যথিত করে। লোকজনের খাবার পরে যেখানে পাতা ফেলা হয়েছিল সেখানে একদল নিম্নশ্রেণীর লোক ঐ পাতা থেকে উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে খাচ্ছিল দেখে মহাপুরুষজী খুবই দুঃখিত হন। তিনি সেবককে ডেকে বললেন—"দেখ, এদের তো বসিয়ে খাওয়ান হয় না। তুমি এক কাজ কর—কাউকে নিয়ে কয়েক বালতি খিচুড়ি তরকারি ও মিষ্টান্নাদি এনে এদের বসিয়ে খাওয়াও

তো। আহা! এরাই হলো ঠিক ঠিক নারায়ণ। সামাজিক পীড়নে এরা পাঁচজনের সঙ্গে তো বসে খেতে পায় না! এরা কত ক্ষুধার্ত, এঁটো কুড়িয়ে খাচ্ছে!" সেবক তাড়াতাড়ি কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে পাতা করে প্রায় ৩০।৪০ জনকে পরিতোষপূর্বক খাওয়াল। মহাপুরুষজী সর্বক্ষণ দাঁড়িয়ে সব দেখছিলেন।

ভারতের সকল প্রান্তেই একশ্রেণীর লোককে নিম্নজাতি বলে সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তাদের একপ্রকার অস্পৃশ্য করে রাখা হয়েছে। তাদের জন্য মহাপুরুষজীর প্রাণ কাঁদত এবং সুযোগ পেলেই তিনি তাঁদের সেবাযত্ন করতেন।

মহাপুরুষজীর শরীর তত ভাল না থাকা সত্ত্বেও তিনি ভুবনেশ্বর মন্দিরে এবং রামেশ্বর শিবমন্দিরে গিয়ে বিশেষ পূজাদি দিয়েছিলেন এবং প্রতিদিন সেবককে দিয়ে ৺রামেশ্বরমন্দিরে পূজা পাঠাতেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের স্মৃতিজড়িত ভুবনেশ্বর মঠে মহাপুরুষজী খুবই আনন্দে ছিলেন এবং ঐ শিবক্ষেত্রের আধ্যাত্মিক আবহাওয়ার উচ্চ প্রশংসা করতেন। তাঁকে অনেক সময় ধ্যানমগ্ন থাকতে দেখা যেত। ভুবনেশ্বরে তিনি রাজা মহারাজের ভাবে এতটা তন্ময় হয়ে থাকতেন যে, সর্বত্র যেন মহারাজকেই দেখতে পাচ্ছেন এবং সব সময়ে মহারাজের সঙ্গেই বাস করছেন। মহারাজের কথাও তিনি অনেক সময় বলতেন। একদিন আশ্রমের সাধুদের লক্ষ্য করে ভুবনেশ্বর মঠ সম্বন্ধে তিনি খুবই আবেগভরে বলেছিলেন—"এটি মহারাজের হাতে গড়া মঠ। বাড়িঘর, গাছপালা সবকিছু তিনি নিজের হাতে করেছেন। এ স্থানটি সাধন-ভজনের খুবই অনুকূল। তিনি এক সময়ে আমায় বলেছিলেন—'তারকদা, আমি নিজের পেট কেটে ছেলেদের সাধন-ভজনের জন্য এ মঠটি করেছি, যাতে এ শিবক্ষেত্রে ছেলেরা ধ্যান-ভজন করে ভগবান লাভ করতে পারে।' মহারাজের সেবার জন্য ভক্তরা যে যা দিত তা তিনি নিজের জন্য ব্যবহার না করে এ মঠের কাজে লাগাতেন। তাই তিনি বলেছেন—নিজের পেট কেটে ছেলেদের জন্য এ মঠটি করেছি।

"খাওয়া-দাওয়া পোশাক-আশাকে মহারাজের এতটুকু বাহুল্য ছিল না। তিনি তপস্বীর মতো কঠোর জীবন-যাপন করে গিয়েছেন। মহারাজ তো ঠাকুরের মানসপুত্র—তাই ঠাকুর যেমন বলতেন, 'ভগবানলাভই মানবজীবনের উদ্দেশ্য', মহারাজও তাই বলতেন—'ওরে, তোরা ভগবানকে ডাক—ভগবান লাভ কর, নইলে বৃথাই মানুষ হওয়া' এবং যাতে সকলে ভগবানলাভ করতে পারে—তারই সাহায্য করতেন।

"মহারাজের জীবনে কর্ম ও তপস্যার অপূর্ব সম্মেলন হয়েছিল। তিনি দেখিয়ে গেলেন এবং বলতেনও যে, ধ্যান-জপ বাদ দিয়ে ঠাকুর-স্বামীজীর আদর্শ অনুযায়ী কাজ করা সম্ভব নয়। ধ্যান-জপের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হলে তখনই ঠিক ঠিক কর্ম হতে পারে—তার পূর্বে নয়। তাই তো মহারাজ ধ্যান-জপের উপরে এতটা importance (গুরুত্ব) দিতেন। কাজের চাপে বা কাজ করছি বলে নিয়মিত ধ্যান-জপ বাদ দেওয়া বা কমানো কখনই উচিত নয়। জপ-ধ্যানের সময় কমালে চলবে কেমন করে? যারা কাজকর্মের মধ্যে আছে তাদেরও অন্তত ৩।৪ ঘণ্টা ধ্যান-জপ নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে করা উচিত। মহারাজ তো নিজের জীবনে করে দেখিয়ে গেলেন! তাঁর মতো এত কাজ এক জীবনে কে করেছে! তাঁর জীবন তোমাদের সকলের আদর্শ হওয়া উচিত। এত কর্ম করেও তিনি নিজেকে ধ্যান-ভজনের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছিলেন। ঠাকুরের মতো তাঁর মনের গতিও ছিল ঊর্ধ্বদিকে। সে মনকেও তিনি নামিয়ে এনে শ্রীঠাকুরের কাজ করলেন। অবশ্য তাঁর সব কাজই লোককল্যাণের জন্য। ভুবনেশ্বর মঠটিও তোমাদের কল্যাণের জন্য তিনি করে গিয়েছেন। আমার তো এত ভাল লাগছে যে, এখান থেকে যেতেই ইচ্ছা হচ্ছে না। সব সময়ে মহারাজের কথাই মনে হয়। এ মঠটি মহারাজের খুব প্রিয় স্থান।"

ভুবনেশ্বরের নির্জন পরিবেশে মহাপুরুষজীর আরো কিছুদিন থাকার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু জরুরি কাজের জন্য মে মাসের গোড়ার দিকে তাঁকে বেলুড় মঠে ফিরে আসতে হলো।

* * *

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে ভবানীপুর গদাধর আশ্রমে জগদ্ধাত্রীপূজার আয়োজন হয়েছিল। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী কমলেশ্বরানন্দ মহারাজের বিশেষ অনুরোধে মহাপুরুষজী ঐ উপলক্ষে গদাধর আশ্রমে পাঁচ দিন ছিলেন।

১৯২০ খ্রিস্টাব্দে নভেম্বর মাসে কালীক্ষেত্রে আদি গঙ্গার তীরে মহাপুরুষজী ঐ আশ্রমটি স্থাপন করেন। দাতার মৃত পুত্রের নামানুসারে ঐ আশ্রমটির নাম রাখা হয়েছিল 'গদাধর আশ্রম'। শ্রীশ্রীমায়ের জীবৎকালেই ঐ আশ্রমবাড়িটির দানপত্র রেজিস্ট্রি কার্য সুসম্পন্ন হয়। শ্রীমা তখন বাগবাজার মঠে অন্তিম শয্যায় শায়িতা। ঐ আশ্রম-স্থাপনের সংবাদে তিনি আনন্দপ্রকাশ করে বলেছিলেন, "কালীক্ষেত্রে আদি গঙ্গার তীরে ঠাকুরের আশ্রম হবে—বেশ হবে। সেরে উঠে ওখানে গিয়ে কিছুকাল থাকব।" শ্রীমা স্থূল শরীরে গদাধর আশ্রমে যাননি, কিন্তু ঐ আশ্রমটি নিঃসন্দেহে তাঁর আশীর্বাদপূত।

জগদ্ধাত্রীপূজার পূর্বদিন মহাপুরুষজী গদাধর আশ্রমে এলেন এবং প্রতিমাদি

দর্শন করে খুবই আনন্দপ্রকাশ করেন। তাঁর শুভাগমন-সংবাদে আশ্রমে বহু ভক্তের সমাগম হয়েছিল। সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের আরাত্রিকের সময় তিনি মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় ভক্ত সনৎবাবুর (পরে স্বামী ধ্যানেশানন্দ) উদ্যোগে পাখোয়াজ, ক্ল্যারিয়নেট, বেহালা ও হারমোনিয়াম ইত্যাদি বাদ্যসহযোগে 'খণ্ডনভববন্ধন' ইত্যাদি আরাত্রিক-ভজন বেশ গম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। মহাপুরুষজী পাখোয়াজের সঙ্গে আরাত্রিক-ভজন শুনে খুবই আনন্দিত হন। পরে নিজের ঘরে এসে সেবককে বললেন "দেখ, পাখোয়াজ বাজিয়ে আরাত্রিক শুনে আমার খুব আনন্দ হয়েছে। সেই স্বামীজীর কথা মনে পড়ছে—তিনি নিজে পাখোয়াজ বাজিয়ে আরাত্রিক গাইতেন। আরাত্রিক-ভজনটি রচনা করে আমাদের শিখিয়েছিলেন এবং পাখোয়াজ বাজিয়ে আমাদের নিয়ে ঠাকুরের আরাত্রিক গাইতেন। আজ অনেক কাল পরে পাখোয়াজের সঙ্গে আরাত্রিক শুনে আমার বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল! সেসব দিনের কথা মনে পড়ছে। পাখোয়াজের সঙ্গে হারমোনিয়ামের বাজনা খুব জমেছিল। তুমি সনতের কাছ থকে আরাত্রিকের সঙ্গে হারমোনিয়াম বাজানোটা শিখে নিতে পারবে? আর এখানে 'সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে' এই দেবী প্রণামটিও নিত্য গাওয়া হয়। তুমি এসব হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাওয়া শিখে নিও।" সেবক সানন্দে সম্মতি জানাল এবং পরদিন থেকে হারমোনিয়াম-সংযোগে সমগ্র আরাত্রিক-ভজন গাওয়া অভ্যাস করে নিল।

পাঁচ দিন পরে গদাধর আশ্রম থেকে মঠে এসে তিনি সেবককে বললেন— "আজ থেকে তুমি হারমোনিয়াম বাজিয়ে আরাত্রিক-ভজন ও দেবীপ্রণামটি গাইবে।" সে দিন হতে বেলুড় মঠে নিত্য হারমোনিয়াম বাজিয়ে আরাত্রিক গাওয়া প্রবর্তিত হলো।

গদাধর আশ্রমে মহাপুরুষজীর উপস্থিতিতে স্থানীয় ভক্তগণ বিশেষ উদ্দীপনা পেয়েছিলেন। তিনিও প্রতিদিন বিভিন্ন সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসঙ্গ, ত্যাগ-বৈরাগ্য ও সাধন-ভজন সম্বন্ধে এমন তন্ময় হয়ে বলতেন যে, সকলে মুগ্ধ হয়ে শুনত। ফলে অনেক ভক্তই আশ্রমে এসে নিয়মিতভাবে সকাল-সন্ধ্যায় ধ্যান-জপ করতে লাগলেন। ক্রমে ঐ আশ্রমটিকে কেন্দ্র করে বহু ভক্তের আধ্যাত্মিক জীবন গড়ে উঠেছিল এবং কয়েকজন যুবকভক্ত সংসারত্যাগী হয়ে বেলুড় মঠে যোগদান করেছিল।

* * *

১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে ২ জানুয়ারি মহাপুরুষজীর শুভ জন্মতিথি বেলুড় মঠে প্রথম উদ্‌যাপিত হয়। তাঁর জন্মের সন তারিখ কারোরই জানা ছিল না। তাঁর কোন কোষ্ঠীও পাওয়া যায়নি। তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি গম্ভীরভাবে বলতেন—"আমি

তো অজর অমর আত্মা, আমার আবার জন্ম কি!" কখনো এও বলতেন—"আমার জন্ম হয়েছে বলেই তো মনে হয় না।" তিনি এক সময়ে বলেছিলেন, "আমার খুব বড় একটা কোষ্ঠী ছিল। ঐ কোষ্ঠী বাবা করিয়েছিলেন। আমি যখন বাবাকে প্রণাম করে তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে আসি তখন বাবা একরকম জোর করেই ঐ কোষ্ঠীটি আমার সঙ্গে দিয়েছিলেন। পরে বরাহনগর মঠে থাকতে একদিন পরামাণিক ঘাটে স্নান করতে এসে ঐ কোষ্ঠীটা গঙ্গার জলে বিসর্জন দিই। এখনো বেশ মনে পড়ে সেই ১০।১২ হাত লম্বা কোষ্ঠীটা হেলে দুলে কেমন গঙ্গার স্রোতে ভেসে গেল!" জন্মের তিথি নক্ষত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি কোন সময়ে এও বলেছিলেন যে, অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশীতে তাঁর জন্ম, এটুকু মাত্র স্মরণ আছে।

মহাপুরুষজী প্রেসিডেন্ট হবার পরেই অনেক সাধু-ভক্তের প্রাণে তাঁর জন্মতিথি-পালনের কথা জাগে। কিন্তু তার কোন উপায় ছিল না। ঐ সময়ে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে জনৈক ভক্তের বিশেষ চেষ্টায় কলকাতার একজন ভাল জ্যোতিষীকে দিয়ে কৌশলে মহাপুরুষজীর হাত দেখানো হয়। ঐ জ্যোতিষী লুপ্ত কোষ্ঠীর উদ্ধার ও করকোষ্ঠী তৈয়ারে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি বহু যত্নে মহাপুরুষজী যে বলেছিলেন—অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশীতে তাঁর জন্ম—সে সঙ্গে মিলিয়ে মহাপুরুষজীর জন্মের সন তারিখ উদ্ধার করেন। এইভাবে জন্মতিথি নিরূপিত হতে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে শ্রীশ্রীমায়ের উৎসবের ঠিক চারদিন পরে মহাপুরুষজীর জন্মতিথি উৎসবের আয়োজন করা হয়। অবশ্য সব ব্যবস্থাই করা হয়েছিল তাঁকে না জানিয়ে। তাঁকে শুধু এইটুকু মাত্র জানানো হয়েছিল যে, ঐ দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও হোমাদি হবে এবং ভক্তরা যারা আসবে তারা প্রসাদ পাবে। মহাপুরুষজী তাতে কোন আপত্তি করেননি বরং শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজাদির কথায় খুশিই হয়েছিলেন।

ঐ দিন সকাল থেকে বহু ভক্তের ভিড় জমেছিল। সকলেই তাঁকে প্রণাম করে খুব আশীর্বাদ নিয়েছিলেন। শ্রীমন্দিরে ভোগরাগাদির পরে মহাপুরুষজীর জন্য প্রসাদ আনা হলো। তিনিও প্রতিদিনের মতো আহার করে বিশ্রাম করতে গেলেন; এদিকে মঠের বড় উঠানে, গঙ্গার ধারে এবং পাশের বাগান-বাড়ি থেকে ভক্তদের প্রসাদ পাবার সময় মুহুর্মুহু জয়ধ্বনিতে মঠ মুখরিত হয়ে উঠল। তখন মহাপুরুষজী দরজা জানালা খুলে চারদিকে অগণিত ভক্ত প্রসাদ পেতে বসেছে দেখে বিশেষ বিচলিত হয়ে সেবককে জিজ্ঞেস করলেন—"আজ ব্যাপার কি হে? এত ভক্ত প্রসাদ পেতে বসেছে—কুলাবে তো?" এসব কথা বলতে বলতে তিনি এত আকুল হয়ে পড়লেন যে, কেঁপে জ্বর এসে গেল। সেবক একটু আভাস দিতেই তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে

বললেন, "কই, আমাকে তো কেউ কিছু বলেনি। তুমি কৃষ্ণলালকে বলে এসো ঠাকুরের স্থানে এসে কেউ অভুক্ত যেন না থাকে। দরকার হয় তো দ্বারিক ময়রার দোকান থেকে খাবার আনিয়ে সকলকে যেন পেট ভরে খেতে দেয়।" এসব কথা বলছেন আর জ্বরে কাঁপছেন এবং সেবককে বারবার পাঠাচ্ছেন—ঘুরে ঘুরে দেখতে যাতে সকলে পেট ভরে খেতে পায়। তিনি জ্বর গায়ে খুব অস্থিরভাবে দরজা জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ভক্তদের খাওয়া দেখছেন! বেলা তিনটার পরে কৃষ্ণলাল মহারাজ এসে তাঁকে প্রণাম করে যখন বললেন যে, প্রায় চার হাজার ভক্ত নরনারীকে শ্রীঠাকুরের পাকা প্রসাদ পরম তুষ্টির সঙ্গে ভোজন করানো হয়েছে, তখন তিনি শান্ত হয়ে বিছানায় গিয়ে শুলেন। সন্ধ্যা নাগাদ তাঁর জ্বরও কমে গেল।

* * *

১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে মহাপুরুষজীকে যন্ত্র করে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর সঙ্ঘের অনেক বড় বড় কাজ করিয়ে নেন এবং তাঁর ভাবধারা দিকে দিকে প্রসারিত করেন। ঐ বৎসর ২৮ জানুয়ারি স্বামীজীর দ্বিষষ্ঠীতম জন্মতিথিতে বেলুড় মঠে বিপুল জনতার সামনে মহাপুরুষজী স্বামীজীর সমাধি-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে স্বামীজীর দেহত্যাগের পর তাঁরই নির্দিষ্ট স্থানে গঙ্গাতীরে তাঁর পূতদেহ পবিত্র হোমানলে আহুতি দেওয়া হয় এবং ঐ সমাধি-স্থানের উপর একটি ছোট গর্ভমন্দির নির্মিত করে নিত্য সেবাপূজাদির ব্যবস্থা হয়েছিল। সে গর্ভমন্দিরকে বেষ্টন করেই বর্তমান বিরাট স্মৃতিমন্দিরটি গড়ে উঠেছিল। ঐ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সারা দিন-রাত্রি চলেছিল বিবিধ যাগযজ্ঞ, পূজা-পাঠ, হোম ও ভজন-কীর্তন এবং বহু সহস্র দরিদ্রনারায়ণকে পরিতোষপূর্বক ভোজন করানো হয়েছিল। মহাপুরুষজী সারাদিন খুবই কর্মব্যস্ত ও স্বামীজীর ভাবে মাতোয়ারা ছিলেন। তিনি প্রসঙ্গক্রমে বললেন—"স্বামীজী এখনো এই বেলুড় মঠে বাস করছেন। আমি কতদিন তাঁকে তাঁর ঘরে গভীর ধ্যানস্থ দেখেছি, কখনো দেখেছি তিনি পায়চারি করছেন। তিনি নিজে কাঁধে করে ঠাকুরকে এখানে বসিয়েছেন। ঠাকুর যেখানে, সেখানেই মা আর স্বামীজীও আছেন, আর সব পার্ষদরাও। ঠাকুর পার্ষদ ছাড়া থাকতে পারেন না—আবার পার্ষদরাও তাঁকে ছাড়া থাকতে পারেন না। তাঁর পার্ষদরাও দেহত্যাগের পর তাঁর সঙ্গে এই বেলুড় মঠেই বাস করবেন। সে জন্যই তো আমি শ্রীশ্রীমায়ের দেহত্যাগের পর তাঁর পূজা ও ভোগের ব্যবস্থাও করেছি। আগে ঠাকুরের একসের চালের ভোগ হতো, মায়ের দেহত্যাগের পর ভোগের চাল একপোয়া বাড়িয়ে দিয়েছি, আবার মহারাজের দেহত্যাগের পর আরো একপোয়া বাড়িয়ে এখন দেড়সের চালের ভোগ হচ্ছে। ওতেই শ্রীঠাকুর, মা ও পার্ষদদের সকলের ভোগ হয়। স্বামীজী দেহত্যাগের

কয়েকদিন মাত্র পূর্বে একদিন বাবুরাম মহারাজকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গার ধারে বেড়াতে বেড়াতে এই সমাধি-স্থানটি দেখিয়ে বলেছিলেন, 'দেহত্যাগের পর আমার শরীর এখানে যেন দাহ করা হয়। আমি মঠেই থাকব।' তা শুনে বাবুরাম মহারাজ খুবই দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিলেন—'ওসব কি বলছ, তুমি সেরে যাবে।' তখন স্বামীজীর শরীর খুবই খারাপ, আর তিনিও যেন দেহত্যাগের সঙ্কল্প করেছিলেন, কাজকর্ম থেকে তাঁর মন উঠে গিয়েছিল। শুধু 'মা-মা' করতেন। ঠাকুরই তো স্বামীজীকে 'মা নাম' শিখিয়েছিলেন। তিনি তো আগে মা-কালীকে মানতেন না। ঠাকুরই তাঁকে কালীঘরে পাঠিয়েছিলেন এবং স্বামীজীকে বলেছিলেন—'তোকে মার অনেক কাজ করতে হবে।' তাই তো তিনি মায়ের কাজে এত খেটেছিলেন যে, অল্প বয়সেই তাঁর শরীর গেল। তিনি নিজেকে ঐ মায়ের কাজে একেবারে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। স্বামীজীকে এখনো কেউ বুঝতে পারেনি; আমরাই বা তাঁর কতটুকু বুঝেছি? স্বামীজী না এলে ঠাকুরকে লোকে জানতেই পারত না।"

ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বিভিন্ন শাখাকেন্দ্র থেকেও অনেক সাধুর সমাগম হয়েছিল। মহাপুরুষজীর প্রতিষ্ঠিত ঐ মন্দির স্বামীজীর বিরাট কীর্তির প্রতীকরূপে গঙ্গাবক্ষ আলোকিত করে দেশ-বিদেশের শত শত তীর্থযাত্রীর প্রাণে দিব্য উদ্দীপনা এনে দেবে দীর্ঘকাল ধরে।...

স্বামীজীর মন্দির-প্রতিষ্ঠার কয়েক দিন পরেই পরবর্তী ৭ ফেব্রুয়ারি শ্রীরাজামহারাজের শুভ জন্মতিথি-পূজার দিন মহাপুরুষজী গঙ্গাতীরে নির্মিত স্বামী ব্রহ্মানন্দ-সমাধি-মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করে মহারাজের মানুষপ্রমাণ (বসা) মর্মরমূর্তি-প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মূর্তিটি এত সুন্দর যে, দেখে মনে হয় যেন মহারাজ জীবন্ত বসে আছেন। মন্দিরের দ্বিতলে মহারাজের ব্যবহৃত সব জিনিসপত্রাদিও রক্ষিত হয় এবং সেদিন থেকেই ঐ মন্দিরে শ্রীমহারাজের নিত্য পূজাদি হচ্ছে। সারাদিনই পূজাপাঠ ও ভজনকীর্তনে মঠপ্রাঙ্গণ মুখরিত ছিল। সন্ধ্যার পরে মঠবাসী সাধুগণ মন্দিরে শ্রীমহারাজ-প্রবর্তিত 'শ্রীরামনামসংকীর্তন' গান করেন। শ্রীমহারাজকে ঐ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করে মহাপুরুষজী খুবই তৃপ্ত হয়ে বলেছিলেন— "মহারাজের দেহত্যাগে মঠ যেন শূন্য মনে হতো। মঠের আধ্যাত্মিকতা, এমনকি গাছপালা পর্যন্ত যেন শুকিয়ে যাচ্ছিল। এখন মহারাজ মঠেই বাস করবেন—মঠ আবার জেগে উঠবে। যারা মন্দিরে মহারাজের দর্শন করবে তাদেরও মহারাজ আশীর্বাদ করবেন আর তিনি মন্দিরে বসে আমাদের দেখাশুনা করবেন। মহারাজ না থাকলে কি মঠ মানায়?..."

এর কিছুদিন পরে মার্চ মাসের (১৯২৪) গোড়ার দিকে মহাপুরুষজী হঠাৎ অসুস্থ

হয়ে পড়েন। সর্দিজ্বর ১০২।২½ ডিগ্রি পর্যন্ত ওঠে, জ্বরের বিরাম নেই। প্রথমটা তিনি আদৌ গ্রাহ্য করেননি—নিত্যকর্ম সবই চালিয়ে যাচ্ছিলেন, শুধু খাওয়া-দাওয়া বন্ধ। তখন বেলুড়ে কোন ভাল ডাক্তার ছিল না। কলকাতা থেকে ডাক্তার ডাকতেও তিনি বারণ করলেন। চতুর্থ দিনে মঠের প্রবীণ সাধুদের বিশেষ অনুরোধে তিনি ডাক্তার দেখাতে রাজি হন। ডাঃ শ্যামাপদ বাবু পরীক্ষা করেই বললেন—"শুধু ইনফ্লুয়েঞ্জা নয়, সঙ্গে ব্রঙ্কাইটিসও রয়েছে।" তিনি ঔষধ ও পথ্যাদির নির্দেশ দিলেন, কিন্তু জ্বরের উপশম হচ্ছিল না, বরং জ্বর বেড়ে ১০৪ ডিগ্রি পর্যন্ত হতে লাগল—সর্দিকাশি, বুকে ব্যথা, ক্রমেই দুর্বলতা বেড়ে চলেছিল, কিন্তু ঘরে শৌচাদি করতে তিনি কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না। বলছিলেন—"না, ঘরে ঠাকুর-দেবতার ছবি রয়েছে, আমি স্নানের ঘরেই যাব।" সেবককে ধরে ধরে স্নানঘরেই যেতেন, তাতে খুবই ক্লান্তি হতো। পরে যখন চলচ্ছক্তিরহিত হয়ে পড়লেন এবং সকলকার বিশেষ অনুরোধে ঘরেই মাটির সরাতে শৌচাদি করতেন। সেবক তা পরিষ্কার করে দিত। তাঁর গঙ্গাভক্তি এত গভীর ছিল যে, পুরীষজাতীয় কোন কিছু গঙ্গাতে ফেলতেন না। স্নানের ঘরে কাগজের উপর শৌচাদি সেরে তিনি নিজের হাতে তা এমন ভাবে ফেলতেন যাতে সেসব গঙ্গার জলে না পড়ে। পরে যখন নিজে ফেলতে পারতেন না, তখনও দাঁড়িয়ে থেকে সেবককে দিয়ে সাবধানে ফেলাতেন। তাঁর ঘরে সর্বদাই গঙ্গাজল থাকত। তিনি সকালে এক গণ্ডূষ গঙ্গাজল পান করে সর্বত্র গঙ্গাজল প্রোক্ষণ করাতেন এবং সকাল-সন্ধ্যায় গঙ্গাদর্শন ও প্রণাম করতেন। এই গঙ্গাভক্তি তিনি যেন উত্তরাধিকারসূত্রে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, গঙ্গার হাওয়া যতদুর যায় ততদূর পবিত্র হয়ে যায়।

ঐ সময় ১৪ দিন জ্বর ভোগ করে মহাপুরুষজী খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। পরে ডাক্তার তাঁর জন্য পোড়ের ভাত ও ঝোল-পথ্যের নির্দেশ দিলেন। ঐ পথ্যরান্নার জন্য একজন সেবক নিযুক্ত হলো এবং সেদিন থেকে তাঁর আলাদা ঝোল-ভাত, সিদ্ধ রান্নার ব্যবস্থা হলো। বারোমাস তাই তিনি খেতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ তাঁর জন্য সবই আনা হতো, তিনি একটু আঙুল ডুবিয়ে সব জিনিস ভক্তিভরে জিভে ঠেকাতেন। তাতেই শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগরান্না ঠিক হচ্ছে কিনা তা বুঝতে পারতেন এবং কোন কিছুর ত্রুটি হলে খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করতেন। কোনদিন বলতেন, "আজ পায়েসটা ধরেছে, ডাক তো প্রভাকরকে (পাচক ব্রাহ্মণ)।" প্রভাকর এসে হাতজোড় করে দাঁড়াতেই তিনি বললেন "প্রভাকর, আজ পায়েস যে ধরে গিয়েছে। এই ধরা পায়েস ঠাকুরের ভোগে কেন দিলে? এভাবে ভোগ নষ্ট করা ঠিক হয়নি। এমনটি আর করো না।" প্রভাকর হাতজোড় করে বলল, "না, বাবা,

আর করব না।" পাচক চলে যেতে সেবককে বললেন, "দেখ, এজন্যই আমি ঠাকুরের যা যা ভোগ হয়, সব প্রসাদ একটু একটু গ্রহণ করি, মুখে দিয়ে দেখি ঠাকুরের ভোগ ঠিক হলো কিনা। আমাদের জীবন্ত ঠাকুর এখানে বসে আছেন, তিনি সব কিছু গ্রহণ করেন। মুখে দিলেই বুঝতে পারি ঠাকুর খেয়েছেন কিনা। আমি তাঁর বাচ্চা এখানে রয়েছিঃ তাঁর সেবাপূজার দায়িত্ব আমার। আমি বেঁচে থাকতে তাঁর সেবার এতটুকু ত্রুটি হতে দেব না। তাঁর সেবাপূজাদি ঠিক ঠিক হলে আর সব কাজই ঠিক চলবে। আসল হলো ঠাকুরসেবা। তিনি তুষ্ট হলেই সব দেবদেবীও তুষ্ট হন। 'তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্।' দেখ, সাবধান! ঠাকুর-সেবার যেন কোন ত্রুটি না হয়। ঠাকুর-সেবাই হলো আসল।" তিনি নানাভাবে চেষ্টা করে ঠাকুরের ভোগরাগ যাতে সুষ্ঠুভাবে হয় তার ব্যবস্থা করতেন। ভক্তদের লিখে সরু চাল আনাতেন, ভাল ঘি, সরু চিঁড়ে, যেখানকার যা শ্রেষ্ঠ জিনিস সব আনাতেন এবং ঠাকুরের ভোগ দিয়ে আনন্দ করতেন। তাঁর কিন্তু কোন জিনিসের উপর আদৌ আকর্ষণ ছিল না। ঠাকুরের ভোগ হলেই তাঁর আনন্দ, সাধু-ভক্তরা প্রসাদ পাবে—তাতেই তাঁর আনন্দ। আর যাঁরা ঠাকুরের ভোগের জন্য উপকরণ দিতেন, তাঁদের ভক্তি-বিশ্বাসের জন্য শ্রীঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতেন।

১৯১০ খ্রিস্টাব্দে রক্ত-আমাশা হবার পর থেকে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে দেহত্যাগ পর্যন্ত—এই চব্বিশ বৎসর তিনি মশলাদি ছাড়া সাধারণ ঝোল ও ভাতে-ভাত খেয়েছেন। বিভিন্ন রকমের রান্না তাঁর সামনে সাজিয়ে দেওয়া হলেও তিনি সব কিছু দেখে বলতেন, "বা! বেশ বেশ, ঠাকুরের খুব সুন্দর ভোগ হয়েছে।" কখনো আঙুলের ডগা দিয়ে একটু জিহ্বায় স্পর্শ করতেন, কিন্তু খেতেন সিদ্ধ আর ঝোলভাত। তাঁর সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের কথাটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য—"জিতে রসে জিতং সর্বম্।" বলতেন—"রসনাকে জয় করতে পারলেই সব জয় করা হলো। মাইরি বলছি—আমার কোন জিনিসে এতটুকু লোভ নেই।" আর তিনি ছিলেন তিতিক্ষার প্রতিমূর্তি। অসুখ করলেও কারো সেবা নিতে কুণ্ঠা বোধ করতেন, সব সহ্য করতেন নীরবে। "সহনং সর্বদুঃখানামপ্রতিকারপূর্বকম্। চিন্তাবিলাপরহিতং সা তিতিক্ষা নিগদ্যতে ॥"—আচার্য শঙ্করের এ উক্তি তাঁর জীবনে হয়েছিল সর্বতোভাবে রূপায়িত। কি হিমালয়ে, কি বেলুড় মঠে—সর্বত্র তিনি 'সর্বংসহা ধরণী'র মতো ছিলেন, সব সয়ে যেতেন। একদিন দাড়ি কামাতে বসে দাঁত পরতে পরতে হাসতে হাসতে সেবককে বলছেন, "এখন তো তোমরা লেপ তোশক গদি দিয়ে কত আরামে রেখেছ! কাশীতে (১৯০২ খ্রিস্টাব্দে) সেই হলঘরটাতে খড় বিছিয়ে তার উপর কম্বল পেতে শুতাম, শীতে সব আড়ষ্ট হয়ে যেত। বিশেষ রাত দুপুরের পরে ঘুম

আদৌ হতো না। ভালই হতো—ভগবানের নাম করতাম। তার উপর ঠাণ্ডাতে দাঁতের ব্যথা বেড়ে গেল। মাড়ি ফুলে গিয়ে অসহ্য যন্ত্রণা। একটা কাপড়ের টুকরার উপর মাথা দিয়ে শুতাম আর সারা রাত দাঁতের লালা গড়াত। কিছু খেতে পারতাম না। আমি একটা দাঁতও কিন্তু তোলাইনি। সব দাঁতই মাড়ি ফুলে নড়ে নড়ে পড়েছে। এই দাঁত বাঁধিয়েছি—তাও খাবার জন্য নয়। (তিনি খাবার সময় দাঁত ব্যবহার করতেন না)। এ শুধু শোভার জন্য। দাঁত পরলে দাড়ি কামাবার সুবিধা হয়। তাই দাঁত পরে দাড়ি কামাই। বাবা, যতই যত্ন কর—এ দেহ অনিত্য। 'যত্নে তৃণকাষ্ঠখানি রহে যুগপরিমাণ। কিন্তু যত্নে দেহনাশ না হয় বারণ ॥ তুমি কার, কে তোমার, কারে তুমি বলবে আপন।' বাবা, সব সয়ে যাও, সয়ে যাও। সুখ দুঃখ সব সমভাবে সয়ে যাও। ঠাকুর তাই বলতেন—'শ, ষ, স—যে সয়, সে রয়। যে না সয়, সে নাশ হয় ॥' সহ্য গুণ বড় গুণ।"

কূটস্থ আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত না হলে এ হেন তিতিক্ষা সম্ভব নয়। দেহ আর আত্মা—এ দুটি যে পৃথক, সে বোধ না এলে তাঁর মতো তিতিক্ষাপরায়ণ হওয়া যায় না। তিনি মাঝে মাঝে ঠাকুরের ঐ কথাটিও বলতেন, 'দুঃখ জানে শরীর জানে, মন তুমি আনন্দে থাকো।' সুখ-দুঃখ তো দেহের, আত্মা আনন্দময় নির্লিপ্ত। এসব অবস্থা মহাপুরুষজীর জীবনে অতি সহজ রূপ ধারণ করেছিল। এদিকে তিনি সব সময়েই নিজেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের দীন সেবক মনে করতেন। ঠাকুরের সেবাই ছিল তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ বিকাশ। পরবর্তী কালে শরীর যখন খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল তখন তিনি ডাক্তারের নির্দেশমত চলতেন, আবার কখনো সেবকদের লক্ষ্য করে বলতেন—"এ শরীরের এত যত্ন করছি কেন জান? এ শরীরে ভগবানলাভ হয়েছে, এ শরীরে ঠাকুরকে দেখেছি, তাঁর কত সেবা করেছি, তাঁর কত সঙ্গ করেছি! এ হাত দিয়ে তাঁকে স্পর্শ করেছি—তাই এত! নইলে শরীরটা রক্তমাংসের পিণ্ড বই আর তো কিছু নয়। এ শরীরের জন্য তোমাদেরও কত কষ্ট দিচ্ছি।" তাঁর কথা শুনে সেবকগণ অভিভূত হয়ে যেত। তিনি সেবকদের বিশেষ কল্যাণাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, যাতে তাদের কল্যাণ হয় তাই করতেন এবং সেভাবেই তাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করতেন। একদিন তিনি খুব স্নেহের সুরে বললেন, "দেখ, (নিজের শরীর দেখিয়ে) সব সময় এর উপর দেববুদ্ধি রাখবে—মানুষবুদ্ধি করেছ তো মারা যাবে। আমি ঠাকুরের বাচ্চা। তোমাদের কল্যাণের জন্যই তিনি এখনো আমায় রেখেছেন। যাতে তোমাদের কল্যাণ হয় তাই আমি করি। এই চব্বিশ ঘণ্টা আমার কাছে থাকা—এ কি কম সৌভাগ্যের কথা। তিনি তোমাদের কল্যাণ করবেন বলেই আমার কাছে এনেছেন। মহারাজ দেহত্যাগের পূর্বে তাঁর সেবকদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন—'তোরা আমার সেবা করেছিস—আশীর্বাদ করছি তোদের ব্রহ্মজ্ঞান হোক।' আমিও

বলছি শ্রীশ্রীঠাকুরে তোমাদের ভক্তি লাভ হোক।" বলতে বলতে তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিমাভ, কণ্ঠস্বর গাঢ় ও হৃদয় আবেগপূর্ণ হলো। তিনি নীরব হয়ে গেলেন।

একবার ৭২ ঘণ্টা ধরে একটানা হাঁপানির টান চলেছে—না শুতে পারছেন, না খেতে পারছেন, না কথা বলতে পারছেন। তিন দিন তিন রাত্রি বালিশ কোলে করে বসে কাটাচ্ছেন অথচ এতটুকু বিক্ষোভ প্রকাশ করছেন না। যে আসছে তাকে হাসিমুখে হাত তুলে আশীর্বাদ করছেন। ডাক্তার এসে কেমন আছেন জিজ্ঞেস করতে তিনি একগাল হেসে অস্ফুটস্বরে বললেন, "বেশ আছি।" ডাক্তারও অবাক, আর সকলেও অবাক! বিদেহ অবস্থায় ছিলেন, সর্বক্ষণ দেহাতীত সত্তাতে যেন তিনি বিরাজ করতেন—দেহে থেকেও এতটা কি করে সম্ভব হতো তাই হয়েছিল সকলের বিস্ময়ের কারণ।

* * *

দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হয়ে মহাপুরুষজী মাদ্রাজ মঠের তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী শর্বানন্দ, আমেরিকা-নিউইয়র্ক কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামীজীর শিষ্য স্বামী বোধানন্দ এবং কয়েকজন সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারী সহ এপ্রিলের (১৯২৪) গোড়ার দিকে মাদ্রাজ যাত্রা করেন। তাঁরা পথে দুই দিন ভুবনেশ্বর মঠে বিশ্রাম করেন। তৃতীয় দিন সকালবেলা মঠ থেকে স্টেশনে যাবার পথে নেহাত দৈব কৃপায় মহাপুরুষজী প্রভৃতি এক মহাবিপদ হতে রক্ষা পেয়েছিলেন। তখনও ভুবনেশ্বরে মোটরগাড়ি প্রভৃতির প্রচলন হয়নি, গোযানই সম্বল ছিল। আশ্রমাধ্যক্ষ অনেক চেষ্টার পরে এঁদের স্টেশনে পৌঁছে দেবার জন্য একখানি ঘোড়ার গাড়ি জোগাড় করেছিলেন। মহাপুরুষজী ও আরো তিনজন প্রবীণ সাধু গাড়ির ভিতরে এবং সেবক কোচম্যানের পাশে কোচবাক্সে বসে—এভাবে গাড়িতে আশ্রম থেকে স্টেশনের দিকে যাত্রা করা হলো। ফটক অতিক্রম করে একটু দূর গিয়েই ঘোড়া স্টেশনের দিকে যেতে রাজি না হয়ে বিপরীত মুখে তার আস্তাবলের দিকে যাবার জন্য মাথা ঘুরাল। কোচম্যান প্রাণপণ চেষ্টা করছে, কিন্তু ঘোড়াকে কিছুতেই বাগ মানাতে পারল না। ঘোড়া রাস্তার পাশের নালার মধ্যে গিয়ে পড়ল, গাড়িও কাৎ হয়ে উলটে নালার ধারের সঙ্গে লেগে গেল। সেবক কোচবক্স থেকে লাফিয়ে পড়ে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে গাড়িটা উলটে পড়া থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে। আশ্রমের সাধুরাও দৌড়ে এসে সকলে মিলে গাড়ি তুলল। কোচম্যান ঘোড়া খুলে দিল এবং গাড়ি সোজা করে কোনরকমে দরজা খুলে দিয়ে সকলকে বের করা হলো। মহাপুরুষজী অক্ষত শরীরে বের হয়েই ধীরে ধীরে হেঁটে স্টেশনের দিকে চললেন। গাড়ির ভিতর তিনজনই আহত হয়েছিলেন—কারো মাথায় চোট, কারো

কপালে, কারো নাক দিয়ে দরদর করে রক্ত পড়ছিল। First aid (প্রাথমিক চিকিৎসা) দেবারও সময় নেই—গাড়ি ধরতে হবে। ততক্ষণে কোচম্যান ঘোড়াকে সংযত করে গাড়িতে জুতে নিল এবং সকলকে নিয়ে রওনা হলো। মহাপুরুষজী ইতোমধ্যে হেঁটে খানিক দূর চলে গিয়েছেন। সেবক ছুটে গিয়ে তাঁকে গাড়ির জন্য থামার অনুরোধ করতে তিনি বললেন—"না, আমি হেঁটেই যেতে পারব। এই তো স্টেশন। গাড়ি ধরতে হবে তো!" তিনি সেবক-সঙ্গে আস্তে আস্তে ছড়ি হাতে হেঁটেই গেলেন। এদিকে সব সাধুরা বলতে লাগলেন—"আজ আমাদের কপালে মহাবিপদ ছিল—মহাপুরুষজী সঙ্গে ছিলেন বলে অল্পের উপর দিয়ে তা কেটে গেছে।" বাস্তবিকই গাড়ি যেভাবে উলটে গিয়েছিল তাতে সকলেই বেশ আহত হবার কথা। মহাপুরুষজী পরে ঐ গাড়ি ওলটানোর প্রসঙ্গে রহস্য করে বলেছিলেন—"ঘোড়াটার বুদ্ধি আছে! সে বুঝেছিল যে, তাকে খাটাতে নিয়ে যাচ্ছে। কষ্টকর কাজ কে করতে চায়? তাই নিজের আস্তাবলে ফিরে যেতে চেয়েছিল।" তার পরেই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, "আরে, রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে। ঠাকুরই বাঁচাবার মালিক।"

মাদ্রাজের পথে ওয়ালটেয়ারের ভক্তদের বিশেষ আগ্রহে তিনি সঙ্গীদের নিয়ে ওখানে চারদিন ছিলেন। সমুদ্রের তীরে মনোরম স্থানে প্রাসাদোপম একটি নবনির্মিত দ্বিতল গৃহে মহাপুরুষজী প্রভৃতি সকলের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। ভক্তদের সেবাযত্ন ও আন্তরিকতার অন্ত নেই। মহাপুরুষজীকে সম্বর্ধিত করার জন্য পরপর দুদিন দুটি বিরাট সভার আয়োজন করা হয়েছিল। তাতে স্থানীয় সকল স্তরের নরনারী উপস্থিত হয়ে তাঁকে দর্শন করে এবং তাঁর শ্রীমুখের উপদেশ শুনে বিশেষ আনন্দিত হয়। তিনি তাঁর সঙ্গী প্রবীণ সাধুদের দু-দিনই শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে বলেন। ঐ বক্তৃতাও খুবই উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। সভার পরে দলে দলে লোক এসে মহাপুরুষজীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করত। আহা, তাদের কি ভক্তি! অন্য সময়েও বহু বিশিষ্ট নাগরিকগণ মহাপুরুষজীর চরণে শ্রদ্ধা অর্পণ করতে আসতেন। মহাপুরুষজীর শুভাগমনে সর্বত্র একটা ধর্মভাবের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, যার ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যে ওখানে একটি স্থায়ী কেন্দ্র গড়ে ওঠে।*...

ওয়ালটেয়ারের এগার মাইল দূরে 'সিংহাচলম্' পাহাড়ের উপর অতি মনোরম স্থানে ভগবান নৃসিংহদেবের মন্দির অবস্থিত। এক হাজার সোপান অতিক্রম করে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে ঐ প্রসিদ্ধ মন্দির দর্শন করে সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রী জাগ্রত

---

* ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দেও মাদ্রাজ যাবার পথে মহাপুরুষজী দুদিন ওয়ালটেয়ারে ছিলেন। তখনও ভক্তগণ তাঁর পূতসঙ্গলাভ করে বিশেষ উপকৃত হন।

দেবতার চরণে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করে। স্থানীয় ভক্তগণ মহাপুরুষজী ও সঙ্গী সাধুদের ঐ মন্দির-দর্শনের ব্যবস্থা করেছিলেন। ওয়ালটেয়ার-বাসের চতুর্থ দিন সকালে সঙ্গী সাধুদের নিয়ে মোটরযোগে মহাপুরুষজী যখন পাহাড়ের পাদদেশে উপস্থিত হলেন, তখন দেখা গেল যে, পূর্বব্যবস্থামত মহাপুরুষজীকে উপরে নিয়ে যাবার 'সিডন চেয়ার' সহ বাহকগণ সেখানে উপস্থিত নেই। অথচ তিনি তো অত সিঁড়ি ভেঙ্গে পাহাড়ের উপরে উঠতে পারবেন না! তাই সঙ্গী সাধুদের দেবদর্শনে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি সেবকসহ নিকটস্থ বিশ্রামাগারে গিয়ে বসলেন এবং সেবককে লক্ষ্য করে বললেন—"আগে তো কত পাহাড়-পর্বত ভেঙ্গেছি, পাহাড়ে জঙ্গলে কত থেকেছি, কিন্তু এখন আর সাহস হয় না। বাবা নরসিংহদেবের কৃপা হয় তো তাঁর দর্শন নিশ্চয়ই হবে, তোমার ইচ্ছা হয় তুমিও যাও। আমি এখানে বসেই তাঁর দর্শন করব।" এই বলে গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন। খানিকক্ষণ পরেই 'সিডন চেয়ার' সহ বাহকগণ এসে গেল। তিনিও দেবদর্শনে রওনা হলেন। পূর্ব বৎসর ঐ অঞ্চল প্রবল ঘূর্ণিবায়ুবিধ্বস্ত হওয়ায় ফলস্বরূপ সিঁড়িগুলি প্রায় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বাহকগণ অতি সন্তর্পণে উঠতে লাগল। সেবকও সঙ্গে সঙ্গে থেকে 'সিডন চেয়ার' ধরে ধরে কোনপ্রকারে তাঁকে পাহাড়ের শীর্ষদেশে নিয়ে এল। লোকালয়ের ঊর্ধ্বে নির্জনতায় সুপ্ত স্থানে অবস্থিত বলে ঐ মন্দিরের গাম্ভীর্য যেন আরো নিবিড় হয়েছিল। ততক্ষণে সঙ্গী সন্ন্যাসীরা পৌঁছে গিয়েছিলেন। মহাপুরুষজীকে পেয়ে সকলেই বিশেষ আনন্দিত হলেন। মন্দিরে পূজাদি হচ্ছিল। মন্দিরে প্রবেশ করেই তাঁর অদ্ভুত ভাবান্তর উপস্থিত হলো। তিনি খুবই বিহ্বল হয়ে পড়লেন। প্রধান পূজারি অতি সন্তর্পণে তাঁকে মন্দিরের মধ্যে নিয়ে যেতে তিনি যন্ত্রচালিতবৎ পূজাদি করলেন। পরে বলেছিলেন—"দেখলাম যেন পুরুষসিংহ মন্দির আলোকিত করে দাঁড়িয়ে আছেন। এর পূর্বে কখনো নরসিংহদেবের দর্শন হয়নি।"

সব মন্দিরে পূজা দেবার পরে প্রধান পূজারি সমাদরে উত্তম প্রসাদ সকলকে পরিতোষপূর্বক ভোজন করালেন।

*　　　*　　　*

মাদ্রাজ সেন্ট্রাল স্টেশনের কয়েক স্টেশন আগেই ভক্তগণ গাড়িতে উঠে বিবিধ সুগন্ধী ফুল ও মানুষপ্রমাণ সুন্দর গোলাপ ফুলের মালা দিয়ে মহাপুরুষজীকে দেববিগ্রহের মতো সাজিয়ে দিলেন। নানাজাতীয় ফুলের তোড়া ও ফলমিষ্টান্নাদিতে তাঁর কামরা ভরে গেল—ভক্তগণ তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে করজোড়ে দাঁড়িয়ে। সে এক দৃশ্য! মহাপুরুষজী সকলকে আশীর্বাদ করলেন। মাদ্রাজ সেন্ট্রাল স্টেশনে মঠের সাধুগণ বহু ভক্তসহ তাঁকে অভ্যর্থনা করে মাদ্রাজ মঠে নিয়ে গেলেন। তাঁর

শুভ পদার্পণে মঠে আনন্দ-উৎসব লেগে গেল। সারা শহরের এবং দূর দূর স্থান হতে আগত ভক্তগণ তাঁকে দর্শন করতে আসতে লাগলেন। তাঁর উপদেশ শুনে সকলেই মুগ্ধ হয়ে যেতেন।—তাঁদের অন্তর আপ্লুত হতো আশা ও আনন্দে। বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত হয়ে তিনি আয়োজিত ধর্মালোচনাদিতেও যোগদান করতেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সেবার মাদ্রাজে রাজকুমার হতে আরম্ভ করে সকল স্তরের বহু নরনারী তাঁর কাছে মন্ত্রদীক্ষা পেয়েও ধন্য হয়েছিল। তিনি বিশেষ করে দীক্ষিত ভক্তদের শ্রীরামকৃষ্ণের উদার ভাবধারার ধারক ও বাহক হবার জন্য উৎসাহিত করতেন—তার ফলে ঐ অঞ্চলে ধর্ম-আন্দোলন বিশেষ সক্রিয় ও পুষ্ট হয়েছিল। বিভিন্ন শাখাকেন্দ্র হতে অনেক সাধুর সম্মেলনের ফলে নিত্য ধর্মালোচনাদিতে মাদ্রাজ মঠ আধ্যাত্মিকভাবে এতটা পরিপূর্ণ হয়েছিল যে, প্রত্যেককে তার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হতে দেখা যেত। তিনি ঐবার মাদ্রাজ মঠে তিনজন ব্রহ্মচারীকে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত করেন।

কয়েক দিন পরেই ঠাণ্ডা লেগে মহাপুরুষজীর জ্বর হয়। তাঁর অভ্যাস ছিল রাত তিনটার সময় উঠে শৌচাদি সেরে ধ্যানে বসা। মাদ্রাজ মঠের শৌচাদির স্থান অনেকটা দূরে ছিল—সেজন্য শেষরাত্রে যাতায়াতে ঠাণ্ডা লেগেই বোধ হয় জ্বরটা হয় এবং দু-তিন দিনের মধ্যেই জ্বর বেড়ে ১০৫° ডিগ্রিতে দাঁড়ায়। রক্তপরীক্ষার ফলে প্রচুর ম্যালেরিয়ার জীবাণু পাওয়া যায়। পরপর তিনটি কুইনাইন ইনজেকসন দিতে নয় দিন পরে জ্বর ছেড়ে গেল। কিন্তু বৃদ্ধবয়সে ঐ জ্বর-ভোগের ফলে তিনি খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। ডাক্তার বায়ুপরিবর্তনের পরামর্শ দেন। প্রথম 'কোডোইকানাল' নামক শৈলাবাসে চেষ্টা করা হলো, সেখানে সুবিধা না হওয়ায় জনৈক ভক্তের বিশেষ চেষ্টার ফলে নীলগিরি পর্বতে কুনুরস্থ 'স্প্রিং ফিল্ড' নামক স্থানে মে মাসের ৯ তারিখে যাওয়া স্থির হলো। তাঁর সঙ্গে ৮।১০ জন সাধু ছাড়া স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ private secretary (একান্ত সচিব)-রূপে গিয়েছিলেন।

ঐ সময়ে মাদ্রাজ মঠের আর্থিক অবস্থা আদৌ ভাল ছিল না। অর্থাভাবে মাসিক পত্রিকাটি কয়েক মাস যাবৎ বন্ধ ছিল এবং অনেক বই-এর পুনর্মুদ্রণ অভাবে প্রকাশন বিভাগও ক্রমশ অচল হয়ে পড়েছিল। মাদ্রাজে এসে মহাপুরুষজীর প্রথম চেষ্টা হলো মঠকে পুনরায় জাগিয়ে তোলা। দীক্ষা ও প্রণামীর সব টাকাই তিনি মাদ্রাজ মঠে দিতেন এবং ব্যক্তিগতভাবে বিশিষ্ট ভক্তদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভের চেষ্টার উপরও বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। ফলে অল্প দিনের মধ্যেই যেন ইন্দ্রজালের প্রভাবে মঠের সুদিন ফিরে আসতে সকলেই বিশেষ আশান্বিত হলেন।

মহাপুরুষজীর নীলগিরি যাবার কথা হতে একদিন মাদ্রাজ মঠের তৎকালীন ম্যানেজার স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ খুঁব অন্তরঙ্গভাবে সেবক মহারাজকে বললেন—"দাদা, আপনারা মহাপুরুষজীকে নিয়ে আরো কিছুদিন থাকুন না? এত শীঘ্র চলে যাচ্ছেন কেন? তিনি আসাতে সবদিক থেকেই তো মঠের উন্নতি হচ্ছিল—ফল, মিষ্টি, খাবার-দাবার, কাপড়চোপড়, টাকাকড়ি সবই তো প্রচুর আসছিল, আপনারা, চলে গেলে আবার সব শুকিয়ে যাবে।" মহাপুরুষজীর অবস্থিতির স্থায়ী ফল দিনের পর দিন সকলেই অনুভব করে চমৎকৃত হয়েছিল।

মহাপুরুষজী ঐ যাত্রায় সুদীর্ঘ এগার মাস কাল দক্ষিণ ভারত ও বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমণ করে শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী-প্রচার ও সঙ্ঘের কাজের প্রসারতাবিধান করেছিলেন, যার ফলে ঐসব স্থানে নূতন আশ্রম গড়ে ওঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি পুনরায় ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ ভারতে ব্যাঙ্গালোর, বোম্বাই, নাগপুর প্রভৃতি স্থানে প্রায় দশ মাস অবস্থান করে আরব্ধ কর্মের পূর্ণতাবিধান করেছিলেন—যার ফলে বিশেষ করে উতকামণ্ড, বোম্বাই ও নাগপুরে নূতন আশ্রম গড়ে ওঠে এবং শত শত দীক্ষিত ভক্তের প্রাণে স্থানীয় আশ্রমের পৃষ্ঠপোষকতার পবিত্র দায়িত্ববোধ সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। তিনি দীক্ষিত ভক্তদের সর্বতোভাবে স্থানীয় আশ্রমের উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করার জন্য উৎসাহিত করতেন। মাদ্রাজ মঠে একদিন তিনি সমবেত ভক্তদের সম্বোধন করে বলেছিলেন—"তোমরা ঠাকুরের গৃহী সন্তান। তাঁর ভাব, তাঁর নাম জগতে প্রচার করার গুরু দায়িত্ব তোমাদেরও বহন করতে হবে। বহু লোকের কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর এ মঠে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, তাই তোমরাও এ আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরকে কেন্দ্র করে জপ-ধ্যান, পূজা, পাঠ, ভর্জন, কীর্তন ও সেবাদির মাধ্যমে তোমাদের ধর্ম-জীবনটি সমৃদ্ধ করবে। শ্রীঠাকুর স্বয়ং পরব্রহ্ম ভগবান। যদিও তিনি সর্বব্যাপী, সর্বভূতের হৃদয়বাসী, তথাপি ভক্তদের কৃপা করবেন বলে এ আশ্রমে তাঁর বিশেষ প্রকাশ। তিনি স্বামীজীকে বলেছিলেন—"তুই কাঁধে করে আমাকে যেখানেই রাখবি, আমি জীবজগতের কল্যাণের জন্য সেখানেই দীর্ঘকাল থাকব।" তাই তো ঠাকুরকে কাঁধে করে এনে স্বামীজী বেলুড় মঠে বসিয়েছিলেন সমগ্র বিশ্বের প্রভূত কল্যাণের জন্য। সকলে তো বেলুড় মঠে গিয়ে তাঁকে দর্শন করার সুযোগ পায় না, সেজন্য স্বামীজী-প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সাধুরা ঠাকুরের ভাব প্রচারের জন্য বিভিন্ন স্থানে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করে আশ্রম রচনা করেছেন এবং নিজেরা সাধন-ভজনপূর্ণ জীবনযাপন দ্বারা অন্যকেও ধর্মজীবন-যাপনে সাহায্য করেন। এ মঠে শ্রীঠাকুরের বিশেষ প্রকাশ। এ স্থানকে পুণ্যতীর্থ বলে জানবে। ঠাকুর ভক্তপ্রিয়। তিনি ভক্ত

ছাড়া থাকতে পারেন না। তোমরা তো জান তাঁর অনেক গৃহী ভক্তও ছিল। আবার শ্রীমাও ঠাকুরকে ছাড়া থাকতে পারেন না, স্বামীজী প্রভৃতি পার্ষদরাও ঠাকুরকে ছাড়া থাকতে পারেন না; তাই ঠাকুর যেখানে শ্রীমাও সেখানে আছেন, তাঁর পার্ষদরাও সেখানে থাকেন। যেখানে শ্রীঠাকুর প্রতিষ্ঠিত হন, সেখানে শ্রীমা ও পার্ষদগণও প্রতিষ্ঠিত আছেন। ঠাকুরকে পূজা করলে সকলেরই পূজা করা হলো।

"শ্রীঠাকুরেরই একজন পার্ষদ শশী মহারাজ তাঁকে এ মঠে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বিশেষ করে সমগ্র দক্ষিণ ভারতের কল্যাণের জন্য এবং সমগ্র দক্ষিণ ভারতকে পবিত্র করার জন্য শশী মহারাজ অনেক আরাধনা করে শ্রীমাকেও এ অঞ্চলে এনেছিলেন, আবার শ্রীঠাকুরের মানসপুত্র রাজা মহারাজও একাধিক বার দক্ষিণ ভারতে এসেছিলেন। শশী মহারাজ নিজে ঠাকুরের সেবাপূজাদি করে ঠাকুরের ভাবপ্রচারের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। শশী মহারাজ যেখানে শ্রীঠাকুরকে বসিয়েছেন, সেখানে ঠাকুর থাকবেন না—তা কি হতে পারে? তিনি এ মঠে নিত্য প্রতিষ্ঠিত আছেন। ভক্তি করে ডাকলে তাঁর দর্শনও পাওয়া যায়।

"আর এই যে ঠাকুরের প্রতিকৃতি দেখছ—তা সামান্য ছবিমাত্র মনে করো না। এ ছবির মধ্যে তিনি স্বয়ং অবস্থান করছেন—ভক্তদের সব প্রার্থনা তিনি শোনেন। তাই বলছি তোমরা আশ্রমে এসে ধ্যান-জপ করবে, পূজা-পাঠাদিতে যোগ দেবে। আশ্রমে বসে জপ-ধ্যান করলে তাতে বেশি ফল পাবে, আনন্দ পাবে। করে দেখ। ঠাকুর এ মঠে জীবন্ত জাগ্রত রয়েছেন। বাড়িতে বসেও ধ্যান-জপ হয় বটে, কিন্তু মঠে তাঁর বিশেষ প্রকাশ। তোমরা সাধন-ভজন দ্বারা মঠকে আরো জাগিয়ে তোল। ওতে তোমাদেরও কল্যাণ হবে, বহু লোকেরও কল্যাণ হবে। তোমাদের জীবন দেখে লোকে শ্রীঠাকুরকে বুঝবে—ধরবার চেষ্টা করবে। তোমাদের এমন জীবন যাপন করতে হবে যাতে শ্রীঠাকুরের মহিমা প্রচারিত হয়।"

মহাপুরুষজী যেখানেই যেতেন সেখানেই বহুলোকের অন্তরে শ্রীঠাকুরকে প্রতিষ্ঠিত করতেন। তাঁর ভিতর দিয়ে লোকে ঠাকুরকে দেখতে পেত—তাঁর জীবন দেখে শ্রীঠাকুরকে ধরতে পারত। এভাবে সর্বত্রই শ্রীরামকৃষ্ণভক্তগোষ্ঠী বেশ বেড়ে উঠেছিল।

* * *

'স্প্রিং ফিল্ডে' পৌঁছে কয়েক দিন পরেই ১৮।৫।২৪ তারিখে তিনি জনৈক ভক্তকে লিখেছিলেন—"...আমি মাদ্রাজে ৮।৯ দিন জ্বরে ভুগিয়াছিলাম। ১০৫° ডিগ্রি দুইদিন উঠিয়াছিল। ডাক্তার রক্তপরীক্ষা করিয়া অনেক malarial parasites

(ম্যালেরিয়ার জীবাণু) পান। তিনটি quinine injection (কুইনাইন ইনজেকশন) দেওয়ায় জ্বর বন্ধ হয়। তবে কিছুদিন খুবই দুর্বল করিয়াছিল। পরে এখানে আসিয়া অনেকটা ভাল আছি। এস্থান নীলগিরি পর্বতোপরি অবস্থিত। এখান হইতে প্রায় ১০।১২ মাইল উপরে Ootacamund (উতকামণ্ড)-এ মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের summer-seat (গ্রীষ্মাবাস)। এখানে সাহেবরা অনেকে change-এ (বায়ুপরিবর্তনে) আসেন। অনেকে tea and coffee plantation (চা ও কফির চাষ)-এর জন্য এখানে বাস করে।"

"আমরা যেখানে রহিয়াছি, তাহা প্রায় 6000ft. above the sea-level (সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৬০০০ ফিট উচ্চে), বেশ ঠাণ্ডা। অতি শোভাময় রমণীয় স্থান। Eucalyptus (ইউক্যালিপটাস)-এর জঙ্গল। Spring (ঝরণা) বহু, জল খুব ভাল, হাওয়াও ভাল। যে বাড়িতে আছি তা অতি নির্জন, নিকটে কারো বাড়ি নাই, চতুর্দিকে পর্বত, বৃক্ষলতাদিতে পরিপূর্ণ।

"আমরা ১০।১২ জন এ বাড়িতে আছি। এখানে শরীর বেশ ভালই বোধ হচ্ছে—বেশ বলও পাচ্ছি। ২।১ মাইল দুবেলা বেড়াই।"

নীলগিরিতে মহাপুরুষজীর শরীর যেমন ভাল ছিল, মনও তেমনি হিমালয়বাসের সময়ের মতো সর্বদা অন্তর্মুখ ছিল। অনেক সময়েই তিনি ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকতেন। ঐ সময় হতে তাঁর চিঠিপত্রাদি স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী লিখতেন, তাতেও তাঁর অনেকটা সুবিধা হয়েছিল। মহাপুরুষজীর হাতের লেখা—বাংলা, ইংরেজি দুই-ই অতি সুন্দর ছিল, যেন মুক্তার মালা। চিঠি লেখার সময় তিনি এতটা তন্ময় হয়ে যেতেন যেন শ্রীঠাকুরের সঙ্গে তাঁর মন এক হয়ে যেত। ফলে তাঁর হাতে লেখা আশীর্বাদপূর্ণ চিঠিগুলি এত শক্তিপূর্ণ ও হৃদয়স্পর্শী ছিল।...

ইতঃপূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের কোন অধ্যক্ষই নীলগিরিতে আসেননি। তাই মহাপুরুষজীর আগমনে সারা নীলগিরি পাহাড়ে খুবই সাড়া পড়ে গিয়েছিল! কেরল, মহীশূর, তামিলনাড়ু প্রভৃতি দূর দূর স্থান হতেও ভক্তগণ দীক্ষাপ্রার্থী হয়ে তাঁর কাছে আসতে লাগল। আবার ঐ শৈলাবাসে দক্ষিণ ভারতের যে সব রাজন্যবর্গের গ্রীষ্মনিবাস ছিল, তাঁরাও মহাপুরুষজীর উপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তাঁর কাছে উপদেশপ্রার্থী হয়ে আসতেন এবং তাঁকে নিজেদের প্রাসাদে নিয়ে তাঁর পাদপূজা করে উপদেশ বা দীক্ষাপ্রার্থী হতেন।

রাজপরিবারে কারো জন্মদিন উপলক্ষে একবার তিনি কোচিন রাজপ্রাসাদে ভোজনের জন্য বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সঙ্গী সাধুদের নিয়ে মহাপুরুষজী

ঐ নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে সকলকে আশীর্বাদ করেছিলেন। খাওয়া-দাওয়ার বিরাট আয়োজন হয়েছিল। মালাবারের পদ্ধতি অনুসারে গোটা কলাপাতার উপর এবং কলাপাতার বাটি ও অন্যান্য রৌপ্যপাত্রে ১২৫ রকমের খাদ্য পরিবেশিত হয়েছিল। তার মধ্যে ছিল ১৮ রকমের ভাত, বহু রকমের ঘৃতান্ন, ১২ রকমের পায়েস, বহুবিধ মিষ্টান্ন, ৩০।৩২ রকমের তরকারি ও রসম, ১০।১২ রকমের পাঁপড় ভাজা প্রভৃতি। সব জিনিসের মধ্যেই নারকেল ও কলার প্রাধান্য ছিল, অথচ সবই অতি উপাদেয় ও মুখরোচক। নিরামিষ রান্না যে এত উপচারে হতে পারে তারই একটা নূতন অভিজ্ঞতা হয়েছিল সকলের। মহাপুরুষজী তো অতি সামান্য খেতেন। তিনি সব দেখে খুব আনন্দ করেছিলেন। যাঁর জন্মদিন ছিল তিনি অভুক্ত থেকে খালি গায়ে গলবস্ত্র হয়ে করজোড়ে দাঁড়িয়ে সব তত্ত্বাবধান করেছিলেন এবং মহাপুরুষজীর আহারের পরে তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে আশীর্বাদ নিয়েছিলেন। এইভাবে নিমন্ত্রিত হয়ে কোন কোন রাজপরিবারের লোকদের আশীর্বাদ করতে তিনি উটীতেও কয়েক বার গিয়েছিলেন।...

নীলগিরির আধ্যাত্মিক আবহাওয়া এতই উচ্চভাবোদ্দীপক ছিল যে, তিনি ওখানে সাধুদের সাধন-ভজনের জন্য একটি আশ্রম স্থাপন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। উতকামণ্ড গ্রীষ্মাবাসের ভক্তগণ তা জানতে পেরে ঐ বিষয়ে খুবই উৎসাহী হয়ে উঠলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই এক অভাবনীয় উপায়ে যেন শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ ইচ্ছায় আশ্রমোপযোগী দু একর উত্তম জমি দানস্বরূপ পাওয়া গেল। ঐ সময়ে লেখা মহাপুরুষজীর এক চিঠিতে জানা যায়—"...আশ্চর্যের বিষয়, ঠাকুরের কি মহিমা! অনুন্নত-জাতীয় একজন ধোপা দুই একর জায়গা দান করিয়াছেন। তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, তাঁর ইষ্ট (মা-শীতলা) তাঁকে বলছেন—'তোর কাছে জন কতক লোক মঠ তৈয়ার করবার জন্য জায়গা চাহিতে আসিলে তুই দিস।' ঐ ভক্তটি পরপর তিনদিন তাঁর আরাধ্যাদেবী কর্তৃক স্বপ্নে জমিপ্রদানের জন্য প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছিলেন।"

মহাপুরুষজীর আশ্রম স্থাপনের ইচ্ছা-প্রকাশ এবং সঙ্গে সঙ্গে ৺শীতলাদেবীর ঐ ইচ্ছা-পূর্ণকরণ—এই ঘটনাটি স্থানীয় ভক্তদের প্রাণে এক দিব্য প্রেরণা এনে দিয়েছিল। তাঁরা ঐ আশ্রম স্থাপনকে ঈশ্বর-প্রণোদিত কার্য মনে করে মহাপুরুষজীর কাছে উপস্থিত হন। তিনি সব শুনে একটি আশ্রম কমিটি গঠন করে দেন এবং ১১ জুলাই উতকামণ্ডে গিয়ে আশ্রমের জমিতে যথাবিধি পূজা ও হোমাদির সঙ্গে শত ভক্তের জয়ধ্বনির মধ্যে আশ্রমের ভিত্তিস্থাপন করেন। ঐ উপলক্ষে উতকামণ্ডের জনসাধারণের পক্ষ হতে একটি সুসজ্জিত বিরাট সভায় কয়েকটি কীর্তনের দল কীর্তন ও আরতি করে, ১২টি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সভ্যগণ তাঁকে

পৃথক পৃথকভাবে ১২টি মানপত্র প্রদান করে অভিনন্দিত করেন। মহাপুরুষজী মানপত্রের উত্তরে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন—"...এই পার্বত্য প্রদেশে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের একটি শাখাকেন্দ্রস্থাপনকল্পে উতকামণ্ডের জনসাধারণের আন্তরিক আগ্রহ ও উৎসাহ দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী আপনাদের প্রাণে এতটা গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে যে, আপনারা এই মনোরম প্রদেশে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম স্থাপন করার জন্য উদ্যোগী হয়েছেন দেখে আমি খুবই আনন্দিত। বিশ্বমানবতা ও সেবাধর্মপ্রচারকল্পে পরিকল্পিত আশ্রমের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত ভূমিদাতা তিরুভেন্‌গাডাম পিলাই মহোদয়কে আমার অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি, আর আন্তরিক প্রার্থনা করছি—শ্রীরামকৃষ্ণের শুভাশীর্বাদে এ আশ্রম দীর্ঘকাল সনাতন ধর্ম প্রতিষ্ঠা দ্বারা জগতে বিশ্বমানবতা, ভ্রাতৃপ্রেম, আধ্যাত্মিকতা ও শান্তিস্থাপনে যত্নপর হয়ে প্রভুর নাম জয়যুক্ত করুক।..." পরে মহাপুরুষজী তাঁর সঙ্গী জনৈক প্রবীণ সন্ন্যাসীকে স্থানীয় ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন ও মিশনের আদর্শ সম্বন্ধে বক্তৃতা করতে আদেশ করেন।

দৈব ইচ্ছায় আশ্রমের জমিপ্রাপ্তিরূপ ঘটনাটি সকলের প্রাণেই মহাপুরুষ যে বিশেষ দৈবশক্তি সম্পন্ন মহাত্মা—এই ধারণা দৃঢ় করে দিয়েছিল। তাঁর শুভাগমন নীলগিরি অঞ্চলে একটি বিশেষ ঘটনা। ব্রহ্মবিদ্ তপোজ্জ্বল সৌম্যমূর্তি এই সন্ন্যাসিপ্রবরের নাম ঐ পার্বত্য অঞ্চলে সর্বত্র প্রচারিত হয়েছিল এবং ঈশ্বরদ্রষ্টা পুরুষ জ্ঞানে দলে দলে লোক তাঁকে দর্শন করতে নিত্য আসত এবং দেবদর্শনের আনন্দ নিয়ে সকলে তৃপ্তপ্রাণে ফিরে যেত। তিনি সকলকেই আশীর্বাদ করতেন—শ্রীভগবানলাভের জন্য উৎসাহিত করতেন। এইভাবে নীলগিরি অঞ্চলে যুগাবতারের ভাব সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে মহাপুরুষজী সঙ্গীদের নিয়ে ২৩ জুলাই ব্যাঙ্গালোর যাত্রা করেন। পথে নেত্রামপল্লি নামক গ্রামে প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ছ-দিন অবস্থান করে সকলকে ধর্মোপদেশ দান, কয়েকজন ভক্তকে দীক্ষা এবং আশ্রমের কাজের সুব্যবস্থা করলেন। সঙ্ঘাধ্যক্ষের আগমন নেত্রামপল্লির পক্ষে বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা।

ঐ যাত্রায় মহাপুরুষজী প্রায় সাড়ে চার মাস ব্যাঙ্গালোরে ছিলেন। তাঁর অবস্থিতির ফলে আশ্রমে নিত্যই বহু ভক্ত ও অনুরাগীর সমাগম হতো। তিনি সকলকেই ধর্মোপদেশ দিতেন, নিত্য সান্ধ্য আরাত্রিকে যোগদান এবং আরাত্রিকের পর সঙ্গী সাধুদের ও স্থানীয় ভক্ত গায়কদের নিয়ে অনেকক্ষণ ভজনগান করা তাঁর নিত্য কর্ম ছিল। মহাপুরুষজীর ব্যাঙ্গালোরে অবস্থান সব দিক থেকেই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল। তিনি ঐ আশ্রমে পৌঁছবার কয়েক দিন পরে ঐ আশ্রমাধ্যক্ষ মহাপুরুষজীর

উপর আশ্রমের কার্যভার অর্পণ করে আশ্রমের সব সাধু-কর্মীদের নিয়ে কাবেরী বন্যাত্রাণকার্যে চলে যান। এতে ক্রমে আশ্রমের নিত্য ঠাকুরসেবাপূজারও অসুবিধা হচ্ছিল। তাই তিনি একদিন সেবককে বললেন—"দেখ, ঠাকুরের সেবাপূজার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমারই। আমি ঠাকুরের বাচ্চা—তাঁর সেবার এতটুকু ত্রুটি হতে দেব না। আমি এখনো ঠাকুরপূজা করতে পারি, কিন্তু এখানে দূর দূর স্থান থেকে এত লোকজন আসে যে, তাদের জন্য অনেক সময় দিতে হয়। নইলে তারা নিরাশ হয়ে ফিরে যাবে। বীরেশই (ব্যাঙ্গালোর আশ্রমের ব্রহ্মচারী কর্মী) এ আশ্রমের একমাত্র পুরাতন কর্মী। তাকে বাইরের অনেক কাজকর্ম দেখাশুনা করতে হয়। তাই তার পক্ষে নিত্য ঠাকুরপূজা করা সম্ভব নয়। স্থানীয় ভাষাও সে ছাড়া আমরা তো জানিনে। অতএব তুমি সাধারণভাবে একটু ঠাকুরপূজাটা শিখে নাও। তাহলে বীরেশকে অন্য কাজে লাগাতে পারি। আমাদের ঠাকুরের পূজা ভাবের পূজা, অত মন্ত্র-মুদ্রাদির প্রয়োজন নেই। ভক্তি করে তাঁর পূজা করবে। তুমি তো মায়ের কৃপা পেয়েছ—ঠাকুর তোমার পূজা অবশ্যই গ্রহণ করবেন। মায়ের কাছ থেকে যে মন্ত্র পেয়েছ সে মন্ত্রেই সব নিবেদন করবে। আমি বলছি ঠাকুর তোমার পূজা গ্রহণ করবেন। আমি যে মন্ত্রে ঠাকুরপূজা করি, তাও তোমায় শিখিয়ে দেব। তুমি ঐ মন্ত্রে পূজা করবে। শ্রীঠাকুর জীবন্ত আছেন এবং তোমার পূজা গ্রহণ করছেন—এ বুদ্ধিতে সেবাপূজা করবে। খুব জপ করবে—খুব প্রার্থনা করবে। দেববুদ্ধি সব সময়ে রাখবে।" এভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা সম্বন্ধে নানা উপদেশ-প্রদানে তিনি সেবককে দিয়ে প্রায় তিন মাস ঠাকুরপূজা করিয়েছিলেন। পূজার সময় তিনি প্রতিদিনই উপস্থিত থাকতেন—সান্ধ্য আরাত্রিকের সময়ও দাঁড়িয়ে আরাত্রিক দর্শন করতেন। তাঁর উপস্থিতিতে সকলেই দেবতার আবির্ভাব অনুভব করে প্রাণে অব্যক্ত আনন্দ ও বিমল শান্তি অনুভব করত; বিশেষ পূজা ও ভোগরাগাদি হলে ভোগের সময়ও তিনি উপস্থিত থাকতেন এবং সব ঠিকভাবে হচ্ছে কিনা তা দেখতেন। সব কিছুতে এই মনে হতো—বস্তুত তিনিই প্রতিনিধি দ্বারা পূজা করছেন।

মহাপুরুষজীর অবস্থিতি স্থানীয় ভক্ত ও জনগণের পক্ষে ভগবানের আশীর্বাদস্বরূপ হয়েছিল। আশ্রমে সর্বক্ষণ জপ-ধ্যান, পূজা-পাঠ, ধর্মালোচনা ব্যাখ্যা, ভজন-কীর্তন ইত্যাদিতে ধর্মভাবের যেন জোয়ার বইছিল। ঐ সময়ে মহীশূর, কুর্গ, কানাড়া, তামিলনাড়ু হতে বহু ধর্মপিপাসু নরনারী মহাপুরুষজীর দীক্ষাকৃপা প্রাপ্ত হয়ে ধন্য হন। দীক্ষার প্রণামী সবই তিনি আশ্রমের ঠাকুরসেবার জন্য দিতেন। একজন ভক্ত ১০০১ (একহাজার এক) টাকা গুরুদক্ষিণা এবং প্রচুর মূল্যবান বস্ত্র ও ফলমিষ্টান্নাদি গুরুদক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করে দীক্ষা নিয়েছিলেন। মহাপুরুষজী ঐ টাকা থেকে ৫০১ টাকা বেলুড় মঠে দুর্গাপূজার জন্য পাঠিয়ে দেন এবং বাকি পাঁচশত

টাকা মাদ্রাজ মঠের ভিতরকার আঙ্গিনাটি পাকা করার জন্য দিয়েছিলেন। মহাপুরুষজী সে বৎসর পূজার সময় বেলুড় মঠে ছিলেন না, সেজন্য মঠে পূজা হবে না ঠিক হয়েছিল। ঐ সংবাদ পেয়ে তিনি তাড়াতাড়ি প্রতিমায় পূজার ব্যবস্থার জন্য বেলুড় মঠে ঐ পাঁচশত এক টাকা পাঠিয়ে সকলকে উৎসাহিত করেছিলেন।

ঐ দীক্ষার দিন মহাপুরুষজীর ইচ্ছায় শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা হোমাদি ভোগরাগ ও ভক্তগণের প্রসাদগ্রহণ ছাড়াও অস্পৃশ্যদের গ্রামের সকলকে তৃপ্তিসহকারে ভোজনের ব্যবস্থা হয়েছিল। এইভাবে ৫০।৬০ জন অস্পৃশ্য আশ্রমে বসে সেদিন আনন্দে পেটভরে খেয়েছিল। মহাপুরুষজী দাঁড়িয়ে থেকে তাদের ভাল ভাল জিনিস খুব খাইয়েছিলেন। তারা আনন্দে জয়ধ্বনি করে বলতে লাগল—আমরা জীবনে এমন পরিতোষপূর্বক কখনো খাইনি। তারা স্থানীয় ভাষাতে যা বলছিল তা একজন সন্ন্যাসী ইংরেজিতে মহাপুরুষজীকে বুঝিয়ে বলছিলেন। শুনতে শুনতে মহাপুরুষজীর চোখ ছলছল করে উঠল, তিনি গদগদস্বরে বললেন—"এরাই ঠিক ঠিক নারায়ণ। স্বামীজী এদের উন্নয়নের জন্য প্রাণপাত করে গিয়েছেন—এদের না জাগাতে পারলে ভারত জাগবে না। শত শত বৎসরের উৎপীড়নের সাক্ষ্য দিচ্ছে এরা। এদের আজ পেটভরে খেতে দিয়ে আমার যে কি আনন্দ হয়েছে তা প্রকাশ করতে পারিনে!" পরে তিনি এদের প্রত্যেককে একটি করে টাকা দেবার জন্য একজন ভক্তকে বললেন।

আশ্রমের ঠিক নিচেই একটু দূরে অস্পৃশ্যদের গ্রাম। এরপর মহাপুরুষজী কয়েকবার ঐ গ্রামে গিয়েছিলেন এবং কঙ্কালসার নগ্ন অভুক্ত অস্পৃশ্য বালক-বালিকাদের প্রতিদিনই তিনি নিজের হাতে বিস্কুট লজেন্স ও পয়সা দিতেন। তারা তো তাঁর কাছে আসতে ভরসা করত না,—তাই একটু দূরে এক স্থানে জড় হয়ে কোলাহল করত। তিনি তাদের দেখলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে হাসিমুখে তাদের সম্ভাষণ করতেন এবং পয়সা খাবার ইত্যাদি দিতেন। গরিবদের জন্য তাঁর অন্তরে গভীর বেদনা বোধ ছিল। তিনি ছিলেন যেন তাদেরই একজন।

ব্যাঙ্গালোরের নিকটবর্তী আলসুর প্রভৃতি স্থানের ভক্তদের প্রতিষ্ঠিত সংস্থানে গিয়েও তিনি তাঁদের ধর্মালোচনায় যোগ দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একজন মহান পার্ষদের মুখে ধর্মোপদেশ শুনে তাঁরা প্রাণে নূতন প্রেরণা পেতেন।

ব্যাঙ্গালোর থেকে মহাপুরুষজী পুনরায় মাদ্রাজে এসে ১২ ডিসেম্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ছাত্রাবাসের নবনির্মিত আবাসিক উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়-ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন এবং পরে একটি পরিকল্পিত যন্ত্রশিল্প-বিদ্যালয়ের ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন। এভাবে মাদ্রাজের কাজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তিনি ৭ জানুয়ারি বোম্বাই অভিমুখে

যাত্রা করেন। পথে তাঁকে কাডাপ্পা নামক স্থানে দু-তিন দিনের জন্য নামতে হয়েছিল। ঐ স্থানের হিন্দু-মুসলমান অধিবাসীদের সমবেত চেষ্টায় একটি সমাজগৃহ নির্মিত হয়েছিল। মহাপুরুষজী ওখানে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রতিষ্ঠিত করে পূজাদি করেছিলেন। ঐ সমাজগৃহের প্রকাণ্ড হলঘরটি স্থানীয় মুসলমান-ভক্ত খান বাহাদুর সৈয়দ আবদুল মজিদ (মঞ্জুমিএগ্রা নামে পরিচিত) মহাশয় নিজ ব্যয়ে করে দিয়েছিলেন। মহাপুরুষজী এ মন্দিরে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করার পর দেখা যেত যে, ঐ মুসলমান ভক্তটি অতি দীনভাবে করজোড়ে মণ্ডপের এক কোণে বসে স্থিরদৃষ্টিতে ঠাকুরের ছবির দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি মহাপুরুষজীকে অতি ভক্তিভাবে প্রণাম করে হাঁটু গেড়ে তাঁর সামনে বসে আনন্দ প্রকাশ করে বলেছিলেন—"আমি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপায় জেনেছি যে, আমার আরাধ্য হজরত মহম্মদই রামকৃষ্ণরূপে এসেছেন। এখানে তাঁকে আপনার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত দেখে নিজেকে মহাধন্য মনে করছি। শ্রীরামকৃষ্ণই এ যুগের ভগবান।"

মহাপুরুষজী মঞ্জুমিএগ্রার ভক্তিতে বিশেষ মুগ্ধ হন। তিনি বলেছিলেন—"স্বয়ং ঠাকুরই এ মুসলমান ভক্তটিকে কৃপা করেছেন। তাই তো ঠাকুরকে ভগবান বলে পূজা করছে। জয় প্রভু, ধন্য প্রভু। আহা! তোমার মহিমা কে বুঝবে!" এবং শিবমহিম্নস্তোত্র থেকে উদ্ধৃত করে বলেছিলেন—

"তব তত্ত্বং ন জানামি কীদৃশোঽসি মহেশ্বর।
যাদৃশোঽসি মহাদেব তাদৃশায় নমো নমঃ ॥

তুমি সকলকে কৃপা করবার জন্য এবার অবতীর্ণ হয়েছ। এ মুসলমান ভক্তটি ধন্য।" মহাপুরুষজী মঞ্জুমিএগ্রাকে খুব স্নেহ করতেন এবং মাথায় হাত দিয়ে খুব আশীর্বাদ করেছিলেন। কাডাপ্পাতে আরো অনেক মুসলমান ভক্ত ছিল। সকলেই মহাপুরুষজীর আশীর্বাদ পেয়ে ধন্য হয়েছে।

* * *

মহাপুরুষজী ১২ জানুয়ারি (১৯২৫) বোম্বাই পৌছলেন। সেখানেও তিনি বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হয়েছিলেন। তখনও বোম্বাই আশ্রম শহরের উপকণ্ঠে খার রোডের উপর একটি ভাড়াটে বাড়িতে ছিল। বোম্বাই পৌছেই তিনি আশ্রমকে নিজস্ব জমিতে স্থায়িভাবে স্থাপন করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি বলেছিলেন—"স্বামীজীর বিশেষ ইচ্ছা ছিল যে, আচার্য শঙ্কর যেমন অদ্বৈতবেদান্ত-প্রচারের জন্য ভারতের চার প্রান্তে চারটি প্রধান মঠ স্থাপন করেছিলেন, তেমনি শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবপ্রচারের জন্য ভারতের চার প্রান্তে চারটি প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হবে। ইতঃপূর্বে হিমালয়, কলকাতা (বেলুড়) ও মাদ্রাজে তিনটি মঠ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বোম্বাই-এ আশ্রমটি স্থায়িভাবে নিজস্ব জমিতে প্রতিষ্ঠিত হয় তো স্বামীজী খুবই খুশি হবেন।

আমি দিব্য চোখে দেখছি এখানে ঠাকুরের খুব বড় কাজ হবে।" মহাপুরুষজীর কথা শুনে স্থানীয় ভক্তগণ সাধুদের সহযোগিতায় আশ্রমের জমি সংগ্রহের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করলেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই 'বোম্বাই নূতন উন্নয়ন-অঞ্চলে' আশ্রমের জন্য ১৩০০ বর্গগজ জমি ক্রয় করা হলো এবং এক শুভদিনে ৬ ফেব্রুয়ারি বিশেষ যাগ ও পূজাদির পরে মহাপুরুষজী বহু কণ্ঠের জয়ধ্বনির মধ্যে নূতন আশ্রমের ভিত্তি-স্থাপন করেন। তখনও 'খার' অনুন্নত অঞ্চল—ধানক্ষেত ও চাষের জমি, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমই প্রথম গৃহরূপে সেখানে নির্মিত হয়েছিল। কোন রাস্তা তখনো হয়নি। আশ্রমের জন্য যেতে যেতে কাদাতে মহাপুরুষজীর জুতা আটকে গিয়েছিল। সঙ্গী সাধুরা অতি সন্তর্পণে তাঁকে ভিত্তিস্থাপনের স্থানে নিয়ে যান। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম স্মরণ করে নূতন জমিতে আশ্রমের ভিত্তিস্থাপন করলেন এবং সেদিন হতে আশ্রমবাটির নির্মাণকার্য আরম্ভ হলো।

মহাপুরুষজীর শুভাগমনে বোম্বাই শহরে বিশেষ সাড়া পড়ে গিয়েছিল। অনেকে তাঁর কাছে দীক্ষাগ্রহণ করেন—তাঁদের মধ্যে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত, বিদ্বান ও সঙ্গতিপন্ন ভক্ত বিশেষভাবে আশ্রমের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সকাল-সন্ধ্যায় বহু ভক্ত ও ধর্মপিপাসু তাঁর কাছে সমবেত হতেন, তিনি তাঁদের সাধন-ভজন সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিতেন।

ইতঃপূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কাজের জন্য কোন অধ্যক্ষই বোম্বাই আসেননি, সেজন্য বোম্বাই-এর জনসাধারণের পক্ষ হতে ১৬ জানুয়ারি মাড়োয়ারি বিদ্যালয় হলে শ্রীএম. আর. জয়কার মহোদয়ের পৌরোহিত্যে এক বিরাট সভায় 'পশ্চিম-ভারত বিবেকানন্দ সোসাইটি' মহাপুরুষজীকে একখানি মানপত্র প্রদান করেন। মহাপুরুষজী প্রত্যুত্তরে অল্প কথায় আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে প্রাণের অন্তস্তল হতে গভীর আবেগ সহকারে উপস্থিত জনগণকে যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আশীর্বাদ জ্ঞাপন করেন। তাঁর আশীর্বাণী এতই মর্মস্পর্শী হয়েছিল যে, সভায় উপস্থিত বিপুল জনতা মুদ্রিত নয়নে নিস্তব্ধ হয়ে তা অন্তরে গ্রহণ করেছিলেন। পরে তিনি সঙ্গী জনৈক প্রবীণ সন্ন্যাসীকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী ব্যাখ্যা করতে আদেশ করেন।

বোম্বাই আশ্রমের ভাবী কর্মপ্রসার সম্বন্ধে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী এখন সফল হতে চলেছে। তিনি বলেছিলেন—"এখানে তাঁর কাজ দিন দিন খুবই প্রসারলাভ করবে এবং সমগ্র পশ্চিম ভারত এ আশ্রম দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবে। এই সবে আরম্ভমাত্র—কালে দেখবে এখানে কি বিরাট ব্যাপার হয়! তিনিই সব করছেন—আমরা নিমিত্তমাত্র।"

বোম্বাই-এর কাজকর্ম সম্বন্ধে ৮।২।২৫ তারিখের এক চিঠিতে তিনি লিখছেন—"...বোম্বাই-এর কয়েকজন সম্ভ্রান্ত বিদ্বান শ্রদ্ধাবান লোক মিশনের দিকে খুব আকৃষ্ট হইয়াছেন। ঠাকুর ও স্বামীজীর উপর তাঁরা খুবই শ্রদ্ধাসম্পন্ন দেখিয়া আমি বড়ই খুশি হইয়াছি এবং এখানে তাঁদের কাজ ভবিষ্যতে খুব উত্তমরূপে হইবে আশা হয়।...অবশ্য তাঁরই ইচ্ছায় এসব হইতেছে ও হইবে—আমরা নিমিত্তমাত্র। তিনি ঈশ্বরাবতার। তাঁর কার্য সব অলৌকিক—আমরা কি বুঝিব! আমি খুব সম্ভব ১৩ বা ১৪ এখান হইতে নাগপুর হইয়া মঠে যাইব।" নিরভিমানিতা মহাপুরুষজীর চরিত্রের শ্রেষ্ঠ মাধুর্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণই ছিলেন তাঁর জীবনের সকল প্রেরণার মূল উৎসস্বরূপ।...

মহাপুরুষজী ১৩ ফেব্রুয়ারি বেলুড় মঠের দিকে যাত্রা করেন। কতিপয় বিশিষ্ট ভক্তের আগ্রহে পথে পাঁচ দিনের জন্য তাঁকে নাগপুরে নামতে হয়েছিল। তখনও নাগপুরে কোন আশ্রম ছিল না। স্থানীয় ভক্তগণ অবসরমত একস্থানে সমবেত হয়ে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' প্রভৃতি পাঠ করতেন এবং জনৈক ভক্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রম করার আশায় একখণ্ড জমি কিনে রেখেছিলেন। মহাপুরুষজী নাগপুরে এসে খুবই আনন্দিত হন এবং ভক্তদের ঐকান্তিক আগ্রহে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবপ্রচারে স্থায়ী কেন্দ্র স্থাপন করার জন্য ১৬ ফেব্রুয়ারি নিজেই শ্রীঠাকুরের পূজাদি করে ক্রেডক টাউনে ঐ জমিখণ্ডের উপর আশ্রমের ভিত্তিস্থাপন করেন। তাতে জনসাধারণের প্রাণে বিশেষ সাড়া পড়েছিল। মহাপুরুষজী সকলের সঙ্গে আনন্দে ধর্মপ্রসঙ্গ করতেন এবং কয়েক জনকে দীক্ষাও দিয়েছিলেন। ভিত্তিস্থাপনের পরেই মহা উৎসাহে আশ্রমের গৃহনির্মাণের কাজ আরম্ভ হয়।

* * *

দীর্ঘ এগার মাস পরে ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৫, মহাপুরুষজী বেলুড় মঠে ফিরে এলেন। বেলুড় মঠ তাঁর খুবই প্রিয় স্থান ছিল। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে তিনি বেলুড় মঠে স্থায়িভাবে অবস্থান করতে আরম্ভ করেন এবং ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে পুণ্যভূমি বেলুড় মঠের সেই দ্বিতলের ঘরেই তাঁর দেহত্যাগ হয়। এই সুদীর্ঘ ১৭।১৮ বৎসর তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একনিষ্ঠ সেবকরূপে বেলুড় মঠেই বাস করেছিলেন। ঐ সময়ের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজের জন্য তাঁকে ৩। ৪ বার ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যেতে হয়েছিল। তিনি একদিন প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন—"যেখানেই থাকি না কেন মনটি বেলুড় মঠেই পড়ে থাকে। বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ প্রকাশ। সমগ্র বিশ্বে ঠাকুরের উদার ও মহান ভাবপ্রচারের প্রধান কেন্দ্ররূপে স্বামীজী এই বেলুড় মঠ

স্থাপন করে ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। শ্রীশ্রীমা নিজে পূজা করে ঠাকুরকে এখানে বসিয়েছেন। শ্রীমা, যোগীনমা প্রভৃতি মেয়ে-ভক্তদের কাছে একসময়ে বলেছিলেন যে, যখন তিনি ঘুষুড়িতে তপস্যা করতেন তখন একদিন নৌকা করে দক্ষিণেশ্বরে যাবার সময় মাঝগঙ্গা থেকে দেখেন যে, ঠাকুর গঙ্গার ধারে এ জায়গাটিতে পায়চারি করছেন; এখানে কয়েকটা কলাগাছ ছিল—ঐ কলাবাগানের মধ্যে ঠাকুর আদুড় গায়ে বেড়াচ্ছেন তা দেখে শ্রীমা ভাবলেন—তাই তো, ঠাকুর এখানে বেড়াচ্ছেন কেন? তিনি ঐ দিনই সঙ্গী মেয়ে-ভক্তদের ওকথা বলেছিলেন। তখনও তো মঠ হয়নি বা এখানে মঠ করার কোন কথাও হয়নি। মঠ তো স্বামীজী পাশ্চাত্যদেশ থেকে ফিরে এসে করলেন। মঠের জন্য এই জায়গাটি নেওয়া হয়েছে শুনে শ্রীমা খুবই খুশি হয়ে বলেছিলেন—'ঠাকুর আগে থেকেই এ স্থানটি পছন্দ করেছিলেন। গঙ্গার পশ্চিম কূল বারাণসী সমতুল। এখানে মঠ করে নরেন খুব ভাল কাজ করেছে।'

"স্বামীজী এ মঠে ঠাকুরপ্রতিষ্ঠা করবার পূর্বে শ্রীমাকে মঠ দেখবার জন্য প্রার্থনা জানান। শ্রীমাও তাতে খুশি হয়ে এ মঠ দেখতে আসেন এবং নিজে ঠাকুরকে বসিয়ে পূজা করেছিলেন। দেখ, কি ব্যাপার! ঠাকুর তো স্থূল শরীরে এখানে আসেননি, কিন্তু শ্রীমা স্থূল শরীরে এসে এ স্থানকে পবিত্র করেছেন। এ মঠে ঠাকুরপ্রতিষ্ঠা করার দিন স্বামীজীর আদেশে আমি একমণ দুধের পায়েস রান্না করেছিলাম। ঐ পায়েস ঠাকুরের ভোগে দেওয়া হয়েছিল। ঠাকুরকে এ মঠে প্রতিষ্ঠিত করে স্বামীজী মহা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলেন—'আজ আমার মাথা থেকে একটা বড় বোঝা নেমে গেল। গত বারো বৎসর ধরে আমার মনে ঐ এক চিন্তা—কি ভাবে ঠাকুরের একটু জায়গা করে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করি। তাঁরই ইচ্ছাতে এটি সম্ভব হলো—তিনি নিজেই সব যোগাযোগ করে দিয়েছেন। এ মঠ থেকে সমগ্র বিশ্বে ঠাকুরের উদার ভাব প্রচারিত হবে—এইটি হবে তাঁর 'সর্বধর্মসমন্বয়ের' প্রধান কেন্দ্র, এখানে সকল মতের, সকল ভাবের সামঞ্জস্য থাকবে।" পরে সকলকে সম্বোধন করে তিনি বলেছিলেন—"আপনারা এই মঠকে কেন্দ্র করে তাঁর ভাবপ্রচারের সহায়ক হউন। জগৎ ধন্য হয়ে যাবে, আপনারাও ধন্য হয়ে যাবেন। সমগ্র জগৎ ঠাকুরের উদার ভাব নেবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। আমি ক্ষেত্র তৈয়ার করেছি—আপনারা তাতে বীজ বপন করতে সাহায্য করুন।"

"এ মঠ হবার পরে অবশ্য আমি অনেক সময় হিমালয়ে তপস্যায় কাটিয়েছি, কিন্তু যেখানেই থাকি না কেন মন পড়ে থাকত বেলুড় মঠে।"

মহাপুরুষজী স্বামীজীর নির্দেশ স্মরণ করে বেলুড় মঠের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণে

আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি বলতেন, "বেলুড় মঠ ঠিক চললে আর সব আশ্রমই ঠিক চলবে।"

* * *

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি, শ্রীপঞ্চমীর দিনে মহাপুরুষজী দেওঘর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ নিজেদের নূতন জমিতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিদ্যাপীঠস্থাপয়িতা স্বামী সদ্ভাবানন্দ কর্তৃক বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হয়ে তিনি বেলুড় মঠ হতে প্রায় ত্রিশজন প্রবীণ নবীন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী এবং অনেক ভক্তসহ দেওঘরে আগমন করে ঐ শিবক্ষেত্র বৈদ্যনাথধামে চব্বিশ পঁচিশ দিন অবস্থান করেন। ঐ উপলক্ষে জামতাড়া, পাটনা, কাশী প্রভৃতি স্থানের সাধু-ভক্তগণের যোগদানের ফলে প্রায় তিন সপ্তাহব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

শুভ শ্রীপঞ্চমীর দিন প্রাতে সাধুভক্তগণের কীর্তন ও শোভাযাত্রার পুরোবর্তী হয়ে মহাপুরুষজী পুরাতন ভাড়াটে বিদ্যাপীঠভবন 'বামা ভিলা' হতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতি দু-হস্তে বক্ষে ধারণ করে বিদ্যাপীঠের নূতন ঠাকুরঘরে প্রতিষ্ঠিত করেন, তারপর পূজা ও আরাত্রিক-সমাপনান্তে মুহুর্মুহু জয়ধ্বনির মধ্যে নবনির্মিত বিদ্যাপীঠভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেছিলেন। সমস্ত দিন ভজন-কীর্তন দরিদ্রনারায়ণ-সেবা ইত্যাদি চলেছিল। এভাবে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রদ ও আনন্দদায়ক কার্যসূচীর মাধ্যমে ঐ উৎসব চলেছিল তিন সপ্তাহ। নূতন বিদ্যাপীঠের সংলগ্ন একটি বাড়িতে তাঁর বাসের ব্যবস্থা হয়েছিল। তিনি কয়েকজন সাধুসহ ঐ বাড়িতে থাকতেন এবং বিদ্যাপীঠে বিবিধ অনুষ্ঠানে যোগদান করে সকলকে আনন্দ দিতেন। বিদ্যাপীঠের স্থানটি দেখে তিনি খুবই প্রীত হয়ে বলেছিলেন—"কূর্মপৃষ্ঠাকৃতি এ প্রকাণ্ড স্থানটি—শিবক্ষেত্রে মহাসাধনপীঠ। এখানে একটু চেপে ভজন-সাধন করলে আধ্যাত্মিক উন্নতি খুব শীঘ্র শীঘ্র হবে। এ স্থান সারদাপীঠের তুল্য—এখানে বিদ্যাপীঠ হয়ে ভালই হয়েছে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এখানে কালে একটা বিরাট ব্যাপার হবে।"

বর্তমানে (বাংলা ১৩৮৯ সালে) ১১০ বিঘা জমির উপর আবাসিক ছাত্রাবাসে ৩৪৬টি ছাত্রকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে এবং সমগ্র বিহারের মধ্যে বিদ্যাপীঠটি একটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

বৈদ্যনাথধামে মহাপুরুষজী খুবই আধ্যাত্মিক আনন্দে ছিলেন এবং তাঁর উপস্থিতিতে সাধুকর্মী ও ভক্তগণ বিশেষ উদ্দীপনা পেয়েছিলেন। একদিন বৈদ্যনাথদর্শনে গিয়ে পূজা করতে বসে শিব-বিগ্রহের মস্তকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেই তিনি গভীর ধ্যানস্থ হয়ে পড়েন। ঐদিন একটা বিশেষ মেলা ছিল। শত শত

যাত্রিসমাগমে বম্ বম্ শব্দে মন্দির-প্রাঙ্গণ মুখরিত। সঙ্গী সন্ন্যাসিগণ বিবিধ উপায় অবলম্বন করে তাঁকে ধ্যান থেকে ব্যুত্থিত করে মন্দিরের বাইরে এনেছিলেন।

এইকালে মহাপুরুষজী যেন বিদেহ অবস্থায় ছিলেন। একটুতেই সমাধিস্থ হয়ে যেতেন। একদিন হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে মাঝ রাতে তাঁর প্রবল সর্দি ও খুব কষ্টদায়ক হাঁপানি হয়। হাঁপানির টান এত বেড়ে গিয়েছিল যে, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম। অগত্যা তিনি গভীর ধ্যানমগ্ন হয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই নিজেকে শরীর থেকে পৃথক করে ফেললেন; তখন আর কোন কষ্ট নেই—মহা আনন্দে রাত কেটে গেল। সকালের দিকে হাঁপানির টানেরও উপশম হলো। পরের দিন সকালবেলা স্বামী ওঁকারানন্দ প্রভৃতি সাধুদের প্রশ্নে তিনি বলেছিলেন—"কাল রাতে এক মজার ব্যাপার হয়েছে। হাঁপানিতে এত কষ্ট হচ্ছিল যে, প্রাণ যেন যায় আর কি! যন্ত্রণা যখন অসহ্য হলো—তখন মনে করলাম দূর ছাই! আমি কেন এত কষ্টভোগ করব, আমি তো দেহ নই! অসুখ তো শরীরের, আমি তো আত্মস্বরূপ। তাই ধ্যানে বসে গেলাম। বুড়ো বয়সের ধ্যান কিনা—অল্পক্ষণেই ধ্যান খুব জমে গেল; তখন দ্রষ্টার মতো দেখতে লাগলাম—শরীরটা হাঁপানির টানে বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হচ্ছে। আমি বেশ আনন্দে রয়েছি। শরীরের কষ্ট এতটুকু আর অনুভব হয়নি। বেশ আনন্দে রাত কেটে গেল।"

স্বামী ওঁকারানন্দ প্রশ্ন করলেন, "ওটা কি, মহারাজ?" তিনি জবাবে বললেন—"ওই তো আত্মা।...শরীরের বেশি কষ্ট হলেই আমি ধ্যান লাগাই, শরীর থেকে নিজেকে পৃথক করে নেই। তখন কেবল আনন্দ—দুঃখ কষ্টের লেশমাত্র থাকে না।"...

বিদ্যাপীঠে তখন অনেক সাধুর সমাগম হয়েছে। তাঁরা প্রায়ই সকাল-সন্ধ্যায় বা রাত্রে মহাপুরুষজীর কাছে নানা ধর্মপ্রসঙ্গ করতেন—সাধন-ভজন এবং কাজকর্ম সম্বন্ধেও অনেক আলোচনা হতো। স্বামী সদ্ভাবানন্দের প্রাণে তখন তপস্যায় যাবার ইচ্ছা খুবই বলবতী হয়েছে। তাই তিনি একদিন মহাপুরুষজীকে একান্তে বললেন—"মহারাজ, কাজকর্ম আর ভাল লাগছে না, এতে অহঙ্কার অভিমান খুব বেড়ে যায়। তাই মনে করছি—উত্তরকাশী তপস্যায় যাব।"

তা শুনে মহাপুরুষজী খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "দেখ, তুমি কয়বৎসর খেটেখুটে এ বিদ্যাপীঠটি দাঁড় করিয়েছ। এখন চলে গেলে এ কাজটির সমূহ ক্ষতি হবে। তুমি স্বামীজীর আদর্শে গরিব ছেলেদের রেখে তাদের খেতে দিচ্ছ, শিক্ষার এমন সুন্দর ব্যবস্থা করেছ যাতে এই অল্পদিনের মধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি বহু লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং আমরাও তোমার কাজে খুব খুশি। দেখবে ক্রমে বাংলাদেশে এবং ভারতের অন্যান্য প্রান্তেও গরিবদের জন্য এ জাতীয় অনেক

প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে। এদিকে তোমার স্বাস্থ্যও তেমন ভাল দেখছি না—এ স্বাস্থ্য নিয়ে উত্তরকাশীতে যাওয়া আমার তো মোটেই ভাল মনে হচ্ছে না। তুমি এক কাজ কর—খাটাখাটনির কাজকর্ম একটু কমিয়ে দিয়ে খাওয়া-দাওয়া নিয়মিতভাবে কর এবং জপ-ধ্যান বাড়িয়ে দাও। তাতে শরীর-মন দু-ই সুস্থ হয়ে উঠবে। জপ-ধ্যানই হলো ঠাকুর-স্বামীজীর কর্মশক্তির উৎস। ধ্যান-জপ বাদ দিয়ে ঠাকুর-স্বামীজীর কাজ হয় না। জপ, ধ্যান, স্বাধ্যায় ও সেবা—এ কটি প্রাত্যহিক জীবনে সমভাবে চালাতে হবে। তাহলে দেখবে জীবনে কোন অশান্তি থাকবে না। এই যে দরিদ্র-নারায়ণদের তুমি সেবা করছ, এ তো শ্রেষ্ঠ সাধনা। নিষ্কামভাবে করলে এ থেকেই তোমার ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ—চতুর্বর্গফল লাভ হবে। এসব কাজ স্বামীজীর বিশেষ প্রিয়। তুমি করে যাও। তোমার ভক্তি ও মুক্তির বিষয় ঠাকুরের ইচ্ছায় আমি বা আমরা বুঝব। আমাদের নির্দেশে যারা ঠাকুর-স্বামীজীর কাজ করছে, তাদের আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য আমরাই দায়ী। আমরা ঠাকুরের সন্তান, আমরা কাউকে বিপথে যেতে বলি না। যাতে মঙ্গল হয়—তাই করতে বলি।"

মহাপুরুষজীর কথা শুনে স্বামী সদ্ভাবানন্দ খুবই কাতরস্বরে বললেন—"মহারাজ, পাঁচজনকে নিয়ে কাজ করা খুবই কঠিন। ওতে পরস্পরের মধ্যে মতদ্বৈধ হয় এবং কাজের সাফল্যে মনে অহংকার-অভিমানও আসে। তাই মনে করছি কাজকর্ম ছেড়ে তপস্যায় চলে যাব।"

মহাপুরুষ মহারাজ খুব গম্ভীরভাবে বললেন—"দেখ, একটু আধটু মনোমালিন্যে কিছু আসে যায় না। পাঁচজন এক সঙ্গে কাজ করলে তাতে গোলমাল একটু হবেই। তবে কি জান এ গোলমাল আসে অহংকার-অভিমান থেকেই। ঠাকুর-স্বামীজীর কাজ করছি—এই বুদ্ধি সব সময় থাকলে কোন গোলমাল হয় না। সেজন্য চাই ধ্যান ভজন আর আত্মবিশ্লেষণ। দিনান্তে আবার দিনের প্রারম্ভে নিজের মনকে জাগতিক সব কিছু থেকে গুটিয়ে এনে ইষ্টপাদপদ্মে অর্পণ করতে হয় এবং প্রার্থনা করতে হয়—প্রভু, তোমার কাজ যেন ঠিক ঠিক করতে পারি। এইভাবে নিত্য প্রার্থনা করে কাজে লাগবে। আর একটি গুহ্য সাধনার কথা তোমায় বলছি—সব সময় সব কাজের মধ্যেই ইষ্টমন্ত্র মনে মনে জপ করার অভ্যাস কর। কর্মেন্দ্রিয় কাজ করবে, কিন্তু মনকে লিপ্ত রাখবে ভগবানের ধ্যান-চিন্তনে ও নামগানে। নিত্য এইভাবে অভ্যাস করে দেখ, মনে সব সময়ই পূর্ণ শান্তি থাকবে। মন কিছুতেই চঞ্চল হবে না, শত ঝড়-ঝাপটার মধ্যেও অবিচলিত থাকবে। করেই দেখ। আর এই যে অহংকার-অভিমান বাড়ার কথা বললে—তাও ধ্যান-জপের অভাবে হয়। নিয়মিত ধ্যান-জপ করলে তবেই ঠিক ঠিক কাজ হওয়া সম্ভব। খালি হৃষীকেশে

গেলেই কি অহংকার-অভিমান নষ্ট হয়ে যায়? তখন আবার নূতন রকমের অহং গজাবে যে আমি বড় তপস্বী। সে অহংকার আরো সাংঘাতিক। তোমাকে বলছি—এখানে থেকেই ধ্যান-ভজন একটু বাড়িয়ে দাও, দেখবে মনের অশান্তি কেটে যাবে। আমিও শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করব যাতে তোমার মনের অশান্তি কেটে যায়। তোমরা তো সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে তাঁর আশ্রয়ে এসেছ। তিনি তোমাদের গ্রহণ করেছেনও। মঙ্গল করবেন বলেই তাঁর চরণে তোমাদের আশ্রয় দিয়েছেন। আমাদের কথা বিশ্বাস কর।"

স্বামী সদ্ভাবানন্দ নত হয়ে মহাপুরুষজীকে প্রণাম করতেই তিনি তাঁর মাথায় দু-হাত রেখে খুব আশীর্বাদ করলেন। অন্যান্য সাধুরাও মহাপুরুষজীকে প্রণাম করে বিদায় নিলেন।...

দেওঘরে চব্বিশ-পঁচিশ দিন সকলকে আনন্দ দিয়ে বেলুড় মঠে যাবার পথে মহাপুরুষজী জামতাড়া আশ্রমে নবনির্মিত ঠাকুরঘরে শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রতিষ্ঠা করার জন্য চার দিন ওখানে অবস্থান করেন। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ হতে রাজা মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজ প্রভৃতি জামতাড়ার একটি ছোট্ট আশ্রম করার চেষ্টা করছিলেন যাতে বেলুড় মঠের অসুস্থ সাধুদের ঐ স্বাস্থ্যকর স্থানে স্বাস্থ্যোদ্ধারের একটা ব্যবস্থা হয়। তাঁর শুভাগমনে সেখানে কয়দিনব্যাপী উৎসব চলেছিল। গরিব সাঁওতালদের পরিতোষপূর্বক ভোজন করানোই ছিল ঐ উৎসবের প্রধান অঙ্গ। তিনি ওখানে দু-জনকে সন্ন্যাস, একজনকে ব্রহ্মচর্য ও কয়েকজনকে মন্ত্রদীক্ষাও দিয়েছিলেন। তিনি ঐ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে বলেছিলেন—"এ আশ্রমটি ঠিক ঠিক সাধুর আশ্রমের মতো হবে। সাধুরা ভিক্ষা করে এনে নিজেরা রান্না করে ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে তা-ই প্রসাদ পাবে আর ভজন-সাধন করবে।"

* * *

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মহাসম্মেলনের কিছু দিন পরেই শ্রীঠাকুরের কাজের জন্য মহাপুরুষজীকে কয়েক মাসের জন্য দক্ষিণভারত ও বোম্বাই অঞ্চলে যেতে হয়েছিল। ২ মে (১৯২৬) কতিপয় সন্ন্যাসীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি মাদ্রাজ যাত্রা করেন। পথে পাঁচ দিনের জন্য ভুবনেশ্বর মঠে নেমেছিলেন। ঐ সময়ে একদিন পুরীধামে জগন্নাথদেবকে দর্শন করতে যান। শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করেই মহাপুরুষজীর অদ্ভুত ভাবান্তর হয়। শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে করজোড়ে দর্শন করতে করতে তিনি দাঁড়িয়েই গভীর সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। অনেকক্ষণ ঐভাবে কেটে যাবার পরে সঙ্গী সাধুগণ অতি সন্তর্পণে তাঁকে মন্দিরের বাইরে নিয়ে আসেন। সারাদিনই তিনি ঐ ভাবাবস্থায় ছিলেন। সেজন্য অন্য কিছু আর দর্শনাদি হয়নি। ভুবনেশ্বরে

ফিরে এসে কথাপ্রসঙ্গে শুধু এইটুকুমাত্র বলেছিলেন—“জগন্নাথদেব খুব জাগ্রত দেবতা।”...

মাদ্রাজের পথে ওয়ালটেয়ারের ভক্তদের বিশেষ আগ্রহে মহাপুরুষজী দুই দিনের জন্য ওখানে বিশ্রাম করেছিলেন। তাঁকে পেয়ে ভক্তদের খুবই আনন্দ হয়েছিল। তিনি অক্লান্তভাবে সকলকে ধর্মোপদেশ ও আশীর্বাদ-দানে তৃপ্ত করেছিলেন। একদিন সঙ্গী সাধুদের বক্তৃতাদির ব্যবস্থাও হয়েছিল, বহু লোক ঠাকুর-স্বামীজীর কথা শুনে আনন্দ পেয়েছিল।

১১ মে মহাপুরুষজী মাদ্রাজ মঠে পৌঁছলেন। রোজই খুব ভক্ত-সমাগম হতো—অনেকের দীক্ষাও হলো। তিনি অক্লান্তভাবে শ্রীশ্রীঠাকুর, মা, স্বামীজী, শশী মহারাজ প্রভৃতির প্রসঙ্গ করতেন এবং সাধন-ভজন সম্বন্ধে খুব উৎসাহ দিতেন, ভগবানলাভ করার জন্য সকলকে উদ্দীপিত করতেন। একদিন সমবেত ভক্তদের সম্বোধন করে বললেন—“তোমরা বহু জন্মের সুকৃতির ফলে যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আশ্রয় পেয়েছ, এ সুযোগ ছেড়ো না, শ্রীঠাকুরকে জীবনে আদর্শ কর—এ জীবনেই ভগবানলাভ হবে। আমরা এ সমাচার জগৎকে শোনাবার জন্য এখনো বেঁচে আছি। যে সর্বতোভাবে শ্রীরামকৃষ্ণচরণে আত্মনিবেদন করে, তিনি যে স্বয়ং ভগবান জীবোদ্ধারের জন্য নরদেহ ধারণ করেছেন—এ পরমতত্ত্বে বিশ্বাসী হয়, তার আর কোন ভয় নেই, জন্মমৃত্যুর প্রহেলিকা থেকে সে চিরমুক্ত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণচরণাশ্রয় নিশ্চয়ই পাবে। শ্রীরামকৃষ্ণ-নামই এ যুগের মুক্তিমন্ত্র। রাম ও কৃষ্ণ—এ দুয়ের সম্মেলনে রামকৃষ্ণ—এ দুয়ের যুগ্ম বিকাশ। রামকৃষ্ণনাম নিলে রামনামজপের ফলও পাবে আবার কৃষ্ণনামজপের ফলও পাবে। তিনি পাপী-তাপীদের মুক্তি দিতেই জগতে এসেছিলেন এবং ভগবানলাভ করার সরল সুন্দর পথ দেখিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন—“নাম নামী অভেদ”। শ্রীরামকৃষ্ণনাম নিলে শ্রীরামকৃষ্ণকেই স্মরণ করা হলো। হেলায় শ্রদ্ধায়ও যে তাঁর নাম নেবে তারই কল্যাণ হবে। একবার করেই দেখ—তাঁর নামে কত আনন্দ, কত শান্তি!

“এ আশ্রম কি কম স্থান? এখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একজন পার্ষদই তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ মঠে স্বয়ং জগজ্জননী শ্রীশ্রীমা শুভ পদার্পণ করেছেন। এ আশ্রমে ঠাকুরের মানসপুত্র শ্রীমহারাজ এসেছেন—ঠাকুরের আর আর সন্তানরাও অনেকে এসেছেন। এঁরা কেউই সাধারণ মানুষ ছিলেন না, সকলেই অপ্রাকৃতদেহধারী—শ্রীভগবানের বিশেষ অংশস্বরূপ। তাঁরা সাধক বা সিদ্ধ পুরুষ নন—তাঁরা নিত্যসিদ্ধ। তাঁরা জীবকে সিদ্ধি দিতে পারেন, মুক্তি দিতে পারেন। এ মহাতীর্থস্থান মনে করবে। এ মঠকে তীর্থে পরিণত করবেন বলেই শশী মহারাজ

এঁদের সকলকে আরাধনা করে এখানে এনেছিলেন। দক্ষিণ ভারতের জন্য শশী মহারাজের কত দয়া! তিনি ঐ শুভকার্যে খেটে খেটে—অল্প বয়সে প্রাণ দিয়ে গেলেন। শ্রীশ্রীমাকে দক্ষিণ ভারতে আনার পরেই তিনি বলেছিলেন, 'এবার আমার কাজ শেষ হলো। এখন শরীর যাক আর থাক।' শ্রীমাকে দক্ষিণ ভারতে আনা শশী মহারাজের ভক্তিতেই সম্ভব হয়েছিল। আর কেউ তা করতে পারত না। শ্রীঠাকুর স্থূল শরীরে দক্ষিণ ভারতে আসেননি, তাই দক্ষিণ ভারতকে ধন্য করবার জন্য শশী মহারাজ এত করে শ্রীমাকে এ অঞ্চলে এনেছিলেন। শশী মহারাজের কাছে সমগ্র দক্ষিণ ভারত ঋণী। আবার মাদ্রাজবাসীদের প্রার্থনায় স্বামীজীই শ্রীঠাকুরের ভাবপ্রচারের জন্য শশী মহারাজকে মাদ্রাজে পাঠিয়েছিলেন। তোমরা নিজেদের মহাভাগ্যবান মনে করবে। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রয় পাওয়া কম কথা নয়! তিনিই এ যুগের ঈশ্বর।"

মহাপুরুষজীর ভিতর তখন এমন একটা অলৌকিক আকর্ষণীশক্তির বিকাশ হয়েছিল—যে তাঁকে দেখত সেই মুগ্ধ হয়ে যেত। অবিশ্বাসী বা সন্দেহবাদীও একবার তাঁকে দর্শন করে বা তাঁর আশীর্বাদ পেয়ে পূর্ণ ভগবদ্-বিশ্বাসী হয়ে যেত। যার উপর তাঁর কৃপাদৃষ্টি পড়ত সেই হয়ে যেত ভগবদ্ভক্ত।

মহাপুরুষজীর আগমন-সংবাদে উতকামণ্ডের ভক্তগণ তাঁকে দিয়ে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করাবেন ভেবে তাঁকে উতকামণ্ডে নিয়ে গেলেন এবং পরম যত্নের সঙ্গে দীর্ঘ পাঁচমাস কাল ওখানে রেখেছিলেন। ঐ সময়ে তিনি এক চিঠিতে লিখছেন—"আমি ৪ জুন মাদ্রাজ হইতে এখানে আসিয়াছি। অতি রমণীয় পর্বত, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৮০০০ ফুট উঁচু—সুশীতল, সুদৃশ্য এবং আমরা যে বাড়িটি পাইয়াছি তাহা অতি নির্জন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং well-furnished (আসবাব দ্বারা সুসজ্জিত), চারিদিকে ফুলের বাগান, বৃহৎ প্রাঙ্গণ, নানাপ্রকার গাছপালা—অধিকাংশই ইউক্যালিপ্টাস। এখানকার স্বাস্থ্যও খুব ভাল। শরীর এখানে ভালই আছে। ইহা দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত তীর্থ—বালাজী (তিরুপতি বা ভেঙ্কটেশ্বর) মোহন্ত মহারাজের গ্রীষ্মনিবাস।"

উতকামণ্ডের আধ্যাত্মিক আবহাওয়ার তিনি খুবই প্রশংসা করতেন। বলতেন—"পুরাকালে মুনিঋষিরা এখানে অনেক তপস্যা করেছিলেন, তাই এখানে এমন জমাটবাঁধা ভাব আছে।" তিনি অনেক সময়েই ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকতেন। জাগতিক সবকিছু থেকেই তাঁর মন উঠে গিয়েছিল। সঙ্ঘাধ্যক্ষের দায়িত্বভার ত্যাগ করে জীবনের বাকি কটা দিন নীলগিরি পর্বতের নির্জনতার মধ্যে কাটিয়ে দেবেন, তাও সময়ে সময়ে বলতেন। তিনি সে সময়ে কতটা আত্মানন্দে বিভোর হয়েছিলেন তার

আংশিক পরিচয় একখানি চিঠিতে পাওয়া যায়। তিনি জনৈক ভক্তকে লিখছেন—"আমার ভিতর ঠাকুর ছাড়া আর কি আছে? আমার মন-প্রাণ-দেহ সবই তিনি। জগতে জীবকে বিশ্বাস, ভক্তি-প্রীতি, মুক্তি দিবার জন্যই এখনো জীবিত রেখেছেন।" বাস্তবিকই একমাত্র জীবকল্যাণবাসনা অবলম্বনে তিনি বেঁচেছিলেন, তাঁর অন্য কোন কামনা-বাসনা ছিল না।

দু-বৎসর পূর্বে তিনি যে আশ্রমের ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন তার নির্মাণকার্য শেষ হতে ২৪ সেপ্টেম্বর (১৯২৬) ঐ উটী আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রতিষ্ঠিত করে ওখানে ঠাকুরের নিত্য সেবাপূজাদির ব্যবস্থা এবং একজন যোগ্য সন্ন্যাসীর উপর ঐ আশ্রমের কার্যভার অর্পণ করলেন। তাঁর অবস্থিতিতে উতকামণ্ডে গভীর আধ্যাত্মিক পরিবেষ্টনীর সৃষ্টি হয়েছিল। নীলগিরি পর্বতের সুদূর প্রান্ত হতেও দলে দলে লোক মহাপুরুষজীকে দর্শন করবার জন্য হাতিরামজী মঠের স্তব্ধ আবেষ্টনীর মধ্যে আসতে লাগল। তাদের মধ্যে পার্বত্যঅধিবাসীর সংখ্যাও কম ছিল না। অনেক সময়েই তারা আসত উচ্চ সংকীর্তনে পার্বত্যপ্রদেশ প্রতিধ্বনিত করে—দেবদর্শনের শোভাযাত্রার মতো। তারা মহাপুরুষজীকে দর্শন করে আনন্দে তাঁকে ঘিরে নৃত্য করত। তিনিও ভাবাবেশে তাদের সঙ্গে নৃত্য করতেন এবং সদুপদেশ ও নিজহাতে মিষ্টান্নাদি প্রসাদ-দানে তাদের করতেন পরিতৃপ্ত। তিনি বলতেন—"ঠাকুরের প্রসাদের মহিমা অপার। যে ঐ প্রসাদ গ্রহণ করবে তারই প্রাণে ভগবদ্ভক্তির বীজ উপ্ত হবে।" ফলে যে সব লোক খ্রিস্টান পাদ্রিদের দ্বারা প্রলোভিত হয়ে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে ধর্মান্তরগ্রহণ করছিল—তারা আশ্রমের সংস্পর্শে এসে হিন্দুধর্মের প্রকৃত মহিমা বুঝতে পেরে স্বধর্মত্যাগে বিরত হলো।

উতকামণ্ডের মঠকে আধ্যাত্মিক-আলোককেন্দ্রে পরিণত করে মহাপুরুষজী ব্যাঙ্গালোর আশ্রম পরিদর্শন করবার জন্য সেখানে গেলেন। ব্যাঙ্গালোরেও প্রতিদিন বহু ভক্ত তাঁর মুখে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ শুনে বিশেষ আনন্দ পেতেন। ভগবৎ-প্রসঙ্গে তাঁর আদৌ ক্লান্তি ছিল না। প্রত্যেক মানুষকে ভাগবৎ-স্পর্শ দেওয়াই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত। ব্যাঙ্গালোরে এক মাস অতিবাহিত করে তিনি মাদ্রাজের পথে পাঁচ দিনের জন্য নেত্রামপল্লি আশ্রমে শুভ পদার্পণ করেছিলেন এবং স্থানীয় পঞ্চায়েত-প্রদত্ত পাঁচ একর জমিতে রামকৃষ্ণ শিল্পভবন ও ছাত্রাবাসের ভিত্তিস্থাপন করেন। স্থানীয় জনসাধারণের পক্ষ হতে তাঁকে একখানি মানপত্রও দেওয়া হয়েছিল।

মাদ্রাজ মঠে মাসখানেক থেকে তিনি বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে ২২ ডিসেম্বর বোম্বাই এলেন। দু-বৎসর পূর্বে একটা মাঠের মধ্যে ধানক্ষেতে তিনি যে আশ্রমের ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন—এখন সেখানে রাস্তাঘাট ও আশ্রমবাড়ি গড়ে উঠেছে।

তাই ২৬ ডিসেম্বর আশ্রম-প্রতিষ্ঠার দিন ধার্য হলো। ঐদিন প্রত্যুষে শুভমুহূর্তে ব্রাহ্মণগণ বেদপাঠ করে শোভাযাত্রার পুরোবর্তী হয়ে গুজরাটি, মারাঠি, মাদ্রাজি, পার্সি, বাঙালি প্রভৃতি সকল শ্রেণীর ভক্তের উল্লসিত জয়ধ্বনির মধ্যে মহাপুরুষজী পুরাতন আশ্রম হতে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি বুকে ধরে নবনির্মিত ঠাকুরঘরে নিয়ে গেলেন এবং অতি ভক্তিভরে শ্রীঠাকুরকে সিংহাসনে বসিয়ে পূজা ও ভোগ নিবেদন করলেন। যখন তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে বুকে জড়িয়ে ধরে বারংবার প্রণাম করে সিংহাসনে বসালেন তখন তাঁর সুন্দর মুখমণ্ডলে দিব্যশ্রী ফুটে উঠেছিল—তিনি যেন জীবন্ত ঠাকুরকে বসাচ্ছেন।

আশ্রম-প্রতিষ্ঠার পরে মহাপুরুষজী বোম্বাই আশ্রমে কিছুদিন বাস করে সেখানে ভজন-কীর্তন, পাঠ, আলোচনা ও ধর্মপ্রসঙ্গের মাধ্যমে একটা জাগ্রত আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন, যা আশ্রমের সাধু ভক্ত ও স্থানীয় জনসাধারণের আধ্যাত্মিক জীবনকে বিশেষভাবে উন্নত করেছিল। ঐ সময়ে তিনি এক চিঠিতে লিখেছিলেন "...বোম্বাইতে ঠাকুর-স্বামীজীর ভাব তাঁর ইচ্ছায় খুব প্রচার হইতেছে। শিক্ষিত শ্রেণীর লোক খুব interest নিতে (আগ্রহান্বিত হইতে) আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা শুভ লক্ষণ।...জয় ঠাকুর, ধন্য ঠাকুর, সবই তোমার মহিমা। এই সকল যুগধর্মস্থাপনের লক্ষণ—এখনো এইরূপ কত হইবে তার ইয়ত্তা নাই!"

মহাপুরুষজী ১৪ ফেব্রুয়ারি সকল শ্রেণীর জনসাধারণের উপস্থিতিতে আশ্রমে দাতব্য চিকিৎসালয় ও অবৈতনিক ছাত্রাবাসের ভিত্তিস্থাপন করে সকলকে বিশেষ উৎসাহিত করেছিলেন। বোম্বাই আশ্রমের বর্তমান উন্নতি তাঁরই ভবিষ্যদ্ বাণীর সার্থক রূপায়ণ।

ঐ দিনই মহাপুরুষজী সদলবলে বোম্বাই হতে বেলুড় মঠের দিকে যাত্রা করলেন, পথে এক সপ্তাহের জন্য নাগপুরে নেমে আশ্রমের কার্যসমাপনে অকুণ্ঠ উৎসাহ দিয়েছিলেন। সেখানে পূর্ববারের মতো কোন ভক্তগৃহে না থেকে এবারে আশ্রমের জমিতেই তাঁবু খাটিয়ে তিনি বাস করেছিলেন। তাঁর আগমনে ভক্ত ও হিতৈষীবর্গের প্রাণে বিশেষ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল এবং প্রতিদিন ভজন-কীর্তন, ধর্মপ্রসঙ্গ ও সাধুভক্তসমাগমে ঐ স্থানটি যেন আশ্রমে পরিণত হয়েছিল। মহাপুরুষজী ওখানে অনেক ভক্তকে দীক্ষাও দিয়েছিলেন। তাঁর অবস্থিতির আধ্যাত্মিক প্রভাব অবর্ণনীয়। যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একজন শ্রেষ্ঠ পার্ষদের অবস্থিতিতে ঐ স্থানটি একটি মহাতীর্থে পরিণত হয়ে শত শত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির আশ্রয়স্থান হয়েছে। ঐ আশ্রমের বর্তমান সমৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। নাগপুর আশ্রমের প্রতি মহাপুরুষ মহারাজের বিশেষ স্নেহদৃষ্টি ছিল।

প্রায় দশ মাস পরে তিনি বেলুড় মঠে ফিরে এলেন।

* * *

এর কয়েকমাস পরেই স্বামী সারদানন্দ মহারাজের আকস্মিক দেহত্যাগ মহাপুরুষজীর অন্তরে মর্মন্তুদ আঘাত দিয়েছিল। তিনি শোকে আত্মহারা হয়ে দেহত্যাগের সংকল্প করেছিলেন। ৬ আগস্ট সন্ধ্যার পরে স্বামী সারদানন্দ মহারাজ সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হয়ে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়নে। ঐ সংবাদ পেয়েই মহাপুরুষজী খানিকক্ষণ চুপচাপ ধ্যানস্থ থেকে বিমর্ষ ও বেদনাভরা কণ্ঠে বলেছিলেন—"শরৎ মহারাজ এবার শরীর ছেড়ে দেবেন। তোমরা সকলে যাও—তাঁর আপ্রাণ সেবা কর।" এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজের জন্য যে কয়জনের দরকার তাদের রেখে বাকি সব সাধুদের সে রাত্রেই উদ্বোধনে মায়ের বাড়িতে শরৎ মহারাজের শয্যাপার্শ্বে পাঠিয়ে দিলেন। মঠে তখন টেলিফোন ছিল না। মঠের গেটের বাইরে মাড়োয়ারি বাগানে টেলিফোন ছিল। শরৎ মহারাজের খবর আনার জন্য পালা করে সাধুদের সে টেলিফোনের কাছে দিনরাত সমানে বসে থাকতে হতো। এদিকে মঠে মহাপুরুষ মহারাজ মহাদুশ্চিন্তাগ্রস্তভাবে শরৎ মহারাজের খবরের জন্য উৎকণ্ঠিত প্রাণে চব্বিশ ঘণ্টা ব্যস্ত হয়ে থাকতেন।

Stroke (রক্তচাপ-আক্রমণ)-এর তৃতীয় দিন বিকালে শরৎ মহারাজকে মহাপুরুষজী দেখতে উদ্বোধনে গিয়েছিলেন। তিনি যখন উপরে শরৎ মহারাজের ঘরে যান তখন তাঁর সঙ্গে স্বামী আত্মবোধানন্দ, স্বামী ওঁকারানন্দ ও স্বামী বিজয়ানন্দ প্রভৃতি কয়েকজন সাধু ছিলেন।*

শরৎ মহারাজকে দেখে আসার পর হতে মহাপুরুষজী আরো মন-মরা হয়ে

---

* গত ২৪।২।৬৮ তারিখে কাশীতে সাধুদের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে স্বামী বিজয়ানন্দ ঐ ঘটনাটি যেমন বলেছিলেন তাই এখানে দেওয়া হলো—"...মহাপুরুষজী শরৎ মহারাজের ঘরে গিয়ে বিছানার পাশে বসে শরৎ মহারাজের মাথায় হাত বুলাতে লাগলেন, যেন আশীর্বাদ করছেন। সেই স্পর্শে শরৎ মহারাজ চোখ মেলে বাম চোখ দিয়ে মহাপুরুষজীর দিকে তাকালেন (স্ট্রোকের দরুন তাঁর ডান চোখটি ছোট হয়ে গিয়েছিল) এবং মহাপুরুষজীকে দেখেই একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন যেন চোখে চোখে কি কথা হলো, দুজনেরই দৃষ্টি স্থির। সে কি প্রেমপূর্ণ চাহনি। এইভাবে মহাপুরুষজী খানিকক্ষণ মাথায় হাত বুলিয়ে দেবার পর শরৎ মহারাজ ধীরে ধীরে চোখ বুজলেন। মহাপুরুষজীও একটু পরে নিচে নেমে এলেন। বাড়ি ভরতি লোক। সিঁড়ির নিচের ভাঁড়ার ঘরের পাশে তক্তায় বসে মহাপুরুষজী একটু ঠাকুরের প্রসাদী সন্দেশ ও একটু জল খেলেন। সে সময় শরৎ মহারাজের কি কি চিকিৎসা হচ্ছে এবং আরো কি চিকিৎসা হওয়া উচিত ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শুনে নির্দেশ দিলেন। তারপর উঠে এসে সদর দরজায় গাড়ির কাছে দাঁড়ালেন। সঙ্গে আমি ছিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—'মহারাজ, শরৎ মহারাজকে কেমন দেখলেন? এ যাত্রায় সেরে উঠবেন তো?' উত্তরে তিনি বললেন—'না, শরৎ মহারাজ নির্বিকল্প সমাধিতে শরীর ত্যাগের অপেক্ষায় আছেন। শরৎ মহারাজকে আর রাখা যাবে না।' "

গিয়েছিলেন, তাঁর সমগ্র মুখমণ্ডল উৎকণ্ঠা ও মহাদুশ্চিন্তার ঘন ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। তিনি ঘরের দরজা বন্ধ করে নীরবে চোখের জল ফেলতেন।

তেরো দিন ঐ অবস্থায় থেকে ১৯ আগস্ট শরৎ মহারাজ দেহত্যাগ করেন। ঐ সংবাদ পেয়ে মহাপুরুষজী শোকে আত্মহারা হয়ে বালকের মতো কাঁদতে কাঁদতে শ্রীঠাকুরের উপর অভিমান করে বলেছিলেন, "ঠাকুর, তোমার কর্মক্ষম ছেলেদের সব তুমি নিয়ে গেলে, আর রাখলে অথর্ব আমাকে! তোমার কি কাজ করতে পারব? আমাকেও নিয়ে চল।...শরৎ মহারাজের দেহত্যাগে আমার ডান অঙ্গ যেন ভেঙ্গে গিয়েছে। দুটি প্রাণের কথা বলবার মতো কাউকে রাখলে না ঠাকুর? আমি কি করে থাকি?" তাঁর কান্না আর থামে না। তাঁকে এতটা বিহ্বল হতে ইতঃপূর্বে কেউ কখনো দেখেনি।

শরৎ মহারাজ সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হবার মাত্র কয়েক দিন পূর্বে গভর্নিং বডির মিটিং-এ যোগদান করার জন্য মঠে এসেছিলেন। ঐ স্থূল শরীরে তাঁর শেষ মঠে আসা। ঐ দিন দুপুরে মহাপুরুষজীর ঘরের মেজেতে পাশাপাশি বসে দু-জনে একসঙ্গে আহারাদি করেছিলেন এবং সে সময় সেবকদের বাইরে যেতে বলে তাঁরা দু-জনে প্রায় দেড়ঘণ্টা একান্তে অনেক অন্তরঙ্গ কথাবার্তা বলেছিলেন। এক একবার দেখা যাচ্ছিল যে, মহাপুরুষজী শরৎ মহারাজের কাঁধে হাত রেখে কত সোহাগভরে কথা বলছেন!

সেদিন সন্ধ্যার পূর্বে উদ্বোধনে ফিরে যাবার সময় শরৎ মহারাজ এসে মহাপুরুষজীর বিছানায় বসলেন। মহাপুরুষজী চেয়ারে বসে। জনৈক সেবক শরৎ মহারাজের পায়ে মোজা পরিয়ে দিচ্ছিল, সে সময়ে তাঁর পা খুব কাঁপছিল দেখে সেবক জিজ্ঞেস করল, "আপনার পা অমন কাঁপছে কেন, মহারাজ?" তিনি স্মিতহাস্যে বললেন—"এ শরীরের কি কিছু আছে? যখন মায়ের বাড়ি করতে প্রায় ন-হাজার টাকার দেনা হলো তখন ঐ দেনা শোধ করার উপায়ান্তর না দেখে ঠাকুরের 'লীলাপ্রসঙ্গ' লিখতে আরম্ভ করলাম। সে সময় সকাল ৭টার পর ঐ যে একাসনে লিখতে বসতাম—বেলা দেড়টা দুটা পর্যন্ত—তখন একবার পা ছড়াবারও সময় হতো না। ঐ ভাবে রক্তচলাচল বন্ধ হয়ে দুটা পা-ই অবশ হয়ে গিয়েছে। তা মায়ের বাড়ির দেনা তো শোধ হয়ে গেল!"...পরে মহাপুরুষজীকে বিদায়প্রণাম করে শরৎ মহারাজ বলেছিলেন—"দেখুন মহাপুরুষ, শরীরটা বড্ড খারাপ হয়ে গিয়েছে। বোধ হয় আর বেশি দিন টিকবে না।" তা শুনে মহাপুরুষজী তাঁর কাঁধে হাত রেখে বললেন—"সে কি বলছ? ঠাকুর যতদিন রাখবেন থাকতেই হবে। এই দেখ না, আমাকেই এত বুড়ো বয়স পর্যন্ত তিনি রেখে দিয়েছেন। ওসব কিছু ভেবো না।"

কথা বলতে বলতে সিঁড়ি পর্যন্ত এসে শরৎ মহারাজ যখন এক সিঁড়ি নেমেছেন তখন মহাপুরুষজী পেছন দিক থেকেই শরৎ মহারাজের মুখের কাছে মুখ এনে কাঁধের উপর দিয়ে তাঁকে আদর করে বিদায় দিয়েছিলেন। স্থূল শরীরে দু-জনের মধ্যে এই শেষ কথাবার্তা।...

শরৎ মহারাজের দেহত্যাগের পরে মহাপুরুষজীকে একান্তে বসে কাঁদতে দেখা যেত এবং তাঁর শরীর খুব খারাপ হলো। চৌদ্দ দিন অত্যধিক জ্বর। ঐ জ্বরের সময়ও তিনি কেঁদে কেঁদে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতেন, "আর কেন, ঠাকুর, আমায় নিয়ে চল।" তাঁর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা দেখে সকলেই বিশেষ শঙ্কিত হয়ে বলাবলি করতে লাগল—"এবার মহাপুরুষ মহারাজও দেখছি শরীর ছেড়ে দেবেন।" ডাঃ অমর বাবুর সুচিকিৎসা ও অক্লান্ত সেবাযত্নাদির ফলে ১৪ দিন পরে তাঁর জ্বর ছাড়ল। কয়েকদিনের মধ্যেই ডাক্তারগণ বায়ু-পরিবর্তনের পরামর্শ দিলেন। তখনও তাঁর শরীর এত বেশি দুর্বল যে, ডাক্তার অমর বাবু তাঁকে সঙ্গে করে মধুপুরে জনৈক ভক্তের প্রাসাদোপম 'শেঠ ভিলা' নামক বাড়িতে নিয়ে এলেন। মধুপুরের জলহাওয়া ও নির্জন আবেষ্টনী এবং সেবাযত্নাদির ফলে তাঁর স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি দেখা গেল। মধুপুরে তিনি প্রায় দু-মাস ছিলেন। তাঁর অবস্থিতিতে সাধু ও ভক্ত-সমাগমে 'শেঠ ভিলা' সে সময় যেন মঠে পরিণত হয়েছিল। তিনি সেখানে কয়েক জনকে দীক্ষাও দিয়েছিলেন।

মধুপুর হতে কতকটা সুস্থ শরীরে তিনি ২২ নভেম্বর কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে এলেন। কিন্তু তাঁর মানসিক অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন তখনো হয়নি। তিনি দেহত্যাগ করার প্রার্থনা ঠাকুরকে প্রায়ই জানাতেন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে বললেন—"এ হচ্ছে মহাশ্মশান। যারা ভগবানকে ডাকবে, তাঁর নাম করবে, কেবল তাদেরই এখানে থাকা উচিত। বিষয়ীদের এখানে থাকা উচিত নয়। এ অবিমুক্তপুরী কাশীক্ষেত্রের সবটাই শিবের শরীর। আমরা শিবের মধ্যে বাস করছি।" এসব কথা থেকে তৎকালীন তাঁর মানসিক অবস্থার আংশিক পরিচয় পাওয়া যায়।

ঐ সময়ে তাঁর এক অলৌকিক দর্শন হয়েছিল যার প্রভাব তাঁর মনের উপর পড়েছিল বিপুলভাবে। একরাত্রে তিনি শুয়েছেন, কিন্তু কিছুতেই ঘুম হচ্ছিল না। রাত ১২টার পরে তিনি দেখতে পেলেন যে, তাঁর ঘরটি স্নিগ্ধ আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। হঠাৎ ঐ আলো দেখে তিনি বিছানায় উঠে বসলেন—এমন সময় দেখলেন, "এক শ্বেতকায় জ্যোতির্ময় পুরুষ, জটাজূটধারী, ত্রিনয়ন—সামনে এসে দাঁড়ালেন।" তাঁর "দিব্যকান্তিতে চারদিক আরো আলোকিত হয়ে উঠল। সেই কমনীয় মূর্তি সকরুণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে প্রসারিত হস্তে যেন তাঁকে আলিঙ্গন

করবার জন্য তাঁর দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছেন। ঐ শ্বেতকায় পুরুষকে দেখামাত্রই তাঁর ভিতর থেকে মহাবায়ু গড়গড় করে একেবারে উপরের (সহস্রার) দিকে উঠতে লাগল এবং তিনি ক্রমে গভীর ধ্যানস্থ হয়ে পড়লেন। ঐ অবস্থায় তিনি দেখলেন যে, ঠাকুর ত্রস্তব্যস্ত হয়ে উৎকণ্ঠিত ভাবে ডান হাত তুলে ঐ দিব্য পুরুষের পেছনে এসে দাঁড়ালেন যেন কোন বিষয়ে বাধা দিচ্ছেন। ক্রমে সেই জ্যোতির্ময় শিবমূর্তি বিলীন হয়ে গেল! ঠাকুর তখন সহাস্য বদনে মহাপুরুষজীকে হাত দিয়ে ইসারা করে বললেন—'তোর এখন যাওয়া হবে না, আরো কিছু কাজ বাকি আছে—তোকে থাকতে হবে।' ঠাকুর ঐ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মন আবার নিচের দিকে আসতে লাগল এবং প্রাণবায়ুর ক্রিয়া চলতে লাগল।"

পরদিন সকালবেলা তিনি পূর্বরাত্রের ঐ দর্শনের কথা-প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "সবই তাঁর ইচ্ছা। আমি কিন্তু বেশ আনন্দে ছিলাম। তিনি আর কেউ নন, সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ আমায় নিতে এসেছিলেন, এদিকে ঠাকুর তা হতে দিলেন না।"

তা শুনে জনৈক সন্ন্যাসী প্রশ্ন করলেন—"আপনি কি স্বপ্নে দর্শন করেছিলেন?"

মহাপুরুষজী বললেন, "না হে, জেগে জেগে।" এবং অন্যপ্রসঙ্গের অবতারণা করলেন। মহাপুরুষজী নিজের দর্শনাদির কথা কদাচিৎ বলতেন; কিন্তু সেদিন ৺বিশ্বনাথ ও শ্রীঠাকুরের যুগ্ম দর্শনে তাঁর এতই আনন্দ হয়েছিল যে, সে আনন্দের ভাব সেদিন আর চাপতে পারেন নি।

কাশীক্ষেত্রে বিশ্বনাথ ও ঠাকুরের যুগ্ম দর্শন মহাপুরুষজীর জীবনে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ঐ দর্শনের পর মহাপুরুষজী শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছাতে নিজের ইচ্ছা সম্পূর্ণভাবে মিলিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর মুখে শরীরত্যাগের প্রার্থনা আর কখনও শোনা যায়নি। ঠাকুরের আদেশকে তিনি মাথা পেতে নিয়েছিলেন এবং ঠাকুরের কাজের জন্য তাঁকে আরো প্রায় ছ-বৎসর স্থূল শরীরে থাকতে হয়েছিল। তখন থেকে তিনি সর্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টি নিয়ে জগতে ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অন্তরে বসে তাঁকে যন্ত্র করে সব কিছু করতেন। ঐ সময়ে বারাণসী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের জনৈক সাধু-কর্মীর প্রশ্নে তিনি সস্নেহে বলেছিলেন—"...ঠিক বুঝেছ, বাবা! এখানকার কথা শুনে চললে তোমার কল্যাণ নিশ্চয়ই হবে এখান থেকে যে সমস্ত কথা এখন বের হচ্ছে, সেসব ঠাকুরের কথা বলে জানবে। এখন ঠাকুরের সঙ্গে এক হয়ে রয়েছি।"

ঐ বৎসর কাশীতে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর জন্মতিথির দিন মধ্যাহ্নে পূজা ও

হোমান্তে তিনি কয়েকজন সাধু-কর্মীকে ব্রহ্মচর্যব্রতে এবং শেষরাত্রে কয়েকজন ব্রহ্মচারীকে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। তার চারদিন পর একাদশীতে মহাপুরুষজীর জন্মতিথির দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা—হোম, ভোগরাগ, গীতা-উপনিষদ্-পাঠ এবং সকলকে পরিতোষপূর্বক ভোজনের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ঐ দিন ভোরবেলা থেকে তিনি যেন দৈবভাবে আবিষ্ট হয়ে গরগর মাতোয়ারা ভাবে—সর্বক্ষণ চোখ বুজে সকলকে অক্লান্তভাবে আশীর্বাদ করে যাচ্ছিলেন। কারো মাথায় হাত দিয়ে, কারো বুকে হাত দিয়ে, 'ঠাকুরে ভক্তিলাভ হোক' বলে আশীর্বাদস্পর্শ দিয়ে সকলের অন্তর বিমলানন্দে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিলেন। যে তাঁর স্পর্শ পেয়েছে, সেই নিজেকে ধন্য মনে করেছে।

ঐ বারে কাশী সেবাশ্রমের মাঠে বেড়াবার সময় একদিন সন্ধ্যাবেলা মহাপুরুষজী ৺বিশ্বনাথের দর্শন পান এবং সে অবধি সর্বক্ষণ তাঁর মন উচ্চ ভাবভূমিতে বিচরণ করত।

স্বামীজীর উৎসবের সময় তিনি কাশীতেই ছিলেন এবং সেদিন প্রসঙ্গক্রমে কিভাবে স্বামীজীর ইচ্ছায় কাশী অদ্বৈত আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হলো তা বলেছিলেন। স্বামীজীর উৎসবের কয়েক দিন পর তিনি পাটনা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম পরিদর্শন উপলক্ষে সেখানে ৩।৪ দিন অবস্থান করেন। তাঁর শুভাগমনে পাটনাতে বিশেষ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল। পাটনায় বহু দীক্ষিত ভক্ত ছিল, তাছাড়া মহাপুরুষজীর কাছে অনেকে মন্ত্র-দীক্ষা পেয়ে পাটনায় বেশ রকমের একটি শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তগোষ্ঠী গঠন করেন, যা স্থানীয় আশ্রমের উন্নতির পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। তাঁর উপস্থিতি প্রত্যেক ভক্তহৃদয়ে আশা ও উদ্দীপনার পবিত্র বহ্নি জ্বালিয়ে দিয়েছিল। মহাপুরুষজী ১৯।২।২৮ তারিখে বেলুড় মঠে পৌঁছলেন।

* * *

ঐ সময় হতে মহাপুরুষজীর ভিতর যে গুরুশক্তি ও ঐশীভাবের বিকাশ হয়েছিল তা বাস্তবিকই অনুপম। কিন্তু তিনি নিজেকে শ্রীপ্রভুর দাস মাত্র বলে জানতেন এবং শ্রীঠাকুরের হাতের যন্ত্ররূপে কাজ করতেন। ঐ সময়ের (১০।৫।২৮) এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, ..."বৃদ্ধ শরীর। ঠাকুর প্রাণ-মনের পরিচালক—তিনিই আত্মা, ঈশ্বর—যতদিন ইহাদিগকে কাজ করাইবেন ততদিন করিবে, যখন তিনি বন্ধ করিতে ইচ্ছা করিবেন তখনই চুপ হইয়া যাইবে—এই জ্ঞান তিনি দয়া করিয়া পাকা করিয়া দিতেছেন, সুতরাং আমার চিন্তা নাই।"...

কাশী হতেই তাঁর রক্তের চাপ বেশ বেড়েছিল। তিনি ঐ সম্বন্ধে রহস্য করে

বলতেন—সাধুর বায়ু একটু চড়া থাকবে বইকি! ঐ সম্বন্ধে বেলুড় মঠে জনৈক সন্ন্যাসী একান্তে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—"মহারাজ, ডাক্তাররা আপনার বায়ুরোগ হয়েছে বলে ঠিক করেছেন। আমার তো তা মনে হয় না; এটা বোধ হয় কোন যোগজ ব্যাপার। কাশীতে আপনার কোন দর্শনাদি হয়েছিল কি? কেন না, কাশী থেকে আসার পর হতেই এর সূত্রপাত দেখছি।"

একথা শুনে তিনি খানিকক্ষণ মৌন থেকে বলেছিলেন—"হাঁ, কাশীতে এক শ্বেতকায় যোগিমূর্তি দেখি, তারপর থেকেই এই রকম হয়েছে।" তখন থেকে তাঁর মন সর্বদাই উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবভূমিতে বিচরণ করত—আহার নিদ্রাদি সম্বন্ধেও তিনি উদাসীন হয়ে গিয়েছিলেন।...

দিন দিন ভক্ত ও দীক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়ে চলেছিল। মহাপুরুষজী যেন 'মা গঙ্গা হয়ে গিয়েছিলেন—সকলকেই গ্রহণ করতেন, শ্রীরামকৃষ্ণচরণে অর্পণ করতেন। বলতেন, "ঠাকুরই সকলকে আকর্ষণ করে নিয়ে আসছেন আবার তিনিই আমার হৃদয়ে বসে সকলকে কৃপা করছেন। নইলে আমাকে দেখতে এত লোক আসবে কেন? আমার না আছে বিদ্যা বুদ্ধি, না আছে পাণ্ডিত্য, না বলতে কইতে পারি, না দেখতে শুনতে ভাল। তিনিই সকলকে কৃপা করবেন বলে আকর্ষণ করে নিয়ে আসছেন—মাঝখান থেকে আমি ধন্য হয়ে যাচ্ছি।" অবশ্য একদিন হাসতে হাসতে এও বলেছিলেন—"সকলেই মনে করছে এ বুড়োও এবার টেঁসবে, আর বেশিদিন নয়, তাই এত লোকের ভিড়! আরে, বাবা, রাখে কৃষ্ণ মারে কে? যতদিন ঠাকুর রাখেন ততদিন থাকতেই হবে।"...

মহাপুরুষজীর ভিতর আধ্যাত্মিক শক্তির এত বিকাশ হয়েছিল যে, তিনি যেন আর চাপতে পারেন না! যে আসে তাকেই নির্বিচারে মুক্তিমন্ত্র দিতেন। একদিন বিকালবেলা বিশ্রামের পর তিনি নিজের খাটের উপর পশ্চিমাস্য হয়ে বসে আছেন। কখনো চোখ বুজে ধ্যান করছেন, কখনো একটু চোখ মেলে সামনে দেয়ালে লম্বিত শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবিখানির দিকে তাকাচ্ছেন। পশ্চিমদিকের বারান্দার দরজা জানালা সব খোলা। চারদিক নিস্তব্ধ। ঘরের এক কোণে সেবক দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ মহাপুরুষজী মাথা তুলে সোজা হয়ে বসে ডান হাতটি ঘুরিয়ে গম্ভীরস্বরে উঠানের আমগাছটি দেখিয়ে বললেন, "দেখ, এর ভিতর এখন এত শক্তি এসেছে যে, যদি ঐ গাছটিকে বলি—'তুই মুক্ত হয়ে যা' তো সেও মুক্ত হয়ে যাবে। যে দিকে তাকাই সব মুক্ত করে দিতে পারি।" এইমাত্র বলেই আবার মাথা নিচু করে ধ্যানস্থ হয়ে পড়লেন। ঐ ভাবে অনেকক্ষণ ছিলেন।

একেই বোধ হয় কৃপাদৃষ্টি বলা হয়—দৃষ্টির দ্বারা কৃপা করা। এর কিছুকাল

পরে জনৈক দীক্ষাপ্রার্থিনী মহিলার প্রার্থনার উত্তরে তিনি বলেছিলেন—"কেন, মা, আমি তো তোমাকে আগেই কৃপা করেছি।" মহিলাটি একটু সঙ্কুচিতভাবে বললেন—"না, বাবা, আপনি তো এর আগে আমায় দীক্ষা দেননি!" তখন মহাপুরুষজী বললেন, "সেদিন বিকালে তুমি যখন ঘড়ির নিচের সিঁড়ির উপর থেকে আমাকে দেখছিলে এবং মনে মনে প্রণাম করেছিলে তখনই আমি তোমার প্রণাম গ্রহণ করে তোমার দিকে তাকিয়ে তোমাকে কৃপা করেছি। তা মন্ত্র নিতে চাও তো ঠাকুরের নাম শুনিয়ে দেব।" পরে একদিন তিনি সে মহিলাটিকে মন্ত্র দীক্ষা দিয়েছিলেন। মহিলাটিও তাতে খুবই আনন্দিতা হন।

Saint Paul বলেছিলেন— "It's not I who is living, but Christ liveth in me."—আমি যে বেঁচে আছি তা তো আমি নই, যিশুই আমার ভিতর বেঁচে আছেন। মহাপুরুষজীর তৎকালীন অবস্থা সম্বন্ধে সেন্ট পলের উক্তিটি সর্বাংশে প্রযোজ্য। বাস্তবিক পক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণই মহাপুরুষজীর অন্তরাত্মারূপে তাঁর দেহের মধ্যে ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীই মহাপুরুষজীর মুখ দিয়ে বের হতো। শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাই প্রতিভাত হতো মহাপুরুষজীর দৃষ্টির ভিতর দিয়ে কৃপাদৃষ্টিরূপে। শ্রীরামকৃষ্ণই তাঁর দেহ-মনকে চালিত করতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব অপরের মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি সংক্রমণ করতে পারতেন, জীবকে মুক্তি দিতে পারতেন—কারণ তিনি সর্বশক্তিমান ভগবান। তাঁর জীবনের অনেক ঘটনাই তাঁর ঐ ঐশী শক্তি প্রমাণ করে। মহাপুরুষজীও একস্থানে লিখেছিলেন, ..."তাঁর ঐ উচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তি প্রমাণ করতে আজও আমি বেঁচে আছি।" শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সে শক্তিই মহাপুরুষজীকে যন্ত্র করে হয়েছিল সক্রিয়। তিনিও সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তাঁর পাকা জ্ঞান ছিল যে, তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের হাতের একটি সামান্য যন্ত্রমাত্র।

ক্রমে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ এসে গেল। ঐ খ্রিস্টাব্দে শ্রীঠাকুর তাঁরই অন্যতম পার্ষদ মহাপুরুষজীকে যন্ত্র করে তাঁর ভাবী মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করালেন। শ্রীঠাকুরের একটি বিরাট মন্দিরের পরিকল্পনা নিয়ে স্বামীজী স্বামী বিজ্ঞানানন্দের সাহায্যে ঐ ভাবী মন্দিরের একটা নক্সা করিয়েছিলেন এবং এও বলেছিলেন, "এ মন্দির পরে হবে—আমি উপর থেকে দেখব।" তাঁর আকস্মিক দেহত্যাগের জন্য ঐ মন্দির-নির্মাণ তখন সম্ভব হয়নি। তারপর প্রায় ত্রিশ বৎসর কেটে গেল, ঐ মন্দির নির্মিত হয়নি। স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ যতদিন জীবিত ছিলেন, তিনি বেলুড় মঠে এলেই মাঝে মাঝে ঐ নক্সাখানি দেখতেন এবং বলতেন—"তাই তো, স্বামীজীর পরিকল্পিত মন্দির এখনো তো হলো না!" এদিকে শ্রীঠাকুরের সাক্ষাৎ পার্ষদদের মধ্যে অনেকেই

দেহরক্ষা করেছেন। এসব ভেবে সঙ্ঘের প্রবীণগণ ঠিক করলেন যে, মন্দির যখনই হোক হবে, কিন্তু মহাপুরুষজীকে দিয়ে অন্তত পরিকল্পিত শ্রীমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করিয়ে রাখতে হবে। সেভাবে অনুরুদ্ধ হয়ে (১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে) শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভ জন্মতিথির দিন মহাপুরুষজী বেলুড় মঠ প্রাঙ্গণের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে শ্রীমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করেন। ঐ উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবিত শিষ্যদের মধ্যে স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ও মাস্টার মশাই প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত ছিলেন। মহাপুরুষজী ঐ ভিত্তিপ্রস্তর খণ্ডটি পরম ভক্তিভরে পূজা করে বহু সাধুভক্ত কণ্ঠোত্থিত 'শ্রীগুরুমহারাজজী কি জয়' ধ্বনির মধ্যে যথাস্থানে স্থাপন করে* বিহ্বলপ্রাণে ঊর্ধ্বদৃষ্টি হয়ে করজোড়ে দুটিমাত্র কথাতে শ্রীঠাকুরের চরণে কাতর প্রার্থনা জানিয়েছিলেন—"ঠাকুর! মান রেখো।"

শ্রীঠাকুর সে প্রার্থনা শুনেছিলেন, তাঁর মানও রেখেছিলেন। মহাপুরুষজীপ্রোথিত ঐ ভিত্তিপ্রস্তরের উপরেই কয়েক বৎসরের মধ্যে আশ্চর্য উপায়ে স্বামীজী-পরিকল্পিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঐ বিরাট মন্দির নির্মিত হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরের ভিত্তিস্থাপনের বিবরণ মাসিক 'প্রবুদ্ধ ভারত' ও 'উদ্বোধন' পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রভিডেন্স বেদান্তপ্রচার কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী অখিলানন্দ ঐ খবরটি বেদান্ত সোসাইটির কোন কোন সদস্যকে পড়ে শোনান। তাতে মিস রুবেল নাম্নী জনৈকা মহিলা-ভক্ত সদস্যের প্রাণে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি হয়। তিনি ঐ মন্দির-নির্মাণের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তারপর যথাসময়ে কার্যকরী নক্সা প্রস্তুত ও আনুমানিক ব্যয় নির্ধারিত করে ঐ প্রস্তর-মন্দিরের নির্মাণকার্য আরম্ভ হয় এবং ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জানুয়ারি শুভদিনে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের স্বামীজী-পরিকল্পিত মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মহাপুরুষজীর ঐ ভিত্তিস্থাপনের দশ বৎসরের মধ্যেই শ্রীঠাকুর ঐ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হন।...

* * *

ব্রহ্মজ্ঞের সর্বজীবে ব্রহ্মদর্শন-বর্ণনা-প্রসঙ্গে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ বলেছেন—

"ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ ॥"

অর্থাৎ তুমি নারী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার আবার তুমিই কুমারী; তুমি জরাভার

---

* তখনও মন্দির-নির্মাণের স্থান নির্বাচিত হয়নি। সে জন্যই মঠপ্রাঙ্গণের একপাশে গোলাপ বাগানের এক কোণেই ঐ ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। পরে মন্দিরের স্থান নিরূপিত হতে মহাপুরুষজী-পূজিত ঐ ভিত্তিপ্রস্তরই ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে গুরুপূর্ণিমার দিন সকালবেলা স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ নির্বাচিত স্থানে পুনঃস্থাপিত করেন।

বহন করে দণ্ডহস্তে স্খলিতপদে চলেছ বৃদ্ধের সাজে, আবার তুমিই নবীন জীবনের ভূয়িষ্ঠ সম্ভাবনা নিয়ে নবজাতকরূপে পৃথিবীর বুকে দেখা দিচ্ছ নানা দেহে নানা আকারে।

উপনিষদ্ বলেছেন—"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" ব্রহ্মদ্রষ্টা পুরুষ শুধু মানুষের মধ্যেই ব্রহ্মদর্শন করেন না, পরন্তু সকল প্রাণীতে সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন করেন। তেমনি ঈশ্বরদ্রষ্টা ভক্তও সর্বভূতে একই ভগবানের বিভিন্ন রূপ দেখেন। উপনিষদ্ আরো বলেছেন—আত্মচৈতন্যকে ভূতে ভূতে পরিব্যাপ্ত দেখতে পেলে তবেই যথার্থ তিনি ধীর। ঠাকুর দেখেছিলেন কোষা-কুষি, পূজার উপচার, দালান—সব চিন্ময়। তাঁরই পার্ষদ মহাপুরুষজীরও সর্বত্র সেই চৈতন্যেরই স্ফূর্তি হতো। একদিন গভীর রাত্রে তাঁর ঘরে একটি বিড়াল মিউ মিউ করে ডাকতেই তিনি হাতজোড় করে বিড়ালের উদ্দেশ্যে প্রণাম করলেন এবং নিকটস্থ সেবককে বললেন, "দেখ, ঠাকুর আমায় এমন অবস্থায় রেখেছেন যে, সবই দেখছি চিন্ময়—ঘর-দোর বিছানাপত্র এবং সব প্রাণীর ভিতরই সেই এক চৈতন্যের খেলা।"

একবার মহাপুরুষজীর নারীমাত্রকেই বিবিধ উপচারে পূজা করবার ইচ্ছা হলো। বিশেষত কুমারীদের। সেজন্য সব সময়েই শাড়ি, সিন্দূর, শাঁখা, ফল-মিষ্টান্নাদি মজুত রাখতে হতো। তিনি কুমারীমাত্রকেই কন্যারূপিণী মহামায়াজ্ঞানে পূজা করতেন। বলতেন, "দেখলাম, সবই মা—'স্ত্রিয়ঃ সমস্তা সকলা জগৎসু'।"

তাঁর ঘরে বিছানার পাশে দেয়ালে কালী, দুর্গা, চামুণ্ডাদেবী, কন্যাকুমারী ও হংসেশ্বরী মাতার পট টাঙানো থাকত। তিনি সকলকে প্রণাম করতেন এবং প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে, হংসেশ্বরীর মন্দিরে, কালীঘাটে, বরাহনগরের কালীমন্দিরে পূজাদি পাঠাতেন এবং মঠেও রটন্তী ও ফলহারিণী কালিকাপূজার ব্যবস্থা করতেন। আবার নিস্তব্ধ নিশিথে শিবাবলি দ্বারা শিবারূপিণী জগন্মাতার অর্চনা করতেন। এইভাবে জগন্মাতার আরাধনা চলেছিল তিন-চার বৎসর।

ঐ সময় সাধু, ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরনারী যে-ই তাঁকে প্রণাম করতে আসত, তিনি তাদের দেখামাত্রই আগে থেকে প্রণাম করতেন। তাতে শিষ্যস্থানীয় দর্শকদের মনে কষ্ট হতো। তা শুনে তিনি বলতেন—"কি করব রে! ঠাকুর যে আমায় এখন এভাবেই রেখেছেন—তোদের ভিতর যে সাক্ষাৎ নারায়ণকে দেখি, তাই তো প্রণাম করি।" তা শুনে সকলেই স্তম্ভিত হয়ে যেত। ছাদে পক্ষিরূপী নারায়ণদের সেবা চলত, কুকুররূপী নারায়ণদের সেবাতেও উৎসাহ কম ছিল না। গরিব-দুঃখী আর্ত-নারায়ণদের সেবাতেও তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। তাঁর এইসব ভাবাবেশ সকলের বিস্ময়ের কারণ হয়েছিল।...

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে রাজা মহারাজের জন্মদিনে তিনি মহারাজের ভাবে খুবই বিহ্বল হয়ে পড়লেন। মহারাজের ছবি আনতেই তিনি হাত বাড়িয়ে নিয়ে মহারাজকে কতভাবে প্রণাম করলেন—কখনো মাথায় নিচ্ছেন, কখনো বুকে করছেন, কখনো বলছেন, "দেখছো, কেমন রাজার মতো চেহারা! তিনিই তো আমাদের রাজা—আমরা তাঁর আজ্ঞাবহ।" পরে মহারাজের ছবির সামনে করজোড়ে বলছেন—"জয় মহারাজ, এসব ছেলেদের তয়ের করে দাও। মহারাজেরই তো এই মঠ, আমরা তাঁর দাস—এটি যেন সর্বদা মনে থাকে।" পরে সেবকের দিকে মুখ করে বললেন "মহারাজ ঠাকুরের মানসপুত্র—ঈশ্বরকোটী। ঠাকুর আমাকেও এবার ঈশ্বরকোটী করে দিয়েছেন।...মহারাজ এখন ঠাকুরের কাছে আছেন। আমরাও দেহত্যাগ করে ঠাকুরের কাছে যাব—রামকৃষ্ণলোকে বাস করব। মহারাজের সঙ্গে এখানে যেমন ছিলাম, ওখানে গিয়েও তেমনি থাকব।" এই কথা বলেই খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন।...

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে অক্টোবর মাসে রক্তের চাপবৃদ্ধির দরুন মহাপুরুষজীর একটা mild stroke (মৃদু আক্রমণ) হয়েছিল। তার কিছুদিন পূর্ব হতে, তাঁর খুব বেশি ভাবাবেশ হতো। তাঁর ব্যাধি-জর্জরিত স্থবির অথর্ব শরীর ঐ ভাবাবেশের তোড় যেন আর সইতে পারছিল না। একদিন অনেকক্ষণ ভাবে গরগর মাতোয়ারা থেকে তিনি পরে বলেছিলেন—"যেন একটা ডাকাত ঢুকেছিল। কালীকীর্তন হতেই ছেড়ে গেল। বাপরে বাপ! শরীরটা যেন তছনছ করে দিয়ে গেছে! এ রকম ভাব ঠাকুরের হতো। আমি তো তাঁরই সন্তান। 'কুছ নেহী তো থোড়া থোড়া' তো আছে।...আমরা এসব ব্যাপার একটু একটু বুঝি। বড়জোর আর তিন-চার বছর চলবে।" পরে একটু থেমে নিজের মনেই বললেন, "ঠাকুর, এমন কাউকে রাখলে না যে, দুটি মনের কথা বলি। সুধীরটুধীর (স্বামী শুদ্ধানন্দ)—এরা তো ছেলে মানুষ। থাকতেন মহারাজ, হরি মহারাজ, শরৎ মহারাজ তো তাঁরা এসব বুঝতেন। আমারও প্রাণ খুলে দুটি কথা বলে আনন্দ হতো।" ঐদিন অনেকক্ষণ গম্ভীর হয়ে ছিলেন। কেউ কাছে যেতে সাহস করছিল না।

Mild stroke-এর ফলে তাঁর ডান চোখের কোণে একটু রক্ত জমেছিল এবং ডান হাতটা একটু যেন অবশ হয়েছিল। কয়েক দিনের চিকিৎসাতে তা প্রায় সেরে যায়। তার কিছুদিন পরে intestinal paralysis (আন্ত্রিক অসারতা)-এর মতো হয়েছিল, বাহ্যে কিছুতেই হতো না। ২০।২৫ দিন তাতে খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। অথচ দীক্ষাপ্রার্থীর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছিল। তিনি কাউকে ফেরাতেন না। ঐ অসুস্থ শরীরেও অনেককে দীক্ষা দিয়ে সেবককে লক্ষ্য করে বলেছিলেন—"ঠাকুর বলতেন, 'এক-আধজনকে দেখে শুনে দিতে হয়।' কিন্তু এখন তো একেবারে বাঁধ ভেঙ্গে গিয়েছে।

তিনি কেন যে এত লোককে নিয়ে আসেন তা তিনিই জানেন। তাঁর ইচ্ছা আমি আর কি করব বল?" আবার কখনো বলতেন—"এ ভাঙ্গা ঢাক আর কত বাজবে?"

তাঁর শরীরের ঐ অবস্থা দেখে জনৈক মহিলা-ভক্ত কেঁদে কেঁদে বললেন—"বাবা, আপনার যা শরীরের অবস্থা! আমরা দাঁড়াব কোথায়?" করুণাবিগলিত কণ্ঠে তখনই অভয় দিয়ে বললেন—"তোদের কিছু ভয় নেই। ঠাকুর রয়েছেন, সব দেখছেন। মুক্তি-ফুক্তি সব হয়ে যাবে। তোদের সবাইকে ঠাকুরের পাদপদ্মে অর্পণ করেছি, তিনি গ্রহণও করছেন। আমরা তো তাঁর পাদপদ্ম ছুঁয়েছি। তাঁর উপর আমাদের জোর আছে। আমরা যাদের পাঠাই তাদের তিনি ফেরান না। তোদের কোন চিন্তা নেই। শুধু ঠাকুরকে ধরে থাক।"

একদিন ঢাকার জনৈক ভক্ত অনেক ফল মিষ্টান্নাদি নিয়ে প্রণাম করছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বললেন—"থামো, থামো।" এবং সেবককে ডেকে ফল মিষ্টান্নাদি সব ঠাকুর ভাণ্ডারে দিতে বলে ভক্তটির দিকে করুণাদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "এখন প্রণাম করতে পার।" ভক্ত প্রণাম করে যখন বললেন—"মহারাজ, আশীর্বাদ করুন।" তিনি সঙ্গে সঙ্গে আবেগভরা কণ্ঠে বললেন— "আশীর্বাদ তো সব সময় আছে—always flowing flowing flowing (বয়ে যাচ্ছে)। আশীর্বাদ ছাড়া আর কিছু নেই। ঠাকুর যখন এ শরীর দ্বারা তোমাদের তাঁর পাদপদ্মে আশ্রয়ে দিয়েছেন, তখন তোমাদের কোন চিন্তা নেই। মুক্তি অনিবার্য। ঠাকুর তোমাদের গ্রহণ করেছেন। কিছু কর আর না কর—মুক্তি হবেই। আমার যা কিছু করার সেই এক সময় (দীক্ষা দেবার সময়ই) করে দেই। তোমরা কিছু কর আর না কর—মৃত্যুর পরে শ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে স্থান পাবেই। কিছু ভাবনা নেই। সব হয়ে যাবে। তাঁকে ধরে থাক। অমনি বলছি যে তা নয়। ঠিক ঠিক ঠিক।"—এই বলেই গম্ভীর হয়ে গেলেন।

শারীরিক অসুস্থতা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। দিনে রাত্রে ঘুম আদৌ নেই, তিনি নানা ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ নিয়েই থাকেন। উপনিষদ্, গীতা, ভাগবত, চণ্ডী, কথামৃত—এসব নিত্য পড়ে শোনানো হয়। ঐ সব নিয়েই গভীর রাত্রেও আলোচনা চলে। ডাক্তাররা বলেন—বায়ুর চাপবৃদ্ধির জন্যই এসব হয়। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের শেষ ভাগে blood pressure (রক্তের চাপ) বেড়ে ২৭৫ পর্যন্ত উঠেছিল। ডাক্তার ঘন ঘন জোরাল জোলাপ দেন—তাতে শরীর আরো দুর্বল হয়। কিন্তু তার মধ্যেও দীক্ষা বন্ধ করেন না। সাধু-ভক্তদের জন্য সব সময় অবারিত দ্বার। তার উপর আবার জোর হাঁপানিও আছে। তিনি ওসব গ্রাহ্য করেন না, সেবকদের বারণ মানেন না। বলেন—"ঠাকুর ক্যান্সার রোগের সময়ও কত লোককে কৃপা করেছিলেন, কাউকে ফেরাননি। আর আমি ঠাকুরের বাচ্চা হয়ে লোকজনকে ফেরাব?"

সেবকদের ধমকে বলেন—"কাউকে আসতে বাধা দিও না। সকলে আসবে—প্রণাম করবে। যারা প্রণাম করবে তাদেরই পরম কল্যাণ হবে।" অন্য একদিন বললেন—"কেন আছি? খেয়ে সুখ নেই, বসে সুখ নেই—তবু তাঁর ইচ্ছায় লোকের কল্যাণ হচ্ছে শুনে বড় আনন্দ হয়। এ শরীর থাকলে যদি লোকের কল্যাণ হয়, আর তাই যদি মায়ের ইচ্ছা হয় তো হোক।"

রক্তের চাপ অত্যধিক বাড়ার দরুন ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে ৩০ জানুয়ারি শ্রীপঞ্চমীর দিন শেষ রাত্রি ৪-৩০টা থেকে নাক দিয়ে রক্ত পড়তে থাকে। রক্তপড়া আর থামে না। টস-টস করে বেশ টাটকা রক্ত ৪।৫ আউন্স পড়ল। তিনি তা দেখে বালকের মতো আনন্দ করে বললেন—"রক্ত বেড়েছে কিনা তাই পড়ছে।" আবার ৭-৩০/৮টার সময়ও রক্ত পড়ল। কিন্তু তিনি দীক্ষা বন্ধ করলেন না। আগে থেকেই কথা দেওয়া ছিল—সেবকদের বারণ মানলেন না। বললেন—"কেন? এখনো তো কথা বলতে পারছি!" তিনি দীক্ষা দিলেন বেশ সহজভাবে সোজা হয়ে বসে, যেন নীরোগ শরীর—অন্য মূর্তি, অসুখের কোন চিহ্ন নেই। খুব গম্ভীর ও স্পষ্ট স্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করলেন—কত আশীর্বাদ করলেন।

ডাক্তার অজিতবাবু এসে পরীক্ষা করে বললেন—বেশি ব্লাড প্রেসারের দরুন কোন জায়গায় শিরা ছিঁড়ে গিয়ে নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে, রক্ত বেরিয়ে যাওয়াটা ভাল। ঐ শিরাটি যদি মাথার শিরা হতো তো খুবই ভয়ের কারণ ছিল। ডাক্তারবাবু নাক প্লাগ করে দেবার কথা বললেন। মহাপুরুষজী রাজি হলেন না। লিকুইড ডায়েটের ব্যবস্থা হলো আর পূর্ণ বিশ্রাম—কথাবার্তা বন্ধ। ডাক্তার চলে যাবার পর তিনি ভক্তদের সঙ্গে সামান্য কথাবার্তা বলতেন। দীক্ষাও দিতেন কিছু কিছু। এভাবে বিশ-বাইশ দিন নাক দিয়ে রক্ত পড়েছিল, কোন কোন দিন দু-তিন বারও। ডাঃ নীলরতন সরকারও দেখেছিলেন এবং কয়েক রকমের ঔষধ দিয়েছিলেন। এত বড় অসুখ—সকলেই উদ্বিগ্ন, কিন্তু তাঁর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি সদানন্দময়—যে আসছে তাকেই আশীর্বাদ করছেন, সব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন!

* * *

মহাপুরুষজী দিব্যভাবে আরূঢ় হয়ে দৈবী কৃপা দু-হাতে বিতরণ করে যাচ্ছেন, তাতে এতটুকু ক্লান্তি নেই। এদিকে শরীরের তো এমন অবস্থা—নিজের চেষ্টায় বিছানাতে বসতেও পারেন না, বিছানা থেকে নামা তো দূরের কথা। শয়নাবস্থা থেকে সেবক তাঁকে বিছানায় বসিয়ে দেয় আবার সেবকই তুলে ধরে বিছানা থেকে নামিয়ে দেয়। চব্বিশ ঘণ্টাই সেবকের দরকার।

১০।১২ জন সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারী পালাক্রমে দু-জন করে সর্বক্ষণ তাঁর সেবাতে নিযুক্ত থাকেন। একদিন বিকালবেলা সন্ধ্যার পূর্বে তিনি সেবককে বললেন—"আমাকে ধরে নামাও তো। একবার গঙ্গাদর্শন করতে যাব।" অন্য কোন সেবক তখন সেখানে ছিল না, তাই সেবক একাই তাঁকে বিছানা থেকে নামিয়ে দাঁড় করাল। তিনি সেবকের কাঁধে একহাত রেখে ধীরে ঘরের বাইরে এসে স্বামীজীর ঘরের পাশে থামলেন। স্বামীজীর উদ্দেশে হাতজোড় করে প্রণাম করে আবার সেবকের কাঁধে হাত রেখে উপরের গঙ্গার ধারের বারান্দায় এসে রেলিং ধরে গঙ্গামুখো হয়ে দাঁড়ালেন—খুব অন্তর্মুখ ভাব। একটু পরে ক্রমে দক্ষিণেশ্বর, কাশীপুরের শ্মশান ও গঙ্গার উদ্দেশে হাতজোড় করে প্রণাম করলেন। তখন ঠিক সন্ধ্যা হয়েছে, মন্দিরে আরাত্রিকের ঘণ্টাও বেজেছে। তিনি চুপচাপ মাথা নিচু করে গঙ্গামুখো হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। হঠাৎ একহাত তুলে নিজের দিকে ইঙ্গিত করে গম্ভীর স্বরে সেবককে বললেন, "দেখ, এটা মুক্ত শরীর, মুক্ত শরীর—যে দেখবে সেও মুক্ত হয়ে যাবে।" এই মাত্র বলেই তিনি পুনরায় রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। সেবকের মনে হলো যেন দৈববাণী হচ্ছে। এ দৈববাণী আর কেউ শুনতে পেল না! তখন ওখানে আর কেউ উপস্থিত ছিল না, স্বামীজীর ঘরের পাশে এক কোণে একটি যুবক ভক্ত মাত্র দাঁড়িয়েছিল—দেখা গেল।

একটু পরেই সেবকের কাঁধে হাত রেখে ধীরে ধীরে মহাপুরুষজী নিজের ঘরে ফিরে এসে সেবকের সাহায্যে খাটে বসলেন। তখন মন্দিরে আরাত্রিক আরম্ভ হয়েছে। মহাপুরুষজীও চুপচাপ বসে রইলেন—আর কোন প্রসঙ্গ হলো না।

* * *

১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ পড়তেই মহাপুরুষজীর মন আরো যেন বেশি দিব্যলোকচারী হয়েছিল। ধ্যানে সপ্তর্ষিমণ্ডলে চলে যেতেন। অশরীরী বাণী শুনতেন, দিব্যদেহধারীদের দর্শন করতেন। দিনরাত ঘুম আদৌ ছিল না, অল্পেতেই গভীর ধ্যানস্থ হয়ে পড়তেন। শরীর ক্ষীণ, শিথিল ও উত্থান শক্তি রহিত, অথচ সেদিকে তাঁর আদৌ ভ্রূক্ষেপ নেই। তাঁর মন সর্বদা বিচরণ করত দিব্যলোকে। তিনি দিব্যানন্দে ছিলেন। শরীরের সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস করলে বলতেন—"শরীরের জন্য কোন চিন্তা নেই; যে সাধু শরীরের জন্য ব্যস্ত, মরতে ভয় করে, সে সাধুই নয়। I am always ready for His call.—(আমি তাঁর আহ্বানের জন্য সদাই প্রস্তুত) গুরুকৃপায় পাকা জ্ঞান হয়ে গিয়েছে যে, এ শরীরটা আমি নই।" অন্য সময় বলেছিলেন—"আজকাল একটা ভারি মজা দেখছি। এটাকে (শরীরকে) অবলম্বন করে দুটো ব্যাপার চলছে—একটা শরীরের আর একটা আত্মার। শরীরের দিক

থেকে নানা ব্যাধি ইত্যাদি, আর আত্মার দিক থেকে নির্মল আনন্দ—বেশ আনন্দ হয় দেখে আর ভেবে।"

জনৈক সেবক মঠের সর্বত্র ঘুরে মঠবাসীদের, গরু-বাছুর ও বাগ-বাগিচার সব খবর নিয়ে প্রতিদিনের মতো সন্ধ্যার পূর্বে তাঁর কাছে গিয়ে একে একে সব খবর বলতে আরম্ভ করল, কিন্তু সেদিন তিনি ঐ সব শুনতে কোন উৎসাহ প্রকাশ করলেন না। তিনি খুবই অন্তর্মুখ—চুপচাপ মাথা নিচু করে বসে আছেন হঠাৎ বলে উঠলেন—"দে দে, আমায় বিশ্বনাথের বিভূতি পরিয়ে দে। আহা! আহা! এই যে ঠাকুর এসেছেন, মহাদেব এসেছেন।...তোরা দেখতে পেলিনি। এই যে চলে গেলেন।" বলতে বলতে গভীর ধ্যানস্থ হয়ে পড়লেন—অনেক ডাকাডাকিতে বেশি রাতে ধ্যান ভঙ্গ হয়। সাধারণত শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগ নামার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর খাবার দেওয়া হতো। সেদিন ঠাকুরের ভোগ নেমেছে—পঙক্তির ঘণ্টা পড়েছে, কিন্তু তখনো ধ্যানস্থ। এদিকে ডাক্তার সেবকদের বলেছিলেন যে, তাঁকে বেশি ধ্যান করতে দেবেন না। বেশি ধ্যান করা তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। সেজন্য সেবক বারবার ডেকে তাঁর ধ্যানভঙ্গ করে। ধ্যান ভাঙতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "ঠাকুরের ভোগ নেবে গিয়েছে?" তিনি ভোগ নামার ঘণ্টা প্রভৃতি কিছুই শুনতে পাননি। সে রাত্রে খাওয়ার সময়ও বেশ আনমনা ছিলেন। এর পরেও ডাক্তারের পরামর্শ মতো কয়েকবার তাঁকে ধ্যান থেকে ব্যুত্থিত করতে হয়েছিল। ঐ কালে রাত্রে তাঁর আদৌ ঘুম হতো না। তিনি বলতেন, "যোগী আবার ঘুমাবে কি?" আবার গান ধরতেন—

"ঘুম ভেঙ্গেছে আর কি ঘুমাই, যোগেযাগে জেগে আছি।
যোগনিদ্রা তোরে দিয়ে মা, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি।"

কখনও বলতেন—"ধ্যানের এমন অবস্থা আছে, যে স্তরে মন গেলে আর ঘুমের দরকার হয় না। ঐ ধ্যানের অবস্থাতেই মনের বিশ্রাম হয়ে যায়। আমি কখনো মনকে সে অবস্থাতে তুলে নিয়ে বেশ আনন্দে থাকি। ও এক রকমের সমাধি।" আর একদিন বিকালবেলা হঠাৎ বললেন—"এইমাত্র স্বামীজী ও মহারাজ এসেছিলেন আর বললেন—'চলুন, তারকদা'। তোরা দেখতে পেলিনি? এই যে সামনে দাঁড়িয়েছিলেন।"...

রাত্রে ঘুম হতো না বলে মহাপুরুষজী সকালে সকলের সঙ্গে দেখাশুনার পর ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে একটু শুতেন—সেবকরা গা-হাত-পা টিপে দিত, তিনি খানিকক্ষণ শুয়ে থাকতেন; ঐ সময়ে কোন কোন দিন একটু ঘুমও হতো। দ্বিজেন মহারাজ (স্বামী গঙ্গেশানন্দজী) মাথাটি টিপে দিতেন। তিনি মাথা টিপে দিতে দিতে মহাপুরুষজীকে ঘুম পাড়িয়ে দিতেন।

মার্চ মাসের মাঝামাঝি। ঐদিনও মহাপুরুষজী সকালে একটু শুয়েছেন, দ্বিজেন মহারাজ প্রভৃতি ৩।৪ জন সেবক তাঁর সেবায় রত। তিনি চুপচাপ শুয়ে আছেন মনে হলো যেন একটু ঘুমুচ্ছেন। এভাবে আধ ঘণ্টা কেটে গেল। হঠাৎ তিনি ডুকরে কেঁদে উঠলেন! সেবকরা সকলেই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। ৪।৫ মিনিট ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে তিনি আবার চুপ হয়ে গেলেন। মনে হলো তিনি আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন। তারপর যথাসময়ে বসিয়ে দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করতে দরজা-জানালা খুলে মহাপুরুষজীকে বিছানায় বসিয়ে দেওয়া হলো। তখনো তিনি খুব গম্ভীর হয়ে আছেন। একথা-সেকথার পর দ্বিজেন মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন—"আপনি ঘুমোতে ঘুমোতে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিলেন কেন? কোন কষ্ট হচ্ছিল কি?" মহাপুরুষজী মাথা নিচু করে ধ্যান করার মতো বসেছিলেন। মাথা তুলে বললেন—"কেঁদে ছিলুম নাকি? একটু থেমে বললেন—স্বামীজী এসেছিলেন। তাঁর কি দিব্যোজ্জ্বল মূর্তি! তিনি বললেন—'তারকদা, আমিই তো বুদ্ধরূপে এসেছিলাম, আর তুমি এসেছিলে আনন্দরূপে। সেসব কথা তোমার মনে পড়ছে? এবার খেলা সাঙ্গ হলো—এখন চল। আর কেন?' বলেই স্বামীজী অন্তর্ধান করলেন। স্বামীজী চলে যেতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। নিজেকে সামলাতে পারিনি, তাই কেঁদে ফেলেছিলাম।" খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—"স্বামীজী ডেকেছেন—এবার যেতে হবে।" বলেই মহাপুরুষজী মাথা নিচু করে ধ্যানস্থ হলেন। সেবকগণ নীরবে চোখের জল ফেলতে লাগল—দ্বিজেন মহারাজও শুকনো মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সেদিন থেকে মহাপুরুষজীর ব্যবহারে এক অদ্ভুত গাম্ভীর্য দেখা দিয়েছিল। সব কিছুতেই ঔদাসীন্য। একদিন বললেন—"ওঃ, আজকাল রাতগুলো কি আনন্দে কাটছে! মহারাজ, হরি মহারাজ প্রভৃতির দর্শন পেয়েছি।" অন্যদিন বললেন—"খুব গভীর ধ্যান হয়েছিল—সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছিলাম। এ সব রাজ্য ছেড়ে মন চলে গিয়েছিল অতি ঊর্ধ্বে সপ্তর্ষিমণ্ডলে, সেখানে স্বামীজী রয়েছেন দেখলাম।...বেশ আনন্দে ছিলাম।"...

তখন থেকে মহাপুরুষজী আশীর্বাদময় হয়ে গিয়েছিলেন, প্রত্যেককেই গভীর আবেগভরে আশীর্বাদ করতেন। ঐ আশীর্বাদ পেয়ে আনন্দে প্রত্যেকের প্রাণ মন ভরে যেত। একজন প্রবীণ সাধু প্রণাম করে দাঁড়াতেই তিনি বললেন—"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" সন্ন্যাসী কাতর প্রার্থনা জানালেন—"মহারাজ, আশীর্বাদ করুন আমারও যেন সে অনুভূতি হয়।" তিনি তখনই সোজা হয়ে বসে বললেন—"আলবত হবে—এই জীবনেই হবে। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছি তোমার ভিতরও এ 'ব্রহ্মজ্ঞান' আসুক।" সন্ন্যাসী ভক্তিনম্র মস্তকে সেই আশীর্বাদ ধারণ করে চলে গেলেন। সন্ন্যাসী চলে যেতেই তিনি আবার বললেন—"তোমাদের ব্রহ্মজ্ঞান হবে

বইকি? ঐ জ্ঞান দেবেন বলেই তো ঠাকুর তোমাদের তাঁর পবিত্র সঙ্ঘে আশ্রয় দিয়েছেন। ঠাকুরের ঘরের সাধুদের সকলেরই ব্রহ্মজ্ঞান হবে।"...

একদিন বিকালবেলা একজন প্রবীণ সাধু প্রণামান্তে হাতজোড় করে বললেন—"মহারাজ, এত কাল তো কেটে গেল, এখনো তো কিছু হলো না!" শুনেই মহাপুরুষজী দৃপ্তকণ্ঠে বললেন—"যতীন, এসব কি বলছ?—হবে, হবে—নিশ্চয় হবে। আমি বলছি হবে—আমার কথা বিশ্বাস কর। আমরা হক কথা বলি, লোক ঠকাতে আসিনি। ঐ ভক্তি দেবেন বলেই তো ঠাকুর তোমাকে কৃপা করেছেন। মা তোমায় কৃপা করেছেন। মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ তোমায় কৃপা করেছেন। আমরা কত ভালবাসি তোমাকে! পড়ে থাক তাঁর দুয়ারে, তিনি তোমার অন্তর ভক্তি-বিশ্বাসে পূর্ণ করে দেবেন।" সন্ন্যাসী কাঁদতে কাঁদতে মহাপুরুষজীকে পুনরায় প্রণাম করতে তিনি দু-হাত তাঁর মাথায় দিয়ে খুব আশীর্বাদ করলেন। সন্ন্যাসীর প্রাণ ভরে গেল, তিনি চোখের জল মুছতে মুছতে চলে গেলেন।

ঐ সময়ে মহাপুরুষজীর নির্লিপ্তভাব দেখে মঠের সাধুদের ভয় হলো—তিনি দেহরক্ষা করবেন, সাধুরা নিরাশ্রয় হবে। একদিন বিকালবেলা ৩টার পর মহাপুরুষজী পশ্চিমাস্য হয়ে বালিশ কোলে করে বসে আছেন। শরীর খুবই দুর্বল। উদাসপ্রাণে মলিনমুখে সেবক পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি হঠাৎ সেবকের দিকে তাকিয়ে স্নেহবিগলিত কণ্ঠে বললেন—"তুমি কিছু বলবে?" তাঁর কথা শুনেই সেবক কাঁদতে কাঁদতে বলল—"আমাদের কি হবে? আপনি চলে গেলে কি করে থাকব?" তিনি যেন করুণায় বিগলিত হয়ে আর্দ্রস্বরে বললেন—"তোমার ভয় কি? তুমি এতো কাল মায়ের মতো আমার সেবা করেছ—এ কি কম কথা!... তোমাকে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করছি। এ জীবনেই তোমার ভগবান লাভ হবে। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।..." আরো অনেক কথা বলে সেবককে বহুভাবে আশীর্বাদ করলেন। সেবক নিজেকে সামলাতে পারল না। মহাপুরুষজীর পায়ে মাথা রেখে কাঁদতে লাগল—তিনিও মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে সেবককে আদর করতে লাগলেন।...

একদিন পূর্বাহ্ণে ১০-৩০টা নাগাদ মঠের জনৈক সন্ন্যাসী মহাপুরুষজীকে প্রণাম করে বলল—"মহারাজ, আশীর্বাদ করুন যাতে মনে কখনো কুভাব না আসে।" সন্ন্যাসীর চোখ ছলছল করছিল। মহাপুরুষজী তখনই প্রার্থনার সুরে বললেন, "ঠাকুর করুন, তোমার মনে যেন কখনো কুভাব না আসে। কুদৃষ্টিতে মেয়েদের দেখা—এটা ঠাকুরের ভাব নয়। সকল স্ত্রীলোকের প্রতিই ঠাকুরের মাতৃভাব ছিল। তোমাকে একটা কৌশল শিখিয়ে দিচ্ছি। ইষ্টমন্ত্রজপের পরেও খানিকক্ষণ 'রামকৃষ্ণ' নাম মনে মনে জপ করো। দেখবে 'রামকৃষ্ণনামাগ্নি'তে মনের

সব কুভাব ভস্ম হয়ে যাবে। আমিও তোমার জন্য ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করব।" তখন সন্ন্যাসী প্রণাম করতে মহাপুরুষজী তাঁর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন—"যাও, কোন ভয় নেই।"

* * *

১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসবের দিন মহাপুরুষজী যেন মত্ত হয়ে শত শত লোককে আশীর্বাদ করলেন। উৎসব নির্বিঘ্নে হয়ে গেল। সন্ধ্যার পর সেবকের প্রশ্নে বললেন—"দূর, বোকা, আজ আবার ক্লান্তি কি? আজ কার জন্মদিন!" অথচ তিনি খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন।

সাধারণ উৎসবের পূর্বদিন ডাণ্ডি করে ঘুরে ঘুরে উৎসবের সব আয়োজন দেখে এলেন। এর পর ২৪ এপ্রিল সকালে আবার ডাণ্ডি করে নিচে নামলেন। স্বামীজীর মন্দিরের পাশে বেলতলা পর্যন্ত গেলেন—গোয়াল, প্রাঙ্গণ, বাগান-বাগিচা, ভাঁড়ার প্রভৃতি সব পরিদর্শন করলেন—মঠের সব কিছুর সঙ্গে এই তাঁর শেষ পার্থিব দেখাশুনা। তাঁর উৎসাহ দেখে সকলেরই প্রাণে আনন্দ। ২৫ এপ্রিলও সকালে তিনজন ভক্তকে দীক্ষা দিলেন।...এগারটার পরে খেতে বসেছেন—সামান্য ঝোল ও গলাভাত খান। খাওয়া প্রায় শেষ। খাবার শেষে একটু ঘোল খেতেন। ঘোলের পেয়ালা হাতে নিয়ে এক চুমুক খেতেই হাত কাঁপতে লাগল, পেয়ালা থালায় রাখলেন। সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ অঙ্গ অবশ এবং বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হয়ে গেল। সেবকের দিকে তাকিয়ে কিছু বলবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু বলতে পারলেন না। মৃদু হেসে উৎসুক নয়নে তাকিয়ে রইলেন। তখনও বসে ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে জনৈক সন্ন্যাসী ডাক্তার এসে নাড়ী পরীক্ষা করে তাঁকে শুইয়ে দিলেন এবং বললেন যে stroke (স্ট্রোক) হয়েছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কলকাতার অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ এসে পরীক্ষা করলেন—মঠ লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। ডাক্তার নীলরতন সরকার প্রভৃতি সুবিজ্ঞ ডাক্তারদের চিকিৎসা চলতে লাগল। ডাক্তার সরকার একদিন বলেছিলেন—"বলুন তো এঁর মতো মহাপুরুষ চলে গেলে পৃথিবীর কি অবস্থা হবে?"

বাহ্যত মহাপুরুষজী অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন—পথ্যাদিও সব বন্ধ। একমাস পর অবস্থার কিছু উন্নতি দেখা গেল এবং ডাক্তার সরকার 'অবস্থা নিরাপদ' বলে ঘোষণা করলেন....ক্রমে বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল, কিন্তু দক্ষিণাঙ্গ সম্পূর্ণ অবশ এবং বাক্‌শক্তিও নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বাম অঙ্গ একটু একটু সক্রিয় হলো। তিনি বাম হাত একটু তুলতে লাগলেন—বাম পাও একটু নাড়াচাড়া করতে পারতেন। ২।৩ মাসের মধ্যেই পূর্ব অভ্যাসমত সব ব্যবহার চলতে লাগল। ইঙ্গিতে সব কিছু করাতেন, এমন কি সকালে ছাদে পায়রা-শালিকদের খাবার দেওয়া পর্যন্ত।

মহাপুরুষজীর স্মৃতিশক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল এবং দৃষ্টির ভিতর দিয়ে বা বাম হাতের স্পর্শ দ্বারা আশীর্বাদ বা শক্তিসংক্রমণ করতেন। মৌন প্রশান্ত দৃষ্টির দ্বারা সকলের মনের নানাপ্রকার দ্বন্দ্ব ও সন্দেহের নিবারণ করে দিতেন। তাঁর সকরুণ দৃষ্টিতে আশীর্বাদ বর্ষিত হতো। বাম হাতটি তুলে সম্মতি ও উৎসাহ জ্ঞাপন করতেন। তাঁর অবস্থিতিমাত্রেই সঙ্ঘের কাজকর্ম সব ঠিক চলত। কাজকর্ম সম্বন্ধে অনেক সমস্যার সমাধানও তিনি ইঙ্গিতে করে দিতেন। স্নিগ্ধ প্রসন্ন হাস্যে বাম হাতখানি তুলে এমন আশীর্বাদ করতেন যে, তাতে সকলের অন্তর ভরে যেত। তাঁর প্রশান্ত দিব্য মুখশ্রী দেখে মনে হতো যে, তিনি পরমানন্দে আছেন—শুধু ভাষার অভিব্যক্তি নেই। মহাপুরুষজীকে দেখে মনে হতো তিনি যেন সমাধিস্থ হয়ে আছেন।

এভাবে বেলুড় মঠে ৺দুর্গাপূজা, শ্রীশ্রীমায়ের উৎসব, মহাপুরুষজীর উৎসব, স্বামীজীর উৎসবাদি সব নির্বিঘ্নে হয়ে গেল।

১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজার কয়েক দিন পূর্ব হতে মহাপুরুষজীর খুব সর্দিজ্বর ও কাশি হলো। সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল হাঁপানি ও শ্বাসকষ্ট। চিকিৎসাদিতে তেমন ফল হচ্ছিল না। ১৫ ফেব্রুয়ারি তিথিপূজার দিন তিনি অপেক্ষাকৃত ভাল ছিলেন এবং উৎসবাদির সব কিছুতেই বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করলেন। শত শত সাধুভক্ত তাঁর দর্শনে আনন্দ পেয়েছিল। পরবর্তী রবিবার শ্রীশ্রীঠাকুরের সাধারণ উৎসব। তার পূর্বদিন হতে তাঁর ১০৫° ডিগ্রি জ্বর হলো। খুব সংকটপূর্ণ অবস্থা। কিন্তু শ্রীভগবানের কৃপায় উৎসবের দিন তিনি অপেক্ষাকৃত ভাল ছিলেন; তাতে সকলের প্রাণেই আশার সঞ্চার হয়েছিল। কিন্তু সাধারণ উৎসবের পরদিন বিকাল হতে জ্বর পুনরায় বেড়ে ১০৫° ডিগ্রি দাঁড়াল। তিনি কিন্তু নির্বিকার ও প্রশান্ত। তাঁর মুখমণ্ডল আনন্দোজ্জ্বল অথচ সংকল্পে দৃঢ়। তিনি যেন দেহত্যাগের জন্য প্রস্তুত। ঐ রাত্রে এক অলৌকিক উপায়ে তিনি তাঁর দেহত্যাগের বিষয় ও সময় সেবককে জানিয়ে দিয়েছিলেন। সেবক রাত্রি ১২-৩০টা পর্যন্ত মহাপুরুষজীর সেবায় নিযুক্ত ছিল এবং সে সময় তার কেবলই মনে হচ্ছিল যে, মহাপুরুষজীর বয়স তো ৮০ বৎসর চলছে। কনখলে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে পণ্ডিতজী বলেছিলেন যে, মহাপুরুষজীর পরমায়ু আশি বৎসর। এই কঠিন অসুখেই হয়তো তাঁর দেহত্যাগ হবে। বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হয়ে সেবক ১২-৩০টার পর এসে সবেমাত্র শুয়েছে, এমন সময় তন্দ্রার ঘোরে দেখল যে, সে আর দু-জন সেবক মতি মহারাজ ও শ্রীনাথ মহারাজের সঙ্গে মঠের গঙ্গার ঘাটে এসে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু এ যেন অন্য গঙ্গা; (গঙ্গার) জল নীল ও নিস্তরঙ্গ এবং খুব প্রশস্ত, অপর তীর ক্ষীণরেখার মতো দেখাচ্ছিল। তিন জনে দাঁড়িয়ে গঙ্গার ঐ শোভা দেখছে, এমন

সময় একখানি নৌকা তীরবেগে এসে গঙ্গার ঘাটে থেমে গেল। অদ্ভুত নৌকা, দেখতে মোটর বোটের মতো, অথচ তাতে কোন চালক নেই, দাঁড় হাল বা পাল কিছুই নেই। পাটাতন সম্পূর্ণরূপে বদ্ধ। সেই চালকহীন সুন্দর অদ্ভুত নৌকাটি গঙ্গার ঘাটে ভিড়তেই সেবক যেন দৈবচালিত হয়ে সঙ্গী দু-জনকে নিয়ে ঐ নৌকায় উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে নৌকাও ঐ নিস্তরঙ্গ জলের উপর দিয়ে বিদ্যুৎবেগে অন্য তীরের দিকে ছুটে চলল এবং নিমেষমধ্যে স্বর্গপুরীর মতো সুশোভন উজ্জ্বল প্রাসাদোপম অট্টালিকার সামনের ঘাটে এসে থেমে গেল। তিন জনেই নৌকা থেকে নেমে সামনে শত শত সুরম্যকক্ষযুক্ত এক উজ্জ্বল অট্টালিকা দেখতে পেয়ে কৌতূহলী হয়ে চারদিক দেখতে লাগল। কোথাও জনমানব নেই—একটু পাখির কাকলীও নয়—এক স্বর্গীয় নিস্তব্ধতা ও আনন্দ সর্বত্র ঘিরে রয়েছে। তিন জনেই অবাক হয়ে—আনন্দে একে একে সব কক্ষগুলি ঘুরেঘুরে দেখতে লাগল। কেউ কোথাও নেই অথচ সবই যেন জীবন্ত। ঐ প্রাসাদের মাঝে দরবার হল-এর মতো সুসজ্জিত একটি বড় কক্ষ দেখতে পেয়ে তিন জনই তাতে প্রবেশ করে দেখতে পেল যে, মহাপুরুষ মহারাজ জ্যোতির্ময় দেহে এক স্বর্ণসিংহাসনে বসে আছেন। অপ্রত্যাশিতভাবে মহাপুরুষজীর দর্শন পেয়ে সকলেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে তাঁকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করল এবং সেবক করজোড়ে জিজ্ঞেস করল—"আপনি কখন এলেন, মহারাজ?" তিনি স্মিতমুখে বললেন—"এই ৫-৩০টা নাগাদ। ঠিক সেই সময় সেবক যে ঘরে শুয়েছিল তার পাশের ফোন ঘর থেকে রামপ্রসাদ মহারাজের জোর গলায় 'hallo hallo' শব্দে সেবকের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। ফোন ঘরে ২৪ ঘণ্টা লোক থাকে ফোন ধরার জন্য। ঠিক সে সময়ে কাশী সেবাশ্রম থেকে সতীশ মহারাজ (স্বামী সত্যানন্দজী) trunk call (ট্রাঙ্ক কল) করে মহাপুরুষ মহারাজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছিলেন। রামপ্রসাদ মহারাজ ঐ সময় ফোন ধরেছিলেন। সতীশ মহারাজ কানে কম শুনতেন, তাই ঐ ট্রাঙ্ক কল-এর জবাবে রামপ্রসাদ মহারাজকে খুব চিৎকার করে কথা বলতে হচ্ছিল। ঐ 'hallo hallo' শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সেবক বিছানায় বসে ভাবতে লাগল ঃ মহাপুরুষ মহারাজ যে বললেন "সাড়ে পাঁচটায় এসেছি"—এর অর্থ কি? তিনি কি তাঁর দেহত্যাগের সময় জানিয়ে দিলেন?

মহাপুরুষজী বলতেন ঃ "দেবস্বপ্ন সত্য। বিশেষত কলিকালে দেবতারা দর্শনাদি স্বপ্নেই দেন।" সেবক ঐ স্বপ্নের বিষয় ভাবতে ভাবতে তখনই উপরে গিয়ে মহাপুরুষজীর সেবায় নিযুক্ত হলো। তিনি শান্তভাবে শুয়ে আছেন, যেন ঘুমোচ্ছেন—মুখমণ্ডল আনন্দোজ্জ্বল। তাঁর জ্বর ১০২° ডিগ্রি। সেবক মহাপুরুষজীর বিছানার উপর মহাপুরুষজীর পাশে বসে ঐ স্বপ্নের বিষয় ভাবতে লাগল—সেই

সীমাহীন সুন্দর নদীটি, চালকহীন দৈব-ইচ্ছা-চালিত নৌকাখানি, নদীর পরপারের সুরম্য অট্টালিকা, জ্যোতির্ময় দেহে মহাপুরুষজীর দর্শন, তাঁর শ্রীমুখের বাণী!

ক্রমে রাত্রি প্রভাত হলো। সকালে মহাপুরুষজীর জ্বর ১০০° ডিগ্রিতে নেমেছিল, কিন্তু যত বেলা বাড়তে লাগল তাঁর জ্বরও বাড়তে লাগল। ১২ টার পর শ্বাসকষ্ট দেখা দিল—তিনি কিন্তু প্রশান্ত ও স্থিরভাবে শুয়ে আছেন, যেন গভীর ধ্যানস্থ। সেবক তাঁর পাশে বসে; পূর্ব রাত্রের স্বপ্নের কথা তার অন্তর জুড়ে রয়েছে। বেলা ২টার পর হতে তাঁর সারা দেহে মুহুর্মুহু পুলক ও রোমাঞ্চ হতে লাগল। মাথার চুল থেকে সারা গায়ের লোম কদমফুলের মতো বিকশিত হলো। চোখের কোণে আনন্দাশ্রু। ২-৩০টার পরই ডাক্তারগণ শেষ পরীক্ষা করে 'আর আশা নেই' বলে চলে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সাধুগণ 'জয় রামকৃষ্ণ' ধ্বনি করে মহাপুরুষজীকে ঠাকুরের নাম শোনাতে লাগলেন। তা শুনে সেবক শুষ্ককণ্ঠে পার্শ্বস্থ সেবক স্বামী কৈলাসানন্দকে বলল—"এঁরা মস্ত ভুল করলেন। মহাপুরুষজীর শরীরত্যাগ এখন তো হবে না, সাড়ে পাঁচটায় তাঁর শরীর যাবে। এত আগে থেকে কেন নাম শোনাচ্ছেন?" স্বামী কৈলাসানন্দ সেবককে জিজ্ঞেস করলেন—"আপনি কি করে জানলেন যে, এখন মহাপুরুষজীর শরীর যাবে না? ডাক্তাররা তো বলে গেলেন।" সেবক মাথা নিচু করে চোখের জল ফেলতে ফেলতে শুধু বলল, "দেখবেন। সাড়ে পাঁচটার সময় তাঁর শরীর যাবে।"

ঘণ্টাখানেক নাম শুনাবার পর তা বন্ধ করে সূর্য মহারাজ মহাপুরুষজীর প্রিয় ভজনগান গাইতে লাগলেন। এদিকে মহাপুরুষজী শান্তভাবে সমাধিস্থ হয়ে আছেন, চোখে মুখে সর্বাঙ্গে দিব্যানন্দের স্ফূর্তি। আরো ঘন ঘন পুলক ও রোমাঞ্চ দেখা দিল তাঁর অঙ্গে। এক একবার পুলক ১০।১২ মিনিট স্থায়ী হয়। পরে সতীনাথ মহারাজ গান ধরলেন, 'কালীনামের গণ্ডি দিয়ে' ইত্যাদি গান, যা মহাপুরুষ মহারাজ নিজে গেয়ে তাঁকে শিখিয়েছিলেন, তা অশ্রুপূর্ণ নয়নে গাইতে লাগলেন।

৫টার পর খুব জোর রোমাঞ্চ ও পুলক হলো, সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। পাঁচটা বিশ মিনিটের সময় তাঁর শরীরে যে পুলক হলো তা আর থামল না—ঐ পুলকের মধ্যেই সাড়ে পাঁচটার সময় মহাপুরুষজীর শেষ নিঃশ্বাস মিলিত হলো। শত শত সাধু-ভক্তের শ্রীরামকৃষ্ণনাম ও ক্রন্দনধ্বনির সঙ্গে। রাত্রি ৮-৩০টা পর্যন্ত মহাপুরুষজীর শরীরে ঐ পুলকিত অবস্থা বিরাজ করছিল এবং বুক-পিঠও বেশ গরম ছিল।

* * *

বেলুড় মঠে পরম পূজনীয় মহাপুরুষজীর ঘরে তাঁর নিত্য সেবাপূজাদির প্রবর্তন হয়েছে। সাধুগণ ও ভক্তেরা নিত্য প্রণাম করতে আসেন এবং ঐ ঘরে বসে ধ্যানজপ করেন। মহাপুরুষজীর দেহত্যাগের প্রায় তিন মাস পর একদিন বিকালে জনৈক আইনজীবী শিষ্য মহাপুরুষজীর ঘরে এসে প্রণাম করে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন। সেবককে দেখেই বললেন—"মহারাজ, এখন তো আর দু-আনা পয়সা খরচ করে এলেই মহাপুরুষজীর দর্শন পাওয়া যাবে না। সেদিন গেছে। মহাপুরুষজীর দর্শন এত সোজা ছিল বলে তখন তার মূল্য দিইনি।" ভক্তের কান্না আর থামে না।

ওঁ শুভম্

দ্বিতীয় পর্ব

মহাপুরুষজীর স্মৃতিকথা

শ্রীহেরম্ব ভট্টাচার্য, বি. এ.

পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজকে আমি প্রথম কবে দর্শন করি এবং তা বাবার সঙ্গে বেলুড় মঠে গিয়ে কিনা সেসব আমার এখন স্মরণ নেই। তবে এটুকু মনে আছে যে, খুব শৈশবে হয়তো ১৯১৬-১৭ সাল হতে শ্রীশ্রীমা, পূজনীয় শরৎ মহারাজ, পূজনীয় ব্রহ্মানন্দ স্বামী, পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ ও পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ প্রভৃতি শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদদের পুণ্যদর্শন লাভ করি—তা আমার পিতৃদেব ৺মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের সঙ্গে এবং আমার গৃহশিক্ষক শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে গিয়েও। তবে বাবার সঙ্গেই প্রথম মঠে যাই তা বেশ মনে আছে। অবশ্য আমি যে গিয়েছিলাম তা তাঁদের সঙ্গী হিসাবে এবং বাবা নিয়ে যেতেন বলে, কারণ তখনও আমার বয়স এত কম ছিল যে স্বাধীন চিন্তা বা ব্যক্তিত্ব কিছুই আমার ছিল না।

উদ্বোধনে মায়ের বাড়িতে যেদিন শ্রীশ্রীমার অশেষ স্নেহ ও আশীর্বাদ লাভে ধন্য হই, সেদিন মাস্টার মহাশয়ের সঙ্গে যদুবাবুসহ গিয়েছিলাম, তা বেশ স্মরণ আছে। তখন আমার বয়স ৭।৮ বছর হতে পারে।

সে সময় সকলের স্নেহ, আদর ও আশীর্বাদ লাভের সৌভাগ্য আমার প্রচুর হয়েছিল, বাবার নাম করে সবাই আমায় সস্নেহে "অমুকের ছেলে" বলে খুব আদর-যত্ন করে কোলে টেনে নিতেন। আমি তখন তাঁদের স্নেহ-আদরেই বশীভূত হয়েছিলাম, আধ্যাত্মিক শক্তির কিছুই বুঝিনি। পরে যখন কলেজে পড়তে থাকি তখনই ঐ বিষয়টি উপলব্ধি করার চেষ্টা করি এবং সে সময়ই ঠাকুরের সন্তানদের মাহাত্ম্য কিছু কিছু বোধগম্য হতে থাকে। অবশ্য এইমাত্র বুঝেছি যে, পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের সান্নিধ্যে গেলেই একটা অপূর্ব অনুভূতি ও আনন্দ বোধ হতো এবং তাঁকে আমার খুব ভাল লাগত। এ বোধটা কেন হতো জানি না। শুধু আদর-যত্ন করতেন এবং ভাল ভাল প্রসাদ খেতে দিতেন বলে যে তা নয়—এও বেশ মনে পড়ে। মহাপুরুষজীর এক একটি কথায় যে উৎসাহ ও ভরসা পেতাম তা বলে বুঝানো যায় না।...

আমি তখন কলেজে পড়ি, ১৯২৮ সালের কিছুকাল পূর্বেই তাঁর কৃপালাভের সৌভাগ্য হয়েছে, জপ-ধ্যান কিছু কিছু করার চেষ্টা করি। দীক্ষার সময় তিনি

ঠাকুরের পাদপদ্মে ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য সব কিছু সমর্পণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সে অপূর্ব উপদেশের প্রেরণায় সোৎসাহে অগ্রসর হবার চেষ্টা করি। কিন্তু দর্শনাদি ও অনুভূতির আশায় প্রাণ ব্যাকুল হলেও তা লাভ না হওয়ায় প্রাণে দারুণ ব্যাকুলতা ও আকুতি বাড়ে। একদিন গিয়ে মহাপুরুষজীকে বললাম, "মহারাজ, কই কিছুই তো হচ্ছে না।" তিনি বেলুড় মঠে তাঁর ঘরেই চেয়ারে বসে ছিলেন। আমার কথায় ঈষৎ হাসলেন। তারপরেই গম্ভীর হয়ে দৃপ্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন, "কি বলছিস তুই, হতেই হবে, আলবত হবে।" এই আশ্বাস-বাণীতে হৃদয় ভরে উঠল, প্রাণে বল পেলাম। কত লোক কত আশা-ভরসার কথা জীবনের কত ক্ষেত্রে শুনিয়েছে, কিন্তু শক্তিমান পুরুষের কথার ভিতর দিয়ে যে জিনিস পাওয়া যায় তা সম্পূর্ণ আলাদা। সেদিন অনুভব করলাম তিনি যেন একটা বিশেষ শক্তি সঞ্চারিত করলেন।

মহাপুরুষজী বাইরে অতি গম্ভীর ও রাশভারী, কিন্তু ভিতরে স্নেহময় ছিলেন। একদিন একটা ব্যাপারে আমায় কিছু তিরস্কার করেছিলেন। তার পরদিন তাঁর কাছে গিয়ে প্রণাম করেই সরে গেলাম, কথা বলতে যেন কেমন ভয় হচ্ছিল। ভারাক্রান্ত প্রাণে মঠের এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছি এমন সময় হঠাৎ তাঁর সেবক-মহারাজ এসে ডেকে বললেন যে, মহাপুরুষ মহারাজ আমায় ডাকছেন। তখন বিকালবেলা, তাড়াতাড়ি উপরে গেলাম। মহাপুরুষ মহারাজ তাঁর ঘরের উত্তরদিকের ছাদে বসে জলযোগ করছিলেন। আমাকে দেখেই সস্নেহে কাছে ডাকলেন এবং নিজের জলখাবার প্লেট হতে সন্দেশ তুলে আমার হাতে দিয়ে বললেন, "নে খা।" আমি মহা আনন্দে প্রসাদ গ্রহণ করলাম এবং প্রাণে শান্তি নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম।

এ জাতীয় কত দিনের কত কথাই মনে পড়ে, তাঁর স্নেহ ও করুণার স্পর্শ অজস্র পেয়েছি, মঠের আবহাওয়া তাঁর উপস্থিতিতে যেন জমজমাট থাকত। যখনই তাঁকে দর্শন করতে গিয়েছি, তখনই অনুপ্রেরণা লাভ করে ফিরেছি।

মহাপুরুষজী যে শুধু আমার ধর্মগুরু ছিলেন তা নয়, তিনি একাধারে আমার গুরু, পরম আত্মীয় ও কল্যাণকামী ছিলেন। তাঁর আশীর্বাদ আমাকে সর্ববিধ বিপদ থেকে রক্ষা করেছে। জীবনে যখনই কোন সমস্যা উপস্থিত হতো, তখনই তাঁর কাছে ছুটে যেতাম বা তাঁকে চিঠি লিখতাম; তিনি সব সমস্যার সমাধান করে দিতেন এবং সকল প্রকার বিপদ থেকে আমাকে মায়ের মতো রক্ষা করেছেন। একবার ১৯২৯ সালে পারিবারিক জটিল সমস্যায় পড়ে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। পত্রোত্তরে তিনি লিখেছিলেন, "...তোমার পত্র পাইয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছি।...প্রভু কৃপা করিয়া তোমার ভাইয়েদের আত্মার কল্যাণ করুন, আন্তরিক প্রার্থনা করি। সংসারে এ সকল অবশ্যম্ভাবী। প্রভু তোমায় শক্তি দিন, প্রার্থনা করি। পরীক্ষা দিতেছ,

কৃতকার্য হও প্রভুর কৃপায়। আমার শরীর ভাল নয়। তোমাদের সর্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনা করি।"

কঠিন অসুখে পড়ে কাতর হয়ে মহাপুরুষজীকে চিঠি লিখেছিলাম—প্রাণে খুবই ভয় ও হতাশ-ভাব। জবাবে তিনি আশীর্বাদ পাঠালেন ঃ "তোমার পত্র পাইয়া দুঃখিত হইলাম। ভয় নাই, ঠাকুরের কৃপায় আরোগ্য হইয়া যাইবে। Operation (অস্ত্রোপচার)—তোমার বাবা ও ডাক্তারেরা যাহা বলেন, তাহা করাই ভাল। দয়াল ঠাকুর তোমায় দেখছেন, ভয় নাই, সংসারে আসক্ত হইবে না। লিখিতে হাত কাঁপে, শরীর ভাল নয়—ক্রমেই অকর্মণ্য হইয়া আসিতেছে, তাঁর ইচ্ছায় যতদিন থাকে থাকবে। আমার কোন ভাবনা নাই। আমি দেহ নই—এ জ্ঞান তিনি দয়া করিয়া নিশ্চয় করিয়া দিয়াছেন। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ তুমি জানিবে, বাড়ির সকলকে জানাইবে।" তাঁর আশীর্বাদে সে যাত্রায় বিপন্মুক্ত হয়েছিলাম। তখন তাঁর শরীর খুবই অসুস্থ, নিজের হাতে চিঠি লিখতে খুবই কষ্ট হতো, তবু আমাকে তিনি নিজের হাতেই চিঠি লিখেছিলেন। ঐ শক্তিপূর্ণ চিঠি পেয়ে আমার অন্তর 'অভীঃ' হয়েছিল—প্রাণে বলও পেয়েছিলাম।

১৯২৯ সালের প্রারম্ভে আমার জীবনে এক মহাসমস্যা উপস্থিত হয়। নিরুপায় হয়ে মহাপুরুষজীকে সব জানিয়ে চিঠি লিখলাম। জবাবে তিনি জানালেন..."তোমার পত্র পাইয়া সকল সংবাদ অবগত হইলাম। তোমার বিষয় আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি, তুমি বিবাহ করিও। তুমি পিতামাতার একমাত্র সন্তান, তা ছাড়া তুমি আদর্শ গৃহস্থ হইতে পারিবে। উহাই তোমার জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া জানিবে। তোমার বাবা যেমন সব প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন, কত সৎকাজ করিতেছেন, তুমিও তাঁর পদানুসরণ করিয়া সেইরূপ হইতে পারিবে। তোমার শিক্ষা-দীক্ষাও অনুকূল। তুমি গৃহস্থ হইলে তোমার ভক্তি-বিশ্বাসের হানি হইবে না। ঠাকুর রয়েছেন, তোমার চিন্তা নাই। তুমি বিবাহে মত দিও, এবং কি উদ্দেশ্যে বিবাহ করিতে যাইতেছ তাহাও স্মরণ করিও। আদর্শ গৃহস্থ সংসারে খুব দরকার। প্রার্থনা করি ঠাকুরের কৃপায় তুমি তাহাই হও। আমি তোমায় অনুমতি দিতেছি। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবে। প্রার্থনা করি ঠাকুরের কৃপায় তোমার কল্যাণ হউক।"

অন্য সময়ে মনের অশান্ত অবস্থা জানিয়ে মহাপুরুষজীর শরণ নিয়ে চিঠি লিখেছিলাম। তিনি অভয়-আশীর্বাদপূর্ণ পত্র লিখেছিলেন ঃ "...তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তুমি অত চিন্তিত হইতেছ কেন? ঠাকুরের কৃপায় তুমি কখনও সংসারের মোহে আবদ্ধ হইবে না, বিশ্বাস কর। ঠাকুরকে যে একবার ডেকেছে, তাঁকে যে একবার ভালবেসেছে, তার বন্ধন নাই—আপাতবদ্ধ বলে মনে হতে পারে বটে, কিন্তু

চিরবদ্ধ হবে না জানবে। সময়ে তিনি তোমায় সংযম দিবেন। আমি তো সবই জানি—জেনেই তোমাকে বিবাহ করতে বলেছি, এতে তোমার ভয় কি?...তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জানবে এবং বৌমাকেও জানাইয়া সুখী করিবে। আমার শরীর ভাল নয়। একপ্রকার চলে যাচ্ছে। যখন কলকাতায় আসিবে দেখা হইবে।...”

মহাপুরুষ মহারাজ আমাদের পরম কল্যাণাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, দেহ-মনের সব রোগ তিনি সযত্নে আরাম করে দিতেন এবং পথের সব বাধা অপসারিত করে স্বর্গীয় দূতের মতো হাত ধরে ধর্মের পথে চালিত করতেন। যত দিন যাচ্ছে তত তাঁর অসীম কৃপা অনুভব করে অন্তর আনন্দে ভরে যায়। ১৯৩০ সালের শেষভাগে বিভ্রান্তমনে তাঁকে চিঠি লিখে জবাব পেলাম ঃ “...তোমার পত্র যথাসময়েই পাইয়াছি। মহেশবাবু এসেছিলেন, তাঁহার কাছে তোমার সংবাদ পাইলাম। অপারেশন শীতকালে হওয়াই ভাল। বেশ তো, তাই হোক। ততদিন একটু সাবধানে থাকিতে হইবে।

“তোমার শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতিপূর্ণ মূর্তি ভাল লাগে। এ তো ভাল কথা। ঠাকুর আর তাঁতে কি কোনও প্রভেদ আছে? ঠাকুরের মধ্যে সব ভাবই আছে।... তুমি শ্রীকৃষ্ণের যখন চিন্তা করিবে তখন ভাবিবে ঠাকুরেরই চিন্তা করিতেছ। পৃথক-বুদ্ধি যেন না হয়, এবং ঠাকুরের যখন চিন্তা করিবে তখন তাঁর মধ্য দিয়া শ্রীকৃষ্ণেরই চিন্তা হইতেছে জানিবে। তুমি সর্বসমন্বয়-স্বরূপ ঠাকুরের কাছে এসে এটি বুঝতে পার নাই! ঠাকুরের এইরূপ ভাব বলিয়াই তিনি ভাবরাজ্যের রাজা। তাঁর রাজ্যে একঘেয়ে ভাব নাই। সর্বভাবের সমষ্টি-মূর্তি হইতেছেন ঠাকুর—তাঁর চিন্তায় সর্বভাবের তুমি ভাবুক হইবে এবং তোমার যদি আলাদা আলাদা ভাব ভাল লাগে তাহাই করিতে পার, তাহাতে কোনও ক্ষতি হইবে না। কারণ তাতে তাঁহারই চিন্তা করা হইবে, সেইজন্যই তো সাধনকালে সর্বদেবদেবীভাব তাঁর শরীর ও মন আশ্রয় করিয়াছিল। তবে পূর্বে যেমন লিখিয়াছি—ঠাকুরের সহিত ঐসকল ভাবের যেন পার্থক্য-বুদ্ধি না হয়, তাহা হইলেই ক্ষতি হইবে।...আমার শরীর ভাল নয়, তবে ঠাকুর একপ্রকার চালিয়ে দিচ্ছেন। তুমি আমার আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে।”

সাধন-ভজন সম্বন্ধে মহাপুরুষজীকে কখনো বিশেষ কিছু জিজ্ঞেস করিনি, কারণ দীক্ষা নেবার পরে সাধন-ভজন করার ইচ্ছা যখন বেড়েছিল, তখন তাঁর শরীর প্রায়ই অসুস্থ থাকত। সেজন্য তাঁকে প্রশ্ন করার সুযোগ বেশি হতো না। শুধু দর্শন করে তাঁর অশীর্বাদ নিয়ে আসতাম, তিনি কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞেস করতেন এবং খুব আশীর্বাদও দিতেন। সেজন্য মানসিক অবস্থা জানিয়ে সাধন-ভজন সম্বন্ধে চিঠিতে তাঁকে জানাতাম। ১৯৩০ সালে একবার মনের অনেক সন্দেহ জানিয়ে তাঁকে লিখেছিলাম। জবাবে তিনি জানিয়েছিলেন—“শ্রীমান হেরম্ব, তোমার পত্র পাইয়া

সুখী হইয়াছি। সংসার কণ্টকাকীর্ণ সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁকে ধরে থাকলে উহা আনন্দময় হইয়া থাকে। তুমি ঐ দিকে লক্ষ্য না দিয়া ঠাকুরের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। তাঁর কৃপায় তুমি কখনই বদ্ধ হইবে না। আর তাঁর দিকে যদি লক্ষ্য রেখে চলতে পার—সংসারের ঘাতপ্রতিঘাত তোমার দৃষ্টি তাঁর দিকেই বেশি নিয়ে যাবে, তোমার বিবেক-বৈরাগ্য ও তাঁর প্রতি প্রেম ভালবাসা-বৃদ্ধির কারণ হইবে। সংসারের সুখে সুখ নাই যখন বুঝিয়াছ, তখন তোমার ভাবনা নাই। তুমি নিশ্চয়ই ঠাকুরকে ভালবেসে তাঁর কৃপায় শান্তি ও আনন্দ পাইবে। আমি তোমাকে হৃদয় থেকে আশীর্বাদ করছি—ঠাকুর তোমাকে ভক্তি বিশ্বাস দিয়ে পূর্ণ করে দিন।

"তোমার মন্ত্রটির একটু গোলমাল হইয়াছিল।...তুমি মন্ত্রটি এইরূপ (...) ভাবে জপ করিও।...

"ধ্যান-জপ যখন সকাল-সন্ধ্যায় করিতে বসিবে তখন শিরদাঁড়া ও মাথা সোজা করে পায়ের উপর পা দিয়ে মানুষ সহজভাবে যেমন বসে সেইভাবে বসবে। এবং প্রতি মন্ত্র-উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ইষ্টমূর্তি বা তাঁর গুণ চিন্তা করিবে। তাঁর শ্রীমূর্তি যেমন ছবিতে বসাভাবের আছে তাহা অবলম্বন করিয়া ঐ সকল চিন্তা করিবে। তিনি প্রাণবন্ত এবং তোমার প্রার্থনাদি শুনিতেছেন—তিনি প্রভু—ঈশ্বর, অতি আপনার জন মনে করিবে। তাঁর চিন্তা হৃদয়পদ্মে বা সহস্রারে তোমার যেখানে ভাল লাগে করিবে। জপান্তে বা অন্য সময়ে মন্ত্রোচ্চারণ না করিয়াও তাঁর চিন্তা বা ধ্যান করিতে পার! ঐ চিন্তায় দেহ জগৎ ভুলে তন্ময় হয়ে যাওয়ার নাম ধ্যান। জপ করিতে করিতেও ঐরূপ হইয়া থাকে। জপ ও ধ্যান দুই-ই সমান। কাহারও জপ করিলে তাঁর দিকে মন বেশি আকৃষ্ট হয়, কাহারও বা ধ্যানে—যাহার যেটি ভাল লাগে। তুমি জপের সঙ্গে ঐ প্রকার ধ্যানের অভ্যাস কর, তারপর কোনটি তোমার পক্ষে প্রশস্ত আপনিই বুঝিতে পারিবে। ধ্যান-জপ করিতে বসবার আগে খুব প্রার্থনা করে নেবে।

"সকাল-সন্ধ্যায় আসনে না বসে সর্বসময়ে সর্বাবস্থায় তাঁর স্মরণ-মনন ধ্যান-জপ করা যায়। তবে নিষ্ঠার জন্য সকাল-সন্ধ্যায় করবেই।

"প্রার্থনা করি, ঠাকুর তোমার কল্যাণ করুন। খুব ভক্তি বিশ্বাস দিন, ইহাই প্রার্থনা। আমার শরীর একপ্রকার চলে যাচ্ছে, ভাল নয়। ঠাকুর তোমাকে সুস্থ রাখুন। আমার আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে। ইতি"...

শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ এখন অশরীরী চিন্ময়রূপে আছেন। তাঁর চরণে শত শত প্রণাম করি।

শুভম্

শ্রীমহাপুরুষজীর পুণ্যস্মৃতি

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত

ইংরেজি ১৯২২ সন। আমি তখন ঢাকা আইন কলেজে পড়ি এবং ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে নিয়মিত যাওয়া-আসা করি। ঐ সনের ১৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকার ভক্তগণের আগ্রহাতিশয্যে ও ঐকান্তিক চেষ্টায় পরম পূজ্যপাদ মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ মহারাজ তদীয় গুরুভ্রাতা পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজসহ বেলুড় মঠ হতে ঢাকায় শুভ পদার্পণ করেন। তাঁদের দর্শন করবার জন্য প্রত্যহ সকালে বিকালে ও সন্ধ্যায় অগণিত ভক্ত নরনারী ঢাকা মঠে সমবেত হতেন। আমিও মহপুরুষজীকে দর্শন করে, তাঁর শ্রীমুখের উপদেশ শুনে এবং দু-এক দিন তাঁর পদসেবা করার দুর্লভ সুযোগ পেয়ে নিজেকে পরম কৃতার্থ বোধ করি।

মহাপুরুষজী প্রায় দেড়মাস ঢাকায় অবস্থান করেন। সকল শ্রেণীর অসংখ্য ধর্মপিপাসু নরনারী তাঁর সরল অথচ হৃদয়স্পর্শী মধুর উপদেশ শুনে পরিতৃপ্ত হতেন। দেখেছি—তিনি ছিলেন সম্পূর্ণরূপে শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ, 'তন্নামশ্রবণপ্রিয়' ও 'তদ্ভাবরঞ্জিতাকার' এবং খোলাখুলিই ভক্তদের বলতেন, "আমি শ্রীরামকৃষ্ণের দাসানুদাস কিঙ্কর, তাঁকে ছাড়া আর কিছুই জানিনে—সাধু-ফকির মানুষ। ঠাকুরই আমার অন্তরাত্মা—তিনি যা বলাবেন তাই বলব, যা করাবেন তাই করব, অন্য কিছুর খবরাখবর জানিনে, জানবার দরকারও নেই।"

মহাপুরুষজীর ঢাকায় অবস্থানকালে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট অসহযোগ আন্দোলনের (Non-Cooperation Movement) নেতা ও প্রবর্তক মহাত্মা গান্ধীকে গ্রেপ্তার করেন। পদসেবারত আমাকে তিনি গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। আমি সে সময়ে অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে খুঁটিনাটি সব খবরাখবর রাখতাম এবং গান্ধী-সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'Young India' (ইয়ং ইণ্ডিয়া) রীতিমত পড়তাম। আমি মহাপুরুষজীকে বললাম, "আজ্ঞে, গান্ধীজী তাঁর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' কাগজে 'British Lion Shakes its Manes' (ব্রিটিশ সিংহ তাঁর কেশর নাড়ছে) এবং 'Poles Asunder' (রাজা-প্রজার সম্বন্ধ মেরু ব্যবধানের মতো) নামক দুটি নির্ভীক ও স্পষ্টোক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছেন। লেখা দুটি সরকারের দৃষ্টিতে রাজদ্রোহাত্মক (Seditious) বলে বিবেচিত হয়েছে। এজন্য গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তাঁর বিচার হবে।" তা শুনে মহাপুরুষজী তখনই প্রবন্ধ দুটি শুনতে

চাইলেন। ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পাঠাগারে তখন অভয় আশ্রমের ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ এক কপি 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' সর্বসাধারণের পাঠের জন্য বিনামূল্যে দিতেন। আমি তখনই পাঠাগার হতে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' এনে মহাপুরুষজীকে প্রবন্ধ দুটি পড়ে শুনালাম। পাঠের সময় তিনি কোন মন্তব্য না করে মনোনিবেশ সহ শুনলেন এবং পড়া শেষ হলে গম্ভীরভাবে বললেন, "গান্ধী মহাত্মা লোক; তপস্যার জোর না থাকলে এমন নির্ভীকভাবে প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সমালোচনা করতে পারতেন না। তিনি নিজেই তো প্রবন্ধ দুটির মুখবন্ধে লিখেছেন যে, ভগবানের কাছে প্রার্থনার পর প্রবন্ধগুলি রচনা করতে আরম্ভ করেছেন। বাস্তবিকই প্রার্থনার শক্তি অসীম। প্রার্থনা অসম্ভবকে সম্ভব করে। 'More things are wrought by prayer than this world dreams of.'—পৃথিবীর লোক স্বপ্নেও যা ভাবতে পারে না, তার চেয়ে ঢের বড় বড় বস্তু লাভ হয় ভগবানের কাছে প্রার্থনা দ্বারা, কবিও একথা বলেছেন। আধ্যাত্মিকতাই—ধর্মই মানুষের শক্তির মূল উৎস। ভারতে ধার্মিক ব্যক্তিই নেতৃত্ব করতে পারেন! নেতা ধার্মিক না হলে ভারতে কেউ তাঁর কথা শোনে না। ধার্মিক বলেই গান্ধী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং সকলে তাঁকে মানছে।" সঙ্গে সঙ্গে কবিদের সম্বন্ধেও তিনি বললেন, "ঠিক ঠিক কবি হতে হলেও আধ্যাত্মিক অনুভূতি চাই। দুঃখের বিষয়, আজকাল কবিদের অনেকেরই তা নেই। অনেকেই তাঁদের কবিতায় উপনিষদ্ পুরাণাদি থেকে তত্ত্বের কথা লেখেন বটে, কিন্তু তাঁদের নিজেদের জীবনে সেসব তত্ত্বের অনুভূতি নেই বললেই চলে। উপনিষদে 'সর্বদর্শী' অর্থে কবি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আত্মাকে 'কবির্মনীষী', 'কবিং পুরাণমনুশাসিতারং' ইত্যাদি বলা হয়েছে ঃ 'কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াং- সমনুস্মরেৎ যঃ। সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।' (গীতা, ৮। ৯)—পরমাত্মা কবি অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান বিষয়ের দ্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। ভগবানের সঙ্গে যোগাযোগ থাকলেই প্রকৃত কবিত্বের স্ফুরণ হয়।"...

একদিন বিকালে ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠের ঠাকুরঘরের সামনের চত্বরে মহাপুরুষজী একখানি চেয়ারে বসে আছেন। আমরা দু-এক জন তাঁর সেবার জন্য কাছেই দাঁড়িয়ে আছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি ছাত্র এসে মহাপুরুষজীকে প্রণাম করল। মহারাজ ছাত্রদের জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের কিছু বলবার আছে, বাবারা?" একটি ছাত্র বলল, "আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আপনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য, বেলুড় মঠ হতে শুভাগমন করেছেন শুনে আপনাকে দর্শন করতে এবং আপনার কাছে দু-একটি বিষয় জানতে এসেছি। আমেরিকায় রামকৃষ্ণ-মিশনের বেদান্ত-প্রচারের কাজ কোথায় কেমন হচ্ছে, তা জানবার জন্য আমাদের খুব আগ্রহ, কৃপা করে তা বলুন।" মহাপুরুষজী বললেন, "আমি তো,

বাবারা, আমেরিকায় যাইনি। ওদেশ সম্বন্ধে তোমাদের যা কিছু জিজ্ঞাস্য আছে, তা আমার গুরুভাই স্বামী অভেদানন্দের কাছে জানতে পার। তিনি আমার সঙ্গে এসেছেন, এখন এ মঠেই আছে। তিনি দীর্ঘকাল আমেরিকায় ছিলেন এবং বেদান্ত প্রচার করেছেন, ওদেশ সম্বন্ধে সব জানেন। তোমরা তাঁর কাছে যাও (তাঁর থাকবার প্রকোষ্ঠটি দেখিয়ে)। আমি সাধু-ফকির মানুষ, ভগবান সম্বন্ধে কিছু জানি ও দুচার কথা বলতে পারি—সে সম্বন্ধে যদি তোমাদের কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে তো বল, কিছু বলি।" ছাত্রগণ তখনই স্বামী অভেদানন্দজীর কাছে গেল। তারা চলে যেতেই মহাপুরুষজী আমাদের বললেন, "দেখলে, ওরা শুধু বাইরের খবর, দুনিয়ার খবর জানতে চায়। ঈশ্বর সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ এদের মোটেই নেই। কোথায় আমাদের কাছে আসবে তত্ত্বজিজ্ঞাসু হয়ে ভগবানলাভের উপায় জানবার জন্যে, তা নয়, শুধু বহির্মুখ ভাব—বহির্মুখী দৃষ্টি। 'যার যেমনি ভাব তার তেমনি লাভ!' সাধু-সন্ন্যাসীর কাছে আসতে হয় ধর্মকথা শোনবার জন্যেই। সাধু হচ্ছেন আচার্য—ধর্মশিক্ষা দেন, ভগবানের খবর রাখেন। দেশ-বিদেশের খবর তো বই-পুস্তকেই ঢের পাওয়া যায়।"...

* * *

ঢাকায় অবস্থানকালে পূজ্যপাদ মহাপুরুষজী শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে ভক্তদের দ্বারা আয়োজিত ধর্মপ্রসঙ্গ, শাস্ত্রপাঠ, ভজন-কীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠানে স্বয়ং উপস্থিত হয়ে ঈশ্বরীয় কথা বলে শ্রোতাদের ধর্ম-পিপাসা মেটাতেন। ফরাসগঞ্জ অঞ্চলে শ্রীপ্রসন্নকুমার দাসের 'গৌরাবাস' নামক প্রাসাদোপম ভবনের সম্মুখভাগে একটি সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত একটি ধর্মালোচনা কেন্দ্র ছিল। শ্রীযুক্ত প্রসন্নবাবু ঐ প্রকোষ্ঠটি ধর্মালোচনার জন্য ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। সেখানে প্রতি শনিবার একটি সান্ধ্য-অধিবেশনে ভজন-কীর্তন, ধর্মশাস্ত্রপাঠ ও আলোচনা হতো। একটি গ্রন্থাগারও ছিল। ভক্তগণ গ্রন্থাগার হতে ধর্মপুস্তকাদি এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ গ্রন্থাবলী নিয়ে পড়তেন। মহাপুরুষজী ভক্তগণের আগ্রহে একদিন ঐ ধর্মসভায় সান্ধ্য-অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন। তাঁর শুভপদার্পণে তত্রত্য ভক্ত নরনারীদের মধ্যে বেশ সাড়া পড়ে গেল। গৃহস্বামী প্রসন্নবাবুর আগ্রহাতিশয্যে ও সশ্রদ্ধ আমন্ত্রণে মহাপুরুষ মহারাজ বাড়ির ভিতরে গিয়ে পরিবারস্থ সকলকে আশীর্বাদ করেন। বহির্বাটির প্রধান প্রকোষ্ঠের দেয়ালে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি, নরেন্দ্রসরোবরতীরে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ভাগবতপাঠ-শ্রবণ, শ্রীদুর্গা, শ্মশান-কালী প্রভৃতি সুচিত্রিত বৃহৎ প্রতিকৃতিগুলি ছিল। মহাপুরুষজী একে একে ছবিগুলির উদ্দেশে ভক্তি-বিনম্র প্রণাম নিবেদন করে গৃহস্বামী প্রসন্নবাবুকে বললেন, "শ্মশানকালীর ছবি গৃহস্থের বাড়িতে রাখতে নেই; যদি রাখতেই হয়, তবে নিত্য

নিয়মিতভাবে তাঁর পূজার্চনা করতে হয়, না করলে অমঙ্গলের আশঙ্কা থাকে। সাধুদের আশ্রমে, মঠে বা ঠাকুরবাড়িতে শ্মশান-কালীর ছবি রাখাই ভাল—সেখানে নিত্য নিয়মিত পূজার্চনাদি হয়।" মহাপুরুষজীর এ উপদেশ শিরোধার্য করে গৃহস্বামী কিছুদিন পরে শ্মশান-কালীর পটখানি ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে পাঠিয়ে দেন। তদবধি প্রতিকৃতিখানি ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের নাটমন্দিরে সযত্নে রক্ষিত আছে।

ফরাসগঞ্জ ধর্মসভার সান্ধ্য-অধিবেশনস্থানে প্রবেশ করে মহাপুরুষজী শ্রীশ্রীঠাকুরের সুসজ্জিত প্রতিকৃতিখানি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেন। তিনি আসন গ্রহণ করলে যথারীতি উদ্বোধন-সঙ্গীত গীত হলো। সমবেত আগ্রহশীল ভক্ত নরনারী মহাপুরুষজীর শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশ শ্রবণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু মহাপুরুষজীর আদেশে ধর্মসভার প্রচলিত রীতি অনুসারে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' পাঠ হতে লাগল। 'কথামৃত'-পাঠ শেষ হলে জনৈক শ্রোতা প্রশ্ন করলেন, "মহারাজ, ভগবানলাভের উপায় কি?" মহাপুরুষজী উত্তরে বলেন, "শাস্ত্রে তো ঈশ্বরলাভের নানারকম উপদেশ রয়েছে, কিন্তু শেষ কথা হলো শরণাগতি বা প্রপত্তি—তাঁর পাদপদ্মে আত্ম-সমর্পণ। সর্বপ্রকারে তাঁর চরণে আশ্রয় নিয়ে পড়ে থাকতে পারলে আর কোন ভয়-ভাবনা থাকে না। তবে ঈশ্বরে সম্পূর্ণ নিবেদন ও শরণাগতি একদিনে আসে না। এ বড় কঠিন ব্যাপার। যত কিছু পূজা, পাঠ, জপ, ধ্যান, কঠোর সাধনা সবই একমাত্র শরণাগতি আনবার জন্য। সবার উপরে চাই ঈশ্বর-কৃপা। অনন্যচিত্তে তাঁর স্মরণ-মনন, ধ্যান, চিন্তা ও প্রার্থনা করতে করতে তিনি কৃপা করে সেই দুর্লভ শরণাগতি দেন।" মহাপুরুষজীর পুণ্যদর্শনে ও উপদেশামৃত-শ্রবণে ভক্ত নরনারী সকলেই বিশেষ পরিতৃপ্ত হন।

* * *

একদিন মহাপুরুষজী প্রাচীন ভক্ত শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র নাগ মহাশয়ের আকুল আগ্রহে তাঁর বুড়ীগঙ্গার অপর তীরস্থ বেঞ্জারা গ্রামের বাড়িতে শুভ-পদার্পণ করেন। সেবকগণ, ঢাকা মঠের কতিপয় সাধু-ব্রহ্মচারী এবং ভক্তগণ তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন। মহাপুরুষজীর পূর্ববঙ্গে গ্রাম-দর্শন বোধ হয় এই প্রথম। বুড়ীগঙ্গা নদী নৌকায় পার হয়ে মহাপুরুষজী পালকিতে না উঠে পায়ে হেঁটেই গ্রামের পথে হরিৎক্ষেত্র, গাছপালা, বাড়ি-ঘর, কৃষকদের গরু-বাছুর দেখে আনন্দ করতে করতে হরেন্দ্রবাবুর বাড়ির দিকে রওনা হলেন। হরেন্দ্রবাবুর বাড়িতে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করে ঠাকুরপ্রণামান্তে মহাপুরুষজী বললেন, "হরেন ও তার স্ত্রীর ঐকান্তিক ভক্তি, বিশ্বাস, অনুরাগ ও একনিষ্ঠ সেবায় শ্রীশ্রীঠাকুর জাগ্রত হয়ে আছেন। এমন ভক্তি, বিশ্বাস, অনুরাগ ও নিষ্ঠাতেই তো ভগবান ঘরে বাঁধা থাকেন। হরেন, ধন্য তুমি ও তোমার

স্ত্রী।” হরেন্দ্রবাবুর স্ত্রীকে ডেকে মহাপুরুষজী বললেন, “দেখ, মা, তুমি নিষ্ঠা ও ভক্তির সঙ্গে এবং সযত্নে আজ শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগটি রান্না কর। আমি পুজো ও ভোগনিবেদন করব।” মহাপুরুষজীর নির্দেশে তাই হয়েছিল। হরেন্দ্রবাবু ও তাঁর সহধর্মিণীর ভক্তি, শ্রদ্ধা, সেবাযত্ন ও আদর-আপ্যায়নে মহাপুরুষ মহারাজ অতিশয় সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হন।...

ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের খুব কাছেই ভক্ত শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষের বাসাবাড়িতেও মহাপুরুষজী একদিন কৃপা করে পদধূলি দিয়েছিলেন। ঘোষ মহাশয়ের বাড়িতে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করে ঠাকুরপ্রণামান্তে বলেন, “যোগেশ, তোমার family shrineটি (পারিবারিক দেউলটি) বেশ সুন্দর ও পবিত্র।” যোগেশবাবু তখন স্থানীয় পগোজ হাই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তিনি প্রণাম করতেই মহারাজ স্নেহভরে তাঁকে বলতেন, “পগোজ, পগোজ।” এই পগোজ স্কুলের প্রাঙ্গণেই স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ঢাকাবাসীদের অভ্যর্থনার প্রত্যুত্তরে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। যোগেশবাবু পরবর্তী কালে উকিল হয়েছিলেন এবং ঢাকা মঠের জনহিতকর কাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তখনও বেলুড় মঠে মহাপুরুষজীকে প্রণাম করলেই মহারাজ স্নেহমাখা ‘পগোজ, পগোজ’ সম্বোধনে তাঁকে আপ্যায়িত করতেন। ভক্তদের সঙ্গে এমনি ছিল মহাপুরুষজীর একটা প্রেমের সম্পর্ক!

মহাপুরুষজীর ঢাকায় অবস্থানকালে স্বামী ভোলানন্দ গিরি হরিদ্বার থেকে ঢাকায় এসে তাঁর মন্ত্রশিষ্য জমিদার শ্রীযোগেশচন্দ্র দাস কর্তৃক স্থাপিত স্বামী ভোলানন্দ গিরি আশ্রমে কিছুদিন যাবৎ বাস করছিলেন। আশ্রমটি ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠেরই অল্প দক্ষিণে অবস্থিত। মহাপুরুষজীর ঢাকায় আগমনের কথা শুনে গিরিজী একদিন ঢাকা মঠে তাঁকে দর্শন করতে আসেন। মহাপুরুষ মহারাজ স্বামী ভোলানন্দজীকে যথোচিত সম্মানের সহিত আপ্যায়িত করেন। দেখা হতেই স্বামী ভোলানন্দ গিরিজী মহাপুরুষজীর পাদস্পর্শ করে সশ্রদ্ধ প্রণাম এবং পরে সপ্রেম আলিঙ্গন করেন। প্রণামের সময় মহাপুরুষজী বললেন, “গিরিজী, পায়ে হাত দিয়ে আবার প্রণাম কেন? আপনি সাধুলোক।” তাতে গিরিজী হাতজোড় করে খুব বিনীতভাবে বললেন, “সেকি? আপনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ পার্ষদ। আপনি নমস্য। আপনাকে প্রণাম করব না?” তারপর উভয়ের মধ্যে অনেক হৃদ্যতাপূর্ণ আলাপাদি হলো। গিরিজী বিদায় নিয়ে যাবার সময় মহাপুরুষজীকে (ঢাকায়) ভোলানন্দ-আশ্রম পরিদর্শন করতে আমন্ত্রণ জানালেন। গিরিজী চলে গেলে মহাপুরুষজী নিকটস্থ ভক্তদের বললেন, “ভোলানন্দজী সাধুলোক। আমরা যখন উত্তরাখণ্ডে তপস্যাদি করি, তখনই তাঁকে কঠোর তপস্বী দেখেছি। আমাদের তপস্যাস্থানের কাছেই তিনি

সাধন-ভজন করতেন এবং প্রায়ই দেখা-সাক্ষাৎ হতো।" দুদিন পরে মহাপুরুষ মহারাজ ভক্তগণসহ পদব্রজে ভোলানন্দ-আশ্রমে যান। আশ্রমের ফটকের কাছে একজন ভিখারি মহাপুরুষজীর সামনে এসে কাতরভাবে কিছু ভিক্ষা চাইল। করুণার্দ্র মহারাজ ভিক্ষার্থীর দিকে একবার চেয়েই সঙ্গী ভক্তগণের কারুর কাছে কিছু টাকা-পয়সা আছে কিনা জিজ্ঞেস করেন। জনৈক ভক্ত তৎক্ষণাৎ একটি টাকা মহাপুরুষজীর হাতে দিলেন। "নে, বাবা, দরিদ্রনারায়ণ"—বলে মহাপুরুষজী ভিখারিকে টাকাটি দিলেন। ভোলানন্দজী মহাপুরুষ মহারাজকে আশ্রমে সাদর অভ্যর্থনা করেন। মহাপুরুষজী আশ্রমটি ঘুরে ঘুরে দেখে খুব প্রীত হন এবং সন্ধ্যার পূর্বেই ঢাকা মঠে প্রত্যাবর্তন করেন।...

মহাপুরুষজীর ঢাকায় অবস্থানকালে স্থানীয় ও পূর্ববঙ্গের অন্যান্য স্থানের বহু ভক্ত নরনারী তাঁর কাছে মন্ত্রদীক্ষা পাবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ ও ইচ্ছা প্রকাশ করেন। প্রথমত তিনি মন্ত্রদীক্ষা দিতে সম্মত হননি। পরে ভক্তদের আগ্রহাতিশয্যে ও ব্যাকুলতায় মহাপুরুষজীর দয়ার্দ্র হৃদয় বিগলিত হয়। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রেরণায় ও আদেশে এবং রামকৃষ্ণ-সংঘের তদানীন্তন অধ্যক্ষ গুরুভ্রাতা পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের সানন্দ সম্মতিতে ঢাকাতেই প্রথম প্রায় একশত ভক্ত নরনারীকে মন্ত্রদীক্ষা প্রদান করেন। এ দীক্ষা সম্বন্ধে মহাপুরুষজী একসময় বলেছিলেন, "ঢাকাতে অনেক ভক্ত নরনারী শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় তাঁর নাম পেয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর একসময় আমাকে বলেছিলেন, 'কালে তোদের বহু লোককে দীক্ষা দিতে হবে।' আমি ঠাকুরকে তখনি বলেছিলুম, 'আমি কিন্তু ওসব পারব না।' শুনে ঠাকুর বলেছিলেন, 'সে ঈশ্বরের ইচ্ছা। পরে দেখা যাবে, তুই এখন এত ভাবছিস কেন?' ঠাকুরের কথা কখনো মিথ্যা হয়? সে কতকালের কথা—এতদিনে সত্য হলো! কে জানতো, বাবা, যে আমায় দীক্ষা দিতে হবে?"

মহাপুরুষজীর আধ্যাত্মিক শক্তির দুর্নিবার আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে সহস্র সহস্র ধর্মপ্রাণ মুমুক্ষু নরনারী পৃথিবীর নানাস্থান থেকে তাঁর পদপ্রান্তে উপস্থিত হতে লাগলেন আর মহাপুরুষজীও তাঁর ঐ শক্তি অকাতরে দান করে তৃপ্ত করতে লাগলেন তাঁদের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা। কোন কোন ভক্তকে মহাপুরুষজী বলেছেন, "ঠাকুরকে ও আমাদের নিত্য অন্তত একবার স্মরণ করবে শত কাজের মধ্যেও, তাহলেই হয়ে যাবে। ঠাকুরের যে প্রিয়, সে যে আমাদেরও অতি প্রিয়। তোমাদেরও যে এত স্নেহ করি, ভালবাসি, তোমরা তাঁর ভক্ত বলেই—অন্য কিছুর জন্য নয়।"

* * *

বাংলা ১৩৩৪ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম সপ্তাহে—২ জ্যৈষ্ঠ (ইংরেজি ১৯২৮

সনের মে মাস) আমার দীক্ষার দিন। কিছু আম মিষ্টান্নাদি, একখানা ঢাকাই তাঁতের লালপেড়ে মিহি কাপড় ও কিঞ্চিৎ গুরুদক্ষিণাসহ আমি বেলুড় মঠে পুরাতন ঠাকুরঘরের বারান্দায় শুভক্ষণের প্রতীক্ষায় রইলাম। পরমারাধ্য মহাপুরুষজী নির্দিষ্ট সময়ে নিজের ঘর থেকে ঠাকুরঘরে এলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতির সম্মুখে রক্ষিত ও পূজিত ইষ্টকবচের দিকে মুখ করে আমায় পশ্চিমাস্য হয়ে বসতে আদেশ করলেন। মহারাজজী স্বয়ং উত্তরাস্য হয়ে উপবেশন করলেন এবং আচমনাদির পর শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে অঞ্জলি দান করবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিশেষ ভাবান্তর লক্ষিত হলো। ঐ অবস্থায় যেন আবিষ্টের মতো মহাপুরুষজী দীক্ষামন্ত্র গুরুগম্ভীর স্বরে অনেকবার উচ্চারণ করে আমাকে তদনুরূপ করতে বললেন। তারপর মন্ত্রার্থ বুঝিয়ে দিয়ে কিভাবে নিত্য নিয়মিত জপ-ধ্যান করতে হবে, বলে দিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের 'ইষ্টকবচ' যে পাত্রে রক্ষিত আছে, তা স্পর্শ ও প্রণাম করতে বললেন। সর্বশেষে বললেন, "আজ হতে তোমার নূতন জীবন আরম্ভ হলো। কায়মনোবাক্যে খুব বিশ্বাস ভক্তি অনুরাগ ও প্রেমের সঙ্গে এ ইষ্টমন্ত্র সাধন করবে—যখন যেমন সুবিধা হয়, প্রতিদিন অন্তত (সকাল-সন্ধ্যা) দুই সময়ে। আর ঠাকুর-স্বামীজীর কথা পড়বে, 'কথামৃত' পাঠ করবে।" দীক্ষান্তে মহাপুরুষজীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলাম। তিনি আশীর্বাদ করে বললেন, "যাও, মন্দিরের বারান্দায় বসে মনে মনে জপ অভ্যাস কর।" আদেশমত জপ অভ্যাস করতে লাগলাম।

দীক্ষার পরদিন বিকালে মহাপুরুষজী নিজের ঘরের উত্তরদিকের ছাদের উপর চেয়ারে বসে আছেন—অন্তর্মুখ ভাব। কিছুক্ষণ পরে জনৈক অধ্যাপক ও এক ভদ্রলোক এসে মহাপুরুষজীকে প্রণাম করে বসলেন। ভদ্রলোকটি অধ্যাপকের পরিচয় দিলেন। অধ্যাপক বললেন, "মহারাজ, আমি বর্তমানে মেদিনীপুর কলেজের অধ্যাপক। আমার নিজের বাড়ি ও শ্বশুর বাড়ি কলকাতায়। নানা অসুখে ভুগে ক্ষীণস্বাস্থ্য হয়েছি। এত কাছে থেকেও একবার বেলুড় মঠে এসে আপনার শ্রীচরণ দর্শন করবার সুযোগ পাইনি। সুযোগ পেলেও মন হয়নি। ছাত্রজীবনে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করতাম, শিবনাথ শাস্ত্রীর বক্তৃতাদি শুনে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম, কিন্তু সাধনপথে একটুও অগ্রসর হতে পারিনি। জীবনটা বৃথাই গেল। এখন আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় নেবার ইচ্ছায় এখানে এসেছি, যদি কৃপা করে অধমকে শ্রীপদে স্থান দেন, তবেই মনে শান্তি পাব, নচেৎ এ জীবন একেবারে নিষ্ফল হবে। আমার স্ত্রী খুব ধর্মপ্রাণা ও ভক্তিমতী, তাঁর পূজার্চনায় আগ্রহ ও নিষ্ঠা দেখে আমার মনে হিংসাই হয়। তিনি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী সারদাদেবীর কাছে মন্ত্রদীক্ষা পেয়েছেন। খুব সাধন-ভজন করেন, কিন্তু আমি তাঁর কাছে কিছুই নই।" মহাপুরুষজী অধ্যাপকের সকল কথা শুনে বললেন, "ভয় কি? তোমার স্ত্রী যখন

ধর্মপথের সহায় আছে, তখন কোনই ভাবনা নেই। গত জীবন একেবারে ভুলে যাও। Begin your life afresh from now—এখন থেকে নূতনভাবে জীবন আরম্ভ কর। সব ঠিক হয়ে যাবে। ব্রাহ্মসমাজে গিয়েছ তাতে কোন দোষ হয়নি। আমিও পূর্বে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করতুম। শিবনাথ শাস্ত্রী পণ্ডিত ও বক্তা ছিলেন—লোকও ভাল। আমরা অনেকদিন একসঙ্গে কত ধর্মকথা আলোচনা করেছি। তবে তার গোঁড়ামি একটু ছিল, এই যা। ভগবান নিরাকার, তিনি সাকার হতে পারেন না—ব্রাহ্মসমাজের এই গোঁড়ামি!" একথা বলে মহাপুরুষজী ব্রহ্মের স্বরূপ (সাকার ও নিরাকার) সম্বন্ধে অনেকক্ষণ বললেন, "ব্রহ্ম অনন্ত, তাঁর অনন্ত নাম, অনন্ত রূপ, তাঁকে জানবার পথও অনন্ত; ভক্তেরা তাঁকে যে নামে, যে রূপে ও যে পথেই জানতে চান, তাঁরা সে ভাবেই জানতে পারেন। তিনি নিরাকারও বটে, নাম-রূপের অতীত, অনামী, অরূপও বটে। জ্ঞানের পথে নিত্যানিত্যবস্তু-বিচারের দ্বারা জ্ঞানীরা নিরাকার ব্রহ্মের উপলব্ধি করেন, এ বড় কঠিন সাধন। আবার তিনি সাকার নিরাকারের পারে, আরও কত কিছু! কে তাঁকে জানতে পারে, যদি তিনি কৃপা করে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ না করেন? এরূপ গোঁড়ামি ভাল নয় যে, তিনি শুধু সাকার, তিনি নিরাকার নন, আবার তিনি শুধু নিরাকার, তিনি সাকার হতে পারেন না। এসব একদেশী ভাব, যাকে ঠাকুর 'মতুয়ার বুদ্ধি' বলতেন—এ ভাল নয়, এতে সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়।"...

বছরে দু-বার—জ্যৈষ্ঠমাসে গ্রীষ্মের ছুটিতে ও ডিসেম্বরে বড়দিনের ছুটিতে মহাপুরুষজীকে দর্শন করতে বেলুড় মঠে যেতাম এবং কয়েক দিন তাঁর দিব্যসান্নিধ্যে পরমানন্দে কাটাতাম। রোজ প্রাতে প্রণাম করতে গেলেই মহাপুরুষজী জিজ্ঞেস করতেন, "রাত্রে ঘুমের কোন অসুবিধা হয়নি তো? আমি তো, বাবা, এখন নিচে যেতেও পারি না। কারুর খোঁজ-খবরও নিতে পারি না—শরীর অথর্ব হয়ে গিয়েছে।" কোন অসুবিধা হয়নি বললে তিনি খুব আনন্দিত হতেন। তাঁর এমনি স্নেহমাখা কথা ও আচরণে ভক্তবাৎসল্য ও করুণাই স্বতঃপ্রকাশিত হতো। এইভাবে যে কয়দিন মহাপুরুষজীর সান্নিধ্যে থাকবার সুযোগ হয়েছিল, পরমানন্দে দিনগুলি কেটে গেল।...

১৯২৯ সালের ২৬ ডিসেম্বর, অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা-একাদশী। আজ পূজ্যপাদ মহাপুরুষজীর শুভ জন্মতিথি। বেলুড় মঠে বিস্তর ভক্ত-সমাগম হয়েছে। ভক্তগণ একে একে এসে তাঁকে দর্শন ও প্রণাম এবং আশীর্বাদ-ভিক্ষা করছেন। আমিও কিছু ফল, মিষ্টি ও একখানা কাপড় শ্রীচরণে রেখে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলাম। আমার যাতে ভগবানে ভক্তি-বিশ্বাস ও অনুরাগ বৃদ্ধি পায়, সেজন্য তিনি আন্তরিক আশীর্বাদ

করলেন। আমার প্রণামের পর কয়েকজন মহিলা-ভক্ত প্রণাম করতেই মহাপুরুষজী দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে নিমীলিতনেত্রে ভাবে তন্ময় হয়ে বলতে লাগলেন, "মা আনন্দময়ী! মা আনন্দময়ী! মা আনন্দময়ী!" শ্রীচরণে প্রণামী টাকা রাখায় মহারাজ মহিলা-ভক্তদের বললেন, 'টাকা-পয়সা পায়ে দিতে নেই, নিচে রাখ। টাকা লক্ষ্মী।"...

সে বৎসর সাধু-ভক্তগণ বেলুড় মঠে তাঁর শুভ জন্মতিথি উদ্‌যাপন করবার ঐকান্তিক ইচ্ছা ও আগ্রহ প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে মহাপুরুষজীর অনুমতি চাইতে তিনি স্পষ্টই বলে দিলেন, "আমার তো জন্মই হয়নি—আমি অজ নিত্য শাশ্বত পুরাণ আত্মা। আমার আবার জন্মোৎসব কি?" সাধু-ভক্ত উদ্যোগিগণ উপায়ান্তর না দেখে মহাপুরুষজীকে জানালেন যে ঐ দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজার্চনা ভোগরাগাদি হবে এবং সাধু-ভক্তগণ সকলেই প্রসাদ গ্রহণ করবেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা ও ভোগরাগাদি হবে শুনে তিনি অতিশয় আনন্দিত হন এবং উদ্যোক্তাদের উৎসব পালন করতে অনুমতি দেন। মহাপুরুষজীর উচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও বিদেহ-ভাব এবং গুরু-ইষ্টগতপ্রাণতা দেখে সকলেই বিস্ময়-বিমুগ্ধ হন। তাঁদের ইচ্ছাও পূর্ণ হলো। বিশেষ সমারোহে উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। সেদিনকার শুভ অনুষ্ঠানে যোগদান করার পরম সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সে উপলক্ষে পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁর কলকাতা রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটি থেকে মঠে এসেছিলেন। মঠে পৌঁছেই তিনি উৎসবের সমারোহ ও আয়োজন দেখে আনন্দে বললেন, "মহাপুরুষের উপযোগী জন্মোৎসবই উদ্‌যাপিত হচ্ছে।" মঠের বিরাট প্রাঙ্গণে ভক্তগণ প্রসাদ পেতে বসেছিলেন এবং মাঝে মাঝে শ্রীশ্রীঠাকুরের ও মহাপুরুষজীর জয়ধ্বনি দিচ্ছিলেন। মহাপুরুষ মহারাজ নিজের ঘরের জানালা দিয়ে বিশাল জনসঙ্ঘের প্রসাদগ্রহণ দেখছিলেন।...

* * *

২৭ ডিসেম্বর। প্রাতে প্রণাম করতেই মহাপুরুষজী কিছুক্ষণ তন্ময় হয়ে এই বলে আশীর্বাদ করলেন, "ঠাকুর তোমার ভেতর সর্বদা জাগ্রত থাকুন। তোমার খুব ভক্তি বিশ্বাস জ্ঞান হোক।" কিভাবে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতে হয় জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, "খুব ব্যাকুল হয়ে ও আন্তরিকতার সঙ্গে এভাবে প্রার্থনা করবে— 'হে প্রভো, আমার সাধন নেই, ভজন নেই, জ্ঞান নেই, ভক্তি নেই, বিশ্বাস নেই, বিবেক-বৈরাগ্য নেই। তুমি কৃপা করে তোমার পাদপদ্মে আমার শুদ্ধা ভক্তি, দৃঢ় বিশ্বাস, ঠিক ঠিক জ্ঞান-বিবেক-বৈরাগ্য দাও। তুমি যুগে যুগে দয়া করে নানারূপে আবির্ভূত হয়ে ভক্তদের উদ্ধার করেছ, নইলে তাদের কি সাধ্য ছিল যে, তোমায় জানতে পারে। এবার তুমি শ্রীরামকৃষ্ণরূপে দর্শন দিয়ে আমায় কৃতার্থ কর।' আর

জানবে ঠাকুর রামকৃষ্ণ জীবন্ত জাগ্রত দেবতা, পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ—তিনিই লোক-কল্যাণের জন্য দেহধারণ করেছেন।"...

২৮ ডিসেম্বর। প্রাতে মহাপুরুষজী বেলুড় মঠে গঙ্গার ধারের ঘরের দোতলা বারান্দায় এসে উত্তর-দক্ষিণে পায়চারি করছেন। আমি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলাম। সূর্যের কিরণ বারান্দায় প্রবেশ করেছে দেখেই মহাপুরুষজী বলছেন, "সূর্যের তেজ জীবনস্বরূপ, সব সজীব হয়ে ওঠে।" তারপর গুরুগম্ভীর স্বরে গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করে বললেন, "গায়ত্রীতেও 'সবিতুর্বরেণ্যং' কথা আছে। সবিতা জগৎকে পালন করছেন। গায়ত্রী কি সুন্দর ও কবিত্বপূর্ণ! এখন গায়ত্রী-মন্ত্রের তত বেশি চল নেই। কুলগুরুরা এ মন্ত্র দেন বটে, কিন্তু শিষ্যরা অর্থ না বুঝে আবৃত্তি ও উচ্চারণ করে, কাজেই তার দ্বারা বিশেষ ফল হয় না। অর্থ না বুঝে mechanically (কলের মতো) শুধু মন্ত্রোচ্চারণ করলেই ফল হয় না, ভক্তি বিশ্বাস হয় না—ঐগুলি তো শব্দের সমাবেশ মাত্র। ওঁ হরি, ওঁ নমো নারায়ণায়, ওঁ তৎসৎ, ওঁ শ্রীরামকৃষ্ণায় প্রভৃতি মন্ত্রই যথেষ্ট। 'মা মা আনন্দময়ী'—এই যথেষ্ট, সংক্ষেপে কাজ হয়। নইলে কতকগুলি শ্লোক শব্দসমষ্টি অর্থ না বুঝে আওড়ে লাভ কি? মন্ত্রোচ্চারণ আর তাঁর কাছে কাতর প্রার্থনা এবং ক্রন্দন—ভক্তি বিশ্বাস ও অনুরাগের জন্য। এতেই সব হয়। মানুষ এখন কিছুই পারে না। শিক্ষাদাতাও নেই। অন্যান্য বৈষয়িক কাজে লোকে আনন্দ পায়, স্ফূর্তি পায়, কাজেই সেগুলি করে। অর্থ না বুঝে মন্ত্রোচ্চারণ ও জপ করে কোন আনন্দ পায় না, তাই জপাদি করতে রুচি হয় না এবং ফলও পায় না।"

* * *

একদিন গঙ্গার ধারের মঠবাড়ির দোতলা বারান্দায় মহাপুরুষজী একটু পায়চারি করছিলেন। আমি প্রণাম করে আমার একটি কঠিন সমস্যার কথা তাঁকে নিবেদন করলাম, "মহারাজ, আইন পরীক্ষায় পাশ করেছি। সনদ নিয়ে ওকালতি করবার জন্য অভিভাবকরা খুব পীড়াপীড়ি করছেন। কি করব ভেবে কিছু ঠিক করতে পারছি না।" মহাপুরুষজী আমার অতি কাছে এসে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "পারবে না, বাবা, পারবে না (হাতের আঙুল নেড়ে)। তুমি ওকালতি করতে পারবে না। ও ব্যবসা করার ধাত তোমার নয়। তোমার আলাদা প্রকৃতি ও সংস্কার, ধর্মভাব প্রবল। উকিলকে অনেক সময় মক্কেলের স্বার্থে সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য সাজাতে হয়। হাইকোর্টে অবশ্য কিছুটা কম—কাগজপত্র-দৃষ্টে মামলা করতে হয়। এ ব্যবসায় খুব ঝুনো বুদ্ধির দরকার। তা, বাবা, তুমি পারবে না। অভিভাবকরা বলুক গে, তারা তাদের ভাবে বলে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখছে।" মহাপুরুষজীর তীক্ষ্ণ ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি—ভিতরের সংস্কার ও প্রবৃত্তি দেখবার ও

বুঝবার অদ্ভুত শক্তিতে বিস্মিত হলাম। আমিও ইতস্তত করে প্রথমত সনদ গ্রহণ করিনি। পরে কিন্তু অভিভাবকদের পীড়াপীড়িতে ও তাগিদে সনদ নিয়ে কিছুকাল ঢাকা জজ-আদালতে যাওয়া-আসা করেছি। আশ্চর্যের বিষয়, আদালতের আবহাওয়া আমার কাছে খুবই অস্বস্তিকর বোধ হতো। শেষ পর্যন্ত সত্যদ্রষ্টা, ক্রান্তদর্শী মহাপুরুষজীর কথাই সত্য হলো। আইন-ব্যবসা আমার ভাল লাগল না—ছেড়ে দিতে বাধ্য হলাম। 'ঋষীণাং পুনরাদ্যানাং বাচমর্থোঽনুধাবতি'—ঋষিদের কথা বিফল হয় না। অব্যর্থ। সত্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলেই মহাপুরুষজী যা বলতেন তাই ভবিষ্যদ্বাণীর মতো ফলপ্রসূ হতো।...

আর একদিন কলকাতা কলেজ স্ট্রিট মার্কেট থেকে কিছু ফল-মিষ্টি কিনে মহাপুরুষজীকে দর্শন করতে গেলাম। প্রণাম করে ঐ ফল-মিষ্টি মহারাজের কাছে রাখলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "ফল-মিষ্টি ঠাকুরকে দিয়েছ?" আমি একেবারে অপ্রস্তুত, কারণ গুরুদর্শনের আগ্রহাতিশয্যে প্রথমেই ফল-মিষ্টি সহ মহাপুরুষজীর শ্রীচরণপ্রান্তে উপস্থিত হয়েছি, ঠাকুরঘরে তখনও যাইনি। বললাম, "ঠাকুরঘরে এখনও যাইনি।" মহাপুরুষজী তৎক্ষণাৎ ভাবে একান্ত অভিভূত হয়ে বললেন, "সে কি! ঠাকুরকে দাওনি? আগে ঠাকুর, তারপর আমরা। তাঁর অস্তিত্বেই আমাদের অস্তিত্ব। 'তমেব ভান্তম্ অনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।' ব্রহ্মের জ্যোতিতেই জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জ্যোতিষ্মান—উপনিষদে পড়নি? যাও, আগে ঠাকুরকে দিয়ে এসো।" আমি হতভম্ব হয়ে এবং একটি সম্পূর্ণ নূতন শিক্ষা পেয়ে তখনই ফল-মিষ্টির অর্ধেক ঠাকুরঘরে দিয়ে এলাম বাকি অর্ধেক মহাপুরুষজীর নিকট আনলাম। তখন মহাপুরুষজী শান্ত ও আনন্দিত হন। প্রতি কাজে, প্রতি আচরণে, প্রতি কথায়, প্রতি চিন্তায় মহাপুরুষজীর গুরু-ইষ্টগতপ্রাণতা প্রকাশ পেত। এই গুরু ও ইষ্টের প্রতি ভক্তি ও নিষ্ঠার কথাই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ বলেছেন, 'যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতাঃ হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥'—যাঁর ভগবানে গভীর ভক্তি আছে এবং গুরুতেও তেমনি গভীর ভক্তি রয়েছে, সেই মহাত্মার হৃদয়েই উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশিত হয়।

মহাপুরুষজী প্রতিদিন বিকালে গঙ্গার ধারে দোতলা বারান্দায় (স্বামীজীর ঘরের উত্তর পাশে) কিছুক্ষণ পায়চারি করতেন। নিজের ঘর থেকে বের হয়ে সামনের আর একটি প্রকোষ্ঠের ভিতর দিয়ে তিনি ঐ বারান্দায় যেতেন। ঐ ছোট প্রকোষ্ঠে পূজ্যপাদ সুবোধানন্দ মহারাজ (খোকা মহারাজ) থাকতেন। একদিন আরাম কেদারায় বসে গ্রন্থপাঠে নিযুক্ত খোকা মহারাজ মহাপুরুষজীকে ঐ ছোট প্রকোষ্ঠের ভিতর দিয়ে আসতে দেখে সসম্ভ্রমে দাঁড়ালেন! মহাপুরুষজী খোকা মহারাজের দু-হাত ধরে

তাঁকে জোর করে বসিয়ে দিতে গিয়ে বললেন, "খোকা মহারাজ, তুমি দাঁড়ালে কেন? বসো, বসো! কি বই পড়ছিলে?" খোকা মহারাজ হাত জোড় করে বললেন, "পুরাণ পড়ছিলুম।" মহাপুরুষজী শুনে বললেন, "তোমার আবার পুরাণ পড়া কেন? তুমি তো পুরাণ-পুরুষই আছ। তোমার সবই লাভ হয়ে গিয়েছে।" ঘটনাটি সামান্য, কিন্তু এতে দুই গুরুভ্রাতার পরস্পরের প্রতি গভীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধার ভাব বিশেষভাবে পরিস্ফুট। "গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু'—এই ভাবই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণের পরস্পরের মধ্যে।

আমার দীক্ষার দিন মহাপুরুষজী আমায় বলেছিলেন—"ঠাকুর-স্বামীজীর বই পড়বে 'কথামৃত' পাঠ করবে।" মাস্টার মহাশয় একদিন কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন—"শুনেছি মহাপুরুষ মহারাজ প্রথম প্রথম যখন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে যেতেন—তখন তাঁর কথা এত ভাল লাগত যে তিনি ঐসব কথা মনোনিবেশ সহকারে শুনে একটি খাতায় লিখে রাখতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তা লক্ষ্য করে তারকনাথকে বলেছিলেন, 'তুই এসব কি কচ্ছিস? একাজ তোর জন্যে নয়, একাজ মাস্টারের জন্য। তুই লোকগুরু হবি, লোকশিক্ষা দিবি।' সে অবধি তারকনাথ ঠাকুরের কথা আর খাতায় টুকে রাখতেন না এবং যা কিছু লিখে রেখেছিলেন, সবই গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন দেন।"...

পরম পূজ্যপাদ শ্রীমহাপুরুষজীর সদাপ্রসন্ন বদন, ধ্যানপরায়ণতা, প্রশান্তচিত্ততা, সুমধুর স্নেহ-ব্যবহার, স্বল্পে সন্তোষ, তীব্র বৈরাগ্য, ত্যাগ, সংযম, অনাসক্তি, সতত ঈশ্বরতন্ময়তা, বিদেহভাব, লোককল্যাণচিকীর্ষা প্রভৃতি গুণরাজি সম্মিলিত হয়ে তাঁর 'শিবানন্দ' নাম সার্থক করেছিল। লোকে অনায়াসেই বুঝতে পারত ৺তারকনাথের কৃপায় যাঁর জন্ম হয়েছে, তার জীবনে শিবের গুণাবলী পরিস্ফুট হওয়া খুবই স্বাভাবিক। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানী পুরুষোত্তমের চরিত্র-মাহাত্ম্য-বর্ণনাচ্ছলে গীতায় বলেছেন ঃ

'নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥' (গীতা-১৫।৫)

—যাঁরা নিরভিমান ও বিবেকী, প্রিয় বা অপ্রিয় বস্তুর সমাগমে যাঁদের অনুরাগ বা বিরক্তি নেই, যাঁরা মায়াতীত, বিষয়াসক্তিশূন্য, আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ, কামনা-বাসনা-বর্জিত, শীতোষ্ণ-ক্ষুৎপিপাসা-সুখদুঃখরূপ দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত, তাঁরাই সম্যক আত্মজ্ঞান দ্বারা অবিনাশী ব্রহ্মকে লাভ করে। জ্ঞানী পুরুষোত্তমের গুণরাশি মহাপুরুষজীর মধ্যে স্পষ্টই প্রকট হয়েছিল।

ওঁ তৎ সৎ ওঁ

গুরুদেবের স্মৃতি

শ্রীযদুনাথ মজুমদার

১৯১১ সালের পূজার ছুটিতে ময়মনসিংহ জেলার বল্লারতনগঞ্জ হতে প্রথম বেলুড় মঠ-দর্শনে যাই। স্বামী ধীরানন্দ মহারাজের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়। শ্রীমন্দিরে ঠাকুরকে প্রণাম করে প্রার্থনাদি করার পরে তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন শ্রীমহাপুরুষজীর কাছে এবং আমার পরিচয় বললেন। ঐ সন্ন্যাসি-প্রবরকে যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাসঙ্গী জেনে আমি তখনই গঙ্গাসাক্ষী করে তাঁকে গুরুপদে বরণ করলাম এবং তাঁর শ্রীপাদপদ্মে মস্তক রেখে প্রণাম করে জন্মের মতো তাঁর দাস হলাম। আমার অন্তরদেবতা যেন বলে দিলেন—এই তোর গুরু। আমিও আবিষ্টের মতো দ্বিধাহীন-চিত্তে তাঁর চরণে আত্মনিবেদন করে ধন্য হলাম—তৃপ্ত হলাম। জ্বলন্ত অনলের মতো দিব্যকান্তি ঐ বিশাল পুরুষপ্রবরকে দর্শন করে, ইনি ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ এবং যুগে যুগে অবতারের লীলাসঙ্গী—এই চিন্তায় আমি বিহ্বল হয়ে গেলাম এবং নিজেকে মহাভাগ্যবান মনে হলো। পূর্বদিন সদ্‌গুরুলাভের জন্য সমগ্র অন্তর জুড়ে যে দারুণ অভাববোধ আমাকে অস্থির করেছিল তা আশ্চর্য উপায়ে শান্ত হলো। আমার কি নাম, কোত্থেকে এসেছি, আত্মীয়স্বজন কে আছে না আছে, তা তিনি অতি আপনজনের মতো সব জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। তাঁকে দর্শন করেই প্রাণের আবেগে আমার কণ্ঠরোধ হয়ে এলো, বুদ্ধি বিকল হলো—আমি অবশের মতো কোনপ্রকারে তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিলাম এবং শেষকথা এই বললাম—"মহারাজ, আমি ঘর ছেড়ে এসেছি—আর বাড়ি যাব না। আপনি আমায় কৃপা করুন, আপনার দাসরূপে আশ্রয়দান করুন। আমি এখানে আপনার সেবক হয়ে থাকব অথবা আপনি অনুমতি করলে আপনার কৃপালাভ করে হিমালয়ের গভীর বনে প্রবেশ করে কৃচ্ছ্রসাধনে জীবনপাত করব।"

মহাপুরুষজী বললেন, "তুমি ছেলেমানুষ, কোথায় বনে-জঙ্গলে যাবে? এ মঠেও এখন থেকো না। কিছু অর্থ উপার্জন করে মায়ের সেবা কর। তুমি ঘর ছাড়লে তোমার মায়ের অন্নবস্ত্রের কষ্ট হবে। ঘরে থেকেই জপতপ ও মায়ের সেবা কর। সর্বদা চিঠিপত্র লিখবে এবং আমাদের কাছে যাতায়াত করবে।"

এসব কথাই ভাল করে বুঝিয়ে তিনি আমায় গৃহে ফেরত পাঠালেন। ঘর ছাড়বার প্রবল উদ্যমে এভাবে দারুণ বাধাপ্রাপ্ত হয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও গৃহে প্রত্যাবর্তন করলাম।

* * *

কিছুদিন পরেই গরমের ছুটি। তখন পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ কনখলে। তাই হরিদ্বার অভিমুখে যাত্রা করলাম। কনখল সেবাশ্রমে পৌঁছে মহাপুরুষ মহারাজ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী শঙ্করানন্দ, স্বামী কল্যাণানন্দ, স্বামী অচলানন্দ ও স্বামী নিশ্চয়ানন্দ প্রভৃতিকে দর্শন ও প্রণাম করে খুবই আনন্দ পেলাম। হরিদ্বার যাবার কিছুকাল পূর্বে মহাপুরুষ মহারাজকে এক চিঠিতে জানিয়েছিলাম যে, প্রাণপণ জপ-তপ করে রাত জেগে কোনপ্রকারেই ভগবানের দর্শন পেলাম না। অতএব আর চেষ্টা করব না। ঐ চিঠির জবাবে তিনি লিখেছিলেন—..."ভক্তের আবদার ভালবাসা সকলই ভগবানের সহিত—অভিমান তাহাও ভগবানের সহিত। ইহাতে অস্বাভাবিকতা কিছুই নাই। প্রাপ্যবস্তু চাহিয়া যখন পাওয়া যায় না, বাস্তবিকই অবিশ্বাস ইত্যাদি নানারূপ ভাব মনকে অধিকার করে এবং অভিমানও হয়। বাস্তবিক ভক্ত আর কাহার উপর রাগ-অভিমান করিবে, তার যাহা কিছু সমস্ত ভগবানের উপর, প্রীতি—তাহাও ভগবানের সহিত, কলহ—তাহাও তাঁর সহিত। অতএব প্রভুকে ছাড়িও না। প্রেমে হউক, অপ্রেমে হউক তাঁহাকে ছাড়িতে পারিবে না। যে শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রয় এক মুহূর্তের জন্য সমস্ত প্রাণের সহিত গ্রহণ করিয়াছে, সে তাঁহাকে ছাড়িতে চাহিলেও তিনি তাহাকে ছাড়িবেন না—ইহা নিশ্চয় জানিও।"...

মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে দেখা হতে ঐসব কথা আলোচনা হলো। ঐ প্রসঙ্গে তিনি আমার হরিদ্বার আসার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম—"দুনিয়াদারি আমার কিছু ভাল লাগে না। আমি আপনার কাছে থাকব, দীক্ষাগ্রহণ করে জপ-তপ করব। যদি এখানে থাকতে না দেন তো হিমালয়ের গভীর বনে চলে যাব, সেখানেই তপস্যায় জীবনপাত করব।"

মহাপুরুষজী পূর্বের মতোই বললেন—"তুমি এখনো ছেলেমানুষ; কোথায় বনে যাবে? তাছাড়া তোমার মা আছেন। জপ-তপ কর, চাকরি কর। মায়ের সেবার জন্য টাকা রোজগার কর, নইলে তিনি কি খাবেন—তিনি বাঁচবেন কি করে? মায়ের কষ্ট হলে ধর্মকর্ম কিছুই হয় না। এখন এই কর। সাধু হতে চাও, তা আরো পরে হবে।" এভাবে তিনি নানারকমে আমায় বোঝাতে লাগলেন, কিন্তু তাঁর কোন কথাই মানছি না দেখে তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজের কাছে নিয়ে গিয়ে তাঁদের আমায় বোঝাতে বললেন।

মহাপুরুষজীর কথায় তাঁরা সস্নেহে আমায় বসতে বললেন। রাখাল মহারাজ অতি মধুরভাষী, তাঁর গলার স্বরও সরু। তিনি আলো ধরে আমার মুখ দেখলেন এবং বললেন—"তুই তো নেহাৎ ছেলেমানুষ! এই কচি বয়সে কি সাধু হবি? এখন মায়ের কাছে থাকগে। সাধু হবি তো বছর দুই পরে হবি। আমি তোর মতো বয়সেই বের হয়েছিলুম।" হরি মহারাজও আমায় অনুরূপ কথা বলে নানাভাবে বোঝাতে লাগলেন—যাতে আমি আরও কিছু বড় হয়ে ঘরের বার হই। আমি কিন্তু তাঁদের কোন কথাতেই সম্পূর্ণ রাজি হলাম না, বললাম—"তবে আমি তিন দিন এখানে থাকি। ভেবে চিন্তে যা হয় ঠিক করব।" এ কথা শুনে মহাপুরুষজী খুবই সন্তুষ্ট হলেন। বললেন—"এ উত্তম বুদ্ধি। বেশ, তুমি তিন দিন এখানে থেকে কর্তব্য স্থির কর।"...

পরদিন দশহরার স্নান। সহস্র যাত্রী নানা দিগ্‌দেশ থেকে গঙ্গাস্নানের জন্য সমবেত হয়েছে। আমাকে গঙ্গাস্নানের জন্য মহারাজগণ স্বামী অচলানন্দজীর সঙ্গে গঙ্গায় পাঠালেন। মহাপুরুষ মহারাজ, রাজা মহারাজ ও হরি মহারাজ তিনজনই উত্তরদিকের দালান বাড়িটিতে থাকতেন। সকাল বিকাল এই তিনজনই তিনচার ঘণ্টা করে গভীর ধ্যানে ডুবে থাকতেন। জীবিত কি মৃত তখন কিছুই বোঝা যেত না! তিনজনেরই দিব্যদেহ তপ্তকাঞ্চনবর্ণ। পরিধেয় গৈরিকের সঙ্গে তাঁদের দেহের বর্ণ এক হয়ে গিয়েছে। মুখমণ্ডলে দিব্যব্রহ্মজ্যোতি। জাগতিক কোন মলিনতা এঁদের স্পর্শ করেনি। এঁরা শ্রীভগবানের মানবীয় লীলার সঙ্গী। এমন সুন্দর মানুষ আমি জীবনে পূর্বাপর কখনও দেখিনি। এই সন্ন্যাসী মহাপুরুষগণ তাঁদের প্রাণের দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ধ্যান চিন্তা করতে করতে এমন অমলকান্তি বিমলজ্যোতি প্রাপ্ত হয়েছেন। কথায়, মমতায়, স্পর্শে ও ভঙ্গিতে জীবজগতের মায়াব্যূহ ব্যবচ্ছেদ করতে পারেন।...

* * *

পরদিন সকালবেলা মহাপুরুষ মহারাজ দুটি সন্দেশ হাতে নিয়ে আমার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে উত্তরদিকের দালানবাড়ি থেকে নেমে আমার খোঁজ করছিলেন। আমি নির্জনে একা বসেছিলাম আপনমনে—দক্ষিণদিকে কুয়ার ধারে একটি ছোটঘরে। তাঁর ডাক শুনে ঘর থেকে বের হয়ে এগিয়ে আসতেই দেখি তিনি অনেকটা এগিয়ে এসেছেন আমার খোঁজে। স্নিগ্ধ হাসি, স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি—ঠিক যেন মা যশোদা। তাঁকে দেখেই এক অভূতপূর্ব আনন্দের স্পন্দনে আমার চোখে জল এল। তিনি সস্নেহে সন্দেশ দুটি আমার হাতে দিয়েই বললেন—"নাও, এই সন্দেশ খেয়ে একটু জল খাও।" আবেগে আমার কণ্ঠরোধ হয়ে গেল—আমি শুধু তাঁকে প্রণাম করে সন্দেশ হাতে নিলাম। শ্রীঠাকুর বলতেন—"আমরা একপা এগুলে, শ্রীভগবান দশপা এগিয়ে

আসেন।" ঠিক তাই। তিনি স্বয়মাগত হয়ে সন্দেশদানের ছলে আমাকে আত্মসাৎ করলেন। আমি চিরতরে তাঁর কাছে বন্দি হলাম। এই স্নেহের দানের মধ্যে কতবড় গুরুকৃপা ছিল, কত গুরুশক্তি নিহিত ছিল, তা তখন আমি বুঝতে পারিনি! কিন্তু আমার সমগ্র মনপ্রাণ অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে গিয়েছিল—আমি অভিভূত ও আবিষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম।...

ঐ দিন মধ্যাহ্নে বিভিন্ন আখড়ায় সাধু-মহাত্মাদের নিমন্ত্রণ করে রাজা মহারাজ এক বিরাট ভাণ্ডারার আয়োজন করেছিলেন। মহাতীর্থসেবী ঐ সাধুমহাত্মাদের দর্শন করে পরম তৃপ্তিলাভ করলাম। তাঁদের দিব্যকান্তি-দর্শনে প্রাণ জুড়াল! আনন্দে ভরে গেল অন্তর। আবার নিজের দৈন্যের দিকে তাকিয়ে বেদনাভারাক্রান্ত হলো প্রাণ। মনে হলো—সর্বত্যাগী না হলে জীবন বৃথা—ভগবানলাভ সুদূরপরাহত।

মধ্যাহ্নে পুরি, আলুকা শাক, রায়তা ও বিবিধ মিষ্টান্ন প্রভৃতি দ্বারা সাধুদের পরিতৃপ্ত ভোজন করানো হলো। তাঁরা সমস্বরে শ্লোক আবৃত্তি করতে লাগলেন আর আমোদ করে 'লাড্ডু আউর, রায়তা আউর দিজিয়ে' বলে বলে আনন্দে ভোজন করলেন। এই সাধু-সঙ্গতি কত মধুর, কত উদ্দীপক!

* * *

তৃতীয় দিন মহাপুরুষদের অমোঘ ইচ্ছাশক্তিতে আমার বুদ্ধি পরিবর্তিত হয়ে গেল। তাঁদের আদেশই সর্বান্তঃকরণে মেনে নিলাম। দেশে ফিরে যাওয়াই স্বীকার করলাম। এতে মহাপুরুষ মহারাজ বড় সন্তুষ্ট হলেন! বললেন, "এ তোমার উত্তম বুদ্ধি। এতে তোমার কল্যাণ হবে। ছেলেমানুষ—কোথায় বনে যাবে? মায়ের কাছে থাক, মায়ের সেবা কর। এ যুগে বনে গিয়ে তপস্যা করা বড় কঠিন! আমরা ওসব করেছি—তাই জানি। কত কষ্ট!"...

বিকালে মহারাজদের প্রণাম করে, তাঁদের শুভ-আশিস মস্তকে ধারণ করে রেলস্টেশনের দিকে যাত্রা করলাম। গামছাখানি ফেলে আসাতে পথ থেকে ফিরে আবার আশ্রমে গেলাম। তখন রাজা মহারাজ, হরি মহারাজ—এঁরা বসেছিলেন। ফিরে যেতে আমায় বললেন, "আবার কি সংবাদ?" গামছা ফেলে গিয়েছি জানতে পেরে সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "ভালই হলো। আবার দেখা হলো।" আমিও পুনঃ প্রাণভরে সকলের শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম করলাম। আসতে প্রাণ চাইছিল না, তাঁদের স্নেহ ভালবাসাতে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। কত আপনার, পরমাত্মীয় মনে হতো তাঁদের! চোখ মুছতে মুছতে যেন শুধু শরীরটি নিয়ে দেশের দিকে রওনা হলাম। প্রাণ রইল তাঁদের চরণতলে।...

একটা আশ্চর্য কথা। সারাজীবন যতবার মঠে গিয়েছি—শ্রীশ্রীমা, মহাপুরুষ

মহারাজ, রাখাল মহারাজ, প্রেমানন্দ স্বামী, সারদানন্দ স্বামী—এঁদের কাছে গিয়ে প্রণাম করা মাত্র আমার মনবুদ্ধি সব বিকল হয়ে যেত। শরীর-মনের সহজ অবস্থা এমনভাবে লোপ পেত যে, আমি যা যা জিজ্ঞেস করতে গিয়েছি সব ভুলে যেতাম। মন সংশয়মুক্ত হয়ে যেত—আনন্দে ভরে উঠত। মঠে অনুমান শত-শত বার গিয়েছি এবং শ্রীশ্রীমায়ের কাছেও গিয়েছি বহুবার—কোন বারেই এ অবস্থার ব্যত্যয় হয়নি। ব্রহ্মজ্ঞানীদের শক্তিতে বিবশ হয়ে গিয়েছি।...

বাড়ি এসে উপর্যুপরি দুরাত্রে দুটি স্বপ্ন দেখলাম। প্রথম রাত্রে দেখি আমি কলকাতায় কোন ভক্তের বাড়িতে দ্বিতলে বসে আছি। হরি-সংকীর্তন হচ্ছে। আমি গত কয়েক বছর সদ্‌গুরুলাভের জন্য দিনরাত্রি চেষ্টা করেছি, কত কান্নাকাটি করতাম। ঐ কীর্তন-সভার একজন আমায় আশ্বাস দিয়ে বললেন, "তুমি আর কেঁদো না। তোমার উপর সদ্‌গুরুর কৃপা হয়েছে।" এর দু-এক দিন পরে পুনঃ একরাত্রিতে স্বপ্নে দেখি মহাপুরুষ মহারাজ আমাদের বাড়ির শালগ্রাম ঠাকুর-ঘরে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বসে আছেন। এ দু-ঘটনা মিলিয়ে ক্রমে চিন্তা করে বুঝলাম আমি এই মহাপুরুষের চরণেই আত্মসমর্পণ করেছি। তিনি আমাকে দীক্ষা-মন্ত্রাদি না দিলেও স্নেহ-মমতা দিয়ে আমায় কৃপা করে গ্রহণ করেছেন।...

* * *

২২ ডিসেম্বর ১৯১৪ মহাপুরুষ মহারাজকে তৃতীয়বার দর্শন করি কাশীধামে শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমে। বড়দিনের ছুটিতে ২০ ডিসেম্বর সান্ধ্য আরাত্রিকের পর বেলুড় মঠে পৌঁছই এবং পূজনীয় স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজকে দর্শন ও প্রণাম করি। তাঁর অসীম স্নেহ-মমতায় অবগাহন করে সেই রাত্রি মঠেই কাটালাম। আমি যখন মঠে পৌঁছই তখন তিনি ঠাকুরঘরে ধ্যান করছিলেন। অনেকক্ষণ পরে নেমে এসে আমার মুখের কাছে একটি হারিকেন ধরে বললেন, "এ যে চেনা-চেনা মুখ বলে মনে হচ্ছে।" এই বলে আমার পিঠের দিক থেকে জড়িয়ে ধরে চিবুকে হাত দিয়ে বললেন, "আয়রে বাছা সোনার চাঁদ—" এবং আদর করতে লাগলেন। রাত্রে প্রসাদগ্রহণের পর আমাকে শুইয়ে গায়ের লেপ ও মশারির ব্যবস্থা করে পরে তিনি উপরে গেলেন। পরদিন কিছু বেলা পর্যন্ত রেখে নানা সংবাদ মহাপুরুষজীর কাছে বলবার জন্য কত করে বললেন—হয় তিনি আসুন মঠে নতুবা আমাকে সেখানে নিয়ে যান—দরদী না হলে প্রাণ বাঁচে না—ইত্যাদি অনেক কথা। এসব সংবাদ ও বুকভরা আশীর্বাদ নিয়ে আমি সেদিন শ্রীরামপুরে এক বন্ধুর বাড়িতে গেলাম এবং সেখান থেকে আমরা চার বন্ধুতে যথাসময়ে কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমে পৌঁছলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রণাম করে মহাপুরুষ মহারাজ ও স্বামী তুরীয়ানন্দজীকে

প্রণাম করি। মহাপুরুষজী আমাদের চারজনের জন্য আশ্রমের নিকটেই কুণ্ডুদের বাড়ি ভাড়া করে রেখেছিলেন। তিনি নিজে আমাদের সঙ্গে নিয়ে সে বাড়িতে পৌঁছে দিলেন। সেদিন সোমবার ও একাদশীর উপবাস ছিল। তিনি বললেন, "তোমরা বোধ হয় একাদশীর উপবাস কর না। আজ শুভদিনে বিশ্বনাথের স্থানে এসেছ। যাও, গঙ্গাস্নান ও বিশ্বনাথ-দর্শন করে আজ উপবাস কর। কিছু ফল ও সাবু ভিজিয়ে খেও।" আমরাও তাই করলাম।

সেবাশ্রমে পূজনীয় হরি মহারাজ ও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ আর অদ্বৈতাশ্রমে মহাপুরুষজী, চন্দ্র মহারাজ, স্বামী শান্তানন্দ প্রভৃতি ছিলেন। সন্ধ্যায় সেবাশ্রমে শ্রীশ্রীরামনাম-সংকীর্তন হলো। মহাপুরুষজী, স্বামী তুরীয়ানন্দ ও প্রজ্ঞানানন্দ স্বামী—এই কজনকে পৃথক আসন দেওয়া হলো। বাকি সব সাধু ও আমরা একসঙ্গে বসলাম। স্বামী বরদানন্দ যে রামনাম-কীর্তন করলেন তা শুনে এবং সাধুসঙ্গতিতে মন এমনই মুগ্ধ হলো যে, আর বাড়ি ফিরে যাব না স্থির করলাম। সাধুসঙ্গে শিবের স্থানেই জীবন কাটিয়ে দেব মনে করলাম। রামনাম-সংকীর্তন শেষ হলে মহাপুরুষ মহারাজ হরি মহারাজকে জিজ্ঞেস করলেন—তিনি আমায় চেনেন কিনা, তিন বৎসর পূর্বে হরিদ্বারে দেখা হয়েছিল। হরি মহারাজ আলো আনিয়ে আমার মুখ দেখে চিনতে পেরে খুব খুশি হলেন এবং বিবাহ করেছি কিনা জিজ্ঞেস করলেন। বিবাহ করিনি জেনে বিশেষ সুখী হলেন এবং বললেন, "বেশ হয়েছে।" কুণ্ডুদের বাড়ি কদিনের জন্য ভাড়া পেয়েছি জিজ্ঞেস করায় বললাম যে, সাতদিনের জন্য। শুনে তিনি স্নেহকাতর হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তারপর কোথায় যাবে? আমি যেতে দেব না। সেবাশ্রমে আমি যে বাড়িতে থাকি সেখানেই তোমার থাকার স্থান করে দেব। সেইখানেই থাকবে।" তাঁর স্নেহ-মমতায় আমার প্রাণ ভরে গেল। মহামহিমান্বিত পুরুষদ্বয়ের স্নেহে আমি স্বর্গসুখ অনুভব করলাম।

রোজ দু-বেলা মহাপুরুষজীকে দর্শন করি আর কথাবার্তা হয়, তিনি কত উপদেশ দেন। তিনি আমার নূতন সঙ্গী হরকুমার, যতীশ ও ক্ষিতীশকে রামকৃষ্ণ-নাম ও তাঁর শ্রীমূর্তি-ধ্যান করতে বললেন। ক্ষিতীশ তা শুনে কেঁদে বলল, "মহারাজ, আমি মহাপাপী। আমার কি উপায় হবে?"

তা শুনে মহাপুরুষজী বললেন, "ভয় কি, বাবা? তুমি কি পাপ করেছ? তুমি কি মদ খেয়েছ?" ক্ষিতীশ কাঁদতে কাঁদতে বলল, "না মহারাজ, আমি এসব কিছু করিনি।" মহাপুরুষ মহারাজ তখন বললেন, "তবে তুমি আর কি পাপ করেছ? শোননি, ঠাকুর বলতেন—পাপ তুলার পাহাড়। ভগবানের কৃপা হলে পর্বতপ্রমাণ পাপও পলকে ভস্মীভূত হয়ে যায়! তুমি ঠাকুরকে ডাক। ইহকাল পরকাল সকল

কালের মঙ্গল হবে।" সেদিন তাঁর কাছে বিদায় নেবার সময় তিনি আমাদের চারজনকে চারটি কমলালেবু দিলেন। পরে বুঝেছিলাম যে, লেবু অবলম্বন করে তিনি তাঁর বিশেষ আশীর্বাদই সেদিন আমাদের দিয়েছিলেন।...

বাসস্থানে ফিরে এসে হরকুমার বলল, "দাদা, আমি শ্রীগৌরাঙ্গকে ভালবাসি। তিনি আমাকে রামকৃষ্ণ-চিন্তা ও রামকৃষ্ণের নামজপ করতে কেন বললেন?" আমি বললাম—"বিকালে যখন যাবে তখন তুমিই এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস কর।"

বিকালে গিয়ে ঐকথা জিজ্ঞেস করতে মহাপুরুষজী বললেন, "শ্রীগৌরাঙ্গই অধুনা শ্রীরামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। যখন মনে লয় গৌরাঙ্গনাম এবং যখন মনে লয় রামকৃষ্ণনাম—তাই জপ ও চিন্তা কর।" মহাপুরুষজীর উপদেশ ও আশীর্বাদ তার ধর্মজীবনে বিপুল পরিবর্তন ও বিকাশ এনে দিয়েছিল। দেশে ফিরে এসে কিছুদিন পরে এক অদ্ভুত ঘটনা তার মনকে বিশেষ প্রভাবান্বিত করে। হরকুমার স্বপ্নে দেখে যে, একটা পাগলা হাতি তাকে তাড়া করেছে—সেও জীবনরক্ষার জন্য ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়চ্ছে। অকস্মাৎ ঐ বিপদের মুখে তার 'রামকৃষ্ণনাম' স্মরণ হলো। সে 'রামকৃষ্ণনাম' জপ করতে করতে দেখে যে, ঐ পাগলা হাতির ভিতর হতে 'শ্রীরামকৃষ্ণ' বের হয়ে এলেন!

ঘুম ভাঙ্গার পর সে জেগে দেখে যে, শ্রীগৌরাঙ্গমূর্তি ও নাম তার আর মনে আসে না। সব রামকৃষ্ণময় হয়ে গিয়েছে—সব আকর্ষণ রামকৃষ্ণে পর্যবসিত।

* * *

একদিন কাশী বিশ্বনাথের গলি থেকে বেশ বড় বড় গাঁদার মালা এবং বিল্বপত্র ও তুলসীপত্র কিনে এনে তাতে গঙ্গাজল প্রোক্ষণ করে পূজার জন্য নিয়ে এলাম। যদিও তুলসী শিবপূজায় প্রশস্ত নয় তবুও তুলসী আমার প্রিয় বলে গুরুপূজায় দেব স্থির করলাম। অদ্বৈতাশ্রমের পূর্ব-দালানের প্রকোষ্ঠে মহাপুরুষজী বসেছিলেন। আমি মালাটি তাঁর গলায় পরিয়ে ফুলবিল্বপত্রাদি তাঁর পায়ে অঞ্জলি দিয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম। তিনিও খুব আশীর্বাদ করেছিলেন।...

সাধু গৃহস্থ সকলেই মালাজপ করেন দেখে আমিও মালাজপ করব স্থির করে তাঁকে জানালাম। মহাপুরুষজী সানন্দে অনুমতি দিয়ে স্বামী শান্তানন্দকে একছড়া ভাল মালা কিনে গাঁথিয়ে আনার কথা বললেন। ঐ মালা গঙ্গায় ডুবিয়ে এনে মহাপুরুষজীর হাতে দিতে তিনি মালাছড়া মুঠো করে চোখ বুজে রইলেন খানিকক্ষণ—তারপরে নিজের মাথায় ও বুকে স্পর্শ করে আমার হাতে দিলেন। আমি দুহাতে অঞ্জলিভরে ঐ মালা নিয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম। তিনি মালাজপের

প্রণালী দেখিয়ে দিলেন—তর্জনী স্পর্শ করতে নেই—'সাক্ষী' লঙ্ঘন করতে নেই ইত্যাদি। তিনি মালাছড়া জপ করে দিলেন না বলে মনে দুঃখ রইল, কিন্তু তা প্রকাশ করার সাহস হয়নি।...

আমার পিতৃপুরুষের পিণ্ডদান করব কিনা গুরুদেবকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন—"ঠাকুর কিছুই নষ্ট করতে আসেননি। তুমি পিণ্ডদান করো।" আমার পিতৃপুরুষগণ মুক্তিলাভের জন্য সর্বদা আমাকে উত্ত্যক্ত করতেন। প্রায়ই স্বপ্নে দেখতাম তাঁরা বলছেন—"আমরা তোমার পূর্বপুরুষ।" একদিন তাঁরা সংখ্যায় দু-শত—তাও বলেছিলেন। সূক্ষ্মদেহে আমার চারদিকে তাঁরা উড়ে বেড়াচ্ছেন দেখেছিলাম।...

আমি কাশীধামে যাচ্ছি জেনে আমাদের গ্রামের ছোট ছোট ছেলেরা দু-আনা এক আনা করে সকলেই আমার কাছে মহাপুরুষ মহারাজের দুধখাবার জন্য পয়সা দিয়েছিল। ছেলেমানুষ বলে তার বেশি দেওয়া কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। মহাপুরুষজীকে ঐ সংবাদ জানাতে তিনি বড়ই সন্তুষ্ট হয়ে চন্দ্র মহারাজকে ঐ পয়সা দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের পায়েস-ভোগ দিতে বললেন।

বহুবাঞ্ছিত দেবতাকে আড়াই বৎসর পর পেয়ে চুম্বক-লোহার মতো মিলিত হয়ে গুরুকৃপামৃতে সাতদিন অবগাহন করে আমরা চারজন গয়ার পথে কলকাতায় রওনা হলাম।

* * *

এর পরে ১৯১৬ সনের অক্টোবর মাসে একদিন অপরাহ্নে বেলুড় মঠে গিয়েছিলাম। মহাপুরুষজীকে প্রণাম করে তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে কুমিল্লার দানবীর শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের পুত্রের (হেরম্বের) গৃহশিক্ষকতা-কাজের জন্য বৈদ্যনাথ যাচ্ছিলাম। মহাপুরুষজী আমায় দেখে খুবই সন্তুষ্ট হলেন। বললেন, "এতদিনে শ্রীঠাকুর তোমার কষ্ট দূর করলেন, মহেশবাবু বড় ভাল লোক।... এখন ঠাকুর তোমার বাহন জোগাড় করে দিলেন। সর্বদা এঁদের সঙ্গে মঠে আসবে-যাবে। কত তীর্থদর্শন এঁদের সঙ্গে হবে!" এভাবে কত আশীর্বাদ করলেন, কত কথা বললেন! প্রাণ শীতল হলো।

পূজনীয় বাবুরাম মহারাজের সেদিন জ্বর। তিনি মহাপুরুষজীর কাছে একখানি ইজিচেয়ারে চাদর-মুড়ি দিয়ে বসে জপ করছিলেন। তাঁর আশীর্বাদও আমায় দিলেন। কিছু মিছরি নিয়ে গিয়েছিলাম। দুজনেই তা প্রসাদ করে দিলেন। ঐ মিছরি-প্রসাদ সঙ্গে রেখে আমি রোজ এক কণা করে খাব—তাই ঐ প্রসাদ করিয়ে নিলাম।

দক্ষিণে লাইব্রেরি ঘরে পূজনীয় হরি মহারাজ ছিলেন। তাঁকে প্রণাম করতে তিনি ঠাকুরের অনেক প্রসঙ্গ করলেন। আমার দেওঘরে যাবার কথাও মহাপুরুষজী বললেন হরি মহারাজকে। তিনিও তা শুনে খুশি হলেন এবং গায়ে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। পরে তিনজনেই পুনঃপুনঃ গায়ে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। মধুভরা স্নেহ-ভালবাসা ও আশীর্বাদে শরীর-মন পূর্ণ করে আমি দেওঘর যাত্রা করলাম।...

* * *

একদিন গ্রীষ্মকালে মঠে গিয়েছি, মহাপুরুষজী মঠের দক্ষিণ অংশে মাঠে ছাতা মাথায় দিয়ে বেড়াচ্ছেন। আমি তাঁর পিছু পিছু একটু দূরে চলেছি। হাতে কয়েকটি বিল্বপত্র। পাশের হলদে করবী ফুলের গাছ থেকে কয়েকটি ফুল তুলে নিলাম। নিকটে আর কেউ ছিল না। তিনি চারদিকে একবার তাকিয়ে আমি কাছে আসতেই অতি স্নেহভরে আমার চিবুক ধরে "কি যদুনাথ" বললেন। সে স্পর্শে আমি অবশ হয়ে গেলাম। কোন উত্তর না দিয়ে তাঁর শ্রীচরণে বিল্বপত্রসহ পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে প্রণাম করলাম। হাঁটু গেড়ে করজোড়ে বললাম—"আমার মাথায় হাত দিন, আশীর্বাদ করুন।"

তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে প্রাণখুলে আশীর্বাদ করে বললেন—"তোমার ভক্তি হোক, জ্ঞান হোক, চৈতন্য হোক ইত্যাদি।" তাঁর ঐ দিব্যস্পর্শে আমার এক অলৌকিক আনন্দের অনুভূতি হলো। শেষের দিকে সংজ্ঞালোপ হয়ে গেল।...

একদিন অপরাহ্ণে নির্জনে তাঁর ঘরে বললাম, "মহারাজ, আপনি চলে গেলে আমার জীবনধারণ ক্লেশসাধ্য বা অসাধ্য হবে। আমি আপনার আগে চলে যাই।"

তিনি স্নেহকোমলস্বরে বললেন, "ওকথা বলতে নেই। তোমরা থাকবে, ঠাকুরের কাজ করবে।"

* * *

জপের মালা একছড়া পূর্বেই পেয়েছিলাম। তা তিনি জপ করে দেননি বলে মনে দুঃখ ছিল। আরো দু-ছড়া মালা জীবনের সম্পদ হিসাবে গুরুদেবের দ্বারা শোধন করিয়ে রাখা স্থির করলাম, এবং একছড়া রুদ্রাক্ষমালা কিনে গাঁথিয়ে এনে মঠে গিয়ে গুরুদেবের হাতে দিয়ে এলাম। তিন দিন তিনি তা জপ করে রাখবেন—চতুর্থ দিনে গিয়ে আনতে বললেন। আমি সেভাবে চতুর্থ দিন মঠে গিয়ে প্রণাম করতে তিনি বললেন—"তোমার মালা শোধন করে রেখেছি। তুমি গঙ্গায় গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে এসে মালা নাও।"

আমি আনন্দিত মনে গঙ্গায় হাত মুখ ধুয়ে এসে দেখি তিনি চোখ বুজে মালাজপ করছেন। জপ শেষ করে মালা হাতের মুঠোতে নিয়ে চোখ বুজে কপালে ও মস্তকে স্পর্শ করে আমার হাতে দিলেন। আমি একান্ত উৎসাহে দুহাতে মালা নিয়ে মাথায় স্পর্শ করে গলায় দিয়ে তাঁকে প্রণাম করতে অগ্রসর হলাম। তা দেখে তিনি বললেন, "এখন প্রণাম করতে পারবে না, কারণ মালা তোমার সঙ্গে আছে। এ মালার প্রত্যেকটির ভিতর 'নাম' রয়েছে। এ মালা সঙ্গে করে প্রণাম করতে নেই।" এ কথা শুনে আমি একান্ত বিস্মিত হলাম। আমি এমন বুদ্ধিহীন ছিলাম যে, মালা খুলে রেখে যে প্রণাম করা যায়, এ বুদ্ধি তখন আমার মাথায় এল না।...পরে আর এক ছড়া মালাও তিনি আনন্দ করে শোধন করে দিয়েছিলেন।...

একদিন মঠে গিয়ে আমোদ করে বললাম—"মহারাজ, পূর্বে আপনারা অল্প কয়েকজন মাত্র দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া-আসা করতেন এবং ঠাকুরকে ভগবান বলতেন। এখন দেখুন আমরা কত দূর দেশ থেকে আসি, আর সর্বস্ব দিয়ে তাঁকে 'ঠাকুর' বলি ও মানি।"

শুনে তিনি খুব ভাবের সঙ্গে বললেন, "যদুনাথ, ঠাকুর বলেই ঠাকুর বলছ। তিনি যে স্বয়ং ভগবান—তাই তো তিনি তোমাদের কাছে ধরা দিয়েছেন।"

* * *

মহাপুরুষজীর মতো সুন্দর মানুষ এ জীবনে কখনও দেখিনি। যে কয়েক জনকে দেখেছি তাঁরা সকলেই ঠাকুরের সন্তান—স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেমানন্দ, তুরীয়ানন্দ প্রভৃতি ব্যতীত আর দেখিনি। প্রয়াগে হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় লক্ষ সাধু দেখেছি, কিন্তু এমন অমল-ধবল-কান্তি দেখিনি। এঁরা আজীবন ঊর্ধ্বরেতা ও ব্রহ্মজ্ঞ।...মহাপুরুষজীর জানুদ্বয় এমন সুন্দর ও সুবলিত ছিল যে, এমন আর আমি কোথাও দেখিনি।...

একদিন অপরাহ্ণে মঠে গিয়েছি। তখন মঠে লোকজন বেশি যেত না। ঠাকুরের ভাব দেশে তখন অল্পই প্রচারিত হয়েছে। বেশি বৃষ্টি হয়েছিল বলে সেদিন প্রায় কেউই আসেনি। আমি গুরুদেবকে নির্জনে পেয়ে প্রাণের একটি কাতর প্রার্থনা জানালাম—বললাম, "মহারাজ, আমার একমাত্র প্রার্থনা যে, আপনি বলুন অন্তে আপনার শ্রীপাদপদ্মে যেন আমার চিরগতি হয়।"

তিনি চোখ বুজে খুব ভাবের সঙ্গে বললেন, "তোমার তা-ই হবে। তোমার তা-ই হবে। তোমার তা-ই হবে।" তিনবার বলার অর্থ শপথ করা। তাঁর মুখে ঐ অভয় অঙ্গীকার-বাণী শুনে প্রীত ও নিশ্চিন্ত হলাম। মন শান্ত ও স্বচ্ছ হলো। অন্তরে

এক দিব্যানন্দের আলোড়ন হচ্ছিল। আমি তাঁর পায়ে মাথা রেখে প্রণত হলাম। তাঁর অযাচিত কৃপা আমায় অভিভূত করেছিল।..

১৯১৯ সনে আমার সহপাঠী শ্যামসুন্দর গোপকে নিয়ে বেলুড় মঠে গিয়েছিলাম। সে কৃষ্ণভক্ত, অতি পণ্ডিত, উন্নত ও প্রতিভাশালী। শ্রীকৃষ্ণলীলায় বিশেষ অধিকার ছিল তার। তার সঙ্গে মহাপুরুষজীর অনেক কথাবার্তা হলো। শেষে মহাপুরুষজী বললেন, "শ্যামসুন্দর, তুমি শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান কর। শ্রীকৃষ্ণই পুনরায় শ্রীরামকৃষ্ণরূপে দেহধারণ করেছেন। এঁদের অভেদ বলে জানবে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-মূর্তিও ধ্যান কর! শ্রীভগবান সত্য, তপস্যা দ্বারা মানুষ তাঁকে লাভ করতে পারে এবং তাঁর দর্শনাদিও জীবের ভাগ্যে সম্ভব হতে পারে। অনেক ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণের এখনো দর্শন পায়।"...

নিজের দর্শনাদি সম্বন্ধে তিনি কখনও বলতেন না। নিজের সত্তা সম্বন্ধে কোন কথা বলেননি।...তাঁর শেষ ১২ বছরের সেবক-সঙ্গী স্বামী অপূর্বানন্দের মুখে শুনেছিলাম যে, মহাপুরুষ মহারাজ ভোরবেলায় ঠাকুরঘরে (পুরাতন মন্দিরে) গেলে শ্রীঠাকুর এগিয়ে এসে চিবুক ধরে তাঁকে আদর করতেন। মাত্র তিন দিন এ নিয়মের ব্যক্তিক্রম হয়েছিল। তাতে মহাপুরুষ মহারাজ বিশেষ চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন এবং শ্রীঠাকুরের এ ঔদাসীন্যে খুবই ব্যথিত হয়ে কেঁদে কেঁদে দিন কাটাতে লাগলেন। তিন দিন পরে রাত্রে গোশালায় আগুন লাগে। গোয়ালে গোলপাতার ছাউনি ছিল, কিন্তু ভগবৎ-কৃপায় কোন গরুরই ক্ষতি হয়নি। এ ঘটনার পর মহাপুরুষজী বলেছিলেন—"দুর্দৈব কেটে গেল।...কোন প্রকারের একটা সেবাপরাধ হয়েছিল। তা অল্পের উপর দিয়ে কেটে গেল।"...

বেলুড় মঠে শেষরাত্রে মঙ্গলারাত্রিকের সময় ঠাকুরঘরের দরজা খোলা হয়। এ নিয়মের ব্যতিক্রম কখনও হয় না। কিন্তু একদিন গ্রীষ্মকালে রাত তিনটার সময় মহাপুরুষজী তাঁর ঘর থেকে বের হয়ে ছাদের উপর দিয়ে গিয়ে চাবি এনে ঠাকুরঘরের দরজা খুললেন। অন্যান্য সাধুরা সে বিষয় জানতে পারলেন, কিন্তু পরদিন কেউ মহাপুরুষজীকে তার কারণ জিজ্ঞেস করতে সাহস করলেন না। দিনান্তে বিকালবেলা একজন সাধু সাহস করে ঐ বিষয়ে প্রশ্ন করতে তিনি বলেছিলেন— "রাত তিনটার সময় ঠাকুর বললেন যে, গরমে তাঁর কষ্ট হচ্ছে। তাই মন্দিরের দরজা খুলে ঠাকুরকে হাওয়া করেছিলুম।" ঐ সাধুজী পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন— "ঠাকুর আর কিছু বলেছেন কি?"

মহাপুরুষজী—"হাঁ, আরো আরো কথা বলেছেন—মঠের ভিতর দরজার বাইরে এত চোরকাঁটা হয়েছে যে হাঁটা যায় না!...আরো বললেন—আজ সন্ধ্যায় যে ফুলের মালা দেয়া হয়েছে, তা অতি সুন্দর হয়েছিল।"

পরের দিন সকালে সকলে মিলে চোরকাঁটা তুলে সব পরিষ্কার করে দিলেন এবং যিনি শ্রীঠাকুরের জন্য মালা গেঁথেছিলেন, তিনিও ঐ কথা শুনে খুবই আনন্দিত হন।

* * *

বাল্যাবধি পরিচিত আমার একজন ভক্তবন্ধুর বাড়িতে প্রতি সোমবারে হরিসভা হতো। তিনি শ্রীমহাপ্রভুর পরম ভক্ত। এক রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখেন—তিনি বেলুড় মঠে গিয়েছেন (পূর্বে তিনি কখনও বেলুড় মঠ-দর্শন করেননি)। গঙ্গার ধারে দ্বিতল-বাড়ি ঐ মঠ, সামনে সবুজ ঘাসের লন। সাধুরা সেখানে বাস করছেন। একজন সৌম্যদর্শন দিব্যকান্তি প্রবীণ সন্ন্যাসী মঠ-বাড়ির পূর্বকোণে লন-এর ধারে উঠানে তাঁর কানে মহামন্ত্র প্রদান করে চতুর্ভুজ-মূর্তিতে দাঁড়ালেন। ঐ স্বপ্ন দেখে ভক্তবন্ধু আনন্দ ও বিস্ময়ে অধীর। আমাকে ঐ স্বপ্ন-বৃত্তান্ত ও মানসিক অবস্থা জানাতেই আমি বললাম—"চলুন, আমরা মঠে যাই। আপনি স্বপ্নে যে মঠ দেখেছেন তা ঠিক কিনা তা দেখবেন। আর আপনার স্বপ্নদৃষ্ট গুরু কে, তাও দেখে চিনে নেবেন। যদি স্বপ্নদৃষ্ট গুরুর সন্ধান পান তো সে মহাত্মার সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁকে গুরুদক্ষিণা প্রদান করবেন।"

বন্ধু রাজি হলেন। আমরা দু-জনে সুদূর পূর্ববঙ্গ হতে বেলুড় মঠে গেলাম। মঠ দেখেই বন্ধু বললেন যে, ঠিক এই মঠই তিনি স্বপ্নে দেখেছেন। গঙ্গার তীরে উঠানের লন-এর ধারে যে স্থানে তাঁকে মন্ত্র দিয়েছিলেন, সে স্থানও চিহ্নিত করে দেখালেন এবং মহাপুরুষজীকে দেখেই তিনিই যে স্বপ্নদৃষ্ট গুরু তা বললেন।

আমি মহাপুরুষজীকে সব কথা বলে ভক্তটির পরিচয় করে দিলাম। তখন তাঁর শরীর বেশ সুস্থ ছিল। তিনি সব শুনে বিশেষ সন্তুষ্ট হলেন এবং ভক্তটিকে খুব আশীর্বাদ করলেন। সান্ধ্য আরাত্রিকের পরে বন্ধুকে না পেয়ে এদিক-সেদিক খুঁজতে খুঁজতে দেখতে পেলাম যে, বন্ধু স্বপ্নদৃষ্ট স্থানে তাঁর গুরুর সঙ্গে বসে আছেন। মহাপুরুষজী সস্নেহে বন্ধুকে তাঁর পারিবারিক অনেক কথা জিজ্ঞেস করছেন এবং পরে স্বপ্নলব্ধ মন্ত্র জিজ্ঞেস করলেন এবং ঐ মন্ত্র সামান্য একটু পরিবর্তন করে দিলেন। ঐদিন পবিত্র বেলুড় মঠে গঙ্গাতীরে মহাপুরুষজীকে কল্যাণ-মূর্তিতে পেয়ে খুবই আনন্দ হয়েছিল।*

আমরা পরদিন শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনে জয়রামবাটী যাবার অনুমতি প্রার্থনা করতে

* এসব শ্রীমহাপুরুষজী প্রকাশ্যে ভক্তদের দীক্ষা দেবার অনেক আগেকার ঘটনা। ঐ সময়ের পূর্ব হতেই কোন কোন ভাগ্যবান শ্রীমহাপুরুষজীকে স্বপ্নে দর্শন ও তাঁর কাছে মন্ত্র-দীক্ষা পেয়েছেন।—সংকলক

মহাপুরুষজী খুব সন্তুষ্ট হলেন এবং পথের নির্দেশ দিয়ে খুব আশীর্বাদ করলেন। ...পরদিন সকালে ৭টার ট্রেনে আমরা তারকেশ্বর যাত্রা করলাম কামারপুকুর ও জয়রামবাটীর পথে। বাবা তারকনাথের দর্শন ও পূজা করে চাঁপাডাঙ্গার পথে কামারপুকুর অভিমুখে যাত্রা করলাম জ্যৈষ্ঠ মাসের কাঠফাটা রোদের মধ্যে। দারুণ গরমে ঐ হাঁটা-পথে রাত্রি ১০ টায় আরামবাগ পৌঁছলাম। ঐ তেলোভেলো মাঠের পথেই শ্রীশ্রীমায়ের 'ডাকাত বাবার' সঙ্গে দেখা হয়। আরামবাগ হতে পরদিন নবাসন আশ্রমে জ্ঞান মহারাজের সঙ্গে পরিচয় হলো। সেদিন সেখানে মহোৎসব। আনন্দে প্রসাদ পেয়ে রামময়দাদাকে পাণ্ডারূপে নিয়ে ৺কামারপুকুর-দর্শন করে জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে উপস্থিত হলাম। কামারপুকুরের পুণ্যধূলিতে গড়াগড়ি দিয়ে এবং একটু ধূলি মহাপ্রসাদ-জ্ঞানে খেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেছিলাম।

আমরা প্রতি বছরই দীপান্বিতার দিনে কয়েকজন ভক্ত মিলে অতি দীনভাবে শ্রীশ্রীমায়ের পূজা করতাম। শ্রীশ্রীমায়ের জন্য সরু লালপেড়ে একখানি পূজার কাপড়ও ডাকে শ্রীপ্রসন্ন মামার ঠিকানায় জয়রামবাটী পাঠাতাম। গতবার ঐ কাপড় পাঠাতে দেরি হয়। এদিকে শ্রীশ্রীমা আমাদের একজনকে স্বপ্নে দেখা দেন। ভক্তটি দেখে—মা ভিজা কাপড়ে আমাদের ঠাকুরঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বলছেন, "রাসু (রাসমোহন), আমার কাপড়খানা দে।" স্বপ্নবৃত্তান্ত জেনে আমাদের মনে খুবই অনুশোচনা হয়েছিল। আবার মা যে আমাদের পূজা গ্রহণ করেন এবং আমাদের কাছে চেয়ে কাপড় নিলেন, তাতে আনন্দও হয়েছিল। ঐ কাপড়খানি এবার জয়রামবাটী নিয়ে গেলাম এবং শ্রীপাদপদ্মে ঐ বস্ত্রখানি রেখে মাকে প্রণাম করলাম। মা আমাদের দেখে আনন্দে উল্লসিতা হয়ে বললেন—"তোমরা কোত্থেকে আসছ, বাবা?"

আমি বললাম—"অনেক দূর থেকে।" "কলকাতা থেকে?" "না মা নোয়াখালী, পূর্ববঙ্গ—সমুদ্রের পার।" "বাবা, এতদূর থেকে এসেছ? আজ থেকে যাও।" রান্না করে খাওয়াতে মার কষ্ট হবে ভেবে আগেই গুরুদেবকে বলেছিলাম যে, আমরা মাকে দর্শন করে চলে আসব। জয়রামবাটিতে থাকব না। সুতরাং মা বলা সত্ত্বেও রইলাম না। মাকে বললাম—"না, মা, আমরা আজই চলে যাব। আমরা থাকলে আপনার কষ্ট হবে।" মা মুড়ি ও পিঠে খেতে দিলেন।

মা মাটিতে পা মেলে বসেছিলেন। তাঁকে প্রণাম করে আশীর্বাদ চাইতে মা বললেন, "আমি তোর মা।" পরে খিল খিল করে হেসে ময়দা-মাখা হাত আমার মাথায় দিয়ে বললেন—"ভক্তিলাভ হোক।"

মায়ের চরণামৃত ও প্রসাদী নাড়ু নিয়ে জয়রামবাটী হতে রওনা হলাম। মা হাতে নাড়ু নিয়ে দেয়ালে শ্রীশ্রীঠাকুরের যে ছবি ছিল তার সামনে হাত বাড়িয়ে নিবেদন করলেন। তারপর নিজের জিহ্বায় ঠেকিয়ে একটু খেয়ে প্রসাদ করে দিলেন। মাকে প্রণাম করে রওনা হলাম। মা যে আবেগভরে বলেছিলেন, "আমি তোর মা"—ঐ কথাটিই বারবার মনে হতে লাগল। আর আনন্দের দোলায় দুলতে লাগল সমগ্র মনপ্রাণ। বিহ্বল হয়ে গেলাম।...

যখন জয়রামবাটী থেকে রওনা হলাম, তখন ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছিল। ঐ বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি মায়ের আশীর্বাদ আশিসবর্ষণ মনে করে চলতে লাগলাম মায়ের গঙ্গা আমোদরের ধারে ধারে।...

অল্প রাত্রিতে যখন কামারপুকুরে পৌঁছলাম, তখন শিবুদা খুব আদর করে আমাদের গ্রহণ করলেন। সব দর্শনাদি করলাম। তাঁকে প্রণাম করে ঠাকুরের কথা জিজ্ঞেস করতে তিনি কাঁদতে লাগলেন, বললেন—"তখন কি জানি তিনি জগৎকর্তা? কত তাঁর কাঁধে চেপে কান ধরে টেনেছি! তিনি বলতেন, 'দেখ হৃদু, শিবু কি করে'!" শিবুদার কান্না আর থামে না! তাঁকে কাঁদতে দেখে আমাদেরও কান্না পেল। তিনি ঠাকুরের একটি গান গাইলেন। পরে আমাদের মুড়ি খেতে দিলেন, রাত্রে থাকার কথা বললেন। আমরা রঘুবীর, শীতলার ঘট, ঢেঁকিশালা—ঠাকুরের জন্মভূমি, ঠাকুরের নিজের হাতে লাগানো আমগাছ প্রভৃতি সব দর্শন করে রাত্রেই রওনা হলাম। সর্বক্ষণ শ্রীমায়ের কণ্ঠস্বর প্রাণে ধ্বনিত হতে লাগল—"আমি তোর মা।"...

* * *

মহাপুরুষজীকে বেলুড় মঠে এবং অন্যত্র বহুবার দর্শন করেছি। সংখ্যায় তার ইয়ত্তা হয় না। সর্বত্রই তাঁকে পেয়েছি কৃপামূর্তিরূপে, স্নেহ-আদর ও মমতার মূর্ত-বিগ্রহরূপে। জীবকল্যাণব্রতী ছিলেন তিনি। শেষ দর্শন হয় ১৯৩৪ সালে তাঁর দেহত্যাগের পূর্বে। জরুরি তার পেয়ে শ্রীঠাকুরের সাধারণ উৎসবের দু-দিন পূর্বেই কলকাতায় ভবানীপুরে পৌঁছই। গিয়ে দেখি যে, যে আত্মীয়ের অসুস্থতার খবর পেয়ে ছুটে গিয়েছিলাম, সে এক অদ্ভুত উপায়ে এক ফোঁটা 'ইপিকাক' ঔষধে বেঁচে উঠেছে!..। রবিবার বেলুড় মঠে সাধারণ উৎসব। সকালে তাড়াতাড়ি চারটি খেয়ে নিয়ে মঠের দিকে রওনা হলাম। মঠে লোকারণ্য। উৎসবের অপূর্ব সাজ-সজ্জা। পরিচিত সাধু মহারাজগণ বললেন, "মহাপুরুষ মহারাজের ১০৫° জ্বর। তাঁকে দর্শন করতে কাকেও দেয়া হয় না।" কিন্তু সহৃদয় মহারাজগণ বললেন, "চলুন, গোপনে আপনাকে নিয়ে দর্শন করাই।" আমার মনে হলো গত ২৩ বছর দিনরাত কতভাবে জ্বালাতন করেছি—এখন বিদায়-মুহূর্তে আর যাতনা দেব না।

উৎসবের মধ্যে দুটো মহা-অমঙ্গলের সৃষ্টি হলো। শেষ বেলায় মেঘ উঠল, সব লোকের মাথায় বড় বড় শিলা-বর্ষণ হতে লাগল। সবচাইতে আশ্চর্যের বিষয়, সে শিলাবৃষ্টি শুধু বেলুড় মঠের উপর—বেলুড় গ্রামের সর্বত্রও শিলাবৃষ্টি হলো না। শত শত লোক আহত হলো—প্রাণভয়ে চারদিকে ছুটাছুটি করছে—মাথা গুঁজবার স্থানও পাচ্ছে না।

দ্বিতীয় ঘটনা, আহিরীটোলা জাহাজঘাটের জেটি ভেঙে বহুলোক হাতে-পায়ে-মাথায় আঘাত পেল—আহত হলো। রাত্রে ভবানীপুরে ফিরে গেলাম।...পরদিন সকাল ৯টার পরে জনৈক ভক্ত খবর নিয়ে এল যে, মহাপুরুষজীর শেষ অবস্থা। সঙ্গে সঙ্গেই রওনা হলাম। পৌঁছে দেখি সমগ্র মঠবাড়ি নীরব নিস্তব্ধ! নিচের পশ্চিমের বারান্দা হয়ে ঘড়ির নিচের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলাম। অগণিত ভক্ত চলেছে। মোড়ে মোড়ে সাধুরা পাহারা দিচ্ছেন। স্বামীজীর প্রকোষ্ঠ ডানদিকে রেখে পূর্ববারান্দা হয়ে উত্তরের ছাদ হতে দর্শনের ব্যবস্থা হয়েছে। প্রবল জ্বরে তিনি সংজ্ঞাহীন, কিন্তু আমি দূর হতে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে মাথা তুলতেই দেখলাম—আয়ত লোচনদ্বয় সুগোল ও বিশাল। তিনি অপলক দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছেন। আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে কেবলই তাঁকে দেখতে লাগলাম—স্রোতের মতো দর্শনার্থীরা এগিয়ে আসছেন তো, সুতরাং প্রহরী মহারাজগণ আর দাঁড়াতে দিলেন না। জনস্রোতের সঙ্গে নিচে নেমে এলাম অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। ঘণ্টায় ঘণ্টায় অবস্থা লিখে দেয়া হচ্ছে। রাত্রিবৃদ্ধির সঙ্গে অবস্থা একটু ভালর দিকে।...

পরদিন প্রভাতে মঙ্গলবারের সংবাদ—তিনি অপেক্ষাকৃত ভাল। আশ্বস্তমনে ভবানীপুর ফিরে এলাম। সন্ধ্যার পরে খবর পেলাম তিনি চলে গিয়েছেন—নীরবে মঠে যাত্রা করলাম। পৌঁছে দেখলাম সব আশা-আকাঙ্ক্ষা শেষ হয়ে গিয়েছে।...

রাত্রি ৮। ৯টায় গঙ্গাতীরে নিয়ে তাঁকে স্নান করান হলো। ভাবলাম শেষের মতো একবার দর্শন, স্পর্শন ও পুষ্পাঞ্জলি বুঝি আর সম্ভব হলো না। কিন্তু দেখতে দেখতে ১৫। ২০ ঝুড়ি ফুল বিল্বপত্র উপস্থিত হলো। অঞ্জলি চলতে লাগল শৃঙ্খলার সঙ্গে। স্রোতের মতো লোক একপথে এসে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে অন্যপথে চলে যাচ্ছে। আগে এল মেয়েদের পালা। পুষ্প-বিল্বপত্রে ঢাকা পড়তেই সেগুলি সরিয়ে দেয়া হচ্ছে। সাধুরা সকলেই হৃদয়বান, বিদ্বান ও বুদ্ধিমান। সেজন্য শেষ-স্পর্শ করে পুষ্পাঞ্জলি দিতে কারো কোন অসুবিধা হয়নি।

স্বামীজীর সমাধি-মন্দিরের দক্ষিণে মঠভূমির দক্ষিণ-পূর্ব শেষবিন্দুতে চিতাসজ্জা রচিত হলো। রাশি রাশি চন্দনকাঠ ও প্রচুর ধূপ-ধুনা সহকারে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে

উঠল। সর্বভুক হুতাশন মেধ্য অমেধ্য সকল বস্তুই কুক্ষিসাৎ করে, অদ্যকার এই চিরনির্মল ব্রহ্মবিলাসের তনু উদরস্থ করে দীর্ঘকালের সমল-জঠর নির্মল করেছে।...

শেষরাত্রে মহাহোম সমাপ্ত হলো। অনেক বছরের মতো মঠভূমি প্রণাম করে দেশে প্রত্যাগত হলাম। পথে পথে ভাবলাম—গুরুদেবের পার্থিবতনু চিরতরে অগোচর হলো। তবে তিনি একদিন বলেছিলেন—"শরীর থাকতে ব্যবধান বেশি। শরীর গেলে প্রিয়জন সর্বদা নিকটস্থ হন। এখন পাথেয় জোগাড় করে তোমার আসতে কষ্ট হয়। তখন সর্বদা নিকটে পাবে।" তাঁর একথা সত্য হোক। যে চক্ষুতে তাঁকে দর্শন, যে কর্ণে তাঁর বাণী শোনা যায়—প্রিয়তম দেবতা তা আমাকে দান করুন! জীবনময় যে অপূর্ব টান তাঁর ছিল! মঠ হতে তাঁকে দর্শন করে ফিরবার পথেই চিন্তা হতো আবার কবে কিভাবে মঠে যাব। এভাবে শত শত বার মঠে গিয়েছি।...

আর জীবনময় 'ভুজঙ্গ-কণ্টক-পঙ্ক-মাঝে' জ্ঞানময় পিতা বেচালে পা পড়তে দেবেন না।...শিশুর হাত ধরে যে নিয়ে চলবেন সে স্বীকৃতি দিয়ে গিয়েছেন।...তাঁর শেষ নিঃশ্বাসত্যাগ আমার চক্ষে ও প্রাণে অসহনীয় হবে বলে আগে যাবার যে দাবি একদিন নির্জনে জানিয়েছিলাম, তা তিনি জেনেই সে সময় আমাকে দূরে রাখলেন।

জয় গুরুরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ! তোমার চিরজয়! আর মহামায়ার ঘোর আঁধারে ভুল-ভ্রান্তির হোক চিরপরাজয়।...

দেশের আশ্রমে এসে খবর পেলাম যে, গুরুদেবের যেদিন শরীরত্যাগ হয়, সেদিন সবে আশ্রমের ঠাকুরঘরে সান্ধ্যপ্রদীপ জ্বালা হয়েছে, এমন সময় স্থানীয় স্কুলের হেডমাস্টার—মহাপুরুষজীর কৃপাধন্য শিষ্য-ভক্ত মথুরামোহন বসু আশ্রমের ঠাকুরঘরে ঠাকুরকে সান্ধ্যপ্রণাম নিবেদন করতে এসেছেন। ঠাকুর প্রণাম করে মাথা তুলতেই দেখেন যে, সিংহাসনে পটমূর্তির স্থানে শ্রীশ্রীঠাকুর সজীব বসে আছেন। আর ঠাকুরের ডানদিকের যে আসনে মহাপুরুষজীর পটমূর্তি—তার পাশে তুষারধবল শিব এবং শিবের পাশে মহাপুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন। ক্রমে ধীরপদে মহাপুরুষজী ঠাকুরের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। আর অগণিত আলোর পুতুল তাঁর পিছু পিছু ঠাকুরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ঐ জ্যোতির পুতুলগুলিসহ মহাপুরুষ শ্রীঠাকুরের শরীরে মিলিয়ে গেলেন। কেবল একটি আলোর পুতুল ঠাকুরে মিলিয়ে গেল না। ক্রমে ঠাকুর ও শিব অদৃশ্য হলেন এবং আলোর পুতুলটিও অদৃশ্য হলো।...

যখন মথুরবাবু ঠাকুরঘরে প্রণাম করতে গিয়েছিলেন, তখন আর একজন ভক্ত নাটমন্দিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মথুরবাবু ঠাকুর প্রণাম করে তাঁকে দাঁড়িয়ে আছেন দেখে হাত ঘুরিয়ে বললেন—"দ্বিজেনবাবু, মঠে মহাপুরুষ মহারাজের দেহত্যাগ হলো।"

জয় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জয়! জয় তদীয় লীলাসাথী শিবানন্দ মহাপুরুষের জয়!!

গুরুদেবের-স্মৃতিকথা

শ্রীনুটবিহারী চট্টোপাধ্যায়, এম. এস-সি

মহাপুরুষ মহারাজের প্রথম দর্শনলাভের সৌভাগ্য হয় ১৯২৪ সালের মে মাসে। তখন স্কুলে পড়ি, বয়স ১৪ বৎসর। গ্রীষ্মের ছুটিতে কলকাতায় মামার বাড়িতে এসেছিলাম, পাটনায় থাকতাম এবং সেখানের মিশনেও যাতায়াত ছিল। কিন্তু বেলুড় মঠে কখনও যাওয়া হয়নি। বাড়িতে মঠের কথা বললে যাবার অনুমতি পাব না, তাই কাউকে কিছু না বলে একদিন সকালে বেলুড় মঠে গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে কারুর সঙ্গেই পরিচয় ছিল না, তবে শুনেছিলাম যে, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পার্ষদ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ তখন মঠের প্রেসিডেন্ট। তাঁকে দর্শন করার খুব আগ্রহ ছিল। অথচ ভয় ছিল যে, হয়ত তিনি আমার সঙ্গে দেখা করবেন না, আর যদিই বা তাঁর কাছে যেতে পারি তো তিনি কিছু জিজ্ঞেস করলে কি বলব। যাই হোক, ঠাকুরঘরে প্রণাম করে মঠের প্রাঙ্গণে একজন প্রবীণ সাধুকে দেখে মহাপুরুষ মহারাজকে দর্শন করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি পূর্বদিকের উপরের ঘর (যেখানে মহাপুরুষ মহারাজ থাকতেন) দেখিয়ে উপরে যেতে বললেন। কম্পিতপদে ঘরের ভিতর গিয়ে দেখলাম, মহাপুরুষ মহারাজ একটি চেয়ারে খাটের পাশে দক্ষিণাস্যে বসে আছেন; তাঁকে ভক্তিভরে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন—কোথা থেকে এসেছি ও কি করি। তাঁর প্রশান্ত মূর্তি ও প্রসন্ন মুখ দেখে তখন ভয় অনেকটা কেটে গেছে। হাতজোড় করে বললাম—"পাটনা থেকে এসেছি, স্কুলে সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ি।" তিনি জিজ্ঞেস করলেন—"পাটনার আশ্রমে যাও?" সে প্রশ্নের উত্তর দিলাম। আবার বললেন—"মঠে আগে এসেছিলে?" বললাম—"না, মহারাজ। ইচ্ছা থাকলেও সে সুযোগ পাই না। আজ কারুকে না বলেই এসেছি

আপনাকে দর্শন করব বলে।" শুনে একটু হাসলেন ও বললেন—"তা বেশ করেছ। যখন সুবিধে হবে এসো। পাটনা আশ্রমে মাঝে মাঝে যেও।" তাঁর সঙ্গে কথা বলার সময় তাঁর পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসেই তাঁর সব কথার উত্তর দিয়েছিলাম। আবার জিজ্ঞেস করলেন—"ঠাকুরঘরে গিয়েছিলে তো", বললাম—"গিয়েছিলাম এবং আগে ঠাকুর প্রণাম করে তারপরে এখানে এসেছি।" বাড়িতে কে কে আছে এসবও জিজ্ঞেস করলেন এবং পরে বললেন, "আচ্ছা, আজ এসো। পরে আবার সুবিধে হলে মঠে আসবে।" তিনি সেবককে ডেকে বললেন—"এই ছেলেটিকে প্রসাদ দাও।" তখন তাঁকে আবার ভক্তিভরে প্রণাম করে বাইরে এলাম এবং প্রসাদ নিয়ে বেশ খুশি মনে বাড়ি ফিরলাম। কেবলই মনে হতো লাগল—এত বড় সাধু, রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেন্ট অথচ আমার মতো একজন অচেনা ছোকরার সঙ্গে কেমন ভালভাবে কথা কইলেন! এমনটি তো ঠিক আশা করিনি! তাঁকে আমার খুব ভাল লেগেছিল এবং খুব আপনার মনে হয়েছিল।...

১৯২৫ সালে গ্রীষ্মের ছুটিতে আবার কলকাতায় যাবার সুযোগ হলো। পাটনার মহারাজরা বেলুড় মঠের জনৈক সাধুকে লিখে দীক্ষার দিন স্থির করেছিলেন। ঐদিন সকালে কলকাতার গঙ্গায় স্নান করে, কিছু ফল ফুল হাতে নিয়ে মঠে পৌঁছলাম—তখন বেলা প্রায় সাড়ে নটা। ঠাকুরঘরে যাবার সিঁড়ির নিচেই রামানন্দ মহারাজের সঙ্গে দেখা হলো। তাঁর সঙ্গে পাটনা আশ্রমে থাকার সময় পরিচয় ছিল। তিনি বললেন, "এত দেরি করে এলে? শীঘ্র উপরে ঠাকুরঘরের বারান্দায় গিয়ে বোস এবং একটু ধ্যান কর। এক্ষণই মহাপুরুষ মহারাজ ঠাকুরঘর হতে বার হবেন এবং তোমাকে ডাকবেন।" তাড়াতাড়ি উপরে গেলাম এবং ঠাকুরঘরের সামনে দালানে প্রণাম করে বসে ধ্যান করতে লাগলাম। শীঘ্রই ঠাকুরঘরের দরজা খুলে গেল এবং মহাপুরুষ মহারাজকে সামনেই দেখতে পেলাম। বিরাট পুরুষ, যেন ভাবে বিভোর। আমাকে ভিতরে যাবার জন্য ইঙ্গিত করলেন। আমি ভিতরে যেতে তিনি আবার দরজা বন্ধ করে দিলেন। ঠাকুরঘরের পবিত্র ভাবগম্ভীর পরিবেশ, ধূপ ধুনা ও চন্দনের সুগন্ধ এবং মহাপুরুষ মহারাজের সান্নিধ্যে মন এক অভূতপূর্ব আবেশে ভরে গেল। মনে হলো আমি কত পবিত্র হয়েছি। ঠাকুরের সামনে মহাপুরুষ মহারাজের শ্রীচরণে আত্মনিবেদনের জন্য মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। শ্রীঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণামের পর আমাকে তিনি সামনের আসনে বসতে আদেশ করলেন এবং নিজে দক্ষিণদিকের আসনে বসলেন। পূর্বেই আমার উপনয়ন হয়েছিল। আমাকে আচমন করে দশবার গায়ত্রীমন্ত্র জপ ও কিছুক্ষণ ঠাকুরের ধ্যান করতে বললেন এবং ধ্যানের পর তাঁর নির্দেশ মতো কিছু ফুলচন্দন ঠাকুরের শ্রীচরণে নিবেদন করলাম। মহাপুরুষের সান্নিধ্যে ঠাকুরের সামনে বসে ধ্যান ও পূজা করা এবং

আত্মনিবেদন করার ফলে এক অভূতপূর্ব অনুভূতিতে মন যেন কোন এক আনন্দময়লোকে চলে গিয়েছিল। তারপর তিনি আমার কানের কাছে ইষ্টমন্ত্র তিনবার স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে আমাকেও সেইমন্ত্র জপ করতে বললেন। পরে কয়েকটি উপদেশ অল্পকথায় বলে দিলেন। একবার জিজ্ঞেস করলেন, "মন্ত্র ঠিক বুঝতে পেরেছ? মনে থাকবে তো?" আমি "বুঝতে পেরেছি এবং মনে থাকবে" বলায় তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তখন তাঁর পায়ে মাথা রেখে আমি প্রণাম করলাম এবং একটি টাকা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম, সেটি তাঁর পায়ের কাছে রেখে গুরুদক্ষিণা দিলাম। তিনি আমার মাথায় দুহাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। তারপর আবার ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে বাইরে এলাম এবং বারান্দায় বসে ধ্যান করতে লাগলাম। দুপুরে মঠেই মহারাজের পাতের প্রসাদ পেয়েছিলাম।

প্রসাদ পাবার কিছুক্ষণ পরে একজন সাধু আমাকে বললেন, "মহাপুরুষ মহারাজ তোমাকে ডাকছেন।" তখনই উপরে গেলাম এবং তাঁর ঘরে গিয়ে দেখলাম তিনি নিজের খাটের উপর বসে আছেন। তাঁকে প্রণাম করে তাঁর পায়ের নিচে মেজেয় বসলাম। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "প্রসাদ পেয়েছ?" তখন তাঁর বেশ হাসিখুশি ভাব—দীক্ষার সময় তাঁর যে ভাবগম্ভীর দিব্যভাব দেখেছিলাম, তার বদলে এখন তিনি সহজ, সরল, সহাস্যবদন। বললাম—"প্রসাদ পেয়েছি।" প্রথমবারে তাঁর সামনে কথা বলতে যে ভয় ছিল এখন আর সে ভয় নেই। তাঁকে বড়ই আপনার ও শুভানুধ্যায়ী বলে মনে হচ্ছিল। কবে পাটনায় ফিরব ইত্যাদি দু-একটি কথায় উত্তর দেওয়ার পর তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম—"মহারাজ, দীক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য কি?" তিনি বললেন, "বাবা, দীক্ষায় গুরু ইষ্টকে চিনিয়ে দেন এবং তাঁকে পাবার পথ দেখিয়ে দেন। আমরা তো, বাবা, ঠাকুর ছাড়া আর কিছু জানি না। তাই তোমাকে তাঁরই শ্রীচরণে নিবেদন করে দিলুম। যে মন্ত্র তোমাকে দিলুম তা জপ এবং তাঁর ধ্যান, স্মরণ-মনন অন্তর দিয়ে ব্যাকুল হয়ে যত করবে ততই হৃদয়-মন পবিত্র হবে এবং মনে আনন্দ পাবে। তাঁর কাছে খুব প্রার্থনা করবে—তিনি বড় আপনার জন, বড় দয়াল। কাতর হয়ে প্রার্থনা করলে তিনি নিশ্চয়ই শুনবেন। তোমার এখন পাঠ্যাবস্থা। ভাল করে পড়াশুনা ও বাবা-মাকে ভক্তি করা—এই এখন তোমার প্রধান কর্তব্য। সে সঙ্গে সকাল-সন্ধ্যা নিয়মিতভাবে একবার করে, যতটুকু পার, জপ-ধ্যান প্রার্থনা করবে। আর একটি জিনিস মনে রাখবে—পবিত্রতা। এ বয়সে পবিত্রতাই একমাত্র সাধনা। কোন কুভাব মনে এলে খুব কাতরভাবে ঠাকুরকে জানাবে, প্রার্থনা করবে।" এর পর তাঁকে যা জিজ্ঞেস করেছিলাম সেকথা এখন ভাবলে নিজের প্রতি ধিক্কার আসে। জিজ্ঞেস করলাম—"মহারাজ, যদি কখনও সকালে বা সন্ধ্যায় বসে জপ-ধ্যান করার অবসর না পাই?" তিনি বললেন—

"দু-চার মিনিট অন্তত বসবার সময় করে নেবার চেষ্টা করবে—আর তা যদি একান্তই সম্ভব না হয় তো যখন যে অবস্থায় থাকবে তাঁর স্মরণ-মনন করে নেবে।" আবার জিজ্ঞেস করলাম, "মহারাজ, যদি কখনও মন্ত্র ভুলে যাই বা ঠিক-মন্ত্র মনে আছে কিনা সন্দেহ হয়?" তার উত্তরে বললেন, "যদি তেমন হয় আমি তো আছি, আমাকে লিখো, আবার বলে দেব।"

তাঁর প্রত্যেক কথাটি স্নেহপূর্ণ, করুণামাখা। গুরুদেবের বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছি ভেবে আরঁ দু-চারটি কথার পর তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। আসার আগে তাঁকে বললাম—"মহারাজ, আমি তো দূরে থাকি, সব সময় মঠে আসার এবং আপনাকে দর্শন করার সুযোগ পাব না। আপনাকে কি চিঠি লিখতে পারি?" তিনি বললেন, "নিশ্চয়ই লিখবে। যখন যা লেখার দরকার হবে আমাকে চিঠিতে জানাবে। আমি উত্তর দেব। আর মঠে আসা বা আমার সঙ্গে দেখা হওয়া, সে ঠাকুরের ইচ্ছায় যখন হবার হবে। মোট কথা, ঠাকুরকে ধরে থাকবে। তিনিই তোমার মনে প্রেরণা দেবেন, পথ দেখিয়ে দেবেন।"

ছুটির শেষে পাটনায় ফিরে এলাম, কিন্তু দীক্ষার কথা বাড়িতে বলার সাহস হয়নি। আশ্রমের সকলে জানতেন। অনেকদিন পরে অবশ্য বাবা জিজ্ঞেস করায় তাঁকে সব কথা বলেছিলাম এবং তিনি শুনে খুশিই হয়েছিলেন।

পরের বছর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা ভালভাবে পাশ করার খবর দিয়ে মহাপুরুষ মহারাজকে চিঠি দিই এবং স্কলারশিপের টাকা থেকে পাঁচটি টাকা প্রণামী পাঠাই। তার উত্তরে তিনি খুব আনন্দ করে এবং ভবিষ্যতে পরীক্ষায় আরও ভাল হবে আশীর্বাদ জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। তাঁর সে অমোঘ আশীর্বাদ নিষ্ফল হয়নি। ইতঃপূর্বে দু-একখানি পত্র তাঁকে লিখেছিলাম এবং তাঁর উত্তরও পেয়েছিলাম। প্রতি চিঠিতেই তাঁর আন্তরিক আশীর্বাদ এবং উত্তরোত্তর ঠাকুরের প্রতি ভক্তি-বিশ্বাস ও ভালবাসা বৃদ্ধি পাবার আশ্বাসবাণী থাকত।

* * *

১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি কাশী থেকে মঠে ফেরার পথে তিনদিনের জন্য মহাপুরুষজী পাটনায় এসেছিলেন। তাঁর আসাতে পাটনার ভক্তদের মধ্যে এবং আশ্রমে যেন ধর্মের প্লাবন এসেছিল। আশ্রম ভাড়াটে বাড়িতে ছিল বলে আশ্রমের কাছেই একজন ভক্তের বাড়িতে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। সে সময় প্রত্যহই তাঁর দর্শন পেতাম।

পাটনায় রোজ সন্ধ্যার সময় মহাপুরুষ মহারাজ সমাগত ভক্তদের সঙ্গে বসে

নানারকম ধর্মপ্রসঙ্গ করতেন এবং তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন। ঐ আলোচনার সময় একদিন একজন তাঁকে জিজ্ঞেস করেন—"মহারাজ, সাধন-ভজন করলেই যে ভগবানের কৃপা পাওয়া যাবে এর কোন প্রমাণ বা নিশ্চয়তা আছে কি?" উত্তরে মহাপুরুষ মহারাজ বললেন—"প্রমাণ আর কি? যাঁরা এ পথে গিয়ে ফল পেয়েছেন—তাঁদের কথায় বিশ্বাস করতে হয় এবং আন্তরিকভাবে তাঁকে ডাকলে তাঁর কৃপা হয়।" আবার প্রশ্ন হলো—"যদি সারাজীবনে তাঁকে ডেকে কোন ফল না হয়?" তার উত্তরে বললেন—"একটু করেই দেখ না? আর চেষ্টা করেও যদি না পাওয়া যায় তো না হয় মনে করবে একটা জীবন বৃথাই গেল—এমন তো কত জীবনই ব্যর্থ হয়েছে।" কর্মফলও মানতে হয়। এইরকম কত আলোচনা হতো। সে সময় তিনি অতি সহজ, সরল বালকের মতো হাসিমুখে সকলের সব কথার জবাব দিতেন। প্রশ্ন অবান্তর বা নির্বোধের মতো হলেও কোনরকম বিরক্তি প্রকাশ করতেন না।...

এই সময় আমার গলার একটি গ্ল্যাণ্ড ফুলে উঠে এবং তা পেকে যেতে ডাক্তার 'টি-বি' সন্দেহ করেন। ফলে, নানারকম চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের কাছে এবং হাসপাতালে নিয়মিত যাতায়াত করতে হয়। অথচ সামনেই আই-এস-সি পরীক্ষা। পড়াশুনার খুবই ব্যাঘাত হচ্ছিল। এই খবর দিয়ে পরে মহাপুরুষ মহারাজকে চিঠি লিখি। তাতে তিনি জানিয়েছিলেন যে, ঐ অসুস্থতার জন্য "ভাবনার কোন কারণ নেই। ঠাকুরের কৃপায় ভাল হয়ে যাবে এবং পরীক্ষার ফলও ভালই হবে।" তাই হয়েছিল। তিন-চার মাস ভোগার পর গলার ক্ষত সেরে গিয়েছিল এবং পরীক্ষার ফলও আশাতীত হয়েছিল। সে খবর দিয়ে তাঁকে লেখায় তিনি উত্তরে জানান, তুমি ঠাকুরের কৃপায় এবার প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ জানিয়া খুবই আনন্দিত হইলাম। ঠাকুর তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন, সদ্‌বুদ্ধি দিন ও চিরপবিত্র রাখুন, ইহাই প্রার্থনা।" আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস এই যে, দুষ্টরোগমুক্তি এবং পরীক্ষায় সুফল গুরুদেবের আশীর্বাদেই সম্ভব হয়েছিল।...

আমার বরাবরই ইচ্ছা ছিল পরবর্তী জীবনে শিক্ষকতার কাজ করা। তখনকার দিনে অবশ্য শিক্ষকদের বেতন এখনকার তুলনায় এবং অন্যান্য কাজের তুলনায় কম ছিল এবং উন্নতিও দেরিতে হতো। আমাদের সাংসারিক অবস্থাও সচ্ছল ছিল না। সেজন্য বাড়ির লোকের ইচ্ছা ছিল যে, আমি ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হই। একথা মহাপুরুষ মহারাজকে লেখায় তাঁর উত্তর পাই—"তোমার educational line-এ থাকবার ইচ্ছা, এ তো খুব ভাল। এ রাস্তায় তাঁকে নিয়ে বেশ থাকা যায়। নিজ কর্তব্য এবং অনেকের প্রতি কর্তব্যও পালন করা যায়, বিদ্যার চর্চাও হয়। অনেককে—ছাত্রদিগকে সুপথে পরিচালিত করতে পারা যায়। উন্নতি যে নেই তাও

নয়। তবে তুমি ঠাকুরের আশ্রিত, যে দিকেই যাও না, তোমার ভক্তি-বিশ্বাসের অভাব কখনও হবে না তাঁর কৃপায়। তোমারও যখন educational line-এ থাকবার ইচ্ছা, বাবাকে বুঝিয়ে বলো, তিনি রাজি নিশ্চয়ই হবেন। তাঁদের ভালবাসার কি শেষ আছে!...” তাঁর নির্দেশমত বাবাকে বলায় তিনি আমার general line-এ অর্থাৎ বি-এস-সি পড়ায় রাজি হয়েছিলেন এবং কলেজ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই কটকের র‍্যাভেন'শ কলেজে রিসার্চ এবং শিক্ষকতার কাজও পেয়েছিলাম।

তিনি প্রত্যেক চিঠিতেই আশীর্বাদের সঙ্গে প্রেম, পবিত্রতা ও ঠাকুরের প্রতি ভক্তি-বিশ্বাস-বৃদ্ধির উপরই বেশি জোর দিয়ে লিখতেন। ১৯২৯ সালের একটি চিঠিতে লিখেন, “...এই বয়সে ব্রহ্মচর্য ও পবিত্রতার দিকে খুব নজর রাখবে এবং ভক্তি বিশ্বাস ও নির্ভরতার জন্য তাঁর কাছে খুবই প্রার্থনা করবে। তিনিই তোমাকে ঐসব দিতে পারেন এবং চাইলে পাওয়া যায়। তিনিই তোমার হৃদয়ে ঐভাব দিয়েছেন—বাড়াবেন বইকি। প্রাণে আপনিই আবেগ আসবে, পাবে। খুব প্রার্থনা করবে।...”

১৯৩০ সালের মাঝামাঝি আমার এক ছোট ভাইয়ের টাইফয়েড হয় এবং প্রায় দু-আড়াই মাস সেই রোগে ভোগে। একসময় তার অবস্থা খুবই খারাপের দিকে যায় এবং ডাক্তারেরা হতাশ হয়ে পড়ায়, বাড়ির সকলে আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় মুহ্যমান হয়ে পড়েন। সবকথা তখন মহাপুরুষ মহারাজকে লিখে জানাই। সে চিঠির উত্তরে তিনি লেখেন—“তোমার ছোট ভাইটির অসুখ করেছে, তুমি ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছ—তুমি বালক, পবিত্র এবং ভগবদ্ভক্ত, তোমার প্রার্থনা তিনি শুনবেন। তোমার ভাইটি আরোগ্য হয়ে যাবে তাঁর কৃপায়।” ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষের আশীর্বাদ কখনও নিষ্ফল হতে পারে না। রোগীর অবস্থার ক্রমশ উন্নতি হয় এবং সে কিছুদিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে ওঠে।...

* * *

পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ যে বাক্সিদ্ধ ছিলেন—তাঁর আশীর্বাদ যে অমোঘ তার অনেক প্রমাণ পেয়েছি। আর একবারের কথা মনে পড়ে। ১৯৩২ সালের এপ্রিল মাস। শীতের সময় টাইফয়েড জ্বরে ভুগে শরীর খুব দুর্বল হয় এবং জ্বর ছাড়ার পরও যকৃতের দোষ ছিল। সেজন্য সেবার ফাইনাল পরীক্ষা দিতে পারিনি। একদিন সকালে মঠে গিয়ে মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করলাম। আমাকে দেখে বললেন—“তোমার অসুখের খবর চিঠিতে পেয়েছিলাম; এখন কেমন আছ?” সব কথা তাঁকে জানালাম। তিনি বললেন—‘টাইফয়েডের পর অনেক সময় এমন হয়। তা তুমি সিদ্ধ জিনিস খেও আর এক চামচ করে olive oil (জলপাইয়ের তেল)

খেয়ে দেখ—ওতে যকৃতের রোগে বেশ উপকার হয়।" তারপর তাঁর সেক্রেটারি মহারাজকে ডেকে বললেন—"সুরেশ ডাক্তারকে বলে দাও একে ভাল করে দেখে যেন ঔষধ দেন।" আমাকে বললেন, "তুমি আজ মঠেই প্রসাদ পাও আর ফেরার পথে বৌবাজারে সুরেশ ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে তাঁর ওষুধ নিয়ে যেও। তিনি যেমন ব্যবস্থার নির্দেশ দেন সেরূপ করবে।" প্রসাদ পাবার আগে ঠাকুরঘরের দালানে বসে ভাবতে লাগলাম—ইনিই সেই মহাপুরুষ যাঁকে কিছুদিন আগে ঠাকুরঘরের সামনে ছাদে ধ্যানস্থ অবস্থায় সংসারের মায়া-বন্ধনের উর্ধ্বে ভাবরাজ্যের অসীম বিস্তারের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে দেখেছিলাম! এঁর উপরই রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেন্টের গুরুভার ও দায়িত্ব! হাজার হাজার ভক্তের কল্যাণের জন্য এঁকে অহরহ কত চিন্তা করতে হয়! কত লোকের কত আবেদন-নিবেদন এঁর কাছে নিত্য এসে পৌঁছচ্ছে এবং সেসব চিন্তাও করতে হয়! অথচ আমার মতো নগণ্য এক ছোকরার শরীর খারাপ, তার জন্যও এত ভাবনা! ডাক্তার ও ওষুধের ব্যবস্থা পর্যন্ত—নিজে নির্দেশ দিয়ে নিখুঁতভাবে তার বন্দোবস্ত করে দিলেন! এঁর এই স্নেহ ভালবাসা পাবার আমার নিজের তো কোন যোগ্যতাই নেই। এঁর জন্য তো আমি কোন ত্যাগই স্বীকার করিনি বা এঁর কোন সেবাই করতে পারিনি। এই কি অহেতুকী ভালবাসা? ইনি কি মানুষ, না দেবতা?...

অবাক হবার তখনও বাকি ছিল। দুপুরে মঠে সাধু ও ভক্তদের সঙ্গে প্রসাদ পেতে বসেছি। অন্য পাতে কিছু ভাজা মশলাযুক্ত ব্যঞ্জন পরিবেশন হলো—কিন্তু আমার পাতে তা পড়ল না। অবশ্য দিতে এলেও আমি মানা করতাম। কারণ সেসব জিনিস আমার খাওয়া তখন নিষিদ্ধ। ভাবছি, আমি যে এসব খাই না তা এঁরা জানলেন কি করে? কিছুক্ষণ পরেই দেখি, একটি বড় কাঁসার বাটিতে একবাটি মশলাবিহীন ঝোল পাতের কাছে একজন রেখে দিলেন ও বললেন—"মহাপুরুষ মহারাজ বলেছেন তোমাকে দিতে।" কিছুক্ষণ অবাক হয়ে বসে রইলাম। বুকের মধ্যে একটা আলোড়ন এল আর মাথা নিচু করে চোখের জলে খাওয়া শেষ করলাম। তখন বুঝতে পারলাম—কার নির্দেশে ইতঃপূর্বে আমার পাতে ভাজা ও অন্য তরকারি দেওয়া হয়নি।

প্রসাদ পাবার কিছুক্ষণ পরে একজন আমাকে বললেন, "মহাপুরুষ মহারাজ তোমাকে উপরে ডাকছেন।" তখনই গেলাম। তিনি তখন নিজের খাটটিতে বসে আছেন; প্রণাম করে তাঁর পদপ্রান্তে বসতেই খাওয়া হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করলেন। সে কথার উত্তর দিলাম। আগে ভেবেছিলাম যে, তাঁর কাছে নিজের মনের কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার কথা জানাব। কিন্তু তাঁর সামনে বসে কিছুই বলতে পারলাম না। কেবল

জলভরা চোখে তাঁর দিকে চেয়ে বসেছিলাম—এই কথাই মনে পড়ে। তিনি নিশ্চয়ই আমার অন্তরের কথা বুঝেছিলেন। কিছুক্ষণ কোন কথা বললেন না, দু-জনেই চুপচাপ। তারপর বললেন, "বাবা, ঠাকুর বড়ই দয়াল। তাঁকে আপনার জন ভেবে খুব প্রার্থনা করবে। তিনিই তোমার সকল অভাব পূর্ণ করবেন। তাঁর কৃপায় তোমার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হবে। আমাদের বয়স হয়েছে, তাঁর কাজের জন্য তিনি যতদিন রাখেন আছি। কবে আছি, কবে নেই—এ তাঁরই ইচ্ছা।"

তখন কি জানি যে তাঁর পদপ্রান্তে বসে তাঁর মুখের অমৃতময়ী বাণী শোনার সুযোগ এ জীবনে আর পাব না। কত কথাই তো তাঁকে বলার ছিল, বলা হয়নি! কোন সেবাই তাঁর করতে পারিনি। এ অনুতাপের শেষ নেই। সেদিন তাঁকে প্রণাম করে সজল চোখে বিদায় নিয়েছিলাম এবং তাঁর নির্দেশমত ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে ওষুধ নিয়ে ফিরেছিলাম। বলা বাহুল্য তাঁর আশীর্বাদস্বরূপ সেই ওষুধেই আমার উপকার হয়েছিল।

এর পর মাত্র আর একবার তাঁর দর্শন পেয়েছিলাম। তবে সে দর্শনমাত্র। তখন তাঁর কথা বলার শক্তি নেই। শরীর খুবই খারাপ। আগস্ট মাসে (১৯৩৩ সালে) পাটনা থেকে কটক যাবার পথে—মঠে তাঁর ঘরে গিয়ে তাঁর শরীরের অবস্থা দেখে অশ্রু সংবরণ করতে পারলাম না। তাঁকে প্রণাম করে কেমন আছেন জিজ্ঞেস করায় তিনি ইশারায় ঠাকুরের ছবির দিকে দেখালেন এবং একটু হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন। তাঁকে প্রণাম করে চোখের জলে তাঁর কাছ থেকে শেষ বিদায় নিলাম। নরদেহে তাঁর সঙ্গে আর দেখা হয়নি। শুধু তাঁর অহেতুকী স্নেহ, ভালবাসা, করুণার যে আভাস পেয়েছি—তাতেই হৃদয়-মন ভরে আছে। তিনি আমার ইহকাল ও পরকালের চিরসাথী ও পথপ্রদর্শক।

মহাপুরুষজীর স্মৃতিকথা

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি. এ.

পরমপূজ্যপাদ শ্রীমহাপুরুষ মহারাজকে দর্শনের সৌভাগ্য হয় ১৯২৯ সালে, তখন আমার বয়স তেত্রিশ বৎসর। তাঁর পূর্বে কখনও বেলুড় মঠে যাইনি, কোন সাধুর সঙ্গে আমার পরিচয়ও ছিল না। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' আমার ভগিনীপতির বাড়িতে চোখে দেখেছিলাম এবং কৌতূহলবশত কিছুটা পড়েছিলাম মাত্র। স্বামীজীর

বইও কিছু কিছু পড়েছিলাম, তাতে করে 'দরিদ্রনারায়ণদের' সেবা করবার প্রবৃত্তি বোধ হয় জেগেছিল। সরকারি অফিসে চাকরি করতাম, বারবেল ও মুগুর ভাঁজতাম, কুস্তি লড়তাম। ডিফেন্স পার্টির নেতা হয়ে রাত্রে পাড়ায় চৌকি দিতাম আবার প্রয়োজনমত স্থানীয় লোকদের অসুখে বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ-বিতরণ করতাম—এভাবে জীবন চলেছিল সহজগতিতে। ধর্মকর্মের ধার ধারতুম না।

ঐ সময়ে আমার স্ত্রী সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হলেন, জীবনসংশয়—তাঁকে কলকাতার বিশিষ্ট চিকিৎসকদের চিকিৎসাধীন রাখা হলো। অজস্র অর্থব্যয় গুরুঋণভার ও অন্যান্য নানাকারণে মনঃকষ্টে প্রপীড়িত হয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়, এমন সময় আমার একজন শুভানুধ্যায়ী, আত্মীয় ও বন্ধু আমাকে স্বামীজীর মধ্যম ভ্রাতা পূজনীয় মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি তখন হরিদ্বার ও কনখলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও তপস্যাদি সম্বন্ধে উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর সঙ্গে আলাপ করছিলেন। মুগ্ধ হয়ে একমনে তাঁর কথাবার্তা শুনে মনে হলো যেন অন্য রাজ্যে এসেছি। তিনি আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। বন্ধু সমস্ত জানালেন। সেই রাত্রেই স্বপ্ন দেখলাম যেন মহিমবাবু বলছেন, "তুমি এই মন্ত্র জপ কোরো, শান্তি পাবে।"

পরদিন তাঁর কাছে গিয়ে ঐ স্বপ্নের কথা নিবেদন করতে তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, "তোমার দীক্ষা নেবার সময় হয়েছে। আমি কিন্তু কাউকে দীক্ষা দিই না। তবে তোমার যদি আমার উপর শ্রদ্ধা থাকে তো আমি যাঁকে শ্রদ্ধা করি তিনি এখনও বেঁচে আছেন। যাও স্বামী শিবানন্দ মহারাজের কাছে। বলো যে আমি তোমায় পাঠিয়েছি। তিনি তোমাকে দীক্ষা দেবেন।"

আমি বললাম, "আমি তো কখনও মঠে যাইনি। কাউকে চিনি না। কি হবে?" তিনি আমার বন্ধুর নাম করে বললেন, "ও-ই তোমাকে নিয়ে যাবে, চিন্তা নেই।"

ঐ ঘটনার কয়েক দিনের মধ্যেই একদিন সকালে বন্ধুটির সঙ্গে শ্রীমহাপুরুষ মহারাজকে দর্শন করতে বেলুড় মঠে গেলাম। পুরানো মঠবাড়ির দোতলায় উঠেই দেখলাম ঠিক পশ্চিমদিকের ঘরটিতেই একটি চেয়ারে তিনি বসে আছেন। ধ্যানগম্ভীর সৌম্যমূর্তি। আমরা ভক্তিভরে তাঁর শ্রীচরণে প্রণাম করলাম। বন্ধু আমাকে দেখিয়ে বললেন, "এঁকে মহিমবাবু আপনার কাছে পাঠিয়েছেন—দীক্ষার জন্য।" মহিমবাবুর নাম করার সঙ্গে সঙ্গেই মহারাজ বলে উঠলেন, "ও, মহিম, মহিম, মহিম। কেমন আছে? কেমন আছে সে? চা খেয়ে খেয়ে লিভারটা মাটি করলে।"

বন্ধু মহিমবাবুর শারীরিক খবরাখবর দিয়ে আমাদের আসার উদ্দেশ্য পুনরায় নিবেদন করলেন। স্নিগ্ধ প্রসন্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "হ্যাঁ

বাবা, তোমার দীক্ষা হবে; কিন্তু এখন নয়, পরে এসো।" আমার নাম ধাম বর্ণ কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না।

তারপর মধ্যে মধ্যে একাই তাঁকে দর্শন করতে যাই। প্রণাম করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলতেন, "শরীর এখন ভাল নেই, পরে এসো, বাবা।"

১৯২৯ সাল শেষ হলো। স্ত্রীর অসুখ চলছে। ডাঃ ইউনান চিকিৎসা করছেন। একদিন মন অত্যন্ত খারাপ হওয়ায় ভোরেই গিয়ে মঠে শ্রীমহাপুরুষজীর চরণ-বন্দনা করলাম। আমাকে দেখেই তিনি বললেন, "ওঃ তুমি এসেছ? যাও গঙ্গাস্নান করে এসো। আজ তোমার দীক্ষা হবে।"

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে যেন লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি দিয়ে নামছি। নিচে অফিসঘর, জনৈক সেবক বললেন, "কি মশাই, এত তাড়া কিসের? আমি তাঁকে দীক্ষা ও স্নানের কথা বললাম। তিনি বললেন, "স্নান তো করা হবে তা কাপড়চোপড় আছে?"

আমি সে কথা তো ভাবিনি। বললাম—"না।" তিনি অফিসঘর হতে দুখানি গামছা দিলেন। স্নানাদি সেরে উপরে উঠতে যাচ্ছি এমন সময় সেবক জিজ্ঞেস করলেন, "দীক্ষা তো হবে—গুরুদক্ষিণা আছে তো?" রোজ কাছে কিছু কিছু বাড়তি টাকাপয়সা থাকে, কিন্তু সেদিন কিছুই নেই। মাত্র গাড়িভাড়ার জন্য কয়েক আনা ছিল। তা কি দেওয়া যায়? না হয় পায়ে হেঁটেই ফিরব। মনের কথা সেবককে জানাতেই তিনি হেসে বললেন, "আর পায়ে হেঁটে ফেরবার দরকার নেই। এই হর্তুকিটি নিন, এটি দক্ষিণা দিলেই চলবে।"

দীক্ষার জন্য শ্রীমহাপুরুষজীর ঘরে গেলাম। তিনি নিজের ঘরের বিছানায় বসে আছেন, পুরানো ঠাকুরঘরের দিকে মুখ করে। হাত দুটি বিছানার উপরে। মুখমণ্ডল আরক্তিম! সর্বাঙ্গে যেন জ্যোতি বেরুচ্ছে। আমাকে নিচে মেজের উপরে একটি আসনে বসতে বললেন এবং তিনি যেন ভাবস্থ হয়ে ধীর গম্ভীর ভাবে প্রত্যেক শব্দের উপর জোর দিয়ে আমায় 'মহামন্ত্র' দান করলেন। এক একটি শব্দ উচ্চারণ করে আমাকে তা পুনরুচ্চারণ করতে বললেন। আমি তাই করলাম। এভাবে কয়েকবার মন্ত্র উচ্চারণ করার পর শ্রীশ্রীঠাকুরকে হৃদয়ে ধ্যান করতে বললেন এবং প্রার্থনা করতে বললেন, "ঠাকুর, তুমি আমার ধর্মাধর্ম, পাপপুণ্যের ভার নাও, আর আমার সমস্ত কর্মের ফল তুমি নাও।" মঠের দেয়া হরীতকীটিই দক্ষিণা দিয়ে প্রণাম করলাম। পরে ঘরের এক কোণে বসে কিছুক্ষণ জপ করতে বললেন। তারপর সেদিন মঠেই প্রসাদ পেলাম। কখন, কতবার, কত সংখ্যা জপ করতে হবে, তা তিনি বললেন না এবং আমিও জিজ্ঞেস করিনি।...

পরে মঠের শিল্পবিদ্যালয় হতে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী ও শ্রীগুরুদেবের ছবি কিনে বাঁধিয়ে বাড়ির একটি নিভৃত স্থানে স্থাপন করে সেখানে জপ করতাম। এইভাবে কিছুকাল কাটল। স্ত্রীর অসুস্থতার জন্য দীক্ষার কথা তাঁকে বলিনি। সুচিকিৎসার ফলে ক্রমে ক্রমে তাঁর স্বাস্থ্যের একটু উন্নতি হতে লাগল। অবশেষে একদিন তাঁর কাছে ধরা পড়ে গেলাম। তাঁকে বাদ দিয়ে আমি একাই মন্ত্র নিয়েছি শুনে তিনি কান্নাকাটি করতে লাগলেন। পরে ধরে বসলেন, তাঁকে গুরুদর্শনে নিয়ে যেতে হবে। যদিও তখনও তাঁর চলবার শক্তি ছিল না, তবু ডাক্তারের অনুমতি নিয়ে মোটরযোগে মঠে গেলাম। ১৯৩১ সালের ঘটনা।

গাড়ি থেকে নেমে শ্রীমহাপুরুষজীকে দর্শন করবার অনুমতির জন্য সেবক মহারাজের সঙ্গে দেখা করলাম। দুর্ভাগ্যবশত সেদিন শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের শরীর খুব খারাপ ছিল; তাঁরা অনুমতি দিতে রাজি হলেন না। ফিরে এসে স্ত্রীকে বললাম, "তোমার ভাগ্যে নেই—কি করব বলো? এখন বাড়িতে চলো।" স্ত্রী কাঁদতে লাগলেন। মোটরচালক গাড়ি স্টার্ট দেবার চেষ্টা করছে, এমন সময় জনৈক সাধু দৌড়ে এসে বললেন, "গাড়িতে যিনি আছেন, তাঁকে দেখা করবার জন্য ডেকেছেন।" অপ্রত্যাশিত আহ্বানে আমরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম। পূজনীয় জ্ঞান মহারাজের ঘর হতে একখানি চেয়ার নিয়ে, আমি ও আমার পাচক দু-জনে মিলে সেই চেয়ারে বসিয়ে স্ত্রীকে বয়ে আনলাম মহাপুরুষ মহারাজের ঘর পর্যন্ত। সঙ্গে দুই কন্যা। ঘরে প্রবেশ করে দেখলাম তিনি সহাস্যবদনে বিছানায় বসে আছেন। পেছনে ও পাশে বালিশ দেওয়া; পাশে কয়েকজন সেবক। জনৈক সেবক বললেন, "ঐখান থেকেই প্রণাম করে চলে যান।"

"বাবা, পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে পারব না?" আমার স্ত্রী বললেন।

"হাঁ, মা, তুমি পারবে", মহাপুরুষজী বললেন। আমরাও সকলে তাঁকে প্রণাম করে ধন্য হয়ে পরিপূর্ণ-হৃদয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। এর পরে দীক্ষাগ্রহণের জন্য স্ত্রী অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। মহাপুরুষ মহারাজকে তা নিবেদন করতে তিনি ক্ষণকাল চোখ বুজে থেকে বললেন, "হাঁ, ওর-ও দীক্ষা হবে—বেশ সরল। তবে ওকে এখানে আনবার দরকার নেই, মন্ত্র লিখে দেব। কাল তোমরা সকালে স্নান করে, ঠাকুরের পটের সামনে বসে, তুমি জপাদি করে মন্ত্রলেখা কাগজটি তাকে দেবে। তা হলেই হবে!"

তাই করা হলো। স্ত্রীর এইভাবে দীক্ষা হয়ে গেল। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে স্ত্রী বললেন, "কাল রাত্রে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম। দেখলাম যেন একজন বৃদ্ধা আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন—"তোমার আজকে মন্ত্র হয়েছে?" আমি

বললুম, "হ্যাঁ।" তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কি মন্ত্র পেলে?" আমি বললুম, "বলব না।" তিনি বললেন, "বলনা।" আমি বললুম, "না, বলতে নেই।" শেষে চলে যাবার সময় তিনি বললেন, "আমি জানতে এসেছিলাম, তুমি মন্ত্র পড়তে পেরেছ কিনা। যা হোক যা পেয়েছ তাইতেই হবে।" স্ত্রীর কথা শুনে আমি আনন্দিত হয়ে কাকেও ওকথা বলতে নিষেধ করলাম। পরে আমার মনে হলো, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরুন এসেছিলেন এবং স্ত্রী মন্ত্র ঠিকভাবে গ্রহণ করেছেন কিনা তা জানতে চেয়েছিলেন। কয়েক বৎসর ভাল থেকে আমার স্ত্রী পুনরায় সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯৩৯ সালে দেহত্যাগ করেন। অসুখে ভুগে ভুগে তাঁর মাথার যেন গোলমাল হয়েছিল, মনে হতো, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, মৃত্যুর দুদিন আগে থেকে তাঁর অবস্থা একেবারে বদলে যায় এবং তিনি স্বাভাবিক হয়ে যান। শেষ সময়ে আমার মুখে শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম সাগ্রহে শুনতে শুনতে দেহত্যাগ করেন।...

* * *

দীক্ষার জন্য আমার মন কতটা প্রস্তুত ছিল তা জানিনে, কিন্তু অমোঘ গুরুশক্তির প্রভাবে দীক্ষার পর হতে ক্রমে আমার মধ্যে কয়েকটি অভাবনীয় পরিবর্তন এল। প্রথম—শ্রীগুরুপ্রদত্ত মহামন্ত্র যেন আমাকে পেয়ে বসল। ইচ্ছা করি বা না করি, যখন-তখন, যেখানে-সেখানে আপনা হতেই ভিতরে মহামন্ত্র-জপ হতে লাগল। রাস্তায়, গাড়িতে, বাড়িতে, অফিসে কোথাও অব্যাহতি নেই। মন যেন নিজের নয়—যেন কোন ঐশী শক্তি মনকে চালিত করছে। শেষটায় এমন হলো যে, অফিসের কাজে মন দেওয়াও যেন অতি দুরূহ ব্যাপার। দ্বিতীয়—মনের রিপুগুলির তাড়না আমার অজ্ঞাতসারে শান্ত হয়ে গেল। তৃতীয়—মনে কিঞ্চিন্মাত্র চাঞ্চল্য এলেই শ্রীগুরুদেবকে দর্শন করতে যেতাম, তাতেই তা সম্পূর্ণ তিরোহিত হতো এবং এই ভাব প্রায় মাসাবধি থাকত। শেষের দিকে যখন তাঁর শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ নিষিদ্ধ হয়েছিল, তখন তাঁকে দর্শনমাত্রই ঐ ফল অনুভব করতাম। চতুর্থ—মনের মধ্যে কোন সংশয় উঠলে ইচ্ছা হতো যে শ্রীগুরুদেবকে প্রশ্ন করে তা সমাধান করে নেব। কিন্তু তাঁর কাছে গেলেই প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গিয়ে চকিতে মন শান্ত এবং সংশয় মুক্ত হতো।...

মহাপুরুষ মহারাজকে যখনই দেখতে যেতাম, তখনই দেখতাম তিনি ধ্যানস্থ। প্রশান্ত গম্ভীর মূর্তি—যেন অর্ধ-বাহ্যদশায় আছেন। তাঁকে দেখলেই মনে হতো সাক্ষাৎ শিব—যেন আমারই উদ্ধারের জন্য লীলাবিগ্রহ ধারণ করে আছেন।

একদিন এভাবে মনে কিছু সংশয় উপস্থিত হওয়ায় প্রতিজ্ঞা করলাম যে, আজ শ্রীগুরুদেবকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতেই হবে। তাঁকে প্রণাম করে প্রশ্নটি উত্থাপন করবার

জন্য তাঁকে বললাম—"বাবা, কিছুই তো বুঝতে পারছি না।" তৎক্ষণাৎ তিনি উত্তর দিলেন, "তোমার বোঝবার তো দরকার নেই, বাবা। ডাকো, খালি তাঁকে (হাতে তিনবার তালি দিয়ে) 'মা, মা, মা' বলে ডাকো। বোঝবার দরকার হয় তিনিই বুঝিয়ে দেবেন।" আর কখনও কোনও বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করিনি এবং আমার দীর্ঘজীবনে দেখেছি যে, তাঁর উপদেশ সম্পূর্ণ সত্য, তাঁর আশীর্বাদ অমোঘ। তিনি ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিনিধি। মনোবাসী শ্রীঠাকুরই অন্তর্যামিরূপে সব সংশয় মিটিয়ে দেন।...

জীবনে একবার মাত্র তাঁর আশীর্বাদ ভিক্ষা করেছি। কিন্তু তাতে আমার নির্বুদ্ধিতার কথা এখন মনে হয়। লোকে কল্পতরু গুরুরূপী ভগবানের কাছে জ্ঞান চায়, ভক্তি চায়, মুক্তি চায়। কিন্তু আমি চাইলাম—আমি যেন কর্মযোগী হতে পারি; প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করে তৎক্ষণাৎ তিনি আশীর্বাদ করলেন, "হবে হবে, হবে, আমি বলছি হবে। নিশ্চয় হবে।"...

শ্রীগুরুর মর্তলীলার অবসানের দিনটিতে মাত্র উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি। তিনি স্থূলদেহে বর্তমান না থাকলেও, তাঁর কৃপা হতে কখনও বঞ্চিত হইনি। ভুলপথে পদক্ষেপ করবার উপক্রম মাত্রই তাঁর দিব্য উপস্থিতি অনুভব করেছি। গুরুদেবের কোন সেবা করতে পারিনি, তিনিও কখনও কিছু চাননি আমার কাছে। তাঁর দেহত্যাগের পরে তাতে মনে বিশেষ ক্ষোভ ছিল।

এক রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম, শ্রীশ্রীঠাকুর এসেছেন। বলছেন—"ওগো, আমার একজোড়া কাপড় আর একজোড়া চটিজুতো দরকার। দিতে পারবে?" আমি বললাম, "নিশ্চয়ই দেব।" "দেখি, বাবু, পার কিনা"—এই বলে তিনি অন্তর্হিত হলেন। ঘুম ভেঙে গেল। ভোর হলো, কি করি ভাবছি—শ্রীঠাকুরকে কি দেব বুঝতে না পেরে পূজনীয় মহিমবাবুর কাছে গিয়ে সব নিবেদন করলাম। তিনি শুনেই বললেন, "এতে আর ভাববার কি আছে? মঠের প্রেসিডেন্টকে ঐ জিনিসগুলি কিনে দিয়ে এসো।"

পরে একদিন সব জিনিস কিনে স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজকে দিয়ে আসি এবং বোধ হয় শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ মনে করে তিনি মাথায় ঠেকিয়ে সব জিনিস গ্রহণ করলেন।...

গুরুদেবের পুণ্যস্মৃতি

শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

মহাপুরুষজী কে ছিলেন, সে কথা এক সময়ে তিনি নিজমুখে বলেছিলেন ঃ "এই শরীরটা কি বারবার আসে? আড়াই হাজার বছর পূর্বে সেই ভগবান তথাগতের সঙ্গে এসেছিল।"...

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে শ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি-মন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষে আমরা পাটনা থেকে কাশী গিয়েছিলাম। সে সময় শ্রীসারদানন্দ মহারাজও কাশীতে ছিলেন। খুব আনন্দের হাট বসেছিল। এমন সময় খবর পেলাম, শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ বিকেলে এলাহাবাদ থেকে কাশীতে আসছেন। সন্ধ্যাবেলায় দেখলাম মহাপুরুষজী অদ্বৈতাশ্রমের খোলা বারান্দায় শরৎ মহারাজের সঙ্গে বসে কথাবার্তা বলছেন।

মহাপুরুষ মহারাজ—এলাহাবাদ গিয়ে দেখলাম পেসন (স্বামী বিজ্ঞানানন্দ) বারোজনকে জিইয়ে রেখেছে, তাদের দীক্ষা হয়ে গেল।

শরৎ মহারাজ—আজকাল এই ঢং হয়েছে—দীক্ষা নেওয়া; তারপর কিছুদিন যেতে না যেতে বিরক্ত করে মারে—কিছু হলো না।

মহাপুরুষ মহারাজ—হ্যাঁ, তবে এ রকমও দেখা যায় যে, দীক্ষা নেবার পরে তাদের ভক্তি-বিশ্বাস বেড়ে যায়।

এরপর কনখল সেবাশ্রম সম্বন্ধে কথাবার্তা হতে থাকে। দীক্ষা সম্বন্ধে তাঁদের ঐ কথোপকথন কিন্তু আমার মনে একটা বিমুখতার ভাবের সৃষ্টি করেছিল। ঐ বার শ্রীমহাপুরুষজীকে প্রণাম করেছি মাত্র, কথাবার্তা কিছু হয়নি।

*　　*　　*

স্বামী প্রকাশানন্দ মহারাজ পাটনা আশ্রমে এসেছেন। সেটা বোধ হয় ১৯২৩ সালের ফেব্রুয়ারির শেষ বা মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে। তাঁর সঙ্গে আর একজন মহারাজও ছিলেন। আমি ঐ সময় প্রকাশানন্দজীর সেবকরূপে পাটনা হতে দেওঘর হয়ে বেলুড় মঠে পৌঁছলাম। এই আমার প্রথম বেলুড় মঠ-দর্শন।

পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ নিচের বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন, চায়ের টেবিলের পাশে। বহু সাধু-ভক্ত একত্র হয়েছেন। প্রকাশানন্দজী শ্রীমহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করতেই তিনি বললেন, "সুশীল, তোমার অনেক চিঠিপত্র ও কেবল জড়ো হয়ে আছে।" তারপর প্রকাশানন্দজী আমাকে মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে পরিচয় করাবার জন্য বললেন, "এই ছেলেটি পাটনার ভক্ত। আমার খুব সেবা করে। এইজন্য মঠে এনেছি।" মহাপুরুষ মহারাজ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমাকে ইতঃপূর্বে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে, তাই না?" আমি বললাম, "হ্যাঁ, কাশীতে আপনার দর্শন পেয়েছিলাম।" তারপর প্রকাশানন্দজীর তামাক সাজবার ব্যবস্থা করতে লাগলাম। একটু পরেই দেখি শঙ্কর মহারাজ কাঁধে তোয়ালে, গায়ে মাইশোরী গেঞ্জি, গলায় কালভৈরবের ডোর—তিনি একটি ডিশে প্রসাদ নিয়ে খুব ব্যস্তভাবে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি পাটনার বিশুবাবু?" আমি বললাম, "হ্যাঁ, মহারাজ।" তিনি বললেন, "মহাপুরুষ মহারাজ আপনার জন্য প্রসাদ পাঠিয়ে দিয়েছেন।" দেখলাম প্লেটে অর্ধেক পাউরুটির খাওয়া টুকরো ও কিছু মিষ্টি। আমি প্রসাদ পেয়ে প্রকাশানন্দজীকে তামাক সেজে দিলাম। তিনি জ্ঞানেশ্বর মহারাজকে বললেন, "যাও, জ্ঞানেশ্বর! বিশুকে মহাপুরুষজীর কাছে নিয়ে গিয়ে দাগিয়ে দাও।" আমার মন দীক্ষার জন্য প্রস্তুত ছিল না। আমি বললাম, "না, মহারাজ! দীক্ষার ব্যাপারে আমি নেই।" প্রকাশানন্দ মহারাজ বললেন, "তুমি তো খুব বোকা! মহাপুরুষজী হলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের পার্ষদ ও সঙ্ঘ-গুরু। দীক্ষা দেওয়া তাঁর ইচ্ছা। আমি বললেও হবে না, তুমি 'না' বললেও হবে না। যাও, শীঘ্র দেখা করো।"

আমি জ্ঞানেশ্বর মহারাজের সঙ্গে গিয়ে দেখি মহাপুরুষ মহারাজ 'কথামৃত' পড়ছেন। আমাদের দেখে উঠে দাঁড়ালেন। দেখলাম, তার ডান পা দড়ির চটির বাইরে ও বাম পা চটির একটু ভিতরে। জ্ঞানেশ্বর মহারাজ মহাপুরুষ মহারাজজীকে বললেন, "এই ছেলেটিকে আপনি কৃপা করুন।" আমি এই কথা শুনে বিমূঢ় হয়ে গেলাম। জ্ঞানেশ্বর মহারাজ আমার অবস্থা দেখে আমার ঘাড়ে খুব জোরে চাপ দিয়ে বললেন, "মহাপুরুষ মহারাজজীকে বল।" আমি আর কি করব? অগত্যা মহাপুরুষজীকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলাম। অজ্ঞাতসারে আমার মাথা তাঁর ডান পায়ের উপর রাখামাত্র প্রবল বন্যার মতো অঝোরে চোখের জলে তাঁর পা ভিজে গেল। অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়াই। মহাপুরুষ মহারাজ (এতক্ষণ তিনি স্থির হয়ে ছিলেন) বললেন, "আজকে তো আমার গদাধর আশ্রমে যাবার কথা। সেখানকার ভক্তরা গাড়ি নিয়ে আসবে। ওরা যদি এখন এসে পড়ে! যাই হোক, take a chance (যদি সুযোগ ঘটে)।" জ্ঞানেশ্বর মহারাজ বললেন, "এ এক কাপড়ে

এসেছে, দ্বিতীয় বস্ত্র নেই।" এই কথা শুনে মহাপুরুষ মহারাজ হেসে বললেন, "তাতে কি হয়েছে—এ আমাদের অন্নপূর্ণার সংসার। শঙ্কর মহারাজকে আমার জন্য একখানি ধুতি, চাদর ও গামছা দিতে বলে আমায় বললেন, "তুমি গঙ্গাস্নান করে এই নূতন কাপড় পড়ে ঠাকুরঘরে অপেক্ষা কর।" আমি সেভাবে ঠাকুরঘরের বারান্দায় গিয়ে বসলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি, মহাপুরুষ মহারাজ বগলে হরিণের চামড়ার আসন নিয়ে মন্দিরের ভিতর চলে গেলেন। তারপর আমাকেও ভিতরে ডাকলেন এবং তাঁর নিজের পাশে ঠাকুরের দিকে মুখ করে বসালেন। আমার প্রাণের আবেগে চোখ ঝাপসা হয়েছিল, তাই মনে হলো ঠাকুরঘর কুয়াসায় আবৃত। ঠাকুরের ছবি ও মহাপুরুষজীকে একটু আবছা আবছা মনে হতে লাগল। মহাপুরুষজী বলতে লাগলেন, "ঠাকুর জগতের কল্যাণের জন্য সভক্ত এই ধরাধামে লীলা করতে অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি যুগাবতার, ভক্তবৎসল ও পরম দয়ালু। তিনি তাঁর ভক্তদের বড়ই ভালবাসেন।"...তারপর মহামন্ত্র দিয়ে, হাত পাতলেন। আমার কাছে কিছুই ছিল না। তখন তিনি পুষ্পপাত্র হতে একটি হরীতকী নিয়ে তাঁর হাতে দিতে বললেন। তারপর ঠাকুর-ভাণ্ডারিকে বললেন কিছু ফল ও মিষ্টান্ন আনতে এবং তাও আমার হাত থেকে গ্রহণ করলেন। তিনি যখন নিজের ঘরে ফিরে এলেন তখন গদাধর আশ্রমের ভক্তেরা গাড়ি নিয়ে পৌঁছেছেন। দেরি হবার কারণ—বড়বাজারের মোড়ে গাড়ির টায়ার পাংচার হয়ে গিয়েছিল। আমি তাঁর ঘরে গিয়ে দেখলাম তিনি তৈরি। শঙ্কর মহারাজ মহাপুরুষ মহারাজের প্রসাদী বেলের পানা দিলেন। দীক্ষার পর আমার পূর্বের বিরূপ-ভাব চিরতরে দূর হয়ে গেল। নূতন জীবন, নূতন আশায় প্রাণ ভরপুর। মহাপুরুষজীকে দর্শন করবার একটা অব্যক্ত দুর্বার আকর্ষণ অনুভব করতাম, কিন্তু একথা কাকেই বা বলি—মনেই চেপে রেখেছিলাম। সেদিন দীক্ষাদানের পরই তিনি গদাধর আশ্রমে চলে গিয়েছিলেন।...

পরদিন জ্ঞানেশ্বরানন্দজী আমায় বললেন, "চল, মহাপুরুষ-দর্শনে।" আনন্দে আপ্লুত হৃদয়, কণ্ঠ রুদ্ধ, কোনও ভাষা তখন আমার ছিল না। শুধু একবার তাঁর কথায় ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিলাম। আনন্দে চোখের কোণ অশ্রুসিক্ত।

আমরা উভয়ে 'মায়ের বাড়ি' (উদ্বোধন) হয়ে গদাধর আশ্রমে রওনা হই। 'মায়ের বাড়ি'তে তখন শরৎ মহারাজ উপস্থিত ছিলেন না। ভবানীপুরে পৌঁছতে-পৌঁছতে বেলা ১০টা হয়ে গেছে। গদাধর আশ্রমের সিঁড়ি বেয়ে উঠেই মহাপুরুষজীকে দর্শন করলাম। চির-বাঞ্ছিত জনের সান্নিধ্যে যেমন হৃদয় পূর্ণ হয়, মহাপুরুষজীকে প্রণাম করে আমার তখন তেমনি মনে হলো। প্রণাম করে মাথা তুলতেই তিনি স্নেহমাখা স্বরে বললেন, "আজ আমাদের এক ভক্ত বাড়িতে নিমন্ত্রণ।

আমরা সেখানে যাচ্ছি, তুমি আজ এখানেই ঠাকুরের প্রসাদ পাবে। আমাদের ঠাকুরের মোটা ভাত-তরকারি।" তাঁকে দেখে, তাঁর কথা শুনে মন আনন্দে ভরে গেল।...

* * *

একবারের কথা বেশ স্পষ্ট মনে হচ্ছে। আসামের কোন আশ্রমের জনৈক সাধু, মহাপুরুষজীর কাছে প্রণত হয়ে করুণকণ্ঠে নিবেদন করলেন, "মহারাজ, আসামের পাহাড়ি মেয়েরা যেভাবে চলাফেরা করে তাতে আমার পক্ষে সাধুজীবন যাপন করা কঠিন। আমায় অন্যত্র কোনও আশ্রমে পাঠিয়ে দিন।" শুনেই মহাপুরুষজী গর্জে উঠলেন, "তুমি সাধু হবে বলে কি মায়ের রূপ সব উঠে যাবে? যাও, ওখানেই থাকবে। ব্যাটা! বাড়িতে কি মা-বোন ছিল না, তখন কি করে থাকতে? তখন তো এসব মনে হতো না!" ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের উক্তি অব্যর্থ। সাধুর সম্বিৎ ফিরে এল। তিনি করজোড়ে মহাপুরুষজীর কাছে গদগদকণ্ঠে বললেন, "মহারাজ! আপনি যথার্থই বলেছেন। আমি মা-বোনের মতো তাদের দেখবো। আমি ওখানে থাকতে পারবো।" আশুতোষ অল্পেই তুষ্ট। তিনি সাধুটির এই ভাব দেখে প্রসন্ন হয়ে তাঁর মাথায় হাত দিয়ে খুব আশীর্বাদ করলেন, বললেন—"ব্যাটা! ঠাকুরের আশীর্বাদে ঠিক হয়ে যাবে। তাঁর নাম নিলে মনে কোন কুভাব আসতে পারে না।" মহাপুরুষজীর কৃপায় সেদিন তিনি প্রকৃতই সাধু দৃষ্টি ফিরে পেলেন।...

বেলুড় মঠ, গোধূলি। পশ্চিমাকাশে যেন সিঁদুর ছড়ানো। আবার সেই মুহূর্তে আকাশে চাঁদ উঁকি দিচ্ছে। মহাপুরুষজী তাঁর ঘরেই আছেন। চারদিকে থমথমে ভাব। আমি ধীরে ধীরে পাখা কচ্ছি। হঠাৎ মহাপুরুষজী গম্ভীরভাবে বললেন, "তুই এখানে কি করছিস? যা ঠাকুরঘরে যা।" আমি সঙ্কুচিত ও ভীত হয়ে পাখাটি নিচে রেখে দিলাম। আমার অবস্থা দেখে তিনি হেসে ফেললেন, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই পূর্বের গম্ভীরভাব ধারণ করলেন। কাছেই শৈলেশ মহারাজ ছিলেন, তাঁকে উদ্দেশ করে বললেন, "ঐ গানটা পড় তো।" 'শ্যামা মা উড়াচ্ছেন ঘুড়ি। (ভব-সংসার-বাজার মাঝে), ঘুড়ি আশা-বায়ুভরে উড়ে, বাঁধা তাহে মায়া-দড়ি ॥' ইত্যাদি গানপর্ব চলতে লাগল। শুনতে শুনতেই তিনি ডুকরে কেঁদে উঠলেন। আবার সেই সঙ্গে নিজ শরীরে মৃদু আঘাত করে বলতে লাগলেন—"চুপ, চুপ। I cannot afford to lose like this (আমি এরূপ ভাবের বহিঃপ্রকাশ হতে দিতে চাই না)।" তখন খুব স্পষ্ট বোধ করছিলাম, এক আধারে দুটি সত্তার খেলা। মানস লোকেও যা দেখা সম্ভব হয় না, এই স্থূল চক্ষু দিয়ে তাই প্রত্যক্ষ করলাম। মহাপুরুষজী একটু সামলে বললেন, "দেখছিস কি? আমার মনে হচ্ছিল ঠাকুরের কি কৃপা! (নিজ শরীর

দেখিয়ে) তার কৃপায় শিবানন্দ সাধু হয়ে গেল।" ঠাকুরের একান্ত কৃপার কথা ভেবে তিনি একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন!...

মহাপুরুষজীর শরীর তখন ভাল নয়। রাত জেগে পালা করে সেবকরা সেবা কচ্ছেন। মধ্যরাত্রি, চারদিক নিস্তব্ধ। মহাপুরুষজীর চোখে নিদ্রা নেই। শয্যার একপাশে নিজের মুখটি ঘুরিয়ে সহসা জিজ্ঞেস করলেন, "কে জাগে?" সেবক উত্তর দিলেন, "আমি সুধীর।" মহাপুরুষজী পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, "কে সুধীর?" উত্তরে সেবক বললেন, "আজ্ঞে, জ্ঞানাত্মানন্দ।" মহাপুরুষজী পুনরায় জোরের সঙ্গে বললেন—"কে জ্ঞানাত্মানন্দ?" এবার আর উত্তর দেবার কি আছে! সেবক প্রমাদ গণলেন—হয়তো বা কোনও ত্রুটি অজ্ঞাতসারে হয়ে গেছে। তাই সভয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন! মহাপুরুষজী তখন ব্রহ্মভাবে বিভোর। প্রকৃত সন্ন্যাসের অর্থ তখন তাঁর মনে উদ্ভাসিত। সেবককে লক্ষ্য করে বললেন, "তুমি না সন্ন্যাসী? তোমার আবার নামরূপ কি?" কথা কটি উচ্চারণ করেই আপন ভাবে মাতোয়ারা হয়ে গেলেন। তখন আর বুঝতে অসুবিধা হলো না "ওঁ মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি নাহং—" বাক্যের তাৎপর্য।...

মহাপুরুষজীর স্বাস্থ্য ক্রমেই ভেঙে পড়ছে। সকালবেলায় তাঁর দর্শনের জন্য সাধুদের ভিড় জমেছে, মহাপুরুষজীকে সুন্দর জামা কাপড় পড়িয়ে বিভূতি মাখিয়ে দেওয়া হয়েছে। খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। আমি তাঁর কাছে আছি। তিনি নিজ শরীরের দিকে দেখিয়ে বলছেন, "এর কোন দিনই যত্ন করিনি, এটার কথা মোটেই ভাবিনি। কিন্তু এরা এখন কত কষ্ট করে এটার যত্ন করছে, দেখে দুঃখ হচ্ছে।" তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলছেন, "তবুও এর একটা উদ্দেশ্য আছে।" খানিক মৌন থেকে কোনও বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে বললেন, "এই শরীরে কত তপস্যা হয়েছে, এই শরীরে সমাধিলাভ হয়েছে, এই শরীরে ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হয়েছে। এই শরীরে ঠাকুরের দর্শন হয়েছে, এই শরীরটা ভগবানের পার্ষদ। এর যে সেবা করবে, তারই কল্যাণ হবে।" এ সব কথায় নেহাত অর্বাচীনেরও সম্বিৎ ফিরে আসে।...

বেলুড় মঠের পরিবেশের কথা কি বলবো? সীমানার মধ্যে ঢুকলেই মনে হতো যেন পৃথিবীর কত ঊর্ধ্বে! জাগতিক কোন কোলাহলই আর সেখানে পৌঁছতে পারবে না। সত্যিই বড় ভরসার স্থান। যুবা বয়স। মহাপুরুষজীর কৃপা হয়েছে। স্নেহের অধিকার নিয়েই তাঁর কাছে যাতায়াত। জ্ঞানেশ্বরানন্দজীর সান্নিধ্যেও শাস্ত-আলোচনার ব্যূহে প্রবেশ করে গীতার স্থিতপ্রজ্ঞের কথা নিয়ে মনে খুব আলোড়ন চলছে। ঐ অবস্থা-লাভের প্রবল বাসনা। কিন্তু নিজের যোগ্যতা বুঝবার ক্ষমতা

তখন আমার নেই। তাই অধীর আগ্রহে একেবারে মহাপুরুষজীর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে প্রশ্ন করলাম—"মহারাজ! সমাধি কি আমায় বলুন!" মহাপুরুষজী অতি স্বাভাবিক ভাবেই বললেন, "সমাধি? সমাধি কি?"—এইরূপ বলতে বলতে নিজের আঙুলে তাঁর নাভিস্থল, হৃদয়, কণ্ঠ ও মস্তক পরপর স্পর্শ করে একেবারে স্থির হয়ে গেলেন। সব স্থির। দীর্ঘ প্রশান্তির পর তাঁর দৃষ্টি উন্মীলিত হলো। বললেন, "তোরা এসব সহ্য করতে পারবিনে।... ঠাকুরকে ধরে থাক, তাহলেই সব হয়ে যাবে। By heightening up the Divine Imagination one can reach the stage of Samadhi. (শুদ্ধ মনে ভগবান সম্বন্ধে যতদূর উচ্চ কল্পনা চলে—তাই শেষে সমাধিতে পর্যবসিত হয়)।"

আর একবার তিনি গভীরভাবস্থ হয়ে বললেন, "ঠাকুরের কৃপায় এর ভিতর ক্রমশ শক্তি জেগেছে যে তোকে ছুঁয়ে দিলে তোর চৈতন্য হবে—এ তো অতি ছোট কথা, বরং যদি বলি (সামনের উঠানের আম গাছটি দেখিয়ে) তুই মুক্ত হয়ে যা, তা হলে গাছটি মুক্ত হয়ে যাবে।" দ্বিধাহীন চিত্তে দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি এই কথা কটি বলেছিলেন। আর আমি বিস্মিত ও হতবাক হয়ে শুনেছিলাম মাত্র। কিছুই বলবার সাহস ছিল না।...

১ এপ্রিল ১৯২৬, আমি মঠে পৌঁছলাম। Post & Telegraphs-এর চাকরি করি। কটকে বদলি হয়েছি। পথে বেলুড় মঠ, তাই সেখানে না নেমে কি করে উড়িষ্যার পথে রওনা হই! মহাপুরুষ মহারাজকে দর্শন করলাম, প্রণাম করে তাঁর আশীর্বাদ নিলাম, কিন্তু বিশেষ কোন কথা হলো না। ঠাকুরের অন্যতম পার্ষদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ তখন মঠেই ছিলেন। আমার সমস্ত খবর বিজ্ঞান মহারাজকে দিলাম। তিনি সব শুনে একটু চিন্তিত হয়ে বললেন, "তাই তো, তুমি কটকে যাচ্ছ—বিয়ে থা করবে না বলছো—মাথার উপর ভূত সারাক্ষণ ঘুরে বেড়াচ্ছে, খুব সাবধানে থাকবে।" আমি সকলের আশীর্বাদ লাভ করে কটকের কাজকর্ম শুরু করে দিয়েছি, উড়িষ্যার সমস্ত টেলিগ্রাম কটক হয়ে যেত। একদিন আমি কর্ম-ব্যস্ততার মধ্যে একটা telegram দেখে একটু অবাক হলাম। কারণ মঠ থেকে একটি তার—Arriving tomorrow morning Puri Express-করেছেন মহাপুরুষ মহারাজ ভুবনেশ্বরের একজন স্বামীজীকে। সব খবরটা শুধু যন্ত্রের মতো প্রেরণ করলাম না, কিছু ঘ্রাণ আস্বাদনও করলাম। যথারীতি ট্রেন এল। আমিও প্রস্তুত। মহাপুরুষজীকে প্রণাম করে উঠতেই তিনি আনন্দিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুই এখানে কি করে এলি?" দেখলাম স্বামী শর্বানন্দ প্রভৃতি অনেকেই মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে রয়েছেন। কোনরূপ সঙ্কোচ না করে হাসতে হাসতে বললাম,

"মহারাজ, আমার একটু একটু সিদ্ধাই হয়েছে।" ক্ষণেকেই মহাপুরুষজী সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে বললেন, "বাঃ, বাঃ, বেশ, বেশ।" দেখলাম, তিনি আনন্দে উল্লসিত। আমিও তার পরদিন ভুবনেশ্বর মঠে পৌঁছলাম। দেখি, মন্দিরে প্রণাম করে মহাপুরুষজী রাজামহারাজের স্মৃতিকক্ষের সামনে উপস্থিত হলেন। সামনে জনৈক সন্ন্যাসীকে লক্ষ্য করে বললেন—"এ কি! মহারাজের দরজার পর্দায় উই লেগেছে! আহা! মহারাজের কত স্পর্শই না এতে রয়েছে! তোমাদের সাবধান থাকা উচিত। পর্দায় উই লেগে কিছুটা খেয়েও ফেলেছে।" তিনি ভাবে বিহ্বল হয়ে পর্দাটি নিজ মস্তকে বারবার স্পর্শ করতে লাগলেন। গভীর শ্রদ্ধারও ভাব! এই ঘটনা, এই আকুতি দেখে যে চিত্রটি সত্যই চোখে ভেসে আসে, তা হচ্ছে শ্রীরাধা যেন শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানে কৃষ্ণের প্রিয় তমালবৃক্ষ ও অবলা গরুগুলো দেখে ভাব-বিহ্বল হচ্ছেন। তাদের স্পর্শ করছেন, আর অন্য দিকে কোন হুঁশ নেই! কিছুক্ষণ পরে মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, "এ পর্দার বদলে ওখানে নূতন পর্দা লাগিয়ে দিও।" সেদিন মহাপুরুষজী রাজামহারাজের কথায় বিভোর, অন্য কোন প্রসঙ্গই হলো না। সর্বদা মহারাজের কথাই হতে লাগল। দীর্ঘদিনের ব্যবধান সেসব স্মৃতিকে আজ ম্লান করে দিয়েছে। কিন্তু শ্রীমহারাজের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার ভাবটি আমার মনে আজও চিরজাগ্রত হয়ে আছে।

১৯২৮ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি মহাপুরুষজী কাশীধাম থেকে পাটনার দিকে রওনা হলেন। সে দিনটি আমাদের সবচেয়ে মধুরস্মৃতি-বিজড়িত ছিল। মহাপুরুষজী তখন পাটনার ভক্তবৃন্দকে 'অহেতুক কৃপা' যে কি বস্তু তা জীবনে ধারণা করবার একটি অভূতপূর্ব সুযোগ দিলেন।...

১৯২৮ সালের ঐ দিনের প্রভাতটি পাটনার ভক্তদের জীবনে চিরদিনের মতো সুপ্রভাত হয়ে আছে। ব্যথাগ্লানি-জর্জরিত জীবন-পথে সাধারণ সংসারী লোকেরা কতটুকুই বা তাদের জীবনকে উচ্চদিকে চালিত করতে সমর্থ হয়, যদি না শ্রীভগবানের করুণাধারা বহুভাবে বিচিত্ররূপে তাদের জীবনে প্রবাহিত হয়! শিবানন্দরূপী শিব তাই যেন অন্ধ মূঢ় কয়েক জনকে বিগলিত করুণার অনুপম স্পর্শদান করবার জন্যই সেদিন পাটনায় এসেছিলেন!

শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবের ধারক ও বাহক স্বামী শিবানন্দজী আজ পাটনায় একটি ভক্ত পরিবারের পরম আদরের শ্রদ্ধেয় অতিথি। আজ তাঁদের নতুন বাড়ি ও ঠাকুরঘরের উদ্বোধন দিবস। আনন্দ-উৎসব-মুখর পরিবারটি সাদর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে মহাপুরুষজীর আগমনের। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, ভক্ত-জননীটি তাঁর ছেলেরা কুলগুরু ত্যাগ করে অন্য গুরু গ্রহণ করাতে শাপভয়ে ভীতা, কারণ

প্রচলিত ধারণা—কুলগুরু ত্যাগ করা মহাপাপ, তা গুরু যত সাধারণই হোন। তিনি তখন অসুস্থ। দৃষ্টি অতি ক্ষীণ। অধিক চলতে কষ্ট হয়। কিন্তু মহাপুরুষজীর শুভ পদার্পণে তিনি প্রথমেই গভীর শ্রদ্ধার ভাবে বিহ্বলা হলেন। জানি না শ্রীমহাপুরুষজীর শুভাগমনে কি অদ্ভুত অধ্যাত্মশক্তিই না তখন বিচ্ছুরিত হচ্ছিল! পুলকিত মনে ঐ ভক্তের জননী অন্তর থেকে তা অনুভব করলেন যে, সত্যই তাঁর পুত্রেরা উপযুক্ত গুরুই বরণ করেছে।

সেদিন ছিল একাদশী। মহাপুরুষজী নিজহস্তে তাঁর প্রাণবল্লভ শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রতিষ্ঠা করে নূতন ঠাকুরঘরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করলেন আর তাঁরই আশ্রিত ভক্তদের নির্মিত নূতন ভবনের উদ্বোধন করলেন।

ভক্ত-জননী এই অতি-মানবের পূজাদি সমস্তক্ষণ দেখে এতই মুগ্ধ হলেন যে, তাঁর মনের পূর্ব-ভাবটি দূর হয়ে গেল এবং তিনি করজোড়ে নিজ মনের দৈন্য-অবস্থা জানিয়ে মহাপুরুষজীর কাছে ক্ষমাভিক্ষা করলেন। সদা-প্রসন্ন শিব (শিবানন্দ) বললেন, "দেখ, মা! তোমার ছেলেরা পরম করুণাময় ঠা-কু-রে-র আশ্রয় পেয়েছে। আজ থেকে তুমি তোমার সমস্ত ভার আমার উপর ছেড়ে দাও। তোমার কোন চিন্তা নেই; তুমি শুধু রোজ ঠাকুরঘরে গিয়ে সকাল বিকাল প্রণাম করবে।" কিন্তু প্রত্যুত্তরে ভক্ত-জননী নিজ অক্ষমতার কথা মহাপুরুষজীকে নিবেদন করে বললেন, "বাবা! যা শরীর, তাতে আমি উঠে হেঁটে বেড়াতে পারি না। আমি কি করে ঠাকুরের ঘরে যাব?"

দয়ালু মহাপুরুষজী আরও সহজ করে বললেন, "তা হলে এক কাজ কর—বিছানায় বসেই ঠাকুরের দিকে চেয়ে আন্তরিকভাবে প্রণাম করলেই হবে। তুমি ঠাকুরকে চোখে না দেখতে পেলেও ঠাকুর তোমার অন্তরের প্রার্থনা শুনবেন।"

এত অল্প ও সহজে মহাপুরুষজীর করুণা লাভ করে তিনি এতদূর মুগ্ধ হলেন যে, নিজেই দুর্বল শরীরে মহাপুরুষজীর জন্য বহুপ্রকার ভোগ রান্না করলেন। ভাব-বিগ্রহ মহাপুরুষজী বুঝেছিলেন—এঁর মধ্যে আছে কত শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা! তাই আনন্দের সঙ্গে ভোগ নিবেদন করে খুব তৃপ্তির সঙ্গে প্রত্যেকটি প্রসাদ গ্রহণ করেছিলেন।

সমস্ত দিনের আনন্দোৎসব পূরবীরাগে সমাপ্ত হয়। মহাপুরুষজী সন্ধ্যায় ভক্তবাড়ি থেকে রওনা হবার পূর্বে সেই ভক্ত-জননীকে বললেন, "তোমার কোন চিন্তা নেই, আমি আশীর্বাদ করছি, তুমি আনন্দে থাকবে। ঠাকুর তোমার গতি করে রেখেছেন।"

ভক্ত তুলসীদাসজী সত্যই বলেছেন ঃ আমি সাধু আর অসাধু উভয়ের সঙ্গে

দুঃখ পাই, কারণ সাধু সঙ্গদানের পর চলে যাবেন—এই ভেবে দুঃখ, আর অসাধুর সঙ্গ থেকে কখন নিষ্কৃতি পাব—এই চিন্তা করে দুঃখ।...ঐ ভক্ত-জননী অন্তে মৃত্যুর সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম করতে করতে দেহত্যাগ করেছিলেন। এমনই ছিল মহাপুরুষজীর কৃপা!...

*　　　*　　　*

বেলুড় মঠে পৌঁছে অনিদ্রা, হাঁপানি ইত্যাদি রোগের প্রকোপে মহাপুরুষজীর শরীর ক্রমে একেবারে ভেঙে পড়ল, কিন্তু আনন্দময় পুরুষ কখনও এসবে কাতর হননি। বেশ বোঝা যেত—রোগ, শরীর আর তিনি সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁর জাহ্নবীর মতো বিগলিত করুণাধারা শেষ অবস্থায়ও বহু তাপিত ও শুষ্ক হৃদয়কে সিক্ত করেছিল। হাঁপানির টানে মুখে লালা ঝরছে, চোখ দুটি বসে গিয়েছে, রক্তবর্ণ সমস্ত মুখমণ্ডল ঘর্মাক্ত। তখনও তাঁর মুখের হাসি বিদ্যুতের মতো সর্বাঙ্গে ঝলক দিত। না দেখলে তা বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। তিনি সেই অবস্থায়ই কত রঙ্গ করে নিজের পরিচয় মাঝে মাঝে দেবার চেষ্টা করতেন। এই সময় একদিন বললেন, "আমি মা গঙ্গা হয়ে গেছি। এখন মড়াতে এলায় না।" অর্থাৎ পবিত্র গঙ্গাবারির মতো তিনি বয়ে চলেছেন, কত শবদেহ ভেসে যাচ্ছে, তাতে তাঁর পবিত্র ধারার গতিরোধ হচ্ছে না বা পবিত্রতা একটুও কমছে না। আবার ঐ অবস্থায় তাঁর এক জন্মদিনে বলেছিলেন, "দেখ, বাপকা বেটা সিপাইকা ঘোড়া, কুছভি নহি তো থোড়া থোড়া।" অর্থাৎ তিনি ঠাকুরের পুত্র, ঠাকুরের সঙ্গে সব না মিললেও কিছু কিছু মিল আছেই। আমি বলেছিলাম, "আপনার তো থোড়া থোড়া! আর আমাদের কি?" তৎক্ষণাৎ মহাপুরুষজী একগাল হেসে হেসে হাত উঁচু করে বললেন, "বহুত! বহুত!"

আর একটি কথা মনে গভীরভাবে গেঁথে রয়েছে। শেষ সময় পর্যন্ত আমরা বিদায় নিতে গেলে প্রণাম করা শেষ হলেই হাততালি দিয়ে বলতে থাকতেন, "জয় দুর্গা, দুর্গা দুর্গা। দুর্গা দুর্গা বলে যে জন পথে চলে যায়। শূলহস্তে শূলপাণি রক্ষা করেন তায় ॥" আজ জীবন-সন্ধ্যায় শেষ-যাত্রার সন্ধিক্ষণে শুধু তাঁর ঐ কথাটি বারবার কানে বাজছে—ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর শ্রীমুখনিঃসৃত ঐ আশা ও অভয়বাণী ঃ "জয় দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা।"

ওঁ শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু

শ্রীগুরুদেবের স্মৃতিকথা

ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-বি, বি-এস্

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে এপ্রিল মাসে আমার পরম বন্ধু কলকাতা পার্শিবাগান রামকৃষ্ণ সোসাইটির সম্পাদক শ্রীসত্যেশচন্দ্র মিত্রের সঙ্গে একদিন বিকালে পোর্ট কমিশনারের ফেরি-স্টিমারে বেলুড় মঠে প্রথম যাই। সত্যেশবাবুর বড় ভাই শরৎচন্দ্র এলাহাবাদে ব্রহ্মবাদিন ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তখন সবেমাত্র Monks' Conference (সাধু-সম্মেলন) শেষ হয়েছে, মেরাপ তখনও খোলা হয়নি। সত্যেশবাবু আমাকে ঠাকুরঘর, ব্রহ্মানন্দ-মন্দির, মাতাঠাকুরানীর মন্দির, স্বামীজীর মন্দির, গোশালা, বাগান প্রভৃতি দেখিয়ে ব্রহ্মচারী জ্ঞান মহারাজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ঐ সব দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। গঙ্গাতীরে এমন সুন্দর পরিবেশ এবং গেরুয়াধারী সর্বত্যাগী সাধুগণকে দেখে খুবই আনন্দ হলো। বোধ হয় সেদিন পূজ্যপাদ শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ ট্রাস্টির মিটিং-এ ছিলেন, সেজন্য তাঁর ঘরে গিয়ে তাঁকে দর্শন করতে পারিনি। খোলা ছাদ দিয়ে যখন তিনি বাথরুমে যাচ্ছিলেন তখন নিচের উঠান থেকে তাঁকে দর্শন করেছিলাম। এমন সৌম্যমূর্তি পূর্বে আমি দেখিনি। Vini Vidi Vici (অর্থাৎ প্রথম দর্শনেই তিনি আমার অন্তর জয় করে নিলেন)—তাঁকে দর্শনমাত্র মন তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়ল। ধর্মলাভ করার জন্য আর অন্য স্থানে যেতে হয়নি। সাধুদের দেবতা বোধ হতে লাগল। কয়েক দিন পরে আমি একলা বৈকালে গিয়ে মহাপুরুষজীর ঘরে তাঁকে দর্শন ও প্রণাম করেছিলাম। তিনি আমার পরিচয়াদি গ্রহণ করলেন। যতক্ষণ বসেছিলাম মন আনন্দে ভরপুর হয়ে গিয়েছিল। সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে তিনি নিচে নামলেন, আমরাও তাঁর পিছু পিছু যেতে লাগলাম। সেদিন আনন্দে সন্ধ্যারতি-দর্শনের পর বাড়ি ফিরলাম।

তখন থেকে প্রায় প্রতি সপ্তাহে একবার বা দু-বার করে তাঁর দর্শনার্থে বেলুড় মঠে যেতাম—প্রথমে স্টিমারযোগে, পরে বাস যখন হলো বাসে করে। প্রতিবারই মহাপুরুষজী কুশলাদি জিজ্ঞেস করতেন। তাঁর কাছে অনেকক্ষণ বসতাম এবং পরে তাঁর সাথে মাঠে বেড়াতাম। গরমকালে পাখা দিয়ে তাঁকে হাওয়া করতাম। সন্ধ্যারতি দর্শন করে আনন্দিত মনে বাড়ি ফিরতাম। একদিন বেড়াতে বেড়াতে মহাপুরুষ মহারাজ বলেছিলেন, একজন ভক্ত গায়ক ছিল—(নাম আমার মনে নাই, পরে

শুনেছিলাম নাম বিষ্ণু দিগম্বর) তিনি শুধু এই দুই লাইন—'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম, পতিতপাবন সীতারাম' নানাসুরে গাইতেন।...

অতঃপর পূজনীয় সারদানন্দ মহারাজের দেহত্যাগের পর ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে শ্রীমহাপুরুষজী কিছুকাল মঠে ছিলেন না, আমি কিন্তু তখনো পূর্বের মতো মঠে যাতায়াত করতাম। ঐ দেবভূমি, সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের আমার খুব ভাল লাগত। ব্রহ্মচারী জ্ঞান মহারাজ আমাকে কাছে বসিয়ে ঠাকুর ও স্বামীজীর প্রসঙ্গ করতেন, তাঁর ছাপা 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রচার' সম্বন্ধীয় কাগজপত্র দিতেন। একবার জ্ঞান মহারাজের সঙ্গে হাওড়া খুরুটে বালকাশ্রমে গিয়েছিলাম।

মঠে অভ্যাগতদের কক্ষে যে খোলা লাইব্রেরি ছিল তা থেকে বই নিয়ে পড়াশুনা করে অনেক সময় কাটাতাম। সে সময় পার্শিবাগান রামকৃষ্ণ সোসাইটিতে খুব ঘন ঘন যেতাম এবং সেখানকার সম্পাদক সত্যেশবাবু বেলুড় মঠের অনেক পুরোনো কথা বলে আনন্দ দিতেন।...

* * *

১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে একদিন দুপুরবেলা যখন আমি আমহার্স্ট স্ট্রিটের মাড়োয়ারি হাসপাতালের লেবরেটরিতে কাজ করছিলাম তখন শ্রীমণীন্দ্রনাথ সিংহ এসে আমাকে বললেন, "মহাপুরুষ মহারাজ মঠে এসেছেন। আর কালবিলম্ব না করে দীক্ষা প্রার্থনা করুন।" এই কথাটি আমার দৈবাদেশ বলে মনে হলো। ঐ দিনই বিকালে বেলুড় মঠে গিয়ে পূজ্যপাদ মহাপুরুষজীর কাছে দীক্ষাপ্রার্থী হলাম। উপস্থিত একজন সন্ন্যাসী আমার পরিচয় করিয়ে দিতে যাচ্ছিলেন, তাতে তিনি বললেন, "আমার কাছে অনেক দিন থেকে যাতায়াত করছে, আমি ওকে খুব চিনি।" কুলগুরুর কাছ থেকে প্রায় আড়াই বৎসর পূর্বে সস্ত্রীক দীক্ষা নিয়েছি বলাতে মহাপুরুষজী প্রথমটায় সামান্য আপত্তি করলেন। আমি একটু জেদ করাতে বললেন, "আচ্ছা, আমি ঐ মন্ত্র modify করে (একটু পরিবর্তন করে) দেব।" ঠাকুরের তিথিপূজার কয়েক দিন মাত্র দেরি ছিল, তাই ঐ তিথিপূজার দিন সস্ত্রীক দীক্ষা হবে বললেন। আনন্দে অন্তর আপ্লুত হলো। তিথিপূজার দিন সকালে ফল মিষ্টান্ন ও বস্ত্রাদি নিয়ে আমরা মঠে হাজির হলাম। গঙ্গাস্নান করে মন্দিরে অপেক্ষা করতে লাগলাম। পুরোনো ঠাকুরঘরের পাশে ধ্যানঘরে মহাপুরুষ মহারাজ উত্তরাস্য হয়ে বসেছিলেন। তাঁর সামনে ঠাকুরের বড় প্রতিকৃতি ছিল। বেলা আন্দাজ ১০টা—তখন আমাদের ডাক পড়ল। মহাপুরুষজীর ডানদিকে পশ্চিমাস্য হয়ে আমরা দু-জনে দুইটি আসনে বসলাম। কুলগুরুর হাতে লেখা সন্ধ্যাবিধির কাগজখানি আমি মহারাজের হাতে দিয়ে বললাম, "আমরা এই পদ্ধতিতে সন্ধ্যাবন্দনা করে থাকি।"

তিনি কাগজখানি হাতে নিয়ে একটু দেখে আমাকে ফেরত দিয়ে বললেন, "যেমন করছ তেমনি করবে।" কেবল মন্ত্রটির সঙ্গে কিছু যোগ করে দিলেন। আমার শরীর মন আনন্দে ভরে গেল। দক্ষিণা দিয়ে পাদপদ্মে প্রণাম করে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে নিবেদন করলাম, "আজ থেকে আপনি আমার গুরু হলেন!" পরে আমাদের বারান্দায় বসে ঐ মন্ত্র জপ করতে বললেন। ঐ দিন দ্বিপ্রহরে তাঁর পাতের প্রসাদ আমরা পেয়েছিলাম। প্রসাদ যেন সুধাসম বোধ হয়েছিল।

পরে একদিন মহাপুরুষজীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কুলগুরুকে বার্ষিক কিছু প্রণামী পাঠাতাম, তা দেব কিনা। উত্তরে তিনি বলেন, "সেসব পূর্বের মতো দেবে।"

প্রতি সপ্তাহে একবার বা ততোধিকবার মঠে গিয়ে ঠাকুর প্রণাম করে মহাপুরুষজীর কাছে বসতাম। তিনি কুশল-প্রশ্নাদি করতেন। কোন কথা জিজ্ঞেস করবার প্রয়োজন বোধ করতাম না; তাঁকে দেখলেই মন আনন্দে ভরে যেত। একবার বলেছিলাম, "মাড়োয়ারি হাসপাতালে চাকরির মধ্যে ঘণ্টা দুই অবকাশ পাই, সে সময়টা নষ্ট না করে ঠাকুরের ধ্যান করি।" মহাপুরুষ মহারাজ বলেছিলেন—

'আপনাতে আপনি থেকো মন, যেও নাকো কারু ঘরে।
যা চাবি তা বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে ॥
পরম ধন ঐ পরশমণি, যা চাবি তা দিতে পারে।
কত মণি পড়ে আছে চিন্তামণির নাচদুয়ারে ॥'

প্রেমের সঙ্গে নাম জপ করতে বলতেন। কত জপ হলো তার সংখ্যা রাখবার জন্য ব্যস্ত হতে বারণ করতেন। বরং কতক্ষণ জপ হলো তা ঘড়িতে সময় দেখে নিতে বলতেন। ঠাকুরকে কিভাবে ধ্যান করব জিজ্ঞেস করাতে গুরুদেব বলেছিলেন, "হৃদয়পদ্মে ঠাকুর যেন প্রসন্নদৃষ্টিতে তোমার দিকে চেয়ে বসে আছেন—এইভাবে ধ্যান করবে। ঠাকুরই এ যুগের অবতার। তাঁকে ধরে থাকলে সব কিছুই পাওয়া যাবে। পূর্বে কত অবতার এসেছিলেন, এ যুগে জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম শিক্ষা দেবার জন্য সর্বদেবদেবীস্বরূপ ঠাকুর অবতার হয়ে এসেছেন।"

সঞ্চয় করা উচিত কিনা জিজ্ঞেস করাতে মহাপুরুষ মহারাজ বলেছিলেন, "গৃহস্থের ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করা উচিত।"

* * *

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের কথা। একদিন বিকেলে মহাপুরুষ মহারাজ দোতলার বারান্দায় উত্তরাস্য হয়ে বসে আছেন। একজন প্রাচীন ভক্ত একখানি পাঁচ টাকার নোট শ্রীচরণের কাছে রেখে প্রণাম করে জিজ্ঞেস করলেন, "মহারাজ, কেমন আছেন?" তিনি বললেন, "আর বাবা, এ শরীর রোজ রোজ ক্ষয় পাচ্ছে, আর

এটা টিকবে না।” ভক্তটি বললেন, “মহারাজ, আপনি না থাকলে আমরা কোথায় দাঁড়াব?” মুহূর্তমধ্যে উদাত্তকণ্ঠে মহাপুরুষজী জবাব দিলেন, “দূর শালা, আমি কি মরি? আমার জন্ম নেই, মরণ নেই; রোগ, শোক, জরা, ব্যাধি কিছুই নেই; আমি সেই অজর অমর শাশ্বত আত্মা, আনন্দস্বরূপ। ঐ পাঁচ টাকার নোটখানি ডানহাতে তুলে ধরে আমাকে দেখিয়ে বললেন, “তুই কি চাস? টাকা নিবি?” আমি বললাম, “না, মহারাজ, আমি টাকা চাই না। আপনি যে জ্ঞানের কথা বললেন ঐ জ্ঞান চাই।” মহারাজ চুপ করে রইলেন।

আর একবার একজন ভক্ত মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে প্রবেশ করে তাঁকে প্রণাম করে জিজ্ঞেস করলেন, “মহারাজ, কেমন আছেন?” উত্তর দিলেন, “খুব আনন্দে আছি।” ভক্তটি চলে যাচ্ছিলেন, তাঁকে ফিরিয়ে মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, “ওগো শোন, শোন। তুমি এই শরীরটার কথা জিজ্ঞেস করছ? এটা মোটেই ভাল নয়।”...

মঠে রাত্রিবাস করার জন্য আমাকে একবার মহাপুরুষজী আদেশ করেছিলেন। তাতে দোতলার গঙ্গার দিকে বারান্দায় জপধ্যান করে আমি কয়েক রাত যাপন করেছিলাম। রাত্রে সাধুদের সঙ্গে এক পঙ্গতে প্রসাদ পেতাম, হৃদয় আনন্দে ভরে যেত। সে যে কি স্বর্গীয় পরিবেশ তা ভাষায় বর্ণনা করতে অক্ষম! মনে হতো—আমি যেন দেবলোকে বাস করছি—জগতের কোলাহল থেকে কত ঊর্ধ্বে!...

মাস্টার মহাশয়ের (শ্রীম) কাছে রোজ যাই শুনে মহাপুরুষজী খুব প্রসন্ন হয়েছিলেন। হাত দিয়ে মাস্টার মহাশয়ের লম্বমান দাড়ি দেখিয়ে বলেছিলেন, “ঋষি, ঋষি।” ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে মাস্টার মহাশয়ের পরামর্শক্রমে কয়েক মাস প্রায় প্রত্যহ মঠে যেতাম এবং পূজ্যপাদ খোকা মহারাজের সঙ্গে অধিকাংশ সময় কাটাতাম। তা লক্ষ্য করে মহাপুরুষ মহারাজ একদিন আমাকে হাসতে হাসতে বলেছিলেন, “তুই কি খোকা মহারাজের চেলা?” বলেছিলাম, “না, মহারাজ, আপনার চেলা।”

১৯৩০ খ্রিঃ থেকে কয়েক বৎসর দুর্গাপূজার পর কাশী অদ্বৈত আশ্রমে এসে কিছুদিন বাস করতাম। কলকাতায় ফিরবার সময় মোহন্ত চন্দ্র মহারাজ (স্বামী নির্ভরানন্দ) শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের জন্য নেনুয়া পাঠিয়ে দিতেন। বেলুড় মঠে নেনুয়া নিয়ে গেলে তিনি খুব আনন্দ প্রকাশ করতেন।...

মহাপুরুষজীর জনৈক সেবক একসময় তাঁর সেবার কিছু ত্রুটি করেছিলেন। তাতে তিনি বিরক্ত হয়ে তাঁকে দাবড়ানি দেন। সেবক বললেন, “আমি ভাল হবার জন্য আপনার কাছে এসেছি, আপনি আমাকে ভাল ও কর্মপটু করে নিন।” মহাপুরুষ মহারাজ বললেন—“গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব—তিনের দয়া হলো, একের (মনের) দয়া বিনে জীব ছারেখারে গেল।”

কাশীপুরের জনৈক ভক্তের সঙ্গে আমরা একসময় (১৯৩০ খ্রিঃ) মাস্টার মহাশয়ের কাছে যাতায়াত করতাম। ২।৩ মাসের একটি শিশুপুত্র রেখে তাঁর স্ত্রী পরলোক গমন করেন। ভক্তটি পোস্টাফিসে চাকরি করতেন, বয়স আন্দাজ ৪০ হবে। স্ত্রীবিয়োগের পর একদিন তিনি মহাপুরুষ মহারাজের কাছে গিয়েছেন। মহারাজ বললেন, "হাঁরে, তোর নাকি মাগ মরে গেছে?" "হাঁ, মহারাজ।" "তা তুই আবার বে করবি নাকি?" ভক্ত চুপ করে আছেন। মহারাজ বললেন, "দ্যাখ, ভাল ঘোড়াকে একবার চাবুক মারলে সে ঠিক চলতে থাকে, দু-বার চাবুক মারতে হয় না। তা তুই তো একবার চাবুক খেয়েছিস, আর কেন?" বহুদিন হলো ভক্তটি সরকারি কর্ম হতে অবসর গ্রহণ করেছেন। মহাপুরুষ মহারাজের কথায় তিনি আর দারপরিগ্রহ করেননি।...

১৯৩০ খ্রিঃ জানুয়ারি, খোকা মহারাজ (স্বামী সুবোধানন্দ) উদ্বোধন থেকে বেলুড়ে বেড়াতে এসেছেন। তাঁর গায়ে তুলার জামা দেখে মহাপুরুষ মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় এটি তৈয়ার করিয়েছ?" খোকা মহারাজ বললেন, "বড়বাজার থেকে।" আমি তখন বড়বাজার মাড়োয়ারি হাসপাতালে চাকরি করি। একদিন বিকেলে ধানকুড়িয়ার জমিদার শ্রীনৃপেন সাহু বড়বাজারে এসে আমাকে বললেন, "খোকা মহারাজের তুলার জামার মতো একটি তুলার জামা মহাপুরুষ মহারাজ তাঁর জন্য তৈয়ার করাতে আমাকে আদেশ করেছেন।" দুই-তিন দিনের মধ্যে ঐ রকম একটি জামা নিয়ে আমি মহাপুরুষ মহারাজের শ্রীচরণে গিয়ে প্রণত হলাম। তিনি তখনই ঐ জামা পেয়ে বালকের মতো তা গায়ে দিয়ে আনন্দ করতে লাগলেন। কত দাম জিজ্ঞেস করাতে আমি দাম বললাম। তিনি আমাকে দাম দিতে চাইলেন। আমি নিতে রাজি হইনি। তখন বললেন, "আচ্ছা, আধাআধি নাও।" আমি তাও নিইনি।

তখন সবেমাত্র বেলুড় মঠে ইলেকট্রিক হয়েছে। আমি সিমেন্সের একটা ইলেকট্রিক কেটলি নিয়ে মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করলাম এবং বললাম, "মহারাজ, গরম জলের আর ভাবনা নেই, যখন খুশি পাওয়া যাবে।" মহাপুরুষজীর ঘরে ইলেকট্রিক প্লাগ ছিল, কেটলিতে জল দিয়ে এক প্লাগে লাগিয়ে দিলাম। কয়েক মিনিট পরে জল টগবগ করে ফুটতে লাগল। তিনি খুব আনন্দ করে দেখতে লাগলেন, যেন সদাশিব—পাঁচবছরের শিশু! আমি তা খুব উপভোগ করলাম।...

নরসিংহবাবু রোজ অফিসের ছুটির পরে তামাক বা অন্য কিছু নিয়ে মহাপুরুষ মহারাজকে দর্শন করতে মঠে আসতেন। তাঁর ভাই ব্যবসায়ে ফেল হয়ে দেনদার হয়েছিলেন। পাওনাদারেরা ভায়ের কাছ থেকে টাকা আদায়ের কোন উপায় না

দেখে নরসিংহবাবু ও তাঁর ভাই দুজনকেই আসামী করে কোর্টে মামলা রুজু করে। উদ্দেশ্য নরসিংহবাবুর মাইনে থেকে টাকা আদায় করবে। উভয়পক্ষের শুনানির পর জজ এরূপ মন্তব্য করেন যে, নরসিংহবাবু পাওনাদারকে ফাঁকি দেবার জন্য ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত নন—এই কথা বলছেন। জজ রায় তখনও দেননি। একদিন মহাপুরুষ মহারাজকে দর্শন করতে সেই জজের ইচ্ছা হলো। মঠে যাতায়াত করেন এমন এক বন্ধুর সঙ্গে তিনি একদিন মঠে হাজির হলেন। মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করছেন এমন সময় দ্বিজেন মহারাজ (স্বামী গঙ্গেশানন্দ) মহাপুরুষজীকে বললেন, "এই জজের কোর্টেই নরসিংহবাবুর মকদ্দমা হচ্ছে।" মহারাজ বললেন, "আমি কি বলবো, বাপু, উনি সাক্ষী সাবুদ ও কাগজপত্রে যেমন পাবেন তেমনই রায় দেবেন। তবে আমি জানি নরসিংহ ভাল লোক।" এই কথা জজ সাহেবের মনে রেখাপাত করল। তিনি রায়ে নরসিংহবাবুকে বেকসুর খালাস দিলেন।

* * *

মহাপুরুষজীর শরীর যাবার পর হেথায় হোথায় সাধুদর্শন করতে গিয়েছি, কিন্তু অমন আনন্দ আর কোথাও পাইনি। তিনি আমার সারা হৃদয় জুড়ে বসে আছেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী যেমন ঠাকুরকে বলেছিলেন, "এইখানে ষোলআনা আছে, অন্যত্র কোথাও এক আনা, কোথাও দু-আনা!" মহাপুরুষজীর শ্রীচরণে মাথা স্পর্শ করে আমি ধন্য হয়ে গিয়েছি।

একবার মহাপুরুষজী আমাকে মঠের ব্রহ্মচারীদের Physiology (শারীরতত্ত্ব) সম্বন্ধে কিছু বলতে বলেছিলেন। আমি visitors' room-এ (অভ্যাগত-কক্ষে) বোর্ডে খড়ি দিয়ে এঁকে শরীরের রক্তসঞ্চালন সম্বন্ধে (circulation of blood) বলেছিলাম।

বেলুড় মঠে একবার গর্ভধারিণী মাকে নিয়ে মহাপুরুষ মহারাজের কাছে গিয়েছিলাম। মা মহাপুরুষজীর শ্রীচরণ স্পর্শ করে প্রণাম করেছিলেন। মা পরে আমাদের বলেছিলেন, "মহাপুরুষজীর শ্রীচরণস্পর্শমাত্র ভিতরে কি যেন একটা তোলপাড় হয়ে গেল!"

১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ, এপ্রিল মাস। বেলুড়ে গঙ্গার ঘাটের পাশে নাথদের পুরোনো বাড়ির একখানি জীর্ণ ঘর ভাড়া নিয়ে কয়েক মাস একান্তে বাস করি। সেবক মহারাজ একথা আমার সামনে মহাপুরুষ মহারাজকে নিবেদন করতে তিনি শুনে খুব প্রসন্ন হয়েছিলেন। রোজ সকাল-বিকাল গুরুদর্শন ও প্রণাম এবং নিত্য গঙ্গাস্নান খুব ভাল লাগত। এইখানে একদিন আমার খুব চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করতে গেলে তিনি আমার মনের চাঞ্চল্য ঠিক টের পান।

বললেন—"তোমার চিত্তচাঞ্চল্য হয়েছে।" জিজ্ঞেস করলাম, "কিসে এটা যায়?" মহাপুরুষজী খুব জোর গলায় বললেন দুটি কথা—"Determination আর prayer (দৃঢ়সঙ্কল্প ও প্রার্থনা) তাহলেই হবে।"

এর কিছুকাল পরে মহাপুরুষ মহারাজের দক্ষিণ অঙ্গ অবশ হয়ে বাক্‌শক্তি রোধ হলো। সারগাছি থেকে স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ মহাপুরুষজীকে দেখতে এলেন। মিশনের কাজের অসুবিধা হচ্ছে দেখে মহাপুরুষজী স্বামী অখণ্ডানন্দজীকে power of attorney (আম-মোক্তারনামা) দিলেন। Registrar (রেজিস্ট্রার) উপস্থিত ছিলেন। আমি তাতে সাক্ষী হিসেবে সই করেছিলাম।

অসুস্থ মহাপুরুষজীর টিপসই নেওয়া হলো। তাঁর প্রসন্ন মুখমণ্ডল দেখে বোধ হলো তিনি সব বুঝতে পারছেন এবং এতে তিনি খুব খুশি হয়েছেন।

এরপর মহাপুরুষজীকে প্রণাম করতে গেলে তিনি প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখতেন এবং কখনো কখনো বামহাতটি তুলে আশীর্বাদ করতেন।

জীবন-সায়াহ্নে এখন শ্রীগুরু মহাপুরুষজীকে অবলম্বন করে তাঁর দুয়ারে পড়ে আছি। যে বিদ্যার সম্পদ তিনি আমাকে দান করেছেন, তাই আমার জীবনকে মধুময় করেছে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

শ্রীমহাপুরুষজীর কৃপা-স্মরণে

শ্রীমহাদেব মুখার্জী

দীক্ষালাভের কয়েক মাস পরে খুব সম্ভব ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসের কোন সময়ে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমহাপুরুষ মহারাজকে দর্শন করতে বেলুড় মঠে যাই। আমরা দু-ভাই মহাপুরুষ মহারাজের ঘরের দরজার সামনে যখন পৌঁছলাম তখন তিনি আমাদের দেখে আনন্দে ঘাড় নেড়ে নেড়ে 'রাম-লছমন দু-ভাই, ভজ মন রঘুরাই' মধুর স্বরে গাইতে লাগলেন। আমরা প্রণামান্তে তাঁর কাছে বসলাম। তিনি তখন যেন এক স্বর্গীয় ভাবে মাতোয়ারা, রামজীর ভাবে ভরপুর কোন কথাই বলতে পারছেন না। আমরা কিছুক্ষণ বসে পুনরায় প্রণাম করে নিচে নেমে এলাম। সেদিন কোন কথাবার্তা হয়নি, কিন্তু তাঁর ঐ দিব্যভাব মনের উপর

চিরতরে গভীর রেখাপাত করেছে এবং এখন তা ধ্যানের বস্তু হয়ে রয়েছে। মহাপুরুষজী এ জগতে ছিলেন, কিন্তু এ জগতের ছিলেন না—তিনি ছিলেন দিব্যলোকবাসী।

মহাপুরুষজীর অনুমতি নিয়ে সেদিন মঠে রাত্রিবাস করেছি। দোতলায় পূর্বদিকের বারান্দায় রাত কাটালাম। সূর্যদেব ধীরে ধীরে পূর্বাকাশে উদিত হচ্ছেন। ব্রহ্মচারী বিমল মহারাজ (স্বামী শ্রদ্ধানন্দ) সবে স্বামীজীর ঘরের কাজ শেষ করে বারান্দায় এসেছেন। এমন সময় মহাপুরুষজী এসে স্বামীজীর ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ঘরের ভিতর একদৃষ্টে তন্ময় হয়ে দেখছেন। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর হঠাৎ বলে উঠলেন, "Good morning, Swamiji. Good morning, Swamiji. Good morning, Swamiji." তারপর ধীরে ধীরে বারান্দার দিকে এগিয়ে এসে কাশীপুরের উদ্দেশে প্রণাম করলেন; পরে 'জয় মা গঙ্গে' বলে গঙ্গাকে অভিবাদন করলেন, প্রণাম করলেন। শেষে দক্ষিণেশ্বরের দিকে মুখ করে প্রণাম করে গঙ্গার দিকে মুখ করে ইজিচেয়ারে বসলেন, ভাবাবেশে তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিমাভ ও আনন্দোজ্জ্বল। তারপর ধীরে ধীরে বলছেন—"আজ বড় শুভদিন। স্বামীজী মহারাজের দর্শন হলো। আজ সকালে স্বামীজী প্রাতর্ভ্রমণ করে ঘরে ফিরে আসতেই দেখা হয়ে গেল—দেখলাম আনন্দে ভরপুর হয়ে আছেন।"

সেদিন স্বামীজীর ভাবে তিনি কতখানি পূর্ণ হয়ে আছেন তা তাঁর কথাতে আংশিক প্রকাশ পেয়েছিল। বলতে লাগলেন, "একবার স্বামীজীর মুখে শুনেছিলাম যে, তিনি তখন হিমালয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—একদিন সন্ধ্যার পূর্বে দেখলেন যে, মাথায় চূড়াবাঁধা দীর্ঘশ্মশ্রুগুম্ফবিশিষ্ট ঋষির দল পাহাড় থেকে নামছেন! সূর্যদেব তখন অস্ত যাচ্ছেন; ঋষিরা আবৃত্তি করছেন—

'আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রীচ্ছন্দসাং মাতঃ ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তু তে ॥'

আরক্তিম-বদন ঋষির দল। স্বামীজী এসেছিলেন ভারতের ঐতিহ্য ও পুরাতনকৃষ্টিকে জাগাতে, তাই তিনি এসব প্রত্যক্ষ করেছেন, আমরাও তাঁর মুখে ঐসব শুনে বিহ্বল হয়ে পড়তাম।"

খানিকক্ষণ অন্তর্মুখভাবে চুপচাপ থেকে মহাপুরুষজী পুনরায় বলতে লাগলেন, "আর এক সময়ের কথা মনে পড়ছে, স্বামীজী ও ঠাকুরের মধ্যে খুব তর্ক চলছে। ঠাকুর বলছেন-স্বামীজীকে, 'তোকে মায়ের অনেক কাজ করতে হবে।' স্বামীজী ভীষণ আপত্তি জানিয়ে বলছেন, 'আমার দ্বারা ওসব হবে না, আপনার মা বলেছেন তো আমার কি!' ঠাকুর তখন তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে বলছেন, 'তোর ঘাড় করবেক্।'

তখন তিনি উপায়ান্তর না দেখে বললেন, 'রাজি আছি এক শর্তে যে, আপনাকে সর্বদা সর্ব অবস্থায় আমাকে হাতে ধরে কাজ করিয়ে নিতে হবে'।"

মহাপুরুষ মহারাজ এই কথা বলতে বলতে আবেগভরে বললেন, "স্বামীজী যে এত কাজ করলেন, তা ঠাকুর হাত ধরে ছিলেন বলেই তো সম্ভব হলো! দেখ না গীতাতে অর্জুন তো প্রথমে খুবই আপত্তি করেছিলেন যে, যুদ্ধ করতে পারবেন না। কিন্তু ভগবান তাঁকে যন্ত্রস্বরূপ করেই তো সব করিয়ে নিলেন। যুগে যুগে শ্রীভগবানের আবির্ভাবে তাঁর কাজ ও প্রচার এই ভাবেই হয়ে থাকে। ভগবানের যারা ভক্ত তাদের বিপদে তিনিই ফেলেন; আবার উদ্ধারও করেন তিনিই অভাবনীয় উপায়ে। অবতার-পার্ষদদেরও এ রকম পরীক্ষা দিতে হয়।

"ঠাকুরের লীলাবসানের পর আমরা সকলে তখন সারা ভারতবর্ষের তীর্থাদি দর্শন করছি। মধ্যভারতের নর্মদাতীরে জনমানবহীন দুর্গম জঙ্গলে এক প্রসিদ্ধ শিবমন্দির আছে। শিব-দর্শনের জন্য সন্ধ্যার কিছু পূর্বে মন্দিরে উপস্থিত হলাম। পূজারি সন্ধ্যার আগেই মন্দির বন্ধ করে গ্রামে চলে যান। রাত্রিতে কেউই ঐ জঙ্গলে থাকতে সাহস করে না। বন্য জন্তুর ভয়। পূজারি আমাকে অনেক করে তাঁদের গ্রামে যাবার অনুরোধ করলেন, কারণ এই মন্দিরের কয়েক মাইলের মধ্যে কোনও জনবসতি নেই। আমি গ্রামে যেতে রাজি হলাম না; মন্দিরে রাত্রিবাসের সঙ্কল্পই স্থির করলাম। রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে বন্য জন্তুর বিকট শব্দ মাঝে মাঝে শুনছিলাম। কিন্তু শ্রীভগবানের ধ্যানে রাত কেটে গেল। পরদিন পুরোহিত আমাকে অক্ষত অবস্থায় দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, "আপ তো খুদ শিউজী হ্যায়। তা না হলে এখানে প্রাণ নিয়ে কেউ থাকতে পারে?" মহাপুরুষজী শেষে বললেন, "তা ঠাকুরের কৃপায় আমাদের ওসব ভয় ডর কোনদিনই ছিল না।"

ঠাকুর যে কেমন করে ভক্তকে রক্ষা করেন, তার সুন্দর একটি ঘটনা মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, "আমাদের মধ্যে যোগেন স্বামীরই পরমহংস অবস্থা ছিল। সুঠাম সুন্দর দেহ, অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন তিনি। কোনও এক সময়ে মধ্যপ্রদেশে ভ্রমণ করছিলেন। ট্রেনে একটি নিরিবিলি খালি কামরায় উঠে আপন মনে চলেছেন। এক স্টেশন থেকে ট্রেনটি ছাড়বার কয়েক মুহূর্ত পূর্বে এক অনিন্দ্যসুন্দরী বাইজি সেই কামরায় উঠে পড়েন একলা, হাতে কিছু জিনিস নিয়ে। ট্রেন ছেড়ে দেবার পর বাইজির চোখ পড়ল যোগেন স্বামীর উপর। সন্ন্যাসীর ঐ অপরূপ রূপ দেখে বাইজি একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ল এবং যোগেন স্বামীকে উদ্দেশ করে বলতে লাগল—'আমি আমার যথাসর্বস্ব নিবেদন করছি, আপনি আমায় গ্রহণ করুন।' যোগেন স্বামীর কাছ থেকে কোনও জবাব না পেয়ে বাইজি অধৈর্য হয়ে উঠল এবং বলল—'যদি আপনি

আমার কথা না রাখেন তো আমি এই মুহূর্তে এলার্ম চেন টেনে গাড়ি থামিয়ে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনব যে, আপনি আমার শালীনতা নষ্ট করেছেন।' এই বলে নিজের হাতে যে মদের বোতল ছিল তা থেকে সমস্তটুকু নিঃশেষে পান করে ফেলল। বাইজি বোধ হয় ভেবেছিল যে, মদ খেয়ে আরও বেশি চাঙ্গা হয়ে উঠবে, কিন্তু হলো তার বিপরীত। মদের নেশায় একেবারে ঢলে পড়ল নিজের সিট-এ। গাড়ি পরবর্তী এক স্টেশনে থামতেই যোগেন স্বামী নেমে পড়লেন।"

এই ঘটনা বলে মহাপুরুষ মহারাজ আবেগভরে বলতে লাগলেন—"আহা! ঠাকুরের কি কৃপা! তিনি রক্ষা না করলে কে আর রক্ষা করবে? এখনও আমার যোগেন স্বামীর ঐ অবস্থার কথা মনে পড়লে রোমাঞ্চ হয়, কি দারুণ পরীক্ষাতেই না তিনি পড়েছিলেন সেদিন!"

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে আমার চাকরি-জীবনে এক বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল। তাই বিশেষ বিপন্ন হয়ে আমি পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের কাছে গিয়ে সব ঘটনা নিবেদন করলাম। তিনি সমস্ত শুনে অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেলেন, কিছুক্ষণ চিন্তার পর আমাকে বললেন, "তুমি এই সামান্য ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলতে গেলে কেন? খুবই অন্যায় করেছ।"

যা হোক, আমি অন্যায় স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করি। শেষে পাটনায় ফিরে 'আপিল' আরম্ভ করলাম। এভাবে ছমাস কেটে গেল। কোনও উত্তর না পেয়ে অবশেষে মরিয়া হয়ে Council (কাউন্সিলে)-এ আমার মামলাটি দায়ের করার আয়োজন করে মহাপুরুষ মহারাজকে পত্রে আমার এই শেষ অভিযানের খবর দিয়ে তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করলাম। কয়েক দিন পরে মহাপুরুষজীর কাছ থেকে এক জরুরি তারবার্তা এল। 'Stop all activities see me at once blessings–Shivananda.' (সব কর্মতৎপরতা থামাও, অবিলম্বে আমার সঙ্গে দেখা করো। আশীর্বাদক—শিবানন্দ)।

এ যেন ভগবানেরই সেই বাণীর প্রতিধ্বনি ঃ

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ —গীঃ, ১৮।৬৬

—কি করা উচিত, কি করা উচিত নয়—এসব চিন্তায় বিমূঢ় না হয়ে আমার শরণাপন্ন হও। আমি তোমায় সব পাপ থেকে উদ্ধার করব। দুঃখ করো না।

আমি নির্দেশমত সঙ্গে সঙ্গে বেলুড় মঠে উপস্থিত হই। আমাকে দেখে খুব দুঃখের সঙ্গে তিনি বললেন, "তোমাদের কি এই বুড়োর উপর (নিজেকে দেখিয়ে) এতটুকু বিশ্বাস নেই? অন্যায় করেছ, তার উপর আবার (কাউন্সিল)-এ মামলা

move (উপস্থাপিত) করতে যাচ্ছ—এ যে খুঁচিয়ে ঘা করা। যা হোক, এবার সমস্ত ব্যাপার গুটিয়ে নাও এবং ঠাকুরের মুখ চেয়ে বসে থাক। যা করবার তিনিই করবেন।”

এই সুনিশ্চিত আদেশ পেয়ে পাটনায় ফিরে এসে ফলাফলের অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিছুদিন পরেই বড়কর্তার কাছ থেকে হুকুমনামা এল যে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি প্রমাণিত হয়নি—অতএব আমি নির্দোষ। ফলে আমি পুনরায় কাজে বহাল হলাম।

মহাপুরুষ মহারাজকে এই সংবাদ জানাবার জন্য উৎফুল্লচিত্তে মঠে এসে উপস্থিত হলাম। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে দাঁড়াতেই তিনি আস্তে আস্তে হেসে বললেন—“এমনটি আর করো না, কখনও করো না।” চিরক্ষমাশীল মহাপুরুষ মহারাজের কৃপায় গীতার বাণী মনে অনুরণন তুলল—

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ —গীঃ, ৯।৩১

—অত্যন্ত দুরাচার ব্যক্তিও আমায় ভজনা করিয়া শীঘ্র ধার্মিক হয়, চিরদিন শান্তিলাভ করে। হে অর্জুন, তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পার আমার ভক্তের বিনাশ নাই।

মহাপুরুষ মহারাজ যে কতখানি ভক্তবৎসল ছিলেন, বহু ঘটনায় তাঁর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছি এবং সেসব শেষ জীবনের পরম পাথেয় হয়ে রয়েছে। তিনি একাধারে ধর্মগুরু ও স্নেহময় পিতা ছিলেন। বহু বৎসর পূর্বে পিতৃহারা হয়েছিলাম, তিনি পিতার মতো সাংসারিক দুঃখকষ্ট ও ঘাত-প্রতিঘাতে আমাদের রক্ষা করেছেন। তাঁকে পেয়ে পিতার অভাব ভুলেছিলাম। আবার মাতৃবিয়োগের পরে, তিনি মায়ের স্থানও গ্রহণ করেন।...

আত্মস্থ পুরুষরা যা বলেন তাই সত্য হয়; সত্য যেন তাঁদের কথাকে অনুসরণ করে। বাহ্যদৃষ্টিতে অনেক জিনিস অসম্ভব মনে হলেও, তাঁদের কৃপা ও আশীর্বাদে সবই বর্ণে বর্ণে সত্যে পরিণত হয়। দীর্ঘ কয়েক বৎসর বহু ঘটনার মাধ্যমে তার সত্যতা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করেছি—আর বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছি। মহাপুরুষজী একবার পাটনায় আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন এবং আমার গর্ভধারিণীকে খুব আশীর্বাদ ও আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন—“তোমার ভাবনা কি? শুধু বসে বসে ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে থাক; তোমার শেষ গতি তিনি আগে থাকতেই করে রেখেছেন।” মৃত্যুর সময়, আমরাও বিস্মিত হয়ে দেখলাম যে, আমার গর্ভধারিণী সজ্ঞানে ঠাকুরকে দর্শন করতে করতে এবং ঠাকুরের নাম করতে করতে শরীরত্যাগ করলেন। মহাপুরুষজীর এই আশীর্বাদ কতটা সত্য হয়েছিল তা আমাদের মায়ের

শরীর যাবার পরে তাঁর স্বহস্তে লেখা পত্রের প্রতিটি ছত্রে পরিস্ফুট হয়েছে। সেই পত্রটি এখানে উদ্ধৃত করলাম ঃ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণশরণম্

BELUR MATH P. O.
DT. HOWRAH (BENGAL)
25. 10. 28

শ্রীমান বিশু,

মহাদেবের তার গতকল্য পাইয়াছি। আমিও এইরূপ আশা করিতেছিলাম। তোমাদের পূজনীয়া মাতাঠাকুরানী মহাপুণ্যবতী; মা-দুর্গার বিজয়া দশমীর দিন তাঁর (মা-দুর্গার) সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের মায়ের পবিত্র আত্মা ৺কৈলাসে গমন করিল। তিনি মহাপুণ্যবতী, মহাভাগ্যবতী; তোমাদের সকলকে নূতন বাড়িতে বসাইয়া নিজেও কিছুদিন ভোগ করিয়া তোমাদের সেবা-শুশ্রূষা লইয়া ৺গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করিয়া (পাটনা ৺গঙ্গার উপরে) ৺দেবীপক্ষে বিজয়া দশমীর দিন ৺কৈলাসে চলিয়া গেলেন। অবশ্য তোমাদের খুবই দুঃখ হইয়াছে আমি জানি, কিন্তু দেহের মৃত্যু তো অবশ্যম্ভাবী, তোমাদের মা-র বয়সও যথেষ্ট হইয়াছিল। যাহা হউক, তিনি মহাভাগ্যবতী, মহাপুণ্যবতী। তিনি মা জগদম্বার অভয়চরণতলে চিরশান্তি ভোগ করিতেছেন। তোমরাও বিশ্বাস-ভক্তি-প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ হইয়া সংসারের কর্তব্য কাজ সকল অনাসক্ত হইয়া করিতে থাক! কখনও হতাশ হইও না। ঠাকুর আছেন, আমরাও আছি, তোমাদের কোন চিন্তা নাই। কখনই সংসারে তোমরা আসক্ত হইবে না, আমি নিশ্চয়ই জানি। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তোমরা সকলে জানিবে। আমার শরীর কোনরকম জোড়াতাড়া দিয়া ঠাকুর চালাইতেছেন। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

* * *

একবার এলাহাবাদ থেকে বেশ বড় এক-একটা বিশ সের ওজনের দুটি তরমুজ নিয়ে আমরা দু-ভাই মঠে গিয়েছি। ওজনে ভীষণ ভারী। কোনরকমে মাথায় করে হেম পালের গলি দিয়ে মঠে পৌঁছেছি। মহাপুরুষ মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন, "কি এনেছিস?" উত্তরে বললাম, "মহারাজ, তরমুজ। বাইরে সাদা দেখতে কিন্তু ভিতরটা লাল এবং খুব মিষ্টি।" তিনি শুনে বলতে লাগলেন—"বাঃ, বাঃ, বাইরে সাদা, ভিতর লাল! বাইরে সাদা, ভিতর লাল! এই তো হওয়া চাই। ভিতরটা লাল হওয়া চাই। তবে তো। আজ বিকালে ঠাকুরকে জোর ভোগ লাগিয়ে দাও।"

বিকালে মহারাজ ঠাকুরের তরমুজপ্রসাদ পেয়ে মহা খুশি হলেন। কিরকম ব্রহ্মদৃষ্টি! সব কথা থেকেই সেই ভগবানের কথা টেনে আনছেন!

এক ভক্ত মহারাজকে প্রণাম করতে গেছেন তাঁর ঘরে। মহাপুরুষজী ভক্তকে দেখেই হাততালি দিয়ে গান আরম্ভ করলেন—"বিশ্বনাথ-চরণকমল ভজ মন...।" ভক্তটি দীক্ষার পর নূতন যাচ্ছেন, তখনও জড়তা কাটেনি। প্রথমেই ঐ গান শুনে একটু সন্ত্রস্ত হলেন—তার নামগান গাইছেন ভেবে। কিন্তু শেষে মহাপুরুষজীর কৃপাতেই তিনি বুঝলেন যে, শিবের ভাবে তিনি আজ মাতোয়ারা। ভক্ত ও ভক্তের নাম কেবল উপলক্ষ্য মাত্র।...

কথাপ্রসঙ্গে মহাপুরুষজী একদিন বলছেন, "ঠাকুর হচ্ছেন পাকা খেলোয়াড়। তিনি কানাকড়ি দিয়ে বাজিমাত করেন। আমি এখন নিজেই অবাক হয়ে ভাবি, এ শরীর মন নিয়ে কি খেলাই তিনি খেলছেন! কত লোক তাঁর inspiration (উদ্দীপনা) নিয়ে এখানে আসে, আমিও তাদের সঙ্গে আলাপ করে আনন্দ পাই!"

তিনি নিজে যে ঠাকুরের যন্ত্রস্বরূপ ছিলেন, তা প্রতি কাজে, প্রতি কথায়, প্রতি ব্যবহারে প্রকাশ পেত। এই রামকৃষ্ণময় শিবানন্দ-বিগ্রহ আমাদের মনেও চমক লাগাত।

দীক্ষা সম্বন্ধে একদিন হাসতে হাসতে বলছেন, "আমার গুরুভাব কোনদিন আসেনি, আসবেও না। তবে যারা এখানে আসে তাদের তো ঠাকুরের কাছে নিবেদন করে দিতে হবে, ওইটুকুই আমার কাজ। লোকে যেমন ফুল চন্দন ইত্যাদি দিয়ে ভগবানের পূজা করে, আমিও সেইরকম জ্যান্ত মানুষ ঠাকুরের শ্রীচরণে অর্পণ করে দিই এবং দেখি তিনি তাদের গ্রহণ করছেন। ব্যস! এই দেখে আমি নিশ্চিন্ত হই আর বলি—ঠাকুর, তোমার জিনিস তুমি নাও, আর তোমার ভক্তের কল্যাণ কর। আমাদের এই শরীর যে রয়েছে তার প্রধান কারণ হলো সমস্ত জগতের কল্যাণ কামনা করা—এই জন্যই ভগবানের যুগে যুগে সপার্ষদ আসার প্রয়োজন হয়। লোকের মনে যাতে ভগবদ্-ভাবের স্ফুরণ হয় সেটিই আমাদের কাম্য। আমরা আর কিছুই চাই না।" এই কথা কয়টি বলেই তিনি নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন, পরে "জয় শ্রীগুরুমহারাজজী কি জয়, জয় শ্রীগুরুমহারাজজী কি জয়" বলতে বলতে ভাবসাগরে যেন ডুবে গেলেন। আমরাও স্তম্ভিত হয়ে এই রামকৃষ্ণ-প্রতীককে দর্শন করে মুগ্ধ হলাম। সেইসব মধুর দিনগুলির কথা মনে করলে এখনও দেহ মনে অদ্ভুত শিহরণ জাগে।

তিনি একবার ভাবস্থ হয়ে জোরের সঙ্গে বলেছিলেন, "তোরা দেখবি ঠাকুরের কৃপা পেয়ে এল্‌ডেল্‌ হয়ে যাবি।"

জীবনের আশি বৎসর পার হলো। আজ জীবন-সন্ধ্যায় মৃত্যুর সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। মহাপুরুষ মহারাজজীর কৃপায় মৃত্যুভয় আর নেই। তিনি যে হাত ধরে আছেন এবং অন্তিম সময়ে এসে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন—এ বিশ্বাস হৃদয়ে দিনের পর দিন দৃঢ়তর হচ্ছে। আর তাঁর কৃপা যে অমোঘ এবং ভালবাসা সুদূরপ্রসারী—এটি নিশ্চিত জেনে তাঁরই আশায় পথ চেয়ে বসে আছি।

'অব শিব পার কর মেরে নৈয়া...।'

ওঁ তৎ সৎ

শ্রীমহাপুরুষ মহারাজজীর স্মৃতিসঞ্চয়

শ্রীভূপেশচন্দ্র দত্ত

৪৪ বৎসর পূর্বে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রথম বেলুড় মঠে যাই। তখন আমি স্কুলের ছাত্র। সুদূর সিলেট (আসাম) থেকে এক আত্মীয়ের সহায়তায় কলকাতায় আসি। উদ্দেশ্য—বেলুড় মঠ ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদদের দর্শন লাভ করা।

বাল্যকাল (৮।৯ বৎসর বয়স) থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হই। শ্রীহট্টে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে সর্বদাই যাতায়াত করতাম। আশ্রমের ছোটখাট কাজকর্মও কিছু করতাম এবং কাজের সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসি-সন্তানদিগের পুণ্য জীবনকাহিনীও আলোচিত হতো। একে একে আশ্রমের অনেক কর্মীই বেলুড় মঠে এসে দীক্ষা ও ব্রহ্মচর্যগ্রহণান্তে মিশনের কাজে যোগ দিতে লাগলেন। উক্ত পবিত্র পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত থাকায় আমার মনেও বেলুড় মঠে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পার্ষদগণের দর্শনলাভের বাসনা ক্রমেই তীব্র হতে লাগল।

দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে আমার কলকাতা আসার সুযোগ এল। সেই সময় পরমারাধ্য মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ মহারাজ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ। আমার কলকাতা যাবার প্রকৃত উদ্দেশ্য পরিবারের সকলের কাছে গোপন রেখেছিলাম, কারণ তখন ছাত্রজীবনে কলকাতা গিয়ে বেলুড় মঠে দীক্ষাগ্রহণ কাহারো মনঃপূত ছিল না।

কলকাতায় পৌঁছে পরদিন সকালে ৯।১০টার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া সেরে ফেরি স্টিমারে বেলুড় মঠে পৌঁছুতে ১২টা বেজে গেল। এপ্রিল মাস। বেলা ১২টার পর মঠ প্রায় নীরব। দক্ষিণের ফটক দিয়ে মঠে প্রবেশ করামাত্র আমার মন আনন্দে পূর্ণ হয়ে গেল। আমি মঠভূমি স্পর্শ করে প্রণাম করলাম। মনে পড়ল—এই সেই তীর্থ যেখানে স্বামী বিবেকানন্দ 'আত্মারাম'কে মাথায় করে এনে স্থাপন করেছেন।

স্বামীজীর মন্দির দর্শন করে মঠবাড়ির দিকে অগ্রসর হলাম। মঠপ্রাঙ্গণে প্রবেশের ফলকের সামনে আসতেই একজন সন্ন্যাসী পুরাতন ঠাকুরমন্দিরের একতলায় ভাঁড়ার ঘরের বারান্দা থেকে উচ্চৈঃস্বরে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—"কোথা থেকে এসেছ? খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?" আমি খাওয়া-দাওয়া সেরে এসেছি জানালাম। তিনি বললেন, বিকালে ৩টার পরে মহাপুরুষ মহারাজজীর দর্শন হবে। আমি আর অগ্রসর না হয়ে বর্তমানে যেখানে একটি নাগলিঙ্গম ফুলের গাছ আছে সেখানে গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করতে লাগলাম। বিশ্রাম করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না, হঠাৎ কারো ডাক শুনে ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম একজন সাধু আমার ঘুম ভাঙিয়েছেন; তিনি ছিলেন ব্রহ্মচারী জ্ঞান মহারাজ (স্বামীজীর শিষ্য)। আমি গঙ্গার ঘাটে হাতমুখ ধুয়ে একতলায় গঙ্গার দিকের বেঞ্চে বসলাম। জ্ঞান মহারাজ পাশে বসে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন! তিনি সিলেটের ভক্তদের খুব প্রশংসা করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই কলকাতা থেকে ৪।৫ জন ভক্ত পরমপূজ্যপাদ মহাপুরুষজীর দর্শনের জন্য উপস্থিত হলেন। যথাসময়ে খবর দিতেই আমরা সকলে উপরে গেলাম। মহাপুরুষজী তাঁর ঘরে দক্ষিণাস্য হয়ে একটি চেয়ারে আসীন ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদের প্রথম দর্শনে আমি বিমুগ্ধ হলাম। মনে হলো যেন স্বয়ং 'শিবাবতার' উপবিষ্ট রয়েছেন। একে একে ঘরে প্রবেশ করে প্রণামান্তে মেজেতে বসে পড়লাম। উপস্থিত সকলের মধ্যে আমি বয়ঃকনিষ্ঠ।

মহাপুরুষজী সস্নেহে আমার নাম, ধাম, কবে কলকাতা এসেছি, কেন এসেছি, কি পড়ি ইত্যাদি সকল সমাচার জিজ্ঞেস করলেন। সিলেট থেকে এসেছি শুনে স্নেহাশিসপূর্ণ দৃষ্টিতে আনন্দপ্রকাশ করলেন এবং ইন্দ্রদয়ালবাবুর খবর নিলেন। উপস্থিত সকলেই কথাবার্তার মাধ্যমেই উপদেশ গ্রহণ করছিলেন! আমি চুপ করে সব শুনছিলাম। কিছু বলছি না দেখে মহাপুরুষজী আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, "কি হে, চুপ করে বসে আছ যে? একটা কিছু বল। আমাদের কাছে এলে, বাপু, কথাবার্তা বলতে হয়। আর পাথরের মূর্তির সামনে বসে চুপ করে ধ্যান করতে হয়। বুঝলে?" আমি একটু অপ্রতিভ হলেও নীরবই রইলাম। কিন্তু অন্তরে বললাম, "হে প্রভু, আমার আজ একটি মাত্র কথাই আছে। কৃপা করে দীক্ষাদানে আমায় ধন্য কর।" এমন সময়

কয়েকজন সন্ন্যাসী উপরে এসে মহাপুরুষজীকে বললেন—"মহারাজ, আপনার বেড়াতে যাবার সময় হয়েছে।" তখন আমরা সকলে প্রণামান্তে বিদায় নিলাম। মহাপুরুষজী সে সময় প্রতিদিন বিকালে পাঁচটা আন্দাজ বেলুড় ঘাট থেকে ফেরি স্টিমারে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত ভ্রমণে যেতেন এবং সেই স্টিমারেই ফিরে আসতেন। শুনেছিলাম তাঁর blood pressure (রক্তের চাপ)-এর জন্য ডাক্তার এরূপ ব্যবস্থা দিয়েছিলেন। আমি পুরাতন ঠাকুর-মন্দিরে প্রণাম করে কলকাতা রওনা হলাম।

কলকাতায় পৌঁছনোর তৃতীয় দিনে আবার বেলুড় মঠে উপস্থিত হলাম। সেদিন বিকেল প্রায় ৩টার সময় মঠে পৌঁছে পূর্বদিকের বারান্দায় বেঞ্চে বসলাম। এমন সময় সৌম্যকান্তি বলিষ্ঠদেহ একজন সন্ন্যাসী সেখানে উপস্থিত হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "সিলেটি ভক্ত? আচ্ছা! ঠাকুর-স্বামীজী সম্বন্ধে দু-চারটা প্রশ্ন করা যাক।" আমি সভয়ে যথাসাধ্য তাঁর সকল প্রশ্নের জবাব দিলাম। তিনি জবাব শুনে খুশিই হলেন, পরে জেনেছিলাম তিনি স্বামী ওঙ্কারানন্দজী। সেই মুহূর্তে শ্রীমহাপুরুষজীর দর্শনের জন্য ডাক পড়ল। আমি উপরে চলে গেলাম। সেদিন ২।৩ জন দর্শনার্থী মাত্র উপস্থিত ছিলেন। মহাপুরুষজী তাঁর ঘরে চেয়ারে উপবিষ্ট। আমরা প্রণাম করে মেজেতে বসলাম। আমি আগের দিন দক্ষিণেশ্বরে কালীদর্শনে গিয়েছিলাম শুনে মহাপুরুষজী খুব আনন্দিত হলেন এবং ভাবাবেগে বলতে লাগলেন—"দক্ষিণেশ্বর পরম পীঠস্থান। সেখানে স্বয়ং ভগবান লীলা করেছিলেন, জীবকল্যাণে নানাভাবে কঠোর সাধনা করেছিলেন। এমনটি জগতে আর কোথাও ঘটেনি। দক্ষিণেশ্বরতীর্থের প্রতিটি ধূলিকণা পরম পবিত্র।" দক্ষিণেশ্বরে রামলালদাদাকে দর্শন করিনি শুনে মহাপুরুষজী ক্ষুণ্ণ হলেন। এমন সময় একজন সাধু উপরে এসে জানালেন যে, কলকাতা থেকে কয়েকজন ভদ্রমহিলা মহাপুরুষজীকে দর্শন করতে এসেছেন। মহাপুরুষজী আমাদের বললেন, "তোমরা এখন যাও, পরে এসো।" আমি প্রণামান্তে নিচে নেমে গেলাম। সেদিন আর মহাপুরুষজীর দর্শন পাইনি, ঠাকুর প্রণাম করে কলকাতা রওনা হলাম।

পরদিন বিকালে প্রায় ৩টার সময় আবার বেলুড় মঠে গেলাম। এ কয়দিন যাতায়াতে মঠের অনেকের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। সেদিন সোজা উপরে চলে গেলাম। জনৈক সেবক মহারাজকে প্রণাম করতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কিরে, কলকাতা থেকে রোজ মঠে আসা-যাওয়া করছিস, মতলব কি?" আমি তাঁর কাছে মনের বাসনা খুলে বললাম। দীক্ষাগ্রহণের জন্য মনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা শুনে বললেন, "বেশ তো, মহাপুরুষজীর কাছে দীক্ষার কথা বল না কেন?" তখন মনে মনে স্থির করলাম সেদিনই মহাপুরুষজীর শ্রীচরণে দীক্ষার প্রার্থনা জানাবো।

দর্শনার্থী সেদিন আমরা মাত্র দু-জন ছিলাম। সময় হতেই আমরা মহাপুরুষজীর ঘরে গেলাম। তিনি একটি চেয়ারে আসীন ছিলেন। প্রথমে অন্য দর্শনার্থী ভদ্রলোক প্রণাম করলেন, কিন্তু প্রণামান্তে করজোড়ে সেখানেই বসে রইলেন। তিনি উঠছেন না দেখে আমি একপাশ থেকে মহাপুরুষজীকে প্রণাম করে দাঁড়িয়ে রইলাম। মহাপুরুষজী সেই ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলেন—"কি হে, বসে আছ যে? কি হলো?" ভদ্রলোক করুণকণ্ঠে জবাব দিলেন, "মহারাজ, দীক্ষা চাই।" মহাপুরুষজী মাথা নেড়ে বলে উঠলেন—"এসে এক পেন্নাম দিয়েই দীক্ষা চাই।" এ সব হবে না। আমরা এমনভাবে কাউকে দীক্ষা দিই না।" ভদ্রলোক সভয়ে নিবেদন করলেন—"মহারাজ, আমি স্বপ্নে দেখেছি আপনি আমাকে দীক্ষা দিচ্ছেন। মহাপুরুষজী বললেন, "হতে পারে! হতে পারে!" ভদ্রলোক আবার বললেন—"মহারাজ, আমার বাবা-মা আমার বিয়ে দিতে চান। আমি কি বিয়ে করব?" মহাপুরুষজী বললেন, "তুমি বিয়ে করবে কিনা তা আমি কি জানি? আমরা বলি বিয়ে করলে লোকে সংসারে জড়িয়ে পড়ে, ইচ্ছা থাকলেও পরোপকার বা লোকহিতকর কাজে যোগ দিতে পারে না। তুমি বিয়ে করবে কিনা যদি আমাকে জিজ্ঞেস কর, তবে বলব—আমি কিছুই জানি না।" পরে বললেন—"এসে এক প্রণাম দিয়েই দীক্ষা নেবো বললেই আমরা বাপু কাউকে দীক্ষা দিই না। তুমি কেমন লোক জানি না। কোথায় থাকো জানি না। মঠে আসা যাওয়া কর, পরিচয় হোক, তুমি কেমন লোক কিছুদিন দেখি, তারপর দীক্ষা হবে।"

আমি একপাশে দাঁড়িয়ে মনে মনে প্রমাদ গণলাম এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম স্মরণ করতে লাগলাম। ঠিক সেই সময় স্বামী ওঙ্কারানন্দজী ও আর কয়েকজন সাধু উপরে এসে মহাপুরুষজীকে সঙ্গে নিয়ে বৈকালিক ভ্রমণে বেরিয়ে গেলেন এবং আমিও সেবক মহারাজের কাছে উপরোক্ত ঘটনার বিবরণ দিতে তিনি আমাকে নিরুৎসাহ হতে বারণ করলেন। মঠে রোজ বিকালে দর্শনার্থীর ভিড় হয়, সেজন্য পরদিন সকালে এসে মহাপুরুষজীর শ্রীচরণে দীক্ষার প্রার্থনা জানাবো স্থির হলো। কলকাতায় ফিরে সেই রাত্রিটি বড়ই উৎকণ্ঠায় কাটালাম।

পরদিন সকাল ৮টার মধ্যে পৌঁছে সিঁড়ি দিয়ে সোজা উপরে গেলাম। মহাপুরুষজী দরজার দিকে মুখ করে চেয়ারে উপবিষ্ট। আমাকে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে দেখে হেসে বললেন, "এস, এস।" আমি ঘরে প্রবেশ করে তাঁর পাদপদ্মে মাথা রেখে প্রণাম করলাম এবং নতজানু হয়ে করজোড়ে পদতলে বসে রইলাম। মহাপুরুষজী মুখ নিচু করে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কি রে, বসে আছিস যে?" আমি কাতরস্বরে প্রার্থনা করলাম—"মহারাজ, দীক্ষা—।" অন্তরের ব্যাকুলতায়

"নেব" শব্দটিও আর বলা হলো না। করুণাময় মহাপুরুষজী জিজ্ঞেস করলেন—"কি? দীক্ষা? বেশ, দীক্ষা হয়ে যাবে। কালই হয়ে যাবে।"

মহাপুরুষজী স্নেহবিগলিতকণ্ঠে আমি কলকাতায় কোথায় উঠেছি এবং হাতে কি টাকাপয়সা আছে জেনে নিলেন। আমি মির্জাপুর স্ট্রিটে উঠেছি শুনে সেখান থেকে কি করে বেলুড় মঠে আসতে হয় বুঝিয়ে দিলেন। কিছু ফুল, ফল ও মিষ্টি নিয়ে বড়বাজার থেকে ভোর ছটার ফেরি স্টিমারে বেলুড় মঠে আসতে বললেন। আমি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে সেবক মহারাজের কাছে ছুটে গেলাম। সুসংবাদ শুনে তিনিও খুব আনন্দিত হলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজার জন্য কি আনতে হবে এবং মহাপুরুষ মহারাজ কি কি ভালবাসেন (পেপে, কমলালেবু ইত্যাদি) আমাকে বুঝিয়ে দিলেন। সেদিন বিকেলেই কলেজ স্ট্রিট মার্কেট থেকে সব জিনিস কিনে রেখে পরদিন সকালে ৮টার মধ্যে মঠে পৌঁছতে বললেন। সকালে মঠে আসার পথে বড়বাজারে ভীমনাগের দোকান থেকে কিছু ভাল সন্দেশ আনতেও বলে দিলেন।

আমি পরদিন ৮টার মধ্যেই মঠে উপস্থিত হলাম। ঠাকুর পূজার জিনিসপত্র ভাঁড়ারে জমা দিয়ে পূজ্যপাদ মহাপুরুষজীকে দর্শন ও প্রণাম করতে উপরে গেলাম। মহাপুরুষজী আমাকে গঙ্গাস্নান করে ঠাকুরঘরের বারান্দায় গিয়ে বসতে নির্দেশ দিলেন। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসের শেষ—আমি প্রফুল্লমনে স্নানাদি সেরে ঠাকুরঘরের বারান্দায় দীক্ষার শুভক্ষণটির জন্য ব্যাকুল প্রতীক্ষায় বসে রইলাম। মন্দিরে তখন ঠাকুরপূজা হচ্ছিল। যথাসময়ে মহাপুরুষজী তাঁর ঘর থেকে ছাদের উপর দিয়ে ভাবাবেশে অস্ফুটস্বরে কি বলতে বলতে মন্দিরে প্রবেশ করলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি সন্তর্পণে দরজা খুলে বাইরে এলেন এবং আমাকে ভিতরে যেতে ইঙ্গিত করলেন।

আমি ঠাকুরঘরে প্রবেশ করে মহাপুরুষজীর দিব্য ভাবগম্ভীর মূর্তি দেখে একটু বিচলিত হলাম। তিনি উত্তরাস্য হয়ে উপবিষ্ট ছিলেন এবং আমাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের বেদির সম্মুখে পশ্চিমাস্য হয়ে বসতে ইঙ্গিত করলেন। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো সব করতে লাগলাম। মহাপুরুষজী কয়েকবার আমার হাতে পুষ্পাদি দিয়ে মন্ত্র বললেন। আমি অঞ্জলিপুটে সবই শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে সমর্পণ করলাম। অনেকবার দীক্ষামন্ত্র গুরুদেবের সঙ্গে উচ্চারণ করলাম। পরে গুরুদক্ষিণা দিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হলাম। গুরুদেব আমাকে অকুণ্ঠ আশীর্বাদ করে বারান্দায় বসে মন্ত্রজপ অভ্যাস করতে বললেন। আমি নবজীবনলাভের পরমানন্দে বারান্দায় বসে তন্ময় হয়ে অনেকক্ষণ জপ করলাম।

নির্দিষ্ট সময়ে প্রসাদ পেতে নিচে গেলাম। ঠাকুরমন্দিরের একতলায় তখন খাবার ও ভাঁড়ার ঘর ছিল। সেখানে অন্যান্য সাধুগণ উপস্থিত ছিলেন। সেবক মহারাজ মহাপুরুষজীর প্রসাদী থালা নিয়ে সেখানে এসে সেদিন আমার দীক্ষা হয়েছে বলে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে প্রসাদ দিলেন। সেদিন দীক্ষার্থী আমি একাই ছিলাম। মনের আনন্দে প্রসাদ গ্রহণ করলাম। আমার পরম সৌভাগ্যবশত সেদিন পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) মঠে উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে দর্শন করতে গেলাম। তিনি দোতলায় স্বামীজীর ঘরের পশ্চিমদিকের ঘরে ছিলেন। আমি তাঁর পাদপদ্মে প্রণাম করলাম। তিনি বারবার আমাকে স্নেহাশীর্বাদ করতে লাগলেন। তাঁর শ্রীমুখ থেকে মধুর উপদেশবাণী শুনে মনপ্রাণ তৃপ্ত হলো। যতদূর মনে পড়ে সেদিনই পূজ্যপাদ খোকা মহারাজকে (স্বামী সুবোধানন্দ) প্রণাম করে কৃতার্থ হয়েছিলাম। পরে মহাপুরুষজীর ঘরে গেলাম। আমি আর কতদিন কলকাতায় থাকব মহাপুরুষজী জিজ্ঞেস করলেন। আরও কিছুদিন কলকাতায় থেকে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি, পূজনীয় মাস্টার মহাশয়, গদাধর আশ্রম প্রভৃতি দর্শন করব এবং মাঝে মাঝে মঠে আসব জানালাম। মহাপুরুষজীকে এবং ঠাকুরঘরে প্রণাম করে বিকালে কলকাতার দিকে রওনা হলাম।

কয়েক দিনের মধ্যেই বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি দর্শন করলাম। একদিন বিকালে মঠে মহাপুরুষজীকে প্রণাম করে দাঁড়াতে দেখলাম একজন ভদ্রলোক মহাপুরুষজীর সামনে একটি মোড়াতে বসে কথাবার্তা বলছেন; ঘরে আর অন্য কেউ ছিলেন না। মহাপুরুষজী সেই ভদ্রলোককে দেখিয়ে আমাকে বললেন, "প্রণাম কর, ইনিই আমাদের রামলালদাদা।" আমি তাড়াতাড়ি ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলাম। মহাপুরুষজী ও রামলালদাদাকে একসঙ্গে দর্শন করে আমার প্রাণে খুবই আনন্দ হলো। আশ্রিতবৎসল মহাপুরুষজী রামলালদাদাকে আমার পরিচয় দিলেন।

দু-এক দিন পরেই আমহার্স্ট স্ট্রিটে গিয়ে পূজনীয় মাস্টার মহাশয়কে দর্শন করলাম। এত অল্প বয়সেই মহাপুরুষজীর কৃপা পেয়েছি শুনে তিনি খুব আনন্দপ্রকাশ করলেন এবং আমাকে বারবার আশীর্বাদ করতে লাগলেন।

দেশে ফিরে যাবার আগের দিন মঠে গিয়ে মহাপুরুষজীকে দর্শন করলাম এবং পরদিন দেশে যাব জানালাম। তিনি আমাকে অমোঘ আশীর্বাদ করে ভক্তি ও বিশ্বাসের সঙ্গে ইষ্টমন্ত্র জপ করতে উপদেশ দিলেন। প্রতিদিন নিয়মিত সকাল-সন্ধ্যায় ইষ্টমন্ত্র জপ করতে এবং ঠাকুরের কাছে এভাবে কাতর প্রার্থনা করতে বললেন—"ঠাকুর, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। জ্ঞান, বিশ্বাস, প্রীতি, পবিত্রতা দাও। আমার মানবজীবন সফল হোক।" ইত্যাদি। সেদিন তাঁর পূত আশীর্বাদে মনে এক

অনির্বচনীয় আনন্দ ও প্রেরণা লাভ করলাম। শ্রীগুরুপাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে পরিপূর্ণ হৃদয়ে সাশ্রুনয়নে বিদায় নিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরপ্রণামান্তে অন্যান্য সাধুদের প্রণাম করে কলকাতায় রওনা হলাম।

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ—১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে মহাপুরুষজীর আশীর্বাদী পত্র মাঝে মাঝে পেয়েছি। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাসে কলেজে লেখাপড়া করতে কলকাতায় আসি। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ—'৩১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় হস্টেলে থেকে লেখাপড়া করেছি। সে সময় ছুটির দিনে ও উৎসবাদিতে নিয়মিত মঠে যেতাম। এই দীর্ঘ চার বৎসর পরমপূজ্যপাদ মহাপুরুষজীর পূত সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তাঁর অহৈতুক ভালবাসা, প্রীতি ও স্নেহাশীর্বাদে আমার সে দিনগুলি পরমানন্দে কেটেছে।

সে সময়ে মঠে অভেদানন্দ মহারাজ, খোকা মহারাজ প্রভৃতি শ্রীঠাকুরের সন্তানদের পুণ্য সংস্পর্শে আসবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে স্বামীজীর জন্মতিথি উৎসবের দিন মঠে মহাপুরুষজীর ঘরে স্বামী অভেদানন্দজীকে প্রথম দর্শন ও প্রণাম করার সৌভাগ্য হয়। তিনি সারাদিন মঠে থেকে বিকালে কলকাতায় ফিরে যান। বিদায়কালে তিনি মহাপুরুষজীর চরণস্পর্শ করে প্রণাম করলেন। মহাপুরুষজী তাঁকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন। এই দৃশ্য দেখে সকলে মুগ্ধ হলো। সারাদিন পূজাপাঠ ভজন উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতাদিতে মঠ মুখরিত ছিল। শত শত ভক্ত মঠে প্রসাদ পেলেন।

উৎসবের অঙ্গরূপে সেদিন বিকালে মঠবাড়ির পূর্বদিকের প্রাঙ্গণে গঙ্গাতীরে এক সভা অনুষ্ঠিত হলো। একাধিক কারণে উক্ত সভা বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল। সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন দেশনেতা সুভাষচন্দ্র বসু এবং প্রধান বক্তা ছিলেন স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ। কলকাতার বহু বিশিষ্ট নাগরিকও ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। দোতলায় বসে শ্রীমহাপুরুষজী সভার কার্যাবলীর পরিচালনা লক্ষ্য করছিলেন।

প্রথমে স্বামী অভেদানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের যোগসূত্র থেকে শুরু করে স্বামীজীর অলৌকিক জীবনের নানা ভাবধারার বিশ্লেষণ করে সমবেত ভক্তমণ্ডলীর মনোরঞ্জন করেন। সর্বশেষে দেশবরেণ্য নেতা সুভাষচন্দ্র বসু স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করে এক মনোজ্ঞ ভাষণে সমাগত সকলকে অপূর্ব আনন্দ দান করেন। ঐ ভাষণের সারমর্ম এই—"স্বামী বিবেকানন্দের বহুমুখী প্রতিভা ব্যাখ্যা করা বড় কঠিন। আমার সময়ে ছাত্রসমাজ স্বামীজীর রচনা

ও বক্তৃতা দ্বারা যেরূপ প্রভাবিত হইয়াছিল, সেরূপ আর কাহারও দ্বারা হয় নাই। ...স্বামীজী দুইটি জিনিসের উপর বিশেষ জোর দিতেন—ত্যাগ ও চরিত্রগঠন। ত্যাগ ব্যতীত কোন উপলব্ধিই সম্ভব নয়। ভারতবর্ষে মহাপুরুষের অভাব নাই। ভারতে এমন সব প্রতিভাশালী ব্যক্তির উদ্ভব হইয়াছে, যাঁহারা অন্য দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সমকক্ষ। যাহা অতি প্রয়োজনীয় তাহা এই—জনসাধারণের চিত্তে উদ্বোধন চাই। এই জন্যই স্বামীজী বলিতেন—'মানুষ গড়াই আমার কাজ।' স্বামীজী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের, ধর্ম ও বিজ্ঞানের, অতীত ও বর্তমানের সমন্বয় করিয়াছিলেন, তাই তিনি মহান। তাঁহার শিক্ষায় দেশবাসী অভূতপূর্ব আত্মসম্মান, আত্মবিশ্বাস এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার বোধ লাভ করিয়াছে।" (উদ্বোধন, ফাল্গুন, ১৩৩৭)

* * *

মহাপুরুষজী অন্তর্দ্রষ্টা ছিলেন। দৃষ্টিমাত্রই তিনি লোকের বর্তমান ভূত ভবিষ্যৎ জানতে পারতেন। এখানে একটি ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ করছি। আমার এক বন্ধু ও গুরুভ্রাতা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন। মহাপুরুষ মহারাজজীও তাঁকে স্নেহ করতেন। ১৯২৯।৩০ খ্রিস্টাব্দে এম. এ. পড়ার সময় হঠাৎ তাঁর বিলাতে গিয়ে আই. সি. এস. পরীক্ষা দেবার ইচ্ছা জাগে। মহাপুরুষজীকে তাঁর মনোবাসনা জানাতে তিনি এতে বিশেষ আপত্তি জানান। বললেন—"তুমি আই. সি. এস. পরীক্ষা দিতে চাও তা এ দেশে থেকেই দিতে পার। বিলাতে গিয়ে বাবার এত টাকা খরচ করে কোন লাভ হবে না। আর পরিবারে তোমার অন্য ভাই-বোনদের পড়াশুনার খরচও তো রয়েছে!" কিন্তু বন্ধুটি মহাপুরুষজীর উপদেশ গ্রহণ না করে বিলাতে যান এবং সেখানে অল্পদিনের মধ্যে প্রচুর টাকা খরচ করেও আই. সি. এস. পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে পারেননি। এদিকে পিতার অর্থসাহায্যের সামর্থ্যও প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছিল। তাই বন্ধুকে বিফলমনোরথ হয়ে মালবাহী জাহাজে দেশে ফিরে আসতে হয়েছিল।...

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ থেকে মহাপুরুষজীর শরীর ভাল থাকত না। বিশেষত শরৎ মহারাজের তিরোধানের পর থেকে তাঁর শরীর ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছিল। শরীরের কথা জিজ্ঞেস করলে কখনও বলতেন, "বেশ আছি।" আবার কখনও বলতেন—"এই শরীর টলটলায়মান। যতদিন ঠাকুর তাঁর কাজের জন্য রাখবেন ততদিন থাকবেই।" কখনও বা নিজের শরীর দেখিয়ে বলতেন—"এটা কখনও ভাল, কখনও মন্দ হয়; ঠাকুর যতদিন খেলাবেন খেলব।" মহাপুরুষজী নির্লিপ্তভাবে এসব বলতেন ও হাসতেন। তাঁর সেই দিব্য হাসি যে কেউ একবার দেখেছেন, জীবনে কখনও ভুলতে পারবেন না। শেষের দিকে আমরা তাঁকে শরীরের কথা

আর জিজ্ঞেস করতাম না। সেবক মহারাজদের কাছ থেকেই সব জেনে নিতাম। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে আমি আমার প্রথম কর্মস্থলে যোগদান করতে কলকাতা থেকে আসাম চলে যাই। সে সময় পূজ্যপাদ মহাপুরুষজীর শরীর মোটেই সুস্থ ছিল না। এরপর পরমারাধ্য গুরুদেবকে স্থূল শরীরে দর্শন করার সৌভাগ্য আমার আর হয়নি। তাঁর অহৈতুক স্নেহ প্রীতি ভালবাসা ও অমোঘ আশীর্বাদ আমার জীবনের পরম পাথেয়।

ওঁ তৎ সৎ

শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতিকথা*

শ্রী টি. এস. অবিনাশীলিঙ্গম্

১৯২১ খ্রিস্টাব্দ। আমার বয়স তখন আঠারো বৎসর এবং আমি মাদ্রাজে বি. এ. পড়ছি। স্বামী বিবেকানন্দের গুরু ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো ধর্ম-মহাসম্মেলনে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন—একথা শুনেছিলাম, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে আর বেশি কিছু জানতাম না। আমার সহ-আবাসিক আমাকে একদিন বললেন, "মাদ্রাজে একটি রামকৃষ্ণ মঠ আছে এবং শ্রীরামকৃষ্ণের দু-জন শিষ্য শীঘ্রই সেখানে আসছেন।" খবরটি শুনে বেশ আনন্দই হলো, কারণ শ্রীরামকৃষ্ণের দু-জন জীবিত শিষ্য ও বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতাদ্বয়কে দর্শন করা সাধারণ ঘটনা নয়। সুতরাং আমরা উভয়েই মাদ্রাজ মঠে যাবার সঙ্কল্প করলাম। কলেজ ছুটির পর একদিন সন্ধ্যায় মঠে গেলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যদ্বয় ছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী শিবানন্দ। তাঁরা তখন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ ও সহাধ্যক্ষের পদে সমাসীন। মাদ্রাজ মঠে তাঁদের দর্শনার্থী অল্পসংখ্যক লোক ছিল। আমরাও অন্যান্যের সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করে তাঁদের প্রণাম করলাম। তাঁরা ছিলেন বয়সে প্রবীণ ও প্রসন্নমূর্তি। তাঁরা স্নেহভরে সকলের পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ একটু অন্তর্মুখ ও নীরব এবং কথাবার্তাও কম বললেন, কিন্তু স্বামী শিবানন্দকে দেখলাম অধিকতর উন্মুখ। তিনি আমাদের নামধাম, কোন্ কলেজে কোন্ ক্লাসে পড়ি ইত্যাদি সব জিজ্ঞেস করলেন। বিদায়গ্রহণ করার সময় তিনি বললেন, 'আবার এসো।' তাই হলো। আমরা পরপর দুদিন

* মূল ইংরেজির অনুবাদ

সন্ধ্যায় মাদ্রাজ মঠে গেলাম। স্বামী শিবানন্দের প্রতি আমরা কেন আকৃষ্ট হলাম জানি না, কিন্তু আকৃষ্ট হয়েছিলাম—এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, দীর্ঘকাল প্রতিদিন শুধু তাঁকে দর্শন করবার জন্যই অতি কষ্টে হেঁটে গিয়েছি। বর্ষাকাল—বৃষ্টির মধ্যে জল ও কাদা অতিক্রম করে যেতে হয়েছিল; তথাপি একদিনের জন্যও আমাদের যাওয়া বন্ধ হয়নি। আমাদের দেখেই তিনি হাসতেন, তাঁর দুচোখ ঝিকমিক করত এবং বাংলায় জিজ্ঞেস করতেন, "ভালো?" এবং আমরাও খুব খুশি হয়ে বলতাম, "হাঁ, মহারাজ।" কথাবার্তা এর চেয়ে বেশি কিছু হতো না; কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়—এতেই আমাদের খুব আনন্দ ও তৃপ্তি হতো। এভাবে তাঁর সান্নিধ্যে যাতায়াত পরবর্তী বারো বৎসর চলেছিল। অবশেষে তাঁর তিরোধানের সঙ্গে তার অবসান হয়।

পরে আমি মহাপুরুষজীকে আরও বেশি ঘনিষ্ঠভাবে জানতে পেলাম ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে ভুবনেশ্বরে। আমি বি. এ. পরীক্ষা দিয়েছি কিন্তু ছুটির পর বাড়িতে না গিয়ে মহাপুরুষজীকে দর্শন করার জন্য ভুবনেশ্বরে যেতে চাইলাম। তাঁর ভালবাসা ও স্নেহ, ভাবের গাম্ভীর্য ও মহিমা আমাকে খুবই অভিভূত করে থাকবে। মহাপুরুষজী তখন ভুবনেশ্বরে অবস্থান করছিলেন; সুতরাং আমি সেখানে রওনা হলাম। বর্তমান সময়ের মতোই তখন 'কলকাতা মেল' দ্বিপ্রহর রাত্রিতে ভুবনেশ্বরে পৌঁছল। একজন সাধু আমার জন্য স্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন। পরদিন প্রাতে মহাপুরুষজীকে দর্শন করে আমি অত্যন্ত সুখী হলাম। আমার স্বাস্থ্য ও পড়াশুনা ইত্যাদি কেমন চলছে, তিনি জিজ্ঞেস করেন। আমাকে নিশ্চয়ই ছোট বালকের মতো দেখাত, কারণ তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—অতদূর একাকী কেমন করে আসতে পেরেছি। আমার প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা ও স্নেহ দেখে আমি খুবই মুগ্ধ হয়েছি। ভুবনেশ্বরেই তিনি কৃপা করে আমাকে মন্ত্রদীক্ষা ও ধর্মোপদেশ প্রদান করেন। দুদিন পরে তিনি আমাকে যুগ-যুগ ধরে বহু মুনি-ঋষি দ্বারা পবিত্রীকৃত পুরীধাম দর্শন করতে নির্দেশ দেন। একজন প্রবীণ সাধুকে আমার সঙ্গে পুরী যেতে বললেন। বিদায় নেবার সময় তিনি আমাকে বললেন, "তোমাকে কি দেব?" টেবিলের চারিদিকে চাইলেন, সেখানে জনৈক ধনী ভক্তের উপহৃত সোনার হাতলে একটি সুন্দর পেন্সিল ছিল। পেন্সিলটি হাতে নিয়ে বললেন, "এই সোনার পেন্সিলটি দিয়ে কি করব আমি? এটি নাও।" একথা বলেই আমাকে তা গ্রহণ করতে বারবার জিদ করেন। একবার আমি একটা সোনার আংটি হারিয়েছিলাম, সে অবধি কোন মূল্যবান জিনিস রাখতে আমার অনিচ্ছা ছিল। কাজেই আমি বললাম, "না মহারাজ, আমি এটি হারিয়ে ফেলতে পারি। শুধু আপনার আশীর্বাদ চাই।" মহারাজ বললেন, "হাঁ" এবং আমাকে

আশীর্বাদ করেন। তাঁর আশীর্বাদ বরাবরই আমার সঙ্গে আছে এবং জীবনের নানা বিপর্যয়ের মধ্যে আমাকে রক্ষা করে আসছে। জীবনে কত দুঃখ-কষ্ট ও সমস্যা রয়েছে, কিন্তু আমি সত্য সত্যই অনুভব করেছি, তাঁর আশীর্বাদ আমাকে ঐ সকলের সম্মুখীন হতে সর্বদাই সাহায্য করেছে।...

ভুবনেশ্বরে মহাপুরুষজীর সঙ্গলাভের পর আমি প্রায় প্রতি বৎসরই বেলুড় মঠে যেতাম এবং কয়েক সপ্তাহ তাঁর সান্নিধ্যে থাকতাম। এর পরে ১৯২৪ ও ১৯২৬ সালে (দক্ষিণভারতের) কুনুর এবং উতকামণ্ডে বহুদিন তাঁর সঙ্গলাভ ও সেবা করবার সুযোগ পাই। এ উভয় স্থানে তিনি কয়েক মাস অবস্থান করেন এবং আমাদেরও সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর সঙ্গে বাস করবার, প্রায়ই তাঁকে দর্শন করবার, ভ্রমণে তাঁর সঙ্গী হওয়ার, লোকজনের সঙ্গে তিনি কিভাবে কথাবার্তা বলতেন ও ব্যবহার করতেন এবং বিভিন্ন অবস্থায় কি প্রতিক্রিয়া হতো তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করবার। তাঁকে নানাভাবে সেবা করবারও আমাদের অপূর্ব সুযোগ হয়েছিল—তাঁর আহার্য-পরিবেশন, তামাক-সাজা, পা-টেপা প্রভৃতি সেবার কাজ করেছি। যতই তাঁকে লক্ষ্য করেছি এবং অন্তরঙ্গভাবে পেয়েছি, ততই তাঁর ভাবের মাধুর্য ও মহিমায় মুগ্ধ হয়েছি।...

স্বামী বিবেকানন্দ-রচিত 'সন্ন্যাসীর গীতি' (Song of the Sannyasin) সর্বদাই সাগ্রহে পড়েছি। কবিতাটি বাস্তবিকই উদ্দীপনাময়ী ও শক্তিদায়িনী। আমি আশ্চর্য হয়ে ভেবেছি—এ কবিতায় ব্যক্ত ভাবসমূহের দ্বারা অনুপ্রাণিত তেমন কোন মানুষ আছেন কিনা। কিন্তু মহাপুরুষজীর জীবনবেদ গভীরভাবে পর্যালোচনা করে দেখেছি যে, আমাদের চোখের সামনে ও সান্নিধ্যেই সশরীরে এমনই একজন সন্ন্যাসী রয়েছেন। যখন তিনি কুনুরে ছিলেন, সেখানকার সবচেয়ে গণ্যমান্য ব্যক্তিরা তাঁকে দর্শন করতে আসতেন। আমি দেখেছি, কোচিনের মহারাজা এসে মহাপুরুষজীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করছেন। মাদ্রাজ সরকারের তদানীন্তন উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ তাঁকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করছেন। কিন্তু মহাপুরুষজী তাতে বিন্দুমাত্রও উচ্ছ্বসিত বা অভিভূত হচ্ছেন না, পরন্তু সেই বরাবরকার স্নেহ ও প্রসন্নতার সঙ্গে একই অভিনন্দন জানাচ্ছেন, "কেমন আছেন? ভালো তো?" বাগানের মালি ও অন্যান্য চাকর-বাকরেরা তাঁর প্রতি যখন শ্রদ্ধা-ভক্তি নিবেদন করতে আসত, মহাপুরুষজী তাদেরও সেই একই ভালবাসা, স্নেহ ও সম্মান দেখাতেন। একবার জনৈক ধনী ব্যক্তি মহাপুরুষজীকে আশ্চর্য-কারুকার্যখচিত একখানা দামি শাল উপহার দেন। কোন দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান উপহার পেলে বালক যেমন আনন্দে উৎফুল্ল হয়, মহাপুরুষজীও তেমনি সানন্দে শালখানা গ্রহণ করলেন। শালখানা খুলে বলছেন, "কি সুন্দর, কি

চমৎকার, কি মনোরম!" ভদ্রলোক তা দেখে সুখী হয়ে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর দুধওয়ালির ছোট বালিকাটি মহারাজকে প্রণাম করতে আসে। বালিকাটি সতৃষ্ণ নয়নে ও আশ্চর্য হয়ে শালখানার দিকে চেয়ে রইল। ছেলেপুলেদের প্রতি মহাপুরুষজীর সর্বদাই স্নেহ ও ভালবাসা ছিল। তিনি স্নেহভরে বালিকাটিকে জিজ্ঞেস করলেন, "শালখানা চাস? নিবি?" বালিকা বিস্ফারিত চোখে বলল, 'হাঁ'। মহাপুরুষজী তৎক্ষণাৎ শালখানা খুলে সানন্দে বালিকাটির গায়ে জড়িয়ে দিলেন এবং বললেন, "তুই এটা নিতে পারিস।" বালিকা আনন্দে আত্মহারা হয়ে হাসতে হাসতে শালখানাসহ দৌড়ে চলে গেল। এ সম্বন্ধে আর কোন কথাবার্তাই হলো না। কত লোক তাঁর কাছে আসা-যাওয়া করত, ভক্তেরা কত অর্থ তাঁকে দিতেন ও তাঁর জন্য খরচ করতেন। কত জিনিস আসত ও বিলিয়ে দেয়া হতো, কিন্তু তিনি সর্বদাই একভাবে থাকতেন—প্রশান্ত, শিশুর মতো সরল, সতত স্নেহ-পরায়ণ ও প্রেমিক। তাঁর কাছে যাঁরা আসতেন তাঁদের কাউকে তিনি প্রত্যাখ্যান করতেন না, সকলকেই স্নেহভরে গ্রহণ করতেন।...

আমার টেবিলের উপরে শ্রীরামকৃষ্ণের একখানা অর্ধাবয়ব প্রতিকৃতি (bust) রাখতে চেয়েছিলাম। সেজন্য একখানা ভাল ফটো-স্ট্যাণ্ড (photo-stand) ও একখানা ছবি কিনলাম। ছবিখানি মূর্তি-আধারের সমান করে কেটে স্ট্যাণ্ডের মধ্যে স্থাপন করলাম। ছবিখানি স্ট্যাণ্ডে ঠিকভাবে বসানো হলে খুব সুন্দর দেখালো। প্রতিকৃতিখানি মহাপুরুষজীর নিকট নিয়ে গেলাম, আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম যে, তিনিও তা পছন্দ করবেন। কিন্তু তাঁকে ছবিখানি দেখানো মাত্র তিনি উত্তেজিত হয়ে বলে উঠেন, "এ চাই না; ঠাকুরের পাদপদ্ম কই? তাঁর শ্রীচরণই আমি চাই।" এতে করে প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁর গভীর ভক্তি ও অনুরাগ এবং তাঁর দিব্য জীবনের প্রমাণ মিলে গেল। অনেক সময় খুব ভাল ভাল ফল ভক্ত ও অনুরাগীরা তাঁর জন্য আনতেন। তিনি ফলগুলির সুখ্যাতি করে বলতেন, "শ্রীগুরু মহারাজের ভোগে লাগাও!" ফুল অথবা অন্য কোন ভাল জিনিস ভক্তেরা আনলে সেগুলি সম্বন্ধেও একথাই বলতেন। প্রভুর শ্রীচরণে যিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করেছেন, তাঁর পক্ষে এরূপ চিন্তা ও মনোভাব পোষণ করা বাস্তবিকই স্বাভাবিক।...

একবার বেলুড় মঠে থাকাকালে খুব সকালে কলকাতা যাবার ইচ্ছা হলো। মহাপুরুষজীর অনুমতি নিয়ে প্রাতরাশের পূর্বেই সকাল সকাল কলকাতায় রওনা হলাম। পূর্বে আমি গোঁড়া নিরামিষভোজী ছিলাম, এখনও তাই আছি—ডিম পর্যন্ত খাই না। দক্ষিণভারতে নিরামিষভোজীরা মাছ-মাংস না খাওয়ার দরুন গর্ব অনুভব করেন এবং আমিষভোজীদের চেয়ে নিজেদের উন্নতস্তরের লোক মনে করেন।

কলকাতায় গিয়ে খিদে পেতে একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে রুটি ও মাখনের ফরমাশ দিলাম। রেস্তোরাঁর মালিক দু-খানা রুটি টোস্ট করে তাতে মাখনের মতো দেখতে একপ্রকার হলদে পদার্থ মাখালো এবং আমায় পরিবেশন করল। দাম দিতে গেলে আমায় জিজ্ঞেস করা হলো—আমি কি খেয়েছি। আমি বললাম—"রুটি ও মাখন খেয়েছি।" পরিবেশক বলল যে, আমি 'ওমলেট' খেয়েছি। আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো। কারণ যা আমি পূর্বে আর কখনও খাইনি, সেই নিষিদ্ধ খাদ্যই খেয়েছি। খুব অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। মঠে ফিরে গিয়ে মহাপুরুষজীকে তাবৎ বৃত্তান্ত বললাম। তিনি আমার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ না করে হাততালি দিতে লাগলেন এবং বললেন, "বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে, তোমার অহঙ্কার চূর্ণ হলো।" তাঁর কথা শুনে আমার চোখ খুলে গেল—নিরামিষ আহারের জন্য অহঙ্কার করাটা কতখানি মূঢ়তা!...

আমাদের প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা ছিল বলেই আমরা সকলেই তাঁর উপদেশ ও নির্দেশের দিকে চেয়ে থাকতাম। তাঁর অনুপ্রেরণাতেই আমি দেশসেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করেছি। গরিব ছেলেরা যাতে অবস্থাপন্ন ছেলেদের সাথে একসঙ্গে শিক্ষাদীক্ষা পেতে পারে, এমন একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার সঙ্কল্প যখন আমার মনে হলো এবং আমি মহাপুরুষজীর কাছে তা লিখলাম। উত্তরে তিনি ১৯ নভেম্বর (১৯২৯) তারিখের পত্রে লিখলেন, "একটি অনাথাশ্রম স্থাপন করার সঙ্কল্প নিঃসন্দেহে অতি উত্তম ও মহৎ। কিন্তু অর্থ ও বালকদের শিক্ষাদীক্ষা উভয় দিক দিয়েই এতে নিরন্তর মনোনিবেশ দরকার। এ কার্যে হাত দেবার পূর্বে বেশ ভালভাবে চিন্তা করে দেখ—এতো অক্লান্ত শক্তি নিয়ে কাজ করা তোমার পক্ষে সম্ভব কিনা এবং তোমার সহকর্মী বন্ধুরা নিঃস্বার্থভাবে ও অকপটে একাজে লেগে থাকতে পারবে কিনা। যদি তোমরা নিঃস্বার্থভাবে তোমাদের শক্তি নিয়োগ করতে পার, অর্থের অভাব হবে না, অর্থ আসবে।" মহাপুরুষজীর আশীর্বাদ নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি আরম্ভ করা গেল। বর্তমানে এর নাম 'শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়'। বিদ্যালয়টি যদি আজ ভারতবর্ষের অন্যতম আদর্শ শিক্ষায়তন হিসাবে পরিগণিত হয়ে থাকে, তবে তা সম্পূর্ণরূপে মহাপুরুষজীর আশীর্বাদের জন্যই হয়েছে।...

মহাত্মা গান্ধী স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং আমি সে আন্দোলনের দুর্নিবার প্রভাবে আকৃষ্ট হই। রামকৃষ্ণ মিশন একটি ধর্মপ্রতিষ্ঠান এবং ধর্মপ্রতিষ্ঠান হিসাবে মিশন রাজনীতিতে যোগদান না করবার নীতি রক্ষা করে আসছে। সুতরাং মিশনের অনেক সাধুই আমাকে মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে নিষেধ করেন। কিন্তু মহাপুরুষজী আমার মনের গভীরে প্রবেশ করে দেখলেন এবং আমি

যা সত্য ও উচিত বলে মনে করি তা করতে অনুমতি দিলেন। এ ব্যাপারে তিনি সর্বপ্রকার সহানুভূতি, ভালবাসা ও অবধারণ বা বোঝাপড়ার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিলেন। তিনি লিখলেন, "বাবা, ভয় করো না। তুমি এতদিন আমাদের সঙ্গ করছ। তোমার প্রতি আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ সদাই রয়েছে। নিশ্চয় জেনো, তুমি যেখানে ও যে অবস্থায়ই থাক না কেন, কোন কিছুই তোমাকে সংসারে টেনে আনতে পারবে না এবং তুমি কখনও ঠাকুরকে ভুলবে না। ঠাকুর সর্বদাই তোমার সঙ্গে থাকবেন। তিনি তোমার পথপ্রদর্শক ও গতি।"...

আমি শুনেছি, ভালবাসা দ্বারাই সবকিছু জয় করা যায়। এ কথার যাথার্থ্য মহাপুরুষজীর জীবনে যেমন দেখেছি ও বুঝেছি এমন আর অন্য কোথাও বুঝিনি। তাঁর ভালবাসা কোন কিছু—এমন কি যা তিনি ভাল বলে মনে করতেন তাও, অন্যের উপর জোর করে চাপিয়ে দেয়নি। যে কেউ তাঁর কাছে আসত প্রত্যেকেরই প্রকৃতি তিনি বুঝতেন এবং প্রত্যেককেই তার নিজের ভাব অনুযায়ী অধ্যাত্মপথে অগ্রসর হতে সহায়তা করতেন। আমার স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান—এ বিষয়ের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রামকৃষ্ণ মিশন এবং তার আদর্শ ও কর্মপদ্ধতির সঙ্গে আমি গভীরভাবে যুক্ত। কিন্তু গান্ধীজীর মাধ্যমে যখন দেশসেবার আহ্বান এল, তখন সেটাও ছিল দুর্নিবার। মিশনের কাজের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রাজনীতিতে যোগদান করা আমার উচিত নয়—একথা বলা যেকোন লোকের পক্ষে সহজ ছিল এবং মিশনের অনেক সাধুই তাঁদের বিবেচনানুসারে আমাকে তা বলেছিলেন। কিন্তু তখন রাজনীতিতে যোগদান না করলে আমার মনে সংঘর্ষ উপস্থিত হতো এবং ফলে নৈরাশ্য ও বিষাদে জীবন দুর্বহ হয়ে উঠত। তিনি আমার এ মনোভাব এবং বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও শক্তি বুঝতে পেরেছিলেন; সেজন্যই তিনি তাঁর চিন্তা আমার উপর জোর করে চাপিয়ে দেননি, কেবল বলেছিলেন, "যে কোন ত্যাগের জীবন মহৎ।" তাঁর কাছ থেকে কখনও কোন নেতিবাচক নির্দেশ আসেনি। কারাবরণ করতে তিনি আমাকে অনুমতি দেন, শুধু বলেছিলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণের উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শ সর্বদা স্মরণ রেখো।" মহাপুরুষজীর এ সকল ভাবধারা, বাণী ও বোধ-সামর্থ্যই আমাকে প্রভূত শক্তি দিয়েছে। তিনি মনে করতেন, মহাত্মা গান্ধী একজন সত্যের উপাসক এবং স্বামী বিবেকানন্দ দেশের স্বাধীনতা-অর্জনের যে কাজ অসমাপ্ত রেখে গেছেন, সে কাজটি অনেকাংশে সম্পন্ন করবার জন্যই গান্ধীজীর জন্ম।

স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করে শেষবার জেলে যাবার পূর্বে মহাপুরুষজীকে সুস্থ দেখেছি। কিন্তু আমার জেলে থাকাকালে তিনি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে

শয্যাশায়ী হন। পক্ষাঘাতে তাঁর বাক্‌রোধ হয়েছিল এবং শরীরের একাংশ অবশ হয়ে যায়। জেল থেকে বের হয়ে মহাপুরুষজীকে দর্শন করার জন্য অবিলম্বে বেলুড় মঠে যাই। বাক্‌শক্তি-রহিত হয়ে তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন, কিন্তু তাঁর চোখে এমন স্নেহ ও মমতা দেখতে পেলাম যে, তাতে আমি নিতান্তই অভিভূত হলাম। তিনি কথা বলতে পারেননি, কিন্তু তাঁর চোখে যে প্রেম লক্ষ্য করলাম তা আমাকে যেন যুগপৎ মুগ্ধ ও সঞ্জীবিত করল। তাঁর মধ্যে অদৃষ্টপূর্ব আত্মার মহিমা অনুভব করলাম। আমরা বুঝলাম, তিনি বিদেহ আত্মা—নির্বিকার, অনাসক্ত, প্রশান্ত ও শান্তিপূর্ণ।

দেহ, ব্যাধি অথবা দেহের আসন্ন বিনাশ তাঁর কাছে অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হতো। তিনি যেন গীতার বাণী নিজ জীবনে ঘোষণা করছেন ঃ "নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥" "প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে। প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে ॥" অর্থাৎ এ আত্মাকে অস্ত্রসকল ছেদন করতে পারে না, অগ্নি দগ্ধ করতে পারে না, জলও ভিজাতে পারে না, বায়ুও শুষ্ক করতে পারে না।...চিত্তপ্রসাদ হলে সমস্ত দুঃখের অবসান হয়; যেহেতু প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি শীঘ্র উপাস্য বস্তুতে স্থিতিলাভ করে।

আমি দার্শনিকও নই, পণ্ডিতও নই। শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্যদের সম্বন্ধে লোকের কি ধারণা, আমি জানিনা। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ যদি একজন অবতার হয়ে থাকেন—লোককল্যাণের জন্য বহু শতাব্দীর মধ্যে একবার যদি ভগবান মানব দেহ ধারণ করে জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে যাঁরা তাঁর সঙ্গে এসেছেন তাঁরা সাধারণ মানুষ হতে পারেন না। আমরা বাস্তবিকই ভাগ্যবান যে, এমন আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন পুরুষোত্তমদের সঙ্গ করতে পেরেছি এবং সর্বোপরি তাঁরা যে মহান ব্রত উদ্‌যাপন করতে এসেছিলেন তাঁর অংশী হতে পেরেছি।

ঈদৃশ মহাপুরুষগণ পৃথিবীর যথার্থ ভাললোক, অপরিহার্য অমূল্য সম্পদ (Salt of the earth)। তাঁরা নীরবে ঢাক-ঢোল না পিটিয়ে পৃথিবীতে আসেন এবং নিঃশব্দে—রাত্রিতে অদৃশ্য-অশ্রুত শিশির-পতনের মতো সহস্র সহস্র লোককে উন্নততর, স্নেহ-প্রেম-সুকৃতিতে পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ জীবন যাপন করতে সহায়তা করেন।

শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতি*

ডঃ কে. ভি. পুটাপ্পা

(মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপকুলপতি)

যখন স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজী আমাকে পরম পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের কাছে দীক্ষা নেবার পরামর্শ দিলেন, তখন আমি পরমানন্দে তাতে সম্মত হই। কিন্তু আমার এই সম্মতির পেছনে কি কেবল আধ্যাত্মিক প্রেরণাই ছিল? খুব সম্ভব তা-ই ছিল, কারণ এই পূত প্রস্তাবটি সিদ্ধেশ্বরানন্দজীর কাছ থেকে এসেছিল আর এতে ছিল দেশভ্রমণেরও একটা সুযোগ অর্থাৎ বহু নূতন স্থান দেখার ও নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার সম্ভাবনা।

শ্রদ্ধেয় গোপাল মহারাজ (স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দকে আমরা এই নামেই ডাকতাম) বাস্তবিকই আমার জীবনের উদ্ধারকর্তা, তিনিই আমার জীবনকে গড়ে তুলে আঁধার থেকে আলোয় নিয়ে গিয়েছেন। কাজেই তাঁর উপদেশ আমি কোনমতেই উপেক্ষা করতে পারতাম না। বিশেষ করে যখন তিনি আমাকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যদের অন্যতম এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ উচ্চ-আধ্যাত্মিক-শক্তিসম্পন্ন পরম পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের আশীর্বাদলাভের দুর্লভ সুযোগ দিচ্ছেন, তখন কেমন করে আমি এমন একটি অনুরোধ অমান্য করতে পারি?

কিন্তু এই দিব্য সম্পদের মহৎ মূল্যাবধারণ সম্বন্ধে আমি তখন সচেতন ছিলাম কিনা তা আমার জানা নেই। প্রকৃতপক্ষে আমার জীবনে যা কিছু শুভ এসেছে তার কোনটাই আমার চেষ্টার ফলে হয়নি। কোন এক অজানা দৈবানুকম্পা আমার অসামর্থ্য ও ত্রুটি-বিচ্যুতির কিছু পরোয়া না করে এবং কখনো কখনো আমার অহংজনিত ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধেও আমাকে কল্যাণের পথে নিয়ে গিয়েছে এবং এখনও চালিত করছে। সেই একই ঐশ্বরিক কৃপা স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজীর মধ্যে সক্রিয় হয়ে আমাকে পরম পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের পাদপদ্মে নিয়ে গিয়েছিল।

বৃহস্পতিবার, ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ৩ ডিসেম্বর, আমার এক বন্ধু এবং আমি স্বামী

---

* মূল কানাড়া হতে অনূদিত।

সিদ্ধেশ্বরানন্দজীর সঙ্গে মহীশূর আশ্রম থেকে স্টেশনের দিকে যাত্রা করলাম। এই যে ঘটনাটি আমার জীবনে রূপায়িত হতে যাচ্ছিল তার গুরুত্ব সম্বন্ধে আমি তখন সচেতন ছিলাম না। 'সহ্যাদ্রি বনাঞ্চলের' একটি ছোট্ট গ্রামে জন্মগ্রহণ করে আমি মহীশূরে পড়তে এসে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত হই। কিন্তু তখন কোন গুরুর কাছে দীক্ষা নেবার আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। এমন কি এ ধরনের চিন্তাকে আমি অকিঞ্চিৎকর মনে করতাম। বিশেষত বিবেকানন্দের রচনাবলী পড়ে আমি অদ্বৈতবাদ দ্বারা এতটা প্রভাবিত হই যে, মন্ত্রগ্রহণ বা মালাজপ ইত্যাদি আমায় কিছুমাত্র আকর্ষণ করত না। এজন্য আমি দীক্ষা ও যাঁর কাছে দীক্ষা নিতে যাচ্ছি তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহী ছিলাম না। সুতরাং বহুদূরে অবস্থিত অজানা গুরুর প্রতি আকর্ষণ অপেক্ষা নিকটবর্তী স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দের প্রতি আমার অনুরাগই এ ক্ষেত্রে বেশি প্রবল ছিল। বাস্তবিকই স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দের সঙ্গে যদি না দেখা হতো তা হলে আমার জীবনের গতি কোনদিকে মোড় নিত ঠিক বলা যায় না।

স্টেশনে যখন পৌঁছলাম তখন বৃষ্টি শুরু হলো। মনে হচ্ছিল প্রকৃতিদেবী যেন আমাদের আশীর্বাদ করছেন। সবুজ মাঠগুলির হাসি দেখে মনে হচ্ছিল তারা যেন আমাদের শুভযাত্রা জানাচ্ছে। আমরা নগণ্য মানুষ হতে পারি, কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের সেই দেবমানবের মহান শিষ্যের কাছে আমরা যাচ্ছি; সুতরাং এটা যথার্থই উপযোগী ছিল যে, প্রকৃতি আমাদের আশীর্বাদ দেবেন। ব্যাঙ্গালোরে যখন পৌঁছই তখন বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। মাদ্রাজ-মেল তখন ছাড়বার অপেক্ষায়। আমরা তাড়াতাড়ি মালপত্র ওই গাড়িতে ওঠালাম। ব্যাঙ্গালোর আশ্রম থেকে স্বামী সম্বিদানন্দ এবং কয়েকজন ভক্ত আমাদের বিদায় জানাতে এসেছিলেন। তাঁদের আন্তরিক স্বাগত-ভাষণ, আমি বেলুড় মঠে গিয়ে শ্রীগুরুর দর্শন ও কৃপালাভ করব এজন্য তাঁদের আনন্দ ও উল্লাস—আমার মনে একটি গভীর রেখা এঁকে দিল।

প্ল্যাটফর্মে আমার এক পুরাতন অধ্যাপক-বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়। তিনি মাদ্রাজ যাচ্ছিলেন। আমার যাত্রার উদ্দেশ্য জেনে তিনি খুব খুশি হলেন। আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, "আধ্যাত্মিক শিক্ষাগ্রহণের এই উপযুক্ত সময়। পরে গার্হস্থ্য-জীবনে প্রবেশ করলে বাধাবিঘ্নের অন্ত থাকে না। আমারও আধ্যাত্মিক জীবন-লাভের খুব আগ্রহ ছিল, কিন্তু যে দুর্লভ সুযোগ তুমি আজ পাচ্ছ তা আমার জীবনে কখনও আসেনি। যুবাবয়সের আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা পরে ধীরে ধীরে সাংসারিক-জীবনের চাপে পড়ে শুকিয়ে গেল। সত্যি বলতে কি, আমি আজ এজন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত। এমন মহান গুরুর কৃপা পেয়ে তুমি বাস্তবিকই ধন্য হবে।"

বিদায়ের সময় এল। একজন প্রাচীন ভক্ত এগিয়ে এসে স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দের

পাদস্পর্শ করে প্রমাণ করে বললেন, "এ প্রণাম আপনার মারফত পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের উদ্দেশে জানাচ্ছি।"

পরদিন সকালে আমরা মাদ্রাজ পৌঁছে সোজা মাইলাপুরস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে গেলাম। প্রথমে আমরা মন্দিরে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রণাম করলাম। মন্দিরের পবিত্র ও গম্ভীর পরিবেশ মনকে এক উচ্চ ভাবরাজ্যে নিয়ে গেল। যদিও মাদ্রাজ মঠে আমি এই প্রথম এলাম, তবুও মনে হলো আমি যেন এই স্থানের সঙ্গে বহুদিন থেকেই সুপরিচিত। বাস্তবিকই মহীশূরই কি, ব্যাঙ্গালোরই কি অথবা মাদ্রাজই কি, যেখানেই রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুগণ রয়েছেন আমি সর্বদাই তাঁদের সঙ্গে নিবিড় আধ্যাত্মিক আত্মীয়তা অনুভব করেছি।

আমরা মাদ্রাজ মঠে মাত্র দু-দিন ছিলাম। মঠস্থ সাধু ও ব্রহ্মচারিগণ—ঈশ্বরানন্দ, অসঙ্গানন্দ, গণেশ মহারাজ, ইন্দু মহারাজ, পুরুষোত্তমানন্দ—এঁরা সকলেই আমাকে এত স্নেহ করেছেন আর ভালবেসেছেন যে, আমি একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। তাঁরা আমার সঙ্গে এমন মধুর ব্যবহার করেছিলেন যে, মনে হলো আমি যেন একটি ছোটছেলে, বহুদিন পরে মায়ের কাছে ফিরে এসেছি।

আমরা মাদ্রাজে সব আকর্ষণীয় স্থানগুলি দেখলাম। সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হলো সমুদ্র। এই প্রথম আমি সমুদ্র দেখি। আমার কবি-মন এই দৃশ্য দেখামাত্রই আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ল। সমুদ্রের অনন্ত বিশাল বিরাট রূপ প্রকৃতপক্ষে সেই দিব্য গুরুরই বিরাট সত্তার প্রতীক, যে গুরুর সান্নিধ্যে আমি যাচ্ছিলাম।

যেদিন আমরা মাদ্রাজ থেকে রওনা হই, সন্ধ্যারতির পর মাদ্রাজ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী যতীশ্বরানন্দজী আমাকে এই বলে আশীর্বাদ করলেন, "শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ তোমাকে আশীর্বাদ করুন! তুমি যেন মহাপুরুষ মহারাজের কৃপা লাভ করতে পার!"

তারপর দু-দিন চলন্ত ট্রেনই ছিল আমাদের চলতি জগৎ। পথে ঐতিহাসিক স্থান, নদী, নগর, তীর্থস্থান, বিভিন্ন ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি সব কিছু স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং রেল-লাইনের দু-দিকের সবুজ মাঠগুলি আমাদের পরমানন্দ দান করেছিল।

অবশেষে আমরা হাওড়া স্টেশনে পৌঁছলাম। দক্ষিণেশ্বর, বেলুড় মঠ ও গঙ্গা দর্শন করার সম্ভাবনায় আমি পুলকিত হয়ে উঠলাম। সইহাদ্রি বনাঞ্চলের সাধারণ গ্রাম্য ছেলে আমি কলকাতায় এসেছি, যে নগরী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্য-জীবনের পুণ্যস্মৃতির দ্বারা পবিত্র হয়ে রয়েছে! যে পূতসলিলা গঙ্গা, জাহ্নবী, ভাগীরথী প্রভৃতি বিভিন্ন নামে খ্যাতা, তাঁকে দর্শন করার কল্পনায় আমি রোমাঞ্চিত হলাম।

রামনাথ মহারাজ স্টেশনে আমাদের নিতে এসেছিলেন। আমরা একটি ট্যাক্সিতে বেলুড় মঠ অভিমুখে রওনা হলাম। পথে আমি ব্যগ্র হয়ে এই প্রসিদ্ধ 'প্রাসাদনগরীর' (যেমন আমি বাল্যকালে ভূগোল পড়ে জেনেছিলাম) দিকে চেয়েছিলাম। অকস্মাৎ স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ বলে উঠলেন, "জয় শ্রীগুরু মহারাজজীকী জয়। ওই যে বেলুড় মঠ দেখা যাচ্ছে।" আবার সাধুগণের প্রেমপূর্ণ স্বাগত-ভাষণ। আমার মনে হলো আমি যেন একটি ছেলে, বহুদিন পর বাবার কাছে প্রবাস থেকে ফিরে আসছি।

আমরা অতিথিশালায় গিয়ে মালপত্র রেখে স্বামী শর্বানন্দ এবং স্বামী অনন্তানন্দের সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁদের প্রণাম করে আমরা গেলাম স্নান করতে। পরে তৈরি হয়ে স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দের সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী বিবেকানন্দের মন্দির দর্শন করলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্য প্রতিকৃতির সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই মনের আবেগে আমি সম্পূর্ণরূপে অভিভূত হয়ে পড়লাম। এখানেই স্বামী বিবেকানন্দ নিজে মাথায় করে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পবিত্র ভস্ম—'আত্মারামের কৌটা' এনেছিলেন এবং স্থাপন করেছিলেন। মনের আবেগে আমার সারা শরীর কাঁপছিল। আমি বারংবার লুটিয়ে পড়ে নিজেকে ধন্য মনে করলাম।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে অনেক বই পড়া সত্ত্বেও আমি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যদের মহত্ত্ব বিষয়ে খুব অল্পই জানতাম। স্বামী বিবেকানন্দই আমার অন্তর জুড়ে ছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবকেও স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদাতা গুরু হিসাবেই মহান বলে ভাবতাম। সেজন্য আমি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ শিষ্যদের মহত্ত্বের সম্বন্ধে বিশেষ অবগত ছিলাম না। আমাদের পক্ষে স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন নিকটতম সূর্য এবং স্বামী শিবানন্দ মহারাজ ছিলেন দূরতম তারকা। সৌভাগ্যক্রমে স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ দূরবীক্ষণরূপে এই দূরতম তারকাকে পূর্ণ মহিমায় দর্শন করতে আমাকে সাহায্য করেছিলেন। এখন ভাবি, যদি স্বামী শিবানন্দজীও জ্বলন্ত সূর্য হতেন তাহলে কি আমি তাঁর সান্নিধ্যে যেতাম?

বিকাল তিনটা নাগাদ আমি, আমার বন্ধু মানাপ্পা ও সিদ্ধেশ্বরানন্দজী পরম পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজকে দর্শন করতে গেলাম। একপ্রকার ভীতিবিহ্বল আনন্দের প্রতীক্ষায় আমার অন্তর পূর্ণ ছিল। স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ আমাকে পূর্ব হতেই শিখিয়ে দিয়েছিলেন মহাপুরুষজীর ঘরের ভিতর ঢুকে আমাকে কি করতে হবে এবং সেখানে আমি কি রকম ব্যবহার করব। সিঁড়ি দিয়ে উঠে তাঁর পেছনে পেছনে আমি মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে প্রবেশ করলাম। বোধ হলো—আমি এমন একস্থানে প্রবেশ করছি যা প্রশান্ত নীরবতা ও গভীর ধ্যানের ভাবে পরিপূর্ণ।

পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ করুণা ও প্রেমের মূর্ত-বিগ্রহরূপে একটি আরাম

কেদারায় অতি সাধারণভাবে উপবিষ্ট। তাঁর দিব্যসত্তা এমন মনোমুগ্ধকর ছিল যে, অজ্ঞাতসারেই আমি হাতজোড় করে তাঁর পাদপদ্মে প্রণত হলাম।

মহাপুরুষজীকে কিছুটা ক্লান্ত দেখাচ্ছিল—তা মনে হয় তাঁর বার্ধক্যের জন্য অথবা দীর্ঘকালব্যাপী অসুস্থতার জন্য। কিন্তু তাঁর মুখমণ্ডল স্নেহে পূর্ণ ছিল। মনে হলো আমি যেন আমার মায়ের কোলে ফিরে এসেছি। তাঁর সার্বভৌম উদার বিরাট ব্যক্তিত্বের সামনে আমার ক্ষুদ্র অহং ও জীবনটাই খুব ছোট দেখাচ্ছিল। তাঁর সামনে নিজেকে খুব তুচ্ছ বোধ হলো।

কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে আমি ঘরের চারদিকে চেয়ে দেখলাম। ঘরের সাধারণত্ব ও আড়ম্বরহীনতা আমার মনে একেবারে গেঁথে গিয়েছিল। দেয়ালে চার পাঁচখানা ছবি এবং ঘরের একদিকে একখানা কাঠের খাট অন্যদিকে ছোট টেবিলের উপর কিছু বই। আর কিছুই নেই।

স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ প্রথমে মহাপুরুষজীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেন। তারপর আমার বন্ধু মানাপ্পাও পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করে শ্রীচামুণ্ডেশ্বরীর একখানা রৌপ্য প্রতিমূর্তি দিল। সবশেষে আমি ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে তাঁকে এক প্যাকেট 'চন্দন-ধূপ' নিবেদন করলাম।

পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ স্মিতমুখে আমাদের আশীর্বাদ করলেন। স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ আমাদের পরিচয় দিয়ে বললেন, "এরা দু-জন আপনার আশীর্বাদ ও শ্রীচরণে আশ্রয় পাবার জন্য ব্যাকুল। কৃপা করে এদের আশীর্বাদ করুন।"

তখন অহংশূন্য মহাপুরুষ মহারাজ অতি মধুর কণ্ঠে বললেন, "আমি কে, আমি কে, আমি কে? শ্রীগুরুমহারাজই সব। সব কিছুই তিনি। আমি কে? তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হোক!" এই কথাগুলি বলেই মহাপুরুষজী অর্ধমুদ্রিত অন্তর্মুখ হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর চোখ মেলে তিনি আমাদের দিকে হাস্যদীপ্ত দৃষ্টিতে চাইলেন এবং বললেন, "আমি কি জানি? আমি কি জানি? আমি শুধু ঠাকুরের আজ্ঞা পালন করি।"

সত্যসত্যই তাঁর কথার অর্থ বা তাঁর আত্মস্থ ভাব আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। শুধু ভাবলাম, মহাপুরুষগণ বিনয় করে এভাবেই সচরাচর বলে থাকেন। মহাপুরুষজীর কথার পুরো অর্থ আমি অনেক পরে বুঝতে পারি যখন স্বামী অপূর্বানন্দজীর 'শিবানন্দ-বাণী' এবং 'যাঁরা ঈশ্বরকে খোঁজেন তাঁদের জন্য' (For Seekers of God)—এই দু-খানা বই কানাড়া ভাষায় অনুবাদ করার সুযোগ পাই। সে সময় আমাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যান করতে হতো এবং সেই ধ্যানের সময় আমি অনুভব করেছি যে, কেমন করে মহাপুরুষ মহারাজ নিজের 'অহংকে' এমন

সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলেছিলেন এবং কেমন করে নিজের ক্ষুদ্র আমিত্বকে পরিপূর্ণরূপে বিলীন করতে পেরেছিলেন বিরাট-আমিত্বের মধ্যে; তাইতো তিনি ঐভাবে কথাগুলি বলতে পেরেছিলেন।

মহাপুরুষজী আমাদের নাম জিজ্ঞেস করলেন। নাম শুনে বেশ জোরে দু-বার বললেন, "পুটাপ্পা—মানাপ্পা, পুটাপ্পা—মানাপ্পা।" আমার বাস্তবিকই তা খুব কৌতুককর বোধ হচ্ছিল। কিন্তু আজ আনন্দের শিহরণ জাগে। মহাপুরুষজীর শ্রীমুখে আমার সামান্য নামটি! মা যেমন তাঁর বুকে-হাঁটা শিশু সন্তানকে স্নেহভরে কোলে তুলে নেন, তেমনি তিনিও আমাদের দু-জনের নাম উচ্চারণ করে তাঁর ক্রোড়ে আদরে তুলে নিলেন। সেদিন আমি ডায়েরিতে লিখলাম, "মহাপুরুষজীকে দর্শন করে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে এক ঝলক দেখা যায়। তিনি যথার্থই ঠাকুরের প্রতিনিধি। যখন কেউ তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ান তখন সে অনুভব করে যে, সে বিশাল সমুদ্রের মতোই এক বিরাট ব্যক্তিত্বের পাশে দাঁড়িয়ে।"

পরে আমরা মহাপুরুষজীর সেবকের কাছ থেকে জেনে নিলাম যে, আমাদের দীক্ষার তারিখ ও সময় পরদিন সকালে নির্ধারিত হয়েছে। স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ আমাদের স্বামী বিবেকানন্দের প্রকোষ্ঠে নিয়ে গেলেন। যখন আমি সেই ঐতিহাসিক প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করলাম, আমার বোধ হলো আমি যেন এক মহাপবিত্র স্থানে পদার্পণ করছি। স্বামীজীর জীবনের শেষ দিনটিতে যেমন সজ্জিত ছিল, প্রকোষ্ঠটি ঠিক তেমনি রাখা হয়েছে। এজন্য দর্শকদের মনে হয় স্বামীজী যেন কিছুক্ষণের জন্য বাইরে গিয়েছেন মাত্র, আবার এখনই ফিরে আসবেন। স্বামীজীর পাদুকায় প্রণাম করে আমি প্রকোষ্ঠের চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম। ঘরের একদিকে তাঁর ব্যবহৃত খাট চেয়ার ও টেবিল যথাযথভাবে রাখা রয়েছে। বুদ্ধের একটি ধ্যানমূর্তি ঘরের গাম্ভীর্য বৃদ্ধি করছিল। স্বামীজীর তানপুরা, ছাতা ও ছড়ি নীরব সাক্ষীর মতোই দাঁড়িয়েছিল। দেয়ালে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামীজীর দু-খানা বৃহৎ তৈলচিত্র যেন তীর্থযাত্রীদের আশীর্বাদ করছিল। বিছানায় রাখা স্বামীজীর সুন্দর প্রতিকৃতিখানি প্রভূত প্রভাব বিস্তার করছিল। স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ আমাকে কানে কানে বললেন, "স্বামীজী এ খাটে কখনও শুতেন না। তিনি সব সময় ঘরের মেজেতে মাদুরে শুতেন।" আমরা বারান্দায় গেলাম। আহা, কি সুন্দর দৃশ্য!—গঙ্গায় তখন জোয়ার খেলছে! বর্ষার দরুন গঙ্গার জল ঘোলাটে। বহু নৌকা ও স্টিমার চলছে। নদীর দু-পারে সবুজ বৃক্ষরাজির ফাঁকে ফাঁকে বড় বড় বাড়ি। দূরে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের চূড়াগুলি দেখতে পাচ্ছিলাম। সত্যসত্যই স্বামীজী কি সুন্দর স্থানই না মঠের জন্য বেছে নিয়েছিলেন!

তখনই সন্ধ্যারতির শঙ্খ-ঘণ্টা বেজে উঠল, সুতরাং আমরা সবাই ঠাকুরমন্দিরে

গেলাম। দুগ্ধশুভ্র শ্বেতপ্রস্তরের মেজের মাঝখানে ছোট একটি সিংহাসনে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের সুন্দর প্রতিকৃতি। এত আড়ম্বরহীন অথচ এমন দিব্য! কয়েকজন সন্ন্যাসী দুর্গামণ্ডপটি সাজাচ্ছিলেন; তাঁরা সবাই এসে আরতির জন্য আসন গ্রহণ করলেন।...

আরতির পর আমি দুর্গাপ্রতিমার কাছে গেলাম। সত্যিই প্রতিমাখানি অপূর্ব। এই প্রথম আমি দুর্গাপ্রতিমা দেখলাম, সুতরাং বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। দুর্গার দু-দিকে লক্ষ্মী ও সরস্বতী, একপাশে গণেশ ও অন্যপাশে সুব্রহ্মণ্যম্ (কার্তিক)। এঁরা সবাই কি সুন্দর! এমন কি উজ্জ্বলচক্ষুযুক্ত মহিষাসুরের মূর্তি, সিংহ, সাপ—সব কিছু একেবারে জীবন্ত। দুর্গার মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁকে ভীষণা বলে মনে হলো না। মনে হলো মা যেন তাঁর সন্তানদের দিকে তাকিয়ে হাসছেন।

সেখান থেকে আমি একলাই গঙ্গার ধারে বেড়াতে গেলাম। সারাদিনের বিভিন্ন ঘটনাবলীর কথা আমি ভাবছিলাম। মনে হচ্ছিল এসব ঘটনা পরবর্তী দিবসের আধ্যাত্মিক ঘটনারই প্রাক্‌কালীন প্রস্তুতি।

পরদিন ৮ অক্টোবর, ১৯২৯, আশ্বিন—শুক্লা ষষ্ঠী। স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ ভোরে আমাকে বললেন, "আজ সত্যিই খুব শুভদিন। আজ থেকেই শারদীয়া দুর্গাপূজা শুরু হবে। তুমি তো কবি—আজকের দিনটিতে দীক্ষাগ্রহণ তোমার পক্ষে গভীর তাৎপর্য ও অর্থপূর্ণ।"

কথাগুলি শুধু স্তোকবাক্য ছিল না। আজ ৩৮ বছর পর যখন আমি এই কথাগুলি লিখছি, আমি এই কথার তাৎপর্য ও অর্থ পুরোপুরিই বুঝতে পারছি। বাস্তবিক সেদিন আমি যে আশীর্বাদ পেয়েছিলাম, তাই আমাকে জীবনের সব ঝড়-ঝঞ্ঝার মাঝে হাত ধরে নিয়ে গিয়েছে এবং আমাকে বহু উচ্চ সাহিত্যিক-কৃতির যন্ত্রস্বরূপ করে আমার জীবনকে ধন্য করেছে!*

তারপর আমার দীক্ষার কথা! সেই অপূর্ব আনন্দময় অনুভূতি কোন বাক্যরাশি প্রকাশ করতে পারে? বাক্যগুলি তো এ বস্তুর পবিত্রতা, শুদ্ধতা ও শুচিতা নষ্ট করে ফেলবে। সুতরাং আমি বরং বলব, যে এ অনুভূতি ব্যাখ্যার অতীত; আমার দিনপঞ্জী থেকে উদ্ধৃত করে বলছি, "আজ সত্যই সবচাইতে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ দিন! আজ আমি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের কাছ থেকে দীক্ষালাভ করেছি। কিন্তু এ বিষয়টি গোপন রাখতে হয়, সেজন্য আমি আর বেশি কিছু লিখতে চাই না।"

---

* সম্প্রতি লেখকের কানাড়া ভাষায় রচিত 'শ্রীরামায়ণদর্শনম্' মহাকাব্যখানি ১৯৬৮ সালের 'জ্ঞানপীঠ এওয়ার্ড'রূপে পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার পেয়েছে।

মহাকাব্যটি 'অমিত্রাক্ষর ছন্দে' পঁচিশ হাজার শ্লোকে রচিত এবং ৮৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। গ্রন্থখানির ৩য় সংস্করণ চলছে।—সংকলক

দীক্ষা সম্বন্ধে মহাপুরুষজী স্বয়ং বলেছেন, “দীক্ষাদানের ব্যাপারে আমরা ভট্চায বামুনদের পদ্ধতি অনুসরণ করি না। আমরা কোন বড় তন্ত্র-মন্ত্রও জানি না এবং এ-ও বিশ্বাস করি যে, তার কোন প্রয়োজন নেই। আমি কেবল ঠাকুরকেই জানি। তিনি আমার সব কিছু। তাঁরই নাম, তাঁরই শক্তি। তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ীই সবাইকে তাঁর নাম দিই এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাই—'ঠাকুর, দয়া করে এদের গ্রহণ কর। এদের বিশ্বাস ও ভক্তি দাও, আর আশীর্বাদ কর'।” (শিবানন্দ-বাণী—স্বামী অপূর্বানন্দ) মহাপুরুষজী মন্ত্র সম্বন্ধে আরও বলেছেন, “মন্ত্রের অর্থ কী? মন্ত্র হলো ভগবানের নাম। প্রতি মন্ত্রের সঙ্গে যে বীজটি বলা হয় তা ভগবানের নানা রূপের প্রকাশকেই তো বোঝায়। বীজ এবং নাম মিলে হয় মন্ত্র। মোটের উপর মন্ত্রজপ এমন এক প্রক্রিয়া, যার দ্বারা আমরা ভগবানকে স্মরণ করতে পারি। যখন কেউ মন্ত্রজপ করে তখন সে বাস্তবিক ভগবানকেই ডাকে।” ('শিবানন্দ-বাণী'—স্বামী অপূর্বানন্দ)

গুরুর পদমর্যাদা ও দীক্ষাদান-পদ্ধতি সম্বন্ধে একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা রয়েছে। পূজনীয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য সাক্ষাৎ শিষ্যেরা কাশীতে কখনও দীক্ষা দিতেন না। মহাপুরুষজী কিন্তু এ নিয়মের ব্যতিক্রম করেছিলেন। জনৈক সেবক এ বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করতে তিনি বলেন, “দেখ, আমি যে দীক্ষা দিচ্ছি—এ ভাব আমার মনে কখনও আসে না। ঠাকুরের কৃপায় 'গুরুবুদ্ধি' আমার মনে কখনও প্রবেশ করেনি। জগদ্গুরু একমাত্র সেই শিব, মহাদেব। এ যুগে বিশ্বগুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেব। তিনিই ভক্তদের প্রেরণা দিয়ে এখানে পাঠান। আর তিনিই আমার হৃদয়ে বসে দীক্ষা দেন। তিনি আমায় যেভাবে চালান, আমি সেভাবেই চলি। ঠাকুরই আমার—'অন্তরাত্মা'।” ('শিবানন্দ-বাণী'—স্বামী অপূর্বানন্দ)

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একজন অন্তরঙ্গ পার্ষদ এবং ঈশ্বরকল্প মহাপুরুষের কাছ থেকে দীক্ষালাভ করা একটি দুর্লভ বস্তু, যা বলে বোঝানো যায় না এবং যার পূত প্রভাব কেবল গভীর ধ্যানের দ্বারাই উপলব্ধি করা যায়।

দীক্ষালাভের পর দুর্গাপূজার শেষ পর্যন্ত আমরা বেলুড় মঠে থাকি। ভৌগোলিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে বিচার করলে আমরা মহাপুরুষ মহারাজের কৃপাবৃক্ষে ঠিক পক্ষিশাবকের মতোই ছিলাম। সেই মহান গুরুর পূতচরণে আমার আশ্রয়লাভের পর স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দের আর আনন্দের অবধি রইল না। তিনি আমাদের শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিপূত দক্ষিণেশ্বর প্রভৃতি কলকাতার বিশেষ বিশেষ স্থানগুলি এবং মাস্টার মহাশয় (শ্রীম) ও পূজনীয় স্বামী অভেদানন্দজীর মতো মহাত্মাদের দর্শন করালেন। এতে আধ্যাত্মিক অনুভূতির দিক দিয়ে আমরা আরও বেশি লাভবান হলাম। তাছাড়া স্বামী শাশ্বতানন্দ ও স্বামী বিজয়ানন্দের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুর, মাইকেল মধুসূদন ও নজরুল ইসলামের বিখ্যাত সাহিত্য-রচনাবলী মূল বাংলায় শুনবার সুযোগলাভ করেছিলাম, যা আমার কবি-মনের উচ্চ আশাকে প্রচুর আনন্দ দান করেছিল। বেলুড় মঠে থাকার সময় আমরা মহাপুরুষ মহারাজকে চার-পাঁচ বার দর্শন করার দুর্লভ সুযোগ পেয়েছিলাম; তাঁর শারীরিক অসুস্থতার দরুন আমরা তাঁর সঙ্গে বেশি কথা বলতে পারিনি। কিন্তু যখনই তাঁর সান্নিধ্যে গিয়েছি তখনই তিনি আমাদের মায়ের মতোই স্নেহ করেছেন এবং ব্যগ্র হয়ে আমাদের স্বাস্থ্য ও আহারাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করতেন। আমরা দক্ষিণ ভারতীয় বলে আমাদের বাঙালি খাদ্যাদি সহ্য হচ্ছে কিনা, তিনি খুঁটিয়ে জানতে চাইতেন।

শেষবারের মতো যখন মহাপুরুষজীকে প্রণাম করতে গেলাম তখন তিনি আমাদের সবাইকে আন্তরিক স্নেহ-ভালবাসার সঙ্গে আশীর্বাদ করে বললেন, "শ্রীগুরুমহারাজ সর্বদাই তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন।"

এক জ্ঞানালোকমণ্ডিত চেতন-মন ও দিব্য-উপস্থিতির ভাব নিয়ে আমি যখন মহীশূরে ফিরে এলাম, তখন সবসময়ই মানসিক এবং আধ্যাত্মিক দু-দিক দিয়েই অন্যান্যের তুলনায় নিজেকে অধিকতর সম্পন্ন বোধ করতাম। কথাপ্রসঙ্গে আমি যখন জনৈক বয়োজ্যেষ্ঠকে এ বিষয়ে বলি তখন তিনি বললেন, "হাঁ, দীক্ষার পর এ রকমই মনে হয়; যখন চেতন-মন ঊর্ধ্বগামী হয় তখন এমনই হয়।"

এতে কি কোনও সন্দেহ আছে যে, মহাপুরুষজী আমার চেতন-মনকে জাগরিত করে ঊর্ধ্বে নিয়ে গিয়েছেন? একবার কথোপকথনকালে মহাপুরুষজী বলেছিলেন, "যারা ঠাকুরকে দেখেনি, কিন্তু আমাদের দেখেছে, তারাও ধন্য; কারণ আমরা তাঁরই অংশ।"

তা বলে কেউ যেন ভাববেন না যে দীক্ষার পর আমার জীবন কোন জোয়ার-ভাঁটা ছাড়াই কল্যাণের পথে সোজা এগিয়ে গিয়েছে। যে কোন সাধারণ মানুষের মতো আমাকেও জীবনের ওঠা-পড়ার সম্মুখীন হতে হয়েছে। আমাকে শারীরিক কষ্ট ও ইন্দ্রিয়সুখের সামনে দাঁড়াতে হয়েছে। পরাজয়ে আমি ভেঙে পড়েছি এবং জয়ে উন্নত বোধ করেছি; কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমি খুঁটি ধরে রয়েছি—যেমন ছেলেরা খেলার সময় করে। এই খুঁটি ছিল শ্রীগুরুমহারাজ, শ্রীরামকৃষ্ণের নাম এবং আমার গুরুদেবের পূত পাদপদ্ম। এঁরাই আমাকে সর্বদা রক্ষা করেছেন এবং যখনই বিপথগামী হয়েছি তখনই সৎপথে চালিয়ে নিয়েছেন।

একবার কোন ব্যক্তি জনৈক ভক্তের পূর্ব অসৎ জীবনের প্রতি মহাপুরুষ মহারাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে তিনি বলেছিলেন, "তুমি বলছ সে আগে খুব

অসৎ জীবন যাপন করেছে। কিন্তু যা অতীত তা তো হয়েই গিয়েছে। এখন তো সে এখানে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূতচরণে আশ্রয় নিয়েছে। তার যত পাপ সব ধুয়ে যাবে। ঠাকুর ভাগ্যবিধাতা 'কপালমোচন'। তিনি সব কিছুই মুছে দিতে পারেন। এ ব্যক্তি যুগাবতারের চরণে আশ্রয় নিয়েছেন—এটা কি কম কথা! শুভসংস্কার ছাড়া এটি হবার জো নেই। গুরুমহারাজ তাকে রক্ষা করবেন। তাঁর কাছে কোন পাপই বড় নয়। তিনি অন্তর্যামী। তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান জানেন। সে যখন তাঁর কাছে নিজের পাপ স্বীকার করেছে, তখন নিশ্চয়ই জানবে সে সব পাপ থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছে।"

হাঁ, তিনিই ঘোষণা করেছেন ঃ পূর্বজন্মের শুভ-সংস্কার ছাড়া এমন অলৌকিক ব্যাপার ঘটতে পারত না!—কেরলের কোন এক স্থানে জন্মগ্রহণ করে কর্ণাটকের কোন এক প্রান্তে জাত একজনকে সঙ্গে নিয়ে বঙ্গদেশের কোন স্থানে অবতীর্ণ এক সুমহান গুরুর শ্রীচরণে উপস্থিতি!!!

ওঁ তৎসৎ

শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতিকথা*

ডঃ টি. এম. পি. মহাদেবন

১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে পরম পূজ্যপাদ শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ অপার করুণাভরে দীক্ষাদান করে আমাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্যগোষ্ঠীভুক্ত করলেন; তখন আমার সবে মাত্র তের বছর বয়স। আমার জীবনের এই অপূর্ব ঘটনাটিকে পূর্বের বহুজন্মসঞ্চিত সুকৃতির ফল বলেই মনে করি এবং এ জীবনের আটবছর বয়সকালে এই কৃপাগ্রহণের প্রস্তুতি শুরু হয়।

সেটি ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা। আমার মাসিমা (মায়ের বড় বোন এবং আমার ধাত্রী-মা) আমাদের বাসস্থানের কাছেই একটি আড়ম্বরহীন গৃহে আমাকে নিয়ে গেলেন। সেখানে একটি বেদির উপরে সৌম্যদর্শন একজন মহাত্মার একটি বড় প্রতিকৃতি রয়েছে দেখলাম; তিনি সুখাসনে উপবিষ্ট, তাঁর মুখমণ্ডল দীপ্ত, অর্ধনিমীলিত দুই নেত্রে প্রশান্তি, মুখে অল্প দাড়ি, পরিধানে হাঁটু অবধি বস্ত্র এবং

* ইংরেজির অনুবাদ

কাপড়ের একাংশ বাঁ কাঁধের উপর ফেলে রাখা—যার প্রান্তভাগ তাঁর কোমরের ডানদিকে এসে পৌঁছেছে। পরে জেনেছিলাম ইনিই শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে সেই প্রথম দর্শনেই আমার বালক-মন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগী হয়ে পড়ল এবং শ্রীমহাপুরুষজীর শিষ্য নবীন সন্ন্যাসী স্বামী রাজেশ্বরানন্দজীও স্নেহভরে আমার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বেদান্তের প্রতি এক আশ্চর্য গভীর অনুরাগ সঞ্চারিত করলেন। তিনি 'শ্রীসচ্চিদানন্দ সঙ্ঘ'-প্রতিষ্ঠার অল্প কিছুদিন পরই 'অন্নদান-সমাজে' সাপ্তাহিক ধর্মগ্রন্থপাঠের প্রবর্তন করেন। এর পরিচালক ছিলেন মাইলাপুরস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী শর্বানন্দ। প্রতি রবিবার সকালে তিনি বিভিন্ন যোগ সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের ভাষণগুলি আলোচনা করতেন। প্রতি রবিবার পাঠ শুরু হওয়ার আগে আমি আবাহন-মন্ত্র পাঠ করতাম।...

১৯২২ খ্রিস্টাব্দে মাইলাপুরে অবস্থিত রামকৃষ্ণ-মিশন ছাত্রাবাসে আমি প্রবেশ লাভ করি। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে ছাত্রাবাসের মুখ্য ভবনটির দ্বার-উদ্ঘাটন করেন। তাঁর সঙ্গে শ্রীমহাপুরুষজীও মাদ্রাজে এসেছিলেন। আমি এই স্মরণীয় ঘটনাটির কথা জানতাম। কিন্তু তখন খুবই ছোট থাকার দরুণ মাইলাপুরে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের এই দু-জন মহান শিষ্যের দর্শনলাভের সুযোগ আমার হয়নি। কিন্তু যেমন পূর্বেই বলেছি, ঠিক এর পরের বছর ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে এই দুই মহাপুরুষের স্পর্শপূত ছাত্রাবাসে যোগদান করি। সেই বছরেই ওই ভবনে আবাসিক উচ্চ-বিদ্যালয় খোলা হয়। আমি উচ্চ-বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে ভরতি হই।

১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ আমার জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ ওই বছর পুনরায় মাদ্রাজে শুভাগমন করেন। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর মহাসমাধির পর শ্রীমহাপুরুষজী রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষপদে সমাসীন হন। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজ এই মহর্ষিকে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন্ত প্রতিচ্ছবিরূপে স্বাগত জানাল। মাইলাপুর মঠে পৌঁছবার অল্পদিন পরেই তিনি রামকৃষ্ণ মিশন ছাত্রাবাসে আমাদের (ছাত্রদের) আশীর্বাদ করতে শুভাগমন করেন। ছাত্রাবাসের প্রতিষ্ঠাতা কর্মসচিব স্বর্গীয় রামস্বামী আয়েঙ্গার আমাদের শ্রীমহাপুরুষজীর সান্নিধ্যে নিয়ে গেলেন। আমরা সবাই পরপর শ্রীমহাপুরুষজীকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে তাঁর আশীর্বাদলাভে ধন্য হলাম। যদিও তখন আমার বয়স ছিল খুব কম, তথাপি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি গভীর ভক্তির পটভূমিকায় আমি একটা পবিত্র পরিবেশ অনুভব

করি। শ্রীমহাপুরুষ মহারাজকে দর্শন করেই মনে হলো তিনি ঋষিত্বের প্রতিচ্ছবি; তাঁর নির্মল ও প্রশান্ত মুখমণ্ডলে প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণের পূত আধ্যাত্মিকতার পূর্ণতা প্রতিবিম্বিত। কোমলতায় ভরা ছিল তাঁর কৃপাদৃষ্টি। তাঁর সান্নিধ্যে মানুষের মন আপনা হতেই এক উচ্চস্তরে উন্নীত হতো। এটি একটি নিবিড় ও আশ্চর্য অনুভূতি— যার মহিমা ফুটিয়ে তোলার মতো শব্দসম্ভার আমার নেই।

শ্রীমহাপুরুষজীর এই স্মরণীয় পরিদর্শনের কয়দিন পরই ছিল একাদশী তিথি। আমরা (ভবনের সব ছাত্ররা) যথারীতি সন্ধ্যায় রামনাম-সঙ্কীর্তনে যোগ দিতে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে গেলাম। মঠে প্রধান হলঘরটিতে এই সংকীর্তন হতো। হলঘরটির সামনাসামনি পশ্চিমে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির। এ ছাড়া অন্য তিন দিকে বারান্দা। বারান্দা থেকে শ্রীমহাপুরুষজীর সঙ্গে বেলুড় হতে আগত জনৈক সন্ন্যাসী মহারাজ আমাকে দেখছিলেন। মনে হয়, প্রায় বেশির ভাগ সময়ই আমি চোখ বুজে বসে ধ্যান করছিলাম। রামনাম-সঙ্কীর্তন শেষ হবার পর সেই সন্ন্যাসী মহারাজ আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং অনাস্বাদিতপূর্ব স্নেহ-সহকারে আমাকে স্বাগত জানালেন। বাহ্যত আমরা ছিলাম অপরিচিত। কিন্তু অন্তরের গভীরে অনুভব করলাম যেন সন্ন্যাসী মহারাজের সঙ্গে কত কালের ঘনিষ্ঠ পরিচয়! তিনি শ্রীমহাপুরুষজীর একনিষ্ঠ সেবক বলে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের অশেষ করুণাবশেই তিনি যেন আমাকে বেছে নিয়ে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। পরদিন একা আসতে সেবক মহারাজ আমাকে বলে দিলেন। তাঁর আদেশানুযায়ী আমি পরদিন মাদ্রাজ মঠে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি আমাকে শ্রীমহাপুরুষজীর দিব্য-সান্নিধ্যে নিয়ে গিয়ে আমার সম্বন্ধে বাংলাতে কিছু বললেন। শ্রীমহাপুরুষজী স্মিতমুখে ও করুণাপূর্ণ নয়নে আমাকে আশীর্বাদ করলেন। সেই দিন থেকে আমি প্রত্যহই মঠে যেতাম। সেবক মহারাজ শ্রীমহাপুরুষজীকে নিবেদিত প্রসাদী মিষ্টি আমাকে খাওয়াতেন; এবং ঐ সুযোগে আমি শ্রীমহাপুরুষজীর পূত সান্নিধ্যে প্রতিদিনই কিছুক্ষণ করে থাকার সৌভাগ্য লাভ করতাম। শ্রীমহাপুরুষজী ও তাঁর সঙ্গীরা উতকামণ্ড অভিমুখে যাত্রা করা অবধি কিছুদিন এভাবে চলেছিল।

উতকামণ্ড ও বাঙ্গালোর প্রভৃতি স্থান পরিদর্শনান্তে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে শ্রীমহাপুরুষজী মাদ্রাজে প্রত্যাবর্তন করে রামকৃষ্ণ-মিশন বিদ্যার্থী ভবনের আবাসিক উচ্চ-বিদ্যালয়ের উৎসর্গানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্র আমাদের পক্ষে ঐ অনুষ্ঠানটি ছিল খুবই চিত্তাকর্ষক ও তাৎপর্যপূর্ণ। উৎসর্গানুষ্ঠানের পর একদিন শ্রীমহাপুরুষজী আমাকে কৃপাপূর্বক দীক্ষা প্রদান করেন। মাইলাপুরস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ঠাকুর-মন্দিরে পরমদয়াল শ্রীগুরুর কাছে দীক্ষালাভ করি। এই ভাবগম্ভীর

অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত প্রতিটি খুঁটিনাটির প্রতি সেবক সন্ন্যাসিগণ সস্নেহ দৃষ্টি রেখেছিলেন। তাঁদের অনুপম স্নেহ ছাড়া এই অপূর্ব সৌভাগ্য ও বিশেষ অধিকার আমি কোনমতেই লাভ করতে পারতাম না। শ্রীশ্রীঠাকুরের পূত প্রতিকৃতির সামনে মহান গুরু এবং বিনীত শিষ্য উপবিষ্ট—কেবল এটুকুই এখন আমার মনে পড়ে। গুরু মন্ত্রোচ্চারণ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে শিষ্য তিনবার তা পুনরাবৃত্তি করল। এক তেজোময় আধ্যাত্মিকতায় ঠাকুরঘরটি পূর্ণ হলো। আমি অনুভব করলাম—আমার সম্মুখে উপবিষ্ট শ্রীগুরু মূর্তিমতী দয়া ও করুণার জীবন্ত বিগ্রহ। অন্যান্য দীক্ষার্থীদের মতো আমাকেও গুরুদেব শ্রীমহাপুরুষজী এই উপদেশ দিয়েছিলেন ঃ "জপ ও ধ্যান কর; ঠাকুর তোমার মুক্তিদাতা।" আমি প্রতিদিন মঠে আসা অব্যাহত রেখেছিলাম। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে যখন শ্রীমহাপুরুষজী বোম্বাই অভিমুখে যাত্রা করলেন, আমি সেন্ট্রাল স্টেশনে গিয়ে রেলের কামরায় ঢুকে গুরুদেবকে প্রণাম করে বিদায় নিলাম।

নিয়মিত দিনপঞ্জী (ডায়েরি) লেখার অভ্যাস আমার কখনই ছিল না। মাঝে মাঝে স্মরণীয় ঘটনা আর কাজের কথাগুলি আমি লিখে রাখতাম। গোড়ার দিকে কয়েক বছরের মধ্যে কেবল এক বছরের ডায়েরি এখন আমার কাছে আছে—তা হলো ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের। সে বছরের ৬ জানুয়ারি তারিখে লেখা রয়েছে—"ধ্যান করলাম এবং ভোর ৪-৫৫ থেকে ৫-৩০ পর্যন্ত শ্রীগুরুমহারাজের (শ্রীশ্রীঠাকুরের) জীবনী পাঠ করলাম।" কয়েকদিন পূর্বেই গুরুদেবের সন্ন্যাসী সেবক আমাকে একখানা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী—'The Life of Sri Ramakrishna' পাঠিয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর লেখা ভূমিকাযুক্ত ঐ গ্রন্থখানি তখন সদ্য প্রকাশিত হয়েছে। বেলুড় মঠ থেকে এই বইখানা ডাকে পাঠানো হয়েছিল গুরুদেব শ্রীমহাপুরুষজীর আশীর্বাদসহ। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ৬ জানুয়ারি থেকে আমি বইখানি পাঠ করতে শুরু করি। প্রতিদিন ভোরে ছাত্রাবাসের ঠাকুরঘরের সামনের বারান্দায় বসে জীবনীটি পাঠ করতাম। আমার এখনও মনে পড়ে—যে সাধারণ জগতে আমরা সচরাচর বাস করি তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের এক জগতের সন্ধান পেয়েছিলাম ঐ জীবনী-গ্রন্থে। আমার কিশোর-কল্পনায় আমি নিজেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে একাত্মানুভব করতাম এবং সমগ্র দিব্য নাটকটি আমার মানসনেত্রের সম্মুখে পুনরভিনীত হতো। ২৩ মার্চ, ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে আমার দিনপঞ্জীতে লেখা রয়েছে ঃ "শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনচরিত (The Life of Sri Ramakrishna) পাঠ করা শেষ হলো।" এটি সুস্পষ্ট যে, মাত্র ষোল বছর বয়সেই আমি ঐ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনীটি পাঠ করতে, বুঝতে ও উপভোগ করতে পেরেছিলাম শ্রীমহাপুরুষজীর অপার করুণায়। আমার দিনপঞ্জী থেকে এও জেনেছি যে, আমি

শ্রীমহাপুরুষজীর নিকট চিঠিও লিখতাম; এবং ৭ মার্চ, ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর কাছ থেকে একখানি চিঠিও পাই। তাঁর মতো মহাপুরুষ যে আমাকে চিঠি লিখেছিলেন, তা থেকেই বোঝা যায় ভক্ত-শিষ্যদের প্রতি তাঁর কি গভীর স্নেহ ও সতর্ক দৃষ্টি ছিল!

১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চ-এপ্রিল মাসে আমি স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষা দিই এবং গরমের ছুটিতে প্রথমবার মাসিমার সঙ্গে কলকাতা যাই। শ্রীমহাপুরুষজীর জনৈক সাধু-সেবক আমাদের থাকার সব ব্যবস্থাদি করে রেখেছিলেন। আমরা কলকাতায় একটি দক্ষিণ-ভারতীয় হোটেলে ছিলাম। প্রতিদিন ভোরে তামিল-জানা একজন নবীন সন্ন্যাসী বেলুড় মঠ থেকে এসে আমাদের সঙ্গে করে মঠে নিয়ে যেতেন। শ্রীমহাপুরুষজীকে প্রণাম করে তাঁর পূত-সান্নিধ্যে আমরা কিছুক্ষণ বসতাম; এরপর বেলুড় মঠের বিভিন্ন মন্দির ও বিশিষ্ট স্থানগুলি—যেমন স্বামীজীর কক্ষ (যা এখনও তাঁর থাকার সময়ের মতোই রাখা আছে), শ্রীশ্রীঠাকুর-মন্দির, শ্রীমার স্মৃতি-মন্দির ও স্বামীজীর স্মৃতি-মন্দির দর্শন করতাম। এ ছাড়া আমরা পুণ্যসলিলা জাহ্নবীর তীরে বসে তার স্রোতধারা দর্শন ও ধ্যান-চিন্তা করতাম তন্ময় হয়ে। সারাদিন মঠে কাটিয়ে মুখ্য-ভবনটির দ্বিতলে অবস্থিত তখনকার ঠাকুর-মন্দিরে সন্ধ্যারাত্রিক ভজন শুনে রাতে আমরা কলকাতায় ফিরে আসতাম। প্রায় দু-সপ্তাহ আমরা কলকাতায় ছিলাম। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সংযুক্ত প্রতিটি উল্লেখযোগ্য পুণ্যক্ষেত্র আমরা দর্শন করেছিলাম। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনীতে যা কিছু পাঠ করেছিলাম সেসব আবার আমার মনে সুস্পষ্টভাবে জেগে উঠল পুণ্যস্থানগুলি দর্শন করবার সময়। আমরা অনেকবার দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে গিয়েছি, সেখানে বহুক্ষণ বসেছি, কিছুক্ষণ শ্রীরামকৃষ্ণের বাসগৃহে বসেছি, ধ্যানচিন্তা প্রার্থনাদি করেছি, ভবতারিণী ও রাধাকান্তের মন্দিরে পূজাদর্শন করেছি এবং যে আধাত্মিক ভাব সেখানে সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট তা আকণ্ঠ পান করেছি। এ ছাড়া কাশীপুর উদ্যানবাটী (যেখানে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর অন্তিম দিনগুলি অতিবাহিত করেন), ঠাকুরের চিতাভস্ম যেখানে রক্ষিত রয়েছে সেই গঙ্গাতীরবর্তী (কাশীপুরস্থ) সমাধিভূমি, উদ্বোধন কার্যালয়—যেখানে শ্রীমা তাঁর শেষের দিনগুলি কাটিয়েছিলেন, স্বামীজীর পৈতৃক গৃহ এবং কলকাতায় রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন সেবা-প্রতিষ্ঠানও আমরা দর্শন করেছি। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' নামে প্রকাশিত সেই মহান জগদ্‌গুরুর কথোপকথন যিনি লিখে রেখে গিয়েছেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই গৃহী শিষ্য শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম)-কে দর্শন করবার সৌভাগ্যও আমরা লাভ করেছিলাম। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের নামোচ্চারণেই তাঁর চোখে আনন্দাশ্রু দেখা দিয়েছিল। তিনি আমাদের কুশল জিজ্ঞেস করে আমাদের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপাভিক্ষা করেছিলেন।

মহাপুরুষজী মহারাজের জীবৎকালে ১৯৩০ ও ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে দু-বার কলকাতায় যাই। এই দুবারই আমি অল্প কিছুদিনের জন্য গিয়েছিলাম; এবং বেলুড় মঠে একই প্রকার স্নেহ-ভালবাসা ও শ্রীমহাপুরুষজীর সান্নিধ্যে এসে আশীর্বাদ লাভ করেছিলাম।

১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার পরমপূজ্যপাদ শ্রীমহাপুরুষজী মহাসমাধিতে নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। মহাপুরুষজীর সেবক-মহারাজ এ দুঃসংবাদটি আমাকে জানান। অন্য প্রত্যেক 'চেলা'-র মতো আমিও নিজেকে নিতান্ত অসহায় বোধ করলাম। মনে হলো আমি যেন (দ্বিতীয়বার) অনাথ হয়েছি। শ্রীগুরুদেবের পুণ্যপদচিহ্নাঙ্কিত একটি দুর্লভ অমূল্য বস্ত্রখণ্ড আমি সেবক মহারাজের কাছ থেকে লাভ করেছিলাম, যা আমার জীবনে অক্ষয় সম্পদ হয়ে রয়েছে। মহাপুরুষজীর কৃপা জয়যুক্ত হোক।

জয় শ্রীগুরুদেব

মহাপুরুষ মহারাজ স্বামী শিবানন্দজীর স্মৃতি-সঞ্চয়ন*

শ্রীভি. এ. শ্রীকুমারস্বামী

যে বিচিত্র ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্যে আমি আত্মনিয়োগ করবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম এবং কলকাতার উপকণ্ঠে বেলুড় মঠে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের পাদপদ্মদর্শনের সুযোগ পেয়েছিলাম—বর্তমান প্রবন্ধটি তারই বিবরণ।

আমি হিন্দু, শৈব-মতাবলম্বী। শৈশবে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে আমার বিশেষ কোন ধারণা ছিল না। পরীক্ষার সময় কোন মন্দিরে গিয়ে প্রণাম করতাম, প্রার্থনা জানাতাম, কিন্তু ঐ পর্যন্ত, আর কিছু নয়। খ্রিস্টান পাদ্রিদের স্কুলে পড়তাম—পাদ্রিরা হিন্দুদের মূর্তিপূজার প্রভূত নিন্দা করতেন। ফলে আমি খ্রিস্টধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করবো—এটা প্রায় স্থিরই করে ফেলেছিলাম, কিন্তু তেমন কোন সুযোগ তখন হয়নি।...

১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে একটি বিজ্ঞপ্তি আমার চোখে পড়ে। সে বিজ্ঞপ্তিতে এইরূপ লেখা ছিল—কলম্বো বিবেকানন্দ সোসাইটির উদ্যোগে 'ভক্তি-বিজ্ঞানে মূর্তিপূজার

* ইংরেজির অনুবাদ

মহান বিষয়' সম্বন্ধে ভাষণ দেবেন মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী শর্বানন্দ। স্থান—কলম্বো পলিটেকনিক্ ইনস্টিটিউট্। সভাপতি—স্যার পি. অরুণাচলম।... কলম্বো বিবেকানন্দ সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে।

আমি সে সভায় যোগদান করে স্বামী শর্বানন্দজীর ভাষণ শ্রবণ করেছিলাম। তার ফলে মূর্তিপূজা সম্বন্ধে আমার যে সংশয় ছিল সেটি দূর হলো, আর তার সঙ্গে সঙ্গে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হবার বাসনাও মন থেকে চলে গেল। এ সময়ই আমি কলম্বো বিবেকানন্দ সোসাইটির একজন সাধারণ সদস্য হই এবং স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাদি, বিশেষ করে তাঁর 'কর্মযোগ' পাঠ করতে শুরু করি। স্বামী বিবেকানন্দের 'কর্মযোগ' যেন আমার রক্তপ্রবাহে একটা স্পন্দন এনে দিয়েছিল। এরই ফলে দীর্ঘ দশ বৎসর কাল বিবেকানন্দ সোসাইটির কোন-না-কোন সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করে স্বামীজীর কৃপায় আমার দৃষ্টি খুলে যায়, আমি রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্যধারার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সমর্থ হই।

১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশনের মাদ্রাজ কেন্দ্রের তদানীন্তন অধ্যক্ষ স্বামী যতীশ্বরানন্দজী সিংহলে আসেন এবং স্বামী অবিনাশানন্দ ও স্বামী অনন্তানন্দকে সঙ্গে নিয়ে সমগ্র সিংহল-দ্বীপটি পরিভ্রমণ করেন। তাঁরা কলম্বো বিবেকানন্দ সোসাইটির বাড়িতেই ছিলেন। একদিন রাত্রিতে নির্জন সমুদ্রতীরে 'Gall Face Green' নামক স্থানটিতে বসে আমি স্বামী যতীশ্বরানন্দজীর কাছে এই নিবেদন জানিয়েছিলাম যে, কলম্বোতে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি কেন্দ্র যেন স্থাপিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় তার জন্য যে সাহস, যে সংগঠনশক্তির দরকার তা আমার মধ্যে ছিল না। তিনি বলেছিলেন, "প্রার্থনা কর, ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা কর শক্তিলাভের জন্য।" আমি পরদিনই আমার নিজগৃহে একটি বেলগাছের নিচে এক ধর্মসভার আয়োজন করেছিলাম। স্বামী যতীশ্বরানন্দজী মহারাজ সে সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং একটি ভাষণও প্রদান করেছিলেন। পরে আরও দুটি সভার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, একটি ডাঃ ই. ভি. রত্নমের বাংলোতে, অপরটি মিঃ মুটুতাম্বির গৃহে। ঐ সভাতে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সকলে মিলে এই সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, যদি কলম্বোতে একটি রামকৃষ্ণ আশ্রম স্থাপিত হয়, তবে দুই বৎসরের জন্য সেটির ব্যয়ভার তাঁরা বহন করবেন। এর পর স্বামী যতীশ্বরানন্দজী মাদ্রাজে চলে গেলেন এবং তাঁর সঙ্গে প্রায় দুবৎসর পত্র লেখালেখি করবার পর ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ৩০ অক্টোবর কলম্বো রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ—১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ এই দুবৎসর স্বামী পরমেশ্বরানন্দজী ত্রিন্‌কোমালী থেকে কলম্বো এসে বিবেকানন্দ সোসাইটিতে বাস করতেন। তাঁর সঙ্গে

পরামর্শ করে রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী—মহাপুরুষ মহারাজকে একখানা চিঠি লিখি। সে চিঠিতে অনেক ভক্তের স্বাক্ষর ছিল এবং তাঁদের নেতৃস্থানীয় ছিলেন মিঃ এম. সোমসুন্দরম। তিনি পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর একজন বন্ধু ছিলেন। দক্ষ আইনজীবী হিসাবেও যেমন তাঁর খ্যাতি ছিল, ভক্ত হিসাবেও তেমনি তিনি শ্রদ্ধেয় ছিলেন। সে চিঠিতে আমি একথা উল্লেখ করেছিলাম যে, জাফনাতে মুষ্টিমেয় যে কয়জন ভারতীয় বসবাস করেন তাঁদের প্রতি স্বামীজীর গভীর প্রীতির কথা তিনি যেন স্মরণ করেন। এমন কি একদা গরুর গাড়িতে ২৪৫ মাইল পথ অতিক্রম করে তিনি এঁদের আশীর্বাদ করে গিয়েছিলেন। এখন তাঁদের এই প্রার্থনা—একটি আশ্রম-কেন্দ্র যেন এখানে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সে প্রার্থনা যেন তিনি পূর্ণ করেন। তা তিনি করেছিলেন। কলম্বোতে একটি আশ্রম মঞ্জুর হয়েছিল তাঁরই সানুগ্রহ নির্দেশে। তারপর ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে স্বামী শর্বানন্দজী কালীপূজার দিন অহোরাত্র উপবাসী থেকে কালীপূজা সমাধা করে আশ্রমটির উদ্বোধন করেছিলেন। আমরা প্রার্থনা নিবেদন করেছিলাম—'মহামায়ার জয় হোক, জয় হোক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের'।

১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের পূর্বেই আমি স্বামী রামতীর্থের গ্রন্থাদি পাঠ করেছিলাম এবং অদ্বৈত-মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু নিজের লোভ ও রিপু সংযত করতে পারিনি। ঐ খ্রিস্টাব্দে স্বামী যতীশ্বরানন্দজী আমাকে বলেছিলেন, "জীবনে একজনকে আদর্শরূপে গ্রহণ করতে হয়।" কিন্তু হায়! সেটি করতেই আমার দু-বৎসর সময় লেগেছিল এবং সে সময়ের মধ্যেই আমি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উদার আদর্শে বিশ্বাসী হতে পেরেছিলাম।...

এর পূর্বে আমি দুটি স্বপ্ন দেখেছিলাম। একটিতে দেখেছিলাম—যেন মহাকাশের বিভিন্ন অংশ থেকে কয়েকটি দেবদূত ধীরে ধীরে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি মাত্র দেহ পরিগ্রহ করলেন এবং সেই মূর্তি আমাকে নির্দেশ দিয়েছিল যেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে অবতার বলে আমি বিশ্বাস করি। দ্বিতীয় স্বপ্নটি এইরূপ ঃ আমি যেন হঠাৎ দুই উন্মত্ত অশ্বের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম। একটি যেন আমার দুর্বল-মস্তিষ্কা, রুক্ষ-স্বভাবা এবং গর্বিতা পত্নীর প্রতীক, আর অপরটি যেন আমার অসংযত ও দুর্বার ইন্দ্রিয়লালসার প্রতিভূ। এদিক-ওদিক ঘুরবার সাধ্য নেই অথচ আমার পালাবার পথও নেই। এমনই সঙ্কট-মুহূর্তে আমি ঠিক মধ্যবিন্দুতে পরিস্ফুট দেখেছিলাম উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত দুটি শব্দ—'রামকৃষ্ণ মিশন'। আমি সেই শব্দ দুটির মধ্যেই আশ্রয় নিয়েছিলাম। বস্তুত দর্শন দুটির ফলেই আমি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে অবতার এবং আমার জীবনের আদর্শ ও উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিলাম।

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরের পর রামকৃষ্ণ মিশনের কোন কোন সন্ন্যাসী আমাকে পূজনীয় স্বামী শর্বানন্দজীর কাছে দীক্ষা নিতে বিশেষ অনুরোধ করেন এবং তদনুসারে আমি তাঁর কাছে দীক্ষা প্রার্থনা করি। তিনিও সস্ত্রীক আমাকে দীক্ষা দেন। আর সেই সঙ্গে আমাদের সর্বজ্যেষ্ঠা বিধবা ভগিনী মিসেস সুন্দরস্বামীকেও দীক্ষা দেন। তাঁর তিনটি সন্তান একই মাসে সান্নিপাতিক-জাতীয় জ্বরে মারা গিয়েছিল।

পূজনীয় স্বামী শর্বানন্দজী আমাকে বলেছিলেন, "অদ্বৈত-জ্ঞান সকলের জন্য নয়। ওটি শক্তিমান পুরুষদের জন্য বিহিত। তুমি ওসব পিছনে রেখে ভগবানের পূজা কর, তা ব্যক্তিরূপেই হোক অথবা নৈর্ব্যক্তিকরূপেই হোক। আর পূজা কর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের।" তাঁর উপদেশ আমি গ্রহণ করেছিলাম এবং তাঁর কাছে থেকেই পবিত্র বীজমন্ত্র লাভ করেছিলাম। এরপর ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে স্বামী শর্বানন্দজী ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন।

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যভাগে কলম্বো বিবেকানন্দ সোসাইটির ঘরবাড়ি ও জমি-সম্পত্তি যাতে বিনা শর্তে কলম্বো রামকৃষ্ণ আশ্রমের হাতে দিয়ে দেওয়া হয়—সেই মর্মে আমি প্রস্তাব উত্থাপন করি। কিন্তু সে প্রস্তাবে সভ্যদের মধ্যে প্রবল মতভেদ দেখা দেয়। মতভেদের সংবাদ পেয়ে বেলুড় মঠ থেকে পূজ্যপাদ শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ চিঠি লেখেন, "সম্পত্তি দান করবার প্রস্তাব যেন প্রত্যাহার করা হয়, নতুবা সভ্যদের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হবে। কলম্বো রামকৃষ্ণ আশ্রম যেন নিজের গৃহ নিজেই জোগাড় করে নেয়।" তাঁর উপদেশে ঐ বিষয়ে সকল আলাপ-আলোচনা আমি বন্ধ করে দিই।

প্রায় ঐকালেই দুজন আমেরিকান মহিলা—ভগিনী এ এবং ভগিনী ভি পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের শ্রীচরণ-দর্শন করে ভারতবর্ষ থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে কলম্বো এসেছিলেন। তাঁরা উভয়েই মহাপুরুষ মহারাজের অপূর্ব ভালবাসার কথা বলেছিলেন। তাঁদের কথা আমার মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। আমি ভেবেছিলাম, কোন সুদূর আমেরিকা থেকে এঁরা মঠাধ্যক্ষ মহাপুরুষ মহারাজকে দর্শন করতে এসেছেন, তবে আমিই বা কেন তাঁকে দর্শন করতে যাব না? অবশ্যই যাব। এবং তদনুসারে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আমার জ্যেষ্ঠা বিধবা ভগিনী মিসেস সুন্দরস্বামীকে নিয়ে বেলুড় মঠের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। পথে মাদ্রাজে স্বামী যতীশ্বরানন্দজী ও স্বামী অসঙ্গানন্দজীর দর্শন পাই। আমরা যখন বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠে পৌঁছলাম, তখন শ্রীসন্তোষ গাঙ্গুলী নামক একজন ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকের বাড়িতে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল। সন্তোষবাবু তখন সে বাড়িতে সপরিবারে বাস করতেন। বাড়িটি বেলুড় গ্রামে মঠের ঠিক বাইরেই অবস্থিত

ছিল এবং আমি শুনেছিলাম যে, মহাপুরুষ মহারাজ নিজ খরচে সেটি নির্মাণ করিয়ে দেন। আমরা মোট দশদিন বেলুড়ে ছিলাম। প্রতিদিন আমরা মঠে ঠাকুরমন্দিরে যেতাম। মহাপুরুষজী শীতকাল বলে টুপি মাথায় দিয়ে মোজা পরে একটি চেয়ারে বসে থাকতেন। আমরা নত হয়ে তাঁকে প্রণাম করতাম। হাত দিয়ে তাঁর পাদস্পর্শ করে সে হাত মাথায় দিতাম।

একদিন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—আমি দীক্ষা নিয়েছি কিনা। আমি বলেছিলাম, "মহারাজ, আমি ইতঃপূর্বে স্বামী শর্বানন্দজী যখন কলম্বো রামকৃষ্ণ আশ্রম উদ্বোধন করতে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর কাছে দীক্ষিত হয়েছি।" তারপর মহাপুরুষজী আমাকে বলেছিলেন যে, ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক প্রেরিত হয়ে তিনি কলম্বো বন্দরের অনতিদূরে থাম্বেছত্রম্ নামক স্থানে প্রায় ৭।৮ মাস বেদান্তপ্রচার ও তপস্যা করবার জন্য ছিলেন এবং তারপর ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। তখন সেখানে আশ্রমাদি সম্পর্কে কোন উৎসাহ ছিল না।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের তদানীন্তন প্রধান কর্মকর্তা শ্রী টি. লোকনাথনের কাছে স্বামী বিবেকানন্দ পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজকে সিংহলে পাঠিয়ে যে চিঠি দিয়েছিলেন সেটি আজও কলম্বো আশ্রমে রক্ষিত আছে। সেদিন একথা আমি শুনেছিলাম যে, ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে কলম্বো অবস্থানকালে মহাপুরুষ মহারাজ ভগবদ্গীতার ক্লাসও নিতেন।

আজও মনে পড়ে আমাদের সকলের প্রতি মহাপুরুষ মহারাজের অপূর্ব ভালবাসা আর প্রাণখোলা হাসিটির কথা। তিনি প্রত্যহ আমাদের জিজ্ঞেস করতেন সকালবেলা চায়ের সঙ্গে কফি এবং উপমা আমাদের দেওয়া হয় কি না। আমরা যখন বলতাম, 'আজ্ঞে হাঁ', তিনি বলে উঠতেন, 'আচ্ছা'। এর পর আমি একথাও শুনেছিলাম যে, তিনি ঐ বিষয়ে রন্ধনশালার ভারপ্রাপ্ত স্বামীর কাছেও অনুসন্ধান করতেন। এ সকল ছোট-খাটো ঘটনা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, ভক্তদের সুখ-সুবিধার জন্য তাঁর কি উদ্বেগ ছিল, কি গভীর স্নেহ ছিল তাদের প্রতি! একদিন তাঁকে আমি বলেছিলাম, "মহারাজ, আপনাকে আমরা যখন দেখি তখন মনে হয় যেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভগবৎ-প্রেম এবং মহৎ জীবনের কিছুটা আভাস আমরা দেখতে পাচ্ছি।" আর একদিন আমার জপের মালাটি ঠাকুরমন্দির থেকে মহাপুরুষ মহারাজের কাছে নিয়ে যাই শোধন করিয়ে নেবার জন্য। সে সময় আমার একহাতে জপের মালা এবং অন্য হাতে স্বামী বিবেকানন্দের পরিব্রাজক জীবনের একটি ফটো ছিল। ফটোটি দেখবামাত্র তিনি সেটি আমার হাত থেকে নিজ হাতে নিয়ে মাথায় ছোঁয়ালেন এবং আশীর্বাদসহ আমাকে ফেরত দিলেন। তারপর আমাকে জিজ্ঞেস

করলেন, আমার জপের মালা একবার যখন ঠাকুরঘর থেকে ঘুরিয়ে আনা হয়েছে, তখন তো সেটি শক্তিপূত হয়েই গেছে, আবার তাঁকে দিয়ে সেটিকে শোধন করাতে চাইছি কেন। আমি চুপ করে রইলাম। তারপর অবশ্য তিনি জপের মালাটি নিয়ে স্পর্শ করে আমাকে ফেরত দিলেন। সেই জপের মালা এবং ছবিখানি আজও আমার কাছে মহা সম্পদরূপে রক্ষিত। ফটোখানি আমার কক্ষে দেয়ালে ঝুলানো আছে। আর তার পাশেই রাখা আছে মহাপুরুষ মহারাজের একখানা ফটো।

আমার বিধবা ভগিনী মহাপুরুষ মহারাজকে বলেছিলেন যে, তিনি তাঁর তিনটি বয়স্ক সন্তানকে একই মাসের মধ্যে হারিয়েছিলেন। তারা আন্ত্রিক জ্বরে মারা গিয়েছিল। সে সংবাদে অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে মহাপুরুষ মহারাজ বলেছিলেন, "আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি, তোমার অবশিষ্ট সন্তান দুটি দীর্ঘজীবী হবে।"

আর একদিন আমি মহারাজের পদদ্বয়ের কাছটিতে বসেছিলাম। কথাপ্রসঙ্গে তাঁকে সেদিন বলেছিলাম যে, আমার আর একটি ছোট বোন আছে এবং নানা কারণে তার বিয়ে দিতে পারছি না। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "তার আর কি করা যাবে। বাংলাদেশেও সে রকম অবিবাহিতা মেয়ে যথেষ্ট আছে।" কিন্তু পরদিন সকালে যখন তাঁকে প্রণাম করতে গিয়েছি, তখন হঠাৎ নিজ ডানহাতখানি ঊর্ধ্বে উত্থিত করে তিনি বলে উঠলেন, "তুমি কাল যে বিষয়ে আমাকে বলেছিলে, সে বিষয় সব ঠিক হয়ে যাবে, সব ঠিক হয়ে যাবে।" আমি অকস্মাৎ অভিভূত হয়ে তাঁকে প্রণাম করে চলে এসেছিলাম। আমরা ভারতবর্ষ থেকে জাফনা ফিরেছিলাম ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জানুয়ারি। আর আশ্চর্য এই যে, ঠিক সেই দিনই এক ঘটক এসে উপস্থিত হয়েছিল। সে নিয়ে এসেছিল এক বিবাহ-প্রস্তাব, যে প্রস্তাব আমার ভগিনী এবং পরিবারের সকলেই সানন্দে গ্রহণ করেছিল। বিবাহের যাবতীয় বাধা এবং অসুবিধাগুলি যেন চকিতে অন্তর্হিত হয়ে গেল। আমি মহাপুরুষ মহারাজের আশীর্বাদের জন্য তাঁকে একখানা বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্রও প্রেরণ করেছিলাম। তারপর যথাসময়ে নির্বিঘ্নে আমার ভগিনীর বিবাহ হয়ে গেল। কালক্রমে তার ছয়টি পুত্র এবং দুইটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। অবশ্য কন্যা দুটির একটি পরে মারা যায়। এমনি ছিল মহাপুরুষ মহারাজের অমোঘ আশীর্বাদ!

মনে পড়ে ঐদিনই আমার মনকে পবিত্র করে দেবার জন্য মহাপুরুষজীর কাছে আমি প্রার্থনা জানিয়েছিলাম। তিনি হেসে বলেছিলেন, "যথেষ্ট ভোগ তো জীবনে করেছ, এবার ওগুলি ছেড়ে দাও।" একালেই আমি এবং আমার ভগিনী পূজনীয় খোকা মহারাজের এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহী ভক্ত 'কথামৃত'-প্রণেতা শ্রীম-র আশীর্বাদলাভেও ধন্য হয়েছিলাম। সে যাত্রায় কাশীধাম দর্শন এবং কাশী রামকৃষ্ণ

সেবাশ্রমে বাস করবার সুযোগও আমাদের হয়েছিল। কাশী থেকে আমরা দিল্লী যাই এবং আমাদের গুরুদেব পূজনীয় স্বামী শর্বানন্দজীর শ্রীচরণদর্শন করি। তিনি তখন পুরাতন দিল্লীর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন।

দিল্লী থেকে আমরা আবার বেলুড় মঠে ফিরে আসি এবং শ্রীশ্রীমার তিথিপূজা এবং মহাপুরুষ মহারাজের তিথিপূজা পর্যন্ত মঠে বাস করি। তারপর আমরা স্বামী যতীশ্বরানন্দজীর সঙ্গে কলকাতা ত্যাগ করে মাদ্রাজ পৌঁছাই এবং তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ১৪ জানুয়ারি (১৯৩২) জাফনা প্রত্যাবর্তন করি।

জাফনায় ফিরে মহাপুরুষ মহারাজের মহাসমাধির দিনটি পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আমি পত্রে যোগাযোগ রক্ষা করেছিলাম। তাঁর স্বাক্ষরযুক্ত চিঠি খুব তাড়াতাড়িই আমি পেয়ে যেতাম। সে সব স্মৃতি এখনও অক্ষয় হয়ে রয়েছে আমার মনে। মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে পত্রের মধ্যে নিরন্তর যে সব উপদেশ দিতেন তাদের মূল কথা ছিল ঃ

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি অখণ্ড বিশ্বাস রক্ষা করবে, তবেই সকল আপদ-বিপদ অবশ্য অতিক্রম করতে পারবে।

(২) নিজের পুত্রকন্যা সব ভগবানেরই সন্তান, তবে তুমি ভগবানের দাসরূপে তাদের দেখাশুনা করছ—এ ভাবটি মনে দৃঢ়ভাবে রক্ষা করবে।

তাঁর সে সব পূত আশীর্বচন আজও আমার কর্ণে যেন ধ্বনিত হচ্ছে এবং আজও প্রতিদিন যে কোন বিপদের আবর্তে তাঁর প্রথম উপদেশটি আমি মনে মনে জপ করে থাকি। আবার তাঁর দ্বিতীয় উপদেশটি শুধু আমাকে নয়, আমার স্বজনবর্গকেও শান্তির পথ দেখিয়েছিল। মহাপুরুষজীর মহিমার কি তুলনা হয়?...

* * *

১৯৩২ সালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম সন্ন্যাসি-শিষ্য স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজ সিংহল আসবার পূর্বে পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের অনুমতি প্রার্থনা করেন। তিনি হস্ত সঞ্চালন করে বলেছিলেন, "যাও, সিংহল ঘুরে এস।" তার অর্থ—স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীকে সিংহল কেন্দ্রের কার্যাদি পরিদর্শন করতে এবং সেগুলিকে আশীর্বাদ করতে তিনি তাঁকে চাপরাস দিয়ে দিলেন।...

স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী সিংহলের বিভিন্ন কেন্দ্র পরিদর্শন ও বহু ভক্তকে আশীর্বাদ দিয়ে ধন্য করেন। বেত্তিয়াকালোয়া ও অনুরাধাপুরম্ যাবার পূর্বে জাফনাতে একবার পদার্পণ করবার জন্য আমি স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীকে অনুরোধ জানিয়েছিলাম। তিনি কিন্তু জাফনা যেতে রাজি হননি। এরপরই তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সিংহলের কার্যাদির পূর্ণ বিবরণ মহাপুরুষ মহারাজকে যথাসময়ে জানিয়েছিলেন।

সিংহলের কার্যভার একদিন স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং মহাপুরুষ মহারাজের হস্তে ন্যস্ত করেছিলেন, আর আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আজও তিনি সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় দেহে সিংহলবাসী ভক্তদের পরিচালিত করছেন, সাহায্য করছেন, এবং তা দেখাবার জন্যই এই স্মৃতিকথায় সিংহলের কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো। মহাপুরুষজীর অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব। তাঁর প্রেম ও চরিত্র-মহিমা আজও আমার স্মৃতিতে উদ্দীপনার অক্ষয় উৎস হয়ে রয়েছে। তাঁর প্রাণখোলা হাসি আজও যেন দেখতে পাই, তাঁর সেই চিরমধুর উক্তি 'আচ্ছা' আজও যেন কর্ণে ঝঙ্কৃত হয়। তাই মনে হয় তাঁর পুণ্য-প্রকাশ আজও আমাদের সকলকে ঘিরে অব্যাহত আছে; তবে আমাদের প্রত্যক্ষের মধ্যে হয়তো সব সময় সেটা ধরা পড়ে না।

আমার প্রতি তাঁর নির্দেশ ছিল—"ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি বিশ্বাস অটুট রাখতে চেষ্টা করো। তিনি তোমাকে সকল সংকট থেকে পরিত্রাণ করবেন।" সেই নির্দেশই আমার ইষ্টনিষ্ঠা বজায় রেখেছে। আমার উপর এটিই মহাপুরুষ মহারাজের সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ বলে মনে করি। তাঁর জীবনমহিমা জয়যুক্ত হোক, তাঁর আশীর্বাদ আমাদের জীবনে সার্থক হোক!

স্বামী শিবানন্দ-স্মৃতিসংগ্রহ*

(কেরল প্রদেশের কোচিন রাজ্যের তৎকালীন তৃতীয় রাজকুমার শ্রীরবিবর্মার ডায়েরি থেকে উদ্ধরণ)

শুক্রবার, ১৬ মে, ১৯২৪

নীলগিরিস্থ কুন্নুরে অবস্থানকালে ত্রিচুড়ের বিবেকোদয়ম ইংরেজি হাই স্কুলের শিক্ষক বিশ্বনাথ আইয়ার মহাশয়ের সঙ্গে শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের কথোপকথন ঃ আইয়ার মহাশয় মহারাজের কাছ থেকে দীক্ষাগ্রহণে ইচ্ছুক ছিলেন, তাঁর কাছে মহাপুরুষজীকে লেখা স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজীর একখানি চিঠি ছিল। তিনি মহারাজকে ঐ চিঠিখানি দিলেন।

আইয়ার মহাশয়—আরও বেশি ধর্মভাবসম্পন্ন হতে হলে কি করতে হবে তা তো জানিনে। আপনি দয়া করে উপদেশ দিন।

* ইংরেজির অনুবাদ

শ্রীমহাপুরুষজী—শ্রীগুরুমহারাজের নামে তুমি স্কুলে যে কাজ করছ, তাই তোমাকে ধর্মভাব-লাভে সাহায্য করবে। অনাসক্ত কর্ম এমনই শক্তিসম্পন্ন ও প্রভাবশালী যে, তা তোমার ধর্মজীবন গড়ে তুলবে।

আইয়ার—আমি ভগবানের ধ্যান বেশিক্ষণ ধরে করতে পারি না।

শ্রীমহাপুরুষজী—তুমি যদি তাঁর ধ্যানে আরো মগ্ন হয়ে থাক, তাহলে তুমি অন্য কোনও কাজ করতে পারবে না। শ্রীভগবানের ইচ্ছা এই যে, তুমি তাঁর প্রতিনিধিরূপে তাঁরই কাজ কর এবং এজন্যই তিনি তোমায় বহুক্ষণ ধরে তাঁর ধ্যানে অপারগ করেছেন, তাঁর শরণাগত হয়ে সব কিছু করবার চেষ্টা কর আর তোমার সব কাজ তাঁকে নিবেদন কর। রোজ খুব ভোরেই ঘুম থেকে উঠে কিছু সময় ধ্যানে অতিবাহিত করবে আর শ্রীগুরুমহারাজের কাছে এই বলে প্রার্থনা করবে যে, তিনি যেন তোমায় সারাদিনের সব কাজে অনাসক্ত রাখেন। রাতেও শোবার সময় ঈশ্বরের চিন্তা করে তাঁকে তোমার সারাদিনের সব কাজ অর্পণ করবে। তুমি কি বিবাহিত?

আইয়ার—হ্যাঁ, মহারাজ। আপনার কাছে দীক্ষা পেলে আমি খুবই সুখী হব।

শ্রীমহাপুরুষজী চোখ বুজে চিন্তামগ্ন ছিলেন, পরে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন—"ভগবানের কোন্ রূপটি তোমার ভাল লাগে?"

আইয়ার—শংকর।

শ্রীমহাপুরুষজী—তোমার ইষ্ট কে?

আইয়ার—ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ।

শ্রীমহাপুরুষজী—বেশ, আমি তোমাকে দীক্ষা দেব। তোমায় এটি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করতে হবে যে, তিনিই একমাত্র যুগাবতার—এই যুগের ঈশ্বর এবং শাস্ত্রবর্ণিত একজন অবতারের যত লক্ষণ আছে, সমস্তই তাঁতে আছে। তুমি কতক্ষণ এখানে থাকতে পারবে? তুমি কখন ফিরতে চাও?

আইয়ার—যখন আপনি আমাকে যাবার অনুমতি দেবেন। আমার ছুটি তো আগেই ফুরিয়ে গিয়েছে এবং আমি সেজন্য যত শীঘ্র সম্ভব ফিরে যেতে চাই।

শ্রীমহাপুরুষজী—ত্রিচূড়ে যাবার পরের ট্রেন কখন ছাড়বে?

আইয়ার—বিকেল সাড়ে চারটায়।

মহাপুরুষজী আমায় তখন কটা বেজেছে জিজ্ঞেস করলেন। আমি জানালাম যে, দুপুর প্রায় আড়াইটা বাজে।

শ্রীমহাপুরুষজী—তুমি যদি সাড়ে তিনটা নাগাদ এখান থেকে রওনা হও তাহলে হবে তো?

আইয়ার—আজ্ঞে, তাতে হবে।

শ্রীমহাপুরুষজী আইয়ার মহাশয়কে স্নান করে তাঁর কাছে আসতে বললেন। আইয়ার মহাশয় স্নান করে বিভূতি লাগিয়ে শ্রীমহাপুরুষজীর কাছে আসতেই তিনি তাঁকে দীক্ষা দিলেন। মহাপুরুষজী নিজের ঘরে চলে গেলেন, কিন্তু পরে আবার এসে আইয়ার মহাশয়কে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বললেন। এরপর তিনি কয়েকটি প্রসাদী ফল এনে আইয়ার মহাশয়কে দিলেন এবং নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বিশেষ আশীর্বাদ করলেন। অল্পক্ষণ পরে আইয়ার মহাশয় তাঁকে প্রণাম করে বিদায় নিলেন। তখন বিকেল প্রায় সাড়ে তিনটে।

মঙ্গলবার, ২০ মে, ১৯২৪

জনৈক দর্শনার্থী মহীশূরের প্রাক্তন চীফ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার মহাশয় মহাপুরুষজীকে দর্শন করতে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে শ্রীমহাপুরুষজীর নিম্নোক্ত কথোপকথন হয়। আয়েঙ্গার মহাশয় বললেন যে, তিনি কিছুদিন মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রমে থাকতে চান।

শ্রীমহাপুরুষজী—এর ব্যবস্থা খুব সহজেই হয়ে যাবে। আশ্রমটি জনবসতি থেকে একটু দূরে, সেজন্য আগে থেকে জানিয়ে দিতে হবে, তাহলে ওঁরা আপনার জিনিসপত্র আশ্রমে বয়ে নিয়ে যাবার জন্য কুলিদের ঠিক করে রাখবেন। সুতরাং আপনার রওনা হবার দিন-পনেরো আগে জানিয়ে দিতে হবে।

আয়েঙ্গার মহাশয়—আমি তাই করব। কতকগুলো বই পড়ে আর অনেকের সঙ্গে ধর্মালোচনা করার পরেও আমার ধর্ম-সম্বন্ধে কোনও সন্তোষজনক ধারণা হয়নি।

শ্রীমহাপুরুষজী—আলোচনা করলে আর শুষ্ক তর্কে ভরা বই পড়লে আপনার কেবল ধাঁধাই লাগবে। এমন লোকের সঙ্গ করতে হবে যাঁরা ভগবানকে জেনেছেন অথবা ঐ পথে কিছুটা অগ্রসর হয়েছেন। কিন্তু এও মনে রাখবেন যে, সব কিছুই আসলে নির্ভর করছে নিজের মনের উপর। যদি আপনার মন শান্ত ও স্থির না হয় তবে লোকালয় থেকে দূরে শত নির্জন জায়গায় থাকলেও আপনার কিছুই হবে না। ভগবানের কাছে আন্তরিকভাবে প্রার্থনা জানাবেন যেন তাঁর কৃপায় আপনার মন শান্ত ও স্থির হয় এবং আপনি তাঁকে লাভ করতে পারেন। যখনই আপনার মন বিক্ষিপ্ত হবে তখনই প্রাণপণে তাকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করবেন। প্রথমটা হয়তো

আপনি সফলকাম হবেন না, কিন্তু যদি আপনার ঈশ্বরলাভের দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে ভক্তিও থাকে তবে সময়ে আপনার দ্রুত উন্নতি সুনিশ্চিত। আর যখন আপনি ঐ ধর্মরাজ্যে কিছুটা এগিয়ে যাবেন ভগবান নিজেই আপনার হাত ধরে ঠিক পথটি দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। কিন্তু গোড়াতেই সব চাইতে বেশি প্রয়োজনীয় হচ্ছে এমন পুণ্যাত্মাদের সঙ্গ, যাঁরা এই পথে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছেন। প্রথমটায় আপনি যত ধর্মগ্রন্থ পাচ্ছেন তার প্রতিটি পড়বার প্রয়োজন নেই। আমি তো আপনাকে এখন পড়তে বলব যাঁরা ভগবানকে লাভ করেছেন এমন সব পরম ভক্তদের জীবনী।

আয়েঙ্গার—এটা বলা তো সহজ যে মন যখনই বিক্ষিপ্ত হবে তখনই তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, তা কেমন করে করা যায়।

শ্রীমহাপুরুষজী—ধ্যানের সময় ভগবানের লীলার কথা ভাববেন।

আয়েঙ্গার—অনেকে কোন কোন আহার্য সাত্ত্বিক বলেন এবং তা-ই খাওয়া উচিত এও বলে থাকেন। আর কোন কোন বস্তু তামসিক বলে সে-সব আহার করা উচিত নয়,—এও বলেন। আমি কি করব?

শ্রীমহাপুরুষজী—এ বিষয়ে কোন লোক বা কোন বই কি বলছে, তাতে বেশি গুরুত্ব দেবেন না। যা আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল হবে তাই খাবেন।

আয়েঙ্গার—আমার কি ঠিক সহ্য হবে তা কি করে জানতে পারব? আবার অনেকে বলেন যে, প্রাণায়াম করা উচিত।

শ্রীমহাপুরুষজী—সিদ্ধ গুরু না পেলে প্রাণায়াম কখনই করা উচিত নয়। ওপথে অনেক বিপদ। আর আহারের বিষয়ে আমি বলব যে কেবলমাত্র এমন খাদ্য খাবেন, যা আপনার শরীরে সয়। কি ধরনের খাবার খাওয়া উচিত, তাতে খুব বেশি জোর দেবার প্রয়োজন নেই। আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হলো ঈশ্বরলাভ। যদি শরীর সুস্থ না থাকে আমরা ইষ্টে মন একাগ্রভাবে সন্নিবিষ্ট করতে পারি না। তাই এমন খাদ্য খাওয়া উচিত যা আমাদের সুস্থ রাখে। ভগবানকে জানবার জন্য সব চেয়ে যা বেশি দরকার তা আপনাকে সব সময় মনে রাখতে হবে ঃ যেমন (১) যাঁরা ভগবানকে জেনেছেন বা যাঁরা সেই পথে ঠিকভাবে চলেছেন, তাঁদের সঙ্গ করা। (২) বিশিষ্ট ভগবদ্‌ভক্তদের জীবনী বিশেষ যত্ন সহকারে পাঠ করা। (৩) সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হচ্ছে অভ্যাস ও বৈরাগ্য—ইষ্টচিন্তা ছাড়া অন্য সব চিন্তা থেকে বিরত হওয়া।

আয়েঙ্গার—ভাল বা মন্দ কাজ যাই করি না কেন, আমি কি সে সবের প্রভাবের ঊর্ধ্বে থেকে পবিত্র আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করতে পারি?

শ্রীমহাপুরুষজী—নিশ্চয়ই না। আপনার শুভকর্ম আপনাকে আরও বেশি আধ্যাত্মিকভাবে ভাবিত থাকতে সাহায্য করবে, আবার যা কিছু অশুভ কর্ম তা আপনাকে ভগবান থেকে বিমুখ করে সংসারে টেনে নামিয়ে আনবে আর আপনার আত্মাকে জন্মমৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হতে দেবে না—যে মুক্তি আপনার মনুষ্যজন্মের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত, তা থেকে আপনাকে দূরে রাখবে।

শনিবার, ৩১ মে, ১৯২৪

শ্রীমহাপুরুষজী (আমাকে লক্ষ্য করে)—জীবনটাই বৃথা, যদি তা ভগবানের কাজে লাগানো না হয় আর যদি তা ধন-সম্পত্তি-অর্জনের কাজেই কেটে যায়। আপনি প্রথমে মুখ হাত ধুয়ে নেবেন। বিছানায় বসে বসে ধ্যান করতে পারেন, কিন্তু কুশাসনে, কম্বলের আসনে বা মৃগচর্মের উপরে বসেই ধ্যান করা ভাল।

রবিবার, ১ জুন, ১৯২৪

কাদম্বী শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার এসেছেন। শ্রীমহাপুরুষজী ও তাঁর মধ্যে কিছু কথাবার্তা হলো।

আয়েঙ্গার মহাশয়—ভগবান কি নিয়মের উর্ধ্বে? আমার ধারণা হচ্ছে যে, তিনি তাঁর নিজের সৃষ্ট নিয়মকেও অতিক্রম করতে পারেন না।

শ্রীমহাপুরুষজী—ভগবান নিয়মের বাইরে। আমাদের নিজেদের বেলায়ই দেখুন না, একটা দেশের রাজাই নিয়মের উপরে থাকেন। তিনি অনেকক্ষেত্রে নিজেরই তৈরি নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করেন যখন তিনি সত্যই বোঝেন যে, এ রকম নিয়মভঙ্গ দ্বারা দেশের লোকের প্রকৃত কল্যাণ হবে। যদি রাজার মতো একজন মানুষই এভাবে আচরণ করতে পারেন, তবে ঈশ্বর—যিনি সর্বশক্তিমান ও মূর্তিমতী দয়া—তিনি কেন এ রকম করবেন না? আমাদের সামনেই এর একটি উদাহরণ রয়েছে। রানী রাসমণির জামাতা মথুরবাবু একবার শ্রীগুরুমহারাজকে বলেছিলেন যে, ভগবান প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারেন না। শ্রীগুরুমহারাজ তর্কের সুরে বললেন যে, ভগবান তাঁর যা ইচ্ছা করতে পারেন, কারণ তিনি সব নিয়মের উর্ধ্বে—প্রকৃতির নিয়মের তো কথাই নেই। মথুরবাবু জিজ্ঞেস করলেন, একটা রাঙ্গাজবার গাছে কখনও সাদা জবাও ফুটতে পারে কিনা। শ্রীগুরুদেব উত্তর দিলেন, ভগবানের ইচ্ছা হলে তা নিশ্চয়ই সম্ভব। ঘটনাক্রমে পরদিন একটি রাঙ্গাজবা ফুলের গাছে অন্য লালফুলের সঙ্গে একটা সাদা জবাফুলও ফুটলো। এটি মথুরবাবুকে দেখাতেই তিনি স্বীকার করলেন যে, তিনি নিজে ভুল বলেছিলেন এবং শ্রীগুরুদেবের কথাই ঠিক।

আয়েঙ্গার—আমার ধারণায় আগামী ও সঞ্চিত কর্ম—দুটোই কেবল ভগবান নষ্ট করতে পারেন, কিন্তু যদি তাঁর ইচ্ছাও হয় প্রারব্ধ কর্ম নষ্ট করতে পারেন না।

শ্রীমহাপুরুষজী—প্রারব্ধও ভগবান নষ্ট করতে পারেন, কিন্তু আপনি যখন চান ভগবান তখনই তা নষ্ট করবেন না। ভগবান যদি মনে করেন আপনি তাঁর পরমভক্ত ও বিশেষ কৃপার যোগ্য তাহলে আপনার প্রারব্ধও নষ্ট করে দিতে পারেন। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করার সময় যোগীন মহারাজ বিবাহিত ছিলেন। বিবাহ হবার দরুন তাঁর ধারণা হলো যে, তাঁর ঈশ্বরপ্রাপ্তির সব আশাই নষ্ট হয়ে গেছে এবং সেজন্য তিনি শ্রীগুরুমহারাজের কাছে যেতেও লজ্জিত বোধ করলেন, কারণ তিনি গুরুদেবকে অনেক সময় বলতে শুনেছেন যে, কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত লোকের ভগবানলাভের কোন আশাই নেই। কিন্তু শ্রীগুরুমহারাজ যোগীনের অনুপস্থিতি সহ্য করতে পারতেন না। কোনও কৌশলে একদিন তিনি যোগীনকে তাঁর কাছে আনালেন। যোগীনকে আসতে দেখেই শ্রীগুরুমহারাজ তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে জানতে পারলেন যে, কি কারণে যোগীন তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে রয়েছে এবং এগিয়ে গিয়ে যোগীনকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন, "তুই আমার কাছে কেন আসিসনে? তুই কি বিয়ের জন্য ভয় পাচ্ছিস? যদি এখানকার কৃপা থাকে (নিজের শরীরের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে) তুই বার বার বে করতে পারিস। তোর তাতে কোনও অমঙ্গল হবে না। তুই যদি তোর স্ত্রীকে ভয় করিস তো তাকে একদিন আমার কাছে নিয়ে আসবি, আমি তাকে স্পর্শদ্বারা আধ্যাত্মিকশক্তিসম্পন্ন করে দেব।" সুতরাং দেখুন, এভাবে ভগবান ইচ্ছা করলে আমাদের প্রারব্ধও পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারেন।

আয়েঙ্গার—রামদাস পরমভক্ত ছিলেন, তিনি ভদ্রাচলমে মন্দির তৈরি করতে এবং দরিদ্র ও ধার্মিক লোকদের সাহায্যার্থে কোষ থেকে ধন ব্যয় করেন, আর সেজন্য তাঁকে জেলে যেতে হয় এবং আরও সব কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। ভগবান সে ভক্তকে এসব কষ্ট থেকে কেন রক্ষা করলেন না?

শ্রীমহাপুরুষজী—ভগবানের কি করণীয় তা তো আমরা ঠিক বুঝতে পারি না। আপনি কি করে বুঝলেন যে, রামদাস জেলে যাওয়ায় কষ্টবোধ করেছিলেন? ঈশ্বরের প্রতি তাঁর কর্তব্যসম্পাদনের সময় ভক্ত তাঁর প্রতি যা করুক না কেন, তা দুঃখ বলে মনে করেন না।

আয়েঙ্গার—ভগবান তো সর্বত্রই রয়েছেন, তাহলে ভগবান কি মূর্তিতে বিশেষভাবে থাকেন?

শ্রীমহাপুরুষজী—হ্যাঁ, ঈশ্বর মূর্তিতে বিশেষভাবে রয়েছেন। কেউ যখন তাঁর

দিকে অনেকটা এগিয়ে যায়, তখন দেখবে যে ভগবান ঐ মূর্তিতে রয়েছেন আর এমন কি আমাদের নিবেদিত ভোগও তিনি জ্যোতিরূপে স্পর্শ করে গ্রহণ করছেন। এটি শ্রীগুরুমহারাজ ও শ্রীশ্রীমা দুজনেই দেখেছেন।

শনিবার, ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৬ (বেলুড় মঠ, হাওড়া)

সকাল নটার পর জনৈক সন্ন্যাসী দীক্ষার জন্য আমাকে মন্দিরে নিয়ে গেলেন। আমি শ্রীগুরুমহারাজের পাদুকার খুব কাছেই, তাঁর প্রতিকৃতি ও কবচের দিকে মুখ করে বসলাম। শ্রীমহাপুরুষজী উত্তরমুখী হয়ে বসেছিলেন। ভগবানের পবিত্র পাদুকা অর্চনা করবার জন্য তিনি আমায় ফুল দিলেন এবং আমার অশেষ ভাগ্যে আমি সেই পূত পাদুকা স্পর্শও করেছিলাম। প্রথমে ওই শ্রীপাদুকা পূজা করলাম।

দীক্ষার সময় শ্রীমহাপুরুষজী আমাকে এই বলে আশ্বাস দিলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুর পূর্বেই আমাকে তাঁর পুণ্য ছায়ায় আশ্রয় দিয়েছেন, আমার অন্তরে মন্ত্রদান করেছেন এবং শ্রীমহাপুরুষজী কেবল আনুষ্ঠানিকভাবে আমার কর্ণে মন্ত্র শোনাবেন। শ্রীমহাপুরুষজী দয়া করে জপমালায় মন্ত্র জপ করে দিলেন, সেখানেই তখন সেই মালায় আমাকে কিছুক্ষণ জপ করতে বললেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন।

শ্রীমহাপুরুষজী মহারাজ-স্মরণে*

শ্রীপি. শেষাদ্রি

এপ্রিল, ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দ। কেরলে এক ভক্তের বাড়িতে স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর মুখে আমি প্রথম পূজ্যপাদ শ্রীমহাপুরুষজী মহারাজের কথা শুনি। এ ভক্তটি পরে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে দীক্ষা এবং তুলসী মহারাজের (স্বামী নির্মলানন্দজী) নিকট সন্ন্যাস লাভ করেন—তাঁর নূতন নাম হয় স্বামী অস্বানন্দ। জনৈক শ্রোতা বি. এ. ও এল. টি. পাশ শিক্ষক নিজে দারপরিগ্রহ করেছিলেন বলে খুব দুঃখ করেন, কারণ বিবাহের ফলে সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশাধিকার তাঁর ছিল না। স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী তখন মহাপুরুষজী সম্বন্ধে এ কথা বললেন, মহাপুরুষজী (তখন তারকনাথ ঘোষাল) অনিচ্ছাসত্ত্বেও পিতার আদেশে বিবাহ করেছিলেন এবং অফিসে চাকরিও করতেন।

* ইংরেজির অনুবাদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে ত্যাগ ও সংযমের জীবন যাপন করতে উপদেশ দেন এবং ঠাকুরের সংস্পর্শে এসেই তাঁর মনে সংসারত্যাগের বাসনা জাগে। শ্রীরামকৃষ্ণকে মনের কথা খুলে বলতেই তিনি তাঁকে উপদেশ দিলেন তাঁর স্ত্রীর ভরণপোষণের সংস্থান করতে। তিনি স্ত্রীর জন্য এক জোড়া সোনার বালা গড়ালেন। মনে করেছিলেন, তাঁর স্ত্রীর পক্ষে এটাই যথেষ্ট। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে জিনিসটা দেখাতেই তিনি অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বললেন, স্ত্রীর জীবনধারণের জন্য খাদ্যবস্ত্রের পর্যাপ্ত সংস্থান করা তাঁর অবশ্য কর্তব্য। মহাপুরুষজী হতাশায় ভেঙ্গে পড়লেন। কিছুদিন পরে তিনি জানালেন যে, তাঁর স্ত্রী অত্যন্ত পীড়িত। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে ছুটে এসে তিনি বললেন, তাঁরই কৃপায় বোধ হয় তিনি শীঘ্রই সংসার থেকে অব্যাহতি পাবেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তা শুনে খুশি হলেন না। তিনি বললেন—এখন রুগ্ণা পত্নীর শয্যাপার্শ্বে থেকে তাঁর শুশ্রূষা করাই উচিত। মহাপুরুষজী তাই করেছিলেন। অবশ্য অল্প দিন পরেই তাঁর স্ত্রী পরলোকগমন করেন। এবার তিনি যথার্থই নিশ্চিন্ত বোধ করলেন। অফিসে যাওয়া বন্ধ করলেন, সেই মাসের মাইনে নিতেও আর গেলেন না। সাধনায় আত্মনিয়োগ আর ঠাকুরের সেবা—এই হলো তাঁর ব্রত। শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ এবং পিতার অনুমতি নিয়ে সংসার ত্যাগ করলেন। ঠাকুরের দেহত্যাগের পরে বরানগর মঠে প্রথম সন্ন্যাসিরূপে মহাপুরুষ মহারাজই যোগদান করেন।...

১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে আমি কিছুদিন মাদ্রাজে ছিলাম। তখন স্বামী শুদ্ধানন্দজী সেখানে ছিলেন এবং প্রায়ই আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের কথা আলোচনা করতেন। একদিন আলোচনা-প্রসঙ্গে শুদ্ধানন্দজী উল্লেখ করেন ঃ "স্বামীজী একদিন বলেন যে, মঠের নবীন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরা যেন মিশনের কাজকর্মের সুযোগ্য পরিচালনার জন্য স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে, আমেরিকায় ধর্মপ্রচারের জন্য স্বামী সারদানন্দজীকে, সিংহলে প্রচারকার্যের জন্য মহাপুরুষ মহারাজকে এবং বন্যাত্রাণকার্যের জন্য স্বামী তুরীয়ানন্দ ও স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে সংবর্ধনা জানায়। তদনুসারে একটি দিন ধার্য করে সভায় অভিনন্দনপত্রও পাঠ করা হয়। অভিনন্দনের উত্তরে মহাপুরুষ মহারাজ একটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দিয়েছিলেন। সভাভঙ্গের পর স্বামী বিবেকানন্দ মহাপুরুষ মহারাজকে বললেন, 'তারকদা, আপনার এত গুণ, আপনি চাইলেও আপনাকে আমরা হিমালয়ে তপস্যায় চলে যেতে দেব না। স্বামীজীর অনুরোধ মহাপুরুষ মহারাজ প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। তাঁর উপর অর্পিত সকল দায়িত্বভারই মহাপুরুষজী যোগ্যতার সঙ্গে সম্পাদন করেছিলেন।" এই ঘটনার উল্লেখ স্বামী বিবেকানন্দের একটি পত্রেও দেখতে পাই ঃ "Shivananda is here (Belur Math, Howrah) and I have toned down a bit his great desire to go to the Himalayas for good." (Complete

Works of Swami Vivekananda, Birth Centenary edition, Vol. VIII, page 444) অর্থাৎ, "শিবানন্দ এখানে (বেলুড় মঠ, হাওড়া) আছেন। তাঁর চিরদিনের জন্য হিমালয়ে তপস্যার্থ যাবার তীব্র ইচ্ছাটা আমি একটু দমিয়ে দিয়েছি)।"

১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে আমি কিছুদিনের জন্য মাদ্রাজে ছিলাম। সেখানে ময়লাপুরের শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে প্রায়ই যেতাম। স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী সে সময় ঐ মঠে ছিলেন। তিনি একদিন আমায় জানালেন যে, পূজ্যপাদ মহাপুরুষজী মহারাজ পরদিন মাদ্রাজে আসবেন। সেদিন দর্শনার্থীর প্রচণ্ড ভিড় হবে বলে আমি তার পরের দিন মাদ্রাজ মঠে আসি। এদিকে কিন্তু আমার পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধ পিতা দেরি না করে মহাপুরুষজীর আসার দিনই তাঁকে দর্শন করতে গেলেন। মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্টস হোমের ছেলেদের সঙ্গে তিনিও মহারাজকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন। মহাপুরুষজী আমার বাবাকে কৌতুকভরে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনিও ছাত্র নাকি?" প্রসঙ্গচ্ছলে বলে রাখি, ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে কেরলের হরিপাদে স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের দর্শনলাভের সৌভাগ্য হয়েছিল বাবার; বাবাকে তিনি বলেছিলেন, "আপনার অনেক বয়স হয়েছে। ঈশ্বরের নাম জপ করুন—আপনার পক্ষে তাই যথেষ্ট।" বাবা বলতেন ঐভাবেই স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর কাছে তাঁর দীক্ষালাভ হয়েছিল।

পরের দিন আমি মাদ্রাজ মঠে গেলাম। স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী আমাকে মহাপুরুষজীর কাছে নিয়ে গেলেন। আমাকে দেখামাত্র মহাপুরুষ মহারাজ বাংলায় বলে উঠলেন, "আমি তোমাকে দেখেছি।" আশ্চর্য হয়ে আমি বললাম, 'মহারাজ, আপনি আমাকে দেখেছেন বলছেন, কিন্তু কই, আমি তো ইতঃপূর্বে আপনাকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না!' এরপর তিনি মধুরকণ্ঠে আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করলেন। ইতোমধ্যে তাঁর প্রাণায়ামবিষয়ক বাংলা প্রবন্ধটি আমি মালয়ালাম ভাষায় অনুবাদ করেছি এবং আমার সেই অনূদিত রচনাটি রামকৃষ্ণ মিশনের মালয়ালাম মাসিকপত্র 'প্রবুদ্ধ কেরলম্'-এ প্রকাশিত হয়েছে শুনে মহাপুরুষজী এটুকুমাত্র বললেন, "প্রবন্ধ লিখতে আমি কি আর জানি! সুধীর (স্বামী শুদ্ধানন্দজী) তার সম্পাদিত 'উদ্বোধন' পত্রিকায় একটা লেখা দেবার জন্য আমায় ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। তাই কিছু লিখে দিলাম।" তিনি আরও বললেন, "তোমার বাবা পরম ভক্ত। তবে তাঁর কিছু মায়া আছে।"...

অন্য দিনের ঘটনা। সে দিনটি ছিল রামনবমী। আরও কয়েকজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হবার পরে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মহাপুরুষজী বড় হলঘরে বসলেন। একজন জমিদার—সম্ভবত বিজয়নগরের মহারাজাই হবেন—তাঁকে দর্শন করতে

এসেছিলেন। মহাপুরুষজী তাঁকে বললেন, "শ্রীরামচন্দ্রের এই জন্মতিথি রামেশ্বরম থেকে হিমালয় এবং দ্বারকা থেকে পুরী পর্যন্ত উদ্‌যাপিত হচ্ছে। কত হাজার হাজার বছর পার হয়ে গেছে, কিন্তু আজও তিনি সর্বত্র পূজিত। আচ্ছা, আপনি তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস' পড়েছেন?" মহারাজা 'রামচরিতমানস'-এর একটি ইংরেজি অনুবাদ পড়েছেন শুনে মহাপুরুষজী বললেন, "মূল তুলসীদাসীর সঙ্গে ইংরেজি অনুবাদের তুলনাই হয় না।" যা হোক, কিছুক্ষণ পরে মহারাজা প্রণাম করে বিদায় নিলেন। এর পরে মাদ্রাজ মঠের সাধু ও ব্রহ্মচারিগণ মহাপুরুষজীকে ঘিরে বসলেন; তিনি তাঁদের সঙ্গে হাস্যপরিহাসে এত মেতে উঠলেন যে, সকলেই অত্যন্ত আনন্দ পেলেন।

এখানে বলে রাখি, কিছুদিন পরে আমি হরিপাদে ফিরে যাবার পর আমার এক বন্ধু এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত সুন্দর টীকাসহ তুসলীদাসী রামচরিতমানসের একখানি চমৎকার সংস্করণ উপযাচক হয়ে আমায় এনে দিলেন। আমি গ্রন্থখানির 'পারায়ণ' শুরু করে দিলাম। আমার জীবনে নিয়ত অনুপ্রেরণার বস্তু এই বইখানি।

এর পরে আমি মাদ্রাজ মঠে যাই হরিপাদে প্রত্যাবর্তনের দিন মহাপুরুষজীকে বিদায়প্রণতি জানাবার উদ্দেশ্যে। তাঁর অপার করুণা—তিনি আমাকে নানাভাবে আশীর্বাদ করলেন। বললেন, "স্বামী নির্মলানন্দকে বলো যে, আমি এখানে আছি। আমার জ্বর হয়েছিল—ওরা এমন ছুঁচ ফুঁড়লে যে, এখনও গায়ে ব্যথা রয়েছে।" এই বলে শিশুর মতো নিজের হাতের দিকে তাকালেন। মহাপুরুষজী আরও বললেন, "শ্রীমায়ের যদি ইচ্ছা হয় তাহলে কন্যাকুমারীতে মায়ের পূজা দেব, ত্রিবান্দ্রাম আশ্রমেও যাব। স্বামী নির্মলানন্দকে এ কথাটিও জানিও।" শ্রীমায়ের নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মহাপুরুষজীর মুখমণ্ডল স্বর্গীয় আনন্দে উদ্ভাসিত হলো, চোখ দুটিতে পরম তৃপ্তির উজ্জ্বলতা ফুটে উঠল। আজ পর্যন্তও, যখনই সে দৃশ্যটির কথা চিন্তা করি, তখনই মহাপুরুষজীর সেই অলৌকিক মুখমণ্ডল যেন মানসপটে প্রত্যক্ষ ভেসে ওঠে।...

কেরলের প্রসিদ্ধ সংস্কৃত পণ্ডিত স্বামী আগমানন্দ বেলুড় মঠে গিয়ে শ্রীমহাপুরুষজীর মধ্যে তাঁর আদর্শ খুঁজে পেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি মহাপুরুষজীর অতুলনীয় ভক্তি ও ভালবাসা (তিনি যেন ঠাকুরের মধ্যেই বেঁচে ছিলেন), তাঁর অসীম নম্রতা (যদিও তিনি ছিলেন বিশ্বব্যাপী রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সর্বাধ্যক্ষ), প্রোজ্জ্বল ত্যাগধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে আগমানন্দজী আমাকে সর্বদাই পত্র লিখতেন। পরবর্তী কালে ইনি কেরলে ফিরে এসে নিজের পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতার

সাহায্যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতবাণী প্রচার করেন এবং আচার্য শঙ্করের পুণ্য জন্মভূমি কালাডিতে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর আকস্মিক দেহত্যাগের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বহুজনহিতকর কার্যে নিয়ত ব্যাপৃত থাকতেন।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের প্রথমভাগে আমি একদিন শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীকুমুদবন্ধু সেনের সঙ্গে কলকাতার উদ্বোধন কার্যালয়ে যাই এবং সেখানে প্রসাদ গ্রহণ করি। 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী সুন্দরানন্দজী সদ্যপ্রকাশিত বাংলা গ্রন্থ স্বামী অপূর্বানন্দ-সংকলিত 'শিবানন্দ-বাণী'র দ্বিতীয় খণ্ডটি আমায় দিলেন। ইতঃপূর্বে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'শিবানন্দ-বাণী' প্রথম খণ্ডটিও আমি সংগ্রহ করেছিলাম। উদ্বোধন কার্যালয়ের অধ্যক্ষ স্বামী আত্মবোধানন্দজী আমাকে স্বামী অপূর্বানন্দ-সংকলিত 'মহাপুরুষজীর পত্র' নামক বাংলা পুস্তকখানিও পাঠিয়েছিলেন। এ তিনখানি মনোরম গ্রন্থ আমি কতবার যে পড়েছি তার ইয়ত্তা নেই! সাধনমার্গের প্রকৃত ভক্তগণের জন্য এ গ্রন্থত্রয়ে মূল্যবান নির্দেশ রয়েছে—শুষ্ক পাণ্ডিত্যের ভাব নেই, ঈশ্বরপ্রেমে তন্ময় আত্মোপলব্ধিমান স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষের শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশামৃতে পরিপূর্ণ প্রতিটি পৃষ্ঠা। এজন্যই মনে হয়, মহাপুরুষজী মহারাজ আজও পর্যন্ত গীতোক্ত সেই 'লোকসংগ্রহের' কাজই করে চলেছেন।

মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দজীর সহিত সাক্ষাৎকার*

শ্রীআন্না এন. সুব্রহ্মণিয়ান্

১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ এপ্রিল স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের সঙ্গে স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ মাদ্রাজে শুভাগমন করেন। দুদিন পরে তাঁরা দুজনেই রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্টস হোমের সদ্যসম্পূর্ণ নব-নির্মিত বাসভবনটি দেখতে আসেন। তাঁরা ভবনটির মধ্যে প্রবেশ না করে বাইরে থেকেই দেখে বললেন যে, উদ্বোধনের শুভ-মুহূর্তে ভিতরে পদার্পণ করবেন। এই আমি প্রথম শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীকে দর্শন করলাম। ১০ মে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন যখন স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ভবনটি উদ্বোধন করলেন তখন মহাপুরুষজীও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। উদ্বোধন-অনুষ্ঠানের কদিন পর ব্রহ্মানন্দ মহারাজ একমাসের ওপর সেই নূতন ভবনে এসে বাস করলেন। সে সময় মহাপুরুষজী মাদ্রাজ মঠে ছিলেন এবং সকালে ও সন্ধ্যায় বেড়াবার সময় ব্রহ্মানন্দ মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে স্টুডেন্টস হোমে আসতেন।

---

* ইংরেজির অনুবাদ

১৯২২ খ্রিস্টাব্দে স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের মহাপ্রয়াণের পর মহাপুরুষজী সঙ্ঘের অধ্যক্ষরূপে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজে আগমন করেন এবং স্টুডেন্টস হোমের সংলগ্ন আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন করেন। এ সময় আমি তাঁর কাছে মন্ত্রদীক্ষার প্রার্থনা জানাই এবং তিনি কৃপা করে আমার প্রার্থনা পূর্ণ করেন। কদিন পর মাদ্রাজ মঠে যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো, তিনি যে ফল খাচ্ছিলেন তার থেকে নিজহাতে আমাকে প্রসাদ দিলেন। এরূপ স্থির হয়েছিল যে, স্টুডেন্টস হোমের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করতে আমাকে মাদ্রাজ ছেড়ে বাইরে যেতে হবে। আমি যখন মহাপুরুষজীকে প্রণিপাত করে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করলাম তখন তিনি বললেন, "তুমি এখন যাবে কেন?" আমি যখন বললাম যে, আমার টিকিট কেনা এবং অন্যান্য প্রস্তুতিও হয়ে গিয়েছে তখন তিনি বরং অনিচ্ছার সঙ্গে বললেন, "বেশ।" ফলত যেমন মহাপুরুষজী মনে করেছিলেন যে, দীক্ষার পর এত শীঘ্র আমার তাঁর সান্নিধ্য থেকে দূরে যাওয়া উচিত নয়, তেমনি আমার ভ্রমণও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। আমি টাকাকড়ির জন্য যেখানেই গেলাম সর্বত্রই আমাকে নিরাশ হতে হলো। আমি উপলব্ধি করলাম—মহাপুরুষজীর পূর্ণ সম্মতি নেই, একথা জানার পর আমার এই ভ্রমণ-পরিকল্পনা পরিত্যাগ করা উচিত ছিল।...

মহাপুরুষজীর সঙ্গে আমার তৃতীয়বার সাক্ষাৎকার হয় ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে। আমি ২৬ মে মাদ্রাজ থেকে তীর্থযাত্রা শুরু করে পথে রাজমুন্দ্রি, ভাইজাগ এবং পুরী দর্শন করে ৩১ মে বেলুড় মঠে পৌঁছলাম। স্টুডেন্টস হোমের অধ্যক্ষ শ্রী সি. রামস্বামী আয়েঙ্গার (রামু) আমার বিষয় মহাপুরুষজীকে আগে থেকেই লিখেছিলেন, সুতরাং আমি মঠে পৌঁছবার পূর্বেই মহাপুরুষজী তাঁর সেবক স্বামী কৈলাসানন্দজীকে আমার থাকার ঠিকমত ব্যবস্থা করতে বলেছিলেন। যখন মহাপুরুষজীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলো, তিনি রামু ও রামানুজের, তাঁদের পরিবারের সকলের, স্টুডেন্টস হোমের এবং যাঁরা সেখানে থাকতেন তাঁদের এবং মাদ্রাজের ভক্তদের সকলের বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ খোঁজখবর নিলেন।

ঠিক সে সময় স্বামী ভাস্বরানন্দজীর সঙ্গে একটি দল এবং আরও অনেকে কৈলাসদর্শনে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন; তাঁদের সঙ্গে আমারও যাবার ইচ্ছা ছিল। আমি যখন সেকথা মহাপুরুষজীকে জানালাম, তিনি বললেন, "এখানে ওখানে গিয়ে তোমার কি লাভ হবে? তুমি যদি হিমালয়ে যেতে চাও আমি প্রভু মহারাজকে বলব তোমাকে মায়াবতী নিয়ে যেতে, তিনি শীঘ্রই সেখানে যাবেন।" তাতেই আমার যাত্রা-সূচী নির্ধারিত হয়ে গেল।

আমি মায়াবতী রওনা হবার পূর্বে অদ্বৈত আশ্রমের মহাবীর মহারাজ আমাকে দক্ষিণেশ্বর, কাশীপুর বাগানবাটী, উদ্বোধন এবং অন্যান্য স্থান এবং রামলালদাদা ও শ্রীমকে দর্শন করতে নিয়ে গেলেন। ১১ জুন আমি প্রভু মহারাজের সঙ্গে মায়াবতী পৌঁছলাম। রামু কয়েক বছর যাবৎ অসুস্থ ছিলেন এবং ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে ১৭ জুন দেহত্যাগ করেন। খবরটি মহাপুরুষজীর কাছে পৌঁছতে তিনি গভীরভাবে মর্মাহত হলেন। স্বামী কৈলাসানন্দজীর কাছে আমি শুনেছিলাম যে, পরক্ষণেই মহাপুরুষজীর আমার জন্য চিন্তা হয়েছিল যে, রামুর মৃত্যুতে আমি কতখানি আঘাত পাব, কারণ রামুর আমি অত্যন্ত প্রিয় ছিলাম। দুর্গাপূজা পর্যন্ত আমি মায়াবতীতে ছিলাম, তারপর বেলুড় মঠে ফিরে গেলাম। পুনরায় শ্রীমহাপুরুষজীকে শ্রদ্ধা-ভক্তি নিবেদন করবার সুযোগ পেলাম। মহাপুরুষজীকে সেই আমার শেষ দর্শন। ১৯৩৪ খ্রিঃ তিনি মহাপ্রয়াণ করেন, কিন্তু তাঁর দিব্য শক্তি জীবনের প্রতিমুহূর্তে আমাদের অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত করছে।

আমার আচার্যদেবের স্মরণে*

ডঃ রাজেশ্বর ওঝা

শৈশবে আমার কাকার ছোট্ট দেবায়তনটি (ঠাকুরঘর) আমার কাছে পৃথিবীতে স্বর্গের প্রতিচ্ছবি ছিল। যখনই নিতান্ত আকস্মিকভাবে এই পবিত্র দেবায়তনটির ভিতর দৃষ্টিপাত করেছি তখনই আমি পুরাকালের মুনিঋষিদের দেখেছি। মানবজাতির এই পরিত্রাতাদের ঠিক মাঝখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জ্যোতির্ময় প্রতিকৃতিটি দেখতাম এবং এর কিছুটা নিচেই একজন মহামানবের একটি ছোট্ট ছবি ছিল। ছবিখানি সামান্য প্রতিমূর্তি হলেও তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব, মহত্ত্ব ও চিত্তাকর্ষক চাহনি অনুভব করতাম। এই দেবতুল্য ব্যক্তি ছিলেন স্বামী শিবানন্দজী, যিনি 'মহাপুরুষ মহারাজ' নামে সুপরিচিত। অন্যের কাছে যা প্রাণহীন ছবিমাত্র, আমার কাকার কাছে ছিল তা জীবন্ত সত্য। তিনি এরই সাথে কথা বলতেন, যা তাঁকে সুখে আনন্দ ও দুঃখে সান্ত্বনা দিত। প্রতিদিন পুজোর পর যখন তিনি স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করতেন, তখন তাঁর সেই স্বতঃপ্রবাহিত উদ্বেল ভাবরাশি ছন্দায়িত হয়ে পরিবারের সব কটি ছেলেমেয়েকে আকর্ষণ করত।

* ইংরেজির অনুবাদ

আমি কাকার কাছে হিতোপদেশ ও পঞ্চতন্ত্রের গল্প ও মনীষীদের জীবন কাহিনী শুনতে ভালবাসতাম। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-গাথা থেকে নেওয়া তাঁর বর্ণিত চিত্তাকর্ষক ঘটনাবলী আমাদের মনোযোগ এমন ভাবে আকর্ষণ করত যে, যদি আমাদের কখনো ডাকা হতো আমরা তৎক্ষণাৎ ফিরে আসতাম, আর অসীম আগ্রহের সঙ্গে কাকার ছোট্ট গল্পগুলো শুনতাম। পাশ্চাত্যে ঐতিহাসিক ধর্মপ্রচারের পর ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে আয়োজিত সংবর্ধনা-সভায় কাকা স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন এবং কলকাতা শিয়ালদহ স্টেশনে অনুষ্ঠিত বর্ণাঢ্য ও বিচিত্র সেই বিজয়যাত্রার মনোহারী বর্ণনায় আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতেন! সম্পূর্ণ নাটিকাটি যেন আমাদের চোখের সামনে পুনর্বার অভিনীত হতো। তিনি তিন স্থানে—ক্রীড়াঙ্গন, রণক্ষেত্র এবং গণভাষণ-মঞ্চে বিজয়ের একটি পার্থক্য প্রকাশ করে দেখাতেন এবং এগুলোর মধ্যে শেষোক্তটিকে তিনি শক্তি ও মহত্ত্ব যাচাই করার শ্রেষ্ঠ স্থান বলে মনে করতেন।

এই প্রভেদের আলোকেই আমি এই বিখ্যাত পংক্তিটির অর্থ পরে বুঝেছিলাম—'ইটনের ক্রীড়াক্ষেত্রে ওয়াটারলুর যুদ্ধ জয় করা হয়েছিল।' এবং 'গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল তোমাকে স্বর্গের বেশি নিকটে নিয়ে যাবে।'—স্বামীজীর এই উক্তিটিরও মর্মার্থ অনুধাবন করেছিলাম। কাকার দৃষ্টিতে স্বামীজী আলেকজাণ্ডার বা নেপোলিয়ঁর চেয়ে বিজেতা হিসাবে মহত্তর ছিলেন। শেষের দুজন জৈবশক্তির সাহায্যে মানুষকে পরাভূত করেছিলেন, প্রথম জন আধ্যাত্মিক শক্তির সহায়তায় মনের মুক্তি দিয়েছিলেন।

গয়ায় বিদ্যালয়ে আমার জনৈক শিক্ষক কাকার প্রভাবটিকে গভীরতর করেছিলেন। তিনি আমাকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মৌলিক কথোপকথন সহজে আয়ত্ত করার জন্য বাংলাভাষায় জ্ঞানলাভ করতে উৎসাহিত করেন। হয়তো কোনও দিন বিজ্ঞান বায়ুমণ্ডলে অনুরণিত প্রাচীন ঋষিদের উক্তিসমূহ বন্দি করে পুনরায় শোনাতে পারে, কিন্তু এই স্বপ্ন সার্থক হবার প্রতীক্ষায় থেকে বলা যেতে পারে যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবই একমাত্র অবতার-পুরুষ যাঁর কথোপকথন অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ ও রক্ষিত রয়েছে। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আমাকে জ্ঞানের অমূল্য ভাণ্ডারের পথ নির্দেশ করেছিলেন। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' জ্ঞানের অফুরন্ত উৎস এবং তা থেকে প্রাপ্ত প্রেরণা আমাকে শেকস্‌পীয়রের যথার্থ মূল্যাঙ্কনেও সাহায্য করে। এই অমূল্য উত্তরাধিকারের জন্য আমরা শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্তের (মাস্টার মহাশয়) নিকট ঋণী। কলকাতায় ১৯৩০ সালে শ্রীম-কে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।...

পরিবার ও বিদ্যালয়ের এই অনুকূল পটভূমি আরও বিস্তৃত অন্বেষণের জন্য আমার কৌতূহলকে জাগ্রত করেছিল—স্বাভাবিকভাবেই দক্ষিণেশ্বর ও বেলুড়ের প্রতিই আমার প্রথম আকর্ষণ হয়। দক্ষিণেশ্বর তখনও পাগল-করা জনারণ্য থেকে বহুদূরে—আমায় যেন তাঁর অরণ্যের গভীরে ঝাঁপ দিতে আমন্ত্রণ জানাল। বেলুড়কে জনবসতি থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন গঙ্গার সঙ্গে একীভূত বলেই বোধ হতো; তাঁর আড়ম্বর-মুক্ত পরিবেশ এমন একটি সুমহান গাম্ভীর্যকে প্রচ্ছন্ন করে রাখত যা এখন হয়তো চিরতরেই হারিয়ে গিয়েছে। আমি বহুবার এই দুটি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র দর্শন করেছি। এ ছাড়া স্বদেশে এবং বিদেশে রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশনের বেশির ভাগ কেন্দ্রই দেখেছি। শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকজন পার্ষদের অমর বাণীও শুনবার সুযোগ আমার হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ ছাড়া তৎকালীন অন্য সব অধ্যক্ষদের পদপ্রান্তে বসবার সৌভাগ্য লাভ করেছি। এই দুর্লভ সৌভাগ্যের জন্য আমি দ্বিতীয় অধ্যক্ষ পরমপূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের কাছে অশেষ ঋণী, যিনি আমাকে ১৯৩১ সালে মন্ত্রদীক্ষাদানে কৃতার্থ করেন। এই সংক্ষিপ্ত স্মৃতিকথাচিত্রণে মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারে শুধু তিনটি ঘটনার উল্লেখের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখব।

তখন ইংরেজি ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি, বারাণসী থেকে বেলুড় মঠে ফিরবার পথে মহাপুরুষ মহারাজ তিনদিন পাটনায় ছিলেন। আমি সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ে বিশেষ সংশয়গ্রস্ত। নিজের ক্ষমতার প্রতি আমার আস্থা তখন অপচীয়মান, আমার মনে হলো যে এই মহাপুরুষের দর্শন আমাকে এ কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় আত্মবিশ্বাস এবং শক্তি এনে দেবে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই আমি প্রতিদিন স্থানীয় আশ্রমে মহাপুরুষ মহারাজের শ্রীচরণসমীপে উপস্থিত হতাম, কিন্তু সর্বদাই তাঁকে ভক্তদের সঙ্গে কথোপকথনে ব্যস্ত দেখেছি। দীক্ষার্থী ভক্তদের দেখে আমি ভাবলাম যে, 'দর্শন' অপেক্ষা 'মন্ত্রগ্রহণ' হয়তো আমার উপর বেশি প্রভাব বিস্তার করবে। আমি মহাপুরুষজীকে প্রশ্ন করেছি এবং যথাযোগ্য উত্তরও পেয়েছি, কিন্তু তাঁর নিকট আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রকাশ করিনি। একদিন সাহস অবলম্বন করে শ্রদ্ধাবিনম্রচিত্তে মহাপুরুষজীর কাছে প্রার্থনা নিবেদন করলাম আমার প্রতি গুরুরূপে কৃপা করার জন্য। তিনি কিছুটা কৌতুক বোধ করেছিলেন, কিন্তু যখন তিনি আমাকে মন্ত্রগ্রহণের জন্য যথাবশ্যক প্রস্তুত হতে এবং সর্বোপরি ঈশ্বরকৃপার ভিখারি হয়ে প্রতীক্ষা করতে বললেন, তখন আমার প্রতি তাঁর সুগভীর স্নেহ ও করুণা আর গোপন রইল না।

এরই প্রায় বছর দুয়েক পর ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে দুর্গাপূজার সময় বেলুড় মঠে

শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের সান্নিধ্যে আসবার সুবর্ণসুযোগ লাভ করি। এই সময় আমি স্বামী মাধবানন্দজীর সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়ে উঠেছি। তাঁর হৃদয়ে সর্বদাই আমার জন্য একটি কোমল স্থান ছিল। আমি মঠে সপ্তাহকাল বাস করে তাঁর কাছে কিছু শিক্ষালাভ করি। তিনি আমার জন্য একটি সুচিন্তিত সময়সূচী তৈরি করে রেখেছিলেন এবং আমিও তা সানন্দে পালন করেছি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কায়িক শ্রমের মর্যাদা সম্বন্ধে আমাকে কিছু শেখানো, যার মূল্য আমি এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি বুঝতে শিখেছি। স্বামী মাধবানন্দজী পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীর কাছে আমার মন্ত্রদীক্ষার জন্য সুপারিশ করলেন; কিন্তু মহাপুরুষজীর নিজস্ব মতামত অন্য প্রকার ছিল। তিনি আমায় এই বলে আশ্বাস দিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর গণ্ডিভাঙা উদার ভালবাসা আমার প্রতি বর্ষণ করবেন যদি আমি সর্বতোভাবে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করি। যাই হোক, প্রতিদিনই মহাপুরুষজীর শ্রীচরণসমীপে যেতাম এবং ভক্তদের উদ্দেশে প্রদত্ত তাঁর অমূল্য উপদেশগুলি শুনতাম। দীক্ষার বিষয়ে আমার প্রমাণপত্র ছিল বেশ সন্তোষজনক, সেখানে স্বার্থ বা তুচ্ছ আকাঙ্ক্ষার লেশমাত্রও ছিল না। কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও আমার হৃদয়ের কোণে প্রায় অদৃশ্যভাবে লুকানো এক উচ্চাকাঙ্ক্ষার হাত থেকে নিস্তার পেতে পারিনি, যা পূর্ণ করা অনেক পরে আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল উচ্চশিক্ষার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকা যাবার। আশা ছিল যে, আমার দিক থেকে খোলাখুলিভাবে প্রার্থনা না জানালেও এই স্বপ্নটিকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য কৃপাময় মহাপুরুষ মহারাজ অলৌকিক কিছু করবেন।

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মের ছুটিতে জুন-জুলাই মাসে যখন বেলুড় মঠে বাস করি তখন নিজেকে অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবান মনে করি। স্বামী মাধবানন্দজী আমাকে মাসাবধিকাল বেলুড় মঠে বাস করতে উৎসাহিত করেন। তিনি আমায় উপনিষদের সঙ্গে পরিচিত করালেন এবং ঔপনিষদিক জ্ঞান ভালভাবে অধিগত করতে জোর দিয়ে বললেন। তা ছাড়া একটি হিন্দি পত্রিকার সম্পাদনার জন্য আমার যোগ্যতা জানবার চেষ্টা করলেন। তিনি 'সমন্বয়' নামক পত্রিকাটির দুর্ভাগ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করে ঐটিকে একটি নূতন নামে পুনঃপ্রচারিত করা যাবে বলে আশা প্রকাশ করলেন। তদনুসারে আমার প্রায় সবটুকু সময়ই পুস্তকরাজির মধ্যে অতিবাহিত হতো।

আমার গতবারের মঠবাসের কথা ভেবে দেখলে একপ্রকার বলা চলে যে, মঠের রন্ধনশালা থেকে গ্রন্থাগারে আমার পদোন্নতি হলো। কোন দ্বিধাবিভক্ত লক্ষ্য আমার ছিল না এবং কোন বিশেষ প্রার্থনা বা আশা ছাড়াই আমি যতবার সম্ভব

শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীর চরণপ্রান্তে যেতাম। আমি আঁচ করেছিলাম যে, স্বামী মাধবানন্দ আমার সম্বন্ধে মহাপুরুষজীর সঙ্গে আলোচনাদি করেছেন। আমার দিক থেকেও কোন ঔৎসুক্য প্রকাশ করা হলো না এবং স্বামীজীদের দিক থেকেও কোন আশ্বাস আমাকে দেওয়া হয়নি। আমার সবটুকু আন্তরিকতা ও আকুলতা কোনপ্রকারে বহিঃপ্রকাশিত না হয়ে অন্তরের গভীরেই লুকানো ছিল। স্বামী মাধবানন্দ আমাকে যে কার্যভার দিয়েছিলেন আমি তাতেই মগ্ন ছিলাম।

এমন সময় এক সুন্দর সকালে গঙ্গাস্নান করার সময় শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের অন্যতম একনিষ্ঠ সেবক স্বামী কৈলাসানন্দজীকে দ্রুতপদে আমার দিকে আসতে দেখি। তিনি এসে বললেন যে, পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ তখনই আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন। আমি কোনমতে স্নান শেষ করে, বলতে গেলে একরকম দৌড়েই তাঁর শ্রীচরণসমীপে উপস্থিত হলাম—অবশ্য এই যজ্ঞের ভূমিকাস্বরূপ মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রথম প্রণাম নিবেদন করে। মহাপুরুষজীর চরণে প্রণত হতেই তিনি আমাকে শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে উৎসর্গ করবার আশ্বাস দিলেন।

অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত সাধারণ অথচ মনোজ্ঞ ছিল। এর প্রতিটি অঙ্গ অতি পবিত্র, তা বর্ণনা করা যায় না। গুরু এবং শিষ্য ছাড়া সেই শুভক্ষণে অন্য কেউ উপস্থিত ছিল না—গুরু যোগিজনোচিত প্রশান্তমূর্তিতে সুখাসনে আসীন আর দীক্ষার্থী শ্রদ্ধাবিনম্রচিত্তে মন্ত্রগ্রহণে উন্মুখ। পূতমন্ত্রদানের পর গুরুর আদেশে গুরুর সঙ্গেই মন্ত্রোচ্চারণ করলাম। দীক্ষার তাৎপর্যের কথা এবং এই নূতন জীবনে সর্বদাই নিজেকে যোগ্য প্রমাণিত করার কথা গুরুদেব আমাকে সব সময় মনে রাখতে বললেন। শ্রীগুরুর কথাগুলো জীবন্ত বলে মনে হলো, বাকি যা তা শুধু উপলব্ধি।

* * *

মহাপুরুষ মহারাজ সংস্কৃত, হিন্দি, বাংলা ও ইংরেজি—এই চারটি ভাষা জানতেন। আমি তাঁর সঙ্গে বাংলায় কথা বলতে শুরু করতাম, কিন্তু তিনি ঠিক সেই হিন্দিতেই আমাকে নিয়ে আসতেন—অবশ্য তা না বলেই। স্বামী মাধবানন্দ আমার সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলতে শুরু করতেন, কিন্তু আমার আগ্রহাতিশয্যে বাংলায় চলে আসতেন। স্বামী শুদ্ধানন্দজী আমার সঙ্গে বাংলায় ছাড়া অন্য কোন ভাষায় কথা বলতেন না। সাধুগণের সঙ্গে আমি বাংলাতেই কথা বলতে চাইতাম, কিন্তু মহাপুরুষ মহারাজের বেলায় জোর খাটাতে পারতাম না, কারণ তিনি আমার সঙ্গে সর্বদা হিন্দিতেই কথাবার্তা বলতে দৃঢ় থাকতেন। আমার নিকট লেখা চিঠিগুলিতে অবশ্য শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীর ইংরেজি স্বাক্ষর বহন করত, বাকিটুকু তাঁর একান্ত সচিব (প্রাইভেট সেক্রেটারি) শ্রুতিলিখনের মতো নিজের হাতে লিখতেন।

একবার মহাপুরুষ মহারাজের সামনে বসে বিস্ময় প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "সাধুগণ গান্ধীজীর স্বরাজ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন না কেন?" তৎক্ষণাৎ তিনি উত্তরে বললেন, "স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পরে তুমি নিজেই এর উত্তর জানতে পারবে।" আরও বললেন, "আমাদের কাজ হলো—মানুষ তৈরি করা, রাষ্ট্রগঠন নয়; পূর্ব ও পশ্চিম দুদিকেই মানবসভ্যতা এক চূড়ান্ত পরীক্ষার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। সংস্কৃতি এবং সামাজিক মূল্যকে নূতন পথে চালিত করবার প্রাথমিকী হিসেবে সর্বপ্রথম মানুষকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য কর।" মানবজাতির পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের অবতাররূপে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। তাঁর পুণ্য নামে প্রতিষ্ঠিত ধর্মসঙ্ঘ সমগ্র পৃথিবী জুড়ে এক শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের সূত্রপাত করেছে। পৃথিবীর আধুনিক ইতিহাসে বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ ও শিবানন্দের সঙ্গে সমাসীন হবার মতো কে আছেন? তাঁরা সভ্যতাকে উন্নততর ও জীবনকে মধুরতর করেছেন। তাঁরা ধর্মকে নূতনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ধর্ম শুধু বিশ্বাসের নয়, গভীর আত্মোপলব্ধির বস্তু। পূজ্যপাদ আচার্য শিবানন্দজী মহারাজ ছিলেন শাশ্বত সত্যের জীবন্ত প্রতীক। তিনি বলতেন—শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অন্তরের অন্তরতম হয়ে রয়েছেন এবং তিনি ভেতর থেকে যেমন নির্দেশ পাচ্ছেন, ঠিক তেমন ভাবেই কাজ করছেন। সেই নরদেহধারী ভগবানের আলোকশিখাকে নিষ্কম্প ঔজ্জ্বল্য প্রদান করাই ছিল তাঁর প্রধান কাজ এবং সে দায়িত্ব তিনি পরিপূর্ণভাবেই নিষ্পন্ন করেছেন। তিনি আমাদের মধ্যে নেই, একথা বলা ভুল। দিব্যাসনে বসে তিনি পৃথিবীর বুকে মানুষের ভাগ্যরচনা করে চলেছেন। আমার উপর তিনি সততই তাঁর অফুরন্ত স্নেহকরুণা বর্ষণ করছেন। তিনি নিত্য, শাশ্বত, সনাতন।

স্মৃতিতর্পণ—পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীর পদকমলে

শ্রীনন্দীপতি মুখোপাধ্যায়

(মহাপুরুষজীর 'নন্দীভৃঙ্গী')

সে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসের কথা। আমি কলকাতায় গিয়েছি Indian Police Service (ইণ্ডিয়ান পুলিস সার্ভিস) পরীক্ষা উপলক্ষে। সে সময় পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমহাপুরুষজী কলকাতায় হরিশ চাটার্জি রোডে ভবানীপুর গদাধর আশ্রমে অবস্থান করছিলেন। পাটনায় স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ ও স্বামী রামানন্দ আমায়

ঠিকানা ও পথের নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরীক্ষার মধ্যেই একদিন সন্ধ্যার পূর্বে মহাপুরুষজীর দর্শনমানসে গদাধর আশ্রমে উপস্থিত হই। আমার সঙ্গে ছিলেন কলেজের সহপাঠী ও বন্ধু, যাঁর কাছে Medical College Mess-এ (মেডিক্যাল কলেজ মেস) কলকাতায় উঠেছিলাম। সেখানে পৌঁছে দেখি মহাপুরুষ মহারাজ একটি ঘরে চেয়ারে আসীন আছেন এবং অনেকে তাঁর পাশে মেঝেতে বসেছেন। এই আমার প্রথম দর্শন শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীকে। আমি প্রণাম করে নিজ (পাটনার) পরিচয় দিয়ে সকলের মধ্যেই বসে পড়লাম।

রাজনীতি সম্বন্ধে কথাবার্তা হচ্ছিল। মহাপুরুষজী বললেন, "Politics (রাজনীতি) দিয়ে সাময়িকভাবে কিছুটা সুবিধা হতে পারে, অনেক সমস্যার সমাধানও হতে পারে, তবে স্থায়ী সমাধান যদি চাও তো সেটা আধ্যাত্মিক উন্নতিতেই সম্ভব। এ তো ঐতিহাসিক সত্যের ব্যাপার,"...পরে আবার সেবাধর্ম সম্বন্ধে প্রসঙ্গক্রমে বললেন, "ঠিক ঠিক ভাবে করলে এই সেবাধর্মের ভিতর দিয়েই যোগ, জ্ঞান, ভক্তি লাভ হতে পারে এবং হয়েও থাকে, কর্তৃত্বাভিমান যায় এবং অকর্তৃত্ববোধ জাগে। কর্ম তখন উপাসনা হয়ে যায়—work becomes worship. আর worship (উপাসনা) হলেই যোগ, জ্ঞান, ভক্তি আসে—এটাই এ যুগের 'কর্মসু কৌশলম্'। এই জেনে কাজ করবে।" বিশেষ পরিচয় দিয়ে যখন বললাম যে, কলকাতায় চাকরির জন্য পরীক্ষা দিতে এসেছি—তখন মহাপুরুষজী খুবই গম্ভীরস্বরে বললেন, "Government service (সরকারি চাকরি) করতে যাচ্ছ—তোমরা তো servant (চাকর), master (প্রভু) কিন্তু government (সরকার)। তেমনি নিজ নিজ জীবনে জানবে তিনি (ঈশ্বর) Master (প্রভু), আর তোমরা তাঁর servants (চাকর) এই জ্ঞানে সকলে বীর মহাবীর হয়ে যাও। 'গুরু মেহেরবান তো চেলা পহলবান।' কর্ম করতে গিয়ে নিজের আচরণের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে। সাবধান ও সজাগ থাকবে। তোমার আচরণ লোক অনুকরণ করবে। তোমার আচরণ ও কথার মধ্যে সমতা দেখে লোকের আস্থা, বিশ্বাস ও ভক্তি বাড়বে। কথায় ও আচরণের মধ্যে যেন প্রভেদ না হয়।" আমি বললাম, "কাজকর্মের ভিড়ে ভগবানের স্মরণ-মননের, ধ্যান-জপের সময় হয়ে ওঠে না।" তা শুনে মহাপুরুষজী বললেন, "সময় পাও না, সময়ের অভাব বলছ। যাদের জীবনটা regulated (নিয়ন্ত্রিত) নয় তারাই সাধারণত এ জাতীয় কথা বলে থাকে। যাদের জীবন regulated (সুনিয়ন্ত্রিত) তারা কাজকর্মের মধ্যেই প্রচুর সময় করে নিয়ে থাকে। চোখের সামনে অনেক উদাহরণ নিজেরাই তো দেখছ।" এভাবে মহাপুরুষজী অনেক কিছু বললেন। সব দেখে শুনে বেশ ভাল লাগলো এবং মনে হলো এক বিরাট পুরুষের সামনে আমি মুখোমুখি উপস্থিত হয়েছি। বিদায় নেবার সময় তাঁর আশীর্বাদ ভিক্ষা করে

প্রণামান্তে বললাম, "So I have seen the Son though not the Master, Father.—অতএব প্রভু বা পিতাকে না দেখলেও পুত্রকে দেখেছি। ধন্য আমি।"...

এরপরে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে বেলুড় মঠে সাধু-সম্মেলনের সময় পাটনার স্বামীজীদের সঙ্গে সেখানে যাই। সে সময় গঙ্গাতীরের ঐ পুণ্যপীঠ বেলুড় মঠে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ, শরৎ মহারাজ, স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ, খোকা মহারাজ, স্বামী নির্মলানন্দ মহারাজ এবং অনেক প্রাচীন ও নবীন সন্ন্যাসীদের দর্শন, স্পর্শন ও পূতসঙ্গ লাভের সুযোগ এবং সৌভাগ্য হয়। এর পূর্বে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে পাটনায় ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে দেখবার ও তাঁর সঙ্গ করার সুযোগ পাই। পরে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে জয়রামবাটীতে মাতৃমন্দির-প্রতিষ্ঠার সময় ৫।৬ দিন স্বামী সারদানন্দ মহারাজের সঙ্গলাভ হয়েছিল। দেখেছিলাম স্বামী সারদানন্দজীকে শ্রীশ্রীমায়ের একনিষ্ঠ সেবক, যেন মায়ের ভাবে ভরপুর! শুনেছিলাম শ্রীশ্রীমায়ের অনুগত দ্বারপাল সারদানন্দ মহারাজ—প্রত্যক্ষ করলাম তাই। সাধু-সম্মেলনের সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের সাক্ষাৎ সন্তানদের অনেককে একত্র দেখি। এ কি কম সৌভাগ্য! শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্থূলশরীরে দর্শন করার সৌভাগ্য হয়নি, কিন্তু তাঁর অংশসম্ভূত এতজন সাক্ষাৎ সন্তানের দর্শনও কম সৌভাগ্যের কথা নয়। এখনও ঐ ঘটনা স্মরণ করে গর্ব অনুভব করি। শুধু তাঁদের দর্শন নয়, তাঁদের পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা, পরস্পরের প্রতি ব্যবহারাদিও কিছু লক্ষ্য করেছিলাম, শুনেছিলাম। সুযোগ পেলেই শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীর ও স্বামী নির্মলানন্দজীর পূতসঙ্গে কিছু সময় কাটাতাম, ছোটখাট সেবা করার সুযোগের অপেক্ষায় থাকতাম, এত কাছে থাকতাম যে, তাঁদের শ্বাস-প্রশ্বাসও আমার গায়ে লাগত! সেই সমারোহে ৫।৭ দিন ছিলাম, গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে অনেক কিছুই লক্ষ্য করতাম, শুনতাম, মতামত দিতাম এবং তর্কও করতাম। এসব দেখাশুনা নিজের মনটিকে তৈরি করতে অনেক সাহায্য করেছে।...

* * *

সাধু-সম্মেলনের পরে একদিন মহাপুরুষজীর ঘরে গিয়ে তাঁর কাছে আবোল-তাবোল কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি কিন্তু ধৈর্যসহকারে সব প্রশ্নগুলির উত্তর দেন। আমি বলেছিলাম, "সাধনভজনে মনটাই তো সব চাইতে বড় সমস্যা দেখছি।" তা শুনে তিনি স্মিতমুখে বললেন, "সাধন-ভজন তো মনটাকে নিয়েই। মনেতেই সুখ-দুঃখ, স্বর্গ-নরক, হিংসা-দ্বেষ ইত্যাদি। মনটাকে সংযত করে যে বিষয়ে লাগাবে, সুফল পাবে। এর জন্য সময় করে বসবে নিয়ত এবং বেশ করে self-introspection ও self-analysis অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টি ও আত্মবিশ্লেষণ করবে। ব্রাহ্মণের ছেলের পক্ষে এটা তো সহজ, কারণ সে যখন নিত্য সন্ধ্যা-আহ্নিকে বসে তখন তো এটাই

করে থাকে। তখন সে একটা প্রশান্ত, স্থির, সীমাহীন সমুদ্রের ধ্যান করে—এই ধ্যানে অশান্ত চিত্ত শান্ত ও স্থির হয়। তারপর সেই স্থির মনে সৎ suggestion (নির্দেশ) সব দিয়ে থাকে, 'কুমারীং ঋক্‌বেদযুতাং ব্রহ্মাদ্ধপাং বিচিন্তয়েৎ...' ইত্যাদি। জীবনে একটা লক্ষ্য স্থির করে নিতে হয় beacon light (আলোক-বর্তিকা)-এর মতো। একটা আদর্শ রাখবে—সেই ছাঁচে নিজেকে গড়বার জন্য। শ্রীশ্রীঠাকুর এ যুগের আদর্শ, ভাবঘনমূর্তি—totality (সমগ্রতা)-র। ঠাকুরকে আদর্শ করতে পারলে দেখবে তাঁর কৃপা পেয়ে ধন্য হয়ে যাবে।"

তারপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, "জগৎ যদি মিথ্যা তো সত্য-মিথ্যার মাপকাঠি কি?" তাতে মহাপুরুষজী বললেন, "বিচার করবে মনে মনে কোনটা সত্য ও কোনটা মিথ্যা। যার স্থিরতা নেই, যা বদলাচ্ছে অহরহ, তারই জন্য অর্থাৎ সেই অনিত্য বিষয়ের ওপর ভরসা করা যায় না এবং ভরসা করা উচিতও নয়। যা চিরস্থির, বদলায় না, অজর অমর, অচল অটল—সেই নিত্য এবং তার ওপর ভরসা করা যায় এবং ভরসা করা উচিত—সেটাই সত্য অর্থাৎ একমাত্র আত্মাই সত্য। অনিত্য বা মিথ্যার সঙ্গে যোগ হলে বিয়োগ অনিবার্য এবং বিচ্ছেদেই দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদি। চিরানন্দ নিত্য সত্যের সঙ্গে যোগের বিচ্ছেদ নেই।" আমি বললাম, "দুঃখ-কষ্ট বিশ্বাসের অন্তরায়।" মহাপুরুষজী বললেন, "তা কেন? দুঃখ-সুখ, বিপদ-সম্পদ ভগবান আমাদের দিয়ে থাকেন চিত্তশুদ্ধি, ভক্তিপুষ্টির জন্য। দেখিয়ে দেন তিনিই কর্তা, তিনিই আশ্রয়। দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়ে ভগবানে শরণাগতি আসে। সুখ-সম্পদ হলেই তিনি ভাল, দুঃখ বিপদ হলেই তিনি মন্দ—এ রকম মনে করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বিপদ-আপদ ঈশ্বরের স্মরণ-মননের সহায়ক বলে জানবে। আমরা যখন নিঃসম্বল অবস্থায় তীর্থে বা দুর্গম পথে কন্দরে বিচরণ করতাম, যখন কোন আশ্রয় পেতাম না, চারদিক অন্ধকার, তখন দেখতাম ঠাকুর পাশে থেকে, সঙ্গে থেকে অভাবনীয় ভাবে চালিত করেছেন, রক্ষা করেছেন। এখনও দেখছি তাই। আজ যে শ্রীঠাকুরের নামে এই মঠে এত নরনারী সমবেত হয়েছে, দেশ-বিদেশ থেকে এত ভাষাভাষী এসেছে, এটা তো তাঁরই মহিমা। ঠাকুর বলেছিলেনও এই কথা—তাঁর ভক্তেরা আসবে দূর দূর স্থান থেকে—নানা ভাষাভাষী। এসব দেখেও যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে আর কি বলব বল? তবে এটা কিন্তু নিশ্চয় জানবে যে, এ বিশ্বাস হবেই—যখন তোমরা এখানে এসেছ, তাঁর আশ্রয় পেয়েছ। তিনি কপালমোচন।"

* * *

মেজদার সঙ্গে আমি ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে বড়দিনের ছুটির সময়

৺কাশীধামে গিয়েছিলাম। সে সময় পূজ্যপাদ মহাপুরুষজী সেবাশ্রমে অবস্থান করছিলেন। মোগলসরাই স্টেশন থেকে গাড়ি ছাড়তেই মেজদা ও আমি আলোচনা করতে লাগলাম—কাশী পৌঁছে প্রথম গিয়ে ৺বিশ্বনাথকে দর্শন করব, না আশ্রমে গিয়ে শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজকে এই চিন্তা নিয়ে বারাণসী ক্যান্টনমেণ্ট স্টেশনে নামলাম। মেজদা আর. এম. এস. অফিসে কিছু কাজ সেরে নেওয়ার পরে যখন আমরা টোঙ্গায় উঠলাম, তখন যেন মন্ত্রচালিত ভাবে বললাম, 'চলো কোড়িয়া হাসপাতাল, লক্সা।' কে যেন টেনে হাত ধরে আমাদের নিয়ে গেল সেখানে। অদ্বৈত আশ্রমে পৌঁছতেই স্বামী নির্ভরানন্দ (চন্দ্র মহারাজ) বললেন, "যাও, সেবাশ্রমে। মহাপুরুষজী সেখানে আছেন—দর্শন কর গিয়ে।" সেবাশ্রমের অম্বিকাধামে একটি ঘরে প্রবেশ করে দেখি পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ খাটে শুয়ে আছেন, তাঁর পরিচর্যা করছিলেন একজন সেবক। আমরা ঘরের মধ্যে যেতেই তিনি আমাদের দেখে আনন্দে বলে উঠলেন, "এই যে মহাদেব, নন্দীভৃঙ্গী, এসেছ! ভাল ভাল।" তাঁর ঐটুকু স্নেহময় সম্ভাষণেই আমাদের অন্তর ভরে গেল। প্রণাম করতেই তিনি গাঢ় অন্তরঙ্গতার সঙ্গে পাটনা আশ্রমের ও আমাদের বাড়ির সব খবর নিলেন। পরে সেবক মহারাজকে সঙ্গে দিয়ে আমাদের অদ্বৈত আশ্রমে উপরের একটি ঘরে থাকার ব্যবস্থা করতে বললেন।

আমাদের মনে যে-প্রশ্ন উঠেছিল সে বিষয় পরে কথাপ্রসঙ্গে বলায় মহাপুরুষজী আমাদের বিশেষভাবে আশ্বাস দিয়েছিলেন। বললাম, "আমাদের মনে মোগলসরাই থেকে এক প্রশ্ন উঠেছে—শিবধন্য কাশীতে আশ্রমে গুরুস্থানে আপনি রয়েছেন, অতএব কাশীতে নেমে আগে ধুলোপায়ে ৺বিশ্বনাথ দর্শন করব, না আপনাকে দর্শন করব। আমরা কিন্তু সোজা আপনার কাছে এসেছি। এটা ঠিক হয়েছে কি?"

আমাদের কথা শুনে শিবস্বরূপ মহাপুরুষজী প্রসন্ন হয়ে বললেন, "তোমাদের মনের প্রশ্নটা ভালই—তোমরা যা করেছ তাতে কোন দোষ হয়নি। এই প্রশ্ন যখন তোমাদের মনে উঠেছে তখন তাঁর কৃপা বলেই জানবে। আর এ প্রশ্নটা তো আমাকে নিয়েই। তা ভাল। আর জান বাবা, সেই ৺বিশ্বনাথ ঠাকুর তো এই শরীরের মধ্যে রয়েছেন। তা এখানে বা সেখানে একই! তোমাদের এই শুভ প্রশ্নের মধ্য দিয়ে তিনি দেখিয়ে দিলেন তোমাদের মহাকল্যাণের জন্য, ভক্তিবিশ্বাসের জন্য—তিনিই কর্ণধার। কোনও ভয় নেই—তোমরা ঠিকই করেছ, তোমাদের মনে এই প্রেরণা শ্রীঠাকুরই দিয়েছেন। এই ৺কাশীক্ষেত্রে নানাভাবে কত যে দর্শনাদি হয়েছে তা আর কি বলব!" এতটুকু বলেই গম্ভীর হয়ে গেলেন।

পরে ভক্তের দুঃখকষ্টের প্রসঙ্গে মহাপুরুষজী বললেন, "দুঃখকষ্ট, বিপদ-আপদ

ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ মনটা তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। যে মুহূর্তে তাঁর কথা মনে উদিত হয় সে মুহূর্তে সব দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ পালাতে থাকে। তাঁর প্রতি মন যাওয়া মানে তাঁর সঙ্গে যোগ এবং সেটা শুভ লক্ষণ।"...

* * *

বহু বৎসর থেকে কাশী অদ্বৈত আশ্রম ও সেবাশ্রমের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। বাবা-মা কাশীতে নিত্য সকালে ৺গঙ্গামৃত্তিকার দুটি শিবলিঙ্গ তৈরি করে পূজা করতেন, শিবমহিম্নঃস্তোত্র আবৃত্তি করতেন। আমার তখন বয়স খুব কম, সবেমাত্র উপনয়ন হয়েছে—আমার কাজ ছিল পূজার সব আয়োজন করা।

১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে পূজ্যপাদ মহাপুরুষজী পাটনায় শুভাগমন করেন এবং আমাদের বাড়িতে পদধূলি দিয়ে ঐ বাড়িকে মহাতীর্থে পরিণত করেন। মনে হয় বাবা-মায়ের পূজাতে ৺কাশীবিশ্বনাথের কৃপায়—তাঁদের পুণ্যেই—আমরা ঐ দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পেরেছিলাম। মহাপুরুষজী আমাদের বাড়িতে যখন শুভ পদার্পণ করেন তখন আমাদের জননী মহাপুরুষজীকে দর্শন করেই প্রণামান্তে বলে উঠলেন—"আমার ৫০ বৎসরের শিবপূজা আজ সার্থক—আমি সাক্ষাৎ শিবদর্শন করলাম।" মহাপুরুষজীর শুভ পদার্পণ স্মরণ করে মা আমাদের নূতন বাড়ির নাম রেখেছিলেন 'শিবানন্দ-ধাম'। মহাপুরুষজীকে দর্শন করেই মা বলেছিলেন, "আমার সব বাসনা আজ পূর্ণ হলো। আর কোন বাসনা নেই—এখন ভগবানের নাম নিতে নিতে মরতে পারলেই হয়।" তাতে মহাপুরুষজী মাকে খুব আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, "তোমার তাই হবে, মা। কোন চিন্তা নেই। আমি তোমার সব ভার নিলুম। তুমি অন্তিমকালে শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্মরণ করো।"...এর দশমাস পরেই শারদীয়া বিজয়াদশমীর দিন ২৪.১০.২৮-এর সন্ধ্যায় আমাদের ভাগ্যবতী জননী বিন্ধ্যবাসিনী দেবী শ্রীভগবানের নাম উচ্চারণ করতে করতে দেহত্যাগ করে পুণ্যধাম কৈলাস গমন করেন। শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীর আশীর্বাদ কিভাবে তাঁর জীবনে আক্ষরিক ভাবে সফল হয়েছিল তা দেখে আমরা জননীর শোক ভুলে গিয়েছিলাম। ঐ সংবাদ পেয়ে পূজ্যপাদ মহাপুরুষজী নিজের হাতে ২৭.১০.২৮ তারিখের পত্রে আমাদের সব ভাইদের সান্ত্বনা দিয়ে লিখেছিলেন..."আমি সর্বদাই তোমাদের জন্য চিন্তা করিতেছি। ঠাকুর তোমাদের সর্বদাই দেখিতেছেন সর্বাবস্থায়। কোন চিন্তা নাই। ...তোমাদের মার পবিত্র আত্মা ৺কৈলাসে মা জগদম্বার অভয় ও শান্তিময় চরণে বিরাজ করিতেছেন। ইতি, তোমাদের চিরশুভাকাঙ্ক্ষী শিবানন্দ।" মহাপুরুষজীর অমোঘ আশীর্বাদের সাক্ষাৎ পরিচয় আরো অনেক ক্ষেত্রে পেয়ে এখন শেষ জীবনে তাঁর আশীর্বাদই একমাত্র পাথেয় করেছি। অকিঞ্চন ও আর্তদের প্রতি তাঁর কি

করুণা!—তাই স্মরণ করে এখন চোখের জলে রুদ্ধদৃষ্টি হয়ে বসে আছি—তিনি কখন হাত ধরে কাছে টেনে নেবেন, সেই অপেক্ষায়।...

কার্যোপলক্ষে দিল্লীতে থাকাকালে (১৯২৮-৩১ খ্রিস্টাব্দ) আমি মাঝে মাঝে মহাপুরুষজীর আশীর্বাদ ভিক্ষা করে চিঠি লিখতাম এবং তিনিও জবাব দিতেন। দেখেছি তাঁর চিঠি পেলেই মনপ্রাণ আনন্দে ভরে যেত, উৎসাহ ও উদ্দীপনায় জীবন যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠত। তার জের চলত কয়েক দিন। সব কাজের মধ্যে তাঁর কথা মনে হতো, তাঁর স্নেহ-করুণার, অহৈতুকী কৃপার কত স্মৃতি জেগে উঠত! তাঁর চিঠি যেন আনন্দ-উৎস। আমার এক চিঠির জবাবে ১০.১.৩০ তারিখে তিনি লিখেছিলেন—"শ্রীমান নন্দী, তোমার ১লা-র পত্র পাইয়া খুবই আনন্দিত হইয়াছিলাম। তুমি আমার আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে। ঠাকুর তোমার ভক্তিবিশ্বাস বৃদ্ধি করুন।...আমার শরীর ভাল নয়। তুমি ভাল আছ তো? ওখানে মঠ আছে, সেখানে মাঝে মাঝে যাও তো? ইতি—শুভাকাঙ্ক্ষী শিবানন্দ।"

৩. ১১. ১৯৩০-এর পত্রে মহাপুরুষজী লিখেন, "শ্রীমান নন্দী, তোমার পত্র পাইয়া খুবই আনন্দিত হইয়াছি। পূজার সময় বাড়ি আসিয়াছিলে, মহাদেব ও বিশু আসিয়াছিল—তাহাদের নিকট তোমাদের সংবাদ পাইয়াছি।...ঠাকুর তোমাদের শান্তিবিধান করিবেন। সংসারের সব গতিক দেখছ তো! বেশ আছ, বাবা। নিজ কর্তব্যটুকু করে খুব ভগবানকে ডাকো আর যতটা পার জনহিতকর কাজ কর, দেখবে জীবন কত মধুময় ও আনন্দময় হয়। বাবা, নিজের সুখে কি সুখ আছে? আদৌ নেই—ত্যাগেই, বাবা, সুখ আত্মপ্রসাদ লাভ হয়, ভগবদ্‌ভাব বৃদ্ধি পায়। ...তোমাকে বেশি কি লিখিব।...ঠাকুর আছেন, ভয় কি? আমার শরীর ভাল নয়, খুবই খারাপ—হাঁপানি সর্দি অনিদ্রাদি আছে। কি করবো? সবই তাঁর ইচ্ছা। তাঁর কৃপায় ভিতরে বেশ আনন্দ আছে—তা হইলেই হইল। আমার জন্য আদৌ চিন্তিত হইও না। তিনি তোমাদের কুশলে রাখুন, ভক্তি বিশ্বাস দিন, ইহাই প্রার্থনা। আমার আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে। ইতি—সতত শুভাকাঙ্ক্ষী শিবানন্দ।"

* * *

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে একবার মেজদা, বিশু ও আমি মঠে পূজ্যপাদ মহাপুরুষজীকে দর্শন উপলক্ষে তাঁর কাছে উপস্থিত হই। কথায় কথায় তাঁর দরবারে ভাইয়ে-ভাইয়ে অনেক অভাব-অভিযোগ সাংসারিক সুখ-দুঃখের কথা বললাম। তিনি পালঙ্কের উপর বসে আছেন—খোলা গা, গায়ের রং দিব্যকান্তি যেন ফেটে পড়ছে! গলায় মাদুলি, পদ্মকলির মতো চোখ দুটি লাল, হাঁপানি রোগে খুব কষ্ট পাচ্ছেন। এরি মধ্যে কতভাবে আমাদের উপদেশ, কতভাবে আমাদের মঙ্গলের জন্য নির্দেশ

দিলেন। আমাদের সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "যত ঝগড়া মন-কষাকষি তাতে কিছুতেই তোমাদের কোন অমঙ্গল হবে না যদি এইটার প্রতি (তাঁর নিজ শরীর দেখিয়ে) তোমাদের একটু টান, ভালবাসা হয় ও থাকে। ঝগড়া মনোমালিন্য—'অহং'-এর একটি ব্যাধি মাত্র। আমার উপর ভালবাসা হলে তখন মুখ্য হবে এ 'শরীরটার চিন্তা' আর অহংটা তখন হবে গৌণ মাত্র। এদিকে যত ভালবাসা বাড়বে, ততই অহংটা দূরে যাবে। তোমরা সব আনন্দে থাকবে। মনে রাখবে যে, আমাদের সকলের মধ্যে যোগসূত্র হচ্ছেন ঠাকুর। এটা যদি পাকা ও অম্লান থাকে তাহলে কোনও ভয় নেই। সময় অসময়ে সব অবস্থায় তাঁকে ডাকবে—সাড়া পাবে। তিনি যে অন্তরেই রয়েছেন!"

এভাবে আমাদের সঙ্গে কত কথা বললেন! অসুস্থ শরীর, কিন্তু তাঁর রোগের কথা মনেই নেই! বললেন, "রোগ আছে শরীরে তো? আমি কিন্তু আনন্দে আছি দেখি।" আশ্রিত ভক্তদের জন্য কেবল মঙ্গল-কামনা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে। এখন ভাবি, তখনও মনে করতাম—তাঁকে কত উদ্‌ব্যস্ত করতাম! কালীয়দমনের কথাই মনে পড়ে। কেন সে বিষ উদ্‌গার করে একথা কালীয়নাগকে জিজ্ঞেস করায় সে বলেছিল, "ঠাকুর, আমাকে তুমি যা দিয়েছ (বিষ) তাই দিয়েই তোমার পূজা করছি।" আসলে ভগবান তো বিষ দেননি, বিষটা তারই নিজ কর্মার্জিত। ভগবান কৃপা করে সেই বিষ গ্রহণ করে কালীয়কে বিষমুক্ত পাপমুক্ত করে দিলেন।...

আমি তখন উদয়পুর, মেওয়ার-এ। ৪ মাঘ, ১৩৩৮-এর চিঠিতে তিনি আমাকে লিখেন, "তোমার ৪ জানুয়ারি তারিখের টেলিগ্রাম পাইয়া সুখী হইলাম। আমি আন্তরিক আশীর্বাদ করি শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে তোমার ভক্তি বিশ্বাস অচল অটল হউক ও তুমি সুখে শান্তিতে থাক। আমার শরীর এক প্রকার আছে। তুমি আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ইতি—সতত শুভাকাঙ্ক্ষী শিবানন্দ।"

এর পূর্বে তিনি ১৭ পৌষ, ১৩৩৮-এর চিঠিতে লিখেছিলেন, "বহু দিন পরে তোমার পত্র পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। তুমি আমার New Year's greetings (নববর্ষের সম্ভাষণ) ও স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। আমার শরীর তাঁর কৃপায় আজকাল মন্দ নয়। তিনি তাঁর কাজের জন্য যেমন ইচ্ছা এই শরীর দিয়ে কাজ চালিয়ে নিচ্ছেন। তুমি পুনরায় আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ইতি—সতত শুভাকাঙ্ক্ষী শিবানন্দ।"

আমাদের কল্যাণের জন্য তাঁর কত প্রার্থনা, কত উৎকণ্ঠা! আমরা তো তাঁর জন্য কিছুই করতে পারিনি! তাঁর আদেশও পালন করতে পারিনি, তবু কত ক্ষমা, কত দয়া, কত কৃপা!

মহাপুরুষজীর কাছ থেকে অনেক চিঠিই পেয়েছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় বহু চিঠিই যত্ন করে রাখিনি, হারিয়ে গিয়েছে। এখন সেজন্য অনুশোচনা হয়—রুদ্ধশ্বাসে অন্তর ভরে যায়। কি বোকামিই করেছি! অথচ নিরুপায়। যা গেছে তা তো আর ফিরে আসবে না। যে কখানি চিঠি আছে, সেগুলি মাঝে মাঝে পড়ি। অন্তর আনন্দে ভরে যায়—তাঁর স্নেহ, আশীর্বাদ ও মমতা অন্তর আর্দ্র করে দেয়। চিঠিগুলি যেন জীবন্ত। চিঠি পড়তে পড়তে অনুভব করি মহাপুরুষজী সামনে যেন মূর্ত হয়ে ওঠেন—অশ্রুসিক্ত চোখে তাঁর প্রতিবিম্ব ভেসে উঠে! ঐ চিঠিগুলির ভিতর দিয়ে তিনি যেন নূতন করে আশীর্বাদ করেন, সাহস ও সান্ত্বনা দেন!

শেষ চিঠিতে ৩ চৈত্র, ১৩৩৯ (post mark Belur Math dated 18.3.33) তিনি লিখেছেন—"... তোমার প্রণামী টাকা পেয়ে সুখী হলাম। আমার শরীর মন্দ নয়। ঠাকুরের উৎসব বেশ হয়ে গেছে, দেড় লক্ষের উপর নরনারী উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিল। তোমরা কেমন আছ—মধ্যে মধ্যে তোমার কুশল পাইলে সুখী হইব। ঠাকুর তোমাদের পরম কল্যাণ করুন, তাঁর শ্রীপাদপদ্মে ভক্তি বিশ্বাস হউক। ইতি—সতত শুভাকাঙ্ক্ষী, শিবানন্দ।"

এই তাঁর শেষ আশীর্বাদ-পত্র। যে আশীর্বাদ অন্তর ভরে দিয়েছিলেন, যে আশীর্বাদে এখনো অন্তর সঞ্জীবিত হয়ে আছে, তার শেষ অভিব্যক্তি অন্তিম পত্রখানি বহন করে এনেছিল।...

শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীকে শেষ দর্শন করি ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে। তখন তিনি পক্ষাঘাত-রোগে শায়িত, বাক্‌রহিত। কিন্তু তাঁর সেই সকরুণ দৃষ্টি এখনো যেন সর্বক্ষণ আমায় অনুসরণ করছে! তিনি তো আমায় দেখছেন—এই একমাত্র ভরসা!

মহাপুরুষের দুর্লভ সঙ্গ

শ্রীরামমোহন ভট্টাচার্য

আমার 'স্মৃতিকথা' অতি সামান্য ও নিতান্ত ব্যক্তিগত। অন্যের কাছে তা নেহাত অকিঞ্চিৎকর মনে হতে পারে; কিন্তু ঐ পুণ্য স্মৃতিটুকুই আমার জীবনের অন্তিম-সম্বল এবং যে পুণ্যস্পর্শ পেয়েছিলাম তাই আমাকে অমর জীবন দেবে। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ছাত্রাবস্থায় কাশীতে 'শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে' মাঝে মাঝে যেতাম।

তখন কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে আই. এস-সি. পড়ি—ছাত্রাবস্থা, স্বদেশী ভাব ভালো লাগত। ছেলেমানুষ, তাই আদর-যত্ন ও প্রসাদ পেলে ভারী খুশি হতাম। শ্রদ্ধেয় সুরেশ মহারাজ (স্বামী শাশ্বতানন্দ) তখন কাশীতে ছিলেন। তিনি প্রসাদ দিতেন, ভাল কথা বলতেন—ভাল লাগত।

সেবাশ্রমে অম্বিকা ধামের সামনের মাঠে কখনও কখনও পূজ্যপাদ হরি মহারাজ চেয়ারে বসে থাকতেন—দেখতে পেতাম। কাছে কোনদিন যাইনি। তখন ঈশ্বর, ধর্ম-কর্ম ওসব চিন্তা তত ছিল না। এখন ভাবি, যদি ভাগ্যবান হতাম তো গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে আশীর্বাদ লাভ করতাম এবং তাঁর জীবন্ত মহামূল্য উপদেশলাভে কৃতার্থ হতাম।

তারপর দীর্ঘদিন পরে পূর্ববঙ্গে P. W. I. (রেলওয়ে)-এর ট্রেনিং-এ আছি, তখন আমার উপরওয়ালা অফিসারকে 'কথামৃত' পাঠ করে শোনাতে হতো। এই ভাবে যেন বাধ্য হয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্তদের মধ্যে গিয়ে পড়ি এবং সৎসঙ্গ লাভ হয়।

কয়েক বৎসর পরে একবার স্বপ্ন দেখি যে, একজন সন্ন্যাসী আমাকে যেন আর একজন প্রবীণ সাধুর কাছে সমর্পণ করছেন। তাতে আমিও খুব উল্লসিত বোধ করছি। স্বপ্ন মনে করে তার গভীরতা তখন ততটা বুঝতে পারিনি।

কিছুদিন পরে পূর্বোক্ত উপরওয়ালার নিকট একজন ভক্ত কতকগুলি ছবি দেখাতে আনেন। তার মধ্যে একজনকে স্বপ্নদৃষ্ট সাধু বলে চিনে ফেললাম। তিনি ছিলেন কাশী রামকৃষ্ণ মিশনের একজন প্রাচীন সাধু—কেদার বাবা নামে পরিচিত। ইনিই আমাকে স্বপ্নে অপর একজন প্রবীণ সাধুর নিকট সমর্পণ করেছিলেন। তখন তাঁর ঠিকানা জোগাড় করে আমার গুরু-করণ বিষয়ে জিজ্ঞেস করে পত্র লিখলাম। তিনি উত্তরে জানালেন—"এই চিঠি নিয়ে তুমি বেলুড় মঠে যাও তথাকার অধ্যক্ষ শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজই তোমার স্বপ্নদৃষ্ট গুরুদেব। তাঁর কাছে তুমি দীক্ষা নিও, ভবপারে যাবার পাথেয় পেয়ে যাবে।"

বেলুড় মঠে গিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে সুরেশ মহারাজের (স্বামী শাশ্বতানন্দ) সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দীক্ষার বিষয় তাঁকে জানাতেই তিনি বললেন—"আজই দীক্ষা নাও; মহাপুরুষ মহারাজ বৃদ্ধ হয়েছেন—দীক্ষা বড় একটা দিচ্ছেন না তবে কদিন একটু সুস্থ আছেন—এখন দিচ্ছেন।" তখন ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের মাঘমাস।

সুরেশ মহারাজের নির্দেশে দোতলায় পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের ঘরে গিয়ে সব বললাম। তিনি বললেন, "যাও ঠাকুরঘরে গিয়ে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা

কর এবং তাঁর আদেশ নিয়ে এস।" আমি বিনীতভাবে আমার সন্দেহ নিবেদন করে বললাম, "ঠাকুর কি প্রত্যক্ষভাবে আমার সঙ্গে কথা বলবেন এবং আদেশ-উপদেশ শোনাবেন?" মহাপুরুষজী বেশ জোর দিয়ে দুবার বললেন, "আমি বলছি, তুমি যাও। অন্তত প্রার্থনা করে এস।" তাঁর আদেশে গিয়ে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে এলাম। আমার দীক্ষা হয়ে গেল। গুরুদেব 'নাম' দিলেন এবং মনে পড়ে আমার সঙ্গে ঠাকুরের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ চিরকাল ছিল ও আছে তিনি সেইটি ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন। সেদিন দীক্ষার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। গুরুদক্ষিণা কিছুই নিয়ে যাইনি। পরদিন কলকাতা গিয়ে কিছু ফল মিষ্টি কিনে এনে তাঁর ঘরে গেলাম। তিনি দেখে বললেন, "সন্ন্যাসী গুরুকে গুরুদক্ষিণা কিছু না দিলে দোষ হয় না।" টাকা শ্রীচরণের উপর রাখতেই মহাপুরুষজী বললেন, 'টাকা পায়ে ছোঁয়াতে নেই।" আমার আনীত ফলমিষ্টির অধিকাংশই তিনি ঠাকুরঘরে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর আদেশে সেবক মহারাজ শ্রীগুরুদেবের প্রসাদী থালা থেকে প্রসাদ এনে আমাকে দিলেন। আমি শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীগুরুদেবের প্রসাদ গ্রহণে জীবন সার্থক করলাম।

এর অনেক দিন পরে ৺পুরীধাম থেকে এসে বেলুড় মঠে মহাপুরুষজীকে দর্শন করতে গেছি। প্রণাম করতেই অন্য কথা না বলে তিনি ৺জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদের জন্য হাতটি বাড়িয়ে বললেন—"মহাপ্রসাদ এনেছ তো? দাও।" সৌভাগ্যক্রমে লাল কাপড়ের ছোট বগলির মধ্যে মহাপ্রসাদ পকেটে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। তা মহাপুরুষজীকে দিয়ে অতিশয় আনন্দলাভ করলাম। মহাপুরুষজী সানন্দে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করলেন।

শ্রীমহাপুরুষজীকে আমি যেমন দেখেছি*

শ্রীবিজয়গোপাল রাও

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের এক সকালে আমি যখন গঙ্গার তীরবর্তী বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের বাসগৃহের সামনে উত্তরাস্য হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, তখন স্বামী বিজয়ানন্দ এসে আমায় জিজ্ঞেস করলেন, শ্রীমহাপুরুষজীর কাছে আমার কি প্রয়োজন। তাঁকে বললাম, "আমি ভগবানকে শুধু ভালবাসার জন্যই ভালবাসতে চাই, এটি আমি একজন মহাপুরুষের সাহায্য ছাড়া পেতে পারি না বলেই আমার

* ইংরেজির অনুবাদ

বিশ্বাস এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যগণ আমাকে সাহায্য করবেন—এই আশা করে আমি এখানে এসেছি।"

শ্রীমহাপুরুষজীকে ওকথা বলাতেই তিনি ও তাঁর পেছনে স্বামী বিজয়ানন্দ নিচে নেমে এসে দক্ষিণের সমতল জায়গাটিতে দাঁড়ালেন। আমি প্রথমে শ্রীমহাপুরুষজীর সামনে ও পরে স্বামী বিজয়ানন্দের সামনে আভূমি নত হয়ে প্রণাম করলাম। শ্রীমহাপুরুষজী আমাকে পূর্বদিকের বারান্দায় যেতে নির্দেশ দিয়ে সেখানে গিয়ে নিজে একটি বেঞ্চিতে বসে আমাকে অন্যটিতে বসালেন। তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, "তুমি কি বৃন্দাবনে কোন আধ্যাত্মিক প্রেরণা অনুভব করেছিলে?"

আমি—হ্যাঁ।

মহাপুরুষজী—তুমি খুব ভাল আদর্শই গ্রহণ করেছ।

আমি—বৃন্দাবনে কয়েকজন বন্ধু আমাকে বলেছেন, 'যেহেতু শ্রীরামকৃষ্ণদেব মুমুক্ষু (মুক্তিকামী) ছিলেন, তাঁর শিষ্যগণ তোমাকে ভক্তিপথে সাহায্য করতে পারবেন না।'

মহাপুরুষজী—হ্যাঁ, এটি সত্য যে, একজন জ্ঞানী একজন ভক্তের গুরু হতে পারেন না। কিন্তু রামকৃষ্ণদেব মুমুক্ষু অথবা ভক্ত কোনটিই ছিলেন না। তিনি একজন অবতার ছিলেন।

মহাপুরুষজী আমায় আরও উপদেশ দিলেন যে, আমি যেন প্রতিটি সুন্দর বস্তুতে শ্রীকৃষ্ণকে দেখি। আমি কিছুদিন বেলুড় মঠে থাকবার অনুমতি পেলাম। সে সময়ে তিনি আমাকে সাধন-ভজন ও যোগ সম্বন্ধে যা কিছু করণীয়, সে বিষয়ে শিক্ষা দিলেন। তিনি আমার সামনে এক উচ্চ আদর্শ তুলে ধরলেন। একটি নির্জন স্থানে সাধন-ভজন করে ভগবানলাভের এবং আমার সহোদরা বোনদের ছাড়া অন্য কোনও স্ত্রীলোকের মুখ না দেখার উপদেশ দিলেন।...

১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজ মঠে শ্রীমহাপুরুষজীকে আবার দেখার আমার সৌভাগ্য হয়। সেই সময়ে তিনি আমাকে বললেন যে, আমার স্বাস্থ্য ভাল হওয়ার প্রয়োজন—তাহলেই আমি তপঃ-সাগরের গভীরে ডুব দিতে পারব। তিনি আমাকে সেবার গরমে নীলগিরিতে নিয়ে গেলেন। সেখানেই আমার দীক্ষা হয়। দীক্ষাদানের পূর্বে তিনি বললেন, "আমি তোমাকে সব কিছু বলে দিয়েছি। এখন আমি তোমাকে বীজমন্ত্র দেব।" নীলগিরি থেকে তিনি আমাকে ভুবনেশ্বরে পাঠালেন। ভুবনেশ্বর আমার পক্ষে সব দিক থেকেই ভাল হবে মনে করেই গুরুদেব আমাকে সেখানেই থাকতে বললেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমহাপুরুষজীর মুখনিঃসৃত কয়েকটি বাণী যেমন শুনেছিলাম ঃ (১) মুক্তি মানুষকে সব রকম কষ্টের হাত থেকে বাঁচায়, কিন্তু ভগবানই মানুষের আদর্শ হওয়া উচিত। মুক্তির জন্য প্রার্থনা করবে না, প্রার্থনা করবে ঈশ্বরপ্রেমের জন্য। গৃহীদেরও মুক্তির উপায় রয়েছে। (২) ধ্যান ও সাধুসঙ্গ মানুষকে আত্মসংযম প্রদান করে, যা ঈশ্বরপ্রেম (ভক্তি) লাভ করার পথে একটি অপরিহার্য অঙ্গ। (৩) যাঁরা আগেই ভক্তি বা ঈশ্বরপ্রেম লাভ করেছেন, তাঁদের শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে পুজো করবার তত প্রয়োজন নেই, কিন্তু অন্য সকলের তাঁকে পুজো করা প্রয়োজন। যদিও তিনি পূর্ব অবতারগণ থেকে ভিন্ন নন, কিন্তু তিনি বর্তমান যুগের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং তাঁর শক্তিও নবীন, তাই তাঁকে পুজো করতে বলা হয়। (৪) শ্রীরামকৃষ্ণদেব আমাদের রাত্রে খুব কম আহার করতে দিতেন; রাত্রে খুব অল্প আহার করবে, মাত্র দু-তিন ঘণ্টা শোবে, এবং তারপর উঠে ধ্যানে বসবে। (৫) যদি তুমি ভগবানের রূপটি ধ্যানের সময় চিন্তা করতে না পার, তাহলে জ্যোতির ধ্যান করবে। যদি সেই জ্যোতিকেও বেশিক্ষণ ধরে রাখতে না পার তবে প্রেমের (চিন্তা করে) ধ্যান করবে। (৬) প্রার্থনা একটি খুবই ফলপ্রসূ উপায়। যে মানস জয়, আত্মজয় করতে পারে, সেই ভগবানকে জানতে পারে। (৭) রাধার সঙ্গে নিজেকে একাত্মভাবে চিন্তা করা উচিত নয়, কারণ তিনিই স্বয়ং প্রেমের পাত্রটি ধারণ করে রয়েছেন।

মাদ্রাজের রামলিঙ্গ শাস্ত্রী বেলুড় মঠে শ্রীমহাপুরুষজীকে বলেছিলেন, 'আপনি আমাদের অনেক কিছু বলেছেন; যদি বলার মতো আরও কিছু থাকে তাহলে দয়া করে আমাদের বলুন।' একথা শোনামাত্রই শ্রীমহাপুরুষজী কিছুক্ষণের জন্য তাঁর চক্ষু দুটি মুদ্রিত করলেন, তারপর চোখ খুলে বললেন, "এটিই একমাত্র শিক্ষা অর্থাৎ চক্ষু মুদ্রিত করে ভগবানের চিন্তা কর। ঈশ্বর-চিন্তাই একমাত্র উপদেশ, এতে কোন সন্দেহ নেই। (তিনি নিজে যেভাবে ধ্যানমগ্ন রূপ ধারণ করে এ ভাবটি আমার মনে গেঁথে দিলেন তা কিছুতেই মুছে যাবে না।) সব শাস্ত্রগুলিতে ধ্যানই হচ্ছে একমাত্র শিক্ষা। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা সৃষ্টির পূর্বে তিনবার 'তপঃ' এ কথাটি ভগবান নারায়ণের মুখ থেকে শোনেন। সুতরাং শুরু থেকে ধ্যানই হচ্ছে একমাত্র শিক্ষা যা সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে ব্রহ্মা পেয়েছেন। শুকদেব যথার্থই বলেছেন, 'সব শাস্ত্র খুঁজে বার-বার তর্ক করে এই নিষ্কর্ষে পৌঁছুই যে, মানুষের সদাই ঈশ্বরের ধ্যান করা উচিত।' শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'যার মন সর্বদা ঈশ্বরে স্থিত তার আর অন্য কোনও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না।' সেবকদের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের অন্তিম নির্দেশ ছিল—'যতক্ষণ না আমি তোমাদের ডাকি অপেক্ষা কর আর ধ্যান কর'।"

'যিনি রাম, যিনি কৃষ্ণ, ইদানীং রামকৃষ্ণ' ইত্যাদি বলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বামীজীর সন্দেহ নিরসন করেছিলেন। এ ঘটনাটি যদিও আমি পূর্বেই বইতে পড়েছিলাম, তবুও যখন শ্রীমহাপুরুষজী এ ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বলতে বলতে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন, তখন আমিও তাঁরই সঙ্গে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম।

মহাপুরুষজী বলেছিলেন, একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দই শ্রীরামকৃষ্ণকে ঠিক ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন, কিন্তু অপরে এবং তিনি স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কণামাত্র পেয়েছেন। স্বামীজীর তর্ক শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'আমার মা-ই তোর অন্তরে বিশ্বাসরূপে প্রতিভাত হবেন।'

যখনই শ্রীমহাপুরুষজী স্বামী বিবেকানন্দের কথা বলতেন, তিনি যেন মাতোয়ারা হয়ে যেতেন। তিনি বলতেন, যে কোন বিষয়েই স্বামীজী বলুন না কেন, সর্বত্রই তাঁর বাণী ছিল প্রেরণাদায়িনী।

ঈশ্বরের কৃপার উপরে শ্রীমহাপুরুষজীর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। 'ভগবানের কৃপা'—এ কথা দুটি সব সময়েই তাঁর শ্রীমুখে শোনা যেত। তিনি বলতেন, "যে মানুষ ঈশ্বরের কৃপায় বিশ্বাস করে না, তার সঙ্গে আমরা কোনও সম্পর্ক রাখি না।"

এটি সত্য নয় যে, মহাপুরুষজী তাঁর শিষ্যদের শ্রীরামকৃষ্ণনামে মন্ত্র-দীক্ষা দিয়েছেন। তিন বিভিন্ন লোককে ঈশ্বরের বিভিন্ন নামে দীক্ষিত করেছেন। কেউ তাঁর কাছে চেয়ে দীক্ষা পেয়েছে, আবার কাউকে চাইলেও মানা করে দিয়েছেন। কেউ বা না চাইতেই দীক্ষা পেয়েছে।

মহাপুরুষজীর কাছে আমার মন খোলা বইয়ের মতো প্রকটিত ছিল। আমার কোনও চিন্তা তাঁর দৃষ্টি এড়াত না। আমি কি খেয়েছি এবং খেতে কোথায় বসেছি, তাও তাঁর সহানুভূতিসম্পন্ন দৃষ্টি থেকে এড়াত না; আর আমার শরীর সুস্থ রাখার জন্য নানারকম নির্দেশ দিতেও তিনি ভুলতেন না। এটা বলা হয়েছে যে, যে মানুষ নিজের মেধানাড়ীকে বিকশিত করেছে, সে সব কিছু জানতে পারে এবং মনে রাখতে পারে। তাঁর অপরিসীম সহানুভূতি ও দয়া ছিল এবং তেমনটি আমি আর কোথাও দেখিনি। তিনি বলতেন যে, সহানুভূতি মানুষের একটি খুবই প্রয়োজনীয় গুণ। আর কোনও কিছুতে আসক্ত না থেকে যখন খুশি জগৎ থেকে নিজেকে যেন গুটিয়ে নিতে পারে, এমন মনোবল থাকা দরকার।

গুরুদেবকে নানাভাবে দেখা যেত—স্বাভাবিক, শান্ত, চিন্তাশীল, করুণাময় ও গম্ভীর। একবার আমি তাঁকে এতখানি মাথা নিচু করে বসে থাকতে দেখেছিলাম যে, কোনও জীবিত মানুষ ওভাবে মাথা কখনও নিচু করতে পারে না।

মহাপুরুষজী জীবনের শেষের দিকে যখন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং যখন তাঁর শরীর অবশ হয়ে গিয়েছিল, তখনও তাঁর মুখমণ্ডল আনন্দোদ্ভাসিত হয়ে থাকত এবং আমাদের দেখতে পেলে তিনি তাঁর শ্রীহস্তখানি আশীর্বাদের ভঙ্গিতে তুলে ধরতেন।

পরিশেষে আমি বলব যে, প্রায় সব আধ্যাত্মিক কথাপ্রসঙ্গে শ্রীমহাপুরুষজী জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়—জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির প্রয়োজনের উপরই বেশি জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই বর্তমান যুগের পক্ষে সব চাইতে বেশি উপযোগী। স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভিতর শ্রীশঙ্করের মস্তিষ্ক ও শ্রীচৈতন্যের হৃদয় ছিল। আমি অনুভব করেছিলাম যে, 'শরণাগতি'ই শ্রীমহাপুরুষজীর জীবনের প্রধান নোঙর ছিল (sheet-anchor)—শেষ কথা ছিল।

শ্রীমহাপুরুষজীর স্মৃতি-চিত্র

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

আজ মনে পড়ছে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের শেষ ভাগে অথবা ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের প্রথম ভাগে দুই বন্ধুকে নিয়ে আমি একদিন বিকালবেলায় বেলুড় মঠে বেড়াতে গিয়েছিলাম। তখন বুঝতে পারিনি যে, ভাগ্যবিধাতা আমাকে সেদিন পৃথিবীর একজন বরণীয় মানবের শ্রীচরণে উপনীত করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ সেদিন মঠে উপস্থিত ছিলেন। আমি প্রথমটায় পূজনীয় স্বামী প্রেমানন্দের কাছেই উপস্থিত হয়েছিলাম; তিনি অশেষ কৃপা করে হাত ধরে আমাকে ঠাকুরের মন্দিরে নিয়ে যাচ্ছিলেন। স্বামী প্রেমানন্দজীর সেদিনকার অবস্থা মনে করে এখনও অশ্রু-বিসর্জন না করে পারি না। যাই হোক, ঠাকুরঘরে যাবার একটি সিঁড়ির উপর উঠতেই উপর থেকে স্বামী ব্রহ্মানন্দজী নিচে নেমে এলেন। পঞ্চাশ বৎসর পরেও এখনও মনে হয়, তাঁর সেই পদ-ধ্বনি যেন কয়েক মিনিট আগে মাত্র শুনতে পেয়েছিলাম। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী আস্তে আস্তে আমার কাছে এলেন। আমার তখন মনে হচ্ছিল যে, আমি একটি সামান্য মানুষ দুই দেবতার মাঝখানে যেন দাঁড়িয়ে আছি। কি অপূর্ব দৃশ্য! স্বামী প্রেমানন্দজী তখনও আমার হাত ধরে আছেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী যখন আমার কাছে এলেন, শুনলাম তিনি বলছেন, "বাবুরামদা, ছেলেটার মাথাটি খেলে?" স্বামী প্রেমানন্দ তখন আমাকে

দুহাতে ধরে স্বামী ব্রহ্মানন্দের হাতে দিলেন এবং বললেন, "মহারাজ, তুমি একে গ্রহণ কর।" স্বামী ব্রহ্মানন্দ তখন বাঁ হাতে আমাকে ধরলেন এবং ডান হাতটি আমার মাথায় কিছুক্ষণ রেখে আশীর্বাদ করলেন। মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তাঁর চোখ দুটি অশেষ করুণাপূর্ণ, তিনি বললেন, "পারবি?" একথার যে কি সত্যিকার অর্থ তা আমি এখনও জানি না। কিন্তু আমি তাঁকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করলাম এবং বললাম, "আপনার কৃপা হলে নিশ্চয়ই পারব।" তিনি আবার অতি করুণভাবে আমার চোখের দিকে দৃষ্টি রেখে বললেন, "ঠাকুরের কৃপা তো তোর উপরে আছেই।" আমি আবার প্রণাম করলাম। তিনি আস্তে আস্তে আর কোন কথা না বলে উপরে চলে গেলেন। স্বামী প্রেমানন্দ তখন আমাকে আবার ধরলেন এবং আমরা মঠবাড়ির গঙ্গার দিকের একতলার বারান্দায় এলাম। ধর্মভাব কাকে বলে জানি না, এখনও বুঝি না, তবে সুদীর্ঘ বৎসরগুলি ধরে একথাই ভেবে আসছি যে, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাসহচর ঈশ্বরকোটি স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং স্বামী প্রেমানন্দ আমার উপর এই অহৈতুকী কৃপা করেছিলেন। আমার নিজের দিক দিয়ে কোনই যোগ্যতা নেই, এ সম্বন্ধে আমি দৃঢ়নিশ্চয়। আমি যেখানে যে অবস্থায় থাকি না কেন তাঁদের কৃপা আমাকে সর্বদা রক্ষা করবে এবং রক্ষা করছে—এটাই আমার সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতা।

* * *

পূজ্যপাদ শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ স্বামী শিবানন্দকে আমি যেদিন প্রথম দর্শন করি সেদিনটি আমার চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। বোধ হয় ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ, একটা উৎসবের দিন, দুপুরবেলায় প্রসাদ পাবার পরে মঠবাড়ির নিচতলার এক কামরায় একখানি শীতলপাটির উপরে মহাপুরুষজী ও স্বামীজীর ভ্রাতা মহেন্দ্রবাবু বিশ্রাম করছিলেন। এক বন্ধু দূর থেকে মহেন্দ্রবাবুকে দেখিয়ে আমাকে বললেন যে, ইনি স্বামীজীর ভাই। আমি কথাটা শুনে মহেন্দ্রবাবুর সঙ্গে পরিচয় করবার জন্য স্থান কাল পাত্র ভুলে গেলাম। সোজা এগিয়ে গিয়ে তিনি যেখানে শুয়েছিলেন, সেখানে তাঁকে প্রণাম করে সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি বুঝি স্বামীজীর ভাই?" মহেন্দ্রবাবু একটুখানি বিস্মিত এবং বিরক্ত ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, তাতে হয়েছে কি?" আমি যদিও একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম, তবুও বললাম, "আপনার কাছে স্বামীজীর কথা শুনব।" তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুই কি আমাকে একটা মেশিন পেয়েছিস যে, যখন টিপবি তখনই রস বেরুবে?" আমি বললাম, "না, মেশিন পাব কেন? আপনি স্বামীজীর ভাই, আমি স্বামীজীর কথা শুনতে চাই, কাজেই আপনার কাছে বসলেই তো শুনতে পাব, তাই

এসব কথা বলছিলাম।" এবার তিনি একটু নরম হলেন। আমার নাম-ধাম, কি পড়াশুনা করি, কোথায় থাকি—সব খোঁজ খবর করলেন এবং বললেন, "তুই ৩নং গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটে কলকাতায় আমাদের বাড়ি যাবি, গেলে তুই যা জানতে চাস সব তোকে বলব।" কিন্তু মজার কথা হলো যতক্ষণ আমি তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলাম, ততক্ষণ পাশ থেকে মহাপুরুষজী অশেষ করুণার সঙ্গে আমায় দেখছিলেন। মনে হচ্ছিল যেন আমার অভদ্রজনোচিত আচরণের প্রতি বিন্দুমাত্রও দৃষ্টি না দিয়ে তিনি আমার উপর অজস্র কৃপা বর্ষণ করছিলেন। আমি তাঁর সেই করুণাদৃষ্টির প্রতি তখন থেকে আকৃষ্ট হলাম এবং তাঁকে অশেষকল্যাণময় পিতার মতো সেই মুহূর্ত থেকে শ্রদ্ধা করতে শুরু করলাম। মহাপুরুষজীর সেই করুণাপূর্ণ চোখ দুটি যেন এখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে। অথচ তিনি কিন্তু তখনও আমার সঙ্গে কোন বাক্যালাপ করেননি। আমি তাঁকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করলাম এবং তাঁর তেজঃপুঞ্জ কলেবর, গাম্ভীর্যপূর্ণ অপলক দৃষ্টি আমার মনে যুগপৎ শ্রদ্ধা ও ভীতির সঞ্চার করেছিল। আমি তখন থেকে সময় পেলেই বেলুড় মঠে যেতাম, উদ্দেশ্য—স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ ও মহাপুরুষজীর দর্শন ও কৃপালাভ। বহু বার শ্রীমহাপুরুষজীর দর্শনলাভের সৌভাগ্য আমার এভাবে হয়েছিল।

একবার সরস্বতীপূজার দিন আমি মঠে গিয়েছি। ঠাকুরঘরের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে ঠিক ঢুকতে যাব তখনই শ্রীমহাপুরুষজী ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। অপূর্ব তাঁর দৃষ্টি, করুণা যেন ঝরে পড়ছে! আমি থমকে দাঁড়ালাম। অত্যন্ত আদর করে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যাঁরে, কখন এলি? কেমন আছিস? শরীর ভাল আছে তো?" আমি নত হয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম এবং বললাম, "মহারাজ, আপনার কৃপায় সব কুশল।" কিছুক্ষণ চোখ বুজে থেকে অত্যন্ত করুণার সঙ্গে আমায় বললেন, "ভাবনা কি, বাবা? তোমার এও হবে, ও-ও হবে, এদিক ওদিক দুদিকের মনস্কামনা পূর্ণ হয়ে যাবে। তোর কিছুই ভাবতে হবে না।" আমি এই আশ্বাস-বাক্য শুনে আর অশ্রুসংবরণ করতে পারলাম না। খানিকটা হাউ হাউ করে কাঁদলাম। তিনি তখন ছাদের উপর দিয়ে তাঁর ঘরের দিকে চলে গেলেন। আমিও ঠাকুর প্রণাম করতে গেলাম এবং খানিকক্ষণ বসে রইলাম মন্দিরে। পরে যথাসময়ে প্রসাদ পেয়ে বিকালে আবার মহাপুরুষজীর চরণ-বন্দনা করে কলকাতায় ফিরলাম।

আর একদিনের ঘটনা। মহাপুরুষজী ঘরে বসে আছেন। আমি ঢুকলাম এবং নতমস্তকে প্রণাম করলাম। তিনি বললেন, "হ্যাঁরে, কেমন আছিস?" এ কথাটা এত করুণার সঙ্গে বলেছিলেন যে, আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে জোরে কেঁদে উঠলাম এবং তাঁর পাদপদ্ম দুখানা ধরে বললাম, "মহারাজ, আপনি আমায় কৃপা করুন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার উপর আমার শ্রদ্ধা-ভক্তি হোক।" অত্যন্ত কোমলতার সঙ্গে তিনি বললেন, "বাবা, আমি তোকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করছি, শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে তোর শ্রদ্ধা-ভক্তি লাভ হোক, ঠাকুর তোকে কৃপা করুন।"

আর একদিনের ঘটনা। মহাপুরুষজী তাঁর ঘরে খাটের উপরে বসে আছেন। আমি ঢুকেই তাঁকে প্রণাম করলাম। সেদিন তিনি আমার সঙ্গে খুব কৌতুক করতে লাগলেন। একটা গান ধরলেন, "নরেশচন্দ্রের হাসিকান্না না আসা এক ছিল ভালো।" এ পদটি বারবার গাইতে লাগলেন, এবং বারবার আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন। আমার তখন মনে হচ্ছিল, এমন মহাপুরুষদের পূতসঙ্গ ছাড়া আমাদের জীবনের কোন মূল্য নেই। কিভাবে মনটাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাসহচরদের শ্রীচরণে চিরকালের জন্য বিলিয়ে দেওয়া যায়—তাই ভাবছিলাম। একটা জিনিস লক্ষ্য করতাম যে, মহাপুরুষজীর কাছে গেলে তিনি সব সময়ই আমার মনটাকে উঁচু স্তরে তুলে ধরবার চেষ্টা করতেন।

* * *

এক সময় ছাত্রজীবনে বেলুড় মঠে যোগদানের জন্য এক কাপড়ে কম্বল কাঁধে মঠে চলে যাই। মহাপুরুষজী আমায় দেখে কি যে খুশি হলেন, তা প্রকাশ করবার ভাষা আমার নেই। বললেন, "এসে পড়েছিস? বা! বেশ, ভাবনা কি তোর।" মঠে ব্রহ্মচারীর মতো ছদিন ছিলাম, কিন্তু 'নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে?' সপ্তম রাত্রিতে মহাকালীর এক বিভীষিকাপূর্ণ স্বপ্ন দেখে মঠ থেকে চলে আসতে হয়। পরদিন সকালে মহাপুরুষজীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে দাঁড়াতেই তিন বললেন, "শালা, ভয় পেয়েছিস? চলে যাবি?" তিনি কি করে ঐ স্বপ্নের বিষয় জানলেন তা ভেবে আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম...। খানিক পরে আমার দিকে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছিলেন, "তুই চলে যাবি তো যা, কিন্তু বাবা, তুই কোথায় যাবি? তোকে যে আমরা খেয়ে ফেলেছি। আজ থেকে মনে ভাববি যে, তুই যেখানেই থাকবি সেটাই বেলুড় মঠ।"

তারপর আমার জীবনের উপর দিয়ে বিরাট বিপর্যয় ঘটে গেল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পরীক্ষায় অসামান্য কৃতকার্যতা লাভ করে চাকরির সন্ধানে আলামনার, বোম্বাই, কোলাপুর এবং নিপালী প্রভৃতি স্থানে গমন, স্থায়ী ও অস্থায়ী ভাবে চাকরিগ্রহণ, পরে অভাবনীয় উপায়ে বিবাহ।...

বিবাহের পর অনেক দিন মঠে যাইনি। একদিন যেতেই মহাপুরুষজী উল্লসিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কিরে, তুই অনেকদিন আসিসনি কেন?" আমি চুপ করে

রইলাম। তিনি বললেন, "বুঝতে পেরেছি, বিয়ে করেছিস বলে লজ্জা হয়েছে?" কেন জানি না, আমি হাউ হাউ করে কেঁদে বললাম— "মহারাজ, কেন এমন হলো? ঠাকুর আমায় রক্ষা করলেন না কেন?" তিনি অতি করুণভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। পরে বললেন, "হাঁরে, তুই বিয়ে করেছিস তো কি হয়েছে!...যাঁরা ঠাকুরের গৃহি-ভক্ত ছিলেন, তাঁরা কি কম ছিলেন?...একটা কাজ কর, তোর স্ত্রীকে এখানে নিয়ে আসিস তো, আমি দেখে দেবো।" বাকি সময় যতক্ষণ তাঁর কাছে ছিলাম অত্যন্ত আদর করে কথা বললেন। মনের ভার অনেকটা লঘু হয়ে গেল। পরে একদিন মহাপুরুষজী কৃপা করে আমার স্ত্রীকে দীক্ষা দিয়েছিলেন এবং খুব আশীর্বাদও করেছিলেন।...

পরে Incorporated Accountantship (ইনকরপোরেটেড্ একাউন্টেন্টশিপ) পড়তে লণ্ডনে যাই। পাশ করে ফিরে আসি, কিন্তু আমেদাবাদ, টাটা প্রভৃতি স্থানে ঘোরাঘুরি করে কোথাও একটা ভদ্রস্থ চাকরির ব্যবস্থা না হওয়ায় হতাশ হয়ে কলকাতায় ফিরে আসি। ক্রমে অবস্থার বিপাকে জীবনধারণ বিড়ম্বনা মনে হতে লাগল। ঐ অবস্থায় একদিন সস্ত্রীক মঠে মহাপুরুষজীর শ্রীচরণতলে উপস্থিত হলাম। তিনি যেন করুণায় গলে পড়েছিলেন। মঠবাড়ির দোতলায় বসে কথা হচ্ছিল। হঠাৎ তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "হ্যাঁরে, দেখ, ঠাকুর আমাকে কি দেখালেন জানিস? তোর বাড়ি, তার তিনতলায় ঠাকুরঘর, তোর গাড়ি, মাথায় টুপি, পরিধানে সুট, তুই গাড়ি হাঁকিয়ে যাচ্ছিস। ভয় কি? এও হবে, ও-ও হবে।" আমি অনেকক্ষণ চেষ্টা করলাম নিজেকে সামলাতে, কিন্তু পারলাম না, ভেঙ্গে পড়ে বললাম, "মহারাজ, এগুলো সব ঠাট্টা মনে হচ্ছে, দুবেলা অন্নাহারের ব্যবস্থাই করতে পারছি না, তার আবার বাড়ি গাড়ি।" তিনি অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে বললেন, "ঠাকুর আমাদের ভুল দেখান না। ঠাকুর ঠিকই দেখিয়েছেন। তুই দেখে নিস—যা বললাম তাই হবে।" এত কাল পরে দেখছি, ঠাকুর মহাপুরুষজীকে ভুল কিছু দেখাননি। জাগতিক সব কিছুই হয়েছে।...

এ জীবন-সন্ধ্যায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব, তাঁর লীলাসঙ্গিনী পরমারাধ্যা মাতৃদেবী, যুগপ্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দ এবং শ্রীভগবানের অন্যান্য লীলাসহচরগণের পূত আশীর্বাদ এবং অযাচিত কৃপাই আমার একমাত্র পাথেয় হয়ে রয়েছে।

শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতি-কণিকা

শ্রীমধুসূদন মণ্ডল

আমি পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলার অন্তর্গত গাভা হাই স্কুলের ছাত্র ছিলাম। আমার বাড়ি ছিল গাভা থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে এক গণ্ডগ্রামে। আমাদের গ্রামে তখন শিক্ষার আলো প্রবেশ করেনি এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নামও কেউ শোনেনি। যখন আমি অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি তখন সমপাঠীদের কয়েকজন মিলে বাঁশের খুঁটি ও গোলপাতার ছাউনি দিয়ে একখানা ছোট ঘর করে সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি বসিয়ে সন্ধ্যাবেলায় ধূপবাতি দিয়ে আরতি, স্তোত্রপাঠ এবং ভজনাদি করতাম। একদিন এক বন্ধুর অনুরোধে তাঁর বাড়ি যাই এবং এক সান্ধ্য অনুষ্ঠানে যোগদান করি। সেখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমূর্তি দর্শন এবং 'কথামৃত' থেকে কিছু শ্রবণ করা অবধি হৃদয়ে এক প্রেরণা অনুভব করলাম। পরে প্রায়ই সেখানে যেতাম এবং ঠাকুর-স্বামীজীর জীবনী ও উপদেশ সম্বন্ধে কিছু বই পড়ার সুযোগ পেতাম। এভাবে ঠাকুরের কৃপায় একটু ধর্ম-প্রেরণা লাভ করি।

আমি বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে আই. এ. এবং কলকাতায় বি. এ. পড়ি। ইতোমধ্যে আমার বিবাহ হয়। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ছাত্রজীবন শেষ করে যখন বের হই, তখন দুটি প্রশ্ন আমার মনে দেখা দিল—আমার জীবিকা কি হবে এবং কে আমার দীক্ষাগুরু হবেন। ঐ সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘজননী শ্রীশ্রীসারদাদেবী কলকাতা বাগবাজার উদ্বোধন মঠে অবস্থান করছেন জেনে তাঁকে দর্শন করতে যাই এবং পূজনীয় স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের কাছে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন ও দীক্ষালাভের প্রার্থনা জানাই। তখন শ্রীমা অসুস্থা ছিলেন, কেবল দর্শন ও প্রণাম করার সুযোগ লাভ হলো, কিন্তু দীক্ষা নেওয়া হলো না। স্বামী সারদানন্দজী আমার দীক্ষার প্রার্থনা শুনে গম্ভীর হয়ে বললেন, "মা, অসুস্থা, এখন দীক্ষা হবে না।"

সে সময় একজন জ্যোতিষী জোরের সঙ্গে আমায় বলেছিলেন যে, আমার সরকারি চাকরি হবে এবং রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ (প্রেসিডেন্ট) আমার দীক্ষাগুরু হবেন। চাকরি হলো, এবং একটি ছেলেও হলো। স্ত্রী-পুত্র-পরিজন এবং সরকারি কাজ নিয়ে যেমন সকলের হয়ে থাকে, সেভাবে প্রায় তিন বৎসর আমারও কেটে

গেল। দীক্ষালাভের কোন যোগাযোগ হলো না। ঐ সময় আর এক জ্যোতিষী বললেন, ১১ দিনের মধ্যে দীক্ষালাভের সম্ভাবনা আছে। একথা শুনে বেলুড় মঠে যাওয়া স্থির করলাম। কিন্তু মনে ভয়—কোথায় বেলুড় মঠের প্রেসিডেন্ট, যিনি ত্যাগিশ্রেষ্ঠ, সন্ন্যাসীর রাজা! আর কোথায় আমি এক নগণ্য ধনমানকুলহীন ভক্তিবিশ্বাসহীন সংসারের কীট! তিনি কি আমায় আশ্রয় দেবেন? দিলেও যদি বলে বসেন—সংসার ছাড়। তখন? আবার এ সংশয়ও উপস্থিত হলো, কে প্রেসিডেন্ট তা তো জানি না, তাঁকে দেখিনি, তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু শুনিনি, অথচ তাঁকে জীবনের ধ্রুবতারা হিসাবে গ্রহণ করতে হবে! এইসব ভেবেচিন্তে দোদুল্যমান মন নিয়ে একদিন বেলুড় মঠে উপস্থিত হলাম। সেখানে কারও সঙ্গে পরিচয় নেই। জিজ্ঞাসা করে জানলাম শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট এবং তিনি তখন ভবানীপুর গদাধর আশ্রমে আছেন। আমি সেইদিনই মঠ হতে ফিরে বিকালবেলা গদাধর আশ্রমে উপস্থিত হলাম। উপরে একটি ঘরে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম একজন প্রবীণ সাধু খাটের উপরে বিশ্রাম করছেন এবং পাঁচ-ছয়জন বিভিন্ন বয়সের যুবক চারদিকে—কেউ দাঁড়ানো, কেউ বসা। দেখেই বুঝলাম ইনিই প্রেসিডেন্ট মহারাজ এবং মনে মনে প্রণাম করে মেজেতে বসলাম। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ নভেম্বর মাস। শ্রীশ্রীশিবানন্দ মহারাজ যুবকভক্তদের সঙ্গে নানা কথা বলছেন এবং আনন্দ করছেন। কথায় কথায় ভগবদ্ভক্তের কথা উঠতে তিনি বললেন, "তোরাই তো ভক্ত, নইলে তোরা এখানে আসবি কেন? জটাজূট, মালাচন্দন ধারণ না করলেই যে ভক্ত হয় না তা নয়।" এই কথা শুনে আমি একটু আশ্বস্ত হলাম। কিছুক্ষণ পরে একটি বয়স্ক যুবক এসে উপস্থিত হলো। অধ্যক্ষ মহারাজ সেদিন সকালে কয়েকজনকে দীক্ষা দিয়েছেন, তাদের মধ্যে একটি অল্পবয়স্কা মেয়েকেও দীক্ষা দিয়েছেন শুনে যুবকটি একটু অনুযোগের সুরে বলল, "মহারাজ, একি করলেন? ও তো নেহাত ছেলেমানুষ। ও দীক্ষার কি বোঝে?" উত্তরে মহারাজ বললেন, "তুই কি জানিস? দেখবি কালে সে খুব উন্নত হবে।" কে সেই ভাগ্যবতী মেয়েটি আমার জানার সুযোগ হয়নি এবং তার জীবনের কিবা গতি হয়েছে তাও জানিনা। কিন্তু দীক্ষাগুরুর কার্য, স্বতঃপ্রণোদিত অযাচিত কৃপাবর্ষণ এবং তেজোদীপ্ত বাণী আমার মনের সব সংশয় দূর করে দিল। মনে হলো ইনি সাধারণ গুরু নন। ইনি ভূত-ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা। ইনিই প্রকৃত সদ্‌গুরু। আমাকে যদি নিজগুণে কৃপা করেন, আমার জীবন সার্থক হবে। মনে মনে ঐ প্রার্থনা করছি এবং ঘরের এককোণে বসে সব দেখছি ও শুনছি। এদিকে ক্রমে বেশ রাত্রি হয়েছে এবং মহারাজের রাত্রির আহারের সময় উপস্থিত। আমার তখন চৈতন্য হলো। এতক্ষণ অধ্যক্ষ মহারাজও আমায় কোন প্রশ্ন করেননি, আমিও তাঁকে কোন কথা বলিনি। অথচ যে জন্য

গদাধর আশ্রমে আসা তাও বলা হলো না। মহারাজজী যখন আহার করতে বসেছিলেন তখন ঘরের দরজার সামনে (নিতান্ত অশোভন হলেও) দাঁড়িয়ে বললাম, "মহারাজ, আমি নিজেকে বড়ই নিরাশ্রয় মনে করছি, আপনি কৃপা করুন।" একথা শুনে তিনি করুণাভরে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ও! দীক্ষা? হবে—কাল সকালে বেলুড় মঠে যেও।" এই আমার প্রথম শ্রীগুরুদর্শন, শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীর সঙ্গে প্রথম আলাপ।...

পরের দিন ভোরে স্নানাদি সেরে বেলুড় মঠে উপস্থিত হলাম বেলা নয় সাড়ে-নয়টার সময়। তখন পূজ্যপাদ মহাপুরুষজী মেজেতে আসনে বসে চিঠি লিখছেন। সামনে ছোট একটি ডেস্ক। আমি ঘরে প্রবেশ করে তাঁকে এই প্রথম ভূমিষ্ঠ প্রণাম করলাম এবং তিনিও আমাকে ইশারায় বসতে বললেন। সঙ্গে সামান্য কিছু ফল ছিল। খালি হাতে সাধু-দর্শনে যেতে নেই—শ্রীশ্রীঠাকুরের একথা স্মরণ করে ফল নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমি যে দীক্ষাপ্রার্থী হয়ে গেছি, দীক্ষা নিতে কি কর্তব্য, কি কি দ্রব্য লাগে—কিছুই জানিনা, সে সম্বন্ধে মনেও কিছু ওঠেনি এবং কোন প্রস্তুতিও ছিল না। কিছুক্ষণ বসার পরে মহারাজ তাঁর সেবককে বললেন, "এর দীক্ষা হবে।" খানিক পরে মহাপুরুষজী চিঠি লেখা শেষ করে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আমি গঙ্গাস্নান করেছি কিনা। 'করেছি' বলায় আমাকে ঠাকুরঘরে গিয়ে বসতে বললেন। এই সময় সেবক শঙ্কর মহারাজ আমার অবস্থা দেখে আমার হাতে দুটি ফল দিলেন এবং বললেন, "এই দিয়ে গুরুদক্ষিণা দেবেন।" সে ফল হাতে করে আমি ঠাকুরঘরে গেলাম। মহাপুরুষ মহারাজ তাঁর ঘর থেকে ছাদের পথে ঠাকুরঘরে এলেন। পুরাতন ঠাকুরঘর, সেখানে এখনও শ্রীশ্রীঠাকুরের বড় ফটো রক্ষিত আছে। ঠাকুরের সামনে একটি কাঁচের বাক্সের মধ্যে ঠাকুরের ব্যবহৃত চর্ম-পাদুকা। তার সামনে দুখানা আসন পাতা। গুরুদেব স্বয়ং এক আসনে বসলেন এবং আমাকে অন্য আসনে বসতে নির্দেশ করেন। আমাকে ঠাকুর প্রণাম করতে বলায় আমি আসনে বসে করজোড়ে ঠাকুরের পাদুকা লক্ষ্য করে প্রণাম করলাম। আমাকে আচমন করতে বললেন বটে, কিন্তু আমি কি আচমন-বিধি জানি? শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্মরণ করে গঙ্গাজল স্পর্শ করলাম মাত্র। অতঃপর গুরুদেব আমার কি ভাব ভাল লাগে জিজ্ঞেস করেন। আমি তা প্রকাশ করায় "খুব ভাল, খুব ভাল" বলে গুরুদেব বীজমন্ত্র প্রদান এবং ইষ্টবস্তু নির্দেশ করে বললেন, "এই মন্ত্র সকাল-সন্ধ্যায় অন্তত ১০৮ বার জপ করবে এবং শ্রীশ্রীঠাকুরকে ধরে থাকবে।" আমায় খুব আশীর্বাদ করে উঠে চলে যাচ্ছেন দেখে আমি তাড়াতাড়ি সামনে দাঁড়িয়ে ফল দুটি গুরুদেবের হাতে দিলাম। তিনি বললেন, "এখানে বারান্দায় বসে একটু জপ কর।" তাঁর গাম্ভীর্য ও চোখ-মুখের ভাব দেখে কোন কথা জিজ্ঞেস করতে

সাহস হলো না। শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ আমার মতো এক দীন-হীনকে, সাধন-সদাচারহীন অজ্ঞাত-কুলশীল একটি লোককে কৃপাপূর্বক রামকৃষ্ণপরিবারভুক্ত করে নিলেন! তাঁর অপরিসীম করুণা ও উদারতায় আমি মুগ্ধ হলাম।

দীক্ষালাভের পর বিদায় নিয়ে ফেরবার সময়ে শ্রীশ্রীগুরুদেব বললেন, "ঠাকুরই তোমার গুরু জানবে। ঠাকুর ও মায়ের শ্রীমূর্তির সামনে প্রণাম করে সকাল-সন্ধ্যায় অন্তত ১০৮ বার মন্ত্র জপ করবে এবং ঠাকুরের কাছে জ্ঞানভক্তির জন্য প্রার্থনা জানাবে।" আবার বললেন, "ঠাকুরই তোমার গুরু, তাঁকে প্রণাম করবে।" সাক্ষাৎভাবে যাঁর কাছে মন্ত্র পেলাম তাঁর অর্থাৎ নিজের কথা কিছু বললেন না। অধিকন্তু অন্তত ১০৮ বার মাত্র জপের কথা নিতান্ত মামুলি বলে মনে হলো। মনে প্রশ্ন জাগল—তবে কি ১০৮ সংখ্যার মধ্যে কোন গূঢ় রহস্য কিছু আছে? লোকোত্তর পুরুষের কথা, কার্য ও আচরণ কত গভীর অর্থব্যঞ্জক হতে পারে তা উপলব্ধি করার মতো ক্ষমতা আমার ছিল না। কিছুদিন পরে ঐ সম্বন্ধে পত্র লিখতে গুরুদেব উত্তরে জানালেন, "তোমার সংখ্যা রেখে জপ করার আবশ্যক নেই। পথে ঘাটে যখন যে অবস্থায় থাক সেই অবস্থায় যেটুকু পার জপ করবে এবং ইচ্ছা করলে তোমার মন্ত্রদাতা গুরুকে প্রণাম করে নেবে।" যেটুকু নিয়মবিধি ছিল তাও তুলে দিলেন। আশা-নিরাশার মধ্যে দিন কাটতে লাগল।

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে বায়ু-পরিবর্তনের জন্য বৈদ্যনাথ গিয়েছিলাম। যাবার পূর্বে মঠে শ্রীগুরুদেবের চরণ-সমীপে উপস্থিত হই। আমার কুশলাদি জিজ্ঞেস করে তিনি বললেন, "দেখ, আমরা ব্যবসাদার নই, আমরা লোক ঠকাতে বসিনি। এখানে যখন এসেছ কোন ভয় নেই। ঠাকুর বড় দয়াল। আমি সাধন-ভজন জানি না, আমাকে কৃপা কর, বলে তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে।" ইত্যাদি অনেক উপদেশ দিলেন। প্রাণ ভরে গেল।

বৈদ্যনাথধামে মাস দুয়েক ছিলাম। বাবা বৈদ্যনাথকে দর্শন করতে গিয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলে প্রণাম করলাম। আমার এমন মতিভ্রম কেন হলো মনে করে পরে অনুতাপ হলো এবং শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজকে পত্র দ্বারা জানাতেই তিনি লিখলেন—"কোন চিন্তা নেই, ঠিকই আছে, এক জ্ঞানই জ্ঞান। মহাভাগ্যেই মানুষের শ্রীরামকৃষ্ণই 'সর্বদেবীস্বরূপ'—এই জ্ঞান হয়।" গুরুদেবের এ উপদেশে খুব আশ্বস্ত হলাম।

* * *

কিছুকাল পরে জনৈক বিশিষ্ট ভক্তের সঙ্গে আমার পরিচয় হলো। আমি শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের পদাশ্রিত অকৃত জন জেনে তিনি আমাকে খুব ভাগ্যবান বলে প্রশংসা করতে লাগলেন। আমি কিন্তু বললাম, "কই, আমার তো কিছুই

হলো না। সাধন-ভজন নেই, প্রাণে তেমন ব্যাকুলতাও এলো না যাতে ঈশ্বরদর্শন হতে পারে। এমনকি স্বপ্নে দর্শনও আমার ভাগ্যে হলো না।" তা শুনে সে ভক্ত বললেন, "সে কি? আপনি যে মন্ত্র পেয়েছেন, তা সিদ্ধ মন্ত্র। ঐ মন্ত্র হাজার বার জপ করলেই আপনার স্বপ্নে দর্শন হবে। ও তেমন কিছু না।" আমি প্রথম থেকেই সংখ্যা রেখে জপ করি না, অতএব সংখ্যার দিকে নজর না রেখে তখন হতেই মনে মনে জপ করতে আরম্ভ করলাম। নৌকায় ও গাড়িতে সারাপথ, কর্মস্থলে এসেও হাতমুখ ধোয়া, কথাবার্তা বলা, খাওয়া এমনকি ঘুমের মধ্যেও জপ চলছে। একটা নেশার মতো হয়ে গেল। দুদিন পর্যন্ত এভাবে চলে। ফলে পর পর দুরাত্রেই দুটি স্বপ্ন দেখলাম। দর্শন হলো—খুব তাৎপর্যপূর্ণ দর্শন। প্রথম রাত্রে গুরুদেবের উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় মূর্তি দেখলাম। ক্রমে সে মূর্তি শ্রীশ্রীঠাকুরের মূর্তিতে পরিণত হলো এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের মূর্তিও আদ্যাশক্তি মা কালীর মূর্তিতে পরিণত হয়ে অদৃশ্য হলো। পরের রাত্রে দেখলাম শ্রীগুরুদেব কর্ণধার হয়ে আমাকে নিয়ে চলেছেন। সে দৃশ্য এখনও যেন চোখের উপর ভাসছে। ঐ স্বপ্ন দেখে আশা ও আনন্দে মন ভরে গেল এবং গুরুশক্তি সম্বন্ধেও বিশ্বাস হলো। এই স্বপ্নবৃত্তান্ত সম্যক বিবৃত করে সঙ্গে সঙ্গে গুরুদেবকে একপত্রে জানালাম। তিনি উত্তরে লিখলেন, "এ ভাল স্বপ্ন বটে, কিন্তু এ তো স্বপ্ন! এ স্বপ্ন ভক্তি-বিশ্বাসলাভে একটু সাহায্য করে মাত্র, তা ছাড়া এর কোন মূল্য নেই। এই দর্শন (জাগ্রত অবস্থায়) সজ্ঞান হওয়া চাই। তুমি সেই প্রার্থনা করবে।"...

অতঃপর এক অবধূত সাধুর সঙ্গে আলাপ হয়। তিনি শ্রীমৎ মহাপুরুষ মহারাজের কথা শুনে বলেন, "আপনার কি? আপনি তো জাহাজের সঙ্গে নৌকা বেঁধেছেন" ইত্যাদি। অথচ আমাকে তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন, "আপনাকে কি কোন সাধন দিয়েছেন?" আমি বললাম, "সাধন বলে তেমন কিছু তো জানি না, মন্ত্র পেয়ছি মাত্র।" অবধূত সাধুর কথা শুনে মন কেমন খুঁতখুঁত করতে লাগল এবং অনতিবিলম্বে শ্রীগুরুদেবের মতামত জানার জন্য একবার তাঁর শ্রীচরণসমীপে উপস্থিত হলাম। মনে হলো গুরুদেব যেন পূর্বেই সব জেনে শুনে প্রস্তুত হয়ে আছেন এবং কোন প্রশ্ন করবার পূর্বেই বললেন, "তোমার আর কিছুরই দরকার নেই। যে নাম পেয়েছ সে নাম জপ করবে এবং সঙ্গে সঙ্গে একটু প্রার্থনা করবে। এতেই হবে। তাঁর কৃপায় বিন্দুতে সিন্ধু হয়ে যায়। যা বলছি, ঠিক বলছি, জানবে।" এভাবে যখনই গুরুদেবের দিব্য সান্নিধ্যে গিয়েছি তখনই যেন মনের সব সংশয় দূর হয়ে যেত এবং আমার হৃদয়-মন পূর্ণ করে ফিরতাম! ঐ যে একটু প্রেরণা লাভ করতাম তার প্রভাবে বেশ কিছুদিন জপ-ধ্যান স্মরণ মনন চলত এবং আনন্দ পেতাম। এ যেন ঘড়িতে দম দেওয়া।...

একবার নিজের ও স্ত্রীর অসুখ, একমাত্র ছেলের মৃত্যু এবং একটি মেয়ের দীর্ঘকালব্যাপী কঠিন পীড়া ইত্যাদিতে বিব্রত হয়ে প্রায় এক বৎসর যাবৎ অশান্তিতে ভুগি। এই অগ্নি-পরীক্ষার সময়ে আত্ম-বিশ্লেষণ করে বুঝলাম, আমার কিছুই হয়নি, বরং আরও পিছিয়ে গেছি, মনের মতো জপ ধ্যান কিছুই হচ্ছে না। আমার নিজের উপর ধিক্কার এল। শুনেছি শিষ্যের দুষ্কৃতির জন্য গুরুকে ভুগতে হয়। প্রাণে বল নেই, মনের একাগ্রতা নেই, ভগবানলাভ তো দূরের কথা। অতএব আমি তো অধঃপাতে গেছি! জীবনটাই বিফলে গেল! মনের এই অবস্থা জানিয়ে গুরুদেবকে পত্র লিখলাম। উত্তরে তিনি জানালেন, "তোমার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে—যার পাঁঠা সে ঘাড়ে না কাটিয়ে লেজে কাটিলে কে কি করিতে পারে? যাক, তুমি যে দারুণ পুত্রশোক পাইয়াও ঠাকুরের কাছে ভক্তি বিশ্বাস প্রার্থনা করেছ, তা তোমার অবশ্য হবে। আর তুমি যখন যে অবস্থায় থাক, জানবে শ্রীশ্রীঠাকুর সদা তোমার পিছনে আছেন। গুয়ে-মুতে জড়িয়ে থাকলেও ঠাকুর ধুয়ে-মুছে কোলে তুলে নেবেনই, নিশ্চয় জানিও। আর মনের একাগ্রতার কথা যা বলেছ তা মন যদি তোমার একাগ্রই হবে তবে আর ভাবনা কি? তাঁর উপর নির্ভর করে তাঁর কৃপাপ্রার্থী হয়ে থাকবে, তোমার অবশ্যই মঙ্গল হবে। সাধনা দ্বারা কি ভগবানলাভ হয়? তুমি আর কি সাধন করবে? তোমার মাথার উপর কত বোঝা রয়েছে, ঠাকুর সব জানেন। যেটুকু পার সেটুকু করে যাও, তারপর ঠাকুর আছেন আর তোমার গুরু আছেন—তারা দেখে নেবেন।" ঐ চিঠি পেয়ে আশা ও আনন্দে অন্তর ভরে গেল।...

শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ সম্বন্ধে স্বভাবতই মনে এক চিন্তা জাগরূক হতো, কে ইনি? পরের জন্য তাঁর কেন এত দরদ? কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারিনি। তাঁর সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরের কোন বাণীও জানা ছিল না। শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানগণ কেউ ব্রজের রাখাল, কেউ শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত, কেউ মহাপ্রভুর দলের, কেউ বা খ্রিস্টের দলের, কারও বা শেষ জন্ম ইত্যাদি, কিন্তু মহাপুরুষ মহারাজ সম্বন্ধে ঠাকুরের এরূপ কোন ইঙ্গিত জানা সম্ভব হয়নি। মহাপুরুষজীর নিজের কাছ থেকে শুনব তবে বিশ্বাস করব—এটা ভেবে একবার তাঁর কাছে লিখলাম। কিন্তু তিনি ভোলানাথ, উত্তরে লিখলেন, "আমি কে বা কি ওসব আমি জানি না, বাবা। এইমাত্র জেনে রাখ আমি ঠাকুরের সন্তান, ঠাকুরের দাস।" একবার স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে লিখেছিলাম। তিনি লিখেছিলেন, "মহাপুরুষ মহারাজ ঠাকুরের লীলাসহচর।"...

শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, ভগবানলাভই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য। ভগবানলাভ অর্থে ভগবানের কোন রূপের দর্শন বুঝতাম এবং কোন কোন ভক্তের ও রূপ দর্শন হয় তাও কখনও কখনও শুনেছি। আমার দর্শনাদি কিছু হলো না বলে মনে কষ্টও

হতো। এরূপ বেদনাক্রান্ত মনে একবার পূজ্যপাদ গুরুদেবের শ্রীচরণসমীপে উপনীত হই এবং প্রণামান্তে আমার প্রার্থনা জানাতে তৎক্ষণাৎ তিনি বললেন, "ঐসব দর্শনে কি হয়? ঠাকুরকে কত লোকে তো দেখেছে! তাদের সবার কি হয়েছে? ঠাকুর যে ভগবান তা কি তারা বুঝেছে? যতক্ষণ সে অনুভূতি না হয় ততক্ষণ কিছুই হলো না। ভক্তিই সার—শুদ্ধাভক্তি; তুমি ঠাকুরের কাছে কেঁদে কেঁদে তাই প্রার্থনা করবে। ভক্তিই তোমার সহজ-ভাব (সহজাত আমি বুঝেছিলাম), ঠাকুরের কৃপায় তাই তোমার লাভ হবে, আমি বলছি।" তিনি এমন ভাবে বললেন যে, ঐরূপ দর্শনাদি আমার কাছে তখন মূল্যহীন মনে হলো। আর কোন কথা বলতে পারলাম না।...

আর একবার দীক্ষালাভের প্রায় ৯ বৎসর পরে শ্রীগুরুদেবের কাছে উপস্থিত হই এবং শ্রীচরণ-বন্দনা করে বসতেই যা কোন দিন বলেননি তাই বলতে আরম্ভ করলেন, "তোমার বাড়ি কোথায়? কোথায় থাক? কি কাজ কর?" একে একে এসব জিজ্ঞেস করলেন। আমি যথাযথ উত্তর দিলাম এবং আমার চাকরির কথা শুনে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের প্রমোশন হয় না?" "হয়, মহারাজ, কিন্তু আমি এদিকে প্রমোশন চাই না", উত্তর দিলাম। মহারাজ বলেন, "Oh, you want spiritual advancement (ওঃ, তুমি আধ্যাত্মিক উন্নতি কামনা কর।)—হবে হবে, তোমার হবে, নিশ্চয় হবে। আমি বলছি হবে, ঠিক বলছি হবে।" ঐরূপ পুনঃ পুনঃ বলতে লাগলেন, আমার চাকরি-জীবনে প্রমোশন হয়নি। আধ্যাত্মিক জীবনে প্রমোশনের জন্য তাঁর দিকে চেয়ে আছি তাঁর প্রতিশ্রুতি স্মরণ করে।...

কিছুদিন পরে আর একবার কোন এক ছুটিতে শ্রীগুরুদেবের দর্শনমানসে বেলুড় মঠে উপস্থিত হই। মনে রয়েছে—আমার দর্শনাদি তো হবে না। তবে আধ্যাত্মিক জীবনের কি পরিণতি হবে? মুক্তি বা মোক্ষের অধিকারী হব কি? কিন্তু তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে যেন সব ভুলে যেতাম। এবারেও তাই হলো। গুরুদেব যেন প্রাণের কথা টেনে নিয়ে বললেন, "মুক্তি-ফুক্তি কি? ও তো অবশ্যম্ভাবী, হাতের মুঠার মধ্যে। তবে যদি কিছু কর তবে জীবন্মুক্তির স্বাদ অনুভব করবে। ঠাকুরকে ধরে থাক, তাঁর কাছে প্রার্থনা কর। ক্রমে সব হবে।"

আবার কোন সময়ে গুরুদেব বলেছেন, "ঠাকুর জীবের মঙ্গলের জন্য এসেছিলেন, আমরাও তাঁরই কাজ করছি। লোক-কল্যাণ-কামনা ভিন্ন অন্য কোন কামনা আমাদের নেই—ঠিক বলছি, আমরা লোক ঠকাতে আসিনি।"...

* * *

আমি একাই দীক্ষা নিয়েছিলাম, কারণ তখন আমার স্ত্রীর দীক্ষালাভের জন্য কোন উৎসাহ দেখিনি বলে তাঁকে ওসব জানাইনি। দীর্ঘকাল পরে স্ত্রীর দীক্ষা নেবার

আকাঙ্ক্ষা হতে শ্রীগুরুদেবকে লিখলাম। গুরুদেবের অনুমতি পেয়ে সম্ভবত ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে স্ত্রীকে সঙ্গে করে মঠে যাই। তখন শ্রীগুরুমহারাজ প্রায় চলচ্ছক্তিহীন। গুরুদেব নিজের প্রকোষ্ঠে বিছানায় বসেই স্ত্রীকে দীক্ষামন্ত্র ভালরূপ উচ্চারণ করে শুনিয়ে দিলেন আমার উপস্থিতিতে এবং মাত্র শুনিয়েই বললেন, "ব্যস! হয়ে গেল।" আর কোন কথা না। জপ-ধ্যানের কোন কথাও না। আমরা প্রণাম করে চলে এলাম।

১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে অর্থাৎ পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের শরীরত্যাগের পর আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। ইতোমধ্যে স্ত্রীকে কোনদিন জপ করতে দেখিনি। "একটুও জপ করছ না, তবে কি তুমি কেবল হাতের জল শুদ্ধ করার জন্য মন্ত্র নিলে?" জিজ্ঞেস করায় স্ত্রী উত্তরে বলেছিলেন, "কই, গুরুদেব তো আমাকে জপ করতে বলেননি। মন্ত্র আমার হৃদয়ে গাঁথা রয়েছে।" দেহত্যাগের পূর্বক্ষণ যখন বাইরের জ্ঞান লুপ্তপ্রায়—এ অবস্থায় স্ত্রী বলে উঠলেন, "গুরুদেব এসেছেন। বসতে দিলে না?" এর পরে স্ত্রীর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ হয়।...তখন বুঝলাম গুরুদেব তাঁর সব ভার নিয়েছিলেন।...

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে বড়দিনের ছুটিতে শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণদর্শনমানসে মঠে যাই। প্রণামান্তে নানা কারণে আমার সাধনভজন কিছুই হচ্ছে না বলে আর্তি জানাতে গুরুদেব অভয় দিয়ে বললেন, "ভয় কি? ঠাকুর আছেন, তিনি দেখছেন, যেটুকু পার সেটুকু করে যাও। দিনান্তে একবার স্মরণ করো, তাতেই হবে।" "ঠাকুরকে তো দেখছি না, তাই আপনাকে জানাচ্ছি" বলে বিদায়ের প্রণাম জানাতে মহাপুরুষজী "শ্রীগুরু শ্রীগুরু" উচ্চারণ করে দৃঢ়স্বরে বললেন,—"আমি বলছি, আমার কৃপায় তোমার বস্তুলাভ হবে।" তাঁর এই অনুপম কৃপা ও আশীর্বাণী লাভ করে আমার চোখ আনন্দাশ্রুতে ভরে গেল, যেন আর বাক্যস্ফূর্তি হচ্ছিল না, গদগদকণ্ঠে বললাম, "আমার আর চাওয়ার কিছু নেই।" পূজ্যপাদ গুরুদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত এই বাণীই আমার কাছে শেষ বাণী। এরপর একবার মাত্র তাঁর শ্রীচরণ দর্শন ও প্রণাম করবার সুযোগ পেয়েছিলাম। কিন্তু তখন তিনি দারুণ সন্ন্যাসরোগে বাক্‌শক্তিরহিত।...

অনেক ভাগ্যবান ভক্ত আছেন, যাঁরা শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে বিশেষ অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশার সুযোগলাভ করেছেন, কিন্তু আমার সে সৌভাগ্য বেশি হয়নি। তিনি কে, কি দৈবীশক্তির আধার ছিলেন—জানি না। তিনি তাঁর প্রকোষ্ঠে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করে বসে থাকতেন যে, সেখানে উপস্থিত হলেই মনে হতো যেন অন্য রাজ্যে উপস্থিত হয়েছি। মনের মলিনতা, সমস্ত সংশয় দূর হয়ে

যেত এবং ঐ চকিত-দর্শন ও তাঁর তেজোদীপ্ত বাণী হতে এমন এক প্রেরণা লাভ করতাম যার প্রভাব অনেক দিন থাকত। একদিকে তাঁর দীনতা, অহংবুদ্ধিরাহিত্য, গুরুবুদ্ধির একান্ত অভাব আর অন্যদিকে আধ্যাত্মিক জগতের একচ্ছত্র অধীশ্বর এবং সংসারতাপদগ্ধ জীবের ভুক্তি-মুক্তি-বিধাতা—এ উভয় ভাবের একত্র সমাবেশে তিনি এক পরম রহস্যময় পুরুষ বলে প্রতীত হতেন। আমার মনে হতো তিনি যেন কল্পতরু হয়ে বসে আছেন।

"ক্ষণমিহ সজ্জনসংগতিরেকা।
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।"

—এ মহাজন-বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি করেছি পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের জীবন থেকে। শ্রীগুরুদেবের এই অমিয়মাখা আশীর্বাণী, যা চিত্তপটে লেখা হয়ে আছে, তাকেই জীবনের প্রধান অবলম্বন করে সংসার সাগরে ভেসে চলেছি এবং এই স্মৃতিকথা যতই চিন্তা করছি, ততই আনন্দ অনুভব এবং নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান মনে করছি। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার মতো তাঁর স্মৃতিকণিকাসহ নিজেকে শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে অঞ্জলি দিয়ে ধন্য হচ্ছি।

মহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতি-কণা

শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ সেন

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ আমেরিকা থেকে ফিরে আসতে কলকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে তাঁকে নাগরিক অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে। অভ্যর্থনার উত্তরে তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, আমি আর একজনের সঙ্গে তার অনুলিপি গ্রহণ করি। অনুলিপি-সঙ্কলনকালে জনৈক ভক্ত কথায় কথায় আমাকে বলেন, "বেলুড় মঠে একজন খুব বড় সাধু আছেন, তিনি 'মহাপুরুষ মহারাজ' নামে খ্যাত। আপনি যদি তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন তো প্রচুর আনন্দ পাবেন।" এ কথা শুনে কিছুদিন পর আমি একদিন শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজকে দর্শন করার জন্য বেলুড় মঠে যাই। পৌঁছে দেখলাম তিনি মঠের বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত। আমি প্রণাম করলাম। তাঁর সঙ্গে একটু আলাপ করতে এসেছি শুনে তিনি অতি কোমলস্বরে বললেন, "বাবা! আজ তো আমি বড় ব্যস্ত—আমাদের মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দজী) অসুস্থ হয়ে বাগবাজারে বলরাম মন্দিরে আছেন। আমি তাঁকে দেখতে যাচ্ছি এবং ওখানেই এখন থাকি। তুমি, বাবা, আর একদিন এসো।" এ কথা কয়টি

এমন বেদনাভরা স্বরে ও স্নেহভরে বললেন যে, আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম এবং তা আমার মনে বেশ একটি রেখাপাত করল। প্রত্যুত্তরে বললাম, "আমি কি আপনার সঙ্গে যেতে পারি?" তাতে তিনি বললেন, "তা এসো না, বাবা। এতে আর আপত্তি কি?" এই বলে তিনি মঠ থেকে হেঁটে বেলুড় স্টিমারঘাটে গিয়ে স্টিমার ধরে বাগবাজারে নামলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে বলরাম মন্দিরে গিয়ে অসুস্থ 'রাজা মহারাজকে' (স্বামী ব্রহ্মানন্দজী) দর্শন করলাম। রাজা মহারাজের অসুস্থতার জন্য মহাপুরুষ মহারাজকে বড় চিন্তিত দেখে সেদিন আর তাঁর সঙ্গে কোন কথাবার্তা বলার সুযোগ হয়নি, কিন্তু তাঁকে আমার খুব ভাল লেগেছিল।

* * *

৪ আশ্বিন ১৩২৯ (ইংরেজি ১৯২২) আমি প্রথম 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের' কথক শ্রীম-র (মাস্টার মশাই) সংস্রবে আসি। 'কথামৃত' প্রত্যহ পড়ে স্টিমারে কাশীপুর থেকে বেলুড় মঠে যেতাম। মঠে গঙ্গাস্নান, শ্রীশ্রীঠাকুরদর্শন ও শ্রীমহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করে ফেরি স্টিমার শিবতলা হতে ফিরে এলে সেই স্টিমারেই বাড়ি ফিরতাম। এতে কাজকর্ম কিছু ব্যাহত হতো না। এর ফলে বেলুড় মঠের সাধুদের বেশ ঘনিষ্ঠভাবে জানবার একটা সুযোগ হয়েছিল। কোন কোন ভক্ত বিনা সংবাদে কখনো কখনো মঠে প্রসাদ পান শুনে মাস্টার মশাই বলেছিলেন, "মঠে যখন-তখন প্রসাদ পেতে নেই। এতে আশ্রম-পীড়া করা হয়।" একদিন কোনও ভক্ত মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগ ও সাধুদের সেবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন। আমি যথারীতি মঠে গিয়ে শ্রীমহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করতে তিনি অতি স্নেহভরে বললেন, "ওহে, আজ মঠে ঠাকুরের ভোগের বিশেষ ব্যবস্থা হয়েছে, আজ তুমি এখানে প্রসাদ পেয়ে যেও।" আমি তখন মঠে নতুন যাওয়া-আসা করছি, তাই মহাপুরুষ মহারাজের এই কথার গুরুত্ব বুঝিনি। আমি তখন মাস্টার মশাই-এর সাবধান-বাণী স্মরণ করে ভাবলাম—মঠে প্রসাদ পেলে তো আশ্রম-পীড়া করা হবে; অতএব মঠে প্রসাদ না পেয়েই চলে এলাম। মাস্টার মশাই তখন মিহিজামে ছিলেন। এই ঘটনা তাঁকে লিখে জানালাম যে, আশ্রম-পীড়ার আশঙ্কায় মহাপুরুষ মহারাজের কথা শুনিনি এবং প্রসাদ না পেয়েই চলে এসেছি। আমার চিঠি পেয়ে মাস্টার মশাই ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ৩ নভেম্বর মিহিজাম থেকে লিখেছিলেন—"আপনি শ্রীযুক্ত মহাপুরুষের পুনঃ পুনঃ নিমন্ত্রণ সত্ত্বেও মঠে মহাপ্রসাদ পান নাই শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম। সাধুদের নিমন্ত্রণ অনেক ভাগ্যের কথা। শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য ফল-মিষ্টান্ন লইয়া আপনি যদি পূজার্থে মঠে নিবেদন করেন ও সেইদিনই মঠে মহাপ্রসাদ নিজে প্রার্থনা করিয়া ভোজন করেন তবে বড় ভাল হয়।"

মাস্টার মশাই-এর আদেশমত আমি মহাপুরুষ মহারাজের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে পরে একদিন বেলুড় মঠে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেছিলাম।

ক্রমে শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের প্রতি আমার এমন একটা প্রবল আকর্ষণ হলো যে, মঠে গিয়ে তাড়াতাড়ি প্রথমেই তাঁর শ্রীচরণদর্শন করতাম। প্রতিবারই তিনি জিজ্ঞেস করতেন, "কিগো, ঠাকুরঘরে গিছিলে?" প্রত্যেক বারই বলতে হতো, "না, মহারাজ, যাইনি।" তৎক্ষণাৎ নিচে নেমে দোতলার উপরে ঠাকুরঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করে মহাপুরুষজীর কাছে আসতাম। তাঁকে দর্শন করলে এবং তাঁর ঘরে একটু বসে থাকলেই হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয়ে যেত এবং মন এক উচ্চভূমিতে উন্নীত হতো অনুভব করতাম। তাঁকে কখনও কোন প্রশ্ন করবার প্রয়োজন হয়নি। দর্শন করলেই সব প্রশ্নের সমাধান হয়ে মনপ্রাণ আনন্দে ভরে যেত।

এক রবিবার মঠে গিয়েছি। সেদিন আমার জামাকাপড় তেমন পরিষ্কার ছিল না। মহাপুরুষজী ঠিক তা লক্ষ্য করেছিলেন। "হ্যাঁ হে, তোমার জামাকাপড় ময়লা কেন?" আমি বললাম, "মহারাজ, আজ রবিবার মঠে এলাম। আপনাদের সকলের কাছে তো আমি পরিচিত। আপনাদের সামনে একটু ময়লা কাপড় পড়ে এলেই বা ক্ষতি কি? সোমবার অফিসে যেতে হবে, অনেক সময় কাজের জন্য বড় সাহেবের সামনে যেতে হয়, তখন ময়লা কাপড় চলে না। কাল কাপড় ছাড়তেই হবে বলে আজ আর কাপড় ভাঙিনি।" এই কথা শুনে তিনি বললেন, "ওহে, ঠাকুর যে আমাদের 'বড় সাহেব'। ঠাকুর আমাদের ময়লা কাপড় পরে ঘোরা পছন্দ করতেন না। এখানে যখনই আসবে ফরসা কাপড় পরে আসবে।"

* * *

আঠারো দিনের একটি শিশুসন্তান রেখে আমার স্ত্রী পরলোকগমন করেন। দু-তিন মাস পরে একদিন মঠে গিয়েছি, মহাপুরুষ মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন—"হ্যাঁ হে, তোমার ছেলেটি কেমন আছে?" মায়ের দুধ না পাওয়ায় ছেলেটির শরীর শুকিয়ে গিয়েছিল—ডাক্তারি ভাষায় যাকে বলে 'রিকেটী'। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে বললাম, "মহারাজ, ছেলেটি রিকেটী হয়ে গেছে।" তিনি বললেন, "ছেলেটি রিকেটী হয়ে গেছে! আচ্ছা, একদিন তাকে এনো তো, দেখবো কেমন হয়েছে। এর মধ্যে এক কাজ করবে, আমার বিশেষ পরিচিত একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার আছেন, তাঁর নাম ডাঃ সুরেশ দত্ত। তাঁকে বলবে যে, আমি তোমাকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছি, ছেলেটিকে ভাল করে দেখে যেন একটা ওষুধের ব্যবস্থা করেন।" তাঁর নির্দেশমত ছেলেটিকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি দেখেশুনে ওষুধ দিলেন এবং তাতে উপকারও হলো।

পরে একদিন আমার ছেলেটিকে নিয়ে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি ছেলেটির গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, "আমাদের আর কি ওষুধ আছে, বাবা! শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণামৃতই আমাদের যা কিছু ওষুধ। ছেলেটিকে একটু চরণামৃত খাইয়ে দিও, আর একটু গায়ে মাখিয়ে দিও। শ্রীশ্রীঠাকুর ওকে ভাল করে দেবেন।" মহাপুরুষজীর আশীর্বাদে ছেলেটি বেশ সেরে গেল। তাঁর অপার করুণার কথা ভেবে অবাক হই!...

সৌভাগ্যক্রমে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দ হতে মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার সুযোগ পাই। তাঁর যে স্নেহ ও ভালবাসা পেয়েছিলাম তাতে মনে হতো যেন আমাকে উনি সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে মঠের জনৈক সন্ন্যাসী আমাকে বলেন, "মহাপুরুষ মহারাজ তোমাকে এত ভালবাসেন, তুমি ওঁর কাছে দীক্ষা নিচ্ছ না কেন?" আমি পূর্বে কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলাম বলে আবার দীক্ষা নিতে আগ্রহ করিনি। আমার মনে হতো—মহাপুরুষজী আমাকে এত ভালবাসেন, আমার আর দীক্ষা নেবার প্রয়োজন কি? বিশেষত মাস্টার মশাই বলতেন যে, দীক্ষা একবার নিলেই হয়। ঐ সন্ন্যাসীকে মাস্টার মশাই-এর কথা বললাম। তাতে তিনি বললেন, "ও নিয়ম ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষের পক্ষে প্রযোজ্য নয়। আচ্ছা, মাস্টার মশাইকেই তুমি এ বিষয় বরং জিজ্ঞেস করো।" মাস্টার মশাইকে জিজ্ঞেস করতেই তিনি বললেন, "তুমি যাঁর কাছে দীক্ষা নিতে ইচ্ছা করছো, তাঁকেই জিজ্ঞেস করো।" তাই একদিন আমি শ্রীমহাপুরুষ মহারাজকে সব বললাম। কুলগুরুর কাছে পূর্বে দীক্ষা নিয়েছি, তাও জানালাম। তিনি সব শুনে বললেন, "কি হে! তোমায় দীক্ষা দিইনি? আচ্ছা, কালই আসবে।" আমি বললাম, "সে কি, মহারাজ, এত শীঘ্র আমি কি করে প্রস্তুত হব? আমাকে কিছু সময় দিতে হবে।" তিনি বললেন, "কিছু প্রস্তুত হতে হবে না। ভাঁড়ার থেকে একটি হর্তুকী চেয়ে নিয়ে আসবে, তাই দক্ষিণা দেবে। তোমাকে আর কিছু দিতে হবে না।" আমি অবশ্য তার পরদিনই কিছু ফল, ফুল, মিষ্টান্নাদি নিয়ে মঠে এলাম এবং যথাসময়ে কৃপাময় পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমহাপুরুষজী আমাকে দীক্ষা দিলেন।

শতসহস্র জন্মেও শ্রীগুরুদেবের ঋণ শোধ হবার নয়। সে সব পুরানো দিনের মধুময় স্মৃতি মনে হলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাই। তাঁর অসীম ভালবাসার ফলে বেলুড় মঠ যে আমাদের কত প্রিয় তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না!

জয় শ্রীগুরু মহারাজ

শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতিকথা

শ্রীআদিত্যপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাপুরুষের দর্শন মানুষের অনেক ভাগ্যে হয়। কিন্তু সে মহাভাগ্য ঘটতে আমার জীবনে অনেক বিলম্ব হয়েছিল। তারই দুচারটে কথা প্রথমে বলছি। গ্রামদেশ হতে কলকাতায় এসে কলেজে পড়ার সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশের একটি ছোট সংকলন হাতে পড়ে। সেটি পড়তে ভালই লেগেছিল। তারপর ইংরেজিতে স্বামীজীর ভাষণ ও রচনা কিছু কিছু পড়বার সুযোগ হয়, তাতে মনে স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের উপর শ্রদ্ধা জন্মেছিল। কলেজে পড়ার সময়ে (১৯১০—১৬ খ্রিস্টাব্দে) কয়েক বার উৎসব দেখতে বেলুড় মঠেও যাই। কালীকীর্তন শুনেছিলাম—এটা মনে আছে। তবে কোন সাধু-মহারাজের সঙ্গে আলাপ হয়নি।

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্ণৌ-এ আমার চাকরি-জীবন আরম্ভ হয়। শ্রীরামচন্দ্র দত্তের লেখা একখানা বই পড়ার সুযোগ সেই সময়েই হয়। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্ণৌ-এর মিলিটারি একাউন্টস্ অফিস ভেঙে গেল। আমি এলাহাবাদে বদলি হয়ে গেলাম। ঐ বছরের শেষাশেষি ওখানে হিউয়েট রোডে যে ব্রহ্মবাদিন্ ক্লাব ছিল, তার উপর তলাটা ভাড়া নিয়েছিলাম। ঐ সময় (১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে) শ্রীমহাপুরুষজী ঐ ক্লাবেও গিয়েছিলেন, আমি কিন্তু তাঁকে দর্শন বা প্রণাম করতে যাইনি। তিনি একবার ওপর তলায়ও এসেছিলেন, কিন্তু আমি তখন উপস্থিত ছিলাম না। তিনি (তিন-চার দিন) এলাহাবাদ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ছিলেন, মন্ত্রদীক্ষাও দিয়েছিলেন।...

ঐ সময়ে শ্রীমহাপুরুষজীকে দর্শন করা হলো না বটে, কিন্তু মুঠিগঞ্জ আশ্রমে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের কাছে যাতায়াত করতে লাগলাম। কয়েকজন শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তের সঙ্গে পরিচয়ও হলো। সেখানে আশ্রমে ৺দুর্গাপূজা, ঠাকুরের তিথিপূজা ইত্যাদিতে যোগদান করে আনন্দও পেতাম। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুরের একখানি ছবি রেখে নিজঘরে পূজা করতে আরম্ভ করি।

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে বেরেলীতে আমি বদলি হলাম। সেখানের অফিসে একজন মাত্র বাঙালি সহকর্মী ছিলেন। তাঁর সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্ব হলো। তিনি কয়েক বৎসর আগে শ্রীমহাপুরুষজীর কৃপা পেয়েছিলেন। তাঁর কাছে আমি শ্রীমহাপুরুষজীর কথা

শুনতাম এবং তাতে তাঁর প্রতি মন বিশেষ আকৃষ্ট হলো। চার-পাঁচ মাস পরেই মীরাটের হেড অফিসে বদলি হলাম। কিন্তু মীরাটে এসে কয়েক মাসের মধ্যেই জীবনে একটা বড় রকমের ওলট-পালট হয়ে গেল। আমার দুটি কন্যা ও দুটি পুত্রসন্তানের মধ্যে দুটি ছেলেকেই হারালাম। মন যেন নিরালম্ব, বাঁধনহারা হয়ে গেল। এমনটি আঘাতের বোধকরি প্রয়োজন ছিল। তখন আমাদের মনের অবস্থা জানিয়ে শ্রীমহাপুরুষজীকে একখানি পত্র লিখলাম যেন বেলুড় মঠে তাঁর শ্রীচরণদর্শন পাই। গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গেলে মহাপুরুষজীর কথা চিন্তা করতাম। একটি ভারী ভারী মুখ যেন মানসপটে ফুটে উঠতো।

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে কলকাতা রওনা হলাম। সঙ্গে স্ত্রী ও বড় মেয়েটি। পরদিন একটা ট্যাক্সি করে বেলুড় মঠে যাত্রা করলাম। ড্রাইভারেরও পথ ঠিক জানা ছিল না। যেদিকে ইটখোলা ইত্যাদি ছিল, সেদিক দিয়েই মঠে গেলাম। ভাল রাস্তা, যা এখন হয়েছে তা তখন ছিল না। যখন পৌঁছলাম, তখন সাধুদের বিশ্রামের সময়। যে দু-এক জন বাইরে ছিলেন—তাঁদের বললাম যে, আমরা পূজ্যপাদ শ্রীমহাপুরুষজীর দর্শনপ্রার্থী। তাঁরা বললেন, "খানিক পরে তাঁর সেবক আসবেন, তাঁকে বলবেন।" অপরাহ্ণের দিকে যখন সেবকের সঙ্গে দেখা হলো, তিনি বললেন যে, মহাপুরুষ মহারাজের শরীর সুস্থ নয়, তিনি এখন মন্ত্রদীক্ষা সাধারণত দেন না, তবে দর্শনের কথা তাঁকে জানাচ্ছি। কিছু পরে সেবক মহারাজ আমাদের ওপরে নিয়ে গেলেন। যখন আমরা মহাপুরুষজীর ঘরের দরজার কাছাকাছি তখন তিনি করুণাভরে বললেন, "বড় সন্তপ্ত হয়ে এসেছ, বাবা।" তাঁর কথা শুনে মনে হলো যেন আমাদের শোকের সন্তাপ বাইরে টেনে নিচ্ছেন। আমরা অশ্রু-সজল চোখে তাঁর শ্রীচরণের কাছে বসলাম। তিনি কত সান্ত্বনা দিলেন! দীক্ষার প্রার্থনা জানাতে পৌষ-সংক্রান্তির দিনে মন্ত্রদীক্ষার সময় ধার্য করলেন। শঙ্কর মহারাজ দীক্ষার জন্য কি আনতে হবে বলে দিলেন। মহাপুরুষজীর কাছে কেউ আমাদের দীক্ষার জন্য সুপারিশ করেন—এটা বোধ হয় প্রভুর অভিপ্রেত ছিল না।

পৌষ-সংক্রান্তির দিন সে বছর স্বামী তুরীয়ানন্দজীর জন্মতিথি ছিল। সেই পুণ্যদিনে পূজ্যপাদ মহাপুরুষজী আমাদের মন্ত্রদীক্ষা দিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে আমাদের উৎসর্গ করলেন। দীক্ষার পর পুরনো মন্দিরে প্রণাম ও জপ করে আমরা গুরুদেবের আদেশমত দক্ষিণেশ্বরে গেলাম। ফিরে এলে সেবক মহারাজ আমাদের প্রসাদ পাওয়ার ব্যবস্থা এবং পরে ছবি ইত্যাদি দিয়ে আনুষঙ্গিক কিছু নির্দেশও দিলেন। পরিপূর্ণ হৃদয়ে মহাপুরুষজীর আশীর্বাদ নিয়ে সেদিন ফিরি।

দূর প্রবাসে থাকায় আমাদের বেলুড় মঠে আসা ঘন ঘন সম্ভব হতো না।

একবার—যখন আমরা মহাপুরুষজীকে প্রণাম করতে গেছি, তখন তিনি দক্ষিণপাশের একটি কক্ষে একজন ইংরেজ বা মার্কিন মহিলার সঙ্গে দরকারী কথাবার্তায় ব্যস্ত ছিলেন। আমরা তাঁকে প্রণাম করবার জন্য অপেক্ষা করছি জেনে মহাপুরুষজী দরজার বাইরে এলেন, আমাদের প্রণাম গ্রহণ করে প্রসন্নমুখে কুশল-প্রশ্নাদি জিজ্ঞেস করলেন এবং প্রায় দুমিনিট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলে ভিতরে গেলেন। আমরা নিজেদের ধন্য ও কৃতার্থ বোধ করলাম।

আর একবার আমি চিকিৎসার জন্য কলকাতায় গিয়ে প্রথমে বেলুড় মঠে যাই। কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতির কাছে যাব শুনে মহাপুরুষজী বললেন, 'ভাল চিকিৎসক, সুস্থ হয়ে যাবে' তাঁর আশীর্বাণী সার্থক হয়েছিল।

দীক্ষার বছর দুই পরে আমাদের একটি পুত্রসন্তান হয়; সেটি যখন চৌদ্দ-পনর মাসের, তখন তাকে নিয়ে বেলুড় মঠে যাই। মহাপুরুষজীর দেহ তখন খুবই শীর্ণ, তিনি তাঁর ঘরে খাটের ওপরে পশ্চিমাস্য হয়ে বসে আছেন। সন্তানটিকে তার জননী শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণের নিচে শুইয়ে দিলেন। মহাপুরুষজী বললেন, "আরে পাগল! ও যে ঘুমুচ্ছে।" আমি বললাম, "সময় সময় মনে নানা সংশয় ও প্রশ্ন ওঠে।" মহাপুরুষজী বুকের ওপর হাতজোড় করে দেখিয়ে বললেন—"প্রার্থনা।"

আর একবারের কথা ভোলবার নয়। মীরাট থেকে ছুটিতে দেশ হয়ে পরে কলকাতায় গেছি কিছু জিনিসপত্র কেনবার জন্য। বেলুড় মঠেও গেলাম। কিন্তু পৌঁছুতে বোধ করি বেলা ১০টা হয়ে গেল। শুনলাম মহাপুরুষজীর শরীর খুবই খারাপ। দর্শনাদি সেদিনের মতো হয়ে গেছে। তাঁর ঘরের নিচে একটি বেঞ্চে বসে রইলাম। ওপরে ওঠার দরজায় একজন দাঁড়িয়ে আছেন; মঠের সাধু-ব্রহ্মচারী ছাড়া আর কারুকে ওপরে যেতে দিচ্ছেন না। মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। সেদিন রাত্রের ট্রেনেই পল্লির বাড়িতে ফিরব এবং শীঘ্র মীরাটে রওনা হতে হবে। বিমর্ষভাবে বসে আছি। হঠাৎ সেবক শঙ্কর মহারাজ নেমে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কি খবর?" আমি বললাম, "মহারাজ, মহাপুরুষজীর দর্শনের জন্য তো এসেছিলাম, কিন্তু ওপরে যেতে তো পাচ্ছি না।" তিনি বললেন, "যান, ওপরে যান।" দেখলাম দরজা আর কেউ আগলে নেই। আমি ওপরে গিয়ে প্রণাম করলাম। মহাপুরুষজী কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর গম্ভীরভাবে বললেন, "এই দেহটাকে দেখবার জন্য ব্যস্ত হও কেন? হয়তো আর দেখবে না। কিন্তু তাতে কি? I am in you. I shall always be with you in spirit. Be sure of that.—আমি তোমার মধ্যে আছি। সূক্ষ্মভাবে সদাই তোমার অন্তরে থাকব। নিশ্চয় জানবে।" কি অবিস্মরণীয় অভয়বাণী! গুরুদেবের শ্রীমুখের ঐ শেষ বাণী শুনেছি।

মহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতি

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ২৮ ফেব্রুয়ারি। সেদিন শ্রীঠাকুরের তিথিপূজা। বেলুড় মঠে বহুলোক-সমাগম, তবু এখনকার তুলনায় কম। বাবা শ্রীমন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে মঠে গেছি, দাদা পূর্ণেন্দু ও আমি। মঠবাড়ির সিঁড়ির মুখে এক ব্রহ্মচারী মহারাজ আটকালেন—"এখন দেখা হবে না।" বাবা বললেন, "রাখাল মহারাজকে (স্বামী ব্রহ্মানন্দজী) বলুন, মন্মথ এসেছে। তিনি যদি যেতে বলেন তো যাব, নইলে ফিরে যাব।" ব্রহ্মচারী ফিরে এসে বললেন, "আপনি চলুন, কিন্তু এরা এখানে থাকুক।" বাবা বললেন, "এই দুটি আমার ছেলে। আমি গেলে এরাও যাবে। যদি 'মহারাজ' অনুমতি না দেন, তবে ফিরে যাব।" এই সময় একজন সন্ন্যাসী মহারাজ এসে ব্রহ্মচারীকে বললেন, "উনি যেমন বলছেন, তাই কর। 'মহারাজ'কে জিজ্ঞেস কর।" একটু পরে অনুমতি পেলাম এবং উপরে গঙ্গার ধারের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। রাখাল মহারাজ দক্ষিণাস্য হয়ে চেয়ারে বসে আছেন। গঙ্গা তাঁর বাঁদিকে। পাশে একটি বেঞ্চিতে ঠাকুরের সন্তানেরা কয়েকজন বসে আছেন; সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরা দাঁড়িয়ে আছেন। ভক্তরা স্বামীজীর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে। কারু মুখে কোন কথা নেই। সকলেই চিত্রার্পিতবৎ 'মহারাজকে' দেখছেন। দাদা ও আমি অবাক হয়ে রাখাল মহারাজকে দেখতে লাগলাম। তাঁর একটি পা চটিতে, অন্যটি চটির ওপরে। হাত দুটি ঊরুর ওপর; স্থির হয়ে বসে আছেন। মনে হয় মানুষটি আছেন কিন্তু তাঁর সত্তা সেখানে নেই। চোখ দুটি ঈষৎ খোলা ফ্যালফেলে চাউনি। 'কথামৃতে' পড়েছি ঠাকুরের সমাধি হতো। এই কি সেই অপূর্ব ভাব! তারপর মনে হলো—ইনি তো ঠাকুরের মানসপুত্র! ঠাকুরকে দেখিনি, এঁকে দেখছি, ঠাকুরকেই দেখা হলো। মুখখানি কি মিষ্টি! যেন সাক্ষাৎ গোপাল। এই সময় বাবা রাখাল মহারাজের কাছে দাঁড়ালেন। মহারাজ কিছুটা সহজ অবস্থায় বললেন—"কে? মন্মথ!" বাবা তাঁকে প্রণাম করলেন। কেউ তাঁর পিছনে ফিস ফিস করে বললেন—"পা ছোঁবেন না।" বাবা মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে পায়ের কাছেই বসলেন। মহারাজ মার (আমার গর্ভধারিণীর) কথা কিছু জিজ্ঞেস করলেন এবং বাবা উত্তর দিলেন—"কিছুটা ভাল আছে।" মার ইন্‌স্যানিটির (মাথার গোলমাল) মতো হয়েছিল। দুটি

পুত্র পর পর ছ-মাসের মধ্যে মারা যায়। আমাদের দেখিয়ে বাবা বললেন, "এই দুটি আমার বড় ও মেজ ছেলে।" রাখাল মহারাজ একটুখানি আমাদের দিকে চেয়ে দেখলেন। দাদা পরে বলেছিলেন—তাঁর মনে হলো দৃষ্টির ভিতর দিয়ে ভিতরটা সব যেন দেখেছিলেন। আমি শুধু দেখলাম 'মহারাজের' চোখ দুটি অতি সুন্দর এবং আয়তনয়নে অপার করুণা। তারপরেই তিনি আবার অন্যমনস্ক হলেন। চোখ খোলাই রইল, দৃষ্টি ভিতরে গুটিয়ে গেল এবং উর্ধ্বমুখী হলো। তাঁর এই ভাবান্তর দেখে মুগ্ধ হলাম। মনে হলো এ অবস্থায় একবার প্রণাম করে নিলেই জন্ম সার্থক। যেই না ভাবা অমনি মাথা নিচু করে একেবারে তাঁর পায়ের কাছে গিয়ে পা দুখানি মাথায় ঠেকালাম।

* * *

১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের ৭ মার্চ শুক্রবার। ঠাকুরের তিথিপূজা। 'তরুণ সঙ্ঘের' ছেলেরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উৎসবে খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ ও অন্যান্য কাজ করতে এসেছে। আমিও তাদের একজন। বয়স ষোল-সতেরো, স্কাউট মার্চ করে আমরা কলকাতা থেকে বেলুড়ে এসেছি। ৯-১০টার মধ্যে এক সময় শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ মঠবাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন। একজন সন্ন্যাসী আমায় বললেন, "দূর থেকে এই বেলা দেখে নাও। তারপর কাজ কর।" দেখলাম সুন্দর দীর্ঘাঙ্গ সুপুরুষ। সৌম্যমূর্তি প্রসন্নবদন। কিন্তু কাছে যেতে ভয় হয়। কাছে যাবার চেষ্টাও করিনি। দূর থেকেই প্রণাম করেছি।...

* * *

১৯২৪-১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ। কলকাতায় পড়ি। ছুটি পেলে প্রায় মঠে যাই। কখনও বা রাত্রে স্বামীজীর সমাধি-মন্দিরে থেকেও যেতাম। মহাপুরুষ মহারাজের কাছে অনেকবার গেছি কিন্তু ভয় ও সমীহ ছিল অত্যন্ত বেশি। কথা সামান্য রকম হতো। যেমন—"মা কেমন আছেন? পড়াশুনা ঠিক হচ্ছে তো?" এই ধরনের। তারপরই বলতেন, "ঠাকুরঘরে যাও", নয় "স্বামীজীর সমাধি-মন্দিরে গিয়ে বসো," কিংবা জিজ্ঞেস করতেন, "মায়ের মন্দিরে প্রণাম করেছিলে?" "মহারাজের মন্দিরে প্রণাম করে এস।" বুঝতাম, বলছেন—"এইবার যাও।" মনে ভাবতাম—ইনি তো ঠাকুরের সন্তান! সাক্ষাৎ মহাপুরুষ! কিন্তু আধ্যাত্মিক কথা তো কিছু বলেন না! এই সময়ে জ্ঞান মহারাজ ও খোকা মহারাজের কাছে বেশ থাকতাম।

১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ। কানপুরে বি. এ. পড়ছি। চিঠি এসেছে মাকে কাশী যেতে হবে। মহাপুরুষ মহারাজ দীক্ষা দেবেন। আমি যেতে চাইলাম কিন্তু বাবা বললেন, "তুমি থাক, সুধা (দাদা) যাবে; সঙ্গে বিভূতিবাবু (মামা) যান।" কয়েকদিন পরে

মা দীক্ষা নিয়ে কাশী থেকে ফিরে এলেন। জিজ্ঞেস করলাম—"মহাপুরুষ মহারাজ তোমাকে কি বললেন?" মা বললেন, "কিছুই তো বলেননি। শুধু বললেন, 'এই নাও ফুল।' বলে, আমার দুই অঞ্জলি ভরে দিলেন। তারপর বললেন, 'বল, আজ থেকে আমার ইহকাল পরকাল সব জন্মের সব পাপ ও পুণ্য সব আপনাকে দিলাম।' এভাবে তিনবার অঞ্জলি দিলাম, তিনি হাত পেতে তা নিলেন। পরে মন্ত্র দিলেন। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'বাবা, আমি তো কিছুই জানি না; পারিও না অনেক সময়। আমার কি হবে?' তিনি অভয় দিয়ে বললেন—'কাশী অবিমুক্ত ক্ষেত্র। এখানে সহজে দীক্ষা দিই না। তবে তোমার সব ভার নিলাম। তোমাকে আজ থেকে কিছুই করতে হবে না।' মহাপুরুষ মহারাজই আমার সব ভার নিয়েছেন।"

* * *

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ, জুন মাস। লাহোর ফোর্ট (পুলিশ জেল) থেকে ছাড়া পেয়ে গেলাম বেলুড় মঠে। মনে হয় ৭ জুন হাওড়া পৌঁছাই। ভাবলাম—কি হবে বড়দার বাড়ি এণ্টালি গিয়ে? চলে যাই সোজা বেলুড় মঠে। বাস ধরে মঠের কাছে পৌঁছালাম। সঙ্গে শুধু একটা চটের হ্যাণ্ডব্যাগ; তার মধ্যে কিছু জামা, কাপড় ও সামান্য বিছানা। সেটা বয়ে নিয়ে গেলাম গেট পর্যন্ত। দেখি ডাব বিক্রি করছে। দুটি কিনে নিলাম—ঠাকুরকে দিতে হবে। ভিতরে গিয়ে পরিচিত স্বামীজীদের সঙ্গে দেখা হলো। স্বামী শর্বানন্দ এসে বললেন, "শৈ—এসেছে। নিচে ব্রহ্মচারীদের ঘরে থাকবে।" একটু পরে ডাকলেন চা খেতে। বললাম, "মহাপুরুষজীর সঙ্গে দেখা করব বলে এসেছি। তাঁকে প্রণাম না করে কিছু খাব না।" তাঁরা শুনলেন না, বললেন, "এখন তো দর্শন হবে না। কখন হবে তাও কেউ জানে না। এসেছ মঠে—অভুক্ত থাকা চলবে না। দর্শন পরে হবেই।" অগত্যা চা খেলাম। রাত্রে আহারাদির পর শুতে গেলাম। বিছানা, মশারি সব মঠের। সেদিন সন্ধ্যায় মঠের সন্ন্যাসীরা মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করতে গিয়েছিলেন। তাঁরা আশ্বাস দিলেন, "সকালে সাধুদের সঙ্গে যেও।" সকালে স্নান সেরে প্রণাম করব বলে প্রস্তুত হয়েছি; কিন্তু 'আজও দর্শন হবে না', শুনে মনঃক্ষুণ্ণ হলাম। মঠের নিচে গঙ্গার সামনের দালানে দাঁড়িয়ে আছি। বেলা আন্দাজ ৯টা। সেখানে অনঙ্গ মহারাজ প্রভৃতি অনেকে আছেন। স্বামী শর্বানন্দ আমার ঘাড় ধরে বলতে লাগলেন, "একে জানো? লাহোর জেল থেকে এসেছে, ভকত সিং-এর দলের।" অনেকেই বললেন, "হাঁ! ওকে তো চিনি। তবে রাজনীতি করে তা জানতাম না।" এই সময় মহাপুরুষ মহারাজের নিচে আসবার কথা নয়। কিন্তু হঠাৎ এসে বারান্দায় দাঁড়ালেন। একবার গম্ভীর

স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "ওখানে ও কে!" শর্বানন্দজী আমাকে একটু এগিয়ে দিয়ে বললেন, "একে চেনেন? এ লাহোর থেকে—।" তাঁর কথা অসমাপ্ত রইল। মহাপুরুষজী তখনই বললেন—"ওকে আমি খুব জানি। তোমাদের আর পরিচয় করাতে হবে না।" মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে খুব জোর বকুনি দিলেন। বললেন— "ছেড়ে দাও ওসব চ্যাংড়ামি! ও তোমার জন্য নয়। তোমার জীবনে অন্য কাজ আছে। পলিটিক্স করার কত লোক আছে। তুমি কি পলিটিক্স করবে ভেবেছ? মানুষ-জন্ম পেয়েছ কিসের জন্য?" আস্তে আস্তে বললাম, "ভগবানলাভই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য। কিন্তু শুনেছি দেশ স্বাধীন না হলে ওটাও স্বার্থপরতা।" গলা আমার বুজে এসেছিল, এবার চোখেও জল এসে গেল।" কিন্তু তিনি একটুও নরম হলেন না। বললেন, "তুমি কি ভেবেছ তোমার মতো চ্যাংড়ারা দেশ স্বাধীন করবে? বল—আজ থেকে ওসব ছেড়ে দিলে।" অতি ধীরে বললাম, "যদি কোনও রকমে জানতে পারি দেশ স্বাধীন হবে, তা হলে আজ থেকে সব ছেড়ে দেব।" তখন মহাপুরুষজী বললেন, "আমার কথা তোমার বিশ্বাস হয়?" বললাম, "হ্যাঁ।" তিনি বললেন, "তবে আমি বলছি, দেশ স্বাধীন হবে। কবে তা জানি না। আমি দেখে যাব না। তোমরা দেখবে। তবে তোমরা চ্যাংড়ারা সে স্বাধীনতা আনবে না। তোমার যদি তাই ইচ্ছা থাকে তো গান্ধীর দলে যোগ দাও। ওদের দলে নাম লেখাও গে যাও। ওরাই দেশের ঠিক ঠিক কাজ করছে।" আমি বললাম—"না। আমি কারু দলেই থাকব না।"

মহাপুরুষজী যেমন হঠাৎ নিচে এসেছিলেন, তেমনি হঠাৎ আবার চলে গেলেন। সেদিন তাঁর কাছে যে রকম বকুনি খেলাম তা জীবনে কখনও খাইনি। কিন্তু আশ্চর্য! আমার প্রাণের ভিতরটা কেমন ঠাণ্ডা হয়ে গেল! রাগ ও বকার ফলে এ রকম মনটি হালকাও কোনদিন হয়নি। আমার মাথা থেকে যেন একটা ভূত নেমে গেল!...

সেবার মঠে কিছুদিন ছিলাম। সকালে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরা প্রণাম করার পর আমিও প্রণাম করতাম। কিন্তু মহাপুরুষ মহারাজ আর একটি কথাও বলেননি। মনটা দমে গেল। ভাবলাম—উনি বোধ হয় আমার ওপর চটে আছেন। তারপর কয়েকদিন আবার দর্শনও হতো না। প্রায়ই তিনি ভাবস্থ হয়ে থাকেন, তাই কাছে যাওয়া বারণ। মাঝে একদিন বেশ প্রসন্ন ও স্বাভাবিক ভাবে কথা বলছিলেন। পশুপতি মহারাজকে বললেন, "তুমি আমার দাড়িটা কামিয়ে দাও তো।" স্বামী বিজয়ানন্দ সব সরঞ্জাম নিয়ে বসলেন। বেশ কিছুক্ষণে ক্ষৌরকার্য সমাধা হলো। মহাপুরুষজীকে হাসতে দেখে আমার ধড়ে প্রাণ এলো। পশুপতি মহারাজও খুব খুশি, পরে বলছিলেন, "আমি কাছে থাকলে উনি আর কারু কাছে খেউরি হন না।"

এরপর সকাল ও সন্ধ্যা দুবার প্রণাম করার অনুমতি পেলাম। কিন্তু আবার একদিন তা বন্ধ হলো। মন বিষণ্ণ, কিছু ভাল লাগে না। জ্ঞান মহারাজ ইঙ্গিত দিলেন— "সিঁড়িতে বসে থাকগে যাও। উনি বারান্দায় চলে যাবেন, দূর থেকে প্রণাম করে নেমে এস। তাই গেলাম, সিঁড়িতে বসে আছি। সেবকরা বিরক্ত হচ্ছেন। নিচে নেমে এলাম। জ্ঞান মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন, "দ্যাখা হয়েছে?" "না"। "তবে নেমে এলে যে?" "ওঁরা বকছেন।" "একটু বকুনি খেতে পার না, অমনি মান করে চলে আসা হয়েছে? তবে আর কি হবে! বকুনি দিয়েছে—ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে তো দেয়নি? তা হলে তো তারা অনুমতিই দিয়েছে! ওরা নিয়মের বিরুদ্ধে বলবে নাকি তুমি সিঁড়ির ওপর বসে থাক।" আবার গিয়ে বসে রইলাম। এই সময় একজন সেবক এসে বললেন, "বারে বারে বলছি চলে যান। তবু বসে আছেন?" তাঁকে মিনতি করে বললাম, "এইখানে বসে আছি। এখান থেকে প্রণাম করব। তাঁর কাছে যাব না—পা ছোঁব না।" তখন সেবক আর কিছু বললেন না। হঠাৎ দরজা খুলে মহাপুরুষ মহারাজ দরজা ধরে দাঁড়ালেন। পা যেন ঈষৎ টলে পড়ছে। একবার বললেন, "কে?" আমি মাটিতেই প্রণাম করে বললাম—"শৈ—।" সামনে দিয়ে যেতে যেতে মনে হলো যেন ইশারা করলেন—আয়। আর কোন দ্বিধা নেই। সারা শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল। উঠে পিছনে পিছনে চললাম। গঙ্গার ধারে ইজিচেয়ারে মহাপুরুষজী বসলেন এবং অস্ফুটস্বরে আপন মনে কথা বলতে লাগলেন, তাঁর কথা একটু অস্ফুট ও জড়ানো মনে হচ্ছিল—"ঠাকুর কৃপা করে জানিয়েছেন, তাই জেনেছি। তিনিই সব—সবই তিনি।" তিনি খুবই আনন্দে ভরপুর ছিলেন। বসতে বললেন ইঙ্গিতে। কাছেই কিছু দূরত্ব রেখে বসলাম। তিনি আপন মনে বলছিলেন, "এই যে গাছপালা, আকাশ, গঙ্গা, ঘর-বাড়ি যা কিছু আছে সবই তিনি। এই ঠাকুর ছাড়া আর কিছু নেই। আমরা তাঁকে জেনেছি। তিনি না জানালে তাঁকে কেউ জানতে পারে না। আমাকে কৃপা করেছেন তাই জেনেছি।" ক্রমে সন্ধ্যা হলো। বেদান্তের অনুভূতি একে একে বলে গেলেন। নিস্পন্দ হয়ে শুনতে লাগলাম। স্থাণুর মতন বসে রইলাম। অস্পষ্ট বাণী কানে যাচ্ছে, অর্থ কখনো বুঝছি, কখনো বুঝছি না। "কীট পতঙ্গ জড় অণু পরমাণু সবই চৈতন্য। তারই নাম ঠাকুর। তিনি সব জুড়ে আছেন। তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। তিনি দয়া করে এসেছিলেন জগতের উদ্ধার করতে। কৃপা, কৃপা, কৃপা।"

হঠাৎ দেখি বাঁদিকে বাবা এসে মহাপুরুষজীকে প্রণাম করে বসলেন একটু দূরে। মহাপুরুষ মহারাজ বলে যাচ্ছেন অস্ফুটস্বরে, "এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ছাড়া আর তো কিছু নেই! তাঁকেই আমরা বলি ঠাকুর। তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণরূপে এসেছিলেন।

তিনি না জানালে কেউ তাঁকে জানতে পারে না। তিনি কৃপা করেছেন—জানিয়েছেন—তাই। তিনি ছাড়া আমাদের আলাদা সত্তা কিছু নেই। তিনিই আছেন এই শরীরের মধ্যে এবং বাইরে—একমাত্র তিনিই—তিনি।”

এই সময়ে বাবা উঠে মহাপুরুষজীর কাছে গিয়ে দুটি হাত জোড় করে সাশ্রুনয়নে বললেন, “আপনি কৃপা করুন, কৃপা করুন।” আমার বাবা ভাবপ্রবণ লোক নন। তাঁকে এ রকম অভিভূত হতে সেই একবারই দেখেছি। মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, “মন্মথ, বসো! বসো! তোমাকে তো স্বামীজীই কৃপা করেছেন।”

বাবা—আজ্ঞে হ্যাঁ! এইটি আমার মেজ ছেলে। আপনি একে সেইভাবে কৃপা করুন।

মহাপুরুষজী—তোমার স্ত্রী কেমন আছে?

বাবা—এখন সম্পূর্ণ ভাল আছে।

মহাপুরুষজী—ও তো আমার কাছে আসে যায়। ওর জন্য তোমার কোন ভাবনা নেই।

বাবা—স্বামীজী আমাকে যেমন ভাবে দীক্ষা দিয়েছেন, সেইভাবে ওকে আপনি দীক্ষা দিন। এই আমার একান্ত অনুরোধ। ওকে আপনি কৃপা করুন।

মহাপুরুষজী—ও! তুমি বলছ মন্তোর দেওয়া! তা ডাকো ওকে আমার কাছে।

বাবা—আজ্ঞে! আজ তো প্রস্তুত হয়ে আসেনি।

মহাপুরুষজী—হ্যাঁ। ওর জন্যে কোন প্রস্তুতির দরকার নেই।

বাবা—আমার ইচ্ছা আনুষ্ঠানিকভাবেই দীক্ষা হয়।

মহাপুরুষজী—তবে পরশু রবিবার আছে; আরো একটি ছেলের দীক্ষা হবে। ঐ সঙ্গে ওরও হবে।

এসব কথাবার্তার পর বাবা ও আমি মহাপুরুষজীকে প্রণাম করে নিচে নেমে এলাম।

নির্দিষ্ট দিনে সকালে গঙ্গাস্নান করে নূতন বস্ত্র পরে একটি চাদর গায়ে দিয়ে অপেক্ষা করছি, এমন সময় একজন ব্রহ্মচারী এসে বললেন, 'আপনাকে ডাকছেন।' ধীরে পা টিপে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজজীর ঘরে এলাম। তিনি খাটে শুয়েছিলেন, হাত দুটি বুকের উপর। ইশারায় বসতে বললেন, আসন পাতা ছিল। বসলাম। খানিকক্ষণ চুপ করে শুয়ে রইলেন, তারপর আস্তে আস্তে উঠে সামনের চেয়ারে বসলেন। বললেন, “মন দিয়ে আমার কথাগুলি শোনো। এই যে ফুল-

পাতা, ঘর-দোর—এ বিশ্বচরাচর সব ঠাকুর। তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। বুঝতে পারছ? আমি যা বলছি তা ধারণা হচ্ছে?"

আমি—প্রাণপণে বোঝবার চেষ্টা করছি, কিন্তু পারছি না।

মহাপুরুষজী—আমি যা বলছি তা বিশ্বাস হচ্ছে?

আমি—আজ্ঞে হ্যাঁ।

মহাপুরুষজী—তা হলেই হবে। আর কিছু করতে হবে না।

আমি—আপনি আমায় দীক্ষা দেবেন, সে তো আমার পরম সৌভাগ্য। ধ্যানকালে সর্বদা ঠাকুরকে তো দেখতে পাই না। নানা দেবদেবীর মূর্তি ভেসে ওঠে।

মহাপুরুষজী—আসুক, সে তো ভালই। শুধু জেনে রাখো, ঠাকুরই সব দেবদেবী। সব দেবদেবীর তাঁতেই লয়। ঠাকুরের পর আর কিছু নেই। ঠিক ধারণা হয়েছে?

মাথা নেড়ে সায় দিলাম। তারপর দীক্ষা হলো। বসে জপ করতে বললেন। পরে বলেছিলেন, "আমি তোমায় দীক্ষা দিইনি। ঠাকুর তোমায় দীক্ষা দিলেন। তুমি ঠাকুরঘরে যাও আর তাঁর কাছে নিজেকে সমর্পণ কর।" এই সময় আমার মনে হলো তিনিই ঠাকুর। তিনি কাছে এসে দাঁড়ালেন। আমিও উঠে দাঁড়ালাম। ভাবলাম—দীক্ষা হলো, কিন্তু একটি ফুলও তো ওঁর পায়ে দিলাম না। একটি ছোট পাত্রে কিছু ফুল রাখা ছিল। দুই হাতে নিয়ে তাঁর পায়ে দিলাম। নিচু হয়ে প্রণাম করলাম। তাঁর পায়ে মাথাটি ঠুকে গেল। ভাবলাম—কি নরম পা দুখানি, নিশ্চয় ব্যথা লাগল! অতিকষ্টে অশ্রুসংবরণ করে উঠে দাঁড়ালাম। তিনি বললেন, "যাও! অন্য ছেলেটিকে পাঠিয়ে দাও। বাইরে দরজার কাছে কানপুর আশ্রমের নেপাল মহারাজ (নেপাল মহারাজকে আমরা মাস্টারমশাই বলতাম) এবং বাবা দাঁড়িয়েছিলেন। মাস্টারমশাই বললেন, "বাঃ! খুব সুন্দর হয়েছে। তোমার দীক্ষা খুব ভাল হয়েছে।" কিছু বুঝলাম না। শুধু এইটুকু মনে হলো শরীর ও মন খুব হালকা এবং ভিতরে একটা আনন্দ ভরপুর হয়ে ঠেলে বাইরে আসছিল!

* * *

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে একবার বেলুড় মঠে গিয়ে কয়েকদিন ছিলাম। তখন বিপিনদার দলে কাজ করি। একদিন মহাপুরুষ মহারাজকে সকালে গিয়ে বললাম—"অনুমতি দিন বাড়ি যাই।"

মহাপুরুষজী—কোথায় আর যাবে? থেকেই যাও। কোথায় তোমার বাড়ি?

আমি—জ্যেঠামশাইয়ের বাড়িতে কলকাতায় থাকি।

মহাপুরুষজী—তা তোমার সেখানে কি কাজ?

আমি—গোঁদলপাড়ায় একটি বোনের টাইফয়েড হয়েছে, যাওয়া উচিত।

মহাপুরুষজী—কেমন বোন?

আমি—মাসতুতো বোন।

মহাপুরুষজী—নিজেরও নয়। কাজিন, তা তোমার অত মাথাব্যথা কেন? আমি চুপ করে রইলাম। আসল কারণটা তো বলতে পারছি না।

মহাপুরুষজী—কে কার বোন? আর কে কার ভাই? সব মায়া।

আমি—তবে ডিউটি কেন বলে?

মহাপুরুষজী—ডিউটি ভাবলে করতে হবে। তবে ডিউটিও মায়া। তা যেতে চাচ্ছ, যাও। তবে ভুগবে।

তা মহাপুরুষজীর কথা কি মিথ্যা হয়! জীবনে অনেক ভোগ ছিল তা ভুগেছি।...

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে আমি যখন লাহোর ফোর্টে তখন মা ও বাবা পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজকে পত্র দেন—যেন আমি মুক্তিলাভ করি। তিনি উত্তরে লিখেছিলেন, "যদি সে খুন বা ডাকাতি না করে থাকে তাহলে নিশ্চয় মুক্তি পাবে।" অভাবনীয়রূপে একমাসের মধ্যেই আমি ছাড়া পেয়েছিলাম। একথা কিন্তু আমি বহু কাল জানতাম না।

* * *

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ আগস্ট। মাস্টারমশাইকে (নেপাল মহারাজ) বললাম, "স্বপ্ন দেখলাম মহাপুরুষ মহারাজ বলছেন—এই মালা নে।" তিনি বললেন, "কাশী থেকে রুদ্রাক্ষের মালা নিয়ে মহাপুরুষজীর কাছে যাও। তাঁকে স্বপ্নের কথা বলো।" তাই নিয়ে গেলাম মঠে। মহাপুরুষ মহারাজ শুনে বললেন—"Dream is but a dream (স্বপ্ন তো স্বপ্ন বই আর কিছু নয়)। এই জীবনটাই একটা dream (স্বপ্ন), তার আবার স্বপ্ন।"

আমি—শুনেছি, গুরু ও ইষ্টের স্বপ্ন সত্যি হয়।

মহাপুরুষজী—হ্যাঁ। তাও বলে বটে। তবে স্বপ্ন স্বপ্নই!

আমি—মালা কি নেব?

মহাপুরুষজী—মালা জপে শালা, কর জপে ভাই।
মন মন জপে তো বলিহারি যাই ॥

আমি—তা হলে মালা থাক।

মহাপুরুষ—মালা এনেছ?

আমি—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

মহাপুরুষ—তা দ্যাখো, যখন মালা জপ করতে ইচ্ছে হয়েছে তো জপ কর। মালা নিয়ে এস।

আমি পকেট থেকে মালাটি বার করে দিতে গেলাম। তিনি বললেন, "গঙ্গায় ধুয়ে আনো। মাথায়ও গঙ্গাবারি ছিটে দিও। গঙ্গাজলে সব শুদ্ধ হয়।" দৌড়ে গেলাম। হাঁটুজলে গিয়ে মাথায় জলের ছিটা দিলাম—মালা গঙ্গায় ডুবিয়ে নিয়ে এলাম। ফিরে আসতেই বললেন—"পায়ে না, হাতে দাও।" তারপর মালাটি মাথায় রেখে ধ্যান করলেন, একটু জপও করলেন। বললেন, "মাথায় ঠাকুর আছেন। তাঁকেই দিলাম। এই নাও তাঁর প্রসাদী মালা।"

আমি—কতক্ষণ জপ করব?

মহাপুরুষ—যতক্ষণ পার। একঘণ্টা, দুঘণ্টা। দিবারাত্র।

আমি—কমপক্ষে কতবার বলুন।

মহাপুরুষ—৮।১০ বার করলেও হয়। তবে তুমি সময়ের কথা কি বলছ? জপ তোমাকে করতে হবে সদা সর্বদা, দিনে ও রাত্রে।

আমি—মহারাজ! এ আমি পারব না।

মহাপুরুষ—তোমায় কিছু করতে হবে না। জপ তোমাকে করাবে। তুমি যাবে কোথা? সময়ে সব হবে। কিছু ভেবো না।

* * *

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ। একবার মহাপুরুষ মহারাজকে জিজ্ঞেস করলাম (তখন কতকটা ভয় ভেঙেছে), "আমার মার তো ক্রনিক ইন্‌স্যানিটি (দীর্ঘকালস্থায়ী মাথার দোষ)। তিনি বলেন—'আমি তো ঠিক ঠিক পূজা জপ কিছুই জানি না। করতেও পারি না। মহাপুরুষ মহারাজকে জিজ্ঞেস করিস তো আমার কি হবে'?"

মহাপুরুষ—তোমার মা-র কিছুই করতে হবে না। তাঁর ভার তো আমি নিয়েছি।

আমি—অজ্ঞান অবস্থায় যদি মৃত্যু হয়, তা হলেও কি মুক্তি হবে?

মহাপুরুষ—হ্যাঁ। ভেতরে ভেতরে কাজ হয়। বাইরে কিছুই বুঝতে পারবে না। শরীরটা গেলে আত্মা স্ব-স্থানে চলে যায়।

আমি—আমাকে কি করতে হবে বলে দিন।

মহাপুরুষ—কি আর করবে? এখানে থাকা—তা এখন আর হবে না। মা তো আছেন। পড়াশুনা কর। বাড়িতেই থাকবে। ঠাকুরকে ধরে থাকবে। সবই তিনি, সময়ে এই বোধ হবে।...

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে কয়েকবার মঠে যাই এবং মহাপুরুষ মহারাজকে দর্শন করি। কানপুরের নেপাল মহারাজ একটি চিঠি দিয়ে এক ভদ্রলোককে পাঠিয়েছিলেন। তিনি দীক্ষা নেবেন। তাঁকে নিয়ে মঠে গেলাম। মহাপুরুষ মহারাজকে বললাম—"ইনি দীক্ষা নিতে চান।" তিনি ধমক দিলেন, "ও দীক্ষা নেবে তো তোমাকে সালিশি কে করতে বলেছে?"

আমি—নেপাল মহারাজ (স্বামী চিদানন্দ) লিখেছেন—তুমি গিয়ে বলো।

মহাপুরুষ—না, ওর এখনো সময় হয়নি।

আমি—মহারাজ! আমার তো কোন গুণ নেই, আমাকে যখন কৃপা করেছেন তখন ও লোকটি কি দোষ করেছে?

মহাপুরুষ—তুমি এসব কি জানো? তোমার হয়েছে বলে ওরও হবে? এ কেমন কথা? দীক্ষা কার হবে, আর কার হবে না—তা আমরা বুঝব।

তারপর সেই ভদ্রলোককে বললেন, "তোমার গুণে তো দীক্ষা হবে না। তবে তোমার আত্মীয় কেউ এখানে সন্ন্যাসী হয়েছে কি?"

ভদ্রলোক বললেন, "হ্যাঁ, —মহারাজ দেওঘরে আছেন, সম্পর্কে ভাই হন। —সন্ন্যাস নিয়েছেন, তিনি সম্পর্কে কাকা।"

মহাপুরুষ—যখন দুজন তোমাদের পরিবারের এখানে সাধু হয়েছে, তখন তোমাকে দীক্ষা দেওয়া হবে। তবে এখন নয়। পরে একমাসের মধ্যে সেই ভদ্রলোকের দীক্ষা হয়েছিল।

* * *

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে এক পুলিশ কর্মচারী, যিনি এক সময়ে আমার পেছনে বিশেষ রকম লেগেছিলেন, এসে বললেন—"আমি তো মহাপুরুষ মহারাজের কাছে দীক্ষা পেয়েছি। এখন তো আপনি আমাকে আর ঘৃণা করেন না?"

আমি—না। আপনি আমার গুরু-ভাই।

এর অল্পকাল পরে তিনি পুলিশের চাকরি ছেড়ে দিয়ে দেশে চলে যান এবং কিছুদিন পরে তাঁর মৃত্যু হয়।

কানপুরের কয়েকজন ভদ্রলোক এই কালে মহাপুরুষ মহারাজের কাছে দীক্ষিত হন। আমার সেজদা শ্রীতিনকড়ি গাঙ্গুলী এই সময়ে সম্ভবত মহাপুরুষজীর কাছে দীক্ষা নেন। আমি সেজদাকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি তো ধর্ম মানেন না। রাজনীতিকেই ধর্ম বলে শিখিয়েছিলেন; তা আপনি কেন দীক্ষা নিলেন?" সেজদা বিপিনদার (বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর) দক্ষিণহস্ত ছিলেন—'তরুণ সঙ্ঘ' আন্দোলনের সঞ্চালক। তিনি ধরা দিতে চাইলেন না, বললেন—"দীক্ষা নিয়ে রাখলাম, কি জানি ওতেও কিছু যদি থাকে তো পরে হবে।" তিনি ভিতরে ভিতরে ঠাকুরের খুব ভক্ত, কিছুদিন পরে মহাপুরুষ মহারাজকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আমি বিবাহ করব কি?" মহাপুরুষজী পরিষ্কার বলে দিলেন—"না। কখনও না।"

এর কিছুপরেই মেজদা দীর্ঘ মেয়াদের জন্য অন্তরীণ থাকেন। সত্তরের উপর বয়স হয়েছে, দার-পরিগ্রহ করেননি।...

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ ডিসেম্বর। আগ্রায় এম. এ. পড়ছি। এক বন্ধুর বিবাহে এসেছি কলকাতায়। মঠে গেলাম। ২৬ তারিখ। মহাপুরুষজীর দর্শন হলো না। সারাদিন অপেক্ষা করলাম। সন্ধ্যাবেলা সিঁড়ির কাছে বসে আছি, এমন সময় কানাই হাজরা এসে পাশে বসল। মহাপুরুষ মহারাজ দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। মাটিতে প্রণাম করছি, কানাইদা আমাকে বললেন, "তোমাকে ডাকছেন।" করিডোর (বারান্দা) ধরে কয়েক পা এগিয়ে গেছেন মহাপুরুষজী এবং আস্তে আস্তে বলছেন, "মা! মা!" কাছে যেতেই ফিরে দাঁড়ালেন, গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "কি চাও?" বললাম—"কিছু চাই না।" তারপর ভাবলাম ভগবানের কাছে বর চাইতে হয়—কিছু চাই না বললে শূন্য পাব। তাই বললাম, "আশীর্বাদ করুন।" করুণাময় মহারাজ বললেন, "ও! আশীর্বাদ? এই লও।" আমি বুকের কাছে হাত দুটি জোড় করে দাঁড়িয়েছিলাম। সেই উন্মুক্ত হাত দুটিতে তাঁর হাতটি দিয়ে বললেন, "এই লও।" সেই অমৃতস্পর্শে যেন হৃদয়কোরক প্রস্ফুটিত হলো। তারপর আমার মাথাটি টলে গেল। মুহূর্তের জন্য সম্বিৎ হারালাম। তারপর মহাপুরুষজী ধীরে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। কি কোমল স্পর্শ! লজ্জিত হয়ে সরে এলাম। তাঁর এই অহেতুক কৃপায় হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। শুনলাম তিনি বলছেন "দ্যাখ, যা চাইবি তাই পাবি। কিন্তু দেখিস যেন মন্দ কিছু চাস না, তাহলে তাও পাবি। চাইবি ভাল জিনিস—জ্ঞান ভক্তি পবিত্রতা এই সব।"

এই সময়ে কানাইদা এসে মহাপুরুষ মহারাজকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বলতে লাগল, "আমাকেও আপনি আশীর্বাদ করুন।" মহাপুরুষজীর ততক্ষণে ভাবান্তর হয়েছে, তিনি বললেন, "তুমি কে?" আমি বললাম, "ও তরুণসঙ্ঘের এক বন্ধু।"

মহাপুরুষ—তা এখানে কি? তোমার এখন হবে কেন?

কানাইদা কাঁদতে কাঁদতে বলল—"মায়ের আশীর্বাদ কি পাব?"

মহাপুরুষ—হ্যাঁ! মা-ই তো সব! সব—মা।" (চলতে চলতে বারান্দার দিকে মুখ করে) মা! মা! মা! এদের কৃপা করো। সব—মা! এই তো! এই তো! সবই তিনি।

* * *

১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে মহাপুরুষ মহারাজ খুব অসুস্থ। পক্ষাঘাতের আক্রমণ হয়েছে। অতি কষ্টে দর্শনলাভ হলো দূর থেকে। মন বিষণ্ণ ও ভারাক্রান্ত। স্বামী সদাশিবানন্দ (ভক্তরাজ)-এর সঙ্গে দেখা হলো। শ্রীমকে দর্শন করতে তিনি আমাকে বললেন। মহাপুরুষ মহারাজ সম্পর্কে শ্রীম আমাকে প্রবোধ দিয়ে বললেন—"মহাপুরুষজী শয্যাশায়ী—ও তো বাইরের। অন্তরে তাঁর কখনো সবিকল্প, কখনো নির্বিকল্প ভূমি—সতত সমাধিমগ্ন মহাপুরুষ। তিনি তো ঠাকুরেরই স্বরূপ।"

সেদিন মঠেই ছিলাম সারাদিন। দুপুরের পরে মঠের পিছনের বাড়িতে গেছি একা একা। স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ বেদান্তের ক্লাশ নিচ্ছেন। তখন উপনিষদের একটি শ্লোকের ব্যাখ্যা করছেন—'সৃষ্টি-রহস্য। ব্রহ্ম ত্রিধা বিভক্ত হয়ে জীব জগৎ ঈশ্বর হয়েছেন। জীবের মধ্যে তিনিই অনুপ্রবেশ করেছেন' ইত্যাদি। এবার আমাকে দেখে হাঁক দিলেন, "ওখানে কে? এখানে বেদান্তের ক্লাশ হচ্ছে, সন্ন্যাসী ছাড়া কারো শোনার অধিকার নেই।"...আবার সেইদিনই রাত্রে স্বামী অখণ্ডানন্দজী গঙ্গার সামনে বারান্দার কাছে চেয়ারে বসে খুব মহাপুরুষ মহারাজের কথা বলছেন—"দাদা (মহাপুরুষ মহারাজ)-কে বললাম, 'শুনতে পাচ্ছেন?' উনি বলছেন, 'হ্যাঁ' চোখের ইশারায়। ও আমিই বুঝতে পারি। সকলে পারে না। বললাম—'এরা সব মনমরা হয়ে রয়েছে। আপনি যে মজা মারছেন তা কে বলবে এদের? আনন্দে আছেন তো?' উনি চোখের ইশারায় 'হ্যাঁ' বললেন।" তারপর হঠাৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী গম্ভীর হয়ে বলতে লাগলেন, "মহাপুরুষ মহারাজ বাইরে দেখতে অজ্ঞানের মতো শুয়ে আছেন। সমাধিতে আছেন সর্বদা। সবিকল্প নির্বিকল্প তাঁর মধ্যে। যে যা চাও, চেয়ে নাও।"...

* * *

১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে আবার বেলুড় মঠে গেলাম। তখন মহাপুরুষ মহারাজ মহাপ্রয়াণ করেছেন। সেই মঠ, সেই সব; কিন্তু মনে হলো আমি অনাথ হয়েছি, আর আমার কেউ নেই। মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে গেলাম। সেখানে তাঁর খাট,

চেয়ার যেমনটি তেমন সাজানো আছে। শুধু নেই সেই মানুষটি যিনি থাকায় সমস্ত বেলুড় মঠ প্রাণের স্পর্শে জীবন্ত ছিল। সেই চেয়ারটি তেমনি আছে—ঐ চেয়ারে বসে তিনি দীক্ষার উপদেশ দিয়েছিলেন, ঠিক সেইভাবে রয়েছে। সেখানে বসে অনেকক্ষণ চোখের জলে তাঁকেই ভাবলাম। মনটা শান্ত হলো। মনে হলো সমস্ত ঘর জুড়ে তিনি আছেন—আরো বিরাট হয়ে বিরাজমান। সেই ঘরে আমি ও আমার এক বন্ধু (হলধর সেন) বসেছিলাম। অনেকক্ষণ পর চোখে পড়ল খাটের কাছে আরো এক ভদ্রমহিলা আলুলায়িত কেশে ভূমিতে প্রণতা। অঝোরে তিনি কাঁদছেন নিঃশব্দে। তাঁর দুঃখ দেখে মনে হলো আমরা কিছুই ভালবাসতে পারিনি। শ্রীগুরুমহারাজকে এমন প্রাণভরে যিনি ভালবেসেছেন তিনিই ধন্য। এর পর উঠে চলে এলাম।

কয়েক বছর আর মঠে যাইনি। কালে সে স্মৃতি তো ম্লান হয়েছে। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ভক্তরাজ মহারাজের কথায় ঐ স্মৃতি ডাইরিতে লিপিবদ্ধ করি। তারপর থেকে প্রত্যেকটি ঘটনা যেন মনের মণিকোঠায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। বিপদে সম্পদে সব সময়ে যে মহাপুরুষজীর আশীর্বাদ রয়েছে, এইটুকু বিশ্বাস আছে। কত সন্ন্যাসী ও ভক্তজন তাঁর কৃপাধন্য হয়েছেন! আমি সামান্য জীব তাঁদের একপাশে স্থান পেয়েছি, এটিই আমার জীবনের পরম সান্ত্বনা।

ওঁ শ্রীগুরুবে নমঃ

কৃপাসিন্ধু মহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতিকণা

শ্রীপূর্ণেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের অশেষ কৃপায় তাঁর পদপ্রান্তে স্থান পাবার সৌভাগ্য হয়েছিল, কিন্তু কখনও ভাবিনি যে তাঁর 'স্মৃতিকথা' লিখতে হবে। সংকলকের অনুরোধে যতদূর মনে করতে পারি লিখতে চেষ্টা করছি।

আমার পিতা ৺মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের কৃপা পেয়েছিলেন। বাড়িতে খুব বাল্যকাল থেকেই ঠাকুর-স্বামীজীর নাম শুনে আসছি। বাবা তখন এলাহাবাদে থাকতেন। সম্ভবত ১৯১০।১১ খ্রিস্টাব্দে যখন আমার বয়স প্রায় ৫।৬ বৎসর, বাবা আমাদের (অর্থাৎ মা, আমি ও আমার

২।৩ বৎসর বয়স্ক ছোট ভাই) নিয়ে এলাহাবাদের মুঠিগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে যান, মনে হয় ঠাকুর বা স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষে। এভাবে সর্বপ্রথম ঠাকুরের পার্ষদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের দর্শন পাই। বিজ্ঞান মহারাজ আমাদের দুই ভায়ের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন, কিন্তু মুখ উঁচু করে রইলেন। পরে মার কাছে জেনেছিলাম যে, বিজ্ঞান মহারাজ স্ত্রীলোকের মুখ দেখবেন না বলে ঐরকম মুখ উঁচু করে ছিলেন। পরে ছাদে বসে খিচুড়িপ্রসাদ খাওয়া মনে আছে। এর পরও মধ্যে মধ্যে এলাহাবাদ মঠে গিয়েছি। প্রত্যেকবার বিজ্ঞান মহারাজ মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতেন এবং আমরা খিচুড়িপ্রসাদ পেতাম। তাঁকে খুব গম্ভীর প্রকৃতির মনে হতো, কিন্তু আমাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দেবার সময় বেশ প্রসন্নভাব দেখা যেত। বিজ্ঞান মহারাজ কখনো কখনো আমাদের বাড়িতেও আসতেন।

এই সময় এলাহাবাদে আমাদের বাসায় আমার এক পিসতুতো ভাই এসে কয়েক মাস বাস করেন। ইনি তখন শ্রীশ্রীমার কাছে দীক্ষা পেয়েছেন, পরে সন্ন্যাসী হন। তিনি এলাহাবাদ মঠে বিজ্ঞান মহারাজের সেবার জন্য কিছুদিন ছিলেন। অসুস্থ হয়ে আমাদের বাড়িতেও মাস দুই ছিলেন। সে সময় সর্বদা বাড়িতে ঠাকুর-স্বামীজীর কথা হতো। কিছু না বুঝলেও ঠাকুর যে ভগবান এইরূপ জ্ঞান হতে লাগল। আমার সে সময় কি যেন অসুখ করেছিল। সেই সন্ন্যাসী তখন আমার মাথার কাছে 'কথামৃত' একখণ্ড রেখে দিয়েছিলেন। তাতেই আমার অসুখ সেরে যায়।

এরপর বাবা কানপুরে বদলি হন সম্ভবত ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে। বিজ্ঞান মহারাজের দর্শন আমি এরপর কানপুরে পাই ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে। বাবার কাছে শুনেছি এলাহাবাদের ব্রহ্মবাদিন ক্লাবের সময় থেকেই বিজ্ঞান মহারাজের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। কৃপা করে তিনি আমাদের বাড়িতে সারাদিন ছিলেন। শীত তখন খুবই কম, কিন্তু মহারাজের গায়ে বেশ প্রচুর গরম কাপড়, তার উপর কানঢাকা টুপি পরে ঘরে বসে থাকলেন। সেদিন আমার প্রথম কাজের জন্য 'ইন্টারভিউ' দিতে যাবার পূর্বে বিজ্ঞান মহারাজকে প্রণাম করে গেলাম। বলা বাহুল্য তাঁর আশীর্বাদে সে কাজ আমি পেয়েছিলাম। এবার অবশ্য মার মুখের দিকে চেয়েই তিনি মাকে খুব আশীর্বাদ করলেন।

* * *

যতদূর মনে পড়ে ১৯১৬।১৭ খ্রিস্টাব্দে বাবা ছুটি নিয়ে কানপুর থেকে কলকাতা যান। সে সময় একদিন আমায় নিয়ে বেলুড় মঠে গিয়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে দেখিয়ে বলেন যে, ইনিই রাখাল মহারাজ। রাখাল মহারাজকে দেখাবেন বলেই আমায় সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমার তখন বালক বয়স, দেখলাম এক সন্ন্যাসী গম্ভীর

মুখে বসে বসে গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছেন, আর অনেক মহারাজরা আশেপাশে যাতায়াত করছেন। রাখাল মহারাজ গঙ্গার দিকের বারান্দায় চেয়ারে বসেছিলেন।

প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই বাবা বললেন—এটি আমার বড় ছেলে। ইতঃপূর্বে প্রণাম করলেও মহারাজ আমার দিকে ফিরেও দেখেননি। বাবা যখন বললেন—আমার ছেলে, ঐকথা শুনেই হঠাৎ দেখলাম রাখাল মহারাজের দৃষ্টি বদলে গেল, আমার পা থেকে মাথা অবধি একবার দেখলেন। চোখের দৃষ্টি দেখে তখন আমার খুব ভয় ভয় করতে লাগল। এখনকার ভাষায় বলতে পারি যেন x'ray eyes (অন্তর্ভেদী দৃষ্টি)। আমার অনুভব হতে লাগল। যেন আমার দেহ স্বচ্ছ কাঁচের মতো। ঐ দৃষ্টি যেন শরীর মন অন্তর বাহির সব কিছুই জেনে ফেলল এবং কোন কিছুই যেন ওঁর কাছে আর গোপন রইল না। রাখাল মহারাজ তারপর অন্যদিকে চোখ করে তামাক খেতে খেতে অন্যান্য সাধুদের সঙ্গে ও বাবার সঙ্গে কথা কইতে লাগলেন। মনে মনে ভাবতে লাগলাম, এ কি অদ্ভুত মানুষ যে আমার সব কিছুই জেনে নিলেন যেমন টর্চের আলো ফেলে অন্ধকারের সব কিছুই দেখে নেওয়া যায়। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের দেখা আর আমি পাইনি, কিন্তু সে দৃষ্টি এখনও ভুলতে পারিনি।

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের প্রথম দর্শনের সৌভাগ্য হয় ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে। আমি তখন পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটের ছাত্র। কানপুরে নেপাল মহারাজ আসবার পর থেকেই তাঁর সঙ্গে আমাদের বাড়ির সকলের খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। আমি তাঁকে বরাবর বড় ভাইয়ের মতো শ্রদ্ধা করতাম ও ভালবাসতাম। আমার ভাল জীবন গঠন করার ও ঠাকুরের দিকে মন রাখার মূলে নেপাল মহারাজের সঙ্গ ও শিক্ষা। মহাপুরুষজী কাশীতে এসেছেন জেনে নেপাল মহারাজ মা-কে খুবই উৎসাহিত করে বললেন, "এমন সুযোগ আর পাবেন না, মহাপুরুষজী কাশীতে আছেন, দীক্ষা নিয়ে ফেলুন।" তিনি আমাকেও বোঝালেন, "শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীমা ও স্বামীজীর সব শক্তি এখন মহাপুরুষ মহারাজের ভিতর কাজ করছে, তুমিও এ সুযোগ ছেড়ো না।"

ডিসেম্বরে বড়দিনের ছুটিতে মাকে নিয়ে ৺কাশী পৌঁছালাম। সকালে জিনিসপত্র এক আত্মীয়ের বাড়িতে রেখেই মনে হয় বেলা ১০টা নাগাদ সেবাশ্রমে মাকে নিয়ে উপস্থিত হলাম। জানলাম মহাপুরুষ মহারাজ সেবাশ্রমের বাড়িতে আছেন, অদ্বৈত আশ্রমে তখন থাকতেন না। সেবক মহারাজকে মহাপুরুষজীর কথা জিজ্ঞেস করতেই তিনি বললেন, "যান না ভিতরে।" ভিতরে গিয়ে দেখি এক অপরূপ দিব্যদর্শন গৌরকান্তি পুরুষ চেয়ারে উপবিষ্ট। নিকটে গিয়ে দেখি মৃদু মৃদু হাসছেন আমাদের দেখে। হঠাৎ মনে হলো কাশীর বিশ্বনাথ আমার সামনে বসে—ইনিই তো স্বয়ং

শিব। এমন পুরুষ কখনও দেখিনি আর দেখবোও না। চোখ দুটি দিয়ে যেন স্নেহ ঝরে ঝরে পড়ছে। প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়ে পিতৃ-পরিচয় দিলাম এবং বললাম যে, মা দীক্ষা নিতে চান। আমার দিকে চেয়ে সুন্দর হেসে মহাপুরুষজী বললেন, "আমি তো তৈরি।" স্বয়ং বিশ্বনাথ ডেকে বলছেন—তিনি তো তৈরি, কিন্তু জীব তো তৈরি নয়! আমার মনে হলো মুখ ফুটে বললেই শ্রীচরণে তখনই স্থান দিতেন, কিন্তু বলা হলো না। স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর লেখা 'গুরু' বই পড়া ছিল। ভাবলাম গুরু যিনি হবেন, তাঁর তো আমার ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সব জানার কথা। তা ছাড়া দীক্ষা পাবার মতো আমার যোগ্যতাই বা কোথায়? শুনেছিলাম ঠাকুর, মা জীবের পাপ নিয়ে কত ভুগলেন, আমার মতো জীবকে দীক্ষা দিয়ে যদি এই মহাপুরুষের সে রকম কিছু হয়! তা ছাড়া যদি দীক্ষা পাবার যোগ্যতা আমার থাকে এবং ইনিই আমার গুরু হন, তাহলে নিজেই দেবেন—আমি কখনও বলবো না। মা-র দিকে চেয়ে মহাপুরুষজী বললেন, "বেশ, দীক্ষা হবে, সব জোগাড় আছে।" দেখলাম কারো দীক্ষা আগে হয়ে গেছে, ভিতরের বারান্দায় আসন পাতা রয়েছে। মা কিন্তু বললেন যে, আজ তো তিনি তৈরি হয়ে আসেননি। মহাপুরুষজী বললেন, "বেশ, তোমার যখন ইচ্ছা।" মা পরের দিন আসার কথা জানালেন। মহাপুরুষজী হেসে উত্তর দিলেন, "বেশ, তাই।" আমার মনে হলো—এখনই তো নিলে হতো, তিনি তো তৈরি। মা অবশ্য পরে আমায় জানালেন যে, তিনি স্নানাদি করে প্রস্তুত হয়ে আসেননি। পরের দিন সকালে মাকে নিয়ে পৌঁছলাম। মহাপুরুষজী বাইরের বারান্দায় বসেছিলেন। সেবক মহারাজকে সব ব্যবস্থা করতে বলে দিলেন। মা ভিতরের বারান্দায় গিয়ে দীক্ষা নিয়ে এলেন। জানলাম, দীক্ষা দেবার পর মহাপুরুষজী মাকে বললেন, "তোমার পাপ, পুণ্য, সুখ, দুঃখ, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সব ঠাকুরকে সমর্পণ কর।" দীক্ষার পর মার মন আনন্দে ভরে গেল এবং সে ভাবটা কিছুদিন ছিল।

সেদিন সন্ধ্যায় আবার মা ও আমি আরতির সময় এসেছিলাম। অদ্বৈত আশ্রমে কীর্তন হলো। মহাপুরুষজী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে 'হরি ওঁ হরি ওঁ' বলতে লাগলেন। ঠাকুরের মন্দিরে এ রকম ভাবে-ভরা কীর্তন ও ভাবময় অবস্থা ইতঃপূর্বে কখনও দেখিনি। ঠাকুরের গানও হলো।

আমরা আরও দু-তিন দিন কাশীতে ছিলাম। বড় হয়ে এই প্রথম কাশীতে আসা। মাকে নিয়ে সারাদিন কাশী দেখিয়ে বেড়ানোর পর, মন কিন্তু আশ্রমের দিকে টানছিল। পরের দিনই মহাপুরুষজীকে কিছু জিজ্ঞেস করবো স্থির করে তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম। বাইরের দিকে বারান্দায় তিনি চেয়ারে বসেছিলেন। প্রণাম করে

মুখের দিকে চেয়ে দেখি তাঁর মন সেখানে নেই—শান্ত, যেন কি ভাবে ডুবে আছেন! ইশারা করে বসতে বললেন। রকে মাটিতে বসে পড়লাম। অদ্ভুত দেখতে, তাঁকে খুব ভাল লাগছিল। মনে করে যত প্রশ্ন-চিন্তা এনেছিলাম, কিছুই আর স্মৃতিতে এলো না, নিজের মনও যেন চিন্তাশূন্য হয়ে কেমন স্থির হয়ে গেল! গড়গড়ায় তামাক এলো, মহাপুরুষজী একটু একটু করে টানছিলেন, কিন্তু চোখ দেখে মনে হচ্ছিল বাইরে যেন দৃষ্টি নেই—শান্ত সমাহিত অবস্থা। আমিও চুপ করে বসেই থাকলাম। কয়েকজন ভদ্রলোক সেদিকে আসাতে হঠাৎ চমকে উঠে বেশ রাগত ভাবে বলে উঠলেন, "এদিকে নয়, এদিকে নয়, ঠাকুরঘর ওদিকে, এখানে সাধুরা থাকেন।" তাঁরা চলে গেলেন। আমার মনে হলো—ওদের এত বকে তাড়িয়ে দিলেন, আমায় অবশ্য কিছু বলেননি, কিন্তু আমার থাকাটা ঠিক হচ্ছে কি? জিজ্ঞেস করেই ফেললাম, "মহারাজ, ওদের তাড়িয়ে দিলেন!" বললেন, "ওরা ঠিক নয়।" এই বলে এমন মোলায়েম ভাবে হাসলেন আমার দিকে চেয়ে, যাতে মনে হলো আমি থাকতে পারি। বেশ অনেকক্ষণ বসে বিদায় নিলাম।

এরপর ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে গ্রীষ্মকালে কানপুরের নেপাল মহারাজের সঙ্গে বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের কাছে দ্বিতীয় বার যাই। সে সময় নেপাল মহারাজ কানপুর থেকে এক বিপত্নীক মধ্যবয়সী ভদ্রলোককে নিয়ে গিয়েছিলেন মহাপুরুষজীর কাছে ভদ্রলোকের দীক্ষার উদ্দেশ্যে। কানপুর আশ্রমের অলপী মহারাজও সঙ্গে ছিলেন। মহাপুরুষজী বেশ সহজ অবস্থায় বসে ছিলেন। নেপাল মহারাজ ভদ্রলোকের দীক্ষাগ্রহণের কথা বলতে ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে মহাপুরুষজী বললেন, "আবার ও সব (অর্থাৎ দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহের কথা) ভাবছ কেন? মহাপুরুষজীকে একথা কেউই জানায়নি, অথচ তিনি যেন সবই জানেন এমনি সহজভাবে বলে যেতে লাগলেন। আবার কেন এই সব, বোঝাতে লাগলেন। তখন দীক্ষা দিলেন না। দ্বিতীয় বার বিবাহ না করতে এবং ঠাকুরের নাম করতে ভদ্রলোককে বললেন। নেপাল মহারাজের বিশেষ অনুরোধে দু-এক বছর পরে তাঁকেও দীক্ষা দিয়েছিলেন। ভদ্রলোক আর বিবাহ করেননি। অলপী মহারাজকে দেখে বললেন, "এ ছেলেটি দীক্ষা নেবে না?" অলপী কোন উত্তর দিলেন না। পরে অলপী বিজ্ঞান মহারাজের কাছে দীক্ষা পান এবং সন্ন্যাসী হন। নাম হয় স্বামী চিদাত্মানন্দ। আমার তখন ছিল অল্প বিদ্যার অহংকার এবং মহারাজকে সহজ অবস্থায় দেখে তর্ক করবার ইচ্ছায় বললাম—"মহারাজ, আপনারা খালি সব নিজের দিকেই টানেন।" আমার মনের তখন ভাব যে, সৎভাবে যার যেমন ইচ্ছা সৎ সংসারী হয়ে সৎকর্ম করুক না। দেশের কাজ করার দিকে তখন আমার খুবই ঝোঁক। সকলে সন্ন্যাসী হবে কেন? মহাপুরুষজী আস্তে আস্তে আমার দিকে ফিরে এমন এক দৃষ্টিতে চাইলেন যে, তাঁর

সহজ অবস্থার তখন সম্পূর্ণ পরিবর্তন দেখলাম। সে দৃষ্টির সামনে মনের অহংকার, বিদ্যা, তর্ক সব যেন কোথায় গুলিয়ে গেল! কোন প্রশ্ন ও কথা আর মনে ছিল না। মহাপুরুষজী বললেন, "আমি যা বলি সব ঠিক বলি। তুমি এটা বুঝেছ?" মাথা হেঁট করে বললাম, "হ্যাঁ, মহারাজ, বুঝেছি।" বলা বাহুল্য সেই মুহূর্ত থেকে মনে হলো এ অসামান্য পুরুষ যা বলছেন তাই শুধু ঠিক। আবার মনে হলো—যেমন কাশীতে দেখেছিলাম, ইনি কি সত্যই শিব, ঠাকুরের শক্তি এখন এঁরই ভিতর! দীক্ষার কথা মনে উদিত হলো, কিন্তু শুধু অলপীকে বললেন, "দীক্ষা নেবে না?" অথচ আমায় সে রকম কিছু বললেন না। বুঝলাম তাহলে আমার দীক্ষা পাবার কোনও যোগ্যতা নেই বা সময় হয়নি। বললে যদি নিষেধ করেন। যোগ্য হলে নিজেই বলতেন। দীক্ষার কথা আর বলা হলো না।

এরপর ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে গরমের ছুটিতে আবার কলকাতা যাই। এবার বেলুড় মঠের নিচে বাইরের বারান্দায় মহাপুরুষজী চেয়ারে বসেছিলেন। সময় বৈকাল। প্রণাম করে উঠতেই মহাপুরুষজী বাবার কথা বিশেষ করে জিজ্ঞেস করলেন। তারপর আমার বাবার জীবন থেকে উদাহরণ দিয়ে বোঝালেন—তিনি কতবার সাংসারিক ব্যাপারে ঠকেছেন এবং সংসারে কিভাবে চলতে হবে সে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। আমায় বললেন, "বাবা, তুমি দেখে শিখবে।" কতক্ষণ ধরে আমায় এত সাংসারিক কথা বললেন যা পূর্বে কখনও কেহ তাঁকে জানায়নি বা বলেনি। স্তম্ভিত হয়ে বুঝলাম আমার সামনে যিনি বসে আছেন তিনি আমার ভূত বর্তমান সব বলে যাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেরও উপদেশ দিচ্ছেন। এতে বুঝলাম আমায় সংসার করতে হবে এবং সমস্ত জীবন কর্ম করে যেতে হবে। মন বলল, গুরু যিনি হবেন তাঁর সব লক্ষণই তো মিলে যাচ্ছে। শিবস্বরূপ দেখলাম, এক দৃষ্টিতে অহঙ্কার চূর্ণ করে পূর্ণ বিশ্বাস এনে দিলেন। আমার ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সবই তো তিনি জানেন—এ রকম আর কে হবেন! তবু দীক্ষা নেবার কথা বলেননি। আমার নিশ্চয়ই এখনো সময় হয়নি। নিজে যদি দীক্ষা দেন তো দেবেন, আমি বলব না।

ইতোমধ্যে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শৈলেনকে নিয়ে বাবা কানপুর থেকে বেলুড়ে আসেন। শৈলেন তখন বিপ্লবী দলের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিল। বাবা বলতে মহাপুরুষজী শৈলেনকে দীক্ষা দিলেন। তার জীবন বদলে গেল।

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে আগস্ট মাসে কানপুর থেকে কলকাতা এসে আমার বিবাহ হয়। আর সকলের সঙ্গে নেপাল মহারাজও এসেছিলেন। বিবাহের কয়েকদিন পরই মা বললেন, "তোমরা চল, মহাপুরুষ মহারাজকে দর্শন ও প্রণাম করে আসবে এবং দীক্ষাও নেবে। নেপাল মহারাজ এবারও বলেছিলেন—এ সুযোগ আর ছেড়ো

না। সহধর্মিণীকে বললাম, "মহাপুরুষজীর কাছে দীক্ষা নেবে?" তিনি সানন্দে বললেন, "হ্যাঁ, আমার ঠাকুর-স্বামীজীকে খুব ভাল লাগে।"

বিবাহের পূর্বে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের 'কথামৃত' পড়েছিলেন, স্বামীজীর কথাও শুনেছেন এবং পড়েছেন। আমার মনে দীক্ষা নেওয়ার খুব ইচ্ছা অথচ মন বলছে— নিজে বলবো না, তিনি যদি দীক্ষা দেন তো দেবেন।

স্নান করে কিছু না খেয়ে মা ও নবপরিণীতা সহধর্মিণী সহ সকালে বেলুড় মঠে পৌঁছলাম। আমার ছোট দুই বোন এবং এক ভাইও সঙ্গে ছিল। এই ভাইটি পরে ১৮ বছর বয়সে মারা যায়। মহাপুরুষজীকে দর্শন করতে এসেছি শুনে নিচে এক ব্রহ্মচারীজী বললেন যে, মহারাজের শরীর খারাপ, কয়েকদিন যাবৎ কাকেও দর্শন দেন না, দেখা হবে না। ঠাকুরের কি কৃপা! আমাদের শুকনো মুখ দেখে জ্ঞান মহারাজ ও আর একজন সন্ন্যাসী (সম্ভবত সূর্য মহারাজ) বললেন, "মহাপুরুষজীকে শুধু খবর দাও—এঁরা এসেছেন, দেখা করা না করা তাঁর ইচ্ছা।" আমাদের নাম ধাম কিছুই জানানো হয়নি, কেউ জিজ্ঞেসও করেননি। মহাপুরুষজী তখনই অনুমতি দিলেন—"ওদের ডাক।" উপরে গেলাম, ঘরে ইজিচেয়ারে মহাপুরুষজী বসে। চেহারা কত রোগা হয়ে গেছে দেখে বড় কষ্ট হলো। আমাদের দেখে কি মধুর হাসলেন! মাকে ও আমায় তো চিনতেনই। সকলে একে একে প্রণাম করে বসতেই মা বললেন, "এরা দীক্ষা নেবে।" মহারাজ খুশি হয়ে বলে উঠলেন, "বেশ, তোমরা তৈরি হয়ে এসেছো?" বললাম—"হ্যাঁ, মহারাজ, স্নান করে এসেছি।" মহাপুরুষজী বললেন, "যাও, গঙ্গায় গিয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করে ঠাকুরকে প্রণাম করে এসো।" ফিরে আসতে ঘর থেকে সকলকে চলে যেতে বললেন। আমি ও সহধর্মিণী তাঁর সামনে পাশাপাশি বসলাম। মহাপুরুষজী একটু গম্ভীর হয়ে বসে কুশি করে 'গঙ্গে গঙ্গে' বলে আচমনের মতো নিজমুখে জল নিলেন। আবার দেখলাম মহাপুরুষজীর পরিবর্তন হয়ে গেল—যেন মহাদেব 'গঙ্গে গঙ্গে' করে গঙ্গাকে অবতরণ করাচ্ছেন! স্তব্ধ হয়ে দেখতে লাগলাম। তারপর চোখ বুজে একটু ভাবলেন, এবং বললেন, "তোমার মন্ত্র এই। ইষ্ট এই। প্রণব সংযুক্ত করে এই বীজমন্ত্র ও ইষ্টনাম জপ করবে।" আমার স্ত্রীকে বললেন, "তুমি শুধু বীজমন্ত্র ও ইষ্টনাম জপ করবে, প্রণব বলবে না।" প্রশ্ন করলাম—"আমার স্ত্রী প্রণব জপ করবে না কেন?" মহারাজ বললেন, "শাস্ত্রের বারণ আছে। বীজমন্ত্রে প্রণবও আছে।" মন্ত্রের অর্থ বুঝিয়ে দশবার নিজে নিজে জপ করে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জপ করিয়ে নিলেন। কি করে কর জপ করতে হয় দেখিয়ে শিখিয়ে দিলেন। আমায় জিজ্ঞেস করলেন গায়ত্রী জপ করি কিনা। না বলাতে বকলেন, "রোজ আগে অন্তত দশবার গায়ত্রী

জপ করে তারপর এই ইষ্টমন্ত্র জপ করবে সকাল-সন্ধ্যায়।" তারপর ঠাকুরঘরে গিয়ে জপ করে আসতে বললেন। কিছুক্ষণ জপ করে ফিরে আসার পর মা বললেন, "চরণামৃত নে।" মহাপুরুষ কৃপাসিন্ধু, সানন্দে সম্মতি দিলেন। অঞ্জলি ভরে জল নিলাম। তিনি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ডুবিয়ে চরণামৃত দিলেন, পান করে ধন্য হলাম আমরা। আমায় বললেন, "স্ত্রীকে পার্বতীর অংশ বলে জানবে।" এবং স্ত্রীকে বললেন, "স্বামীকে জানবে শিবের অংশ।" আমায় বললেন, "তুমি ওকে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ শিক্ষা দেবে।"

মন্ত্র পাবার পর যখন ঠাকুরঘরে যাচ্ছি তখন যেন নেশার মতো মনে হচ্ছিল, পা একটু একটু টলছিল। এ ভাবটা অনেকক্ষণ ছিল। মনে সর্বদা মন্ত্রজপ হতে লাগল, ইচ্ছা করি বা না করি। এ অবস্থা বেশ কয়েক মাস ধরে খুব ছিল। তারপর সাংসারিক নানা অবস্থায় কমে গিয়েছিল, কিন্তু তাঁর কৃপায় একটু জপ করলেই আবার ঐ অবস্থা ফিরে আসে।

দীক্ষার পর গুরুদেব সেবক মহারাজকে প্রসাদ দিতে বললেন। নিচে নামতেই সেবক মহারাজ ও অন্যান্য সাধুগণ আমাদের পরিচয় জানতে চাইলেন, বাবার নাম শুনেই বললেন, "আপনাদের তো হবেই। মহাপুরুষজী কয়দিন থেকেই অসুস্থ ছিলেন, দর্শন বন্ধ ছিল, আজ সকাল থেকেই একটু ভাল আছেন।" আমাদের অশেষ ভাগ্য তাই কৃপাসিন্ধু মহাপুরুষজীর কৃপা পেলাম।...

চাকরি উপলক্ষে অন্যত্র গিয়ে প্রায় এক বছর পর ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে সম্ভবত জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে সহধর্মিণী সহ বেলুড় মঠে গিয়ে পুনরায় মহাপুরুষজীর দর্শন পাই। এবার শরীর আরো খারাপ দেখলাম। শরীর এত খারাপ অথচ মুখ দেখে বোঝবার জো নেই। সদানন্দ, হাসিতে মুখখানি ভরা। শরীরের অসুস্থতা সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন। কি তফাত আমাদের সঙ্গে—আমাদের মন অসুস্থ শরীরেই পড়ে থাকে! মহাপুরুষজী ঠাকুরের সম্বন্ধে কত কথা বললেন! ঠাকুরই সব—এই কথা বার বার বললেন। উঠে ঠাকুরের স্বহস্তলিখিত নাম দেখালেন। ঘরে অন্য যে সব ছবি ছিল একে একে দেখালেন। গুরুদেবের কাছে এলেই জিজ্ঞেস করতেন ঠাকুরঘরে গিয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করে এসেছি কিনা। এইভাবে শ্রীঠাকুরকে ধরিয়ে দিতেন। এখন যত দিন যাচ্ছে তত বুঝতে পারছি—তিনি কেন ঐসব শিক্ষা দিতেন। আহা! তিনি কত কল্যাণাকাঙ্ক্ষী ছিলেন!

পর বৎসর ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে সম্ভবত আগস্ট মাসে কলকাতায় গিয়ে বেলুড় মঠে মহাপুরুষ মহারাজের দর্শনলাভের সৌভাগ্য হয়েছিল। সঙ্গে সহধর্মিণী, শিশুকন্যা ও শ্বশ্রূঠাকুরানী। মঠে পৌঁছে মহাপুরুষজীর দর্শন প্রার্থনা করায় সেবক

মহারাজ প্রথম সম্মতি দিতে ইতস্তত করলেন, কারণ মহারাজের শরীর বেশি অসুস্থ, রোগা শরীরে স্ট্রেইন্ বেশি হতে পারে। আমরা তাঁর কৃপা পেয়েছি জেনেও অল্পক্ষণের বেশি বসবো না বলিয়ে নিয়ে মহারাজের কাছে যেতে দিলেন।

শরীর আরো খারাপ দেখে মন দমে গেল, কিন্তু তাঁর সেদিকে কোনও খেয়াল আছে বলে বোধ হলো না। শারীরিক কুশলপ্রশ্ন করায় বললেন, "বাবা, আর শরীর! এ তো এবার ভাঙবেই।" তারপর তাড়াতাড়ি বললেন, "আমি ভালই আছি।" দেখলাম বটে উনি ভাল আছেন, সদানন্দময়; অসুস্থ তো শরীরটা। শরীর আর উনি আলাদা। স্নেহমাখা স্বরে কত কথা বললেন! আমাদের কথা জিজ্ঞেস করলেন। শিশুকন্যাকে চিবুকে হাত দিয়ে আদর করে বললেন, "কি খাবি, কি খাবি।" মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। সেবক মহারাজ বোধ হয় ঘড়ি দেখছিলেন, দূর থেকে ইশারায় চলে আসতে বললেন। আমরা কিন্তু শ্রীগুরুর স্নেহে সব ভুলে বসেছিলাম। জীবনের এই দুর্লভ সময় যে আর পাব না—তা কি তখন জানি? প্রণাম করে মাথা না তুলেই বললাম, "মহারাজ, আশীর্বাদ করুন।" দুই হাত মাথায় রেখে বললেন, "আশীর্বাদ তো করছিই।" তাঁর সেই আশীর্বাদের কৃপায় জীবনের এতগুলি দিন সুখে দুঃখে, নানা বিপদ ও সমস্যার ভিতর দিয়ে কেটে গেল। যখনই তাঁর কাছে প্রার্থনা জানিয়েছি, সাড়া পেয়েছি—তিনি বিপন্মুক্ত করেছেন। সাংসারিক গোলযোগে মাঝে মাঝে ভুল হলেও তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে, আমরা অনাথ নই। নিজের কোনও সাধ্য নেই যে, তাঁকে ধরে থাকবো। সর্বদা মনে রাখি, নিজ কৃপায় তিনিই ধরে আছেন এবং মনে করিয়ে নিচ্ছেন।

মহাপুরুষজীর কৃপাপ্রাপ্তির পর ৩৮ বৎসর গত হলো, সংসারে বহু প্রলোভনে পড়েছি। সময়ে সময়ে মন যেন প্রভাবিত হয়ে পড়েছে, কিন্তু আজ অবধি কিছুতেই বিপথে যেতে পারিনি। কে যেন কিছুতেই কোনও নিম্নগামী কর্ম করতে দেন না। নিজের কোনও কৃতিত্ব বা ক্ষমতা নেই, তিনি করতে দেন না। তাঁর হাত ধরে থাকার ক্ষমতা আমার নেই, কেউ যেন আমার হাত ধরে সংসারের খানা-ডোবা থেকে সর্বদা রক্ষা করছেন। সাংসারিক জীবনে বহু বার নানা সমস্যা বিপদ ও রোগের মধ্যে পড়তে হয়েছে, কিন্তু প্রত্যেক বারই যেন নিমজ্জমান ব্যক্তিকে টেনে তোলার মতো টেনে তুলেছেন, ডুবতে দেননি। বিপদের সময় আরো যেন নিজের বিনা চেষ্টায় মন্ত্রজপ চলতে থাকে এবং ধীরে ধীরে অন্ধকার কেটে যায়।

শ্রীশ্রীগুরুদেবের করুণা

শৈলবালা ভৌমিক

পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ স্বামী শিবানন্দজী ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় শুভ পদার্পণ করেন। সে সময়ে আমার দাদা শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র নাগ মহাশয়ের ঐকান্তিক ইচ্ছায় ও আগ্রহে শ্রীশ্রীমহাপুরুষজী কৃপা করে একদিন দাদার ঢাকা জেলার বেঙ্গোরা গ্রামের বাড়িতে পদধূলি দিয়েছিলেন এবং দাদার বিশেষ প্রার্থনায় মহাপুরুষ মহারাজ পূজার আসনে ধ্যানস্থ হয়ে বসে ঠাকুরের পূজা সমাপন করেন। সেই জ্যোতির্ময় আনন্দঘন মূর্তি যেন ঠাকুরঘর আলোকিত করে রেখেছিল। ঐদিনই (১৯২২ খ্রিস্টাব্দে, ফাল্গুন মাস, বৃহস্পতিবার, একাদশী তিথি) মহাপুরুষজী অসীম কৃপা করে আমাকে মন্ত্রদীক্ষা দেন দাদার বাড়ির ঠাকুরঘরে। আমার এক ভাই, তাঁর স্ত্রী, ছোট ভাই এবং ছোট বোন সুনীতিবালা বলেরও দীক্ষা হয়েছিল সেদিন। দীক্ষার সময় মহাপুরুষজী আমাকে বললেন, "ঠাকুরের নাম দিয়ে তোমাকে তাঁর শ্রীচরণে সমর্পণ করলাম। ঠাকুর তোমার কল্যাণ করুন—এই আন্তরিক আশীর্বাদ করছি।" ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর অহৈতুকী কৃপা ও অমোঘ আশীর্বাণী আমাকে সংসারের ত্রিতাপ থেকে সর্বদা রক্ষা করছে বর্মের মতো।

আমার ছোট ভাইটি মহাপুরুষ মহারাজের শ্রীচরণে আশ্রয় লওয়ার তিন বৎসরের মধ্যেই দেহত্যাগ করে। সে খুব শান্ত, শিষ্ট ও সত্যবাদী ছিল। তার মৃত্যুর সময়কার এক অপূর্ব দৃশ্যের কথা মনে পড়ে। দুদিন আগে থেকেই তার কথা বলবার শক্তি ছিল না, কিন্তু মৃত্যুসময়ে তার মুখে কথা ফুটল; সে বলল, "আমাকে মহাপ্রসাদ দিন।" মহাপ্রসাদ দেওয়া হলো। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদী ফুলের মালা গলায় পরিয়ে দেওয়া হলো, খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। পরে বলল, "শ্রীশ্রীঠাকুর ও কালীমাতার ফটো আমাকে দিন।" তাও দেওয়া হলো। অমনি অতি ভক্তিভরে ফটোখানা মাথায় ঠেকিয়ে বুকে রেখে বলল, "মা, ব্রহ্মময়ি, মা ব্রহ্মময়ি, দয়া কর, মা।" আমাকে বলল "বড়দি, গুরুমহারাজ মহাপুরুষজী এসে স্বপ্নে আমাকে মহামন্ত্রজপের সংখ্যা অনেক বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। আমি তাই জপ করতাম।" কি পরম সৌভাগ্য ছিল! মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে এ অনাঘ্রাত পুষ্পটি ঝরে পড়ল!

শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা গুরুদেবের ভিতর বসে আমার মতো অধম সন্তানকে রক্ষা করছেন। গুরুকৃপার অমোঘ শক্তি সর্বদাই বিপদে-আপদে সঙ্কটে মতিবিভ্রমে অনুভব করছি। গুরুশক্তিই এ জীবনটা পরিচালিত করছে—মনে-প্রাণে বুঝছি। আমি বালবিধবা। একবার আমার শ্বশ্বরবাড়ির লোকেরা আমাকে কুলগুরুমন্ত্রে দীক্ষিতা করতে খুব চেষ্টা করেছেন, আর আমি কেবল পাশ কাটিয়েছি। একবার তাঁরা আমাকে দীক্ষার জন্য কুলগুরুর বাড়িতে নিয়ে যাবেন ঠিক করলেন। আমি তখন নিরুপায় হয়ে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের শ্রীচরণে শরণ নিলাম। মহাপুরুষজী তখন বেলুড় মঠে আছেন। একখানা পত্রে লিখলাম, "মহারাজ, আমার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা আমাকে কুলগুরুর কাছে দীক্ষিতা করতে চান এবং বিশেষ পীড়াপিড়ি করছেন।" পত্রখানা পেয়ে তখনি করুণাময় মহাপুরুষজী আমাকে লিখলেন, "ভয় কি, মা? বলবে—শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে স্বপ্নে দীক্ষা দিয়েছেন।" স্বপ্নে আমি দীক্ষা পাই—কিন্তু আমি কারও কাছে ঐকথা ব্যক্ত করিনি। অন্তর্যামী মহাপুরুষজী সবই জানেন! তাই স্বপ্নের ঘটনা তিনি বলেছিলেন এবং তাঁর অসীম আশীর্বাদে সমস্ত বাধাবিঘ্ন দূর করতে পেরেছি।

আর এক রাত্রিতে শুভ মুহূর্তে স্বপ্নে দেখি—মহাপুরুষজী এসে আমাকে স্পর্শ করলেন। আমি আনন্দ-বিস্ময়ে ভাবলাম—একি! এমন ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ, আর আমি তাঁর বিশ্বাস-ভক্তিহীনা সামান্য সেবিকা দাসী—আমার উপর তাঁর এত কৃপা! অমনি মহাপুরুষজী দেখালেন এক মোটা বটগাছের গুঁড়ি। বললেন, "বটের গুঁড়ি মোটা হলে হাতি বেঁধে রাখা যায়।" কি আশ্চর্য! সেই বটগাছের মোটা গুঁড়িটা আমার চোখের সামনে ভাসছে! গুরুকৃপায় মানুষ মহতো মহীয়ান হয়। গুরুকৃপা বটগাছের মোটা গুঁড়ির মতো দৃঢ়, ভক্তদের একমাত্র আশ্রয়স্থল।...

গুরুদেব কৃপা করে আমাকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন চিঠিতে (১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ—১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ) লিখেছেন ঃ "আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবে। ঠাকুরের কৃপায় তোমার খুব ভক্তি বিশ্বাস বৃদ্ধি হউক, তিনি তোমায় শান্তি ও আনন্দ দিন এবং তোমাদের কল্যাণ করুন—ইহাই প্রার্থনা।" ..."জগতে ভগবৎ-ভক্তি-বিশ্বাসই অতি দুর্লভ বস্তু। তাঁর কৃপায় ঐ অভাব যাদের দূর হয়েছে, তাদের অন্য কোন কাম্যবস্তুই থাকতে পারে না। যারা ঐ ধনে ধনী তারা আর অন্য বস্তুর জন্য কাঙাল কখনও হয় না। অন্য সব তুচ্ছ।"..."আমার শরীর তাঁর কৃপায় একপ্রকার চলে যাচ্ছে। আমার জন্য চিন্তিত হবে না—ঠাকুর আছেন ও থাকবেন, তাঁকে ডাকবে, তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে। তা হলেই তোমার সব হবে।...ঠাকুর ও মাকে ধরে থাক। তাঁরা চিরকালই তোমাদের দেখছেন ও দেখবেন, তাঁদের কৃপায় তোমাদের

কল্যাণ নিশ্চয়ই হবে।" ..."মা, টাকা পাঠাইবার কোন প্রয়োজন নাই—ঠাকুরের কৃপায় কোনই অভাব নাই। তাঁকে ডাক, তাতেই আমি সন্তুষ্ট হব।"

শ্রীগুরুদেবের উপদেশই জীবনপথের প্রধান পাথেয়। তাঁর পাদপদ্মে কোটি কোটি ভক্তিবিনম্র প্রণতি।

মহাপুরুষজীর অস্ফুট স্মৃতি

শ্রীশচীন্দ্রনাথ দত্ত

অনেক দিন আগেকার কথা, তখন সবেমাত্র পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের কৃপা পেয়েছি। এক শ্যামাপূজার রাত্রে বেলুড় মঠে কাকাবাবু ৺মন্মথনাথ দত্তের সঙ্গে গিয়েছি পূজা-দর্শনমানসে। মহাপুরুষ মহারাজের বিছানার পাশে মেঝেতে আমরা দুজনেই বসে আছি, রাত ৯টা আন্দাজ হবে, এমন সময় কাকাবাবু আমাকে মহাপুরুষজীর পদসেবা করার কথা বললেন। তিনি শুয়েছিলেন। আমি তখন তাঁর পদসেবা করতে লাগলাম। তখন মা-কালী কি তা তিনি বোঝাতে লাগলেন।

"৺মা-কালী, চিন্ময়ী, ব্রহ্মশক্তি, ত্রিগুণাতীতা, আদ্যাশক্তি (Primeval Force)। তিনিই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন; গড়ছেন, তা নিয়ে খেলছেন, আবার ভাঙছেন—এই লীলা তাঁর ইচ্ছামত অবিরত চলছে। দেখছো না, চোখের সামনে কি ভয়ঙ্কর বন্যায় উত্তরবঙ্গ ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল! কত গ্রাম, কত লোক বিপন্ন! কত জীবজন্তু, গৃহদ্বার নিশ্চিহ্ন ও লুপ্ত! এই ধ্বংস-লীলা। আবার তারই সঙ্গে অবিরাম অভয়বাণী ধ্বনিত করে মানুষ ছুটেছে ঐ ভয়াবহ ধ্বংসক্ষেত্রে অগণিত বিপন্ন মানব ও জীবকে রক্ষা করতে ও সেবা করতে। এই তো মায়ের এক হাতে ধ্বংস ও অন্য হাতে অভয় ও বর। বিশ্ব-প্রকৃতিতে তিনিই বিরাজমানা থেকে এই লীলা অবিরাম করে চলেছেন। যিনি নিরাকার নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মরূপে বিরাজমান, তিনিই সাকার সক্রিয় হয়ে বিশ্বপ্রকৃতিতে অনন্তরূপে বিচিত্র ভঙ্গিতে শক্তির বিকাশ করছেন। তাইতো ঐ শবরূপ শান্ত শিবের বুকের উপর তাঁরই ইচ্ছাশক্তি ৺মা-কালীরূপে দাঁড়িয়ে। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি, শিব ও কালী একই। একটির সঙ্গে অপরটি সর্বদা যুক্ত, ছাড়াছাড়ি নেই। তাঁরই পূজা আজ অমাবস্যার গভীর নিথর রাতে। মনপ্রাণ ঢেলে দাও এই পূজায় মায়ের শ্রীপাদপদ্মে।" ধন্য হলাম এই সব শুনে।...

* * *

অনেক পূর্বে একদিন বৈকালে কাকাবাবুর সঙ্গে বেলুড়ে শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজকে দর্শন করতে উপস্থিত হয়ে তাঁকে প্রণাম করে বসলাম। মহাপুরুষ মহারাজ খুব উৎফুল্ল, স্বামী বিবেকানন্দজীর উৎসব আসছে বলে।

দ্বারভাঙ্গা থেকে কলকাতায় এসেছিলাম তখনকার প্রচলিত রেলের মেয়াদী রিটার্ন টিকেট কিনে। কাকাবাবু বলেছিলেন ঐ উৎসব দেখে ফিরতে। কিন্তু ঐ উৎসবের কিছু আগেই আমার রেল-টিকেটের ফিরে যাবার মেয়াদী সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাবার কথা, তাই এক বন্ধুর রিটার্ন টিকিটের সঙ্গে বদলাবদলি করে তাঁর টিকেটখানি আমি লই। এরূপ করায় আমি ঐ উৎসবটি দেখে ফিরে যাবার সময় পেলাম অথচ তাঁরও ফিরে যাবার কোন অসুবিধা হলো না।

কথায় কথায় আমি ঐ টিকেট পরিবর্তন করে কিভাবে উৎসব দেখার সময় পেয়েছি তা মহাপুরুষ মহারাজকে বললাম। কিন্তু মহারাজ ঐ কথা শোনামাত্র দৃঢ়ভাবে আমাকে বললেন—"টিকেট-পরিবর্তনের কাজটি দুর্নীতিপূর্ণ রেল-কর্তৃপক্ষের নিয়মানুসারে। অতএব তোমার এ কাজটি ঠিক হয়নি। তুমি রেল-কর্তৃপক্ষের নিয়মভঙ্গ করেছ। উদ্দেশ্য যতই ভাল হোক না কেন, নিয়মভঙ্গ করে দুর্নীতির পথ ধরে কখনো কোনও কাজ কোরো না। এই দোষকে প্রশ্রয় দিলে ক্রমশ স্বভাবগত হয়ে যাবে, সাবধান।" তাঁর সেই সতর্কবাণী এখনো কর্ণে ধ্বনিত হচ্ছে।...

অন্য একদিনের কথা। বেলুড় মঠে মা-দুর্গার পূজা দেখতে গেছি সকালবেলায়। তখন কলকাতা ও বেলুড়ের মধ্যে স্টিমারের যোগাযোগ ছিল। মঠবাড়ির প্রাঙ্গণে গিয়ে দেখি মণ্ডপ বেঁধে মা-দুর্গার পূজা হচ্ছে; আর মঠবাড়ির প্রায় সংলগ্ন আমগাছটির দক্ষিণে একটি ছোট বেঞ্চের উপরে উত্তরাস্যে শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ আত্মভোলা হয়ে মা দুর্গাকে দর্শন করছেন। আমি গিয়ে তাঁকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করামাত্রই তিনি বললেন, "যাও, ঠাকুরঘরে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করে এসে মা দুর্গাকে প্রণাম করে এখানে এসে বস।" যখন ঠাকুরপ্রণাম করে তাঁর কাছে ভূমিতলে বসলাম, তখন তিনি কিন্তু তাঁর পাশে বেঞ্চের উপরে আমাকে বসতে বললেন। শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে একাসনে বসতে লজ্জায় ও দ্বিধায় ইতস্তত করছিলাম মনে মনে, কিন্তু তাঁর বালকবৎ সরল ব্যবহার ও স্নেহবিগলিত আহ্বানে মুগ্ধ হয়ে যন্ত্রবৎ তাঁর পাশেই বেঞ্চের উপরে বসে পড়লাম।

তখন মহাপুরুষজী মণ্ডপে মা-দুর্গাকে দেখিয়ে আনন্দোচ্ছ্বাসের সঙ্গে বললেন—"ঐ দেখ, আমাদের সবাইকার মা এসেছেন আমাদের পূজা নিয়ে আমাদের আনন্দ দিতে। সাক্ষাৎ মা।" কিছুক্ষণ পরে বললেন, "গঙ্গার ধারে গিয়ে দেখ সাধুরা সমবেত হয়ে সপ্তশতী হোম করছেন। সেখানে দেখতে পাবে একজন ধুতিচাদর-

পরিহিত শ্বেতাঙ্গ দীর্ঘাঙ্গ ও বলিষ্ঠ পুরুষ, ব্রহ্মচারী। তিনি ছিলেন বিশ্বযুদ্ধে বৃটিশের বিপক্ষ ইটালীয়ান সৈন্যবাহিনীর নেতৃস্থানীয় একজন—নাম কাপ্তেন মস্কা। তিনি যুদ্ধে আহত হয়ে চাকরি ছেড়ে ভারতে এসেছেন এবং ভাগ্যচক্রে মঠে এসে বেলুড় মঠে সর্বত্যাগী সাধুদের সঙ্গে বাস করছেন।" গঙ্গার ধারে দেখলাম সপ্তশতী হোম এবং সাধুদের মধ্যে একপাশে দেখতে পেলাম অবিরত জপে নিযুক্ত সেই দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ শ্বেতাঙ্গ ব্রহ্মচারীকে। মহাপুরুষ মহারাজের কাছে ফিরে আসতে তিনি বললেন—"রাজসিক ভোগের চরম দেখেও ঐ পুরুষটির শান্তিলাভ হয়নি, এখন সাত্ত্বিকভাবের উদয় হয়েছে, এইবার শান্তি পাবে।"

* * *

অন্য দিনের কথা। একদিন বিকালবেলা বেলুড় মঠে মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করতে গেছি। তাঁকে প্রণাম করে তাঁর ঘরে বসে আছি। আমি একলাই ছিলাম। একটি কথা তিনি জোর দিয়ে আমাকে বললেন—সেটি জগতের অনিত্যতার কথা। তিনি বললেন, "সর্বদা মনে রাখতে চেষ্টা করবে যে, জগৎ অনিত্য, মানুষ অনিত্য—এই আছে, এই নেই। মানুষ জন্মাচ্ছে, কিছুকাল বেঁচে থেকে মরে যাচ্ছে। কেউই চিরদিন বেঁচে থাকবে না। পুরানো লোকেরা চলে গেছে, নতুন লোকেরা এসেছে—এরাও পুরানো হয়ে চলে যাবে, আরও নতুনরা আসবে। এইভাবে জগৎ চলছে। মনে রাখবে—মানুষ অনিত্য, কিন্তু প্রবাহ বা স্রোত হিসাবে মানুষ নিত্য। মানুষ আসছে যাচ্ছে, কিন্তু মানুষের আসা-যাওয়ার স্রোতধারা আবহমান কাল ধরে বর্তমান রয়েছে এই স্রোতের ধারায় এ জগতে এসে পড়ায় মানুষের কর্তব্য কি তা গভীরভাবে চিন্তা করে দেখা উচিত, খুব গভীরভাবে ভেবে দেখা উচিত। এই স্রোতের মূল উৎসটি জীবন্ত চৈতন্যময় ধারা, বেগময় অথচ স্থির ও নিত্য।"...

আর একদিন বেলুড় মঠে প্রণামান্তে মহাপুরুষ মহারাজের সামনে তাঁর ঘরের মেঝেতে একলা বসে আছি, তিনি চেয়ারে বসে আছেন। বেলা ৩টা আন্দাজ হবে। এমন সময়ে আরো কয়েকটি যুবক-ভক্ত এসে তাঁকে প্রণাম করে আমার পাশেই বসলেন। মহাপুরুষজী আনন্দময় ও হাস্যমুখ। তিনি সকলের কুশল-প্রশ্নাদি করলেন। ঐ ভক্তদের একজন উচ্চশিক্ষার জন্য শীঘ্র জার্মানীতে যাবেন বলে মহাপুরুষজীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন। তিনি খুব খুশি হয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন এবং তাঁর খুব মঙ্গল হবে জানালেন। ভক্তটি গদগদচিত্তে মহাপুরুষজীকে প্রণাম করলেন।

কিছুক্ষণ পরে একটি ভক্ত মহাপুরুষজীকে তাঁর শারীরিক কুশল প্রশ্ন করায় তিনি বললেন—"এ শরীরটা ভালয় মন্দয় একরকম আছে, কিন্তু শরীরটা খুব বুড়ো হয়েছে, না?" ভক্তটি বললেন, "মহারাজ, এ শরীরটি আছে বলেই তো

আমাদের বল ভরসা সব আছে, তা না হলে আমাদের কি দশা যে হবে তা জানি না।" মহাপুরুষজী এ কথা শুনেই অভয়বাণী উচ্চারণ করলেন, বললেন, "এ বুড়ো শরীরটা থাক বা যাক তোমাদের কোন ভয় নেই, কোন ক্ষতি হবে না, কিছুই তোমাদের আটকাবে না—নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত থাকো। তাঁর কৃপায় সবই ঠিক ঠিক হয়ে যাবে, আমি বলছি।" এই অভয়বাণী শুনে আমরা ধন্য হলাম।...

অন্য একদিন বিকালে বেলুড় মঠে মহাপুরুষ মহারাজের কাছে প্রণামান্তে বসে আছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "এবার দুর্গাপূজার ছুটিতে কোথায় যাবে মনস্থ করেছ?" উত্তরে বললাম যে, সস্ত্রীক রাজগিরে (রাজগৃহে) কিছুদিন থাকবো ভেবেছি। শুনেই তিনি খুব খুশি; বললেন, "বেশ বেশ, চমৎকার স্থান, তপস্যার স্থান—বুদ্ধদেবের স্থান। তিনি কত তপস্যা সেখানে করেছিলেন! তাঁর ত্যাগ তপস্যা ও করুণার ভাব ওখানে যেন জমাটবাঁধা হয়ে আছে। ওখানে জপধ্যান বেশ জমবে।"...

* * *

একদিন বৈকালে বেলুড় মঠে গিয়ে মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করে তাঁর সামনে মেঝেতে বসেছি, আর কোন ভক্ত তখনো আসেননি। ৺শিবরাত্রির কয়েকদিন পূর্বেকার কথা। কথায় কথায় মহাপুরুষজী বললেন যে, কয়েকজন সাধু মঠ থেকে ৺শিবরাত্রি উপলক্ষে নেপালে পশুপতিনাথ-দর্শন করতে যাচ্ছেন। তা শুনে আমি বললাম যে, ওঁরা কাছে ৺কাশীধামে না গিয়ে নেপালে যাচ্ছেন, আশ্চর্য মনে হচ্ছে। এ কথা শুনে একটু বিরক্ত হয়ে মহাপুরুষজী বললেন, "একি কথা! হিমালয় ৺শিবের স্থান। হিমালয়ের গুরুগম্ভীর নির্জন পরিবেশ স্বতই মনকে ধ্যানপ্রবণ করে দেয়। সেই হিমালয়ে ৺পশুপতিনাথ বসে আছেন ভক্তদের দর্শন দেবার জন্য। একি কম কথা! তাঁকে দর্শন করতে যাওয়া সৌভাগ্যের কথা।"...

একবার ৺কাশীধামে অদ্বৈত আশ্রমে মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গলাভ করবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল। সে সময় গঙ্গাস্নানের একটি বিশেষ যোগ উপস্থিত হয়। আমার শরীর একটু অসুস্থ ছিল। সেজন্য তিনি বললেন—"গঙ্গাস্নান কোরো না। গঙ্গা স্পর্শ করে গঙ্গাজল মাথায় ও গায়ে ছিটিয়ে দিও, তাতেই হবে। শরীর ও মন শুদ্ধ হয়ে যাবে। মন শুদ্ধ হওয়াই আসল কথা, তা যে রকম করেই হোক।"

মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ-স্মৃতি

শ্রীইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায়

কলেজে পড়বার সময় থেকেই পরম পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে আমার পরিচয়। সম্পর্ক ঘনিষ্ঠভাবে বেড়ে ওঠে ঠিক ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে বি.এ. পাশ করবার পর থেকেই, কারণ আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে তিনি বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন। আমরা কি করি বা না করি খুব খোঁজখবর নিতেন। মঠে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করবার পরই "কি ঠিক করলে, বাবা?"—এই প্রশ্ন প্রায়ই করতেন। জবাব তো দিতে হবে, তাই মহাফাঁপড়ে পড়তাম। এদিকে আমরা একদল যুবক প্রায় সকলেই সহপাঠী—পাড়ার বন্ধু ও সমবয়সী—একসঙ্গে সাতজন গ্র্যাজুয়েট হয়েছি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে; এর মধ্যে কেউ আবার বি. এস-সি. অনার্স গ্র্যাজুয়েটও আছে। তবে বেশির ভাগই আর্টস গ্র্যাজুয়েট। আমরা কোন্ লাইনে যাব, কি করব এসব ভাবছি। এছাড়া আরও ২/৩ জন যারা আমাদের আগে পাশ করেছে, তারাও সব গ্র্যাজুয়েট—ভাল ছেলে। এতগুলো যুবক, এদের ভবিষ্যৎ তিনি ভাবছেন না—একি হতে পারে?...

১০ এপ্রিল, ১৯২২ খ্রিঃ রাত্রে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র পরম পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ কলকাতা বলরাম মন্দিরে মহাসমাধিতে শরীরত্যাগ করেন। তাঁর তিরোধানের পর শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ ও লীলাসহচর পরম পূজ্যপাদ মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ হন—২ মে, ১৯২২ খ্রিঃ। স্বামী বিবেকানন্দের ঘরের পাশে উপরতলায় তিনি থাকতেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের দেহত্যাগের পরে একদিন কথাপ্রসঙ্গে মহাপুরুষ মহারাজ বেলুড় মঠে তাঁর ঘরে বসে সমাগত ভক্তদের বলছেন—"মহারাজ চলে গেলেন, মঠের গাছপালা সব যেন শুকিয়ে গিয়েছে, সবই যেন ম্রিয়মাণ—পশুপক্ষী পর্যন্ত। কত বড় একটা আধ্যাত্মিক শক্তি জগৎ থেকে চলে গেল!"

পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ আমাদের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখতেন, তিনি রাজা মহারাজের স্থান গ্রহণ করেছিলেন। মঠে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে যেমনি কাছে বসতাম অমনি খোঁজ নিচ্ছেন—"কেমন আছ সব? কি হলো, বাবা? কি ঠিক করলে?" আমরা অনেকেই স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করবার কথা ভাবছিলাম। তাঁর

কাছে প্রকাশও করেছিলাম সব। তিনি সব শুনছেন, কিন্তু কোনটাই তাঁর মনোমত হচ্ছিল না। তাঁকে বললাম যে, পাড়ার উঠে-যাওয়ার মতো ছোট্ট একটি স্কুলকে সংস্কার ও পুনর্গঠন করে চালাবার জন্য পূজনীয় জ্ঞান মহারাজ বিশেষ জিদ করে বলছেন। মহাপুরুষ মহারাজ শুনেই বললেন, "হ্যাঁ, বাবা, স্কুলটি নিতে হবে। ও-সব ব্যবসা-বাণিজ্য নানাকথা যা বলছ, সে সব ছেড়ে দাও।" দেখলাম তিনিও নাছোড়বান্দা।

এখন সমস্যা দাঁড়াল অগ্রণী হয়ে স্কুলটির কার্যভার কে গ্রহণ করবে? পূর্বেই পূজনীয় জ্ঞান মহারাজকে কথা দিতে হয়েছে যে, তাঁর আদেশ পালন করব। আর এদিকে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের ইচ্ছা তো শ্রীশ্রীঠাকুরেরই ইচ্ছা—এই ভেবে আর কালবিলম্ব না করে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে ২৬ নভেম্বর থেকে প্রধান শিক্ষকের গুরুদায়িত্বভার গ্রহণ, বিদ্যালয়ের পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণ এবং পরিচালনার জন্য প্রস্তুত হলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর সন্তানের ইচ্ছামত কৃপা করে আমাকে যন্ত্রস্বরূপ করে নিলেন তাঁর কাজের জন্য। কাজে ব্রতী হলাম; বয়স তখন মাত্র ২২ বছর। আশ্রমের তরফ থেকে স্কুলটি পরিচালনা করবার ব্যবস্থা হলো। যে ২।৩ জন বন্ধু সহকারী হিসেবে এই কাজে প্রথম যোগদান করল, বাদল (শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) তাদেরই অন্যতম। স্বামীজীর নামে স্কুলটির নূতন নামকরণ হলো—'বিবেকানন্দ ইন্‌স্টিটিউশন, হাওড়া'।...

১৯২২ খ্রিস্টাব্দে মহাপুরুষ মহারাজ মঠাধীশ (প্রেসিডেন্ট) হবার পর থেকে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার ফলে আমাদের আশ্রম ও স্কুলসংক্রান্ত খবরাখবর তাঁকে অধিকাংশ সময় জানানো হতো এবং তিনিও আমাদের যথাযথ পরামর্শ দিতেন এবং সেভাবে পরিচালিত করতেন। আমাদের বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই তখন শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীর কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছে। আমার তখনও আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষা হয়নি বটে, কিন্তু প্রেরণা ও উৎসাহ সর্বদাই মহাপুরুষজীর কাছ থেকে পেতাম বলে তার জন্য কোন অভাববোধ ছিল না। ১৯২৬ খ্রিঃ থেকে ভবানীপুর 'গদাধর আশ্রম' বেদবিদ্যালয়ের স্বামী কমলেশ্বরানন্দ আমাদের আশ্রমে প্রতি সপ্তাহে উপনিষদ্, গীতা ও ব্রহ্মসূত্রের ক্লাশ করতেন এবং আমরা অনেকেই তাঁর কাছে নিয়মিত শাস্ত্রাদি পড়াশুনা করতাম। তিনি আমাকে ও আমার বন্ধু সাধনকে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের কাছ থেকে দীক্ষা নেবার কথা বলতে লাগলেন। দীক্ষার কথা উত্থাপন করাতে মহাপুরুষজী বললেন, "তোমরা তো, বাবা, ঠাকুরের হয়েই আছ, আপনার লোক। তোমাদের আর ভাবনা কি?" ভাবলাম—সত্যিই তো তিনি আমাদের গুরু হয়েই আছেন।

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশনের ছাত্রসংখ্যা ক্রমশ বেড়ে যেতে এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যথাসময়ে অনুমোদন পাবার ফলে স্থান-সঙ্কুলান ব্যাপার নিয়ে বাড়ির সমস্যা উপস্থিত হয়। তখন আশ্রম-বাড়ির ঠাকুর-দালান ও বাইরের ঘরগুলি পর্যন্ত স্কুলের জন্য ব্যবহার করা ছাড়া উপায় ছিল না। ক্রমে প্রশ্ন দাঁড়াল—স্কুলটি ছেড়ে দিয়ে আশ্রমটি বজায় রাখা হবে, না আশ্রম ছেড়ে দিয়ে স্কুলটিকে বড় করা হবে? এমন অর্থ-সামর্থ্য নেই যে, দুটি পৃথক প্রতিষ্ঠানকেই সমানভাবে চালানো যায়। আমরা তো ভেবে অস্থির। অনন্যোপায় হয়ে অশরণ-শরণ পূজ্যপাদ মহাপুরুষজীর কাছে এসে আমি একান্তে সব নিবেদন করলাম। সন্ধ্যার সময় তিনি নিচে গঙ্গার দিকে পূর্বদিকের বারান্দায় লম্বা বেঞ্চটিতে একা বসেছিলেন। সব শুনে মহাপুরুষজী জিজ্ঞেস করলেন, "জ্ঞান কি বললে? সুধীর (স্বামী শুদ্ধানন্দ) কি বললে?" আমি বললাম যে, জ্ঞান মহারাজ আশ্রম-বাড়ি ছেড়ে দিতে একদম নারাজ, আমাদের ওপর ভীষণ রেগে গিয়েছেন; তাঁর বিশ্বাস আমরা ইচ্ছা ও চেষ্টা করলে একসঙ্গে সবই বজায় রাখতে পারি। আর সুধীর মহারাজকে জিজ্ঞেস করাতে তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, একান্ত অসুবিধা ঘটলে স্কুলটি ছেড়ে দিয়ে বরং আশ্রম-বাড়িটা রাখাই ভাল। শ্রীশ্রীমহাপুরুষজী চুপ করে সব শুনলেন, তারপর বললেন, "দেখ, বাবা, তোমরা থাকলে কত স্কুল হবে। আশ্রমটি বজায় রাখাই ভাল।" তিনি আমায় আশ্বাস দিয়ে বললেন, "আর একটু দেখ না, বাবা। একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।" আশ্চর্য ব্যাপার! অভাবনীয়ভাবে অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই খুরুট রোডের উপর স্কুলের উপযোগী একটি বড় বাড়ি সত্যসত্যই খালি হবার সম্ভাবনা হয়ে গেল এবং ২/৪ দিন পরে সেটি ভাড়া পাওয়া গেল—১০৭ নং খুরুট রোড এই ঠিকানায়। এটি শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীর শুভেচ্ছা ও তাঁর অশেষ কৃপার নিদর্শন।

এদিকে আর্থিক সমস্যার সমাধান করতে না পেরে বিশেষ বিব্রত ও উতলা হয়ে আমরা তখনকার মতো আশ্রম-বাড়িটি ছেড়ে দিয়ে স্কুলের জন্য সদ্য ভাড়া-করা বড় বাড়িটিরই একাংশে আশ্রমটিকে সরিয়ে নিয়ে এলাম। কারণ তখন অত বড় বাড়ির সব ঘরগুলি স্কুলের কাজের জন্য প্রয়োজন ছিল না। সে সময় স্কুল ও আশ্রম একই বাড়িতে থাকাতে মহাপুরুষজীকে আবদার করে ধরে বসলাম যে, তাঁকে খুরুটের ঐ স্কুলবাড়িতে নিয়ে যাব। মহাপুরুষজীও খুশি হয়ে যেতে রাজি হয়ে বললেন, "বেশ তো, তোমার সঙ্গে হেঁটেই যাব—তার আর কি?" আমি বললাম—"সে কি, মহারাজ! কি বলেন আপনি!" তিনি বললেন, "এখনও তো অত বুড়ো হইনি, বাবা, যে হেঁটে যেতে পারব না।" আনন্দে অধীর হয়ে তখনই নিচে গিয়ে জ্ঞান মহারাজকে বললাম যে, মহাপুরুষ মহারাজ স্কুলবাড়িতে যেতে

রাজি হয়েছেন। সেমতো দিন স্থির হওয়াতে শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ কৃষ্ণলাল মহারাজ ও জ্ঞান মহারাজকে সঙ্গে নিয়ে বেলুড় মঠ থেকে মোটরে সকালবেলা স্কুলবাড়িতে শুভ পদার্পণ করলেন। মহাপুরুষজী এখানে সারাদিন অবস্থান করে নানারকম কথাবার্তায় ও উপদেশদানে আমাদের সকলকে পরিতৃপ্ত করলেন এবং ঠাকুরঘর ও স্কুলের ঘরদোর সব দেখে সন্ধ্যার পূর্বে মঠে ফিরে যান। সেদিনই শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীকে দীক্ষাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "মহারাজ, আপনারা তো ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, যেখানে খুশি দীক্ষা দিতে পারেন।" উত্তর দিলেন—"হ্যাঁ, তা তো পারি বটে, তবে তোমাদের এখানে দেব না; কাল-পরশু মঠে যেও, মঠের ঠাকুর ঘরেই তোমাদের দীক্ষা দেব।" ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে মহাপুরুষজীর শুভাগমনে ও চরণ-ধূলিতে স্কুলবাড়িটি পবিত্র হয়ে গেল; আমরাও ধন্য হলাম।

মহাপুরুষজী স্কুল দর্শন করে এবং ঐ বাড়িতেই তখনকার মতো আমাদের কোনরকমে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে দেখে-শুনে চলে গেলেন বটে, কিন্তু তার কিছুদিন পরে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিজেই আমাদের পৃথকভাবে থাকবার সুবিধার জন্য একটি আশ্রম-বাড়ির ব্যবস্থা করলেন। এবার স্কুল-বাড়ি ও আশ্রম-বাড়ি আলাদা হয়ে গেল। স্কুলটি বড় রাস্তার ওপরে, আশ্রমটি নির্জন পরিবেশে। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে ভাড়া-নেওয়া বাগানবাড়ির সামনে একটি খোলা জায়গা কেনা হয়। তখন পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের শরীর খুব অসুস্থ, তাই তাঁর শ্রীহস্তস্পৃষ্ট চূণার ইষ্টকখানি বেলুড় মঠের শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্মাল্যসহ খোলা জায়গায় প্রোথিত করে আশ্রম-বাড়ির ভিত্তিস্থাপনকার্য মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা জয়যুক্ত হলো।....

* * *

বেলুড় মঠে পূজ্যপাদ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের পুণ্য জন্মতিথিপূজা; বিকালে পূর্বদিকে নিচের দালানে ভক্তগণ সমবেত হয়েছেন। পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমহাপুরুষজী স্বামী নির্বেদানন্দ প্রমুখ দু-একজনকে বাবুরাম মহারাজের কথা বলতে বললেন। সন্ধ্যার পর উপরে নিজের ঘরে বিছানায় বসে আছেন—ঘরটি নীল আলোয় বেশ স্নিগ্ধ ও ধূপের গন্ধে সুরভিত। মহাপুরুষজী আজ আনন্দে মশগুল। অনেকেই প্রণাম করতে গিয়েছেন। আমিও প্রণাম করে তাঁকে সেই সময় জিজ্ঞেস করলাম, "মহারাজ, তাহলে আমাদের দীক্ষা দেবেন কবে?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আর একজন কে?" আমি বললাম, "সে আমার পিসতুত ভাই সাধন, আপনি চেনেন তাকে। সে এখন এম. এ. পরীক্ষার জন্য বড্ড ব্যস্ত।" তিনি হাসতে হাসতে বললেন, "আরে, ঘরের গুরু, জুতো মারবে—মন্তর নেবে।" সকলেই আমরা ঘরসুদ্ধ হো হো করে হেসে অস্থির। তারপর একদিন সকালে আনুষ্ঠানিকভাবে বেলুড় মঠের ঠাকুরঘরে

আমাদের দু-জনকেই মন্ত্রদীক্ষা দিলেন—সেটা ১৯২৬ খ্রিঃ। গুরু-শিষ্য-সম্পর্ক একরকম আগে থেকেই হয়ে গিয়েছিল তাঁর সঙ্গে।...

১৯৩৩ খ্রিঃ একদিন সকালে আমাদের আশ্রম-কর্মী শ্রীপঙ্কজকুমার দাস নামে আমাদের স্কুলেরই একটি ছোট ছেলেকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছি তার দীক্ষার জন্য। মহাপুরুষজী তাঁর ঘরে খাটে বসে আছেন। বললাম, "মহারাজ, এই ছেলেটিকে এনেছি—ওকে দীক্ষা দিতে হবে।" ছেলেটিকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "কি কর, বাবা?" সে বলল, "আমি পড়ি।" মহাপুরুষজী বললেন, "Student-দের (ছাত্রদের) আমি বড় ভালবাসি; তা বাবা, তোমায় এখুনি দিয়ে দিচ্ছি।" আমি ঘরের বাইরে চলে যাচ্ছিলাম দেখে তিনি বললেন, "তোমাকে বাইরে যেতে হবে না, তোমার সামনেই দিয়ে দিচ্ছি।" দীক্ষার জন্য যা ফল মিষ্টি আনা হয়েছিল সেসব ঠাকুরঘরে আগেই দেওয়া হয়ে গিয়েছিল। তাই তার সঙ্গে আর কিছু নেই দেখে গুরুদক্ষিণার জন্য নিজেই পঙ্কজকে বললেন, "তুমি, বাবা, এই ফলটি নাও আর আমার হাতে দাও।" এত কৃপা, এত করুণা! এসব চোখে দেখেছি, শুনেছিও কত! এঁদের দ্বারাই এসব সম্ভব, তাই এঁরা মহাপুরুষ-জগদ্গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসহায়ক—যুগে যুগে পার্ষদরূপে আসেন ভগবানের সঙ্গে জীবকল্যাণের জন্য।...

শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজকে একবার আমরা সকলে মিলে ধরে বসলাম যে, আমাদের একান্ত ইচ্ছা তিনি আমাদের আশ্রমের সভাপতি থাকবেন। তিনি বললেন, "দেখি, বাবা, এদের একবার জিজ্ঞেস করি, এরা কি বলে।" স্বামী অমৃতেশ্বরানন্দ মঠ ও মিশন-সংক্রান্ত যাবতীয় প্রয়োজনীয় ও জটিল বিষয়ে তাঁকে পরামর্শ দিতেন; এজন্য তাঁর মত মহাপুরুষজী জেনে নিতে চাইলেন। মঠ বা মিশনের অনুমোদিত (affiliated) প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য কোন অননুমোদিত প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকা চলে না বলেই অধ্যক্ষ বা মঠাধীশের অন্য প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হবার অসুবিধা থাকে। আমরা প্রায় সকলেই মহাপুরুষ মহারাজের দীক্ষিত শিষ্য ও তাঁর বিশেষ স্নেহের পাত্র—একথা স্বামী অমৃতেশ্বরানন্দ খুব ভালভাবেই জানতেন। তাছাড়া তিনি স্বামী কমলেশ্বরানন্দের সঙ্গে আমাদের স্কুল ও আশ্রমে এসেছিলেন এবং আমাদের বিশেষ স্নেহ করতেন। তাই তিনি পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের ইচ্ছা জেনে সরাসরি মত দিলেন এবং আমাদের আশ্রমের সঙ্গে জড়িত থাকতে কোন আপত্তি করলেন না বরং আনন্দ প্রকাশ করলেন। আমরা মহাপুরুষজীকে আশ্রমের গভর্নিং বডির সভাপতিরূপে পেয়ে পরম আনন্দিত হলাম এবং তাঁকে আশ্বাস দিলাম—"আপনাকে সকল বিষয় জানিয়েই আমরা কাজ করব—আমরা আপনারই কৃপাপ্রাপ্ত ও অনুগত।" পরম সৌভাগ্যের কথা যে,

১৯২৮ খ্রিঃ থেকে ১৯৩৪ খ্রিঃ ২০ ফেব্রুয়ারি—শেষদিন পর্যন্ত পরম পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ আমাদের আশ্রমের সভাপতিরূপে আমাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন এবং তাঁর স্নেহ-ভালবাসা ও অমোঘ আশীর্বাদ আমাদের অফুরন্ত প্রেরণা ও শক্তি যোগাত। শ্রীগুরুর কৃপা আমাদের চলার পথে একমাত্র পাথেয় হলো।

* * *

বাগবাজার 'উদ্বোধন' মঠের বাড়িতে পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ দেহত্যাগ করেন। শেষকৃত্যের জন্য তাঁর দেহ বেলুড় মঠে আনা হয়। সেই সময় মহাপুরুষজী তাঁকে শেষদর্শন করতে যান। কথাপ্রসঙ্গে তাঁর ঘরে সমবেত ভক্তদের বলছেন, "চিতার কাছে শরৎ মহারাজকে দেখতে গিয়ে আর যেন নিজেকে সামলাতে পারি না। কেঁদে ফেলি আর কি! অনেক কষ্টে চেপে রেখে সামলালুম। চোখ দুটি দেখলুম, যোগাবস্থায় শরীর গেছে।"—এই রকম কথা বলতে লাগলেন। পূজ্যপাদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ লিখেছেন—'মহাপুরুষ মহারাজ অল্প কথা কহিতেন এবং খুব রাশভারী লোক ছিলেন।' যে সময় আমরা মহাপুরুষজীর সঙ্গে মেলামেশা করেছি তখন পূর্বের সে-ভাব বোধ হয় প্রায় চলেই গেছে। তা না হলে কেমন করে আমরা তাঁর সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে পারতাম ও কথাবার্তা কইতাম।

* * *

দেশের অবস্থা অনুযায়ী মহাপুরুষজীও নিজের ব্যবস্থা করতেন। চারদিকে যখন খদ্দরের প্রচলন শুরু হয়েছে তখন তাঁকেও খদ্দর পরতে দেখেছি এবং তিনি খদ্দরের জিনিস পছন্দ করতেন। এই সময় তাঁর দরকার হওয়ায় আমাদের একটু খদ্দরের থান কাপড় আনতে বলেন—তখন একটা পাতলা গোটা থান আমরা এনেছিলাম। আমরা তাঁর এই সামান্য সেবা করতে পেয়ে ধন্য হয়ে গেলাম। একবার মহাপুরুষজীর মন এত উচ্চস্তরে চলে গিয়েছিল যে, আর নিচে নামানো যায় না। মঠের সকলেই চিন্তাকুল হয়ে পড়েছেন। আমরা মঠে যেতেই জ্ঞান মহারাজ ও অন্য মহারাজরা আমাদের বললেন, "তোমরা এসেছ, ভালই হয়েছে। উপরে মহাপুরুষ মহারাজের কাছে যাও, তাঁর মনটাকে নামাও। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বল।" আমরা উপরে মহাপুরুষজীর কাছে যেতেই তিনি বলছেন, "আমি, বাবা, এখন ভূমার দিকে যাচ্ছি। তোমরা এখানে বসে কি করবে, নিচে জ্ঞানের কাছে যাও।" তবুও আমরা কিছুক্ষণ তাঁর কাছে বসে রইলাম যদি আমাদের সঙ্গে কথা বলেন।আমাদের তিনি এত ভালবাসেন, কিন্তু সেদিন আমাদের অগত্যা নেমে

আসতে হলো। আমাদের সঙ্গে কোন কথা বললেন না—তিনি নিজের ভাবেই রইলেন।...

মহাপুরুষ মহারাজ বলতেন, "ছেলেরা সব ঘরবাড়ি ছেড়ে পালায় কেন? তারা যা চায়, তা বাড়িতে পায় না বলে। বাড়িগুলোকে শান্তির স্থান করতে পারলে আর বাপ-মা ছেড়ে ধর্ম করতে সন্ন্যাসী হয়ে যেতে হয় না। বাড়ির সকলে মিলে একটা সময় করে পাঠ-আলোচনা করলে বাড়ির atmosphere (আবহাওয়া) অন্যরকম হয়ে দাঁড়ায়, তবে শান্তি আসে।"

* * *

একদিন বিকালে আমরা বেলুড় মঠে গেছি। ঠাকুরঘরে প্রণাম সেরে উপরে গিয়ে দেখি মহাপুরুষ মহারাজ মঠে নেই। শুনলাম তিনি রামকৃষ্ণপুরে গেছেন। তখনি তাঁর দরজায় প্রণাম করে আমরা নীরদ মহারাজের (স্বামী অম্বিকানন্দ) পূর্বাশ্রম রামকৃষ্ণপুরে চললাম। আগে খবরটি জানতে পেলে আমরা সেদিন হয়তো আর মঠে যেতাম না। নীরদ মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের পরম ভক্ত ৺নবগোপাল ঘোষের পুত্র। আমাদের বাড়ির কাছাকাছি হওয়ায় তাঁর কাছে যাতায়াত ছিল এবং সেই সূত্রে বিশেষ পরিচয় হয়েছিল। রামকৃষ্ণপুরের বাড়িতে এসে মহাপুরুষজীকে দেখতে পেয়ে খুব আনন্দ হলো। বললাম, "মহারাজ, আপনাকে মঠে দেখতে না পেয়ে এখানে চলে এসেছি।" তিনিও খুব খুশি হয়েছেন আমাদের দেখে। কথাপ্রসঙ্গে বলছেন, "দেখ বাবা, তোমাদের দ্বারা অনেক লোক-কল্যাণ হবে।" আমি তখুনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "মহারাজ, আপনি কি ঠিক বলছেন?" "হ্যাঁ, বাবা, আমাদের কথা কি আর মিথ্যা হয়! দেখবে।"

* * *

সত্যই দেখেছি যে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের দেহত্যাগের কয়েক বছর পরে আরও দুটি পৃথক্ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল। একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান—শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির, ১৩।১ শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির পথ, উত্তর ব্যাঁটরা, হাওড়া আর একটি স্বতন্ত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান—শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষালয়, ১০৬ নরসিংহ দত্ত রোড, হাওড়া। এ দুয়ের মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান মাইল দেড়েক। দুটি প্রতিষ্ঠানই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারায় পুষ্ট হতে লাগল।

* * *

১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার, অপরাহ্ণ ৫-৩৬ মিনিটের সময় বেলুড় মঠে পরম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ আশি বৎসর বয়সে মহাসমাধি

লাভ করেন। তখন তাঁর প্রকোষ্ঠের কাছে আমরা সকলেই উপস্থিত। বহু ভক্ত শেষ-দর্শনের আশায় চারদিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছেন। শেষ সময় পর্যন্ত আমরা শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণপ্রান্তে থাকতে পেরে চিরকৃতার্থ হয়ে গেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ, মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ ও স্বামী সুবোধানন্দ মহারাজগণের দর্শন ও সঙ্গলাভ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ কৃপালাভ বলে মনে করি। তাঁরা শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ ও লীলাসহায়ক এবং তাঁর থেকে অভিন্ন। তাঁদের পবিত্র চরণ-স্পর্শে জীবন ধন্য হয়ে গেছে। তাঁদের কথা স্মরণ করে প্রতিক্ষণ হৃষ্ট হচ্ছি। তাই গীতার (১৮/৭৭) কথায় আবার বলতে ইচ্ছা হয়—

"তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥"

শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের অনুধ্যান

শ্রীগৌরীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদ ও লীলাসহচর পরম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের পুণ্যস্মৃতি লেখার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করছি। মহাপুরুষ মহারাজের দিব্যজীবন-মহিমা, তাঁর অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তি, সাধনা ও সিদ্ধির কথা আমাদের ধ্যানের বস্তু, ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। মহাপুরুষ মহারাজ তাঁর দেহ-মন-প্রাণ শ্রীশ্রীঠাকুরকে সম্পূর্ণরূপে অর্পণ করে ঠাকুরময় হয়ে গিয়েছিলেন। তাই তাঁর পুণ্যদর্শন আর সাক্ষাৎ ঈশ্বরদর্শনে একই ফল—এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এখন বেশ বুঝতে পারছি বহু জন্মের ত্যাগ-তপস্যা-সাধন-ভজনলব্ধ সুকৃতি না থাকলে মহাপুরুষ মহারাজের পুণ্য-সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য লাভ করা যায় না। সেই জীব-দুঃখে কাতর, অহৈতুককৃপাসিন্ধু মহাপুরুষজীকে দর্শন করার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে, তাঁরাই ধন্য। তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁর অপার করুণা ও স্নেহ-ভালবাসায় আপ্লুত হয়ে নিজ নিজ সাধনপথে অগ্রসর হচ্ছেন। তাই যখন তাঁর দিব্যস্মৃতি অনুধ্যান করি তখন মন-প্রাণ যেন এক স্বর্গীয় মহিমায় ও আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজকে প্রথম দর্শন করি ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান যুগের

পুণ্যপীঠ বেলুড় মঠে। তখন আমার বয়স ১৬। ১৭ বৎসর মাত্র। সেই দিনটি আমার জীবনে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে এবং সেদিন থেকেই আমার 'সফল জীবন' শুরু হলো।

শুনেছি শুদ্ধ, বুদ্ধ, আত্মস্বরূপ মহাপুরুষের সঙ্গলাভ জীবনে এক দুর্লভ জিনিস। কিন্তু এজন্য আমাকে বিশেষ চেষ্টা করতে হয়নি। ঠাকুরের অপার করুণায় অতি সহজেই মহাপুরুষ মহারাজের পাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করেছিলাম। এত শৈশবে আমি পিতৃহীন হই যে, আমার পিতার কোন স্মৃতিই আমার মনে ছিল না, কিন্তু ঠাকুর আমাকে এমন স্নেহময় পিতার কাছে আসার সুযোগ করে দিলেন, যাঁকে দর্শন করা মাত্র আমার পরম প্রিয় আপনার-জন বলে মনে হলো। আমার ইহকাল-পরকালের পরম পিতা লাভ হলো।

এই প্রসঙ্গে বেলুড় মঠে মহাপুরুষ মহারাজের পুণ্য সান্নিধ্যে আসার পেছনে যে কার্যকারণ আমাকে সাহায্য করেছিল তা এখানে একটু উল্লেখ করি। আমি তখন Bengal Veterinary College (বঙ্গ পশুচিকিৎসা কলেজ)-এর ছাত্র। আমাদের কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ রায়সাহেব দিবাকর দে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী সারদাদেবীর আশ্রিত ও বেলুড় মঠের একনিষ্ঠ ভক্ত। তিনিই তখনকার দিনে বেলুড় মঠের গোশালার গরু-বাছুরের চিকিৎসা করতেন। বিলাত থেকে ফিরে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। প্রয়োজনমতো তিনি আর বেলুড় মঠে যেতে পারতেন না। মঠ থেকে গরুবাছুরের অসুখের খবর এলে, তিনি আমাকেই মঠে পাঠাতেন। আমি দেখে এসে তাঁকে সমস্ত বিষয় জানাতাম। তিনি সেইমতো ঔষধ-পত্রের ব্যবস্থাদি করে দিতেন। আমি আবার সেসব ঔষধ মঠে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসতাম। এভাবে আমি প্রথম বেলুড় মঠের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পেলাম। নিয়মিত বেলুড় মঠে যাতায়াতের ফলে প্রবীণ সাধুদের বিশেষ স্নেহভাজন হলাম। মঠে তখন শ্রীশ্রীমহাপুরুষজী অবস্থান করছেন; কিন্তু সেই ব্রহ্মতেজোময়, ধ্যানগম্ভীর, রাশভারী মহাপুরুষের ত্রিসীমানার মধ্যে ঢুকবার সাহস আমার মতো সামান্য যুবকের হতো না।

একদিন সন্ধ্যায় আরতির সময় স্বামীজীর ঘরের দরজায় প্রণাম করতে গেছি দেখি মহাপুরুষজী আত্মভোলা হয়ে হাতজোড় করে তাঁর ঘরের পূর্বদিকের বারান্দায় পাদচারণ করছেন এবং মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের উদ্দেশে নমস্কার করছেন। তিনি ভাবে বিভোর—বহির্জগতের সঙ্গে যেন কোনও সম্পর্ক নেই। আমি সেদিকে আর বেশিক্ষণ না তাকিয়ে স্বামীজীর উদ্দেশে তাঁর ঘরের দরজায় মস্তক নত করে প্রণাম করছি, এমন সময় মহাপুরুষজী তাঁর সেবকদের ডাকাডাকি করছেন শুনতে পেলাম। তখন ঠাকুরের আরতি হচ্ছিল, সেবকরা তখন আরতির জন্য

মন্দিরে গিয়েছিলেন। আমি তখনও স্বামীজীর দরজায় প্রণাম করছি। আমার প্রথমে ভয় হলো, মনে করলাম আমাকে এ সময় প্রণাম করতে দেখে মহাপুরুষজী বোধ হয় বিরক্ত হয়েছেন। ভীত মনে উঠে দেখি, মহাপুরুষ মহারাজ যখন ভাবস্থ ছিলেন সে সময় একটি মহিলা উপরে উঠে এসে তাঁকে প্রণাম করায় তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। মহিলাটি সম্ভবত জানতেন না যে, ঐ রকম ভাবাবস্থায় মহাপুরুষ মহারাজের পাদস্পর্শ করা উচিত হয়নি। সেবকেরা এলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন কেন এ সময়ে এই মহিলাটিকে এখানে আসতে দেয়া হয়েছে। এ কথা শুনে মহিলাটি নিচে চলে গেলেন। আমিও ভয়ে চুপিচুপি নিচে চলে এলাম।

এই ঘটনার কয়েকদিন পর সকালবেলা একটি অসুস্থ গরুকে দেখবার জন্য আমার মঠে ডাক পড়েছে। গরুটির যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করে স্বামীজীর ঘরে প্রণাম করতে যাবার পথে দেখি তিন-চারজন প্রবীণ সাধু সিঁড়ির পাশের বড় ঘরে বসে আছেন। বলাবাহুল্য পূর্ব থেকেই আমি তাঁদের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলাম। তাঁরা আমাকে দেখে খুব খুশি হয়ে বললেন—"আজ বেশ ভাল সময়ে এসেছ, বেশ হয়েছে। যাও, ঐ সামনের ঘরে মহাপুরুষ মহারাজ বসে আছেন, তাঁর কাছে গিয়ে প্রার্থনা জানাও যাতে তিনি কৃপা করে তোমাকে তাঁর পাদপদ্মে আশ্রয় দেন।" আমি প্রস্তুতও ছিলাম না আর দীক্ষা কি জিনিস তাও বুঝতাম না। আমি তাঁদের বিনীতভাবে বললাম, "মহাপুরুষ মহারাজের কাছে যেতে আমার ভয় হয়।" তবু তাঁরা মহাপুরুষ মহারাজের কাছে যাবার জন্য এত পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন যে, আমি তখন তাঁদের বললাম, "আমার দীক্ষাগ্রহণ সম্বন্ধে আপনাদের যখন এত আগ্রহ তখন আপনারাই বরং আমার হয়ে আমার দীক্ষার জন্য মহাপুরুষজীর কাছে প্রস্তাব করুন। তিনি যদি কৃপা করে আমাকে দীক্ষা দিতে সম্মত হন তখন আমি তাঁর শ্রীচরণসমীপে যাব।" প্রবীণ সাধুগণ তখন বললেন যে, মন্ত্রদীক্ষার জন্য নিজেকেই গুরুর কাছে প্রার্থনা জানাতে হয়। তখন আমি একরকম নিরুপায় হয়ে শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীর পদপ্রান্তে যাবার জন্য ভয়ে ভয়ে অগ্রসর হলাম।

মহাপুরুষজীর ঘরে ঢুকতেই অনুভব করলাম ঘরটি যেন অগাধ শান্তিতে পরিপূর্ণ, দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে এক অনির্বচনীয় ধ্যান-গম্ভীর ভাব ধারণ করেছে আর নানা ফুল ও ধূপের গন্ধে আমোদিত হয়ে দিব্যভাবে জমজমাট হয়ে আছে। মন আপনা থেকেই যেন ধ্যানস্থ হয়ে আসে। সামনের পালঙ্কে মহাপুরুষজী যোগাসনে প্রসন্ন ও প্রশান্ত মনে যেন এক জ্যোতির্ময় রূপ ধারণ করে সমাসীন। সুবিশাল, সুঠাম, সোনারবরণ দেহ, দিব্য মুখমণ্ডল করুণা ও প্রেমভরা; সর্বশরীর যেন একটা অপার্থিব মাধুর্যে পরিপূর্ণ হয়ে জীব-উদ্ধারের জন্য সকাতরে বসে

আছেন। সত্যই তাঁর গুরুভ্রাতৃগণ শিবের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ তাঁর মধ্যে দেখেছিলেন। অপলক নেত্রে তাঁকে দর্শন করে আমার মনে হলো ঐ প্রবীণ সাধুগণ আমার কত হিতাকাঙ্ক্ষী। তাঁদের কাছ থেকে উৎসাহ ও প্রেরণা না পেলে আমার তো এই মহাপুরুষ-দর্শনের সৌভাগ্য হতো না। নিজের অজ্ঞতার জন্য এই দেবদুর্লভ জিনিস কিভাবে আমি হারাতে বসেছিলাম! একথা ভেবে নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলাম।

মহাপুরুষজী অন্তর্দ্রষ্টা পুরুষ—তাঁর কাছে আসার পূর্বে পাশের ঘরে প্রবীণ সাধুদের সঙ্গে আমার দীক্ষার বিষয়ে যে আলাপ-আলোচনা হয়েছিল, তিনি যেন সবই জানতে পেরেছেন। তাঁর শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে দাঁড়াতেই তিনি আমাকে অতি স্নেহভরে বহুকালের পরিচিতের মতো নিকটে বসতে বলে আমার নাম ধাম প্রভৃতি জিজ্ঞেস করলেন। আমার মনে হলো তিনি যেন আমাকে কৃপা করার জন্য পূর্ব থেকেই অপেক্ষা করে বসে আছেন। আমি যখন নতজানু হয়ে করজোড়ে দীক্ষার জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা জানালাম, তখন তিনি আনন্দে হেসে বললেন—"বেশ বাবা, বেশ! ২।৩ দিন পরে স্নানযাত্রা, পুণ্যদিন। ঐ শুভ দিনে রানী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে মা-ভবতারিণীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তুমি ঐ দিন সকালে এসো, তোমারও দীক্ষা হবে।" মহাপুরুষজীর প্রাণখোলা হাসিতে আমার যত দুর্বলতা, ভয়, ভাবনা সব দূর হয়ে গেল। আমাকে তিনি আপনার করে নিলেন। আমিও এক অনির্বচনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেলাম। আমার মতো একজন অতি সামান্য যুবকের প্রতিও তাঁর এত কৃপা দেখে প্রেমাশ্রুতে আমার চোখ ভরে গেল। সেদিন সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে চলে এলাম।

নির্ধারিত দীক্ষার দিন গঙ্গাস্নান সেরে ঠাকুরঘরে শ্রীঠাকুরপ্রণামান্তে মহাপুরুষ মহারাজের কক্ষে এলাম। আমার দীক্ষা তাঁর ঘরেই হয়েছিল। দীক্ষা দেবার সময় তিনি যেমন ভাবস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর মধ্যে এমন এক ঈশ্বরীয় ভাবের বিশেষ প্রকাশ দেখলাম যা স্মরণ করলে এখনও আমার রোমাঞ্চ হয়। গুরুদেব যখন আমাকে ইষ্টমন্ত্র দিলেন তখন আমার মনে হলো তিনি যেন আমার সমস্ত মনটাকে সম্পূর্ণরূপে হরণ করে নিয়ে তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি আমার প্রাণে অনুপ্রবিষ্ট করে দিলেন। পরে কিভাবে ধ্যান জপ করতে হয় সেসব তিনি অতি সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে দিলেন। গুরুদেবের শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে তিনি বললেন—"দেখ, বাবা! আমার কাছে যারা আসে আমি তাদের শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে সমর্পণ করে দিই। শ্রীশ্রীঠাকুরই তাদের ভার গ্রহণ করেন। আমি তো, বাবা, কারোর গুরু নই।" এবং তিনি এই উপদেশ দিলেন—"প্রথমে গায়ত্রী সেরে

ইষ্টমন্ত্রের জপ ও ধ্যানাদির পর শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে সতত কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করবে ঃ 'ঠাকুর, আমি বিদ্যাহীন, বুদ্ধিহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন, বিশ্বাসহীন, সহায়-সম্বলহীন, ভজনপূজনহীন। তুমি ভূভারহারী, পতিত-পাবন, অনাথশরণ, কপালমোচন, দুর্বলের বল। তুমি কৃপা করে আমার হৃদয়-পদ্মাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে তোমার পাদপদ্মে আমার প্রেম ভক্তি বিশ্বাস অনুরাগ ও নির্ভরতা দৃঢ় হতে দৃঢ়তর করে দাও।' ঠাকুরকে এইভাবে ধরে থাকলে ভক্তি মুক্তি সবই হয়ে যাবে।" এসব কথা বলতে বলতে তাঁর মুখমণ্ডল এক অপূর্ব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

* * *

মহাপুরুষ মহারাজ মঠের সমস্ত খুঁটিনাটি—সব বিষয়েরই খবর রাখতেন। মঠের গোশালার গরুগুলি তাঁর খুব প্রিয় ছিল। গোশালার গরুবাছুরের তত্ত্বাবধান, তারা কি খায় না খায়, কোন্ গাই বাচ্চা দিয়েছে, কতটা দুধ হচ্ছে—প্রত্যেকটি খবর তাঁকে জানানো হতো। গরুদের অসুখ-বিসুখের খবরে তিনি খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তেন। তিনি তখন বলতেন—"গৌরীশঙ্করকে এখনই ডেকে পাঠাও।" একদিন আমি তাঁর কাছে যেতে আমাকে বললেন—"দেখ গৌরীশঙ্কর, তুমি মঠের গরুদের সেবা কর, এতে তোমার ঠাকুরেরই সেবা করা হচ্ছে। এ মঠ ঠাকুরের। গরুবাছুর, বাগান-বাগিচা, গাছপালা এখানে যা কিছু দেখ সবই ঠাকুরের।" সেদিন গরুদের সেবার জন্য তিনি আমার উপর এত খুশি হয়েছিলেন যে, তৎক্ষণাৎ তাঁর সেবককে—ধুতি, ব্যবহৃত উলের পুরোহাতা গেঞ্জি, ভায়েলার গরম পাঞ্জাবি, গরদের চাদর প্রভৃতি আমাকে দেবার জন্য আদেশ দিলেন। আমার মতো সামান্য লোকের উপর তাঁর অপার স্নেহ-ভালবাসার পরিচয় পেয়ে আমি আনন্দে অভিভূত হয়ে গেলাম। তাঁর আশীর্বাদজড়িত পুণ্য স্মৃতিটুকুই আজ আমার পূজার সামগ্রী।

মহাপুরুষজীর তিনটি প্রিয় কুকুর ছিল—কেলো, ভুলো ও লালু। তাদেরও বা কত যত্ন-আত্তি দেখেছি! কুকুর তিনটিও মহাপুরুষ মহারাজগত-প্রাণ ছিল, তাঁকে দেখতে পেলে কুকুররা আনন্দে তাঁর চরণে লুটোপুটি করত। আমার মনে হতো আমিও যদি এদের মতো মহারাজের পাদপদ্মে শরণাগত হয়ে পড়ে থাকতে পারতাম তাহলে ধন্য হয়ে যেতাম। একদিনের ঘটনা—কেলোর খুব অসুখ করেছে। মহাপুরুষ মহারাজ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। ওদের চিকিৎসার ভার তিনি আমার উপরেই দিয়েছিলেন। খবর পাওয়া মাত্র আমি মঠে চলে গেলাম। যখন মঠে পৌঁছলাম তখন বেলা প্রায় ১টা। মঠের সাধুরা খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করতে চলে গেছেন। অসময়ে তাঁদের বিরক্তি-উৎপাদনের ভয়ে মহাপুরুষজীর সেবকদের কারোও সঙ্গে দেখা না করে আমি অভ্যাগত-কক্ষে (Visitors' Room) গিয়ে অপেক্ষা করতে

লাগলাম। ভাবলাম তাঁরা বেলা ৩টার পরে যখন নামবেন সে সময় গিয়ে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। এদিকে মহাপুরুষ মহারাজ আমি মঠে এসে পৌঁছেছি কি না জানবার জন্য জনৈক সেবককে খোঁজ নিতে পাঠিয়েছেন। আমি যে অভ্যাগতদের কক্ষে চুপচাপ বসে আছি সেবক মহারাজ তো তা জানতেন না, তিনি মঠের অন্য সব জায়গায় আমাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে না পেয়ে মহাপুরুষজীকে গিয়ে জানালেন, "গৌরীশঙ্কর এখনও সম্ভবত মঠে এসে পৌঁছায়নি, কারণ তাকে কোথাও খুঁজে পেলাম না।" মহাপুরুষ মহারাজ কিন্তু নিশ্চিতভাবে জেনেছেন যে, আমি যথাসময়ে মঠে এসে পৌঁছেছি। তাই তিনি সেবককে পুনরায় আমার খোঁজ করে ডেকে আনতে বললেন। এভাবে বেলা ৩টা / ৩॥ টা পর্যন্ত বার বার খোঁজাখুঁজি চলতে লাগল, কিন্তু তিনি আমাকে দেখতে পেলেন না। এরপর বিকালের দিকে আমি যখন অভ্যাগতদের কক্ষ থেকে বেরিয়ে মহাপুরুষজীর কাছে যাবার জন্য আসছি তখন সেবকের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল। আমাকে দেখতে পেয়ে তিনি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তিনি আমায় বললেন, "তুমি এসেছ কিনা জানবার জন্য মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে বার বার তোমার খোঁজ নিতে পাঠাচ্ছেন। তুমি কখন এসেছো আর এতক্ষণ ছিলে কোথায়?" আমি তাঁকে সব বুঝিয়ে বললাম। তিনি বললেন—"এই দারুণ রোদে সমস্ত দুপুরবেলা তোমাকে গরু-খোঁজার মতো খোঁজ করেছি। চলো, এখন মহাপুরুষ মহারাজের কাছে।"

মহাপুরুষ মহারাজের কাছে পৌঁছে তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলাম। তিনি সব শুনে বললেন, "আমি তো আগেই বলেছি, গৌরীশঙ্কর খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক সময়েই মঠে এসে গিয়েছে।" তখনও আমার খাওয়া হয়নি শুনে তিনি আমায় প্রসাদ দিতে তাঁর সেবককে বললেন। আমাকে প্রচুর প্রসাদ দেওয়া হলো। প্রসাদ গ্রহণ করে কুকুরটিকে পরীক্ষা করে যথাবিহিত চিকিৎসার ব্যবস্থা করলাম। মহাপুরুষজীর এই রকম প্রাণঢালা স্নেহ-ভালবাসায় আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেতাম।

* * *

মহাপুরুষ মহারাজকে দর্শন করতে গেলে তাঁর প্রথম প্রশ্ন ছিল—মন্দিরে ঠাকুরকে দর্শন করেছি কিনা। যদি তিনি শুনতেন যে, আগে ঠাকুরকে দর্শন না করে কেউ তাঁর কাছে এসেছে তাহলে তিনি খুবই অসন্তুষ্ট হতেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, শ্রীশ্রীঠাকুর সপার্ষদ মঠে সাক্ষাৎ বিরাজ করছেন—তিনি ঠাকুরকে সাক্ষাৎ দর্শন করতেন। তিনি বলতেন, "ঠাকুর আমাদের জ্বলন্ত জীবন্ত জাগ্রত যুগাবতার। পূর্ণব্রহ্মনারায়ণ জীবোদ্ধারের জন্য নরকলেবর ধারণ করে এসেছেন।" তিনি

বলতেন—"যাও, শ্রীশ্রীঠাকুর মন্দিরে জীবন্ত বসে আছেন, তাঁর কাছে ভক্তি মুক্তি জ্ঞান বিবেক বৈরাগ্য—ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ যা চাইবে তা-ই পাবে।" তিনি মনে প্রাণে জানতেন যে, তাঁর আশ্রিতেরা যদি কোনরূপে ঠাকুরের সঙ্গে একটি প্রাণের সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে তাহলে তাদের মুক্তি অনিবার্য।

একদিন সকালে মহাপুরুষজীকে দর্শন করতে যেতে তিনি আমার সমস্ত খোঁজ-খবর জিজ্ঞেস করলেন। আমি তাঁকে যখন বললাম, "বাবা! ঠাকুরের কৃপায় আমার কোনও অভাব-অনটন নেই, উপরন্তু চাকরির ক্ষেত্রে কিছুদিন হলো আমার পদোন্নতি হয়েছে—বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে ও আনন্দে আছি।" তিনি সব শুনে খুব আনন্দিত হলেন এবং বললেন, "চাকরি-বাকরি জীবনে সব কিছু নয়, কাজকর্ম যেমন মনোনিবেশের সঙ্গে করে থাক তেমনি জপ-ধ্যান ঠাকুরের স্মরণ-মনন তাঁর চেয়ে বেশি নিষ্ঠার সঙ্গে অন্তর দিয়ে করে যাবে।" মহাপুরুষজী আরও বললেন, "অর্থ ঐশ্বর্য সবই অনিত্য—আজ আছে, কাল নেই, কিন্তু সাধন-ভজন ত্যাগ তপস্যা দ্বারা লব্ধ যে পুণ্যফল সেটাই তোমার জীবনের প্রকৃত মূলধন জানবে।" মহাপুরুষজী যখন ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করতেন অথবা তাঁর আশ্রিতদের উপদেশ দিতেন তখন বেশ মনে হতো তাঁর মন যেন সেই আদি-অন্তহীন অখণ্ড সচ্চিদানন্দরূপ শ্রীরামকৃষ্ণে বিলীন হয়ে যেত। তাঁর সেই দেবভাব দেখবার জিনিস—ধ্যানের বস্তু, তা ভাষায় বা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না।

* * *

বহু জন্মের সাধন-ভজন ও তপস্যা দ্বারা পুণ্যফল লাভ করা সত্ত্বেও প্রারব্ধ কর্মফল কিংবা সংসারের প্রভাব থেকে যখন নিজেকে রক্ষা করা যায় না, তখন মহাপুরুষজীকে দর্শন করা মাত্র তাঁর অপার কৃপা-প্রভাবে অপবিত্র মন, অপবিত্র শরীর কিভাবে পবিত্র হয়ে যায়, তার বহু দৃষ্টান্ত থেকে আমি মাত্র একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করব।

সেদিন বেলুড় মঠ থেকে আমার ডাক এসেছে—মহাপুরুষ মহারাজের কুকুরের অসুখ, আমাকে তক্ষুনি মঠে যেতে হবে। তখন ঐ অসময়ে মঠে যাবার যানবাহনের কোন সুবিধা করতে পারছি না, এমন সময় আমার পরিচিত একটি যুবক তার নূতন মোটরগাড়ি নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে হাসপাতালে এল। তার গাড়ি করে বেলুড় মঠে যাবার প্রস্তাব করতেই সে আনন্দে বেলুড় মঠে যেতে স্বীকৃত হলো। যুবকটিকে আমি পূর্ব থেকেই চিনতাম। সে খুব বড়লোকের ছেলে। দুর্ভাগ্যক্রমে তার নৈতিক অধঃপতন ঘটে যায়। এমন অন্যায় কাজ ছিল না যা সে এই বয়সে করেনি। এমন লোকের সাহায্য নিয়ে তাঁর সঙ্গে একত্র মঠে যেতেও

সাহস হয় না। কিন্তু দেখলাম তারও মঠ-দর্শনের আগ্রহ আছে, আর আমারও তাড়াতাড়ি মঠে যাওয়া প্রয়োজন, এইসব ভেবে তার গাড়িতেই মঠে যেতে সংকল্প করলাম। মঠে গিয়ে যথাসময়ে কুকুরটিকে পরীক্ষা করে চিকিৎসাদির ব্যবস্থা সেরে যখন মহাপুরুষজীকে দর্শন করবার জন্য উপরে যাবার উপক্রম করছি, তখন যুবকটি আমাকে অনুরোধ জানাল যে, সেও আমার সঙ্গে মহাপুরুষ মহারাজকে দর্শন করতে যেতে চায়। আমার ভয় হলো—এমন লোককে কি সঙ্গে নিয়ে মহাপুরুষ মহারাজের কাছে যাওয়া উচিত হবে! আবার চিন্তা করলাম—ওর গাড়ি করে এসেছি, ওকে ফেলে যাওয়াই কি ঠিক হবে! এই রকম দ্বিধাগ্রস্ত মনে তাকে সঙ্গে নিয়েই মহাপুরুষ মহারাজের কাছে উপস্থিত হলাম। ঘরে ঢুকতেই ঐ যুবকটির উপর শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীর নজর পড়ল, আর সেও মহাপুরুষ মহারাজকে দর্শন করা মাত্র যেন দেব-দর্শনানন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। যতক্ষণ সে ঘরে ছিল অপলকনয়নে মহাপুরুষ মহারাজের শ্রীমুখপানে আবিষ্টের মতো তাকিয়ে রইল এবং আনন্দে ভাবাবেগে তার দুই চোখ দিয়ে দর দর করে জল পড়তে লাগল। আমাদের প্রসাদ দিতে মহাপুরুষ মহারাজ তাঁর সেবককে বললেন। আমরা মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করে প্রসাদ নিয়ে নিচে চলে এলাম। বন্ধুটি কেমন যেন আনমনা হয়ে গেল।

ফিরবার পথে যুবকটির অনুরোধে Industrial School (শিল্প-বিদ্যালয়)-এর Show -Room (প্রদর্শনী-কক্ষ) থেকে তাকে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের তিনখানি বড় প্রতিকৃতি কিনে দিলাম। সে ঐ তিনখানি প্রতিকৃতি সযত্নে মহানন্দে তার বাড়িতে নিয়ে গেল এবং সেই তিনখানি প্রতিকৃতি সিংহাসনে স্থাপন করে নিত্যপূজা ও নিয়মিত জপ-ধ্যানাদি আরম্ভ করে দিল। যতদিন সে জীবিত ছিল একদিনও তাকে আমি নিত্য-পূজা ও জপধ্যানাদি থেকে বিরত হতে দেখিনি। এর কয়েক বছরের মধ্যে তার স্ত্রী পুত্র কন্যা সব মারা গেল, কিন্তু মহাপুরুষজীকে দর্শন করার ফলে সে এমন এক অপার্থিব শক্তি লাভ করেছিল যাতে এই সব প্রিয়জনের মৃত্যুর জন্য কোনদিন তাকে শোকসন্তপ্ত হতে দেখিনি। স্ত্রী-পুত্রাদি মারা যাবার পর যুবকটি অধিকাংশ সময় পুরীতে বাস করত। শুনেছি এক সময় যেদিন তার পুরী থেকে কলকাতায় ফিরে আসার কথা তার আগের দিন হঠাৎ দেখা গেল দুপুরবেলা মহাপুরুষ মহারাজের একখানা বড় প্রতিকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে অজস্র ধারায় কাঁদছে আর করজোড়ে মহাপুরুষজীর কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে ঃ "মহারাজ! জীবনে জ্ঞানে অজ্ঞানে কত পাপ, কত অন্যায় কাজ করেছি। হে দীননাথ! হে পতিতপাবন, হে কলুষনাশন, হে অনাশ্রয়ের আশ্রয়, তুমি যদি কৃপা করে আমার সমস্ত পাপতাপ নিজগুণে ক্ষমা করে আমাকে মুক্ত না কর—তোমার অভয় পদে আশ্রয় না দাও তাহলে আমি আর দাঁড়াব কোথায়! কে আমাকে রক্ষা করবে!"

মহাপুরুষ মহারাজের প্রতিকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে মহাপুরুষজীকে সে প্রথম বেলুড় মঠে যেমন দর্শন করেছিল, ঠিক সেই প্রত্যক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে মহাপুরুষ মহারাজের কাছে কাতরভাবে তাঁর প্রার্থনা জানাতে লাগল আর তার দুই চোখ দিয়ে দরদর ধারে অশ্রু বয়ে যেতে লাগল। পাশের ঘরে একমাত্র ভাগিনেয় তাকে দেখাশোনা করার জন্য তার সঙ্গে থাকত। ভাগিনেয় শুনতে পাচ্ছিল মামা যেন কার সঙ্গে কথা বলছেন অথচ ঐ বাড়িতে অপর কেউ নেই, তাই কি হচ্ছে দেখার জন্য ঐ ঘরে এসে দেখে যে, মামা একেবারে নিষ্পন্দ অবস্থায় মহাপুরুষ মহারাজের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে কি যেন বলছেন! ভাগিনেয়কে ঘরে প্রবেশ করতে দেখেই মামা তাকে বলল, "আমাকে ছুঁসনি, দেখছিস না মহাপুরুষ মহারাজ আমার সামনে দাঁড়িয়ে!" এ রকম কিছুক্ষণ চলার পর সে কিছুটা প্রকৃতিস্থ হয়ে অল্প সময়ের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল।

বিকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে সে তার ভাগিনেয়কে বলল, "কাল তো আমাদের কলকাতায় যাবার সব ঠিক হয়ে আছে, আজ চলো একবার সমুদ্রদর্শন ও স্নান করে আসি।" সমুদ্রের ধারে গিয়ে সমুদ্রে স্নান করার জন্য বালুর চরে যেই নেমেছে অমনি একটা বিরাট ঢেউ এসে নিমেষের মধ্যে তাকে বহুদূরে ভাসিয়ে নিয়ে গেল এবং কিছুক্ষণ পরে আর একটি ঢেউ তার মৃতদেহ সমুদ্রের কিনারায় বালুচরে ফিরিয়ে দিয়ে গেল। এভাবে মহাপুরুষ মহারাজ যুবকটির সমস্ত পাপ-তাপ দুর্বলতা ধুয়ে মুছে মুক্ত করে তাকে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে চির-আশ্রয় দিলেন। তার উদ্ধার হলো, সে চিরশান্তি লাভ করল। ভাগিনেয়ের কাছে সব ঘটনাটি শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

সমাজ-জীবনে যাদের আমরা ঘৃণ্য পতিত বলে অবজ্ঞা করি, তাদের প্রতিও মহাপুরুষজীর কত করুণা, অনুকম্পা ও সহানুভূতি ছিল! ঐসব কথা শুধু স্মরণ-মনন করলেও আমাদের প্রভূত কল্যাণ হয়।

* * *

পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের পুণ্যসান্নিধ্যে আসার পর আমার আনন্দ উৎসাহ ও উদ্দীপনার অন্ত ছিল না, আমি মুক্ত বিহঙ্গের মতো সদানন্দে বেড়াতাম। তখন কি ভেবেছিলাম যে সংসারবন্ধনে আমাকে কোনও দিন আবদ্ধ হতে হবে। কিন্তু অদৃষ্টের লিখন—যা না ঘটবার তা-ই ঘটল। ঘটনাচক্রে ৫/৬ বৎসর পরে আমাকে বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হতে হলো। এজন্য আমার মানসিক অশান্তি ও চিন্তা-ভাবনার অন্ত ছিল না। লজ্জা ও ঘৃণায় মহাপুরুষজীর সামনে উপস্থিত হতেও সাহস হতো না। অথচ তাঁকে না দেখেও থাকতে পারি না। এ রকম দ্বিধা-ভয়-ভাবনা-ভারাক্রান্ত

মন নিয়ে মহাপুরুষজীর সন্দর্শনে একদিন বেলুড় মঠে উপস্থিত হলাম। মহাপুরুষজীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে উঠে বসতেই আমার বিষণ্ণ মুখ দেখে আমার মনের ব্যথা তাঁকে কিছু জানাবার পূর্বে তিনি স্বতই যেন সব বুঝতে পারলেন এবং সস্নেহে আমাকে বললেন, "বিয়ে করেছো—তাতে হয়েছে কি? তোমাদের সংসারে মা, বোন, মাসি, পিসি, ভাগনি, ভাইঝি অন্য আরও সব তো অনেক আত্মীয়-স্বজন আছে, তাদের সঙ্গে যেমন মেলামেশা কর, তাদের সঙ্গে যেমন ব্যবহার কর, তাদের প্রতি যেমন কর্তব্য পালন কর, তোমার স্ত্রীকে পৃথক না দেখে তাদেরই একজন ভেবে তার সঙ্গে সেভাবেই ব্যবহার করবে। ঠাকুরের কৃপায় তোমার এই বিবাহকে কেন্দ্র করে অনুশোচনা ও অনুতাপের মধ্য দিয়ে তোমার চিত্ত শুদ্ধ হয়ে যাবে এবং সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান ও চৈতন্য লাভ হবে।" মহাপুরুষজী আরও বললেন, "সর্বাবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুরকে ধরে থাকবে, সদা সর্বদা তাঁর স্মরণ-মনন ধ্যান জপ করবে, তাঁর কাছে কাতর প্রার্থনা জানাবে, তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করবে। ঠাকুর তোমাকে যেভাবে চালাচ্ছেন, তুমি সেভাবে চলবে। আমি আন্তরিকভাবে তোমাকে আশীর্বাদ করছি—কোন অবস্থায়ই তুমি সংসারবন্ধনে আবদ্ধ হবে না—দেখবে ঠাকুরের অপার কৃপায় ধীরে ধীরে তুমি সমস্ত বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে যাবে, মনে প্রাণে অপার শান্তি পাবে।" কৃপাময় মহাপুরুষ মহারাজের এ রকম আশা ও উদ্দীপনাসূচক কথায় আমি হতাশ প্রাণে বল ও ভরসা পেলাম। দেখলাম তিনি যাকে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় দেন, শত অপরাধেও তাকে তিনি ত্যাগ করেন না। মহাপুরুষ মহারাজ অন্তর্দ্রষ্টা ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি ছিলেন, তাই তিনি যে কোনও লোককে দেখেই তার ভিতরের সব কিছু দেখতে পেতেন। যার যেমন আধার, যার যেমন প্রারব্ধ কর্ম ও সংস্কার, তার সেই ভাবকে বিন্দুমাত্র নষ্ট না করে—যার পেটে যেমন সয় সেভাবে চালিত করে তিনি তাঁর দৈবশক্তি-প্রভাবে তাকে পরম কল্যাণের পথে নিয়ে যেতেন। তিনি বলতেন, 'ইচ্ছামাত্র আমি ঐ (সামনের) আমগাছটিকে পর্যন্ত মুক্ত করে দিতে পারি আর রাজৈশ্বর্য—সে তো সামান্য তুড়ি দিলেই দেওয়া যায়।" মহাপুরুষজীর ঐরূপ দিব্যশক্তি ও জীবোদ্ধারের জন্য অপার করুণার যৎসামান্য সাক্ষ্য দেবার জন্য আমার মতো অধম সন্তান রয়েছে।

মহাপুরুষ মহারাজ ছিলেন ভালবাসার বাদশা। তাঁর অপার স্নেহ-ভালবাসার আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে দূর-দূরান্তর থেকে আশ্রিতগণকে তাঁর পাদপদ্মে ছুটে আসতে দেখেছি। মহাপুরুষজীর অদর্শনে তাদের মনপ্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠত। তাঁর দর্শনলাভের জন্য কোন সময় বা অসময় ছিল না। এ যেন পিতাপুত্র-সম্পর্ক, বাবার কাছে ছেলের অবারিত দ্বার। তাঁর করুণা স্নেহ-ভালবাসাই আমাকে বেশি আকৃষ্ট

করত, তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি প্রভৃতি অনুধাবন করার মতো সামর্থ্য তখন আমার হয়নি। যদি কোন কারণে তাঁর কাছে যেতে অস্বাভাবিক দেরি হয়ে যেত তো তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়তেন, সময় সময় লোক পাঠিয়েও খোঁজ নিতেন এবং তাঁর কাছে ডেকে পাঠাতেন। তিনি আমাদের পার্থিব অপার্থিব সকল বিষয়েরই খোঁজখবর রাখতেন। অভাব-অনটন ও দুঃখকষ্ট দূর করার জন্য তাঁর সতত শুভেচ্ছা ও অফুরন্ত আশীর্বাদ ছিল। তার কাছে অসঙ্কোচে আমার অভাব-অভিযোগ নিবেদন করেছি, তিনিও আমার শত অপরাধ ক্ষমা করে জাগতিক আধ্যাত্মিক সকল বিষয়ে আমাকে উপদেশ দিয়ে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন। তাঁর তিরোভাবের পর তাই ভয় হতো—যে মহাশক্তির সাক্ষাৎ আশ্রয়ে এতদিন নির্ভাবনায় মহানন্দে ছিলাম, তাঁর অদর্শনে আমি কোথায় যাবো, কে আমায় রক্ষা করবে। দুঃখ-বেদনাভারাক্রান্ত মনে আমার এই নিঃস্ব অসহায় অবস্থার কথা আমি একদিন মঠের এক প্রবীণ সাধুকে জানিয়েছিলাম। তিনি আমাকে সান্ত্বনা ও আশা-ভরসার কথাপ্রসঙ্গে যা বলেছিলেন তা আজ এই পরিণত জীবনে দেখছি বর্ণে বর্ণে সত্য হয়েছে। তিনি বলেছিলেন—"গুরুদেব স্থূলদেহ ত্যাগ করলেই কি তাঁর আশ্রিতদের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়? তা কখনও হয় না বরং সূক্ষ্মদেহে আশ্রিতদের তিনি শতসহস্রগুণ রক্ষা এবং পার্থিব ও অপার্থিব কল্যাণ করে থাকেন।" আজ সর্বক্ষণ অনুভব করতে পারি যে, গুরুদেব সতত আমাকে রক্ষা এবং আমার কল্যাণ করছেন।

শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীর মতো একজন উচ্চ-আধ্যাত্মিকশক্তিসম্পন্ন, স্থিতপ্রজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষের জীবনবেদের মূল্যায়ন করা আমার মতো সাধন-ভজনহীন অতি সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে তাঁকে দেখলে সহজেই মনে হতো যে, তিনি সত্যই ভগবৎ-রাজ্যে বাস করেন, ভগবচ্চিন্তার রাজ্যে বিচরণ করেন এবং তাঁর অন্তরাত্মা ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে একীভূত হয়ে গিয়েছে। সাধারণ দৃষ্টিতে আমি মহাপুরুষজীকে যেভাবে দেখেছি, সেই পুণ্যস্মৃতিটুকুই তাঁর শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করে তাঁর নিকট আমার এই প্রার্থনা নিবেদন করি—তাঁর আদেশ উপদেশ, তাঁর অমোঘ আশীর্বাদ যেন আমার জীবনে বর্ণে বর্ণে সত্য হয়।

শ্রীশ্রীগুরুদেব-স্মরণে

নিবেদিতা মজুমদার

পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেব মহাপুরুষজীর সংস্পর্শে আমি দু-এক দিনের জন্যই এসেছিলাম। সেই পুণ্যস্মৃতি স্মরণ-মনন করি।

আমার বাবা (৺অন্নদাচরণ সেনগুপ্ত) ছিলেন শ্রীশ্রীমার কৃপাধন্য। জন্মাবধি আমার বাবার কাছ থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের কথা শুনে এসেছি। পূজার ঘরে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর ছবি দেখেছি। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় ঠাকুরের সন্ধ্যা-আরতির সময় সকলে মিলে ঠাকুরের স্তোত্রাদি ভজন গাইতাম। বাবার কাছে শ্রীশ্রীমার অনেক কাহিনী শুনতাম। শ্রীশ্রীমার সম্বন্ধে একটি কথা মনে পড়ে। বাবা বলেছিলেন—তিনি শ্রীশ্রীমাকে পূজার সময় সরুপাড়ের কাপড় পাঠাতেন। শ্রীশ্রীমা বলতেন, "আমার বাঙাল ছেলে আমাকে কাপড় পাঠিয়েছে।" বাবা বলতেন—শ্রীশ্রীমা অতি সামান্য জিনিসেই খুশি হতেন। শ্রীশ্রীমার কথা বলতে বলতে বাবার চোখ জলে ভরে আসত।

আমার দশ-এগারো বছর বয়স পর্যন্ত আমরা বরিশালে (পূর্ব পাকিস্তান) ছিলাম। সেখানে রামকৃষ্ণ মিশনে আমাদের যাতায়াত ছিল। কোন উৎসবের দিন হলে আমি ঠাকুরের গান গাইতাম। একবার ধর্মসভায় আমি ঠাকুরের একটি গান করি। গানটি এখনও আমার মনে আছে। গানটি হলো—'রামকৃষ্ণ-চরণ-সরোজে মজরে মন-মধুপ মোর।'

বিয়ের পর কলকাতায় এসে আমার গর্ভধারিণীর সঙ্গে আমি প্রথম বেলুড় মঠে যাই। মঠে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের ও শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির দেখে খুব আনন্দ হয়েছিল। মায়ের সঙ্গে শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের ঘরে গেলাম। দেখলাম একজন সেবক মহারাজ হাতে মোজা নিয়ে মহাপুরুষজীর চরণে পরাবার জন্য উদ্যত হয়েছেন। আমার মার খুব ইচ্ছা হলো মোজাটি তিনি পরিয়ে দেন। সেবক মহারাজ অনুমতি দিলে মা মোজা জোড়াটি পরিয়ে দিলেন। তারপর আমরা একে একে মহাপুরুষজীকে প্রণাম করলাম। মা আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। মায়ের সঙ্গে মহাপুরুষ মহারাজের অনেক কথা হলো। আমার দাদার হাঁটুতে একটা দুরারোগ্য অসুখ ছিল। কলকাতার বড় বড় সার্জনরা বলেছিলেন যে, পায়ের যা অবস্থা তাতে পা কেটে

বাদ না দিলে জীবনের আশঙ্কা আছে। মা একথা দুঃখ করে মহাপুরুষজীকে বলছিলেন। তাই শুনে মহাপুরুষজী দাদাকে ডেকে বললেন, "দেখি, কোথায় তোর অসুখ?" দাদা হাঁটু দেখাতেই মহাপুরুষজী হাঁটুতে হাত বুলিয়ে বললেন, 'যা, সেরে যাবে।" সেই থেকে আজ পর্যন্ত দাদার পায়ে আর কিছু করতে হলো না। দাদার হাঁটুর অসুখ সম্পূর্ণ সেরে গেল। মহাপুরুষজী আমাদের দুজনকে খুব আশীর্বাদ করে আবার আসতে বললেন।

দুদিন পর আমরা আবার মহাপুরুষ মহারাজের শ্রীচরণসমীপে উপস্থিত হলাম। মহাপুরুষজী কৃপা করে বললেন, "আয় তোদের দীক্ষা দেব।" আমি তো বিস্ময়ে হতবাক! মুখ দিয়ে কথা সরে না। আমি ভাবছি কি করে দীক্ষা হবে। আমি তো তৈরি হয়ে আসিনি। দীক্ষার মানেও বুঝি না, জানি যে বড়রাই দীক্ষা নেন। কোন কথাই বলতে পারছি না। কিন্তু খুব আনন্দ হচ্ছে। মহাপুরুষজী বললেন, "তোমরা গঙ্গাস্নান করে এসো।" আমি ও দাদা স্নান করে এলাম, কিন্তু কিছুই তো সঙ্গে নেই। মঠে তখন মতি মহারাজ ছিলেন। তিনি আমাদের পূর্বপরিচিত। তিনি ঠাকুরের ভাণ্ডার ঘর থেকে থালায় করে কয়েকটি ফল ও হরীতকী এনে দিলেন। আমরা আসনে বসলাম। মহাপুরুষজী আমাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম দিলেন। তাঁর আদেশ অনুযায়ী আমি তাঁর হাতে মতি মহারাজের দেওয়া হরীতকী দিলাম। এই আমার গুরুদক্ষিণা। শ্রীশ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করে বাইরে বেরিয়ে এলাম। মন আমার অপূর্ব আনন্দে ভরে উঠল। আমার বয়স তখন মাত্র ১৬ বৎসর। সেদিন ১৯৩১ খ্রিঃ ৺শিবরাত্রির পুণ্যদিবস।

বাড়িতে এসেই ভয় হলো। শ্বশুরবাড়ির মত না নিয়েই আমি মন্ত্রদীক্ষা নিয়েছি। জানি না তাঁরা কি বলবেন। চিঠিতে শ্বশুরমহাশয় ও স্বামীকে দীক্ষার কথা জানালাম। পত্রপাঠ তাঁরা লিখলেন যে, এতে তাঁরা খুবই আনন্দিত হয়েছেন। লিখলেন, "যিনি তোমাকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়েছেন তিনি মহাপুরুষ, তোমার কল্যাণ হবে। তিনি যা বলেছেন তুমি তাই করো। আমরা একটুও অসন্তুষ্ট হইনি।" চিঠি পেয়ে আমি পরম নিশ্চিন্ত হলাম।

দীক্ষার কয়েকদিন পরেই আমি সুদূর পাঞ্জাবে চলে যাই। গুরুদেবের সঙ্গে যে চিঠিপত্রে যোগাযোগ রাখা যায়, তা আমি জানতাম না। তবে তাঁর মহত্ত্ব আমার জীবনকে প্রভাবান্বিত করেছে। সব সময়ই তাঁর কৃপা ও আশীর্বাদের কথা মনে করি। আমার ২।৩টি বড় বড় মোটর দুর্ঘটনা হয়েছিল। একমাত্র গুরুদেবের অমোঘ আশীর্বাদের জন্যই আমরা অক্ষত অবস্থায় বেঁচে গিয়েছি। আমার তো গুরুদেবের কৃপালাভের কোন যোগ্যতাই ছিল না। তবু অহেতুক কৃপাসিন্ধু তিনি কৃপা করে

আমার জীবনকে ধন্য করে দিয়েছেন। এতেই আমার অন্তর গুরুমহারাজের উপর কৃতজ্ঞতায় ভরে আছে।

আজ আমার এই ৫৬ বছর বয়স। সংসারে কয়েকটা বড় দুঃখ পেয়েছি। আমি বিশ্বাস করি যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় গুরুদেবের আশীর্বাদ আমাকে সব কিছু সহ্য করবার ক্ষমতা দিয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর ও গুরুমহারাজের কৃপা ও আশীর্বাদে আমার জীবন ধন্য।

শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সরকার

আমার পরম সৌভাগ্যবশত এমন এক পরিবারে জন্ম হয়েছিল এবং এমন সব আত্মীয়-স্বজন পেয়েছিলাম যাঁরা সবাই ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্ত। এর ফলে আমি অল্প বয়সেই পরম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের চরণাশ্রয় পেয়েছিলাম। স্কুলের শেষ পরীক্ষায় পাশ করে কলকাতায় কলেজে পড়ব বলে সৌভাগ্যবশত আমার এক মাসতুতো দাদার সান্নিধ্যে এলাম—যিনি ছিলেন পূজ্যপাদ মহাপুরুষজীর আশ্রিত ও রামকৃষ্ণ মিশন ছাত্রাবাসের ছাত্র। সে ছাত্রাবাসটি এখন বেলঘরিয়ায় অবস্থিত। এই দাদার কাছে এসেই আমার শুভদিনের সূচনা হলো। দাদাই আমাকে ও আমার এক কাকীমাকে সঙ্গে করে বেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে নিয়ে গেলেন। কাকীমার ইচ্ছা হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর পূর্বে অন্তত একবার 'শ্রীরামকৃষ্ণনাম' নিয়ে যেন তাঁর মৃত্যু হয়। দাদার সঙ্গে কাকীমা পূজ্যপাদ মহাপুরুষজীর শ্রীচরণে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করাতে শ্রীশ্রীমহাপুরুষজী তাঁকে শ্রীচরণে স্থান দিলেন—তাঁর দীক্ষা হলো।

আমি যেদিন প্রথম মঠে উপস্থিত হই, সেদিন মহাপুরুষজীর শরীর খুবই অসুস্থ ছিল, তাই সেদিন তাঁর দর্শন হলো না। চলে এলাম কলকাতায়। তবে দাদার নির্দেশমত শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর গ্রন্থাবলী মনোযোগ দিয়ে পড়তে আরম্ভ করলাম। তখন আমি কলকাতায় বিদ্যাসাগর কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র।

তারপর দাদা একদিন আমাকে দক্ষিণেশ্বর দর্শন করিয়ে বেলুড় মঠে নিয়ে গেলেন। সেদিনটি আমার জীবনের সবচেয়ে শুভদিন—আমি মহাপুরুষ-দর্শন

করলাম। সেদিনই জীবনে প্রথম অনুভব করলাম যে, এক বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তির সান্নিধ্যে এসে পড়েছি। The very atmosphere of the room was surcharged with spirituality.(মহাপুরুষের কক্ষের আবহাওয়া পর্যন্ত আধ্যাত্মিকতায় ভরপুর ছিল)। আমার বুকের ভিতর যেন দুরদুর করে উঠল। শ্রীমহাপুরুষজী মধ্যাহ্ন বিশ্রামের পর তাঁর শোবার খাটের উপরই বসেছিলেন। প্রণাম করলাম। প্রণাম করে উঠতেই বললেন, "তুই কে রে?" সে প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে বোধ হয় পারিনি। আমি বললাম—"আমার বাড়ি যশোরে।" তখনই মহাপুরুষজী হেসে একটি কবিতার দুলাইন বললেন—

"যশোর নগরে ধাম, প্রতাপাদিত্য নাম
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।
কত হাতি ঘোড়া তায়, নাহি মানে পাতশায়
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ ॥"...

আমি যখন শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীর চরণপ্রান্তে উপস্থিত হই, তখন ছিল ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ। তখন তাঁর শরীর প্রায়ই অসুস্থ থাকত। সব সময় দর্শন করাও সম্ভব হতো না। তবু মনে পড়ে অবুঝের মতো একটি বার প্রণাম করবার জন্য নিষেধ জানা সত্ত্বেও সেবক-মহারাজদের অযথা কত জ্বালাতন করেছি! তখন তো ছেলেমানুষ। আজ ভাবলে লজ্জা হয়, মনে যেন একটা জিদ আসত—'আজ মহারাজকে দর্শন না করে বাসায় ফিরব না।' দরজার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেক সময় চোখের জলও ফেলেছি। কিন্তু পরম কারুণিক মহাপুরুষজী যদি কোনরকমে জানতে পারতেন যে, একজন দর্শনের অপেক্ষায় দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, অমনি ডেকে পাঠাতেন। আনন্দে গিয়ে প্রণাম করে তখনই বার হয়ে আসতাম। এভাবে কিছুকাল কাটাবার পর শ্রীশ্রীমহাপুরুষের চরণে নিবেদন জানালাম যে, আমি দীক্ষা নেব। মহারাজ শুনে যেন ধমকের সুরে বললেন—"তুমি ধর্মের বোঝ কি? বয়স কত? কি পড়? এখন মন দিয়ে পড়াশুনা কর, ওসব পরে হবে।" আর কিছু বলিনি কোনদিন। মনে মনে ভয় ভয় করত। মনে হতো—আমি বোধ হয় অযোগ্য অথবা আমার সময় হয়নি, তাই মহাপুরুষজী ঐ কথা বলে আমাকে প্রত্যাখ্যান করলেন। একটু অভিমানও যে মনে হয়নি তা নয়। এই ভাবে কিছুদিন যাবার পর আমার সেই দাদা একদিন বললেন, "তুই মহাপুরুষ মহারাজকে চিঠি লিখে নিবেদন জানাবি, তাতেই কাজ হবে। বুড়ো মানুষ, সব কথা সব সময় মনে থাকে না, তোকে দীক্ষার অনুমতি দিতেও পারেন।" আমি তাই করলাম। কিছুদিন পর পরই চিঠি লিখতে আরম্ভ করলাম। কোন এক চিঠির উত্তরে দীক্ষার অনুমতি পেলাম। কিন্তু দীক্ষা যে

কি, সে ধারণাই আমার নেই। অতি প্রত্যুষে স্নান সেরে মঠে উপস্থিত হলাম। সঙ্গে কিছুই নিয়ে যাইনি। কেবল একটি আধুলি মাত্র ছিল পকেটে। সেই দিনই দীক্ষার দিন ও সময় নির্দিষ্ট ছিল।

দরজায় দাঁড়াতেই সেবক-মহারাজ ডাক দিলেন আমাকে; মহাপুরুষজী তাঁকে একটু গঙ্গাজল আনতে বললেন। বিছানার উপরে উপবিষ্ট মহাপুরুষ মহারাজ আচমন করে নিয়ে আমাকে দীক্ষা প্রদান করলেন, বার বার মহামন্ত্র উচ্চারণ করে আমাকে দিয়ে বলালেন। এবং বললেন, "মনে রাখবে—যে রাম, যে কৃষ্ণ তিনিই এবার এই শরীরে রামকৃষ্ণ। এই যে আকাশ-বাতাস ইত্যাদি যা কিছু দেখছ—সবই ঠাকুর। তিনিই সব হয়েছেন। এই পৃথিবীতে যা যা দেখছ সবই তিনি, এই ভাববে তবেই হবে।" জপের প্রণালীও কয়েকবার দেখিয়ে দিলেন, আর তখুনি ঠাকুরঘরে গিয়ে বসে একটু ধ্যান জপ করতে বললেন। দীক্ষান্তে কিছু দক্ষিণা দেবার বিধি আছে। আমি মাত্র একটি আধুলি তাঁর শ্রীচরণে রেখে প্রণাম করেছিলাম। পরে মহাপুরুষজী বললেন, "প্রসাদ পেয়ে যাবে।" এবং শঙ্কর মহারাজকে বললেন, "এই ছেলেটি প্রসাদ পাবে বলে দিও।" আমিও তাঁর আদেশমত ঠাকুরঘরে চলে গেলাম। মহাপুরুষজীও একটু বিশ্রাম করবার জন্য শুয়ে পড়লেন। সেদিন এই পর্যন্ত।...

আর একদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে মঠে গেছি। উপরে উঠেই দেখি মহাপুরুষজী গঙ্গার ধারের দিকের বারান্দায় ইজিচেয়ারে উপবিষ্ট। কাছে সেই মুহূর্তে কেউই ছিল না। আমার সৌভাগ্য। মহাপুরুষজীকে প্রণাম করে জিজ্ঞেস করলাম, "মহারাজ, আমাকে চিনতে পারছেন? কত হাজার হাজার আশ্রিত ভক্ত আপনার! সবার কথা তো সব সময় স্মরণ রাখা সম্ভব নয়।" এতে মহারাজ যেন একটু উত্তেজিত হয়েই যে-কথা কটি বলেছিলেন, তা হৃদয়ের মণিকোঠায় এখনও রক্ষিত আছে এবং চিরকাল থাকবে। মহাপুরুষজী বললেন, "(নিজের মুখ দেখিয়ে) এই মুখ দিয়ে যে-মহামন্ত্র যাকে যাকে দিয়েছি, তাদের সবাইকেই মনে আছে এবং চিরকাল চিরকাল চিরকাল থাকবে—কখনও ভুল হবে না।" আমার বুক দেখিয়ে বললেন, "ঐ বুকের ভিতরে ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন এবং থাকবেন। এ সূত্র কখনও ছিন্ন হবে না—ইহকালেও না, পরকালেও না। অনন্তকাল মনে থাকবে।" পরম পূজনীয় মহাপুরুষজীর শরীর তখন ভাল ছিল না। কথাগুলি খুব জোরের সঙ্গে উচ্চারণ করলেন বলেই হোক আর যে জন্যই হোক যেন একটু ক্লান্ত মনে হলো এবং অমনি সেবক-মহারাজকে ডাকলেন। সেবক-মহারাজও ত্বরিত গতিতে এসে দাঁড়ালেন। আমি উঠে পড়লাম।

জীবনে সাধু-সন্ন্যাসী অনেক দর্শন করেছি। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ এবং স্বয়ং

ভগবানের পার্ষদ তো আর দেখিনি। পরমসৌভাগ্যবশত আমার জীবনের একমাত্র আশীর্বাদ ও ভরসা যে, আমি মহাপুরুষ দর্শন করেছি। আমার জীবন ধন্য। আধ্যাত্মিক জগতের এক বিরাটশক্তিসম্পন্ন দিকপালের সান্নিধ্যে আসবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল, তাঁর শ্রীচরণপ্রান্তে একটু বসবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলাম—এইটুকুই এ জীবনের বড় সম্বল। জন্মগ্রহণও সার্থক।

*　　　*　　　*

বি.এ. পরীক্ষার সময় আগত। পড়া তেমন কিছুই হয়নি। গৃহ-শিক্ষকতা করে নিজের ভরণপোষণের জন্য বহু সময় নষ্ট করেছি। বিশেষ ভীত হয়ে সেবক শৈলেশ মহারাজের কাছে আমার সম্যক অবস্থা জানিয়ে মহাপুরুষ মহারাজের কৃপা ভিক্ষা করে পত্র দিলাম। মনোভাব এই—পূজ্যপাদ শ্রীগুরুদেব কৃপা করে আশীর্বাদ করলে আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যাব। তখন মহাপুরুষজী পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী ও বাক্‌শক্তিহীন, তবু ভক্তদের অকাতরে আশীর্বাদ ও কৃপা বিতরণ করে যাচ্ছেন। দেহরক্ষার আর বেশি দেরি নেই। সেবক শৈলেশ মহারাজ লিখলেন—"তোমার চিঠি পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজকে পড়ে শুনিয়েছি, তিনি সব শুনেছেন এবং একটি ভ্রূ একটু নেড়ে তোমাকে ঐ অবস্থায়ও আশীর্বাদ করেছেন; তাঁর ওষ্ঠপ্রান্তে একটু হাসির রেখা দেখা গেল। তোমার কোন ভয় নেই, পাশ হয়ে যাবে নিশ্চয়। তোমাকে তাঁর পদরজ ও একটু নির্মাল্য পাঠালাম, এটি ধারণ করবে। কোন ভয় নেই।" অতি অদ্ভুতভাবে সেইবারই কৃতিত্বের সঙ্গে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলাম, মনে পড়ে। যদিও পরীক্ষায় পাশ ও ফেল অতি তুচ্ছ কথা, তবু ছেলেমানুষ তো! তাতেই যেন কত আনন্দ! দয়া, কৃপা, করুণার কথা অনেক শুনেছি—একেই বলে করুণা। মহাপুরুষজী স্বয়ং কঠিনব্যাধিগ্রস্ত ও অক্ষম অবস্থায় থেকেও অসীম যন্ত্রণা ও ক্লেশের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে অকাতরে কৃপা বিতরণ করে গেলেন! একেই বলে মহাপুরুষ! তাঁর 'মহাপুরুষ' নাম সার্থক। কোন নরদেহধারীর পক্ষে ঐ মর্মান্তিক অবস্থায়ও আশ্রিতকে আশীর্বাদ করা সম্ভব কিনা—তা আমার জানা নেই, আমার কল্পনারও অতীত।

গুরুদেব শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীর স্মৃতিকণা

শ্রীমহেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী

পরমপূজ্যপাদ গুরুদেব শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীর স্মৃতির সঙ্গে আমার জীবনের প্রথমভাগ হতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি আকর্ষণাদির বিশেষ সংযোগ আছে। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীন ত্রিপুরার বিলোনিয়া হাইস্কুলে পড়ার সময় মহাত্মা রামচন্দ্র দত্ত-প্রণীত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনী' পাঠ করে প্রথম পরমহংসদেবের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। তৎপর ১৯১৩-১৪ খ্রিস্টাব্দে নোয়াখালী (পূর্ব পাকিস্তান) জিলার ফেণী উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' পাঠ করে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি আরও বিশেষভাবে আকৃষ্ট হই।

১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা জগন্নাথ কলেজ হতে পাঠ সমাপন করে প্রথম কলকাতায় আসি এবং পথের সন্ধান নিয়ে হাঁটাপথে কুঠিঘাট পার হয়ে প্রথম বেলুড় মঠে উপস্থিত হই (সম্ভবত ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকে)। পূজ্যপাদ প্রেসিডেন্ট মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দজী) সঙ্গে সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করি, কিন্তু আগন্তুক-প্রকোষ্ঠে (Visitors' Room) গিয়ে প্রথম মহাপুরুষ মহারাজের দর্শন ঘটে এবং প্রণামান্তে তাঁর কাছে খোঁজ নিয়ে জানতে পারি যে, প্রেসিডেন্ট মহারাজ তখন ভুবনেশ্বরে আছেন এবং এও জানা গেল যে, সাধারণত প্রেসিডেন্ট মহারাজই দীক্ষা দিয়ে থাকেন এবং যিনি তাঁর কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত হন তাঁর মুক্তি অবধারিত। মহাপুরুষ মহারাজের মুখে ঐ সব উপদেশ শুনে আমি প্রেসিডেন্ট মহারাজের কাছে দীক্ষা নেবার জন্য দৃঢ়সংকল্প হই। এ জন্য কিছুকাল অপেক্ষা করার পর ১৯২২ খ্রিঃ-এ বেলুড় মঠে উপস্থিত হয়ে পূজ্যপাদ ব্রহ্মানন্দ স্বামীজীর দর্শন লাভ করি। সেই পুরানো মঠ-বাড়ির উপর তলায় গঙ্গার দিকের বারান্দায় ভক্তবৃন্দ-পরিবৃত স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে প্রণাম করে দীক্ষার কথা উত্থাপন করি। তদুত্তরে তিনি বললেন, "আমি অনেক ফষ্টিনষ্টি করি, মহাপুরুষ মহারাজ তোমাকে দীক্ষা দেবেন। আমি শিক্ষা দিব। তুমি তাঁর কাছে গিয়ে এই কথা বল।" আমিও তাঁর কথানুসারে নিচে নেমে মহাপুরুষজীর দর্শন পাই এবং তাঁর শ্রীচরণে প্রণত হয়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের কথামত সমস্ত নিবেদন করি। কিন্তু মহাপুরুষজী গম্ভীর হয়ে রইলেন

এবং আর কিছুই না বলায় আমি তাঁকে প্রণাম করে বিদায় নিলাম। (পরে জেনেছিলাম যে, মহাপুরুষ মহারাজ তখনো দীক্ষা দেন না)।

পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসবের সময় দীক্ষা নেবার জন্য বেলুড় মঠে উপস্থিত হলাম, কারণ তখন মনে মনে স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের কাছ থেকে দীক্ষা নেবার বড়ই অভিলাষ ছিল। ঠাকুরের উৎসবের পূর্বদিন পূজনীয় সূর্য মহারাজ ও ভবানী মহারাজ প্রভৃতি শ্রীশ্রীমহারাজের সেবকগণ বললেন, "যারা আগামী কাল দীক্ষা নেবে তারা আজ সন্ধ্যার পূর্বে আহার করে সংযম করে থাক।" তদনুসারে আমরা কয়েকজন সন্ধ্যার পূর্বে আহারাদি সমাপন করলাম। পরদিন নির্দেশ হলো—"যারা যারা দীক্ষা নেবে ৮ টার মধ্যে গঙ্গাস্নান করে ঠাকুরঘরের বারান্দায় বস।" সঙ্গে সঙ্গে আদেশ পালন করে ঠাকুরঘরের বারান্দায় লাইন করে বসলাম। ঠিক সময় স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ এক এক জন করে আমার পূর্বজন পর্যন্ত দীক্ষা দিয়ে ঠাকুরঘর হতে উঠে এলেন এবং বললেন, "আমার পেট খারাপ করেছে, আজ আর কাকেও দীক্ষা দেব না।" তখন আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো এবং দুঃখে হৃদয়-মন ভেঙে পড়ল, কারণ তখন আমি যশোহর হেড পোস্ট অফিসে কাজ করি। পোস্ট অফিসের কাজ হতে ছুটি পাওয়া কষ্টকর, তাতে মাত্র তিন দিনের ছুটি নিয়ে এসেছিলাম। নিয়মানুযায়ী ঐ ছুটি বাড়ানো যায় না, তথাপি যদি পরদিন দীক্ষা নিতে পারি এই ভরসায় লিলুয়া পোস্ট অফিসে গিয়ে আরও একদিনের ছুটির জন্য টেলিগ্রাম করলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পরদিনও দীক্ষা না হওয়ায় ভগ্নহৃদয়ে ভিড়ের মধ্যে উপরে গিয়ে পূজনীয় ব্রহ্মানন্দ মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা ও তাঁর পদধূলি নেওয়া সাধ্যাতীত দেখে অগত্যা নিচের উঠান হতে তাঁর উদ্দেশে অশ্রুসিক্ত চোখে হেঁটমুণ্ডে প্রণাম করে শেষ বিদায় নিয়ে ফিরে এলাম। তার কিছুকাল পরেই একদিন পত্রিকায় দেখলাম স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ মরদেহ ত্যাগ করে রামকৃষ্ণলোকে গমন করেছেন। এই দুঃসংবাদে মর্মাহত হয়ে পড়লাম। যাঁকে অন্তরে গুরুর স্থান দিয়েছিলাম তাঁর দেহত্যাগে মেসের রান্না-খাওয়া ছেড়ে দূরবর্তী এক হোটেলে গিয়ে তিনদিন নিরামিশ খেলাম এবং কিছুকাল পর এক মাসের ছুটি নিয়ে বাড়ি গেলাম।

বেলুড় মঠে জনৈক মহারাজ বহুপূর্ব হতেই আমার পরিচিত ছিলেন বলে আমার বাড়ির ঠিকানায় তিনি চিঠি দিয়ে জানালেন—"এ সময় পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ বেলুড় মঠে আছেন, এই সুযোগে মঠে এসে দীক্ষা নিয়ে গেলে ভাল হয়।" আমিও সুযোগের সদ্ব্যবহার করলাম এবং ছুটির শেষভাগে কার্যস্থলে হাজির হওয়ার পথে বেলুড় মঠে এসে পরমারাধ্য মহাপুরুষ মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করে দীক্ষার

প্রার্থনা জানালাম। তদুত্তরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "মঠে তোমার পরিচিত কেউ আছে কি?" আমিও তদুত্তরে কয়েকজন মহারাজের নাম বললাম। তখন তিনি বললেন, "আগামী কাল আরও ২/৩ জনের দীক্ষার দিন স্থির হয়েছে, তুমি বরং তার ২/১ দিন পর দীক্ষা নিতে পার।" আমি বললাম, "মহারাজ, আগামী পরশুই আমাকে খুলনা হেড পোস্ট অফিসে কাজে যোগদান করতে হবে। আগামী কাল দীক্ষা হলেই ভাল হয়, নইলে আমার আর কোন আশা নেই। তখন তিনি বললেন, "সে দিন একজন মুন্সেফের দীক্ষা নেওয়ার কথা আছে, যাক বরং তার দীক্ষা পরদিন হবে। তোমারই কাল হবে।" তখন স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দ পূজক ছিলেন। ১৯২২ খ্রিঃ আগস্ট মাসে ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মচারীদের দীক্ষা হয়ে যেতে পরে আমার দীক্ষা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়। সেদিন গুরুদেব মহাপুরুষ মহারাজ কিভাবে জপ করতে হয় দেখিয়ে দিলেন এবং প্রাণঢালা আশীর্বাদ করেন। সন্ধ্যারাত্রে শায়িত অবস্থায় শ্রীগুরুদেবের পদসেবা করে মানব-জীবন ধন্য করলাম।...

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আমার পিতামহীর মৃত্যু হওয়ায় ছুটি নিয়ে বাড়ি যাবার পথে বেলুড় মঠ হয়ে বাড়ি যাই। তখন মঠে মহাপুরুষজী ছিলেন। আমার পেটের অসুখ হওয়ায় তিনি পাচক-ব্রাহ্মণকে ডেকে আমার জন্য আলাদা সুক্তো রান্না করতে আদেশ দিয়ে আমার সময়োপযোগী আহারের ব্যবস্থা করেছিলেন। শ্রীগুরুদেবের এরূপ অহেতুক কৃপা-প্রদর্শনে এবং আমার প্রতি নিজ সন্তানের মতো আচরণে আমার মনপ্রাণ জন্মের মতো তাঁর শ্রীপদে বিকিয়ে দিলাম। ঐ সময় পুণ্যপীঠ দক্ষিণেশ্বর দর্শন করেও আমি ধন্য হয়েছিলাম।

১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে দোলপূর্ণিমার পূর্বদিন মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমার স্ত্রীর দীক্ষার কথা উত্থাপন করি। মহাপুরুষজী দ্বিরুক্তি না করে পরদিন দোলপূর্ণিমার শুভক্ষণে তাকে মঠে উপস্থিত করতে বললেন। আমিও যথাসময়ে আমার স্ত্রীকে উপস্থিত করলাম বটে, কিন্তু গুরুদেবের সঙ্গে পরিচয় করে দেবার সুযোগ হয়নি। তবু সে মহাপুরুষজীর কাছে উপস্থিত হতেই তিনি চির-পরিচিতের মতো তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমিই তো মহেন্দ্রের স্ত্রী।" সে উত্তর করল, "আজ্ঞে হাঁ, মহারাজ।" তারপর যথাসময়ে মহাপুরুষজী করুণায় বিগলিত হয়ে আমার স্ত্রীকে দীক্ষা দিয়ে চিরকৃতার্থ করলেন।

শ্রীগুরুদেবের পাদমূলে একটানা দীর্ঘকাল বাস করবার, কি ঘন ঘন যাতায়াতের সৌভাগ্য আমাদের হয়ে উঠেনি। দূরে দূরে চাকরিতে থাকতে হতো বলে মাত্র ৺শ্রীশ্রীদুর্গোৎসবের সময় যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর এবং বনগাঁও প্রভৃতি কর্মস্থল হতে ৬ দিনের ছুটি নিয়ে মঠে পূজোৎসবে যোগদান করে সাধু, সজ্জন ও মহাপুরুষ

মহারাজের পুণ্যসঙ্গ লাভের সৌভাগ্য হয়েছিল। একবার দূর স্থান হতে মঠে পূজোৎসবে যোগদান করে আনন্দ উপভোগ করব মনে করে মঠে গেছি, হঠাৎ মহাপুরুষ মহারাজ আমায় আদেশ করলেন, "প্রতি বৎসরের মতো আজ মহাষ্টমীর পূজার ফুল, ফল, শাড়ি এবং দক্ষিণা বাবদ একটি টাকা নিয়ে তুমি এক্ষুনিই ফেরি স্টিমারে দক্ষিণেশ্বর যাও এবং এই-সব উপকরণ মঠ হতে প্রদত্ত হয়েছে বলে রামলালদাদাকে দিও।" প্রথমটায় মনে হলো—এ আবার কি? কোথায় দূর স্থান থেকে একঘেয়ে চাকরি-জীবন হতে কয়েকদিন পূজোৎসবে দশজনের সহিত মিলে মিশে আনন্দ করব বলে মঠে এসেছি এবং মাত্র সপ্তমী পূজার আনন্দ একদিন উপভোগ করার পরই মহাষ্টমীর দিনই অন্যত্র যেতে হবে? মনে একবারও জাগে নাই যে, পরমকরুণাময় শ্রীগুরুদেব আমার ভাবী মঙ্গলের জন্যই এই আদেশ করে আমার মহোপকার সম্পাদন করছেন। যা হোক, গুরুদেবের আদেশ শিরোধার্য করে ফেরি স্টিমারে দক্ষিণেশ্বরে উপনীত হলাম এবং উক্ত উপকরণাদি দক্ষিণেশ্বরে পূজনীয় রামলালদাদার নিকট সমর্পণ করলাম। তাতে খুব আনন্দ হয়েছিল। দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ৺ভবতারিণীকে প্রণাম করতেই এক অব্যক্ত আনন্দে প্রাণ-মন ভরে গেল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব-পূজিতা মাতা ভবতারিণীর পূজোপকরণ ঐ শুভ মহাষ্টমীর দিনে আনার সৌভাগ্য হয়েছিল বলে নিজেকে ধন্য মনে করলাম। গুরুদেবই কৃপা করে আমায় এ সৌভাগ্যের অধিকারী করেছিলেন ভেবে গুরুদেবের অসীম দয়ার কথা মনে করে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। পরে মনে হয়েছিল—ভবতারিণী আর দুর্গা তো একই। শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে গিয়ে প্রণাম করেও খুব আনন্দ হয়েছিল। মঠে এসে গুরুদেবকে সব বলেছিলাম, তিনি খুব আশীর্বাদ করেছিলেন।

এর পরে আর এক দুর্গোৎসবের সময় মঠে যাবার সুযোগ করে পূজ্যপাদ গুরুদেবের শ্রীচরণ দর্শন ও স্পর্শন, সাধু ও ভক্তদের সঙ্গে নানাবিধ আলাপাদি শ্রবণ করে বিমুগ্ধ হয়েছি এবং ফিরবার সময় আনন্দটুকুই জীবনের সম্বল করে নিলাম।

দূর স্থানে থেকে কার্য করতে হতো বলে অন্যান্য সৌভাগ্যবানদের মতো গুরুদেবের দর্শন ও সেবাদি করবার সুযোগ পাইনি, তবুও নানাস্থানে থেকে তাঁকে যেসব চিঠিপত্র লিখতাম, সময়মতোই সে সবের সদুত্তর পেয়েছি এবং তাঁর অগণিত শিষ্যবৃন্দের মধ্যে এ অভাজনকে না ভুলে যে তিনি আমায় মনে রেখেছিলেন তাতেই আশ্চর্য হতাম। একবার লিখলাম—"মহারাজ, দীক্ষার পূর্বে যেমন ছিলাম, এখন তার চেয়ে কিছু উন্নতি হয়েছে বলে তো মনে হয় না, মনও স্থির হয় না।" তদুত্তরে গুরুদেব লিখলেন—"পূর্বজন্মের বহু পুণ্যফলে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে স্থান

পাইয়াছ, তোমার কোন ভাবই নষ্ট হয় নাই। সময়ে সব জাগিবে। একবার যখন ঠাকুরের আশ্রয়ে আসিয়া পড়িয়াছ, আর কোন ভাবনা নাই। আমি তাঁর শ্রীপাদপদ্মে তোমার ইহকাল, পরকাল, ভূত, ভবিষ্যৎ সবই সমর্পণ করে দিয়েছি। এখন সাধন করিয়া যাও।" তাঁর চিঠি পেয়ে মন শান্ত হলো। যদিও আমি ঘন ঘন দর্শন করবার সুযোগ পাইনি, তবু সব সময়ই মহাপুরুষজী আমাকে মনে রেখেছেন এবং একটুও ভুলেননি। তাঁর হাজার হাজার শিষ্যের মধ্যে যে অকৃতী অভাজনকে মনে রেখেছেন তা ভেবেই তাঁর অহেতুক কৃপায় বিস্ময়-বিমুগ্ধ হই। মঠে গেলে শ্রীগুরুদেবের সঙ্গসুখ ত্যাগ করে ফিরে আসতে ইচ্ছা হতো না। এখন তাঁর স্মৃতিই সম্বল। এই সম্বল নিয়েই যেন জীবনের বাকি কটা দিন কেটে যায়।

ওঁ তৎ সৎ

শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতি-সঞ্চয়ন

শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস

আমার কাকা স্বামী করুণানন্দ বোধ হয় ১৯০৩/১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে বেলুড় মঠে যোগদান করেছিলেন। তখন আমি খুব ছোট। তিনি ছিলেন পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য এবং শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের ফটো আমাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। সেই প্রথম শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের ফটো দর্শন করি। বড় হলে শ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ পড়ি। স্বামী করুণানন্দ সন্ন্যাস নেবার কিছু কাল পরে একবার দেশে যান। সেই সময় সংকল্প করি যে, বেলুড় মঠে দীক্ষা নেব।

১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করে কাজকর্মের খোঁজে কলকাতা আসব স্থির করি। সৌভাগ্যক্রমে ঐ বৎসর নভেম্বর মাসে স্বামী করুণানন্দ দেশে যান। আমি তাঁর সঙ্গে ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় আসি এবং মঠে গিয়ে উঠি।

বেলুড় মঠে তখন স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ অবস্থান করছেন এবং স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ আমেরিকা থেকে এসে রয়েছেন। পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ পুরানো অতিথি-ভবনে অবস্থান করতেন। আমি স্বামী করুণানন্দের সঙ্গে শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীর শ্রীচরণ দর্শন করতে যাই। প্রণাম করতেই তিনি আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করেন। এটি আমার পরম সৌভাগ্য যে, প্রথম দিন থেকে মহাপুরুষ

মহারাজ অতি স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে আমাকে দেখেন। তাঁকে আমি সর্বদা অশেষ স্নেহ ও করুণায় পরিপূর্ণ দেখেছি।

১৯২২ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ দেহরক্ষা করেন এবং মে মাসে পরম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ মঠ-মিশনের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। মঠাধীশ হয়েই তিনি তাঁর কৃপারদ্বার বিশেষ করে উন্মুক্ত করে দেন।

আমি কাজের চেষ্টায় নানা জায়গায় ঘুরছি। ক্রমে শারদীয়া পূজা এসে গেল। পূজার সময় মঠে আসি। সকলেরই মনে খুব আনন্দ। মহাষ্টমীর দিন শ্রীশ্রীমহাপুরুষজী অনেককে দীক্ষা দেবেন শুনে আমি সকালে প্রণাম করতে গিয়ে তাঁর কৃপা প্রার্থনা করলাম। প্রার্থনা মঞ্জুর হলো। দীক্ষার সময় শ্রীশ্রীমহাপুরুষজী কৃপামূর্তিতে আমায় মন্ত্রদান করে জীবন ধন্য করলেন। দীক্ষার সময় গুরুদেব বলেছিলেন, "সকাল-সন্ধ্যা দুবার অন্তত ১০৮ বার নাম জপ করবে।" একদিন ছেলেমানুষের মতো জিজ্ঞেস করলাম—দুবার জপ করা ছাড়া আর কিছু করতে হবে কিনা। তাতে তিনি বললেন, "আগে বাপ-মায়ের খাবার ব্যবস্থা কর, তারপর ওসব হবে।" গুরুদেব সিদ্ধ মহাপুরুষ, আমার ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সবই তিনি অবগত ছিলেন এবং আমার শক্তি কতটুকু তাও সম্যক্‌রূপে জানতেন। কাজেই আমার যা প্রয়োজন তাই বললেন। পরে অবশ্য বলেছিলেন, "লেখাপড়া করেছ, কত রাত জেগেছ, কত পরিশ্রম করেছ, তবে তো হয়েছে। এও তাই, খাটতে হবে।"

এরপর আমি আর কখনও কোন কথা শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীকে জিজ্ঞেস করিনি। কোন প্রয়োজনও বোধ করিনি। গুরুদেবকে দেখলেই অন্তর আনন্দে ভরে যেত, কোন প্রশ্নই মনে জাগত না। তিনি নিজে থেকে দয়া করে কখনো কখনো কিছু কিছু বলেছেন।...

তখন ঝরিয়াতে মাস্টারির বেতন খুব কম ছিল। একবার গুরুদেবকে একটি টাকা দিয়ে প্রণাম করতেই সস্নেহে বললেন, "তোমার আবার টাকা দেওয়া কেন?" আমি বললাম, "আপনার আশীর্বাদে আমার চলে যাবে।" তাতে তিনি খুশি হয়ে বললেন, "হাঁ, তা চলে যাবে, তা চলে যাবে।" করুণাময় গুরুদেবেরই আশীর্বাদে সব কেটে গেছে এবং সবই ঠিক চলছে।

একদিন প্রণাম করতেই মহাপুরুষজী বললেন, "বৌমাকে বলবি—আমার প্রতি যেন মন রাখে। তবে সুসন্তান হবে।" আমার স্ত্রীর তখনও দীক্ষা হয়নি। আমি সেই সময় তাঁর দীক্ষার ব্যবস্থা করি। আমার স্ত্রীও শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের কৃপালাভ করে ধন্যা হলো।

আর একদিন মহাপুরুষজীকে প্রণাম করতে বললেন, "ঠাকুরকে দেখেছিস?" বললাম, "না।" তখন বললেন, "আমাকে তো দেখেছিস?" আমি বললাম, "হ্যাঁ, মহারাজ।" তখন বললেন, "আমার প্রতি মতি রাখিস, তাতেই তোর হবে।" গুরুদেবের এই আশীর্বাদই আমার জীবনের চরম সম্বল হয়ে আছে।

একদিন গুরুদেবকে প্রণাম করতে গিয়ে দেখি তিনি চেয়ারে বসে একখানা বই পড়ছেন। প্রণাম করতেই বললেন, " 'কথামৃত' পড়েছিস?" বললাম, "হ্যাঁ, মহারাজ, পড়েছি।" তিনি বললেন, "পড়েছি নয়, রোজ পড়বি। দেখ, আমি এখনও পড়ছি।" এমনই দুর্দৈব যে, গুরুদেবের ঐ আদেশ আক্ষরিক ভাবে পালন করতে পারিনি—তাতে এখনও অনুশোচনা হয়।

ঢাকায় একবার খুব হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়। আমি মহাপুরুষজীকে প্রণাম করে দাঙ্গার কথা বললাম। তিনি বললেন, "তোমাদের কোন ভয় নেই; তোমাদের কি নেবে?" ঢাকাতে বহু গোলমালই হয়েছে, কিন্তু গুরুকৃপায় আমাদের কোন বিপদ হয়নি।

বেলুড় মঠে যেতাম, মহাপুরুষজীকে প্রণাম করতাম। দাঁড়িয়ে তাঁকে দর্শন করতাম। তিনি নিজে দয়া করে শ্রীচরণে আশ্রয় দিয়েছেন এবং যখন যেটুকু বলেছেন, তা-ই জীবনের প্রধান সম্বল করে চলেছি। গুরুদেব সব সময় দেখছেন এবং রক্ষা করছেন—এই বিশ্বাস নিয়ে আছি।

মহাজন-স্মৃতিকথা

শ্রীগুরুদাস গুপ্ত

কুমিল্লা অভয় আশ্রমের একজন প্রখ্যাত কর্মীর সঙ্গে বেলুড় মঠে গেছি। তখন আমরা শার্ট কোট বড় একটা গায়ে দিতাম না। খদ্দরের ধুতি-চাদর ও পায়ে একজোড়া কলকাতায় সদ্য-আমদানী চপ্পল বা স্যাণ্ডেল ব্যবহার করতাম। সরল বেশভূষা দেখে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ খুব খুশি হলেন এবং উৎসাহ দিলেন। তখনকার দিনে চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের প্রবল প্রতিপত্তি, তাঁর প্রশংসা করে মহাপুরুষজী বললেন—"দেশ স্বাধীন নিশ্চয় হবে; ঠাকুর এসেছিলেন, তিনি একা আসেননি—স্বামীজীকেও সঙ্গে এনেছিলেন।" মহাপুরুষজীর এই প্রথম দর্শন

পেলাম। কী তাঁর প্রসন্ন দৃষ্টি, মধুর হাসি ও সপ্রেমবচন! দর্শন করে আমরা একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম।...

একদিন স্বামী অম্বিকানন্দ মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে কথা বলছেন। আমরা প্রণাম করতে মহাপুরুষজী বললেন, "নীরদ, একে চেনো?" স্বামী অম্বিকানন্দ "না" বলায় মহাপুরুষ মহারাজ কয়েক কথায় আমার পরিচয় দিলেন। হাসিখুশির মধ্যে কথা হচ্ছিল। হঠাৎ মহাপুরুষজী অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেলেন। দু-এক মিনিট পরে বললেন, "শরৎ মহারাজের সন্তান।" তাঁর ঐ কথাতে আমার দৃঢ় ধারণা হলো সত্যই আমি আমার পূজ্যপাদ গুরুদেবের পুত্র। শিষ্য যে গুরুপুত্র—এতো জানা কথা; কিন্তু ঠিক ঠিক পিতৃবোধ কজনের হয়? মহাপুরুষজী মুহূর্তে ঐ বোধটুকু আমার দৃঢ় করে দিলেন। সেদিন অন্তরে সে অনুভবের ফলে আমার প্রভূত কল্যাণ হলো। অমি বুঝলাম, গুরুর আধ্যাত্মিক সম্পদ আমার প্রাপ্য উত্তরাধিকারসূত্রে। তখন থেকে শ্রীগুরুর জীবন অনুসরণ করার আপ্রাণ চেষ্টায় জীবন ধন্য হলো। যত দিন যাচ্ছে বুঝছি যে, মহাপুরুষ মহারাজের অপার শক্তি ও কৃপাতেই তা সম্ভব হয়েছে।...

একদিন প্রাতে বেলুড় মঠে গিয়ে দেখি পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ উপনিষদ্ পাঠ করছেন। ঘরে আর কেউ নেই। আমরা যেতে তিনি পাঠ ও ব্যাখ্যা করে শোনাতে লাগলেন। মুক্ত পুরুষের মুখে মুক্তির মনন, ধ্যান ও চিন্তার কথা আমাদের এত ভাল লাগল যে, একমনে একপ্রাণে তন্ময় হয়ে শুনছি, এমন সময় এক আগন্তুক এসে তাঁর সঙ্গে বৈষয়িক প্রসঙ্গ তুললেন। পরমার্থ-প্রসঙ্গ চাপা পড়লো। মহাপুরুষজী তাঁকে বৈষয়িক ব্যাপারের খুঁটিনাটি প্রশ্ন করলেন। আমি ভাবলাম—কি আপদ! ইনি কখন উঠবেন—প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। মহাপুরুষ মহারাজ কিন্তু বিন্দুমাত্র বিরক্তি বা তাচ্ছিল্যের ভাব দেখালেন না, বরং প্রেমের সহিত ঐসব ঐহিক প্রসঙ্গ করতে লাগলেন। প্রথমটা আমি ক্ষুণ্ণ হয়েছিলাম, পরে ভাবলাম—আজ কী উচ্চ শিক্ষা পেলাম! 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্'"—শুধু শাস্ত্রে পড়েছি; আজ তার প্রত্যক্ষ উদাহরণ দেখলাম।

* * *

বাগবাজার শ্রীশ্রীমায়ের বাড়িতে পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজের (স্বামী সারদানন্দজীর) শরীরত্যাগ হয়। মহাপুরুষ মহারাজ তখন বেলুড় মঠে রয়েছেন। হঠাৎ রাত দুটোর পরে তিনি সেবককে বলে উঠলেন—"এখন কটা বেজেছে দেখ তো?" এর কিছু পরেই মঠে খবর এল, শরৎ মহারাজের দেহান্ত হয়েছে। পরে

মহাপুরুষ মহারাজ বলেছিলেন—"দেহত্যাগের সময় শরৎ বলে গেল—'তারকদা, কাশী চললুম।' "...

এক সময়ে শরৎ মহারাজের শরীর অসুস্থ হওয়ায় বিশ্রামের জন্য উদ্বোধন থেকে তিনি মঠে এসেছেন। কিন্তু বেশিদিন থাকতে পারলেন না; শরীর আরও অসুস্থ হওয়ায় ডাক্তার দেখাতে কলকাতায় ফিরলেন। মঠবাড়ির উপরে স্বামীজীর ঘরের পাশে যে পুরাতন লাইব্রেরি ঘর ছিল, সেখানে শরৎ মহারাজ ছিলেন। শরৎ মহারাজ কলকাতায় যাবেন বলে রওনা হয়েছেন দেখে মহাপুরুষ মহারাজ ঘর থেকে বেরুলেন। বারান্দায় উভয়ের সাক্ষাৎ। শরৎ মহারাজ অসুস্থ শরীরেও নিচু হয়ে মহাপুরুষ মহারাজের পাদস্পর্শ করে প্রণাম করলেন। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে যেভাবে উৎসাহ দিয়ে কথা বলেন, মহাপুরুষ মহারাজ সেইভাবে সস্নেহে শরৎ মহারাজকে বললেন, "তুমি মোটেই ভেবো না, শীঘ্রই সেরে যাবে।" গুরুভ্রাতা দুজনের পরস্পরের প্রতি এই আত্মীয়তার ও সম্প্রীতির দৃশ্যটি যেমন সুন্দর তেমনি স্বর্গীয়। উভয়ের মুখশ্রী দেখে মনে হলো যেন সরলতার প্রতিমূর্তি দুটি বালক গাঢ়প্রেমে আবদ্ধ! ...

মহাপুরুষ-স্মরণে

শ্রীতারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-ই

যে দিব্যকান্তি পরিগ্রহ করে শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ মহাপুরুষ মহারাজ এসেছিলেন, তাঁর সান্নিধ্যলাভ স্বল্পকালমাত্রই ভাগ্যে ঘটেছে। অবশ্য এই স্বল্পকালের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৩৪-এর ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁর মহাপ্রয়াণ পর্যন্ত তিন বৎসর প্রায় প্রতি সপ্তাহে একবার, কখনো কখনো দু-বার বেলুড় মঠে গিয়ে তাঁর শ্রীচরণপ্রান্তে উপস্থিত হয়েছি। কেন যে তাঁর কাছে প্রথম গিয়েছিলাম তার কারণ আজও ভেবে পাইনা, তবে যতদূর মনে পড়ে ধর্মলাভ বা আধ্যাত্মিক প্রেরণার বশে যাইনি, গিয়েছিলাম কেবলমাত্র একটা অজ্ঞাত আকর্ষণে।

বোধ হয় ১৯৩১-এর শেষদিকে তাঁকে প্রথম দর্শন করি আমার বড়দিদির অনুরোধে এবং তাঁরই সঙ্গে। পুরানো মঠবাড়ির দোতলায় উঠে উত্তর-পশ্চিম কোণের ঘরে দক্ষিণের দরজা দিয়ে প্রবেশ করে দেখলাম এক সৌম্যকান্তি প্রবীণ সন্ন্যাসী খাটের উপর পশ্চিমাস্য হয়ে বসে রয়েছেন মেজেতে পা রেখে। বড়দিদির

দেখাদেখি আমরাও তাঁকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে তাঁর পায়ের কাছে বসলাম—মেজেতেই। তিনি সস্নেহে আমাদের দিকে তাকিয়ে দিদিকে জিজ্ঞেস করলেন, "এটি কে রে?" "এ আমার ছোট ভাই আর এ ভাই-এর বৌ।" আবার জিজ্ঞেস করলেন, "এ কি করে?" দিদি উত্তর দিলেন, "ইঞ্জিনিয়ার—আগে উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত রেলে চাকরি করত, এখন কলকাতায় কনট্রাক্টারি করে।" "বেশ বেশ—এঞ্জিনিয়ার্স বিল্ডার্স অ্যাণ্ড কনট্রাকটারস" বলেই হো হো করে হাসতে লাগলেন। কয়েক মিনিট দিদিই তাঁর সাথে কথা বলে চললেন, নানা কথা নানা আব্দার; তার ভিতরে "মহারাজ, এদের আপনি কৃপা করুন"—একথাও বলেছিলেন মনে পড়ে। তিনি কি বলেছিলেন মনে নেই, কারণ দিদির কথায় আমি তেমন গুরুত্ব দিইনি। তাছাড়া দীক্ষা সম্বন্ধে আমার কোন আকাঙ্ক্ষা ছিল না। শুনেছিলাম দিদি এর কয়েক বছর আগে মহাপুরুষ মহারাজের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। প্রণাম করে উঠে আসবার সময় বললেন, "আবার এসো।" আর বলেছিলেন ঠাকুরঘরে যেতে। সেবক মহারাজকে আমাদের ঠাকুরের প্রসাদ দিতে বললেন।

কলকাতায় ফিরে সপ্তাহের কটা দিন কাজে ব্যস্ত থাকায় মঠে যাবার কথা মনে হয়নি। শনিবার সন্ধ্যায় কাজ থেকে ফিরে এসে হঠাৎ মনে হলো, পরদিন রবিবার মঠে যেতে হবে। কেন যাব, কি প্রয়োজনে যাব সেকথা মনে ওঠেনি। কলকাতার মতো স্থানে অবসর-বিনোদনের জায়গার অভাব নেই, তা সত্ত্বেও মঠে যাবার প্রেরণা কেন এল তা আজও ভেবে পাই না। "তুমি না ডাকিলে কাছে সহজে কি চিত্ত ধায়"—এ কথার মর্ম তখন বুঝিনি। তিনিই যে এই অভাজনকে অহেতুক করুণাবশেই আকর্ষণ করেছিলেন—তাই কি তখন বুঝেছিলাম! একবার মাত্র দর্শন, তাও মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য—তত্ত্বকথাও কিছু হয়নি। বিদায় নেবার সময় মাত্র দুটি কথা—"আবার এসো।" তা অমন সবাই বলে থাকে শিষ্টাচারের খাতিরে, আর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ তো প্রণম্য সকলেই করে থাকেন। এর আর বিশেষত্ব কোথায়!

যাই হোক, এবার একলাই গেলাম। প্রথমবার গিয়েছিলাম নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বর থেকে, ফেরার পথে একরকম অনিচ্ছায়, দিদির অনুরোধে। দিদি বলেছিলেন, "চল, বেলা হলই বা, একবার কয়েক মিনিটের জন্য মঠে নেমে আমার গুরু মহারাজকে দর্শন করে যাবি।" ইতস্তত করেছিলাম, বলেছিলাম—"আজ থাক, বেলা হয়ে গেছে, আর একদিন দেখা যাবে। আর তোমার গুরু মহারাজকে দেখবার কি আছে—বেলুড় মঠের একজন সন্ন্যাসী তো!" ছেলেবেলায় মঠের অনেক সন্ন্যাসী দেখেছি, এঁর আর নূতনত্ব কোথায়!"

১৯১৫ বা ১৯১৬ সালে প্রথম বেলুড় মঠে যাই শ্রীঠাকুরের জন্মোৎসবের মেলা দেখতে। সাধারণের সঙ্গে এক পঙক্তিতে বসে খিচুড়ি প্রসাদ পেয়েছিলাম। নানা জাতের লোকের সঙ্গে বসে খেয়েছি শুনে আমার জনৈকা নিকট আত্মীয়া ভর্ৎসনা করেছিলেন—তুমি না নূতন ব্রহ্মচারী, সবে পৈতে হয়েছে! মঠে সারাদিন কাটিয়ে 'সন্ন্যাসীর গীতি', 'বীরবাণী', 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের কথা' এইরকম তিন-চারখানা ছোট সংস্করণের বই কিনে সন্ধ্যার ট্রেনে বাড়ি ফিরেছিলাম; বেশ ভাল লেগেছিল এইটুকু শুধু মনে আছে। মহাপুরুষ মহারাজকে দেখেছিলাম কিনা মনে পড়ে না। এখন কিন্তু মনে হয় আমি তাঁকে না দেখলেও—তিনি আমায় দেখেছিলেন, নইলে ষোল বছর পরে আকর্ষণ করে তাঁর অভয় পদপ্রান্তে টেনে এনেছিলেন কেন! কিন্তু যাক সেসব কথা।

বাসে গিয়ে হেম পালের গলির মাথায় নামলাম; খানা, ডোবা আর ইটভাটির পাশ দিয়ে সরু গলি-রাস্তা ধরে মঠের খিড়কি দরজা দিয়ে ঢুকলাম এবং রান্নাঘরের উঠানে এসে দাঁড়ালাম। সেবক মহারাজের সঙ্গে দেখা হলো—মহারাজের জন্য রান্না করছিলেন। আমাকে দেখে তখন মহাপুরুষজীর ঘরে নিয়ে গেলেন। পথে যেতে যেতে কেমন একটা অভাব, একটা আকুল আগ্রহ বোধ হচ্ছিল; কি যে চাই তা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। অতীতের অনেক কথাই মনকে আলোড়িত করছিল। কৈশোরে মাতৃহীন এবং প্রথম যৌবনে পিতৃহীন—স্নেহ-মমতার কাঙাল ছিলাম আমি। আমার শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে দেখবার কেউই এ জগতে ছিল না; সেসব কথা মনে পড়ে চোখে জল আসছিল। মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে উঠে বসতেই তাঁর স্নেহপূর্ণ মুখটি দেখে মনে হলো—এই তো আমার শুকনো মুখ দেখবার লোক এখানে, অনিমেষ নয়নে আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন! কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়লাম, চোখে জল ভরে এল। কি যেন বললেন, বোধ হয় কুশলপ্রশ্ন—কানে এল না। সেবক মহারাজ আমার পরিচয় জানালেন আর নিবেদন করলেন—"মহারাজ, একে কৃপা করুন।"

মহাপুরুষ মহারাজ বললেন—"বেশ তো, কাল এসো আর তাকেও সঙ্গে নিয়ে এসো, এখন যাও ঠাকুরঘরে; আর প্রসাদ পেয়ে যেও।" আর কোন কথা বলেছিলেন কিনা স্মরণ হয় না। ঠাকুরের প্রসাদ পেয়ে সারাদিন মঠে থেকে সন্ধ্যার সময় ফিরেছিলাম; অভূতপূর্ব তৃপ্তি ও আনন্দে মন ভরে গিয়েছিল।

পরদিন সকালে সস্ত্রীক মঠে গিয়ে গঙ্গাস্নান করে মহাপুরুষ মহারাজের শ্রীচরণপ্রান্তে হাজির হলাম। তিনি খাটের উপর বসেছিলেন। প্রণাম করে তাঁর পাদস্পর্শ করে মেজেতে বসে পড়লাম—সেবক মহারাজ ধীরে ধীরে ঘর থেকে

বের হয়ে দরজা ভেজিয়ে দিলেন। দেখলাম তাঁর চোখ-মুখ লাল, দুই চোখ বেয়ে আনন্দাশ্রু ঝরে পড়ছে। গম্ভীর অথচ মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "ঠাকুরে বিশ্বাস আছে?" যন্ত্রচালিতের মতো বাষ্পাকুল কণ্ঠে বললাম, "আছে।" তারপর তারকনাথ মহাদেব তারকমন্ত্র দান করলেন।

দীক্ষা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। ইতঃপূর্বে অবতারতত্ত্ব, গুরুবাদ ইত্যাদি বিষয়ে কিছু কিছু পড়েছিলাম মাত্র, কোন ধারণা হয়নি। এই একটি মুহূর্তে অতীতের জীবনধারার আমূল পরিবর্তন এনে দিল আর ভবিষ্যতের জন্য তুলে ধরল এক মহোজ্জ্বল জীবনের আদর্শ। মঠে গিয়েছিলাম অবসরবিনোদনের উদ্দেশ্যে—ফিরে এলাম অমূল্য রত্ন নিয়ে।

কথাবার্তা কিছু বলেছিলেন, সেসব তেমন মনে নেই। মনে আছে শুধু তাঁর করুণাঘন চেতন বিগ্রহ। আর মনে আছে তাঁর অহেতুক অসীম কৃপার কথা।

এরপর মাত্র দুটি বছর তিনি স্থূলদেহে ছিলেন, তখন প্রতি সপ্তাহেই তাঁর কাছে গিয়েছি। তিনিই আকর্ষণ করে নিয়ে গিয়েছেন। কথাবার্তা তেমন কিছু হতো না, যদিও যাবার আগে নানা প্রশ্ন মনে উঠতো কিন্তু তাঁর কাছে গেলেই সব ভুলে যেতাম। তাঁকে দর্শন করলেই যেন মনটা পরিষ্কার হয়ে যেত।

কোনদিন তাঁর কাছে কিছু চেয়েছি বলে মনে পড়ে না। কেন চাইনি, তখন সেসব কথা মনেই হতো না। এখন ভাবি অযাচিতেই তিনি দিয়েছিলেন, তাই কিছু চাইবার ছিল না, কোন প্রয়োজন বোধ করিনি। অতীতের জন্য ক্ষোভ এবং অনুশোচনা বা ভবিষ্যতের চিন্তা এবং উদ্বেগ যা নিয়ে মনের সব চাওয়া-পাওয়া, তাঁর সান্নিধ্যে গেলেই সেসব কোথায় অন্তর্হিত হতো। মাত্র একবার দর্শনে—একটি কৃপাদৃষ্টি পেলেই সব ভুলে যেতাম, মনের সব গ্লানি দূর হতো।

যতদূর মনে পড়ে একবার মাত্র এর ব্যতিক্রম হয়েছিল—সেটা বোধ হয় ১৯৩৩-এর প্রথম দিকে। নানা সাংসারিক ঘটনা প্রবাহবশে আমার মন তখন গুরুভারাক্রান্ত, কিছুতেই সামলাতে পারছিলাম না। বিভ্রান্ত মনে তাঁর কাছে গিয়ে প্রণাম করে বসতেই বললেন, "কি হয়েছে?" কোনরকমে মন সংযত করে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলাম, "মহারাজ, মন বড় খারাপ, আর যেন পেরে উঠছি না।" তিনি স্থির গম্ভীরস্বরে বললেন, "মনকে বিশ্বাস করো না, মন জোচ্চোর। যাও এখন ঠাকুরঘরে যাও আর প্রসাদ পেয়ে যেও।" তাঁর কথার মর্ম যেন তখন বোধগম্য হলো না। এখন বুঝছি মাত্র দুটি কথা—মনকে বিশ্বাস করো না। বুঝছি যত দিন যাচ্ছে—স্বভাব-চঞ্চল মন সংসারের ঘটনাচক্রে যখনই বিভ্রান্ত হয় তখনই তাঁর

অমোঘ বাণী মনে পড়ে—"মনকে বিশ্বাস করো না।" আর সঙ্গে সঙ্গে মনের বিভ্রান্তি ও উদ্বেগ চলে যায়। যতদূর স্মরণ হয়, এ দুটি কথাই তাঁর মুখের শেষ কথা শুনেছিলাম। এর স্বল্পকাল পরেই অসুস্থ হয়ে তাঁর বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হয়ে যায়। মুখের ভাষা মূক হলেও তাঁর চোখের ভাষা ছিল আর অমৃতনিঃস্যন্দী শ্রীমুখের হাসিটি ছিল প্রাণস্পর্শী, সর্বতাপহারী।

এরপর মাত্র কয়েক মাস তাঁর দেহ ছিল। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই, কখনও সপ্তাহে দু-বার তাঁর কাছে গিয়েছি। কথা বলতে পারতেন না, শুধু বাঁ হাতটি তুলে আশীর্বাদ করতেন। তাঁর পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করতাম আর তাঁর আশীর্বাদ লাভ করে তাঁর স্বর্গীয় হাসিটি দেখে পরিপূর্ণ হৃদয়ে ফিরে আসতাম।

১৯৩৪-এর ২০ ফেব্রুয়ারি শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের আশ্রিত সন্তানদের সমূহ দুর্দিন। ঐ দিন বেলা প্রায় দুইটার সময় আলমোড়ার পূজনীয় রাম মহারাজ আমার বাসা থেকে টেলিফোনে আমার কর্মস্থানে সংবাদ দিলেন যে, মহাপুরুষ মহারাজের অবস্থা খুবই খারাপ—শরীর থাকে কিনা, এখনই মঠে যেতে হবে। আমরা তিনটার কিছু আগে রাম মহারাজের সঙ্গে মঠে গেলাম। মঠ লোকে লোকারণ্য। মহাপুরুষ মহারাজ ধীর স্থিরভাবে শুয়ে আছেন, মুখ যেন জ্বলজ্বল করছে—রোগযন্ত্রণার চিহ্নমাত্র নেই। প্রায় দু-ঘণ্টা ধরে সন্ন্যাসিবৃন্দ ঠাকুরের নাম করতে লাগলেন। একজন ব্রহ্মচারী মহারাজের প্রিয় ভজনসঙ্গীতটি গান করলেন। মহারাজের দেহ ঘনঘন পুলকিত হতে দেখলাম আর তাঁর মুখে দেখতে পেলাম—শান্ত স্নিগ্ধ অম্লান মাধুর্য। অপরাহ্ণ পাঁচটার কিছু পরেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণেলীন হয়ে গেলেন। তাঁর পূত ভাগবতী তনু গঙ্গাবারিস্নাত, চন্দন ও বিভূতিলিপ্ত হয়ে স্বামীজীর মন্দিরের দক্ষিণ প্রাঙ্গণে নীত হলো। অগ্নিতে আহুতি দেবার আগে শেষবার তাঁর শ্রীচরণে মাথা ঠেকিয়ে আবার পিতৃহারা হয়ে কলকাতায় ফিরলাম। তখন গভীর রাত্রি।

তাঁর কাছে কি পেয়েছি—তা ভাষায় প্রকাশ করার সামর্থ্য আমার নেই—বোধ হয় কারও নেই, যা পেয়েছি তা পেয়েছি। শুধু এটুকু মাত্র মনে হয়, কয়েকটি বছরের তাঁর সান্নিধ্য এবং তাঁর অসীম অহেতুক কৃপা—যা আজও অম্লান হয়ে আছে—না পেলে আমার জীবন দুর্বিষহ হতো। তাই আমার জীবনসন্ধ্যায় একমাত্র সম্বল। কবে তিনি কৃপা করে তাঁর এই অভাজন সন্তানকে বাঁ হাতটি তুলে সেই মধুর হাসিটি হেসে পরিপূর্ণভাবে দেখা দেবেন সেই আশায় দিন গুণছি।

ওঁ শ্রীশিবানন্দ-শ্রীচরণার্পণমস্তু